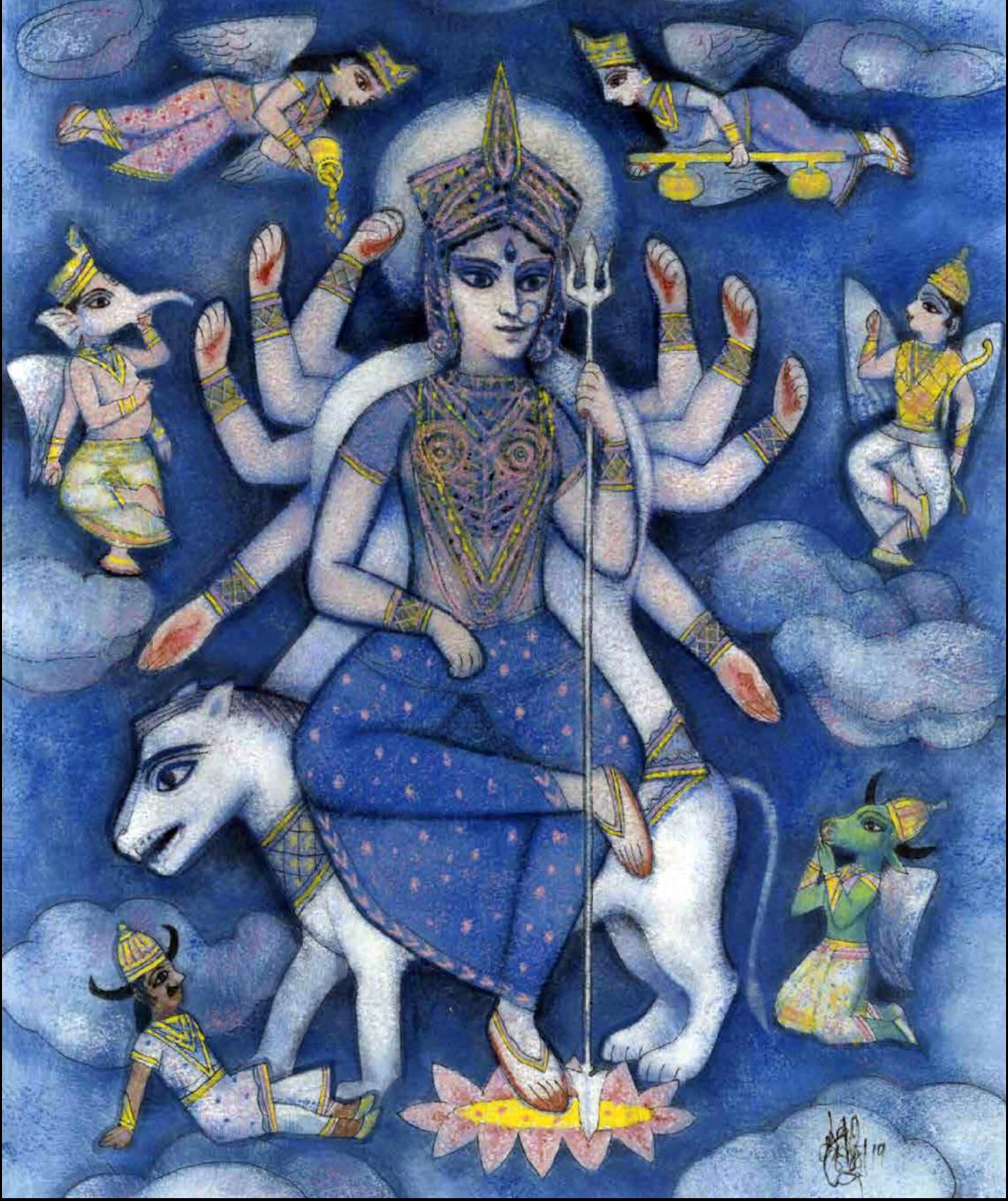
শারদীয়া ১৪২৬

আনন্দবাজার পত্রিকা



আনন্দবাজার পত্রিকা

শারদীয়া ১৪২৬



সূচিপত্র

সূচিপত্র



উপন্যাস

সূচিপত্র



পুরাণকথা

প্রবন্ধ

সূচিপত্র



গল্প

রম্য রচনা

ভ্রমণ

সূচিপত্র



কবিতা

সূচিপত্র



কবিতা

সূচিপত্র



কবিতা

সূচিপত্র



কবিতা

সূচিপত্র



কবিতা

সূচিপত্র



কবিতা

সূচিপত্র



প্রচ্ছদ

সুব্রত চৌধুরী

বহুবর্ণ চিত্র

শ্রীশ্রী দুর্গা : পটচিত্র

পাখির চোখে বিশ্ব: অসিতকুমার হালদার

সূচিপত্র



অলঙ্করণ

সুব্রত চৌধুরী
ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য, তারকনাথ মুখোপাধ্যায়,
কুনাল বর্মণ, রৌদ্র মিত্র, সৌমেন দাস, মহেশ্বর মণ্ডল
বৈশালী সরকার, দীপঙ্কর ভৌমিক

সূচিপত্র



সম্পাদক: অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ জি এন ৩৯, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১ এবং ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০৬০ থেকে মুদ্রিত।



সম্পাদকীয়

বাঙালির জীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধির স্বপ্ন অনেক দিনই বহুলাংশে স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। তার ইতিহাস তাকে মেধা ও সৃষ্টির ভুবনে যে গৌরবের কথা স্মরণ করায়, আজকের বঙ্গসমাজের কাছে তা প্রধানত স্মৃতি। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতির দিনলিপি আজ দিনগত পাপক্ষয়ের হিসেব রেখেই ক্লান্ত। অ-সুখ এবং অ-শান্তির দাপটে তার অস্তিত্ব প্রতিনিয়ত ক্লিন্ন ও দীর্ণ।

তবু, এই অন্তহীন আবর্তনের মধ্যে, এবং আবর্তনের নিয়মেই, শারদোৎসব সমাগত হয়। মানুষ দুঃখ ভুলে আনন্দের সলতে পাকায়। হাজার গ্লানির মধ্যেও উৎসবের সজ্জায় বাঙালি নিজের সমস্ত সৌন্দর্যচেতনাকে মেলে ধরতে চায়, সৃষ্টিপ্রতিভাকে উন্মোচন করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সারা বছরের মালিন্যের পাশে এই মরসুমের আড়ম্বর আপাতদৃষ্টিতে হয়তো-বা কারও বিসদৃশ মনে হতে পারে, কিন্তু তাই বলে সেই আনন্দযাপনকে তুচ্ছ করা চলে না। কারণ, তার মধ্যেই নিহিত থাকে নিজেকে ফিরে পাওয়ার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার অদম্য প্রয়াস।

শারদীয় সাহিত্য সেই আত্ম-অন্বেষার এক পরম আদরণীয় এবং মূল্যবান সম্পদ। বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকের হাতে শারদসাহিত্যের সম্ভার তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়েই তাই আমরা নিজেদের কর্তব্য পালনের সার্থকতা খুঁজে পাই। প্রার্থনা জানাই, বাঙালির শারদোৎসব সার্থক হয়ে উঠুক।



রাজা মহীরথের পুণ্য অর্জন ও পুণ্য প্রদান

হর্ষ দত্ত

শ্মশানভূমির লেলিহান শিখা এবং শোকস্তব্ধতা যেন অতিদ্রুত গ্রাস করছে একদা সুরম্য এই রাজ্যটিকে। চতুর্দিকে অরাজকতার প্রবাহ। কখনও অতি বলশালী হয়ে প্রকাশ্যে, কখনও-বা সুপরিকল্পিত অন্তরালে সেই ধারা বয়ে চলেছে। রাজ্যের শান্তিপ্রিয় প্রজারা সর্বদাই ভীত-সন্ত্রস্ত। নিত্য নানা হিংসা ও অপমানে জর্জরিত প্রজাকুল কোথায়ই-বা অভিযোগ জানাবে, কোথায়ই-বা আশ্রয় নেবে! রাজধর্মের চিহ্নমাত্র এই রাজ্যে অবশিষ্ট নেই। বস্তুত উচ্ছৃঙ্খল, প্রভূত ক্ষমতাবান, মনুষ্যত্ব বিসর্জিত, মদ্যপায়ী, নারীভোগে সতত সক্রিয় একদল মানুষ রাজ্যটিকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় রূপান্তরিত করেছে। এখানে সাধারণ প্রজা বিপর্যস্ত, প্রকৃতি বিষাদগ্রস্ত, মনুষ্যেতর প্রাণীরা কোনও আসন্ন বিপদের অনুমান করে শঙ্কিত। রাজ্যের বহিরঙ্গে যেন দিন ও রাত্রির প্রভেদ অন্তর্হিত।

এমন করুণ অবস্থার জন্যে সম্পূর্ণভাবে দায়ী রাজ্যশাসক রাজা মহীরথ। তিনি পিতার প্রয়াণের পর এই রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেছেন। প্রথমে প্রজারা ভেবেছিলেন, মহীরথ বয়সে তরুণ, কর্মঠ, রাজকার্যে তাঁর আগ্রহ দিন দিন বর্ধিত হবে। কিন্তু তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষা ও ভাবনা যে আদ্যন্ত এক ভ্রান্তি, তা প্রজারা দ্রুত অনুভব করতে লাগলেন। পরিত্যাজ্য দূষিত জীবনযাপনে মহীরথ অভ্যস্ত। রাজকার্যে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তিনি নারীসঙ্গলোভী, কামকেলি পরায়ণ, সর্বদা ভোগলিপ্সু। প্রভাত কাকে বলে তিনি জানেন না। গভীর রাত্রিতে, তিনি নৃত্যগীতের আসর থেকে একাধিক তরুণীকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসেন। মদ্য-মাংসাদি আহার শেষ করে তিনি শয্যাগ্রহণ করেন প্রায় প্রত্যুষলগ্নে। এর ফলে দিবসে তিনি স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করেন প্রায় দ্বিপ্রহরে। রাজকর্ম সম্পাদনের জন্য সামান্য সময় ব্যয় করাও মহীরথের কাছে অনভিপ্রেত। ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত, দুর্বিনীত রাজপুরুষেরা রাজ্যটিকে কুশাসনে নিমজ্জিত করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করছেন। তাঁদের বাধা দেওয়ার কেউ নেই। বরং অমাত্যদের আচরণে মনে হয়, রাজা তাঁদের হাতে সর্বস্ব অর্পণ করেছেন। মহীরথ বুঝতেও পারেন না যে, রাজকর্মচারীদের নানা হাতে তিনি পুতুলের মতো নিত্য হস্তান্তরিত হচ্ছেন। তাঁর ক্ষমতা এঁরাই গ্রাস করেছেন। নিজের

ক্রীড়নক অবস্থা সত্ত্বেও মহীরথ চক্ষুকর্ণহীন শাসকের মতো কালাতিপাত করছেন। প্রজাদের ত্রাহি ত্রাহি রবের প্রতি তিনি উদাসীন। বরং অসৎ ও বিদূষক সদৃশ মিত্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে মহীতোষ সর্বদা আকাঙ্ক্ষিত। তিনি রসাতলে যাওয়া কাকে বলে বুঝতেই পারেন না। তাঁর মন্ত্রণাদাতা রাজকর্মীরা মহীরথকে বিপথে চালিত করতে এতটাই তৎপর যে, রাজ্যটির উন্নতি এখন অবনতির গহ্বরে ঢুকে গেছে।

এই নিদারুণ অবস্থায় সর্বদা পীড়িত বোধ করেন রাজপুরোহিত কশ্যপ। অবক্ষয় কীভাবে রোধ করা যায়— এ নিয়ে তাঁর চিন্তার অন্ত নেই। বোধবুদ্ধিহীন, আত্মরতি সর্বস্ব, অমানবিক গুণাবলিতে আচ্ছন্ন মহীরথকে তিনি মন্দপথ থেকে সৎপথে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেই রাজকর্মচারীরা বাধা দেবেন, তাঁকে হত্যা করতে পারেন রাজার অশিষ্ট, দুরাচারী বন্ধুবর্গ। নিজ স্বার্থই এঁদের কাছে সবচেয়ে বড়। এক বৃহৎ আবর্তের মধ্যে রাজা নিমজ্জিত। তাঁকে সেই পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করার উপায় কী হতে পারে— কশ্যপ বহু চিন্তা করেও মার্গ অন্বেষণে ব্যর্থ। বিদ্রোহ করার মতো মনোবল, অর্থবল ও সাহস প্রজাদের নেই। প্রধানমন্ত্রী বা অন্য অমাত্যবর্গ রাজ্যের কল্যাণ অপেক্ষা নিজেদের অর্থবৃদ্ধিতে অতিব্যস্ত। তাঁরা মহীরথকে এই অবস্থায় রেখে দিতে নানা অপচেষ্টায় নিয়ত তৎপর। এঁদেরকে সুশাসনের কথা বলতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। হয়তো রাজপুরোহিত পদ থেকে তাঁকে চ্যুত করে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হল! কশ্যপের সম্মান ও প্রাজ্ঞতার মূল্য এঁরা দেবেন না। রাজ্যের শুভ কামনায় তাঁর অসহায়তাকে ব্যঙ্গ করবেন। তাঁর অন্তরে যে-রক্তমোক্ষণ হচ্ছে, তাকে গণনার মধ্যেই আনবেন না। অগ্রগামী হয়ে কোনও কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রবচন উচ্চারণ করার মতো পরিবেশও অন্তর্হিত। কশ্যপ কাকেই-বা বলবেন? কে-ই বা শুনবে! বরং এই উদ্যোগ নিলে তাঁকে মিথ্যার আশ্রয়ে এবং অপকৌশলে কারাগারে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এত বাধা অতিক্রম করা একজন রাজপুরোহিতের পক্ষে কখনওই সম্ভব নয়। বয়স এবং অভিজ্ঞতা কশ্যপের অন্তরে নিরন্তর বাধার সৃষ্টি করছে। অথচ বাধা অতিক্রম করতে না-পারলে, রাজা মহীরথ ও তাঁর রাজ্য, কোনওটিই জীবিত থাকবে না। কশ্যপের পক্ষে ধ্বংসের এই লীলা জীবৎকালে দেখে যাওয়া অসম্ভব। সকলের মঙ্গলের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মতো পুণ্যকর্ম আর দ্বিতীয়টি নেই। অতএব মৃত্যু যদি অনিবার্য হয়ে ওঠে, তবে তাই হোক— এমন একটি নির্দিষ্ট ভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে এবং সত্য ও ত্যাগকে সঙ্গে নিয়ে, কশ্যপ একদিন রাজসকাশে যাত্রা করলেন। দেবতার মন্দিরে যিনি প্রত্যহ গমন করেন, দেবতার পুজা ও নিত্যক্রিয়াকর্মাদি যিনি সম্পন্ন করেন, তাঁকে রাজদ্বারের সামনে শকট থেকে নামতে দেখে দ্বারপালরা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেন। রাজা মহীরথ এখন এই দ্বিপ্রহরে জলকেলিতে মগ্ন। রাজঅন্তঃপুরে তাঁর জন্যে সবান্ধব আহারাদির ব্যবস্থা সম্পন্ন হচ্ছে। এমতাবস্থায় রাজপুরোহিতের আগমনের হেতু কী? তিনি তো বিলক্ষণ জানেন, মহীরথ দ্বিপ্রহরের সামান্য আগে মাত্র এক দণ্ড কাল সময় রাজকার্যে ব্যয় করেন। এই সময়ে পুরোহিত কশ্যপ কেন এলেন! ষষ্টি পলও মহীরথের কাছে মহামূল্যবান। রাজপুরোহিতের আগমনে রাজা নিশ্চিত ক্রোধান্বিত হবেন।

প্রধান দ্বাররক্ষী এগিয়ে এসে যথানিষ্ঠ অভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পরম সম্মাননীয় রাজপুরোহিত, কী হেতু আপনার আগমন?

শিষ্টাচার প্রদর্শন করে কশ্যপ বললেন, আমি রাজা মহীরথের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে এসেছি। এই সাক্ষাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তুমি রাজগৃহের অভ্যন্তরে আমার আগমন সংবাদ জানাও।

অধিপতি দ্বারপাল ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, রাজাধিরাজ এই সময়ে স্নান সম্পন্ন করছেন। তারপর দ্বিপ্রাহরিক আহার্য গ্রহণ পর্ব...

আমি সমস্তই অবগত আছি। আমার অন্তরস্থিত দেবতার নির্দেশে আমি এসেছি। তোমাকে বলতে বাধা নেই, এক বিধ্বংসী দুর্যোগ ও সংকট সর্বত্র আভাসিত হচ্ছে। চর্মচক্ষে তা দর্শন করা কঠিন। হে প্রধান দ্বাররক্ষী, তুমি আমার আগমন বার্তা প্রেরণ করো। রাজার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ অনিয়মিত হয়ে যাওয়ায়, আমি সত্যই অসময়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। মহীরথ নিশ্চয়ই অনুধাবন করবে আমার রাজদ্বারে উপস্থিত হওয়ার গুরুত্ব।

দ্বিতীয় প্রধান দ্বারপালের সঙ্গে একান্তে আলোচনা করে, বরিষ্ঠ দ্বারপাল একজন চতুর্থ শ্রেণিভুক্ত দ্বাররক্ষীকে বললেন, মিহির, তুমি সত্বর রাজপুরোহিত মহোদয়কে রাজস্নানাগারের দ্বারদেশে নিয়ে যাও। তোমার পদক্ষেপগুলি যেন নির্ভুল হয়।

মিহিরের সঙ্গে কশ্যপ শ্বেত শৈল নির্মিত রাজগৃহের অভ্যন্তরে উপস্থিত হলেন। স্নানাগারের দ্বারে নিযুক্ত রক্ষীর কাছে কোনও এক অদ্ভুত উপায়ে এরই মধ্যে রাজপুরোহিতের আগমন সংবাদ পৌঁছে গেছে। কশ্যপ সহসা দেখলেন, কয়েকজন অর্ধনগ্ন, সিক্তবসনা নারী পার্শ্ববর্তী একটি দ্বার দিয়ে অন্য কক্ষে প্রবেশ করল। তারপর রক্ষী মুখ্য দ্বারটি উন্মুক্ত করে বলল, ভদ্র, আপনি প্রবেশ করুন। মহারাজা অপেক্ষারত।

প্রস্তরনির্মিত একটি জলাধারে মহীরথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভাসমান। রাজা কিছু বলার আগেই কশ্যপ বললেন, মহামান্য রাজা, এই অসময়ে এক আত্যন্তিক প্রয়োজনে আমি আজ তোমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছি। মার্জনা কোরো। তোমাকে কয়েকটি কথা বলতে এসেছি।

মহীরথ স্মিত হাস্যে বললেন, বুঝেছি, আপনি কোনও কারণে আসতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও রাজসমীপে এমন অকস্মাৎ আগমন অনুচিত। তবু আপনি প্রাজ্ঞ, স্বচ্ছন্দে বলুন আপনার বক্তব্য। তার আগে ওই সুদৃশ্য প্রস্তরাসনে উপবেশন করুন।

কশ্যপ অত্যন্ত চিন্তামগ্ন হয়ে বসেই বললেন, মহীরথ, তুমি তো জানো, রাজধর্ম স্বেচ্ছাচার, পাপাচার, কামাচার নয়। কিন্তু এই রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা হওয়া সত্ত্বেও তুমি ধর্ম, প্রজা, কর্ম, অর্থ— সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কদাচারে নিমজ্জিত হয়ে আছ কেন? 'ন প্রজা ন ধনং ধর্মং নার্থকার্যং স পশ্যতি।/ কেবলং কামিনীকেলি-কলনাচিত বাঞ্ছনাঃ।' তুমি কি এর পরিণতি জানো না?

মহীরথ অত্যন্ত ক্রুধ্ব হলেন। রাজপুরোহিত প্রায়শ রাজগুরুর সমান। তিনি প্রণম্য, তাঁকে মান্যতা দেওয়াও রাজকর্তব্য। কিন্তু এমন অযাচিতভাবে তিনি কেন এই দ্বিপ্রহরে এসব জ্ঞানদান করতে এলেন! রুক্ষস্বরে মহীরথ বললেন, ভোগ মনুষ্যজন্মেই মানুষ বরণ করে এমন নয়, মনুষ্যেতর জন্মেও ভোগ করার বহু নিদর্শন আছে। ভোগ বা বাসনা নিবৃত্তি প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তি। যা সহজাত তার বিরুদ্ধাচরণ করা শেষপর্যন্ত সম্ভব হয় না। তা ছাড়া, ভোগ যৌবনের ধর্ম। হে রাজপুরোহিত কশ্যপ, আপনি যে-বয়সে উপনীত হয়েছেন, সেখানে ত্যাগ প্রাসঙ্গিক।

দুঃখিতচিত্ত কশ্যপ ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক নিয়ে আমি আলোচনা করতে আসিনি। কাম তোমাকে সর্বস্তরে গ্রাস করেছে। তুমি তো জানো, ষড়রিপুর মধ্যে কামই প্রথম স্থানে অবস্থান করছে। শরীরস্থ ষড়রিপুই আমাদের শত্রু। কিন্তু তার মধ্যে কামের শক্তি সর্বাধিক। বৃদ্ধ বয়সেও সে গোপনে দেহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। তুমি কাম-সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছ, রাজন। তোমার পরিত্রাণই আমার একমাত্র কাম্য। তা না হলে এই রাজ্য অচিরেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে কিংবা পার্শ্ববর্তী কোনও রাজা একে গ্রাস করবে। সর্বদা মনে রেখো, সর্বপ্রকার ব্যসনের মধ্যে কামজ দোষই অত্যন্ত পীড়াদায়ক। অন্তহীন দুঃখের পথে কামজ পাপ তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। হে মহারাজ, ধর্মবিরোধী কাম পরিত্যাগ করে নিজের মঙ্গল চিন্তায় জীবনযাপনে মগ্ন হও। 'ব্যসনানি চ দুঃখানি কামজানি বিশেষতঃ।/ ত্যজ স্মর মহারাজ কামং ধর্মবিরোধনম্॥'

কৃত্রিম জলাশয় থেকে গাত্রোত্থান করলেন মহীরথ। ভৃত্য গাত্র শোধন ও শুষ্ক করার জন্যে রাজার হস্তে মহামূল্য বস্ত্র তুলে দিল। পরিমার্জন সমাপন করতে করতে রাজা বললেন, আমার রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে, এমন কোনও সংবাদ আমার কাছে নেই। দ্বিতীয়ত, কাজকর্মচারীরা নিষ্ঠার সঙ্গেই তাঁদের কর্তব্য পালন করছেন। রাজধর্ম থেকে আমি চ্যুত হয়েছি— এমন অভিযোগ আপনিই প্রথম করলেন।

প্রস্তরাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কশ্যপ বললেন, তুমি আমার পুত্রতুল্য। তোমার প্রতি আমার স্নেহাশীর্বাদ সর্বক্ষণ আছে। কিন্তু রাজ্যের অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা অন্যের চোখ দিয়ে দেখার প্রবৃত্তি থেকে তুমি নিজেকে সরিয়ে আন, বৎস। চর্মচক্ষে দেখা যায় না ফল্গু নদী ও ভস্মাবৃত অগ্নি। কিন্তু এগুলি অস্তিত্ববিহীন— এমন বাক্য কেউ উচ্চারণ করে না। কেননা, যেমন ফল্গুর অস্তিত্ব সত্য, তেমনই অগ্নিরও। এদের অস্বীকার করা আর আত্মঘাতী হওয়া সমান। এই মুহূর্তে তোমার রাজ্যের অবস্থা তদ্রুপ। প্লাবন এবং অগ্নি অন্তরালবর্তী। যে-কোনও সময় তাঁরা আত্মপ্রকাশ করবেন।

মহীরথ আরও ক্ষুব্দ হয়ে উঠলেন। এই বৃদ্ধ অযথা তাঁর সময় নষ্ট করছেন।

দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর তিনি নারীসঙ্গসহ দিবানিদ্রা যাপন করবেন। তারপর সন্ধ্যা সমাগমে মন্দির বা দেবালয়ের পথে না-গিয়ে, মহীরথ মূল্যবান রাজবেশ ধারণ করে, সুগন্ধী পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে, অলংকারে ভূষিত হয়ে আনন্দগৃহে চলে যাবেন। সেখানে তাঁর মদ্যপায়ী, কামুক ও ধনী মিত্ররা অপেক্ষা করে থাকে। আর প্রস্তুত থাকে নর্তকী, গায়িকা ও সুসজ্জিত গণিকাবৃন্দ। এদের সাহচর্য বিনা রাজা নিজেকে শূন্যপ্রাণ মনে করেন। অতএব রাজপুরোহিতকে রূঢ় ভাষণে বিদায় করা ব্যতীত অন্য পথ নেই। মহীরথ বস্ত্র পরিবর্তন করে অসম্ভব গাম্ভীর্যে বললেন, আপনি শ্রদ্ধেয় রাজপুরোহিত। আমার মনে হয়, পৌরোহিত্য ব্যতীত রাজকার্যে আপনার প্রবেশ অনধিকার চর্চা। আপনি এবার বিদায় নিন। প্রণাম।

রাজার এই দুর্বিনীত ব্যবহারে কশ্যপ এতটুকু ক্ষুব্ধ হলেন না। শান্তস্বরে বললেন, আমি রাজপুরোহিতরূপে তোমার কাছে যেমন এসেছি, তেমনই আমার আর-একটি পরিচয়— অগণিত প্রজাদের মধ্যে আমিও একজন। আমি ব্রাহ্মণ, তুমি ক্ষত্রিয়— পার্থক্য শুধু এইটুকুই। ব্রাহ্মণ হলেও আমি শাস্ত্রজ্ঞ। সেই কারণে আমি জানি, একজন যথার্থ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং কর্ম কী হওয়া উচিত। জীবনব্যাপী কামজ ভোগ ও পরনির্ভরতা কখনওই কোনও রাজার আচরণ হতে পারে না। রাজা যদি স্বয়ং রাজধর্ম পালন না করেন, তা হলে পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য। যা কিছু ঘটবে তা সশব্দে— এমন ভাবনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বরং নিঃশব্দে ঘটে যাওয়া কার্যগুলি রাজচক্ষুর অন্তরালে থাকে, এবং তা রোধ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। হে মহীরথ, তোমার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, ভোগবাসনার আসক্তি থেকে তুমি নিজেকে উৎপাটিত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত হও। এই প্রচেষ্টায় ধর্মই হবে তোমার সহায়। ধর্ম কোনও কৃত্য নয়, তোমাকে সৎ থাকার পথনির্দেশ দেবে ধর্ম। সংসারী মানুষের জীবনে ভোগবাসনা আজন্ম থাকে। তার হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি অবতারকল্প ও ঋষিকল্প নর-নারীরা লাভ করেন। তৎসত্ত্বেও আমাদের সকলের উচিত অল্পস্বল্প পুণ্য এবং ধর্ম সঞ্চয় করা। ধীরগতিতে হলেও ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত না হওয়াই কাম্য। 'ধর্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।/ ধর্মেণ হি সহায়েন নরস্তরতি দুর্গতিম্‌॥' উইপোকা (পুত্তিকা) যেমন ক্রমে ক্রমে উইয়ের ঢিপি (বল্মীক-মৃত্তিকা) তৈরি করে, তেমনই দুর্গতি থেকে রক্ষালাভের জন্য একটু একটু করে ধর্ম সঞ্চয় করা মানুষের কর্তব্য।

পুঞ্জীভূত পাপাচার সম্পর্কে এই উপমাসহ বাক্যটি শোনার পর রাজার অন্তর যেন কেঁপে উঠল। সামান্য বিনত হয়ে তিনি বললেন, আপনি যথার্থই বলেছেন। তবে উই মৃত্তিকাস্তূপ তৈরি করে স্বভাববশত। তেমনই মানুষেরও স্বভাব আত্মরতি। এই পথেই বংশানুক্রমে সে মানবজীবন বিন্যস্ত করে। আপনি আমাকে যা বললেন, অবশ্যই তা সুচিন্তিত। আমার নিজের মুক্তির নিমিত্ত ধর্মপথের অন্বেষণ অবশ্য কর্তব্য।

কশ্যপ সুমধুর বচনে রাজাকে বললেন, শুধু তোমার মুক্তি নয়, এই রাজ্যও তোমার ধর্মনিষ্ঠ জীবনযাপনের প্রভাবে আদর্শ রাজধর্মে পরিচালিত হবে। দূরীভূত হবে প্রজাদের দুঃখ, বঞ্চনা, ক্ষোভ। অপভ্যাস ত্যাগ করে তুমি মহান হয়ে উঠবে, এ আশা আমি করছিলাম। তবে তোমার কামাকাঙ্ক্ষার সুযোগ নিয়ে যেসব বন্ধুবর্গ ও রাজন্যবর্গ সারা রাজ্যটিকে কুশাসনে ভরিয়ে তুলেছেন, তাঁরাও লাঞ্ছিত হয়ে নিজেদের সংশোধন করবেন। প্রতি বছরের বৈশাখ মাসটি তুমি ধর্মব্রত পালনের জন্যে চিহ্নিত করো। এই মাসটি অতি পবিত্র, ঈশ্বর বৎসরারম্ভে তাঁর কৃপাকর প্রসারিত করে দেন। প্রতিটি দিন যদি তুমি নিবৃত্তচিত্তে তাঁর শরণাপন্ন হও, তবে ধীরে ধীরে কর্মের সঙ্গে ধর্ম তোমার সহায় হয়ে উঠবে।

শব্দ করে হাসলেন মহীরথ। বললেন, আপনার কোনও বাক্যকে আমি অবজ্ঞা করছি না। আমার প্রতি স্নেহপ্রীতিবশত আপনি স্বয়ং এসে সৎ এবং অসৎ সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করলেন ঠিকই, তবে এও তো স্বীকার করবেন, কেউ যদি সাধুসঙ্গমরূপ গঙ্গাজলে স্নান করার সুযোগ লাভ করে, তা হলে তার যজ্ঞ, তীর্থ, তপস্যা বা দান ইত্যাদি ধর্মাচরণ করার কী প্রয়োজন? 'যঃ স্নাতঃ পাপহরয়া সাধুসঙ্গমগঙ্গয়া।/ কিন্তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥'

তাঁকে পরিতুষ্ট করার জন্যে মহীরথ চতুরতার সঙ্গে যে-কথা বললেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে কী বলবেন, কশ্যপ ভেবে পেলেন না। মহীরথের মুখে এখন ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই, বরং জয়লাভের হাস্যে, রাজানন উদ্ভাসিত। কশ্যপ তবু হার মানলেন না। পুনরায় বললেন, আমি এখনও যথার্থ সাধু হতে পারিনি মহারাজ। কেবল তোমার মঙ্গলার্থে রাজরোষ উপেক্ষা করে আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। আমার অনুরোধ বা উপদেশ— যাই বলো না কেন, তুমি পালন করো। প্রতি বছর বৈশাখ মাসটি তুমি পুণ্যার্জনের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখো। এতে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। বরং প্রতি বৎসরের ধর্মসঞ্চয়ে তুমি ধনবান হয়ে উঠবে। এই ধন অপার্থিব। বহির্জগতে অদৃশ্যমান। তোমার অন্তর ক্রমশ ধর্মাভিভূত হয়ে প্রজাদের মঙ্গলকর্মে নিয়োজিত হবে। রাজা, তুমি সব সময় মনে রাখবে, 'ধর্মেন প্রাপ্যতে সর্বমর্থকামাদিকং সুখম্‌'। তুমি বৎসরের মধ্যে মাত্র একমাস বৈশাখকৃত্যের অনুষ্ঠান করো। প্রাতঃস্নান, বিষ্ণুপূজা, সদাচার, দান-ধ্যানে যে পারগ, নিষ্ঠাবান, সে বিষ্ণুলোকে গমন করে। জীবনে একবার মাত্র ভক্তিভরে যথাবিহিত মাধবব্রত উদ্‌যাপনে মানুষের স্বর্গলাভ হয়। আমি এবার বিদায় নেব, রাজন।

বৃদ্ধ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাজপুরোহিতের পবিত্র সান্নিধ্যে মহীরথের হৃদয় সহসা পরিবর্তিত এবং প্রভাবিত হল। তিনি কশ্যপকে সশ্রদ্ধ প্রণিপাত নিবেদন পূর্বক বললেন, আজ আপনি আমায় ভবরোগনিবারক ব্যসনব্যাধির মহৌষধ পান করালেন। অথচ এই ওষুধ সাগরসম্ভূত সুধা নয়, কোনও দ্রব্যও নয়। 'অসাগরোত্থং পীযূষমদ্রব্যং ব্যসনৌষধম্‌।/ ত্বয়াহং পায়িতঃ সৌম্য ভবরোগনিবারণম্‌॥' আজ আমার মনের পরিবর্তন ঘটল। হে প্রাজ্ঞ, ব্রতধারী, সৎ ব্রাহ্মণ, আমি আপনার উপদেশ অনুসারে বৎসরের প্রারম্ভ মাসে ধর্মাচরণের সূচনা করব। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন। দু'টি হাত তুলে আশীর্বাদ জানিয়ে কশ্যপ বললেন, হে মহীপতি, এই মুহূর্তে তুমি কোনও পূর্বজ পুণ্যের প্রভাবে এবং আমার দেবোপম বাক্যে পবিত্রহৃদয় হয়েছ। অতএব তোমাকে বৈশাখমাসীয় অনুত্তম স্নানকৃত্যাদি অনুষ্ঠানে নিয়োজিত করব। তুমি প্রস্তুত হও। 'সাম্প্রতং শুদ্ধহৃদয়ে জাতস্ত্বং বচনাম্মম।/ পুরাচরিতপুণ্যেন কেনাপি চ মহীপতে॥'

রাজপুরোহিত শাস্ত্রমতে সর্বকর্ম সম্পাদনের পর মহীরথকে যথাযথ আশীর্বাদ করলেন। তারপর গভীর আশা নিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে মনে মনে ঈশ্বরকে বললেন, যদি মহীরথ পরিবর্তিত মানব হয়ে ওঠে, তবে হে ভগবান, তা হবে তোমারই কৃপায়। রাজা অজ্ঞ বা মূর্খ নয়। কেবল সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় ও সঙ্গদোষে ধর্মবিমুখ। তোমার প্রতি বিশ্বাস রেখে মহীরথ যদি সৎ এবং অসতের বিচার সম্পন্ন করতে পারে, তা হলে এই হতশ্রী রাজ্যটি ক্রমশ স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে।

রাজা বৈশাখী তিথি পালন করে স্বধর্মে স্থিত হয়ে ধর্মাচরণ করছেন, এই সংবাদ রাজপুরোহিত অন্য সব পুরোহিতের কাছ থেকে পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর স্বপ্ন সফল হল। সেদিন সাহস সঞ্চয় করে এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে রাজসমীপে উপস্থিত না-হলে রাজ্যটি ধ্বংস হয়ে যেত। এই সন্তুষ্টি ও সন্তোষ পুরোহিতকে শান্তি দিল ঠিকই, কিন্তু বয়সজনিত কারণে তিনি একদিন প্রয়াত হলেন। রাজপুরোহিতের প্রয়াণে মহীরথ শোকাভিভূত। কেননা, তাঁর মোহদৃষ্টির পরিবর্তনে রাজপুরোহিতের অযাচিত, শুভকর মঙ্গলবার্তার বিশেষ ভূমিকা তিনি কখনওই ভুলবেন না।

ধর্মাচরণ, রাজধর্মপালন, প্রজারঞ্জন, রাজ্যের উন্নতিসাধন ইত্যাদি কার্য যখন তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল, তখন থেকে রাজা পুনরায় উচ্ছৃঙ্খল, কামাচারে আকীর্ণ জীবনে প্রত্যাবর্তন করলেন। সারা রাজ্য জুড়ে আবার হাহাকার নেমে এল। মহীরথের মিত্র বলে যাঁরা পরিচিত এবং দুর্নীতিগ্রস্ত রাজকর্মচারীরা এই পুনরাবর্তনে অত্যন্ত সুখী ও উল্লসিত হয়ে উঠলেন। রাজাকে তাঁরা আর সৎপথে যেতে দিলেন না। বৈশাখ মাস ব্যতীত অবশিষ্ট একাদশ মাস, মহীরথ পূর্বতন জীবনাচরণে বর্ণময় করে তুললেন। কিন্তু দীর্ঘ ও প্রাত্যহিক স্বকৃত অত্যাচারে মহীরথের দেহ রোগাক্রান্ত হল। ক্ষয়রোগের মরণান্তিক আক্রমণ থেকে রাজা নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না। তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মরদেহ যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজপ্রাসাদে শায়িত রাখা হল।

এদিকে তাঁর সূক্ষ্ম, অদৃশ্য দেহ মর্ত থেকে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যমদূতেরা উপস্থিত হলেন। মহীরথ সারা জীবন কদর্য কামাচারে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিল। অতএব ভীষণ ও দুঃখময় ব্যসন-সাগরে নিজেকে নিমজ্জিত রাখার ফলস্বরূপ তাঁকে নরকে যেতেই হবে। নরকবাসই তাঁর চরম শাস্তি। যমদূতেরা রাজার সূক্ষ্মদেহ তাঁদের রথে যখন স্থাপন করছেন, তখন বিষ্ণুদূতেরা এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, মহীরথ বৈশাখী তিথি পালনে যে-পুণ্য করেছেন, তার জন্যে তাঁকে আমরা বৈকুণ্ঠধামে নিয়ে যেতে এসেছি।



দেবদূতদের প্রবল বাধা দিয়ে যমদূতেরা বললেন, তা কী করে হয়! জীবিত অবস্থায় মহীরথ যে-ধরনের পাপকার্য করেছেন, তাতে বিভিন্ন নরকে তাঁর অবস্থান এবং প্রহার অনিবার্য। আপনারা আমাদের কাজে বাধা দেবেন না। এদিকে বিষ্ণুদূতদের যুক্তিও অকাট্য। সত্যই, রাজা সামান্য হলেও পুণ্য সঞ্চয় করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্বর্গবাস বিধেয়। যম ও বিষ্ণুর দূতেরা কলহের পর স্থির করল, সুকর্মের জন্যে মহীরথ বৈকুণ্ঠে যাবেন তাতে বাধা নেই, এই যাত্রা সকলেরই কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু তার আগে রাজাকে নরকাবাসের পার্শ্ববর্তী পথ দিয়ে যেতে হবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী মহীরথের সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে বিষ্ণুদূতেরা নরকের দিকে গমন করলেন। তাঁদের পশ্চাতে চলল যমদূতগণ।

বীভৎস, পূতিগন্ধময়, অভাবনীয় শাস্তিতে আকীর্ণ, ঘোরতর তমসাবৃত নরকের সন্নিকটে এসে রাজা ক্রন্দনরত প্রাণিকুলের আর্তস্বর শুনে, বিস্ময়াহত হয়ে বললেন, 'কিময়মাক্রন্দো দারুণ শ্রুতঃ'— এ কী নিদারুণ ক্রন্দন ও শব্দসমূহ শুনতে পাচ্ছি!

ভাবলেশশূন্য বিষ্ণুদূতেরা বললেন, আপনার শ্রবণে কোনও ভুল নেই। শাস্তিপ্রাপ্ত পুণ্যকর্মহীন সমস্ত প্রাণী নরকযন্ত্রণা ভোগ আর অশ্রুপাত করছে আর্তনাদ সহযোগে। এদের দেহ ক্ষতবিক্ষত। অন্তরাত্মা শোকতাপে দগ্ধ। শাস্তি শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এরা এই অত্যাচার ও নরকাগ্নি থেকে মুক্তি পাবে না। ধর্মাচরণ না-করলে আপনারও এই অবস্থা হত।

রাজা মহীরথ নরকযন্ত্রণাকে আপন মর্মে উপলব্ধি করে শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, হে দেবদূতগণ, তোমরা শোনো, এই ক্লেশপীড়িত প্রাণীদের পরিত্যাগ করে আমি স্থানান্তরে যেতে পারব না। আমার হৃদয় দুঃখে পূর্ণ হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় স্বর্গের চেয়ে নরকবাসই শ্রেয়। অথবা আমি এই তাড়িত-পীড়িতদের জন্যে এই সূক্ষ্মদেহও ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আর্তব্যক্তিদের আর্তিনাশ ছাড়া অন্য কিছুতেই আমার ক্ষণকালের জন্যেও সুখলাভ হবে না। 'ন পুনঃ ক্ষণমার্তানামার্তিনাশমৃতে সুখম্'।

মহীরথের এই আত্মত্যাগের অভীপ্সা দেখে দেবদূতেরা প্রসন্ন হলেন। অগ্রগণ্য এক বিষ্ণুদূত বললেন, 'দুঃখিতানাং হি ভূতানাং দুঃখোদ্ধর্ত্তা হি যো নর/ স এব সুকৃতী লোক জ্ঞেয়ো নারায়ণাংশজঃ।' দুঃখপ্রাপ্ত মানুষের শোক-তাপ হরণ করতে পারে যে-মানব, সে-ই পরম সুকৃতির অধিকারী এবং নারায়ণের অংশে তাঁর জন্ম। দেবদূতেরা প্রায় সমস্বরে বললেন, কাউকেই আমরা এমনভাবে অপরের দুঃখে পীড়িত হতে দেখিনি। আপনি নিঃস্বার্থ ও মহান। একসময় কামে মুগ্ধ ছিলেন, আর আজ শোকবিহ্বল।

এই দুর্যোগপূর্ণ স্থানে এবং শারীরিক ও মানসিক আঘাতে ভূপাতিত প্রাণীদের ত্যাগ করে মহীরথ যেতে চাইছেন না। এদিকে তাঁর নিশ্চল অবস্থানের সময় যত বাড়ছে, ততই নরক থেকে উত্থিত ক্রন্দনরোল যেন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে। মহীরথ অবাক এবং বিস্মিত। বিষ্ণুদূতেরা এই ক্রমবিলীয়মান অবস্থা কেন হচ্ছে অনুধাবন করে, রাজাকে সবিনয়ে বললেন, আপনি বৈশাখ মাসে যথাবিধি প্রাতঃস্নান এবং ধর্মপালন করেছিলেন। ফলে, পরিত্রাতাসদৃশ আপনার দেবপাবনস্পর্শে এই নরকবাসীরা সামান্য সময়ের জন্যে হলেও সুখী হয়েছে। আদতে, আপনার পুণ্যস্পর্শ সহসা লাভ করেছে বলে ওদের আর্তস্বর ও ক্রন্দন প্রশমিত হচ্ছে। 'নামাপি পুণ্যশীলানাং শ্রুতং সৌখ্যায় কীর্তিতম্।/ জায়তে তদ্বহঃস্পর্শ-বায়ু-স্পর্শসুখাবহ॥'

এক বিনীত দেবদূত বললেন, মহারাজ, এবার আমাদের যাত্রা করতেই হবে। কেননা, আপনার পুণ্যকর্মের বায়ুস্পর্শে নরকবাসীদের কষ্ট অতিদ্রুত লাঘব হয়ে আসছে। এই পরিস্থিতি যমালয় ও বৈকুণ্ঠধাম বিরোধী।

মহীরথ অশান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? এরা যদি আমার প্রভাবে শাস্তি থেকে মুক্তি পায়, তা হলে বিঘ্ন উপস্থিত হবে কেন?

বিষ্ণুদূতটি মধুর স্বরে বললেন, মহারাজ, কর্মফল অনুযায়ী এই শাস্তি এদের প্রাপ্য ছিল। যেমন প্রাপ্য ছিল আপনারও। কিন্তু পুণ্যার্জনের দ্বারা আপনি নরকবাস থেকে মুক্তি পেয়েছেন। অপকর্ম অনুযায়ী এখানে শাস্তি পূর্বনির্ধারিত। আপনি বৃথাই কষ্টভোগ করছেন।

ক্ষণকাল চিন্তা করে মহীরথ জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে উপায়? তারপর নিজেই উত্তর দিলেন, হে ঈশ্বরের দূতবৃন্দ, আমি আমার একদিনের পুণ্যফল নরকবাসীদের দান করলাম। আশা করি, এই দান তোমরা প্রত্যাখ্যান করবে না। এই দানের প্রভাবে কি এরা আমার সঙ্গে সুরলোকে যাত্রা করতে পারে না? আমার প্রার্থনা দয়া করে বিবেচনা করো।

এমন ঔদার্যময় প্রস্তাবের মুখোমুখি দেবদূতেরা কখনও হননি। আর বিচারের অবকাশ নেই। তাঁরা বললেন, আপনার দয়া দেখে আমরা মুগ্ধ, বাক্যহারা। আপনার প্রত্যাশাকে মিথ্যা বা অনুপযুক্ত বলার কোনও স্থান নেই। রাজা, প্রকৃত অর্থেই আপনি দয়াপরবশ, আপনি দয়ানিধি। আপনি দয়াসদৃশ সখা। আপনার আকাঙ্ক্ষা আমরা পূর্ণ করব।

স্বর্গের দিকে এগিয়ে চলল রাজা মহীরথ এবং তাঁর পুণ্যস্পর্শে ধন্য ও শুদ্ধ নরকবাসীদের পুষ্পপত্রচন্দনে শোভিত রথ।

কাহিনি সূত্র: পদ্মপুরাণ। পাতাল খণ্ড। ৬০-৬১তম অধ্যায়

শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী

উপন্যাস

বালিকা জানে না

সমরেশ মজুমদার





এত অল্প পরিসরে দুর্গা কখনও থাকেনি। প্রথম-প্রথম মনে হত আড়াইটে কাঠের বাক্সর মধ্যে রয়েছে। প্রথম-প্রথম মনে হত দেওয়ালগুলো যেন বুকে চেপে বসেছে। বিয়ের পরপর এখানে আসা সম্ভব হয়নি। স্বামী তিনমাস পর পর তখন দেশে যেত। বিয়ের পর দেড় বছর কেটে গেলে সে ভিসা পেল। কিন্তু তদ্দিনে পেটে বাচ্চা এসে গিয়েছে।

তবু কী আনন্দ! স্বামী থাকছে না, তাকে থাকতে হচ্ছে ভাসুরের পরিবারে, কোনও মেয়ের ভাল লাগার কথা নয়, দুর্গারও ভাল লাগেনি। তাই স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে যাওয়ার আনন্দে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পেটে যে এসেছে। অনেকেই বলেছিল, ছ'মাসের বাচ্চাকে পেটে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বিমানে বসে থাকলে বিপদ হতে পারে। তার চেয়ে বাচ্চা পৃথিবীতে আসুক, তারপর গেলে মা এবং শিশু দু'জনেরই উপকার হবে।

আকাশে কম সময় থাকতে হবে না। মাঝখানে একটা বিমানবন্দরে কয়েক ঘন্টা জিরোলেও আকাশে থাকতে হবে অন্তত ষোলো ঘন্টা! কিন্তু স্বামীর কথা শুনে দুর্গা খুশি হয়েছিল। মায়ের পেট থেকে পৃথিবীতে আসার সময় যদি ওদেশের হাসপাতালের ডাক্তার নার্সরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে ভবিষ্যৎটা সোনায় বাঁধানো হয়ে যাবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশের নাগরিক হয়ে জন্মানোর সুযোগ কেউ ছাড়ে! তবু রাজ্যের ভয় এসে মন জুড়ে বসল। মুখ একটু গম্ভীর হলেও সঙ্গে শাশুড়িকে নিয়ে যেতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হল স্বামী।

দু'ঘন্টা গাড়িতে চড়ে এয়ারপোর্টে, সেখান থেকে প্লেনে দুবাই, দুবাই থেকে নিউ ইয়র্ক। যেতে যেতে একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল দুর্গা। মায়ের হাত আঁকড়ে ধরে বসেছিল সে। বমি হয়েছিল দু'বার। শেষ পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের এই বাড়ির চারতলার ঘরে যখন পৌঁছাল, তখন শরীরে যেন শক্তি নেই। অথচ তার চেয়ে আঠারো বছরের বড় মা ছিল অনেক শক্ত।

কিন্তু এ কেমন জায়গায় সে এল দুর্গা ভেবে পাচ্ছিল না। ছোট ছোট দুটো ঘর, সঙ্গে একচিলতে রান্নার জায়গা, স্নান, প্রাকৃতিক কর্ম একটি ছোট জায়গায়, এতদিন এমন জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত ছিল না তারা। ঘরের ভেতর একটা ঠান্ডা আবহাওয়া আছে বটে কিন্তু কোনও জানলা খোলা নেই। দেশে থাকতে কখনও এমন ছোট বদ্ধ ঘরে তারা থাকেনি। তাদের বাড়িতে যে গোরুর থাকার জায়গা আছে, সেটি এই সব ঘরের কয়েক গুণ বড়। এই ঘরে দাঁড়িয়ে বাইরের পৃথিবীটা দেখা যাচ্ছে না। যদিও তার স্বামী এখানে নিয়ে এসে বলেছিল শহরের খুব দামি জায়গায় এই বাড়ি। কিছুদিন থাকলে ঠিক অভ্যেস হয়ে যাবে। সেকথাই বারবার মা তাকে বুঝিয়েছে।

মা বলেছিল, "আমরা তো কখনও বিদেশের শহরে এসে থাকার সুযোগ পাইনি। এখানকার মানুষ বোধহয় এভাবেই কষ্ট করে থাকে। অবশ্য আমরা যাকে কষ্ট ভাবছি, তা এরা কষ্ট বলে মনে করে না। কিন্তু জামাইকে বল জানলাটা খুলে দিতে। জানলা খুললে ঘরে বাতাস আসবে।"

স্বামী বাজার করে নিয়ে এলে দুর্গা কথাটা বলল। শুনে হো হো করে হেসে উঠল স্বামী। বলল, "পাগল! ওই জানলা খুলে দিলে গরম হাওয়া ঢুকবে, তখন ঘরে আমরা কেউ থাকতে পারব না। আবার শীতকালে জানলা খুললে ঠান্ডায় জমে যাব," বলে শাশুড়ির দিকে তাকিয়েছিল জামাই, "আপনার কি ঘরে থাকতে খুব অসুবিধে হচ্ছে?"

শাশুড়ি মাথা নেড়েছিল, "না। শ্বাস নিতে কোনও কষ্ট হচ্ছে না। আসলে দেশের বাড়িতে আমরা তো খোলামেলা থাকতেই অভ্যস্ত।"

মাথা নাড়ল জামাই, "দেখুন মা, আমি তো বিশাল আয় করি না যে বড় বাড়িতে থাকব! বড় বাড়ির ভাড়া কত, তা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। আশীর্বাদ করুন, যাতে এর চেয়ে একটু বড় বাড়িতে শিগগির যেতে পারি। হ্যাঁ, জানলাটা কেউ খুলবেন না। এখন তো গরমকাল, বাইরে পোকামাকড় উড়ছে, সব ভেতরে চলে আসবে। তাছাড়া ভেতরে তো গরমও নেই আবার ঠান্ডাও বেশি নেই। মেশিন সেইভাবে চালানো আছে।"

মেনে নিতে হয়েছিল কথাগুলো, অবশ্য না-মানলে তো উপায় ছিল না।

মানুষ অভ্যেসের দাস। দুর্গা এবং তার মা ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে গেল ওই খাঁচার মতো ঘরে বাস করতে। স্বামী সকালে জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে যায় তার কাজে। দুপুরের খাবার বাইরে খেয়ে নেয়। রাত ন'টার পরে পরের দিনের বাজার হাতে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে।

এর মধ্যে দু'বার স্ত্রী এবং শাশুড়িকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী বেরিয়েছিল। ট্যাক্সিতে চেপে নিয়ে গিয়েছিল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার মহিলা। ভয়ে ভয়ে প্রথম দিন সামনে গিয়ে দুর্গা দেখেছিল তিনি হেসে বাংলায় কথা বললেন। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী নাম ভাই। ওখানেই বসো।"

"দুর্গা।"

"তাই?" মধ্যবয়সি মহিলা চোখ বড় করলেন, "তোমার তো ভগবানের নামে নাম। কবে এসেছ আমেরিকায়?"

পেছনে দাঁড়ানো স্বামী বলল, "এক সপ্তাহ হয়ে গেল।"

"ওকে বলতে দিন। তুমি তো কথা বলতে পারো, পারো না?" ডাক্তার হাসলেন।

সসঙ্কোচে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলেছিল দুর্গা।

"এই প্রথমবার, না আগেও বাচ্চা হয়েছে?"

মুখ নিচু করে দুর্গা জবাব দিয়েছিল, "প্রথম।"

"হুঁ," ডাক্তার স্বামীকে বাইরে পাঠিয়ে তাকে পরীক্ষা করে বললেন, "এই সময় এতটা পথ এলে কেন?"

"আগেই আসার কথা ছিল কিন্তু ভিসা পাওয়া যাচ্ছিল না..."

"অ। বাচ্চাটা এখানে না-জন্মালে তো সে আমেরিকান নাগরিক হতে পারবে না। কী জ্বালা! তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, ঠিকঠাক উত্তর দেবে।"

সেই প্রথমবার। দ্বিতীয়বার ওই মহিলা-ডাক্তারের কাছে দুর্গা গিয়েছিল যখন, তার নড়াচড়া করতে বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল।

তৃতীয়বারে গিয়ে ফিরে এসেছিল সাত পাউন্ড ওজনের মেয়েকে মায়ের কোলে দিয়ে। ভেবেছিল মেয়ে দেখলে স্বামীর মুখে রাজ্যের মেঘ এসে জমবে। অবাক হয়ে সে দেখেছিল, মেঘ নয়, স্বামীর মুখ বেশ খুশিতে মাখামাখি।

মেয়ের জন্য বাবার আগ্রহ দেখে দুর্গার মা খুব অবাক হয়েছিলেন। তাঁর বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়িতে কারও সন্তান জন্মানোর আগে রীতিমতো প্রার্থনা শুরু হয়ে যেত, যেন সন্তান ছেলে হয়! এই দুর্গা যখন জন্মেছিল, তখন শ্বশুর-শাশুড়ি দূরের কথা, ওর বাবার মুখে কয়েকদিন ধরে অন্ধকার মাখামাখি ছিল। অথচ জামাইয়ের হাবভাব কথাবার্তায় একটুও অসুখের ছায়া ছিল না।

খেলনা পেলে শিশুরা যেমন তাই নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ে, তেমনই শিশু জন্মালে মা-মাসির পৃথিবীটা সে দখল করে নেয়। তখন ছোট ছোট ঘর, জানলা যে বন্ধ, আড়াই কামরার মধ্যেই যে পৃথিবীটা আটকে আছে, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কারও ছিল না। ওরা যে ঢাকা শহর থেকে অনেক আকাশ ডিঙিয়ে উড়ে এসেছে নিউ ইয়র্কে, এই কথাটাও যেন শিশু ভুলিয়ে দিয়েছিল।

তারপর সেই দিনটা এল যেদিন সকালে যেন হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় জামাই শাশুড়ির কাছে তার পাসপোর্টটা দেখতে চাইল। মা-মেয়ে অবাক। মায়ের যে একটা পাসপোর্ট আছে একথা তার মনেই ছিল না। তিনি ব্যাগ থেকে খুঁজে বের করে এনে জামাইয়ের হাতে দিলেন। পাতা উলটে একটু তাকাতেই জামাইয়ের চোখ বড় হয়ে গেল। মুখ থেকে শব্দ ছিটকে বের হল, "সর্বনাশ!"

মা-মেয়ে অবাক হয়ে তাকাল। জামাই বলল, "আর একটু হলে সর্বনাশ হয়ে যেত মা। নির্ঘাত জেলে যেতে হত আপনাকে।"

দু'জনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "তার মানে?"

জামাই জানাল, দেশ থেকে আসার আগে আমেরিকায় থাকার অনুমতি চেয়ে ভিসার জন্যে আবেদন করা হয়েছিল। শাশুড়িকে আঠারো মাস আমেরিকায় থাকার জন্যে ভিসা দেওয়া হয়েছিল। জামাইয়ের যেহেতু আমেরিকায় থাকার জন্যে গ্রিনকার্ড রয়েছে, তাই মেয়ের ক্ষেত্রে তিন বছরের ভিসা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যেই তাকে স্বামীর ভিসা এবং সন্তানের নাগরিকত্বের প্রমাণ দেখিয়ে গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে হবে।

সব শুনে দুর্গা বলেছিল, "গ্রিনকার্ড থাকলে কী সুবিধে?"

"পাকাপাকি থাকতে পারবে, সব রকম সুবিধে পাবে, কাজকর্ম করতে পারবে, শুধু ভোট দিতে পারবে না। যদিও সেটা এমন কোনও ব্যাপার নয়," জামাই চোখ বন্ধ করল, "সর্বনাশ হয়ে গেল।"

"কিসের সর্বনাশ?" দুর্গা অবাক হল।

"তোমার মাকে ঢাকায় ফিরে যেতে হবে যে! ভিসার সময় শেষ হয়ে গেলে এদেশে থাকা অবৈধ ব্যাপার," বিষণ্ণ হল স্বামী।

"সেকি? এখনই?" মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

"এই দ্যাখো। এখানে, এই ভিসার ছাপ যেখানে আছে, সেখানে স্পষ্ট লেখা আছে কবে ওঁর ভিসা শেষ হচ্ছে। আজ হল তিন তারিখ, দশ তারিখের মধ্যেই এদেশ ওঁকে ছেড়ে যেতে হবে। এখন এই ক'দিনের মধ্যে ওঁর প্লেনের টিকিট কনফার্ম করাতে হবে," স্বামী বেরিয়ে গেলে পৃথিবীর সব মেঘ যেন একসঙ্গে উড়ে এসে জমা হল মা-মেয়ের মুখে।

যতটা না মেয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট নাতনিকে এই আড়াই বাক্স ঘরে ফেলে রেখে দেশে ফিরে যাওয়া। সেখানে বড় বড় জানলার ঘর, বারান্দা, উঠোন, লাগোয়া বাগানে আম-কাঁঠালের গাছগুলোর পাশে বিস্তর ফুলের গাছ। ঢাকা থেকে এখানে আসার সময় সেই সব গাছগাছালির কথা খুব মনে পড়েছিল, চলে যেতে হবে শোনার পরে সবাইকে ছাপিয়ে ওই একরত্তি মেয়েটার মুখ থেকে বের হওয়া অস্ফুট শব্দ বুকে রক্ত ঝরাতে লাগল।

বিমানের আসন পাকা হয়ে যাওয়ার পর শাশুড়ি, স্ত্রী এবং ওইটুকু মেয়েকে নিয়ে স্বামী কেনাকাটা করতে চলে এল জ্যাকসন হাইটে। সেখানে প্রচুর দোকান। আর কী আশ্চর্য ব্যাপার, জ্যাকসন হাইটের ফুটপাথে নাতনিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে কানে এল বাংলা শব্দ। চমকে দুর্গা তাকাল যাদের দিকে, তারা কথা বলতে বলতে ঢুকে গেল দোকানে। দুর্গার মা কিছুক্ষণের মধ্যে সেই সব মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দাবলি শুনতে শুনতে বেশ রোমাঞ্চিত গলায় দুর্গাকে জানিয়ে দিল, ওই ভাষা শুধুমাত্র চট্টগ্রামের মানুষজন বলে থাকেন। দু'জন যুবক ইংরেজি বলতে বলতে আচমকা এমন ভাষায় কথা বলে উঠল যা শুনে জামাই শাশুড়িকে জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কোথাকার মানুষ তা কি বুঝতে পারলেন?"

দুর্গার মা বললেন, "চেনা চেনা লাগে।"

"বরিশাল," স্বামী যেন খুশি হয়েই হাসে।

শাশুড়ি মাকে নিয়ে স্বামী এয়ারপোর্টে গিয়ে ভেতরে পৌঁছে দিয়ে এল। যাওয়ার আগে নাতনিকে জড়িয়ে দিদিমা কেঁদে ভাসালেও মেয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল। স্বামী বলল, "আপনি মনখারাপ করবেন না মা, কয়েক মাসের মধ্যেই আপনাকে নাতনির কাছে ফিরিয়ে আনব।"

দুর্গাকে তার মা বলে গেল, "সাবধানে থাকিস। বাইরে একা একা কখনওই যাস না। মেয়েকে নিয়ে তোর সময় দিব্যি কেটে যাবে।"

দুর্গা কোনও কথা বলল না।

সকাল আটটায় বেরিয়ে যায় স্বামী। বলেছে, "এখানে তোমার কোনও ভয় নেই। বাড়িতে ঢোকার সদর দরজায় যে-তালা আছে তার চাবি বাইরের লোক পাবে না। আর বাড়ির ভেতরে অন্য ফ্ল্যাটের

ভাড়াটেদের কেউ যদি বদ মতলব নিয়ে এসে দরজার বেলের বোতামে চাপ দিয়ে আওয়াজ করে, তাহলে ভুলেও দরজা খুলবে না। আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে, আমি ঘরে ঢোকার আগে বেল বাজাতে যাব কেন?"

এটা আমেরিকার বড় শহর নিউ ইয়র্ক। কিন্তু ঘরের যত দরজা-জানলা বন্ধ থাকলে বাইরের শহরটার নাম নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার পড়ে না। সন্ধের মুখে রান্না করলে রাত তো বটেই, পরের গোটা দিনও দিব্যি চলে যায়। এক রাত্রে স্বামী জিজ্ঞাসা করল, "জানি একা থাকলে তোমার খারাপ লাগে, গল্পের বই এনে দেব, পড়বে?

"কী বই তা না জেনে কেমন করে বলব!" দুর্গা বলেছিল।

স্বামী কোনও কথা বলেনি। তার মুখ দেখে দুর্গার মনে হয়েছিল বেশ সমস্যায় পড়েছে।

এমনিতে মানুষটা ভাল। তার সঙ্গে কখনওই খারাপ ব্যবহার করে না। মাঝে মাঝেই ভাল খাবার নিয়ে আসে। বাচ্চাকে ঠিক সময়ে ডাক্তার দেখানোর কথা ভুলে যায় না। কিন্তু সকাল আটটায় কাজে বেরিয়ে গিয়ে রাত ন'টা-দশটার আগে কিছুতেই বাড়ি ফিরে আসে না। গোটা দিন আর পুরো সন্ধে হয় মেয়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হয়, নয়তো একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠা মেয়ের দৌরাত্ম্য সামলাতে হিমসিম খেতে হয়। যতক্ষণ জেগে থাকবে ততক্ষণ তাকে না-জ্বালালে ওর যেন শান্তি নেই।

একদিন রাত্রে হাসি-হাসি মুখে একটা বাক্স নিয়ে এল স্বামী। বলল, "এটা থাকলে আর তোমার একা একা মনে হবে না।"

কথা না-বলে কৌতূহলী চোখে তাকিয়েছিল দুর্গা।

"এটা একটা টেপ রেকর্ডার। ইলেকট্রিকে তো চলে, আবার ব্যাটারিতেও চলে। এগুলো হল ক্যাসেট। গানের ক্যাসেট। এর ভেতরে কলকাতার সব বিখ্যাত শিল্পীদের গাওয়া গান আছে। এখন পাঁচজনের পাঁচটা ক্যাসেট এনে দিলাম। যত ইচ্ছে বাজিয়ে শুনবে। আর মনে হবে না একা আছ," স্বামী বলল।

"এগুলো কোথায় পেলে?" সে মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল।

"তোমার জন্যে আনিয়েছি কলকাতা থেকে, কী, খুশি তো?"

হাসি-হাসি মুখে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলতেই খাটে ঘুমিয়ে থাকা মেয়ের ঘুম ভেঙে গেল। চিৎকার করে হাত-পা ছুড়তে লাগল সে।

দুর্গা বলল, "ও চেঁচালে আর শুনব কী করে।"

এটা কোন মাস দূরের কথা, কোন ঋতু তাও বোঝা যায় না। দুর্গা একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা, এখানে কেউ জানলা খুলে আকাশ দ্যাখে না?"

"আকাশ!" অবাক হয়ে তাকিয়েছিল স্বামী। তারপর সামলে নিয়ে বলেছিল, "কেন দেখবে না? বাইরে গেলেই তো দেখা যায়।"

"যারা বাইরে যায় না, আমার মতো।"

"অ। দ্যাখো এখানে যখন গরম পড়ে, তখন এসি না-চালিয়ে ঘরে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। তাই জানলা বন্ধ রাখতে হয় নইলে এসি মেশিন কাজ করবে না। আবার গরম শেষ হওয়ার আগেই ঠান্ডা এসে যায়। তখন বাইরে এমন ভয়ংকর ঠান্ডা পড়ে যে, জানলা খুললে দু'দিনেই হাসপাতালে যেতে হবে," স্বামী বলেছিল, "শীত বাড়লে যে এখানে রাস্তাঘাটে, বাড়ির ছাদে কী ভয়ংকর বরফ পড়ে, তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না। ঠিক আছে, সেরকম একটা দিনে তোমাকে বাইরে নিয়ে যাব। নিজের চোখে দেখবে।"

"তার মানে আমি কোনও দিন আকাশ দেখতে পাব না?"

একটু ভেবেছিল স্বামী। তারপর বলেছিল, "আমাকে একটু সময় দাও। আমি নিউ ইয়র্ক শহরের বাইরে বাড়ির খোঁজ করছি। দামে পোষালে কিনে ফেলব। বাড়ির গায়ে এক চিলতে বাগানও আছে। তখন গরমের দিনে বিকেলবেলায় আর শীতের দিনে দুপুরে তুমি যত ইচ্ছে আকাশ দেখতে পাবে।"

একটু ভেবে নিয়ে দুর্গা জিজ্ঞাসা করেছিল, "এখানে বাঙালি মেয়ে নেই?"

"নিশ্চয়ই আছে। বাঙালিরা এখানে ব্যবসা বা কাজে এসে যখন থাকছে, তখন সবাই কি মেমসাহেব বিয়ে করতে পারে! দেশ থেকে বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসে। তবে ইন্ডিয়ার বাঙালিরা ভাল কাজকর্ম করে বলে দেশ থেকে বেশির ভাগই পরিবার নিয়ে আসে। বাংলাদেশি ছেলেদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে বেশির ভাগের একটু সময় লেগে যায় বলে ওদের স্ত্রীরা একটু দেরিতে আসে। এই যেমন আমি আমেরিকায় এসেছি একুশ বছর বয়সে, বিয়ে করলাম বত্রিশে। আর বিয়ে করেই তো সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে নিয়ে আসতে পারিনি, সময় লাগল।"

বেশ শান্ত গলায় দুর্গাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল স্বামী। আর তখনই তারস্বরে কেঁদে উঠেছিল মেয়ে। আকর্ষণ করার জন্যে যে ওই বিকট কান্না তা বুঝতে পেরে কথা থামাতে বাধ্য হয়েছিল দুর্গা।

এক রাত্রে বাড়িতে ফিরে এসে স্বামী বলেছিল, "তোমাকে কয়েকটা দিন একা থাকতে হবে। কোনও ভয় নেই। একটা ফোন তোমার কাছে রেখে যাব আমি। রোজ দু'বেলা তোমার সঙ্গে কথা বলব।"

"দু'বেলা কথা বলব মানে, তুমি এখানে থাকবে না?" অবাক হয়েছিল দুর্গা।

"মাত্র তিনটি দিনের জন্যে আমাকে যেতে হবে গো।"

"সে কী? কোথায় যাবে তুমি?"

"ভার্জিনিয়া বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে। খুব বেশি দূরে নয় কিন্তু রোজ যাওয়া আসা করা যাবে না।"

"কিন্তু আমাদের ফেলে রেখে তুমি কেন চলে যাবে?"

"উপায় নেই গো, গত আট বছর ধরে ওখানকার পুজোয় স্টল দিচ্ছি আমি। আমাকে যদিও ওরা কনসিডার করে, তবু স্টলের জন্যে ভাল ভাড়া দিতে হয়। ভাল বিক্রি শুধু হয় না, অনেক অর্ডারও পাওয়া যায়। নিজে না-গিয়ে যদি কর্মচারী পাঠাই, তাহলে বিক্রি মার খাবে। কী করব!" স্বামীকে বিব্রত দেখাল।

"সেখানে কী হবে যে তোমাকেই যেতে হবে!"

"খুব বড় দুর্গাপুজো হয়। দূর দূর থেকেও বাঙালিরা ওই পুজোয় আসে। ভাল বিক্রি হয় প্রতি বছর।"

"দুর্গাপুজো?" চোখ বড় হল দুর্গার।

"হ্যাঁ।"

"আমরাও যাব, আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে চলো।"

হতভম্ব হয়ে গেল স্বামী, "ওইটুকু বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় থাকবে তুমি? হোটেলের ভাড়া কত জানো? তাছাড়া আমি সারাদিন দোকান নিয়ে ব্যস্ত থাকব, তোমরা কী করবে?"

"দুর্গাঠাকুরের সামনে বসে থাকব।"

"ঠিক আছে, মেয়ে একটু বড় হোক। কথা দিচ্ছি সামনের বছর তোমাকে ঠিক নিয়ে যাব। তুমি একা থাকলে চিন্তা করতাম না, তোমার মেয়ের খুব অযত্ন হবে," স্বামী বোঝাচ্ছিল, "তুমি চিন্তা কোরো না। কুইন্সের দুর্গাপুজো পরের সপ্তাহে। সেই পুজোয় তোমাকে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাব।"

স্বামী হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরলে দুর্গা বুঝতে পারছিল না তার কী বলা উচিত।

অনেক মিষ্টি কথার সঙ্গে খানিকটা আদর করে দুপুরে বাড়ি ফিরে এসে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে স্বামী বেরিয়ে যাওয়ার আগে দেখিয়ে দিয়ে গেল কীভাবে টেলিফোনে অতগুলো নম্বর ডায়াল করতে হবে। নিজের ফোনের নম্বর লেখা কাগজ স্ত্রীকে দিয়ে বলল, "যত্ন করে রেখো। যখনই প্রয়োজন হবে এই নম্বরগুলো ডায়াল করলেই আমার ফোন বেজে উঠবে। তাছাড়া আমি সকাল-সন্ধ্যা তোমাকে ফোন করে খবর নেব। আরে, তুমি কাঁদছ কেন?"

"আমার খুব ভয় করছে!" আঁচলে চোখ মুছল দুর্গা।

"দ্যাখো, একটু বুঝতে চেষ্টা করো। এই আমেরিকার পূর্ব প্রান্তের বড় বড় শহরগুলোর বাঙালিরা আমাকে চেনে। কোনও অনুষ্ঠান বা পুজোর সময়ে সেই সব শহরে আমি স্টল দিলে, তারা কেনাকাটা

করতে আসে। আমি যদি না-যাই তাহলে খুব আর্থিক ক্ষতি হয়ে যাবে। বুঝতে পারছ?" তারপর গলা নরম করে বলেছিল, "মাত্র তিন রাতের তো ব্যাপার, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

স্বামী যখন বেরিয়ে গেল তখন মেয়ে গভীর ঘুমে। বাইরে থেকে টানলেই দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও ভেতরের আগলগুলো লাগিয়ে দিল দুর্গা। তারপর মাঝের ঘরের চেয়ারে বসে মুখ ঢাকল। স্বামী চলে যাচ্ছে অন্য শহরে। এই কুইন্স শহরে তার কোনও চেনাশোনা মানুষ নেই। সে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। শুধু ওই কাগজে লেখা কয়েকটা নম্বর টেলিফোনে ঘুরিয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ সে পাবে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, ঢাকায় মাঝে মাঝেই টেলিফোন খারাপ হয়ে যায়, তখন লাইন পাওয়া যায় না। সে নম্বরটা মুখস্থ করার চেষ্টা করল। তারপর টেলিফোনের ওপর লেখা নম্বরগুলো টিপতে লাগল। তার পরে কানে এল ওপাশে রিং হচ্ছে। স্বামীর গলা কানে এল, "হ্যালো! কী হল? কিছু হয়েছে?"

অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু তা না-বলে সে বলল, "না, এমনি," বলে ফোনের লাইন কেটে দিল। হঠাৎ তার খেয়াল হল। সে এখন আমেরিকায় আছে। ঢাকা শহরে টেলিফোনের লাইন মাঝে মাঝেই খারাপ হয়ে যায় বটে কিন্তু নিউ ইয়র্ক উন্নত শহর বলে এখানে সেরকম হওয়ার কথা নয়। হয়তো এখানে টেলিফোনের লাইন সব সময় চালু থাকে।

মেয়ে ঘুমোচ্ছে। টেবিলের ওপর রাখা অ্যালার্ম ঘড়ি বলছে এখন সময় বিকেল পৌনে চারটে। আজ রাত্রে স্বামী এই ঘরে ফিরবে না। ভাবতেই বুকের ভেতরটায় কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। ঢাকা শহরের বাড়িতেও সে কখনও একা থাকেনি। ওখানে বাড়িভরতি লোক। আর এখানে— মেয়ের দিকে তাকাল দুর্গা। একেবারে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে বেচারা। এই মেয়ে এখন তার সঙ্গী। হাঁটা দূরের কথা, হামাগুড়ি পর্যন্ত দিতে পারে না। কিন্তু চিৎকার করে কাঁদতে পারে।

বড় শ্বাস বেরিয়ে এল বুক নিংড়ে। দুর্গা টেপ রেকর্ডার টেনে নিল। তার এক মাসির বাড়িতে অবিকল এইরকম একটা টেপ রেকর্ডার মেশিন আছে। ক্যাসেটগুলো থেকে না-বেছে একটা নিয়ে রেকর্ডারের পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে সে বোতাম টিপল। কয়েক সেকেন্ড পরে ভরাট গলায় গান বাজল, 'ও আমার দেশের মাটি...'

গান শোনামাত্র বহু আকাশ পেরিয়ে আসা বাংলাদেশের মাটির কথা মনে চলে এল। একটা কষ্ট-মেশানো সুখ তিরতির করে বুকের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল। একটার পর একটা গান যেন স্রোতের মতো দুর্গাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল, হঠাৎ মেয়ের প্রচণ্ড চিৎকার কানে যেতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। যেন কেউ তাকে আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে ফেলল। কোলে তুলে অনেক দোল দোলানোর পর মেয়ে আচমকা কান্না থামিয়ে এপাশ ওপাশে তাকিয়ে স্থির হল। বোঝা যাচ্ছিল, যেদিক থেকে টেপ রেকর্ডারের গান ভেসে আসছে সেদিকে তার কান খাড়া হয়ে আছে।

তারপর থেকে ব্যাপারটা মজার হয়ে গেল। যখনই মেয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে কেঁদে ওঠে। তখনই টেপ রেকর্ডার চালু করে গান বাজিয়ে দিলে সে সুইচ টিপে আলো জ্বালার মতো একেবারে স্থির হয়ে যায়। মাঝে মাঝে কিছু বলার চেষ্টা করে, কিন্তু কান্নাকাটি বন্ধ হয়ে গেছে বলা যায়।

রাত্রে স্বামী ফোন করলে দুর্গা বলল, "জানো, একটা মজার ব্যাপার হয়েছে?"

"কী? কেউ ফোন করেছিল? কই, কাউকে তো আমি নম্বর দিয়ে আসিনি।"

"না, না। আমি গান বাজালেই তোমার মেয়ে চোখ ঘুরিয়ে দ্যাখে, আর চুপচাপ গান শোনে! একটুও কাঁদে না।" দুর্গা বলেছিল।

"বাঃ। তোমার তো ভালই হল," স্বামী খুশি হয়ে বলেছিল।

"হ্যাঁ। দ্যাখো, এই মেয়ে বড় হলে খুব ভাল গান গাইবে," দুর্গা বলেছিল।

আমেরিকায় আসার পর এই প্রথম রাত, যখন স্বামী পাশে নেই, ওই পুচকে নিয়ে শুতে হচ্ছে। খানিক আগে টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছিল সে। মেয়েকে দুধ খাওয়াতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু নাইট ল্যাম্প জ্বালিয়ে শুয়ে পড়েও দুর্গার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। একথা ঠিক দরজার পর দরজা ভেঙে বাইরের লোকের পক্ষে এই ঘরে ঢোকা অসম্ভব ব্যাপার, তবু ঘুম আসছে না। এখন গরম নেই নিউ ইয়র্কে, উলটে হালকা ঠান্ডা পড়ছে সকাল-সন্ধ্যায়। ঘর গরম করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে স্বামী। কিন্তু মাঝরাতে যদি তার কিছু হয়ে যায়। দুর্গার এক কাকিমা রাতে ঘুমের মধ্যেই হার্ট ফেল করেছিলেন। ব্যাপারটা ভোরের আগে কেউ জানতে পারেনি। এখানে যদি মাঝরাতে সে আচমকা মরে যায়, তাহলে তো বহু দূরের শহরে থাকা স্বামী সেকথা জানতেও পারবে না। সে মরে বিছানায় পড়ে আছে আর মেয়ের ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চিৎকার করে কাঁদছে, দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল দুর্গা। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। মেয়ে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে। কিন্তু তীব্র অস্বস্তি হচ্ছিল তার। মুখ ঘুরিয়ে টেবিলের ওপর রাখা টেপ রেকর্ডারটা দেখতে পেয়ে সে দ্রুত বিছানা থেকে নেমে এল।

যন্ত্রটার পেট খুলে শেষ হয়ে যাওয়া ক্যাসেট বের করে নতুন ক্যাসেট ঢুকিয়ে দিয়ে বোতাম টিপতেই যেন স্বপ্নের গলায় গান বেজে উঠল, 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা, সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে...'

গানের কথা এবং সুর কানের ভেতর দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করা মাত্র সব উদ্বেগ, সব অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে গেল দুর্গা। বিছানায় ফিরে গিয়ে গানের উৎসমুখের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে মনে হল, আহ! কী শান্তি। পাশে ঘুমিয়ে থাকা কন্যার ওই গানের শব্দে ঘুম ভাঙেনি। আওয়াজটা যথেষ্ট কমিয়ে দিয়েছিল সে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান বেজে যাচ্ছে একের পর এক। ভারতের এই বাঙালি শিল্পীর গান বাংলাদেশের মানুষের মনের সব উদ্বেগ একটু একটু করে কমিয়ে দিল। দুর্গা ভুলে গেল এখন এই রাত্রে সে একা ছিল রাজ্যের ভয় এবং উদ্বেগ নিয়ে। তার দু'চোখ জুড়ে কখন যে ঘুম নেমে এল, তা সে নিজেই জানে না। ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে সে যেন ঘুম-ঘুম চাঁদকে দেখতে পেল।

স্বামী ফিরে এল ঠিক সময়ে। যে-পুজোয় পসরা নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে তার ভাল ব্যবসা হয়েছে বলে মন প্রফুল্ল ছিল। সামনের শুক্র-শনি-রবিবার নিউ ইয়র্ক শহরের পুজোতে তার দোকান সামলাবে কর্মচারীরা। তাকে অবশ্য দু'বেলা যেতে হবে, থাকতে হবে অনেকক্ষণ। পরিচিত খদ্দেররা তাকে না-দেখতে পেলে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারেন। তবু তারই ফাঁকে সময় বের করে সে স্ত্রী-কন্যাকে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল।

রবিবারের বিকেল থেকে দর্শকদের ভিড় কমে যায়। সোমবারের সকালের অফিসে ঠিক সময়ে পৌঁছনোর জন্যে রবিবারের সন্ধের পরেই বিছানায় চলে যেতে চায় তারা। তাই রবিবার সকালে নবমী পুজো শেষ করে দুপুর নাগাদ দশমীর পুজো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন উদ্যোক্তারা। পুজো শেষ হয়ে গেলে ঠাকুর দেখার আগ্রহ কমে যায় দর্শকদের। তাই সন্ধের পর ভিড় একেবারেই হালকা। তখন পুজো উপলক্ষে সাজানো দোকানগুলো তুলে নেওয়ার আয়োজন শুরু হয়।

রবিবারের সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে স্বামী বলল, "তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। ঠাকুর দেখতে যাব।"

নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না দুর্গা। তার সমস্ত অভিমান স্বামীর কথা শুনে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। অনেকদিন পরে সে যতটা সম্ভব সুন্দরভাবে সেজে বলল, "তুমি যদি মেয়েকে কোলে নাও, তাহলে ভাল হয়।"

"কেন?" অবাক হয়েছিল স্বামী।

"ওকে কোলে নিলে আমার—", বাকিটা বলতে গিয়ে সঙ্কোচে থেমে গেল দুর্গা। তারপর বলল, "ঠিক আছে।"

কিন্তু মেয়েকে কোলে নিয়ে বেরোল স্বামী। ডাক্তার দেখানো আর হাসপাতালে যাওয়া ছাড়া এই বাড়িতে আসার পর বাইরে বেরনোর সুযোগ হয়নি দুর্গার। আজ হালকা শরীরে বাইরে পা দিয়েই সে শুনতে

পেল স্বামী কাউকে বলছে, “আসেন ভাই, আমরা রেডি।”

দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দর গাড়ির দিকে এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিয়ে একটি লোক বলল, “আসেন ভাভি।”

গাড়িতে উঠতে উঠতে দুর্গার মনে হল কেউ তাকে এই প্রথম ভাভি বলে সম্বোধন করল। ঢাকায় তার পরিচিত মুসলমান পরিবারের মানুষজন তাকে ঘরের মেয়ে হিসেবেই ভাবে। নাম ধরে ডাকে। ভাভি বলে ডাকছে এমন অভিজ্ঞতা তার কখনও সেখানে হয়নি। অবশ্য বিবাহিতা হিন্দু মহিলাকে ভাভি বলে ডাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

স্বামী গাড়িতে উঠে বসার পর তার কোলের দিকে তাকিয়ে দুর্গা দেখল মেয়ে ড্যাবডেবিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ি চলতে শুরু করতেই মেয়ের চোখের পাতা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। দুর্গা রাস্তার দিকে মুখ ঘোরাল। এখন বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামলেও রাস্তায় এত আলো যে রাত বলে মনেই হয় না।

দু'পাশে বিশাল বিশাল বাড়ি। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যাও প্রচুর। পাশে বসে স্বামী বলল, “এখন যা গাড়ি দেখছ, দিনের বেলায়, বিশেষ করে কাজের দিনে এর দশগুণের বেশি গাড়ি রাস্তায় দেখা যায়। কত রকমের গাড়ি যা তুমি কখনও দ্যাখোনি।”

মুগ্ধ হয়ে দু'পাশের বাড়ি, রাস্তা দেখতে দেখতে দুর্গার মনে হল এখানে বোধহয় বিকেল শেষ হওয়ার আগেই সবাই যে যার বাড়িতে ঢুকে যায়। তাই রাস্তা এত ফাঁকা।

কিন্তু তবু তার ভাল লাগছিল এইভাবে রাস্তা দেখতে। মনে হচ্ছিল বহুদিন পরে যেন খোলা আকাশের নীচে এসে বুক ভরে বাতাস নিতে পারছে।

একটা বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেলে স্বামী বলল, “নেমে এসো।”

নীচে নেমে চারপাশে তাকিয়ে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল, “এখানে কোথায় পুজো হচ্ছে?”

স্বামী ড্রাইভারকে কোথায় গাড়ি রাখতে হবে সেই নির্দেশ দিয়ে বলল, “চলো।”

মেয়েকে কোলে নিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে লিফটে উঠতে হল। লিফট তাদের ওপরে তোলার পরে স্বামী যে-ঘরের দরজা ঠেলে তাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল, সেটি একটি বিশাল হলঘর। খুব নিচু স্বরে ভেসে আসছে ঢাকের বোল, ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ।

চোখ ঘুরিয়ে কোনও ঢাকিকে দেখতে না-পেয়ে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল। স্বামী হেসে বলল, “ঢাকি নয়, ক্যাসেটে ঢাকের বাজনা বাজানো হচ্ছে। চলো।”

বাঁদিকে ঘুরতেই প্রতিমা দেখতে পেল দুর্গা। খুব বড় নয়, কিন্তু বেশ সুন্দর দুর্গাঠাকুরের প্রতিমা। পাশে তাঁর ছেলে-মেয়েরাও আছেন। দু'জন পুরোহিত এখন গোছগাছ করছেন। জনাদশেক মানুষ ঠাকুরের সামনে রাখা চেয়ারে বসে আছেন।

দুর্গা দু'হাত বুকের ওপর জড়ো করে ঈষৎ নিচু হয়ে প্রতিমাকে প্রণাম করল। এই সময় একটি গলা ভেসে এল, “আরে, এসো এসো। ইনি নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রী। বেশ বেশ। ওই চেয়ারে বসো।”

আর একজন বলল, “সব দোকান তো তুলে নিয়ে গিয়েছে। তোমার তো এবার বেশ ভাল ব্যবসা হয়েছে?”

“আপনাদের আশীর্বাদ ছিল, তাই।”

“অ! সামনের বছর কিন্তু স্টল ভাড়া একটু বাড়াব।”

“সর্বনাশ,” স্বামী চমকে উঠল।

“মোটেই নয়। কলকাতায় যে জিনিসের দাম দশ টাকা তা এখানে এনে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করছ। উপায় নেই বলে লোক তোমার দোকানের জিনিস কিনছে। তাই স্টলের ভাড়া বাড়লে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।”

কিছুক্ষণ বসে থেকে স্বামী বলল, “চলো, অন্য পুজোয় যাই।”

তাদের উঠে দাঁড়াতে দেখে একজন বলল, “সেকী! এর মধ্যেই চললে? একটু দাঁড়িয়ে গেলে ভোগ নিয়ে যেতে পারবে। কিছু ভোগ এখনও রয়েছে।”

এই সময়ে মেয়ে এত জোরে কেঁদে উঠল যে তাকে থামাতে দূরে সরে যেতে বাধ্য হল স্বামী। প্রতিমার সামনে আরও খানিকটা সময় থাকার ইচ্ছে থাকলেও স্বামীকে অনুসরণ করতে বাধ্য হল দুর্গা। মেয়ের কান্না কিছুতেই থামছে না দেখে বিরক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল স্বামী। দুর্গার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, “ওকে খাইয়ে এনেছিলে? এভাবে অসভ্যের মতো তো আগে কাঁদতে শুনিনি।”

দুর্গা ভেবে পেল না সভ্য কান্না আর অসভ্য কান্নার পার্থক্য কী! সে হাত বাড়িয়ে মেয়েকে কোলে নিতেই সুইচ টিপে আলো নেভানোর মতো তার কান্না থেমে গেল। স্বামী বলল, “দেখলে ব্যাপারটা! মাঝে মাঝে আমাকে ওর পছন্দ হয় না।”

দুর্গা মেয়েকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, “তুমি কতদিন দাড়ি কামাওনি, তাই হয়তো...”

“দূর! ও তো চোখ খোলার পর থেকেই দেখছে আমি হপ্তায় একদিন দাড়ি কামাই। আমার মনে হচ্ছে, কোনও কারণে ওর পেট কামড়াচ্ছিল। চলো, বাড়ি ফিরে যাই।”

মেয়ের মুখের দিকে তাকাল দুর্গা। এখন একেবারে শান্ত। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশ দেখছে। মুখে যন্ত্রণার কোনও চিহ্ন নেই। তাহলে স্বামীর কী দেখে মনে হল ওর পেট কামড়াচ্ছে। কথাটা বলল দুর্গা।

একটু বিরক্ত হল স্বামী। তারপর মাথা নেড়ে বলল, “ঠিক আছে। যদি আর কান্নাকাটি না-করে তাহলে একটা ঠাকুর দেখে আসতে পারি। চলো।”

কিন্তু কপালে সুখ সইল না। খানিকটা যেতেই হঠাৎ মেয়ে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল। এবার হাত-পা ছুড়ে। চেষ্টা করেও তাকে থামাতে পারল না দুর্গা। স্বামী একটু ঝুঁকে ড্রাইভারকে বলল, “আর যেতে হবে না। যেখান থেকে আমাদের নিয়ে এসেছিলেন, সেখানেই ফিরে চলুন।”

মেয়েকে থামাতে ব্যস্ত দুর্গা আপত্তি করার সুযোগ পাচ্ছিল না। কিন্তু ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে কিছু দূর ফিরে যেতেই ওইটুকুনি মেয়ে কান্না গিলে ফেলল। খুব খারাপ লাগছিল দুর্গার। মনে হচ্ছিল এই মেয়ে যেন ইচ্ছে করেই তার সঙ্গে শত্রুতা করল। গাড়ি থেকে নামার সময় দিব্যি ঠোঁট টিপে তাকিয়ে থাকল।

যতদিন মেয়ে চিত হয়ে শুয়ে থাকত অথবা পাশ ফিরত, ততদিন অবস্থা ছিল সহনশীল। দরজা-জানলা বন্ধ ঘরে রান্না সেরে দিব্যি সময় কেটে যেত গান বাজিয়ে। দুর্গা লক্ষ করেছিল যখনই মেয়েদের গলায় গান শুনত, তখনই শুয়ে শুয়ে হাত নেড়ে যেত তার মেয়ে। বোঝা যেত মেয়েদের গলার গান ওর বেশি ভাল লাগছে। মেয়ের চোখ বন্ধ হয়ে গেলে টেপ রেকর্ডারের শব্দ সে কমিয়ে দিত। গান শুনতে শুনতে এক অপূর্ব জগতে চলে যেত দুর্গা।

কিন্তু এই সুখ আর কতদিন! মেয়ে একটু একটু করে উঠে বসতে শিখল, অবোধ্য শব্দাবলি মুখ থেকে বেরতে লাগল, তখনও তাকে সামলানো যাচ্ছিল। কিন্তু যেই সে কোনও কিছু আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়াতে পারল, দুর্গার শান্তির জীবন আর শান্তির রইল না।

হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের চিৎকারের ধরন বদলাল। তার দিকে মনোযোগ না-দিলেই যে-বিকট কান্না ওর গলা দিয়ে বের হয়, তা দুর্গা আগে কখনও শোনেনি। তখন সব কাজ ফেলে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে। কথা বলা বন্ধ করলেই সে চিৎকার শুরু করবে। যত বড় হচ্ছিল, তত টেপ রেকর্ডারের সঙ্গে তার শত্রুতা বাড়তে লাগল। গান বাজালেই মেশিনটাকে নাগালের মধ্যে না-পেলে হাত-পা ছুড়ে এমন স্বরে চিৎকার শুরু করত যে, ওইটুকু শিশুর গলা থেকে কেমন করে বের হয় ভাবতেও পারত না দুর্গা।

তখন রাগ হত। ইচ্ছে করত মেয়ের গলা টিপে ধরে কান্না বন্ধ করতে। দেশের বাড়িতে সে কয়েকজন মেয়ের শৈশব দেখেছে। তারা সবাই ছিল খুব শান্ত। বরং ওদের বয়সের ছেলেরা ছিল অনেক দুরন্ত। এই মেয়েকে দুরন্ত বললে খুব কম বলা হবে। এই আড়াই ঘরের চৌহদ্দিতে মেয়েকে সামলাতে সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল সে। বাথরুমে যাওয়ার সময় মেয়ের পায়ে শাড়ির ছেঁড়া পাড় বেঁধে টেবিলের

পায়ের সঙ্গে আটকে যেতে হত। ওই ছেঁড়া পাড়ের পরিধিতে ঘুরে ঘুরে যত ইচ্ছে চিৎকার করুক, সে না শোনার ভান করে থাকবে। কিন্তু আজ দুপুরে স্নান করতে বাথরুমে গিয়ে সবে শাওয়ারটা খুলেছে সে, তখনই আওয়াজটা হল। কিছু একটা ওপর থেকে পড়ে চুরমার হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না।

ভেজা শরীরে তোয়ালে জড়িয়ে দুর্গা বাথরুমের খোলা দরজা দিয়ে ছুটে ঘরে ঢুকে হাঁ হয়ে গেল। টেপ রেকর্ডারটা টেবিলের ওপর থেকে নিচে পড়ে তিনটে টুকরো হয়ে গেছে। তার একটা টুকরো একেবারে চৌচির। সেই ধ্বংসস্তূপের পাশে বাবু হয়ে বসে গালে একটা হাত রেখে গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে আছে মেয়ে।

"এটা কেমন করে করলি?" চিৎকারটা ছিটকে বের হল গলা থেকে।

ততক্ষণে মোড়াটা চোখে পড়ে গেছে। ওই মোড়া টেবিলের পাশে রাখা ছিল না। তবে পায়ে বাঁধা পাড়ের বৃত্তের কাছাকাছি থাকায় ওইটুকু মেয়ে ওটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে বড় টেবিলের গায়ে। তারপর মোড়ার ওপর কোনও মতে উঠে হাত বাড়িয়ে টেপ রেকর্ডার ধরতে পেরে যা করার তাই করেছে।

ব্যাপারটা বোঝামাত্র নিজেকে সামলাতে পারল না দুর্গা। মেয়েকে তুলে খাটের ওপর নিয়ে গিয়ে উপুড় করে শুইয়ে দুমদুম করে কিল মারতে লাগল ওর পিঠে, নিতম্বে। ব্যথা কতটা লাগল তা বোঝা গেল না কিন্তু গলার জোর বেড়ে গেল সেই আওয়াজে মাথায় যেন রক্ত উঠে গেল। কিছুক্ষণ মারধর করে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল দুর্গা। তার মনে হচ্ছিল এই মেয়ে তাকে শেষ করে ফেলবে।

দুর্গাকে সশব্দে কাঁদতে দেখে নিজের কান্না থামিয়ে চোখ স্থির করে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়ে। হয়তো ওর এইটুকু জীবনে প্রথমবার মাকে কাঁদতে শুনল। মেয়ে চুপ করে গেছে দেখে দুর্গা তার ঝাপসা আড়চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে উঠল। এর মধ্যে মেয়ে চিত শুয়ে দুটো পা শূন্যে ছুড়ছে, একই সঙ্গে ওর দুটো হাত দুলছে। জলে-ভেজা চোখে কান্নার বদলে এখন হাসিতে মাখামাখি হয়ে গিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, মায়ের কান্না দেখে ওইটুকু শিশু খুব খুশি হয়েছে। দুর্গা অবাক হয়ে মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ মুছে উঠে এল। ভাঙা টেপ রেকর্ডারের টুকরোগুলো মেঝে থেকে তুলে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করল ঘরটা। মোড়াটাকে তুলে সরিয়ে দিল এমন দূরত্বে, যেখানে মেয়ে কোনওভাবেই পৌঁছতে না-পারে।

খুব মন খারাপ হয়ে গেল দুর্গার। যে-যন্ত্র থেকে গান বেরিয়ে এসে তার জগৎটাকে অন্য রকম করে দিত, এই মেয়ে সেটা চুরমার করে দিল!

অথচ অবাক কাণ্ড, ওর বাবা যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ জেগে থাকলে মেয়ের মুখে হাসি লেগেই থাকে। নানা বিচিত্র শব্দ বের করে মুখ দিয়ে যা শুনে ওর বাবা পুলকিত হয়। একদিন কথাটা বলেই ফেলেছিল স্বামীকে। পরম প্রশ্রয়ে স্বামী তাকে বোঝাতে চেয়েছিল, এইটা খুব স্বাভাবিক। সমবয়সি ছেলেমেয়েকে দেখা দূরের কথা সারাদিন তৃতীয় কোনও মানুষকে দেখতে পায় না তো, দেখা পেলে খুব খুশি হয়। রোজ রাত্রে যে বাবা বাড়িতে ফিরে আসে তা বুঝে গিয়েছে মেয়ে।

ব্যাখ্যা শুনে হেসে মেনে নিয়েছিল দুর্গা। সারাদিন কাজেকর্মে বাইরে পরিশ্রম করে ঘরে ফিরে এসে মানুষটা যদি মেয়েকে নিজের মতো ভেবে নিয়ে খুশি হয় তাহলে তাই হোক।

মেয়ে টলতে টলতে হাঁটছে, হাঁটতে হাঁটতে হুড়মুড়িয়ে পড়ছে। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু কতক্ষণ সেটা দেখা যায়! ভেঙে চৌচির হয়ে যাওয়া টেপ রেকর্ডার ফেলে দিয়ে আর-একটা নতুন যন্ত্র এনে দিয়েছে স্বামী। বলেছিল, "সাবধানে রেখো। ও একটু বড় হলে এর মর্ম বুঝতে পারবে।"

পারল কোথায়! ওর নাগালের বাইরে রেখে টেপ রেকর্ডারের গান বাজালেই চিৎকার শুরু করে দেয়। খুব জোর ধমক দিয়ে দুর্গা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "ওটার ওপর তোর এত রাগ কেন। কী ক্ষতি করে তোর?" ধমক শুনে মেয়ে শরীর দুমড়ে মুচড়ে দাঁড়ায়। মুখে অবাধ্যভাব ফুটে ওঠে।

মেয়ে যত বড় হতে লাগল, তত সে অবাধ্য হয়ে উঠল। এই আড়াইখানা ঘরে আড়াই বছরের শরীরটা আর আটকে থাকতে চাইছিল না। কিন্তু দিনের বেলায় সেটা সম্ভব না-হওয়ায় যাবতীয় রাগ সে নানাভাবে প্রকাশ করতে লাগল। মেয়ে যখন দুপুরের স্নান-খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ে, তখন যতটা সম্ভব নিচু ভলিউমে গান শুনত দুর্গা। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা' গানটা শুনলে খুশিতে মন ভরে যেত। কিন্তু গান শুনতে এতটাই মগ্ন ছিল দুর্গা যে কখন ঘুম থেকে উঠে বিছানায় দাঁড়িয়ে ঝুল ঝাড়ার লাঠিটা দিয়ে এমনভাবে টেপ রেকর্ডারকে খুঁচিয়েছে মেয়ে, যে সেটা সরে গিয়ে আলমারির পেছনে হুড়মুড়িয়ে পড়ল। সেই শব্দে গানের আবেশ চট করে মিলিয়ে যেতেই চোখ খুলল দুর্গা। দেখল ঝুল ঝাড়ার লাঠি ফেলে দিয়ে মেয়ে আবার দ্রুত বিছানায় শুয়ে পড়ল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মেয়ের শরীর উপুড় করে পাগলের মতো ওর পশ্চাৎদেশে চড় মারতে লাগল সে। চিৎকার করে কাঁদছে মেয়ে। সেই চিৎকার শুনে দুর্গার রাগ বেড়ে গেল আরও। মেয়ের হাত বেঁধে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে দরজা আটকে দিল বাইরে থেকে।

কী আশ্চর্য! রাত ন'টার বদলে বাবা সেদিন এল সন্ধে সাড়ে ছ'টায়। মেয়ের কান্না থেমে গিয়েছিল অনেক আগে। স্বামীকে সমস্ত ব্যাপারটা জানাতে তার মুখ থেকে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল। এগিয়ে গিয়ে বাথরুমের দরজা খুলে বাবা দেখল, মেয়ে হাত বাঁধা অবস্থায় মেঝের ওপর পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তার ঘুম ভাঙাতেই মেয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মেয়ে কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না দেখে তাকে বাঁধনমুক্ত করে ঘরে নিয়ে এসে জামা পালটে কোলে তুলে নিয়ে বাবা বলে গেল, "ওকে একটু বাইরে থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।"

দুর্গা অবাক হয়ে শুনল, মেয়ের কান্না থেমে গিয়েছে। ওরা বেরিয়ে যেতেই সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। মেয়েকে শান্ত করতে বাবা তাকে কোলে নিয়ে বেড়াতে গেল। অথচ তার কথা কোনওদিন লোকটা ভেবেও দ্যাখেনি। মেয়ে হওয়ার আগে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে এবং হাসপাতালে যাওয়ার দরকার বলে তাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল স্বামী। তার পরে অনেক অনুরোধের পর পুজোর সময় ঠাকুর দেখতে যেতে পেরেছিল। ব্যস, ওই পর্যন্ত। অথচ বেয়াদপি করে দামি জিনিস ভাঙার জন্যে সামান্য কান্নাকাটি মেয়ে করেছে শুনেই তাকে সাজিয়েগুজিয়ে বাবা বেড়াতে নিয়ে গেল। অথচ সপ্তাহের পরে সপ্তাহ চলে গেছে, একদিনও লোকটা বলল না, চলো বেড়িয়ে আসি! সে যে এতদিনেও নিউ ইয়র্ক শহরের কিছুই দ্যাখেনি, এমনকী তার স্বামীর যে-দোকান রয়েছে, সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি তাও স্বামীর মনে আসেনি। আর আজ অন্যায় করেছে বলে সে মেয়েকে শাস্তি দিয়েছে, শুনে বাবার মনে দরদ এমন উথলে উঠল যে, মেয়েকে কোলে নিয়ে সন্ধের সময় বাইরে বেরিয়ে গেলেন তার মন ভোলাতে। অনেক চেষ্টার পর নিজের কান্না থামাতে পারল দুর্গা।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন সকালে স্বামী গম্ভীর হয়ে দুর্গাকে বলল, "সবাই বলছে এই বয়সে ওকে স্কুলে ভরতি না-করলে ওর পক্ষে আদবকায়দা শেখা অসুবিধের ব্যাপার হবে।" পরিচিত কয়েকজন বাবাকে পরামর্শ দিয়েছে একটি বিশেষ স্কুলে মেয়েকে ভরতি করতে। ওখানে এই বয়সে ভর্তি করলে একেবারে সেই কলেজে যাওয়া পর্যন্ত কোনও চিন্তা থাকবে না। স্বামী খোঁজ নিয়েছিল, শুধু মেয়েদের জন্যে স্কুল আছে কিনা, কিন্তু এই তল্লাটে সেরকম স্কুলের সন্ধান পাওয়া গেল না।

দুর্গা সব শুনে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে কী করবে?"

"যে-দেশে যা নিয়ম তাই মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।"

"কখন স্কুলে যেতে হবে?"

"সেটাই তো সমস্যা", স্বামীর গালে হাত, "সকাল ন'টায় পৌঁছে দিতে হবে। তিন ঘন্টা সেখানে থাকবে। আবার বারোটার সময় স্কুল থেকে নিয়ে আসতে হবে। আমি হয়তো এক ঘন্টা পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুলে দিয়ে আসতে পারি কিন্তু রোজ তো নিয়ে আসতে পারব না।"

"তাহলে কি মেয়ে স্কুলে ভরতি হবে না?" দুর্গাও চিন্তিত।

"কী যে বলো!" স্বামী বলল, "ওকে দিয়ে এবং নিয়ে আসার জন্যে লোক রাখতে হবে। দেখি, একটা কিছু করতেই হবে।"

কিন্তু বাড়ি ফিরে স্বামী শুকনো মুখে বলল, "কী যে করি?"

"কেন? কী হয়েছে?"

"একজনকে পেয়েছিলাম, যা ডলার চাইছে, তা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। দোকানের যে-কর্মচারী, তাকে পাঠালে ওই সময় দোকান কানা হয়ে যাবে।"

"অনেক দূরে স্কুল? হেঁটে যাওয়া যায়?" দুর্গা জিজ্ঞাসা করল।

"যায়। দশ মিনিট লাগবে হেঁটে যেতে। কেন? তুমি মেয়েকে ওর স্কুলে দেওয়া-নেওয়া করতে পারবে?"

"আমি?" হকচকিয়ে গেল দুর্গা।

"চোখ বড় হয়ে গেল কেন? সেদিন কান্নাকাটি করছিলে, আমি নাকি তোমাকে ঘরে বন্দি করে রেখেছি। আকাশ কেমন দেখতে তা নাকি ভুলেই গিয়েছ! বলোনি?"

বাধ্য হয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল দুর্গা, নিঃশব্দে।

"বেশি দূরে নয়। এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডানদিকের ফুটপাথ ধরে দশ মিনিট গেলেই স্কুলের গেট পেয়ে যাবে। দু'বার দু'টো গলিপথ পার হতে হবে এই যা। তুমি পারবে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে? তাহলে অনেক সাহায্য হয়, একগাদা খরচও করতে হয় না। তোমারও রাস্তা দেখা হয়ে যাবে," স্বামী হাসল।

"ওকে স্কুলে নিয়ে গিয়ে কী করব?" দুর্গা প্রশ্ন করল।

"ওর গলায় একটা নম্বর লেখা লকেট থাকবে। সেটা দেখে স্কুলের গেট থেকে সিস্টার ওকে ভেতরে নিয়ে যাবে। তোমার ডিউটি তখন শেষ," স্বামী হাসল।

"তারপর?"

"আবার ঠিক তিন ঘন্টা পরে স্কুলের গেটে গিয়ে দাঁড়ালে সিস্টার এক-এক করে নাম ডেকে বাচ্চাদের ফেরত দিয়ে দেবে। ওহো, বলতে ভুলে গিয়েছি, বাড়ি থেকে মেয়েকে নিয়ে বের হওয়ার সময় স্কুল থেকে দেওয়া একটা ব্যান্ড হাতে বেঁধে বের হবে। ওটা হাতে বাঁধা না-থাকলে ওরা মেয়েকে ফেরত দেবে না," কথাগুলো বুঝিয়ে বলে স্বামী জিজ্ঞাসা করল, "বলো, কী মনে হচ্ছে, পারবে?"

এক বুক বাতাস বুকে চেপে ধরে দুর্গা মাথা নাড়ল, "পারব।"

পরের দিন রবিবার। মেয়েকে কোলে নিয়ে দশ মিনিটের পথ বলে যা স্বামী বলেছিল, তা পনেরো মিনিটে যাতে ঠিকঠাক পৌঁছতে পারে, তার ট্রেনিং চলল। পথ চিনিয়ে পাশাপাশি হাঁটছিল স্বামী। মেয়ে শরীর মুচড়ে বারংবার আবদার জানাচ্ছিল বাবার কোলে যাওয়ার জন্যে। অসফল হওয়ায় মেয়ে কান্না জুড়ে দেওয়ায় বাবা একটু জোরে ধমক দিতে বাধ্য হল। এমন অভিজ্ঞতা এর আগে মেয়ের হয়নি। ধমক শুনে সে চুপ করে বড় বড় চোখে বাবাকে দেখতে লাগল। দুর্গা বলল, "ঠিক হয়েছে। বেশ হয়েছে।"

স্কুলের গেটে কীভাবে রাস্তা পার হয়ে যেতে হবে, তা দেখিয়ে স্বামী বলল, "এবার তুমি একাই মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে যাও। সাবধানে যাবে।"

ততক্ষণে দুর্গা নিজের ওপর কিছুটা আস্থা পেয়েছে। যদিও মেয়ের ওজন ধীরে ধীরে একটু বেশি বলে মনে হচ্ছিল। এখন ঠান্ডা নেই, আবার গরমও তেমন পড়েনি। হালকা নীল আকাশ, ঝকঝকে বাড়িগুলো দেখতে দেখতে হাঁটতে কোনও কষ্টকেই তার কষ্ট বলে মনে হচ্ছিল না। বহুদিন পরে সে ঝলমলে পথে হাঁটতে পারছে। হঠাৎ কানে স্বামীর গলার স্বর পৌঁছল, "এই যে! কোথায় যাচ্ছ?"

সে হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে বাঁদিকে তাকাতেই স্বামীকে এগিয়ে আসতে দেখল। স্বামী হেসে বলল, "এই বাড়িতে আমরা থাকি।"

"ও। আমি ঠিক..." কথা খুঁজে পেল না দুর্গা।

"ভাল করে চিনে রাখো। ওই যে দেওয়ালে, ইংরেজিতে 'এ' লেখা আছে। ওটা দেখতে ভুলবে না। এবার এসো কীভাবে সদর দরজা খুলে ভেতরের দরজা খুলতে হয়, তা তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এসো..." স্বামী মেয়েকে নিজের কোলে নিল।

পাখি-পড়ানোর মতো দুর্গাকে বুঝিয়ে দিল স্বামী। মোবাইল ফোনে নিজের নাম্বারটা সামনে এনে বলল, "যদি বোঝো খুব বিপদে পড়েছ, তাহলে তুমি এই নাম্বারটা টিপলেই আমার মোবাইলের রিং শুনতে পাবে। আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। কোনও ভয় নেই।"

আমেরিকার রাস্তায় তাকে মেয়েকে নিয়ে একা হেঁটে যেতে হবে, ভাবতেই বুক টিপটিপ করছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হচ্ছিল দু'বার যাতায়াতে প্রায় একঘন্টা সময় এই খাঁচার বাইরে পৃথিবীতে সে হাঁটতে পারবে। মেয়ে এখন এঘর ওঘর দুলে দুলে হেঁটে বেড়াতে পারে কিন্তু রাস্তায় গেলে সে কিছুতেই কোল থেকে নামতে চায় না। না নামুক, তবু তো ওকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার সুবাদেই সে আকাশের নীচে হাঁটতে পারবে!

প্রথম দিন স্বামী সঙ্গে থাকায় কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। লাইন দিয়ে মায়েরা বাচ্চাদের টিচারের হাতে তুলে দিচ্ছিল। সেই সময় বাচ্চারা তারস্বরে চেঁচিয়ে চোখের জল ফেলছিল। টিচার হেসে বললেন, "প্রথম প্রথম ক'দিন ওরা কান্নাকাটি করলেও পরে আর কাঁদবে না। তখন স্কুলে না-নিয়ে এলে আরও বেশি কাঁদবে।"

মেয়ে তো কোল থেকে নামতেই চাইছিল না। অন্য বাচ্চাদের কান্না শুনে তার গলা থেকেও কান্না ছিটকে বের হল। ওকে বেশ জোর করে ভেতরে নিয়ে গেলে অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে মেয়ের গলা মিশে গেল।

স্বামী বলল, "চিন্তা কোরো না, দু'চারদিন এলেই দেখবে ও আর কাঁদবে না।"

স্কুলের গায়েই একটা পার্ক রয়েছে। স্বামী তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বলল, "এখানে বোসো। ওর ছুটি হলে স্কুলের গেটে নাম ডাকবে, তখন এগিয়ে গিয়ে ওকে নিয়ে যে-রাস্তায় এসেছিলে, সেই রাস্তায় বাড়ি ফিরে যেও।"

"তুমি থাকবে না?" কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল দুর্গা।

চোখ বন্ধ করে একটু ভেবে নিয়ে স্বামী বলল, "ঠিক আছে। আজ তো প্রথম দিন, আমি বারোটার সময় আসব। তুমি এখানেই থেকো, আমি ডেকে নেব।"

দুর্গা পার্কের বেঞ্চে বসলে স্বামী চলে যেতে যেতেও ফিরে এসে বলল, "তুমি তো এই প্রথম একা ঘরের বাইরে থাকবে, একটু সাবধানে থাকবে।"

"মানে?" দুর্গা অবাক হল।

"অচেনা মানুষ কিছু বললে তার কথা বিশ্বাস করবে না। কেউ গায়ে পড়ে কথা বলতে এলে তাকে এড়িয়ে যাবে। সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, অচেনা মানুষকে এড়িয়ে চলবে। বুঝতে পেরেছ?" স্বামী সতর্ক করল।

চুপচাপ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল দুর্গা।

দুর্গা স্বামীকে পার্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে চলে যেতে দেখল, যেতে যেতে স্বামী একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। আচমকা সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল দুর্গার। এটা ঢাকা নয়, নিউ ইয়র্ক। এখানে এই পার্ক থেকে বেরিয়ে যদি সে স্বামীকে আর দেখতে না পায়? স্বামী যদি তাকে ফেলে অন্য কোথাও চলে যায়! তার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ফোনের বোতামটা টিপে স্বামীর সঙ্গে কথা বলে। ঠিক তখনই কানে শব্দ বাজল, "হ্যালো!"

মুখ ফেরাতেই দেখতে পেল তারই বয়সি একটি মেয়ে হাতে বেতের ব্যাগ নিয়ে বেঞ্চে এসে বসল। হকচকিয়ে গেলেও সে হাসি ফিরিয়ে

দিল। মেয়েটি কাট-কাট সুন্দরী নয় কিন্তু গোলাপি গায়ের রং একটা চটক এনেছে। চোখ টানা নয় তবে নাকের গড়ন বেশ ভাল। মাথার চুল খুব ঘন নয় কিন্তু ঈষৎ কোঁকড়া।

মেয়েটি ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার মেয়েকে কি এখানে ভরতি করেছ?"

কেউ ধীরে ধীরে ইংরেজি বললে বুঝতে অসুবিধে হয় না দুর্গার। এই মেয়েটি যা জিজ্ঞাসা করল, তা অনায়াসে বুঝতে পারল কিন্তু তার জবাব দিতে গিয়ে ইংরেজি শব্দগুলোও ঠিকঠাক সাজিয়ে উচ্চারণ করতে না-পেরে সে দ্রুত মাথা নাড়ল, যার অর্থ— হ্যাঁ, করেছি। তারপর হাসল, হেসে বলল, "ইয়েস।"

মেয়েটি মাথা দোলাল, "তুমি কি কাছাকাছি থাকো?"

মাথা নাড়ল দুর্গা, "হ্যাঁ।"

মেয়েটি তার ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে আবার হাসল। বইটি একটু তুলে বলল, "খুব ইন্টারেস্টিং ক্রাইম থ্রিলার," তারপর বইয়ের মাঝামাঝি জায়গা থেকে পড়া শুরু করল। দুর্গার মনে হল তার কাছে যদি কোনও গল্পের বই থাকত, তাহলে এখানে নিয়ে এলে সময়টা দিব্যি কেটে যেত। মিনিট পাঁচেক পরে মেয়েটি বই বন্ধ করে পাশে রেখে ব্যাগ থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে প্যাকেটটা দুর্গার দিকে এগিয়ে ধরল। দুর্গা মাথা নেড়ে না বললে সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেট আর লাইটার ব্যাগে ঢুকিয়ে মেয়েটি আবার বই তুলে নিল।

স্বামী সিগারেট খায় না। বিয়ের আগে আত্মীয়দের কাউকে সিগারেট খেতে দেখেছে দুর্গা। তীব্র কটু গন্ধ নাকে আসত বলে সে দূরে সরে যেত। কিন্তু পাশে বসে বই পড়তে পড়তে এই যে মেয়েটি ধূমপান করছে, তার পোড়া সিগারেট থেকে তেমন কোনও দুর্গন্ধ বেরচ্ছে না।

দুর্গা মুখ ঘুরিয়ে পার্কটাকে দেখছিল। তার মতো অনেক মা বিভিন্ন বেঞ্চে বসে সময় কাটাচ্ছে। এই সময় একজন মহিলা ওদের সামনে এসে একটা করে কার্ড হাতে ধরিয়ে হেসে চলে গেল। দুর্গা কার্ডটার দিকে তাকাল। একটি সংস্থা বাচ্চাদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া এবং স্কুল থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সানন্দে নিতে চায়। এই কাজের জন্যে খুব সামান্য সম্মান-দক্ষিণা সংস্থাটিকে দিলেই হবে।

দুর্গা লক্ষ করল বই পড়া সাময়িক বন্ধ রেখে পাশে বসা মহিলা কাগজটি মন দিয়ে পড়ে তার ব্যাগে রেখে দিল। দুর্গার প্রথমে মনে হল এই কাগজটা মেয়ের বাবাকে দেখালে কেমন হয়। রোজ সকালে মেয়েকে নিয়ে যাওয়া-আসার ঝকমারি থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু তার পরেই সে মাথা নাড়ল। অসম্ভব। পয়সার বিনিময়ে ওরা কাজটা হয়তো ভালভাবে করে দেবে কিন্তু তার কী হবে? তাকে তো দরজা-জানলা বন্ধ ঘরে এতকাল যেমন বসে থাকত, তেমনই বসে থাকতে হবে। দ্রুত কাগজটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল দুর্গা।

দ্বিতীয় দিন থেকে আর কোনও অস্বস্তি থাকল না দুর্গার। রাস্তাটা ওর চেনা হয়ে গেল। প্রথম সপ্তাহে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছতে হিমসিম খেতে হয়েছিল। ধীরে ধীরে অন্য বাচ্চাদের শান্ত হতে দেখে মেয়ে চুপ করে গেল। শুধু তাই নয়, সকালে ওকে স্কুলে যাওয়ার জন্যে তৈরি করার সময় থেকেই তার মুখে হাসি ছড়িয়েছিল। স্কুলের গেটে গিয়ে মায়ের কোল থেকে নেমে টলমল পায়ে ভেতরের দিকে যখন এগিয়ে গেল, তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দুর্গা। এখন তিন ঘন্টা সে শান্তিতে কাটাবে।

তিন ঘন্টা সময় মানে আর একশো আশি মিনিট হয়ে রইল না। সাত-আটজন মা, যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নিউ ইয়র্কে স্বামীর সংসার করতে এসেছে, তাদের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। কেউ ভাল ইংরেজি বলেন, কেউ কেউ ভাঙা ভাঙা, আবার কেউ সঙ্কোচে ইয়েস, নো-এর বাইরে মুখ থেকে কিছু বের করতে কুণ্ঠাবোধ করে, কিন্তু হাসি হাসি মুখ নিয়ে বসে থাকে।

দুর্গা কখনও ইংরেজি মাধ্যমে পড়েনি। ঢাকার যে-কলেজে পড়েছিল, তা ছিল একান্তভাবে মেয়েদেরই এবং কেউ অবাঙালি নয়। ইংরেজিতে কেউ প্রশ্ন লিখলে সে স্বচ্ছন্দে জবাবটা ইংরেজিতেই লিখতে পারে অবশ্য সেটা যদি খুব জটিল না-হয়। কিন্তু বলার সময় তাকে অতি দ্রুত ইংরেজি শব্দ হাতড়াতে হয় এবং বিশ্বাসযোগ্য শব্দ না-পাওয়ায় হোঁচট খেতে হয় বলে, অর্ধেক বলার পর হেসে থেমে যাওয়ার একটা কায়দা সে রপ্ত করে নিয়েছে। যেসব মায়েরা গল্প করতে একত্রিত হয়, তাদের মধ্যে শুধু বয়স্ক মহিলাই নেই, অবিবাহিতা দু'জন মা-ও আছে। এরা সকালটা মেয়ের জন্যে দেয়, চাকরি করতে যায় দুপুর দুটোয়। বাচ্চা তখন থাকে পাড়ার এক মহিলার আস্তানায়। তিনি ওই রকম শিশুদের দেখাশোনা করেন সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত। সেই সময়ের মধ্যে বাচ্চার বাবা কাজ সেরে বাড়ি যাওয়ার পথে বাচ্চাকে নিয়ে যায়। সেই মায়েরা বেশ খুশি খুশি গলায় বলে, "মাত্র একশো ডলার মাসে দিয়ে একটা বড় ঝামেলা থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি, না-হলে যে কী হত।"

ওদের কথা হয় ইংরেজিতে। কেউ এসেছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কেউ আমেরিকার অন্য প্রান্ত থেকে। একটি মেয়েকে দুর্গার বাঙালি বলে মনে হয়েছিল। খুশি খুশি মনে কথা বলতে গিয়ে জানল মেয়েটি স্পেন থেকে এসেছে। এদের পোশাক দেখে বোঝা যায় না কোন দেশ থেকে এসেছে। কিন্তু দুর্গা বাড়িতে শাড়ি পরলেও মেয়েকে নিয়ে বাইরে আসার সময় সালোয়ার কামিজ পরে আসে। তার ওই পোশাক দেখে ওদের খুব কৌতূহল। সবাই তার সম্পর্কে জানতে চায়, কোন দেশ থেকে এসেছে, সেই দেশটা কী রকম!

দিন সাতেক পরে স্বামী তাকে জিজ্ঞাসা করল, "অতক্ষণ সময় তুমি পার্কে বসে ইংরেজিতে গল্প করতে পারলে?

"একটু একটু," হেসে জবাব দিয়েছিল দুর্গা।

"একই গল্প আর কতদিন করবে! আমি ভাবছি অন্য কথা।"

"কী কথা?"

স্বামী বলল, "মেয়ের স্কুল থেকে হেঁটে গেলে পনেরো মিনিট পরেই আমার দোকান। দোকান আমি খুলি সকালে, কর্মচারী আসে পৌনে বারোটায়, থাকে রাত আটটা পর্যন্ত। সে দুপুরে দোকানে না-আসা পর্যন্ত আমি কোনও কাজে বাইরে যেতে পারি না। দোকানে কর্মচারী দুপুরে আসার আগে তুমি যদি দোকানে গিয়ে বসো তাহলে আমার খুব সুবিধে হবে।"

চোখ বিস্ফারিত হল দুর্গার। এ কী শুনছে সে!

স্বামী প্রশ্ন করল, "কী ভাবছ?"

"আমি, আমি ওখানে গিয়ে কী করব?"

"কী করতে হবে তা ওখানে যাওয়ার পরে আমি শিখিয়ে দেব।"

"আর কারা দোকানে থাকবে?"

"সকালে আমি একা থাকি, দুপুরে কর্মচারী কাজে যোগ দেয়," স্বামী বলল, "আমি যতক্ষণ দোকানে থাকব, ততক্ষণ কাস্টমার এলে কী করতে হবে বুঝিয়ে দেব।"

"আমি পারব?" দুর্গার হাত ঘেমে উঠল।

"একদিনে পারবে না, দেখতে দেখতে শিখে যাবে। গ্রামে যাওনি কখনও?"

"কেন যাব না? আমার মামারবাড়ি তো গ্রামেই।"

"সেখানে পুকুর নেই?"

"মামারই পুকুর আছে।"

"সেই পুকুরের সিমেন্টে বাঁধানো পাড়ে মাটির কলসি রাখতে রাখতে গর্ত হয়ে যায়, যায় না? মাটির কলসি যদি সিমেন্টে গর্ত তৈরি করতে পারে, তাহলে তুমিও কাজ শিখে দোকান চালাতে পারবে। অবশ্য আমি যতক্ষণ বাইরে থাকব ততক্ষণ।" স্বামী হেসে বলেছিল।

সেদিন মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে প্রায় আরও পনেরো মিনিট হাঁটার পর বেশ জমজমাট একটা এলাকায় চলে এল দুর্গা। যেদিকে তাকাচ্ছে শুধু দোকান আর দোকান। সুন্দর সাজানো দোতলা তিনতলা বাড়ি। ঝকঝকে রাস্তা। এমন জমজমাট জায়গা আগে কখনও দ্যাখেনি দুর্গা। একটা বাড়ির পাশের দোতলায় ওঠার সিঁড়ি দিয়ে স্বামী তাকে নিয়ে এল তালাবন্ধ দরজার সামনে। বলল, "এই হল আমার দোকান। বিয়ের আগে তোমার কাকা এসে দেখে গিয়েছিল। এসো।"

তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আগে ঠাকুর প্রণাম করল স্বামী। তারপর জানলা খুলে দিলে দুর্গা দেখতে পেল নানা রকমের ইমিটেশন গয়না শোকেসগুলোয় ঝকঝক করছে। পেছন দিকের দেওয়ালের গায়ে রয়েছে অনেকগুলো কাঠের আলমারি।

স্বামী তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল কোন আলমারিতে কী কী গয়না আছে। সেই সব গয়নার দাম কম্পিউটারের নাম্বার টিপলেই ভেতরে দাঁড়িয়ে দেখতে পাওয়া যায়। কেনা দামের ওপর লাভ যোগ করে দাম ঠিক করা আছে। কাস্টমার তবু দরাদরি করলে খুব বেশি হলে একশো ডলারে দশ ডলার দাম কমিয়ে কাস্টমারকে বলা যেতে পারে, কিন্তু তার কম নয়।

প্রথম দিন স্বামী বাইরে যায়নি। তার কর্মচারী না-আসা পর্যন্ত দোকানেই ছিল। তারপর স্ত্রীকে পৌঁছে দিয়েছিল মেয়ের স্কুলে, "কাল থেকে একা যাতায়াত করতে পারবে তো?" দুর্গা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল।

এ এক অদ্ভুত উত্তেজনা। ঢাকা থেকে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে এসে জানলা-দরজা অধিকাংশ সময় বন্ধ ঘরে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটাতে হয়েছে তাকে। বাইরে বৃষ্টি হয়েছে, তুষারপাত হয়েছে কিন্তু ঘরের যন্ত্রের গরম সেটা টের পেতে দেয়নি। সন্তানবতী হওয়ার পর মুক্তি পেতে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল শরীরের প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়ে। বাইরের পৃথিবীটাকে চোখ মেলে দেখার মতো শক্তি ছিল না। মেয়ে জন্মাল। তাকে কোলে নিয়ে আবার ফিরে আসতে হয়েছিল আড়াইখানা ঘরে। তারপর বেড়াতে যাওয়া বলতে পুজোর সময় ঠাকুর দেখতে যাওয়া। ঢাকা শহরে প্রতি বছর বেশ ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হয়। ঘুরে ঘুরে সেই সব পুজো দেখেছে সে মা-মাসিদের সঙ্গে। তার সঙ্গে তুলনা করলে এখানকার পুজোকে খেলনা পুজো ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না।

মেয়েকে স্কুলের গেটে টিচারের হাতে তুলে দিয়ে যখন দুর্গা একা দোকানের পথে হাঁটছে, তখন তার মন খুশিতে ভরে গিয়েছিল। যত কম সময় হোক, তিন ঘণ্টারও কম সময়, তবু মনে হচ্ছিল এর চেয়ে আনন্দের সময় আমেরিকায় আসার পর তার ভাগ্যে আসেনি। এত ভাল অনেকদিন তার লাগেনি। দুর্গা পথটুকু চলে এসে রাস্তা পার হওয়ার আগে থমকে দাঁড়াল। বেশ দ্রুত গতিতে বাস থেকে ছোট গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। এই সময় রাস্তায় পা দিলে মৃত্যু অবধারিত। অসহায় বোধ করছিল দুর্গা।

হঠাৎ গাড়িগুলো থেমে যেতে পেছন থেকে কেউ বাংলায় বলে উঠল, "তাড়াতাড়ি রাস্তা পার না-হলে বিপদে পড়বেন।"

গলার স্বরে এমন উত্তেজনা ছিল যে দুর্গা দ্রুত হাঁটতে লাগল। রাস্তা পেরিয়ে আসা মাত্র আবার থমকে থাকা গাড়িগুলো চালু হল। একটা বড় শ্বাস নিতে না-নিতেই দুর্গা শুনতে পেল, "এক্সকিউজ় মি, ইউ আর ফ্রম? আই থিঙ্ক ইউ আর বেঙ্গলি। ইজ়ন্ট ইট?"

কথা না-বলে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে হাঁটতে শুরু করল দুর্গা। অপরিচিত গায়ে-পড়া লোকদের সঙ্গে কথা বললে বিপদে পড়তে হবে বলে স্বামী তাকে সতর্ক করে দিয়েছে। সে বাঙালি কি না তা না জেনেই লোকটা তাকে বাংলায় কেন প্রশ্ন করেছিল?

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে দুর্গা দেখল স্বামী কারও সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছে। সে কাউন্টারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেই কথা বলতে বলতে স্বামী ইশারা করে একটা প্যাকেট দেখিয়ে দিল। সেটা খুলে দুর্গা কয়েকটা স্যান্ডউইচ দেখতে পেল। কথা শেষ করে স্বামী তার কাছে এসে বলল, "ওগুলো খেয়ে নাও। ঘরে যাওয়ার আগে তো কিছু খেতে পারবে না। তা আজ একা একা এখানে আসার অভিজ্ঞতা কেমন হল?"

দুর্গা হেসে মাথা নাড়ল, "ভাল," স্বামী অন্যদিকে সরে যেতে সে লোকটির কথা বলতে গিয়েও থমকে গেল। কী দরকার। শুনলে হাজারটা প্রশ্ন করবে। এরকম লোক তো ঢাকাতেও আছে। একদম চেনে না, রাস্তায় একা হাঁটলে কাছে এসে বলে, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো!

যেন সেই লোক তাকে কোথায় দেখেছে, তা বলে দেওয়ার দায়িত্ব তার। কলেজের বান্ধবীরা এ নিয়ে খুব হাসাহাসি করত। নিজেদের মজার অভিজ্ঞতার কথা বলত। কিন্তু ওই পর্যন্ত। দু'-একজন ছাড়া কেউ সাহসী হয়ে আগন্তুককে প্রশ্রয় দিত না। এই কীভাবে প্রশ্রয় না-দিতে হয়, তা সে চমৎকার শিখে গিয়েছিল। আজ স্বামীকে বললে সেটা তাকে নতুন করে শিখতে হবে। কী দরকার!

প্রথম কয়েকদিন তাকে কিছুই করতে হয়নি। কাউন্টারের ভেতরে যে-টুলগুলো রয়েছে, তার একটিতে চুপচাপ বসে থাকতে হয়েছিল। কোনও কাস্টমার এলে স্বামী তার সঙ্গে কথা বলেছে, কী চাই জেনে পছন্দের জিনিস খদ্দেরকে দেখিয়েছে। দাম জিজ্ঞাসা করলে স্বামী কম্পিউটারের বোতাম টিপে দাম জানিয়েছে। কয়েকদিন ধরে এসব দেখে গিয়েছে দুর্গা। বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি থাকতেই স্বামী তাকে বলত, "এবার যাও। দেরি করে গেলে মেয়ে কেঁদে ভাসাবে।"

তড়িঘড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামে দুর্গা। হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে। বারোটা বাজার ঢের আগেই স্কুলের গেটে পৌঁছতে চায় সে। নিজেকে বেশ হালকা লাগে।

পরের দিন মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে হনহন করে হেঁটে এসে দোকানে ঢুকতেই স্বামী বলল, "এসো। আজ একটু সমস্যা হয়েছে।"

মুখ তুলে তাকাল দুর্গা।

স্বামী বলল, "আচ্ছা, এদিকে এসো তো।"

দুর্গা স্বামীর পাশে কম্পিউটার মেশিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে শো-কেস থেকে একটা সুন্দর বাক্স বের করে স্বামী বলল, "কেউ এটা কিনতে চাইলে তুমি কত দাম চাইবে? মেশিনে দেখে বলো।"

নার্ভাস হয়ে গেল দুর্গা। স্বামী সাহস জোগাতে বলল, "মনে করে দ্যাখো আমি তোমাকে কী করতে বলেছি?"

নাকের ডগায় ঘাম জমল। কয়েকবার ভুল করেও শেষপর্যন্ত কাজটা ঠিকঠাক করতে পারল দুর্গা। এর পরে আরও কয়েকটা জিনিসের দাম দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করলে সে একটু আড়ষ্ট হলেও বলতে পারল।

স্বামী বলল, "এই তো ভালই পারছ। শোনো, আমাকে এখনই একটু এজেন্টের কাছে যেতে হবে। ইন্ডিয়া থেকে মাল এসেছে কিন্তু একটু সমস্যা হয়েছে। না-গেলেই নয়। কাস্টমার এলে এইভাবে দাম বের করে জিনিস বিক্রি করবে। কেউ যদি দরাদরি করে তাহলে শতকরা দশভাগ সুবিধে দিতে পারো। কাস্টমার ডলার বা কার্ড দিলে তা মেশিনে এন্ট্রি করে দেখবে পেমেন্ট ওকে হচ্ছে কিনা। পারবে তো?"

পারবে কি পারবে না বুঝতে না-পারলেও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল দুর্গা।

"আমি হেল্পারকে ফোন করে দিয়েছি, ও সাড়ে এগারোটার মধ্যে আজ চলে আসবে। তেমন কোনও অসুবিধে হলে আমাকে ফোন করবে। ঠিক আছে?" স্বামী ঘড়ি দেখল। তারপর 'সাবধানে থেকো' বলে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

মাঝারি আকৃতির দোকানে দুর্গা একা। খুব ভয় করছিল তার। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল কোনও বিপদ দেখলেই স্বামীকে ফোন করে দেবে। মা বলত, বিপদে পড়লে ঠাকুরকে ডাকবি। দুর্গা চোখ বন্ধ করে 'ঠাকুর, ঠাকুর' বলত একশো আটবার। সব সময় যে তাতে কাজ হত তা নয়, কিন্তু মনে বল আসত। আর ডাকা সত্ত্বেও কেন কাজ হল না জানতে চাইলে মা বলত, "নিশ্চয়ই ডাকার মতো করে ডাকিসনি।"

আজ আধ মিনিট চোখ বন্ধ করে খুব মন দিয়ে ঠাকুরকে ডাকল সে। তারপর চোখ খুলতেই বাইরের দরজা ঠেলে একটি ছেলে দোকানে ঢুকে অবাক হয়ে তাকাল। তারপর চারপাশ দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এই দোকান কি বিক্রি হয়ে গিয়েছে?"

"আপনার কিছু দরকার?" দুর্গা প্রশ্নের কী উত্তর দেবে না বুঝে উলটে প্রশ্ন করল।

"দরকার বলেই তো এসেছি। কিন্তু, এই দোকানে কখনও মহিলাকে

তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আগে ঠাকুর প্রণাম করল স্বামী। তারপর জানলা খুলে দিলে দুর্গা দেখতে পেল নানা রকমের ইমিটেশন গয়না শোকেসগুলোয় ঝকঝক করছে। পেছন দিকের দেওয়ালের গায়ে রয়েছে অনেকগুলো কাঠের আলমারি।

স্বামী তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল কোন আলমারিতে কী কী গয়না আছে। সেই সব গয়নার দাম কম্পিউটারের নাম্বার টিপলেই ভেতরে দাঁড়িয়ে দেখতে পাওয়া যায়। কেনা দামের ওপর লাভ যোগ করে দাম ঠিক করা আছে। কাস্টমার তবু দরাদরি করলে খুব বেশি হলে একশো ডলারে দশ ডলার দাম কমিয়ে কাস্টমারকে বলা যেতে পারে, কিন্তু তার কম নয়।

প্রথম দিন স্বামী বাইরে যায়নি। তার কর্মচারী না-আসা পর্যন্ত দোকানেই ছিল। তারপর স্ত্রীকে পৌঁছে দিয়েছিল মেয়ের স্কুলে, "কাল থেকে একা যাতায়াত করতে পারবে তো?" দুর্গা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেছিল।

এ এক অদ্ভুত উত্তেজনা। ঢাকা থেকে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে এসে জানলা-দরজা অধিকাংশ সময় বন্ধ ঘরে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটাতে হয়েছে তাকে। বাইরে বৃষ্টি হয়েছে, তুষারপাত হয়েছে কিন্তু ঘরের যন্ত্রের গরম সেটা টের পেতে দেয়নি। সন্তানবতী হওয়ার পর মুক্তি পেতে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল শরীরের প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়ে। বাইরের পৃথিবীটাকে চোখ মেলে দেখার মতো শক্তি ছিল না। মেয়ে জন্মাল। তাকে কোলে নিয়ে আবার ফিরে আসতে হয়েছিল আড়াইখানা ঘরে। তারপর বেড়াতে যাওয়া বলতে পুজোর সময় ঠাকুর দেখতে যাওয়া। ঢাকা শহরে প্রতি বছর বেশ ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হয়। ঘুরে ঘুরে সেই সব পুজো দেখেছে সে মা-মাসিদের সঙ্গে। তার সঙ্গে তুলনা করলে এখানকার পুজোকে খেলনা পুজো ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না।

মেয়েকে স্কুলের গেটে টিচারের হাতে তুলে দিয়ে যখন দুর্গা একা দোকানের পথে হাঁটছে, তখন তার মন খুশিতে ভরে গিয়েছিল। যত কম সময় হোক, তিন ঘন্টারও কম সময়, তবু মনে হচ্ছিল এর চেয়ে আনন্দের সময় আমেরিকায় আসার পর তার ভাগ্যে আসেনি। এত ভাল অনেকদিন তার লাগেনি। দুর্গা পথটুকু চলে এসে রাস্তা পার হওয়ার আগে থমকে দাঁড়াল। বেশ দ্রুত গতিতে বাস থেকে ছোট গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। এই সময় রাস্তায় পা দিলে মৃত্যু অবধারিত। অসহায় বোধ করছিল দুর্গা।

হঠাৎ গাড়িগুলো থেমে যেতে পেছন থেকে কেউ বাংলায় বলে উঠল, "তাড়াতাড়ি রাস্তা পার না-হলে বিপদে পড়বেন।"

গলার স্বরে এমন উত্তেজনা ছিল যে দুর্গা দ্রুত হাঁটতে লাগল। রাস্তা পেরিয়ে আসা মাত্র আবার থমকে থাকা গাড়িগুলো চালু হল। একটা বড় শ্বাস নিতে না-নিতেই দুর্গা শুনতে পেল, "এক্সকিউজ় মি, ইউ আর ফ্রম? আই থিঙ্ক ইউ আর বেঙ্গলি। ইজ়ন্ট ইট?"

কথা না-বলে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে হাঁটতে শুরু করল দুর্গা। অপরিচিত গায়ে-পড়া লোকদের সঙ্গে কথা বললে বিপদে পড়তে হবে বলে স্বামী তাকে সতর্ক করে দিয়েছে। সে বাঙালি কি না তা না জেনেই লোকটা তাকে বাংলায় কেন প্রশ্ন করেছিল?

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে দুর্গা দেখল স্বামী কারও সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছে। সে কাউন্টারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেই কথা বলতে বলতে স্বামী ইশারা করে একটা প্যাকেট দেখিয়ে দিল। সেটা খুলে দুর্গা কয়েকটা স্যান্ডউইচ দেখতে পেল। কথা শেষ করে স্বামী তার কাছে এসে বলল, "ওগুলো খেয়ে নাও। ঘরে যাওয়ার আগে তো কিছু খেতে পারবে না। তা আজ একা একা এখানে আসার অভিজ্ঞতা কেমন হল?"

দুর্গা হেসে মাথা নাড়ল, "ভাল," স্বামী অন্যদিকে সরে যেতে সে লোকটির কথা বলতে গিয়েও থমকে গেল। কী দরকার। শুনলে হাজারটা প্রশ্ন করবে। এরকম লোক তো ঢাকাতেও আছে। একদম চেনে না, রাস্তায় একা হাঁটলে কাছে এসে বলে, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো!

যেন সেই লোক তাকে কোথায় দেখেছে, তা বলে দেওয়ার দায়িত্ব তার। কলেজের বান্ধবীরা এ নিয়ে খুব হাসাহাসি করত। নিজেদের মজার অভিজ্ঞতার কথা বলত। কিন্তু ওই পর্যন্ত। দু'-একজন ছাড়া কেউ সাহসী হয়ে আগন্তুককে প্রশ্রয় দিত না। এই কীভাবে প্রশ্রয় না-দিতে হয়, তা সে চমৎকার শিখে গিয়েছিল। আজ স্বামীকে বললে সেটা তাকে নতুন করে শিখতে হবে। কী দরকার!

প্রথম কয়েকদিন তাকে কিছুই করতে হয়নি। কাউন্টারের ভেতরে যে-টুলগুলো রয়েছে, তার একটিতে চুপচাপ বসে থাকতে হয়েছিল। কোনও কাস্টমার এলে স্বামী তার সঙ্গে কথা বলেছে, কী চাই জেনে পছন্দের জিনিস খদ্দেরকে দেখিয়েছে। দাম জিজ্ঞাসা করলে স্বামী কম্পিউটারের বোতাম টিপে দাম জানিয়েছে। কয়েকদিন ধরে এসব দেখে গিয়েছে দুর্গা। বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি থাকতেই স্বামী তাকে বলত, "এবার যাও। দেরি করে গেলে মেয়ে কেঁদে ভাসাবে।"

তড়িঘড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামে দুর্গা। হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে। বারোটা বাজার ঢের আগেই স্কুলের গেটে পৌঁছতে চায় সে। নিজেকে বেশ হালকা লাগে।

পরের দিন মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে হনহন করে হেঁটে এসে দোকানে ঢুকতেই স্বামী বলল, "এসো। আজ একটু সমস্যা হয়েছে।"

মুখ তুলে তাকাল দুর্গা।

স্বামী বলল, "আচ্ছা, এদিকে এসো তো।"

দুর্গা স্বামীর পাশে কম্পিউটার মেশিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে শো-কেস থেকে একটা সুন্দর বাক্স বের করে স্বামী বলল, "কেউ এটা কিনতে চাইলে তুমি কত দাম চাইবে? মেশিনে দেখে বলো।"

নার্ভাস হয়ে গেল দুর্গা। স্বামী সাহস জোগাতে বলল, "মনে করে দ্যাখো আমি তোমাকে কী করতে বলেছি?"

নাকের ডগায় ঘাম জমল। কয়েকবার ভুল করেও শেষপর্যন্ত কাজটা ঠিকঠাক করতে পারল দুর্গা। এর পরে আরও কয়েকটা জিনিসের দাম দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করলে সে একটু আড়ষ্ট হলেও বলতে পারল।

স্বামী বলল, "এই তো ভালই পারছ। শোনো, আমাকে এখনই একটু এজেন্টের কাছে যেতে হবে। ইন্ডিয়া থেকে মাল এসেছে কিন্তু একটু সমস্যা হয়েছে। না-গেলেই নয়। কাস্টমার এলে এইভাবে দাম বের করে জিনিস বিক্রি করবে। কেউ যদি দরাদরি করে তাহলে শতকরা দশভাগ সুবিধে দিতে পারো। কাস্টমার ডলার বা কার্ড দিলে তা মেশিনে এন্ট্রি করে দেখবে পেমেন্ট ওকে হচ্ছে কিনা। পারবে তো?"

পারবে কি পারবে না বুঝতে না-পারলেও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল দুর্গা।

"আমি হেল্পারকে ফোন করে দিয়েছি, ও সাড়ে এগারোটার মধ্যে আজ চলে আসবে। তেমন কোনও অসুবিধে হলে আমাকে ফোন করবে। ঠিক আছে?" স্বামী ঘড়ি দেখল। তারপর 'সাবধানে থেকো' বলে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

মাঝারি আকৃতির দোকানে দুর্গা একা। খুব ভয় করছিল তার। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল কোনও বিপদ দেখলেই স্বামীকে ফোন করে দেবে। মা বলত, বিপদে পড়লে ঠাকুরকে ডাকবি। দুর্গা চোখ বন্ধ করে 'ঠাকুর, ঠাকুর' বলত একশো আটবার। সব সময় যে তাতে কাজ হত তা নয়, কিন্তু মনে বল আসত। আর ডাকা সত্ত্বেও কেন কাজ হল না জানতে চাইলে মা বলত, "নিশ্চয়ই ডাকার মতো করে ডাকিসনি।"

আজ আধ মিনিট চোখ বন্ধ করে খুব মন দিয়ে ঠাকুরকে ডাকল সে। তারপর চোখ খুলতেই বাইরের দরজা ঠেলে একটি ছেলে দোকানে ঢুকে অবাক হয়ে তাকাল। তারপর চারপাশ দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এই দোকান কি বিক্রি হয়ে গিয়েছে?"

"আপনার কিছু দরকার?" দুর্গা প্রশ্নের কী উত্তর দেবে না বুঝে উলটে প্রশ্ন করল।

"দরকার বলেই তো এসেছি। কিন্তু, এই দোকানে কখনও মহিলাকে

ওই কাউন্টারের ওপাশে দেখিনি, তাই... আপনি কি নতুন চাকরি করছেন?"

প্রশ্ন শুনে প্রায় হেসে ফেলেছিল দুর্গা। সামলে নিয়ে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"ও। রায়বাবুর এই দোকানে কোনও মহিলাকে কাজ করতে দেখিনি। আপনি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন না ইন্ডিয়া থেকে?"

"ঢাকা থেকে এসেছি।"

"হ্যাঁ, এবার আপনার উচ্চারণ শুনে বোঝা গেল। রায়বাবু আসেননি?"

"একটু বেরিয়েছেন," নিচু গলায় বলল দুর্গা।

"ও," ঘড়ি দেখল ছেলেটি। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আমি ওঁর জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে চাই..."

কথা না-বলে মাথা নেড়ে সায় দিল দুর্গা।

ছেলেটি চেয়ারে বসে দুর্গার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই একটি বাচ্চাকে নিয়ে বছর তিরিশের এক মহিলা দোকানের ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে কাউন্টারের ভেতরে দাঁড়ানো দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাইয়া নাই?"

ভদ্রমহিলা কার কথা জিজ্ঞাসা করছেন বুঝতে পেরে দুর্গা মাথা নাড়ল, "না, একটু বেরিয়েছেন। কিছু লাগবে?"

"আপনারে তো আগে দেখি নাই। আমি মাঝে মাঝে এই দোকানে আসি। ভাইয়া আমাকে চেনেন," মহিলা হাসলেন।

"আমি কয়েকদিন হল দোকানে আসছি।"

"ভাইয়ার কেউ হন?"

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল দুর্গা।

"ওয়াইফ নাকি?"

হেসে ফেলল দুর্গা, "হ্যাঁ।"

"আচ্ছা। বাঃ, খুব ভাল। ভদ্রমহিলা বললেন, "আমার নাম নার্গিস। নতুন কোনও জিনিস..."

"ওই শোকেসে আছে।"

"ঠিক আছে। আমি দেখছি," নার্গিস সেই শোকেসের দিকে এগিয়ে গেলে দুর্গার মনে পড়ল ভেতরে একটা কাচের পাত্রে অনেকগুলো চকোলেট রয়েছে। তার দুটো সে বাচ্চাটিকে হাতে দিতে চাইলে মাথা নেড়ে সে আপত্তি জানাল। খানিকটা দূরে দাঁড়ানো নার্গিস বললেন, "ওর মিষ্টি খাওয়া নিষেধ। ট্রিটমেন্ট চলছে তো!"

বাচ্চাটির মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছে দেখে আদর করে কিছু বলতে চাইছিল দুর্গা তার আগেই ছেলেটি হাত নেড়ে বলল, "তুমি আমার কাছে এসো।"

নার্গিস এগিয়ে এলেন, "ওকে শেখানো হয়েছে, অপরিচিত কেউ ডাকলেই তার কাছে যাবে না। বুঝতেই পারছ, দিনকাল তো খুব খারাপ।"

কাউন্টারের সামনে এসে নার্গিস বললেন, "নাঃ, ঠিক মন স্থির করতে পারছি না। এসব জিনিস তো লাস্ট টাইম এসে দেখে গিয়েছিলাম," কথাগুলো বলে চোখ বন্ধ করে একটু ভেবে বললেন, "এর মধ্যে কি ইন্ডিয়া থেকে মাল আসবে?"

মাথা নাড়ল দুর্গা, "এসে গিয়েছে। উনি সেই ব্যাপারেই গিয়েছেন।"

"আচ্ছা! তাহলে তো খুব ভাল হল। আজ আর কিছু নেব না। দু'দিন পরে এসে নিয়ে যাব। অনেক ধন্যবাদ ভাই। আবার দেখা হবে। সাবধানে থাকবেন," কথাগুলো বলার সময় খানিকটা দূরে বসা ছেলেটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন নার্গিস।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ামাত্র ছেলেটি শব্দ করে হেসে বলল, "এই মহিলা টাইম পাস করতে এসেছিলেন। নতুন মাল এলেও না-কেনার জন্যে বাহানা বানাতেন।"

"ও।"

"ওই বাচ্চাকে নিয়ে সময় কাটাবার জন্যে এই দোকান থেকে সেই দোকানে ঘুরে বেড়াবেন। এই জ্যাকসন হাইটে তো বাঙালির অনেক দোকান আছে। বাসার লোক বাইরে গেলে এঁরা এইভাবে টাইম পাস করে বেড়ান," মাথা নাড়ল ছেলেটি।

দুর্গা কিছু বলল না। ছেলেটা নিশ্চয়ই বেকার। বেকার বলেই কাজে না-গিয়ে এখানে বসে আছে।

"ভাভি, আপনাকে এই প্রথম দেখলাম। নিউ ইয়র্কে নতুন?"

"হ্যাঁ," কী বলবে বুঝতে না পেরে শব্দটা উচ্চারণ করল দুর্গা।

"কোন জিলা?"

"মানে?"

"বাংলাদেশের কোন জিলায় থাকতেন?"

"ঢাকায়।"

"বাঃ! আমি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। বাসা অবশ্য ঢাকার বাইরে। এখানে আমার চাচার বাসা। চাচা নামকরা ডাক্তার। আমার নাম পলাশ," একটু থেমে প্রশ্ন করল, "ভাভি, আপনার নাম জানতে পারি?"

ছেলেটা সরল না মতলববাজ, তা ঠিক বুঝতে পারছিল না দুর্গা। কথা ঘোরাতে সে বলল, "আমার নাম জেনে আপনি কী করবেন?"

"ও। আপনিও ঢাকা থেকে এসেছেন, আমিও সেখান থেকে এসেছি, তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম," ঘড়ি দেখল পলাশ, "আমি একটা কাজ শেষ করে আসছি। ভাভি, ব্রেকফাস্ট করে এসেছেন তো?"

মুখে কথা না-বলে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল দুর্গা। পলাশ ধীরে ধীরে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলে হেসে ফেলল দুর্গা। বেশ মজা তো! চেনে না জানে না, ছেলেটা তাকে জিজ্ঞাসা করছে ব্রেকফাস্ট খেয়ে এসেছে কিনা। তার মনে হল, ঘরে যদি বসে থাকত তাহলে এই ছেলেটার কথাবার্তা শুনতে পেত না!

সকালের দিকে কাস্টমার সাধারণত বেশি থাকে না। আজ যারা এল, তাদের মধ্যে দু'জন পছন্দের জিনিস কিনল। খদ্দের দাম কমাতে বললে দুর্গা মেশিনে যে-দাম ফুটে উঠেছিল তা থেকে শতকরা দশভাগ কমিয়ে দিলে, কাস্টমার তা নিয়ে নিল। মেশিন থেকে রসিদ বেরিয়ে এলে জিনিসটা প্যাকেটে পুরে রসিদ সমেত খদ্দেরকে দিয়ে দাম গুনে নিল দুর্গা। সে যে স্বামীর ব্যবসায় ঠিকঠাক কাজ করতে পারছে এবং সেই কাজের জন্যে দোকানের আয় হচ্ছে, এতে খুব আনন্দ হচ্ছিল দুর্গার।

সাড়ে এগারোটার একটু পরে যে-ছেলেটি দোকানে ঢুকল, তাকে কোনও দিন দেখেনি দুর্গা, দেখার কথাও নয়। দোকানে ঢুকে বছর একুশ-বাইশের ছেলেটি চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, "আদাব। স্যার ফেরেননি?"

"আপনি কে?"

"আমি নজরুল। এই দোকানে কাজ করি।"

"ও, আচ্ছা," শব্দদুটো মুখ থেকে বের হলেও মনে ধন্দ থেকেই যাচ্ছিল। এই ছেলেই যে-স্বামীর কর্মচারী, তার প্রমাণ কী! ছেলেটার বয়স তার কাছাকাছি। হঠাৎ মনে হল, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে নিলেই তো হয়! মোবাইলের বোতাম টিপতেই ওপাশে জানান দিল। তার পরেই স্বামীর গলা কানে এল, "কী হয়েছে? কোনও সমস্যা? তুমি কোথায় এখন?"

"আমি দোকানে।"

"ও, কেন ফোন করেছ?"

"একজন এসেছে। নাম বলছে নজরুল।"

"নজরুল! হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো আমার কর্মচারী। আচ্ছা ফোনটা ওকে দাও তো!"

শোনামাত্র সামনে যন্ত্রটাকে রেখে ইশারা করল দুর্গা।

নজরুল সেটা তুলে নিয়ে কথা বলল, "কোনও সমস্যা নাই দাদা, আমি নজরুল।"

ওপাশের কোনও কথা শুনে নজরুল বলল, "কাল তো তিনটা বিক্রি হইছিল।"

তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, "আপনারে দিতে বললেন।"

দুর্গা হ্যালো বলতেই স্বামী বলল, "ঠিক আছে। তুমি স্কুলে গিয়ে



মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে চলে যাও। আর হ্যাঁ, ফোনটা করেছ বলে খুশি হয়েছি।"

"কেন?"

"যে-কোনও অচেনা লোক তোমার দোকানে এসে যদি বলে, আমি এখানে কাজ করি, তাহলে তুমি তার হাতে দোকান ছেড়ে চলে যাবে না। যাচাই করে লোকটা দু'নম্বরি নয় বুঝতে পেরে তবে যাবে। আমাকে ফোন করে যাচাই করে নিয়েছ বলে আমি খুশি হয়েছি," স্বামী বলল, "রাখছি।"

একটা কাগজে সে আজ কত ডলারের জিনিস বিক্রি করেছে, তা লিখে রাখল দুর্গা। তারপর দোকানের কর্মচারী ছেলেটিকে ইশারা করে দোকান থেকে নীচে নেমে রাস্তা পার হতেই দেখতে পেল পলাশ নামের ছেলেটাকে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। দেখেও না-দেখার ভান করে হনহনিয়ে হাঁটা শুরু করল সে। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল ছেলেটি তাকে অনুসরণ করছে। তার খুব ভয় করতে লাগল। এবার বড় রাস্তা পার হতে তাকে বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। ছেলেটি পাশে এসে দাঁড়াল, "আপনার ডিউটি শেষ হয়ে গেল?"

দুর্গা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। পোড় খাওয়া মুখ নয়, বরং সারল্যের ছাপ স্পষ্ট।

ছেলেটি আবার বলল, "আমার নাম পলাশ। আমেরিকার কাউকে চিনি না। পাঁচ বছর ধরে ট্রাই করার পর ভিসা পেয়েছিলাম। স্টুডেন্ট ভিসা। আপনি কোথায় থাকেন?"

ঠিক এই সময়ে আলোর সংকেত বদল হতেই লোকজন দ্রুত রাস্তা পেরোতে লাগল। পা বাড়িয়েও আড়চোখে দুর্গা দেখল পলাশ নামের ছেলেটি ফুটপাথেই দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা পার হওয়ার জন্যে পা বাড়ায়নি।

মনের ওপর যে-চাপ জমছিল, তা যেন চট করে নেমে গেল। হনহনিয়ে হাঁটছিল সে। আমেরিকায় এসে এই প্রথম সে স্বাধীনভাবে একা কোনও কাজ করতে পারল। এই তো স্বামী ছিল না দোকানে, না ছিল কর্মচারী, খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলে জিনিস বিক্রি করতে পেরেছে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সে দেখল পথচারী নেই বলা যায়, কিন্তু শোঁ শোঁ করে গাড়ির পর গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। এরকম ছুটন্ত গাড়ি ঢাকা শহরের কোথাও দেখা যায় না। এই ছুটন্ত সুন্দর সুন্দর গাড়ি দেখে মন ভরে গেল দুর্গার। এই রাস্তায় সে কয়েকদিন ধরে যাওয়া-আসা করছে কিন্তু রাস্তাটাকে এত ভাল কখনও লাগেনি।

মেয়েকে স্কুল থেকে ঘরে নিয়ে এসে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে হঠাৎ ভাবনাটা মাথায় আসতেই সে মেয়ের দিকে তাকাল। বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দুর্গা হাসল। তারপর নিচু গলায় গান ধরল। মেয়ের চোখ বড় হল। তারপর ধীরে ধীরে ছোট হয়ে দু'চোখ ঘুমে জড়াল। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না। যে-মেয়ে গান শুনলেই চেঁচামেচি করে, সে আজ কানে গান যাওয়ার পর উলটো আচরণ করল? গান শেষ করে দুর্গা বন্ধ জানলার সামনে ঝোলানো পরদার কাছে পৌঁছে সেটাকে সরিয়ে অনেক চেষ্টা করে শক্ত হয়ে আটকে থাকা জানলাটাকে খুলতেই হুড়মুড়িয়ে হাওয়া ঢুকল ঘরে। এই ভরদুপুরের রোদমাখা হাওয়ায় হিমের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া নেই আবার উষ্ণতাও ঘরে ছড়াচ্ছে না। এই বাড়িতে আসার পর এই প্রথম ঘরে রোদ ঢুকল খোলা জানলা দিয়ে। দুর্গা জানলার বাইরের আকাশটাকে চোখ ভরে দেখে নিয়ে নীচের দিকে তাকাল। বেশিরভাগ বাড়ির জানলা-দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কী ভাল লাগছে নিজের ঘর থেকে

বাইরের এই পৃথিবীটাকে দেখতে!

কিন্তু ওই যে সাড়ে এগারোটা বাজলেই মনে করতে হত, তার দিন ফুরিয়ে আসছে, এখনই স্কুলে ছুটতে হবে, মেয়েকে টানতে টানতে দুটো দরজা পেরিয়ে খাঁচায় ঢুকতে হত। একদম ভাল লাগত না। মেয়ে একটু-একটু করে এখন অনেক কথাই বলতে পারে। শুনতে তো ভালই লাগে কিন্তু দোকানে কাটানোর সময়টা এত অল্প যে কিছুতেই মন ভরে না। তার ওপর শনি এবং রবিবার মেয়ের স্কুল ছুটি। ওকে নিয়ে বাইরে যাওয়ার কোনও কারণ নেই, দোকানে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠেই না। এর মধ্যে মেয়ের জন্যে স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কানে এসেছে, সামনের মাসেই স্কুল মাসখানেক বন্ধ থাকবে। শোনামাত্র মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। স্কুলে ছুটি থাকা মানে এক মাস জানলা-দরজা বন্ধ ঘরে মেয়ের সঙ্গে বন্দি হয়ে বসে থাকা।

মেয়ের স্কুল মাসখানেক বন্ধ থাকবে শুনে স্বামী বলল, "খুলতে না-খুলতেই ছুটি, বেশ আছে এরা। কী করবে? ঢাকা থেকে ঘুরে আসবে মেয়েকে নিয়ে?"

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না দুর্গা। এ কী শুনছে সে!

দুর্গার ঝলমলে মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামী বলল, "আমি তো যেতে পারব না ব্যবসা বন্ধ রেখে। কিন্তু তুমি মেয়েকে নিয়ে একা যেতে পারবে?"

"পারব? ও এখন তো আর তেমন কান্নাকাটি করে না," মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল দুর্গা। স্বামী বলল, "তাহলে তো কোনও সমস্যা নেই। এক কাজ করো, আসার সময় তোমার মাকে সঙ্গে নিয়ে এসো। তাহলে পথে সুবিধে হবে। এখানেও ভাল থাকবে।"

স্বামীর কথা শুনে দুর্গার মন থেকে যাবতীয় অভিমান উধাও হয়ে গেল। ঠিক হল, মেয়ের ছুটি যেদিন হবে তার পরের দিন সন্ধেবেলার প্লেন ধরবে দুর্গারা। তারিখটা জানামাত্র টিকিট কাটা হবে।

মেয়েকে স্কুলের গেটে জমা করে দিয়ে অন্যান্য অভিভাবিকাদের কাছে খোঁজ নিল দুর্গা। শুনে সে বুঝতে পারল তারিখটা দু'-একদিনের মধ্যে স্কুল থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে। শুনে মনে আনন্দ এল। একটু ধীরেই দোকানের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল সে। পাশের রাস্তা দিয়ে তখন ছুটন্ত গাড়ির মিছিল। সেদিকে তাকাবার ইচ্ছে আজ হচ্ছিল না। ঢাকার রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে মুখ বুজে। রিকশায় কোথাও গেলে গাড়ির চেয়ে আগে পৌঁছনো যায়। দুর্গার মনে হল ঢাকার রাস্তাতেও একদিন এই নিউ ইয়র্কের গতিতেই গাড়ি চলবে।

"ভাভি, কেমন আছেন?"

প্রশ্নটা পাশ থেকে কেউ করতে সে মুখ ফিরিয়ে অবাক হল।

ছেলেটি বলল, "এইখান দিয়ে আসছিলাম, হঠাৎ আপনার দেখা পেলাম। আজ যার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছি, তার মুখ যদি রোজ দেখতে পাই!" বলে হাসল ছেলেটি, "আমার নাম ভুলে যাননি তো? আমি পলাশ।"

"ও," শব্দটা অসাড়ে বেরিয়ে এল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

"আমার তো এখানে কোনও ফ্রেন্ড নাই। টাইম কাটতেই চায় না। আপনি তো ছুটির দিন দোকানে আসেন না। তাই?" পলাশ জিজ্ঞাসা করল।

কী করে জানল ছেলেটো? সে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে হাঁটার গতি বাড়াল। পলাশ হাসল, "আপনি সেদিন আসল কথাটা বলেননি!"

ভ্রু কুঁচকে দুর্গা তাকাল।

"আপনি দোকানের কর্মচারী না। দোকানের মালিকের ওয়াইফ। আমি দোকানের যে-কর্মচারী, তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম," পলাশ হাসল।

বড় রাস্তার সামনে পৌঁছে দুর্গা দেখল তখনও গাড়ি আলোর সংকেতে যে-যার মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে দ্রুত রাস্তায় নামতেই আলোর বদল হল। পেছন থেকে পলাশ চিৎকার করে তাকে দাঁড়াতে বলা সত্ত্বেও দুর্গা দ্রুত একেবারে শেষ সময়ে রাস্তা পার হয়ে এল। আবার গাড়ির ঢেউ শুরু হয়ে গিয়েছে রাস্তায়। পলাশ রাস্তা পার না-হতে পেরে ওপারেই থেকে গিয়েছে। দুর্গা হেলতে দুলতে বাকি পথ পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে দেখল স্বামী রাগী গলায় টেলিফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছে।

কাউন্টারের ভেতরে ঢুকে ব্যাগ নামিয়ে রাখতেই স্বামীর গলা কানে এল, "সব ব্যাটা নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু চিন্তা করে না। এত দিন যার নিমক খেলি সে বাঁচল না মরল সেটা ভাবার দরকার আছে বলে মনেই করে না।"

"কী হয়েছে? কে ফোন করেছিল?"

"নজরুল। বলা নেই কওয়া নেই, ফোন করে বলছে আর এখানে চাকরি করবে না। সে নাকি এর থেকে বেশি মাইনের চাকরি পেয়েছে," স্বামীর গলায় রাগ স্পষ্ট, "আরে কারও যদি ভাল হয় তাহলে আমি আপত্তি করব কেন? সেরকম মানুষ আমি নই। তবে এতদিন যার কাছে কাজ করছিস, তাকে লোক খুঁজতে সময় দিবি তো! বেইমান, সব শালা বেইমান।"

"নজরুলকে দেখে তো ভাল ছেলে বলে মনে হত।"

"ভিজা বিড়াল। উঃ!"

"ওর জায়গায় লোক পাওয়া যাবে না?"

"লোক তো হাজার হাজার আছে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় নাকি! পকেটে কাগজ আছে যাদের, তারা তো ভাল মাইনের চাকরিতে ঢুকে যায়। ভিড় জমায় যারা, কাগজ ছাড়া যারা থাকে। যা দেব তাই নেবে। খাওয়া থাকা চলে গেলেই হল। কিন্তু তাদের মধ্যে কে চোর কে বিশ্বাসী, তা বুঝব কী করে? তিনদিন দোকানে কাজ করে আমি না-থাকলে ভাল মালপত্র এখান থেকে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে। পুলিশের কাছে গেলে বলবে পেপার ছাড়া লোক রেখেছেন কেন! উলটে বিপদে পড়তে হবে। আর যে-ঠিকানা চাকরি পাওয়ার সময় দিয়ে থাকে এরা, সেখানে খোঁজ নিতে গেলে শুনতে হবে ঘর ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে," চেয়ারে বসে পড়ল স্বামী হতাশ হয়ে।

মানুষটার মুখ দেখে দুর্গার বুঝতে অসুবিধে হল না, বেশ বড় বিপদে পড়েছে।

দুর্গা কী বলবে বুঝতে পারছিল না। এই দোকান ঠিকঠাক চললে তাদের সংসার ভালভাবে চলবে। যদি বন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে যে কী হবে তা কল্পনা করলেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়।

স্বামী মাথা নাড়ল, "আমাকে রোজ দোকানের প্রয়োজনে বাইরে যেতে হয়। না-গেলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। সরকারি অফিসে না-গেলে তারা দোকানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। সে সময় দোকান বন্ধ রেখে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। কী যে করি!"

হঠাৎ দুর্গার মুখ থেকে কথা বেরিয়ে এল, "আমি তখন দোকানে থাকব?"

মুখ তুলে তাকাল স্বামী, "তুমি?"

"আমি তো ঘরে বসেই থাকি।"

"তখন তো মেয়ে সঙ্গে থাকে। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে বসে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। কোনও কাস্টমার এলে সে কথা বলতেই দেবে না।"

স্বামীর কথা এতটাই সত্যি যে, দুর্গা প্রতিবাদ করতে পারল না।

সেদিন সন্ধের একটু পরেই ঘরে ফিরে এল স্বামী। একদিনেই ওর চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে। স্বামী বলল, "দু'জন ছেলের সঙ্গে কথা বললাম। দেখেই মনে হচ্ছিল বিশ্বাস করা যাবে না। খোঁজ নিয়ে জানলাম চুরি করেছে বলে আগের মালিক ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে। জেনেশুনে চোর রাখা সম্ভব নয়," তারপর স্বামী বলল, "একটা পথ আছে, যদি তুমি রাজি থাক!"

"কী পথ?"

"যতক্ষণ না বিশ্বাসী লোক পাচ্ছি ততক্ষণ, মানে ততদিন যদি তুমি দোকানে বেলা বারোটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত থাকো তাহলে..." কথা শেষ করল না স্বামী।

"ও মা! তখন তো মেয়ে সঙ্গে থাকবে!" চোখ বড় করল দুর্গা।

"আমি এ ব্যাপারে কথা বলেছি। আমাদের এই পাড়ার এক

ভদ্রমহিলা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বাচ্চাদের বাড়িতে রেখে দেখাশোনা করেন। দুপুরের খাবার খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন। সন্ধের সময় মা-বাবা এসে বাচ্চাকে নিয়ে যায়," স্বামী বলল, "এর জন্যে খুব বেশি চার্জ করেন না। তোমার আপত্তি না-থাকলে আমি ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে পারি।"

"মেয়ে থাকবে ওর কাছে?" অস্বস্তি হল দুর্গার।

"দ্যাখো, স্কুলে যাওয়ার প্রথম কয়েকদিন তো কেঁদে-কেটে যেতেই চাইছিল না। এখন স্কুল ছুটি থাকলে কেঁদে ভাসায়। এখানেও দু'-তিনদিনে ও অভ্যস্ত হয়ে যাবে। কী বলো, যাব কথা বলতে?" স্বামী জিজ্ঞাসা করল।

সকাল ন'টা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত মেয়েকে দেখতে পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে অস্বস্তি হলেও স্বামীকে না বলতে পারল না। স্ত্রীর আপত্তি নেই জেনে তখনই বেরিয়ে গেল স্বামী। ফিরে এল ঘন্টাখানেক পরে। মুখে হাসি।

দুর্গা জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে?"

"হয়ে গেছে। স্কুলের কাছেই ভদ্রমহিলার বাড়ি। উনি কলকাতার বাঙালি। বহু বছর আমেরিকায় আছেন। স্বামী মারা গিয়েছেন কয়েক বছর আগে। তারপর থেকে সারাদিন বাচ্চাদের নিয়ে থাকেন। চার্জও বেশি নয়," স্বামীকে খুশি খুশি দেখাচ্ছিল।

রাত্রে ঘুম আসছিল না দুর্গার। মাঝখানে মেয়ে, দু'পাশে সে এবং তার স্বামী। মরার মতো ঘুমোচ্ছে স্বামী। কাল থেকে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে দোকানে যেতে হবে না। বেলা বারোটায় মেয়ের ছুটি হলে তাকে ভদ্রমহিলার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে দোকানে গিয়ে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত থাকবে। বারোটা থেকে ছ'টা, ছ'ঘন্টার স্বাধীন জীবন। কাস্টমাররা এলে তাদের সঙ্গে নানা কথা বলার সুযোগ পাবে। আর ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে হবে না তাকে। মন খুশি হচ্ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যা বাস্তব, তা মনে আসতে মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

মেয়ের এক মাস ছুটির সময়ে তার ঢাকায় যাওয়ার কথা মেয়েকে নিয়ে। যখন সে ঢাকা থেকে নিউ ইয়র্কে এসেছিল, তখন বাচ্চা পৃথিবীতে আসেনি। তার পরে অনেকটা সময় গিয়েছে, মেয়ে পৃথিবীতে এসেছে, বড় হয়েছে, স্কুলে ভরতি হয়েছে। সেই মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় ফিরে যাওয়ার কথা তার। কতদিন পরে সেই সব প্রিয় মুখ, চেনা রাস্তাগুলো দেখতে পাওয়ার কথা। কিন্তু এই বারোটা থেকে ছ'টা দোকানের কাজ শুরু করলে কি আর ঢাকায় যাওয়া এখনই সম্ভব? এমন তো হতে পারে, মেয়ের স্কুলের ছুটি ফুরিয়ে যাবে অথচ ভাল কাজের লোক পাওয়া যাবে না, তখন তো ঢাকায় যাওয়ার কথা তাকে ভুলে যেতেই হবে।

কিন্তু ভুলে যেতে হবে বললেই কি ভোলা যায়! ঢাকা শহরটাকে দুর্গা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। মা না হয় তার নাতনিকে দেখে গিয়েছে, বাবা বা অন্যান্যরা তো ওকে দ্যাখেনি। এখন না-গেলে আবার কবে যে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে কে জানে!

পরের দিন স্বামী সকালে দোকান খোলেনি। মেয়েকে স্কুলে না-নিয়ে গিয়ে তাকে এবং তার মাকে নিয়ে একটি বাড়িতে গেল। বাড়িটি মোটামুটি বড়, বেল বাজাতেই একজন প্রবীণা দরজা খুলে মেয়েকে দেখে হেসে বললেন, "বাঃ, কী সুন্দর মেয়ে। আসুন, ভেতরে আসুন আপনারা," ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি দেখতে একটা পুতুল মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও। আজ থেকে এ তোমার বন্ধু।"

একটু কান্নাকাটি শুরু করেছিল বটে, তবে প্রবীণা বললেন, "কোনও চিন্তা করবেন না। বারোটায় ছুটি হয়ে গেলে আরও তিনজন বাচ্চা আসবে। ওরা এলে আপনাদের মেয়ে খুশি হবে। আপনারা নিশ্চিন্তে যেতে পারেন।"

অচেনা জায়গায় মেয়ের কান্না জোরালো হলেও দুর্গা দেখল স্বামী তা উপেক্ষা করে জোরে হেঁটে ওই বাড়ি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সে স্বামীকে অনুসরণ করল।

বেলা বারোটার পর দোকানে কখনও থাকেনি দুর্গা। আজ সে লক্ষ করল সারাদিন একজন দু'জন কাস্টমার আসছে, পছন্দ হলে কিনছে। তবে সেই সব কাস্টমারদের মধ্যে যারা আগেও এসেছে, তারা বেশ অবাক হয়ে দুর্গাকে দেখেছে। এই দোকানে এই সময় তারা কোনও মহিলা বিক্রেতাকে দ্যাখেনি। স্বামীর সঙ্গে যাদের ভাল চেনাজানা আছে, তারা ঔৎসুক্য প্রকাশ করলে স্বামী পরিচয় দিয়েছে। তখন কেউ কেউ এগিয়ে এসে কথা বলেছে। উৎসাহ দিয়ে বলেছে, "খুব ভাল করেছেন। কেন মিছিমিছি বাড়িতে বসে থাকবেন।"

বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে একবার দুপুরের খাওয়া আর একবার টিফিন করা হয়েছে। দুর্গা ঠিক করেছে, কাল থেকে দোকানে আসার সময় দুপুরের খাবার রান্না করে নিয়ে আসবে।

প্রথম দিন মেয়েকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে দেখল সে বেশ হাসি-হাসি মুখ করেই এগিয়ে এল। প্রৌঢ়া বললেন, "খুব ভাল মেয়ে আপনার। বন্ধুদের সঙ্গে চমৎকার মিশে গেছে। দুপুরে খেয়েদেয়ে অনেকটা ঘুমিয়েছে। কাল থেকে দুপুর বারোটা নাগাদ দিয়ে যাবেন বলেছেন, তাই তো? ওর সঙ্গীরাও ওই সময়ে আসে। ভাল হবে।"

মেয়ের মুখের শব্দ ক্রমশ অর্থবহ হচ্ছে। দুর্গা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁরে, তোর এখানে কেমন লাগল?"

মেয়ে মাথা নাড়ল, বলল, "উড।"

প্রৌঢ়া হেসে বললেন, "উড কী রে, টেল গুড।"

এবার মেয়ে বলল "গুড।"

পরিকল্পনার বদল হল। মেয়েকে স্কুলে দিয়ে দুর্গা চলে যাবে দোকানে। চাপ না-থাকলে স্বামী মেয়েকে স্কুল থেকে দুপুরে নিয়ে যাবে প্রৌঢ়ার বাড়িতে। বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় দুর্গা ওকে নিয়ে যাবে।

আজ দুপুরে মেয়েকে স্কুল থেকে প্রৌঢ়ার কাছে পৌঁছে স্বামীকে যেতে হয়েছিল ইমপোর্ট অফিসে। স্বামী বলে গিয়েছিল, "চিন্তা কোরো না, আমি বিকেল পাঁচটার মধ্যেই ফিরে আসব। আমি জানি এখন তুমি দোকান সামলাতে পারবে।"

স্বামী চলে যাওয়ার পর-পর দোকানে এসেছিল এক বৃদ্ধ দম্পতি। দুর্গা হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আসুন মা, বলুন কী দেব?"

"বাঃ, তুমি আমাকে মা বললে?" বৃদ্ধা অবাক।

"আপনি আমার মায়ের চেয়েও বয়সে বড়।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "দেশ কোথায়?"

"বাংলাদেশে, ঢাকায়।"

"আরে। তুমি তো একেবারে কলকাতার ভাষায় কথা বলো। আমি এই দোকানের কথা আগেও শুনেছি, আজই প্রথম এলাম। তুমি কি এখানে কাজ করো?"

"না। আমি দোকানে খুব অল্পদিন হল এসেছি। এই দোকান আমার স্বামীর। উনি জরুরি কাজে বাইরে গিয়েছেন।"

"ও, তাই বলো," বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করল, "কী নাম তোমার?"

"দুর্গা।"

"ও। আমরা এসেছি ভারতের পশ্চিমবাংলা থেকে। বর্ধমান বলে একটা জেলা আছে, নাম শুনেছ? সেখানেই আমাদের বাড়ি। নাম যখন তোমার দুর্গা, তখন তো তুমি হিন্দু। আমরা মুসলমান," বৃদ্ধা বললেন।

"আঃ, সেই হিন্দু আর মুসলমান। নিজেকে বাঙালি বলে ভাবতে পারো না কেন? যাক গে, যেটা কিনবে সেটা পছন্দ করো। ছেলে বলল, এখানেই শৌখিন জিনিস পাওয়া যায়," বৃদ্ধ বললেন।

পছন্দ করে দুশো বাইশ ডলারের জিনিস কিনে নিয়ে অনেক আশীর্বাদ জানিয়ে ওঁরা বেরিয়ে যেতেই দরজা ঠেলে ঢুকল পলাশ। ঢুকে একগাল হেসে বলল, "আসলাম।"

ভ্রু কুঁচকে ছেলেটিকে দেখল দুর্গা। তারপর গম্ভীর হল।

"আপনি একা? উনি নেই?" পলাশ জিজ্ঞাসা করল।

"থাকলে তো দেখতেই পেতেন," গম্ভীর গলায় বলল দুর্গা।

"আপনি তো এই সময়ে দোকানে থাকেন না!"

"আছি বলে কি আপনার অসুবিধে হচ্ছে?"

"না। অসুবিধে হবে কেন? বরং ভাল লাগছে।"

"আপনি কী কিনতে দোকানে এসেছেন?"

"আমি? কী কিনব? এখানে যা আছে তার সবই মেয়েরা ব্যবহার করে। নিউ ইয়র্কে আমার কোনও পরিচিত মেয়ে নেই যে এই সব ব্যবহার করে," মাথা নাড়ল পলাশ।

"তাহলে..."

"আমার তো এখন কোনও কাজ নেই। একা একা একদম, টাইম কাটতে চায় না। ইংরেজি আমি ভাল বলতে পারি না। তাই..."

এই সময়ে দুই মহিলাকে ঢুকতে দেখে দুর্গা তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তাঁরা যা চাইছেন তা অনুমান করে শোকেস থেকে বের করে সামনে রাখার পর বেশ মন দিয়ে দেখে যিনি অপেক্ষাকৃত কমবয়সি তিনি বললেন, "আপা, আমরা একটু দামি জিনিস উপহার হিসেবে দিতে চাই। আছে?"

"কী রকম বাজেট?" এই বাজেট শব্দটা দুর্গা স্বামীকে বলতে শুনেছিল।

"এই ধরেন একশোর আশে পাশে।"

স্বামী বলেছিল সাধারণ ক্রেতাদের চাহিদা না থাকলে পেছনের শো-কেসের তালা খুলে গিফট আইটেম বের করে দেখাবে না। মহিলাদের দেখে দুর্গার মনে হল, এঁরা সাধারণ ক্রেতাদের পর্যায়ে পড়েন না। সে ওঁদের একটু অপেক্ষা করতে বলে বিশেষ জায়গায় রাখা চাবি বের করে পেছনের শো-কেস খুলে গোটা তিনেক বাক্স বের করে এনে মহিলাদের সামনে রাখল।

মহিলারা বাক্স খুলে গিফট আইটেম ভাল করে দেখে দাম জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর নিজেদের মধ্যে কথা বলে দেড়শো ডলারের আইটেমটার জন্যে একশো ডলার দিতে চাইলেন। হেসে ফেলল দুর্গা, "না দিদি, অসম্ভব।"

"আপনি হিন্দু?" বয়স্কা জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় বাসা? কলকাতায়?"

"না, ঢাকা।"

"ও মা! আপনি ঢাকার মেয়ে হয়ে আমাদের একটুও কনসিডার করবেন না?"

"আমার ওপর অর্ডার নেই। আমি খুব কম হলে একশো চল্লিশে দিতে পারি।"

নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলে রাজি হয়ে গেলেন ওঁরা।

দাম দিয়ে রসিদ এবং প্যাকেট নিয়ে ওঁরা বেরিয়ে যাওয়ামাত্র পেছনের শোকেসের তালা বন্ধ করল দুর্গা। এই সময় কানে এল, "দেখলেন, আমি এলাম বলে ভাল বিক্রি হল।"

দুর্গা মুখ ফিরিয়ে দেখল দূরের চেয়ারে বসে পলাশ নামের সেই ছেলে কথাগুলো বলে হাসল। দুর্গা বেশ বিরক্ত হল, "আপনি এখনও এখানে বসে আছেন?"

"হ্যাঁ, মানে, এখানে বসে দেখতে খুব ভাল লাগছিল," পলাশ বলল।

"এটা কাজের জায়গা, বসে দেখার জায়গা নয়। আপনি বাংলাদেশ থেকে এত দূরে এসে কাজ না-করে সময় নষ্ট করছেন কেন?" প্রশ্ন করল দুর্গা।

পলাশ উঠে সামনে এসে দাঁড়াল, "কী করব বলুন! পেপার নেই শুনে বেশির ভাগ লোক কাজ দিতে চায় না। যারা দিতে রাজি হয়, তারা ঘন্টায় আট ডলারের জায়গায় দুই ডলার দিতে চায়। চাচা চাপ দেয় না, দেখি আর কিছুদিন," পলাশ ম্লান হাসি হাসল।

এই সময় এক বৃদ্ধ ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইমিটেশন গয়না কিনতে চাই। অবশ্য পছন্দ হলে। বাজেট বেশি নয়," তারপর পলাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাঙালি বলে মনে হচ্ছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," পলাশ মাথা নাড়ল।

"বাঃ। নিউ ইয়র্কের এই অঞ্চলে এলে ইংরেজি বলার দরকার হয় না। তা আমাকে দেখাও, মেয়েকে উপহার দিতে চাই," বৃদ্ধ হাসলেন।

পলাশ মাথা নেড়ে দুর্গার দিকে এগিয়ে আসছিল। দুর্গা বলল, "হ্যাঁ, আপনি এখন চলে যেতে পারেন," তারপর বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলল, "এক মিনিট সময় দিন, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি।"

পলাশ আর-একটু এগিয়ে এল, "আমি কি হেল্প করতে পারি?"

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে যে-কথাগুলো বেরিয়ে এল, তা যে সে বলতে পারে নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। পলাশের চোখের ওপর চোখ রেখে দুর্গা বলল, "আপনি অনেকক্ষণ আমাকে বিরক্ত করছেন। অনুগ্রহ করে আপনি দোকানের বাইরে চলে যান।"

বৃদ্ধ অবাক হয়ে পলাশের দিকে তাকালেন, "এ কী! তুমি এই দোকানের কর্মচারী নও?"

পলাশ ঢোঁক গিলল। তারপর মাথা নেড়ে 'না' বলল নিঃশব্দে।

"সে কী!" বলে দুর্গার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ, "এ যখন দোকানের কেউ নয় তাহলে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছ কেন? তুমি মেয়ে, একা দোকানে আছ, ওই সব ছোকরারা বদমতলব নিয়ে ঢুকে ক্ষতি যে করবে না তার কী ঠিক আছে!"

"উনি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন—" পুরোটা বলল না দুর্গা।

বৃদ্ধ চড়া গলায় পলাশকে জিজ্ঞাসা করলেন, "অ্যাই, তুমি কি কিছু কিনতে এসেছ?"

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে আবার না বলল পলাশ।

"তাহলে এখানে না-দাঁড়িয়ে থেকে দোকানের বাইরে চলে যাও, যাও," শেষ শব্দটা বেশ জোরে বলায় পলাশ মাথা নিচু করে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

দুর্গা দেখল বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছেন। সে বলল, "আপনাকে কী ধরনের জিনিস দেখাব যদি বলেন—"

বৃদ্ধ হাত তুলে ওকে থামতে বললেন। দুর্গা বুঝতে পারল ওঁর শারীরিক কষ্ট হচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি কাউন্টারের বাইরে বেরিয়ে এসে একটা চেয়ার বৃদ্ধের পাশে রেখে বলল, "আপনি এখানে বসুন।"

বৃদ্ধ বসলেন। তাঁর চোখ এখনও বন্ধ। দুর্গা প্রশ্ন করল, "শরীর কি খুব খারাপ লাগছে? জল খাবেন?"

হাত নেড়ে 'না' বুঝিয়ে চোখ খুললেন বৃদ্ধ। তারপর জোরে দু'বার শ্বাস নিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট কৌটো বের করে ওষুধ খেলেন। তারপর আবার জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে বললেন, "এখন ঠিক আছি। ডাক্তার বলেছেন যে-কোনও রকম উত্তেজনা এড়িয়ে চলতে হবে। সব সময় সেকথা মনে রাখতে পারি না," মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, "এখন ভাল লাগছে।"

"আপনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন।"

"না না। এখন ঠিক হয়ে গেছি। ডাক্তার নিষেধ করেছেন যেন একদম উত্তেজিত না হই। চেষ্টা করি। কিন্তু এই রকম বেয়াদপি দেখলে মাথা ঠিক থাকে না। আমার প্রেশার একটু বেশির দিকে, বুঝলে!" বৃদ্ধ হাসলেন, "এবার জলটা দাও।"

জল খেয়ে গ্লাস ফিরিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এই দোকানে একাই কাজ করো! এটা তো ভাল কথা নয়।"

হেসে ফেলল দুর্গা, "আমার স্বামী সারাক্ষণ থাকেন। আজ উনি একটা বিশেষ দরকারে বাইরে গিয়েছেন বলে আমি একা আছি।"

"তার মানে এই দোকানটা তোমাদের। তুমি কর্মচারী নও। ভাল ভাল। দ্যাখো মা, তুমি বাঙালি, তাই তোমাকে সাবধানে থাকতে বলছি। তুমি নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি, শুনেছি তারা একটু বেশি সাহসী হয়। আমি মুসলমানের ছেলে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন দত্ত পড়ে বড় হয়েছি।" মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, "থাক ওসব কথা। এবার দেখাও আমাকে।"

বৃদ্ধ উঠে কাউন্টারের সামনে গেলেন। কাউন্টারের পেছনে গিয়ে দুর্গা হেসে বলল, "আমি কিন্তু বাংলাদেশের বাঙালি।"

"ও, তাই! বাঃ। দেখাও এবার।"

শেষপর্যন্ত বৃদ্ধ যা পছন্দ করলেন, তা তাঁর বাজেটের মধ্যেই থাকছে। জিনিসটা প্যাক করতে করতে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি

কবে আমেরিকায় এসেছেন?"

"পাঁচ বছর হয়ে গেল। স্ত্রী গত হওয়ার পর মেয়ে জোর করে নিয়ে এল। দশ বছরের ভিসা দিয়েছে তবে আইন বাঁচাতে মেয়ে কয়েক মাস অন্তর কানাডায় নিয়ে যায়। সেখানে আমার ভাইপো থাকে। এই নাও," মানিব্যাগ বের করে দাম মিটিয়ে হঠাৎ অন্যরকম গলায় বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "দেশের সঙ্গে সম্পর্ক আছে?"

একটু ইতস্তত করে দুর্গা বলল, "আছে।"

"হ্যাঁ। এইটে যেন চিরকাল থাকে। আচ্ছা, আমি চলি।"

"আবার আসবেন," দুর্গা বলল।

"রোজ রোজ তো এসব কেনার প্রয়োজন পড়ে না মা।"

"কিনতে হবে কেন? মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে আসবেন।"

"বলছ? এই জ্যাকসন হাইট থেকে বেশি দূরে আমার মেয়ের বাড়ি নয়। এদিকে এলে নিশ্চয়ই আসব," বৃদ্ধ বেরিয়ে যেতে যেতে দরজার কাছে পৌঁছে থেমে গেলেন। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মায়ের নামটা তো জানা হল না!"

হেসে ফেলে নিজের নাম বলল দুর্গা। চোখ বড় হল বৃদ্ধের। তারপর দুটো হাত এক করে কপালে দু'বার ঠেকিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন।

দুর্গা চোখ বন্ধ করল। ওই মানুষটি নাম শুনে নমস্কার করে গেলেন। এই নমস্কার নেওয়ার কোনও যোগ্যতা যে তার নেই।

স্বামী ফিরে এসেছিল চারটের মধ্যে। দু'জনে একসঙ্গে খাবার খেতে খেতে দুর্গা বৃদ্ধের গল্প করছিল। স্বামী সব শুনে জিজ্ঞাসা করল, "ওঁর ঠিকানা রেখেছ?"

"ঠিকানা? না তো।"

"আহা, সেটা রাখবে তো! হাঁটাচলা করতে পারেন ভালভাবে? কী রকম বয়স?" বলেই মাথা নাড়ল স্বামী, "না। বুকের ব্যথার জন্যে ওষুধ খেয়েছেন বললে, ওঁকে দিয়ে হবে না।"

"কেন এসব বলছ?" দুর্গা অবাক হল।

"আমি ভাবছিলাম, যদি উনি একটু সুস্থ হতেন তাহলে ওঁকে বলতাম দুপুরবেলায় দোকানে এসে শুধু বসে থাকতে। কোনও কাজ করতে হবে না। তাহলেই দেখতে পরিবেশটা অন্যরকম হয়ে যেত। কিন্তু ওষুধ খেয়েছেন যখন, তখন মনে হচ্ছে হার্টের অসুখ আছে। ব্যাড লাক।" স্বামী মাথা নাড়ল।

খুব খারাপ লাগছিল। সে এত বোকা যে বৃদ্ধের ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করে লিখে রাখেনি। মানুষটার মধ্যে একজন স্নেহশীল বাবাকে অনুভব করেছিল সে। সত্যি তো, যদি বেশি দূরে না-থাকেন, যদি পথটুকু হেঁটে আসতে খুব কষ্ট না-হয় তাহলে ওঁকে দুপুরবেলায় পাওয়া গেলে খুব ভাল হয়। কিন্তু হার্টের অসুখের কথা শুনে স্বামী ওঁর সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুল এবং স্কুল থেকে দু'-দুটো রাস্তা পার হয়ে এই দোকানে পৌঁছনোর পথটুকু ছাড়া কখনও একা হেঁটে কোথাও যায়নি দুর্গা। আর এই যাতায়াতের পথে যাদের সে দেখেছে তাদের ক'জন বাঙালি তাতে তার বিস্তর সন্দেহ আছে। আমেরিকান সাদা বা কালো মানুষ ছাড়াও কত দেশের মানুষ যে এখানকার রাস্তায় হাঁটে, তা কে জানে! তারা যে কেউ বাংলা ভাষা বোঝে না, তাতে কোনও সন্দেহ নেই দুর্গার। একথা ঠিক, এই জ্যাকসন হাইটের দোকানগুলোর মালিক-কর্মচারীরা বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া অথবা পাকিস্তানের মানুষ। এরা সবাই কমবেশি ভাল হিন্দি বলতে পারে। এই কয়েকদিন স্বামীর সঙ্গে দোকানে থাকতে থাকতে কিছু কিছু হিন্দি শব্দ দুর্গা শিখতে পেরেছে। কিন্তু ওই বিদ্যে নিয়ে রাস্তায় হাঁটা অচেনা মানুষের সঙ্গে তো কথা বলা সম্ভব নয়। ওই বৃদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করবে সে কাকে? আর জিজ্ঞাসা করলে নাম ঠিকানা না-জানলে কারও পক্ষে তো উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

আজ একটু তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বের হল সে। বেরনোর সময় স্বামী জিজ্ঞাসা করে নিল বাড়ি ফেরার পথে কী কী বাজার থেকে নিয়ে যাবে। যা মনে পড়ল, তা বলে দুর্গা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হেসে ফেলল। স্বামী মানুষটার মন বেশ ভাল। এই যে তাকে দোকানে নিয়ে আসছে আর ভাবছে কষ্ট দিচ্ছে, ভেবে মন খারাপ করছে। মানুষটা ভাল না-হলে তা করত না। লোকটা একবারও বুঝতে পারছে না, দোকানে আসার সুযোগ পেয়ে কষ্ট দূরের কথা সে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। এই মুক্তি পাওয়ার কথা সে প্রচার করতে চায় না।

দূর থেকে ছেলেটাকে দেখতে পেয়ে দ্রুত পা চালাল দুর্গা। কিন্তু সেই বড় রাস্তার কাছে পৌঁছবার আগেই ট্রাফিক সিগনাল বদলে গেল। বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে সময় গুনছিল দুর্গা, কানে কথা বাজল, "আপনি কি জানেন?"

পাশ ফিরে তাকিয়ে দুর্গা দেখল ছেলেটা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুর্গা বিরক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, "কী চাই?"

"আমি পলাশ," ছেলেটা অবাক হয়ে বলল।

"কী চাই?" আবার প্রশ্ন করল দুর্গা।

"আপনার দোকান থেকে বেরিয়ে উনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হাঁটতে পারছিলেন না," পলাশ এটুকু বলতেই রাস্তার গাড়ির আলোর সংকেত বদলে গেল। কিন্তু এগিয়ে যেতে গিয়েও এগোতে পারল না দুর্গা।

"তারপর?" সন্দেহের চোখে তাকাল দুর্গা।

"আমি ওঁকে দোকানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু উনি রাজি হলেন না। আমি তখন একটা ট্যাক্সি করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি," পলাশ বলল।

"এখন কেমন আছেন উনি?" উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল দুর্গা।

"প্রেশার বেড়ে গিয়েছিল। ওষুধ খাওয়ার পর মনে হয় একটু ভাল।"

"আপনি ওঁর বাসায় গিয়েছিলেন?"

"আমাকে আপনি বলবেন না আপা।"

কথাটা শুনে থমকে গেল দুর্গা। ছেলেটা সম্ভবত তারই কাছাকাছি বয়সি, কিন্তু আপা বলে তাকে সম্বোধন করল। হয়তো বিবাহিতা বলেই এই সম্মানটুকু জানাল। সে মাথা নাড়ল, "যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দিন। ওঁর বাসার ঠিকানাটা বলুন।"

"ঠিকানা তো জানি না," মাথা নাড়ল পলাশ, "তবে বাড়িটাকে চিনতে পারব।"

"কত দূরে?"

"এই মিনিট দশেক হেঁটে গেলে যে-ফাস্ট ফুডের দোকান, তার পাশে।"

মুখ ফেরাতেই দুর্গা দেখল আবার দ্রুতগামী গাড়িগুলো চালু হয়েছে। রাস্তা পার হতে আলোর সংকেত পালটানোর জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

পলাশ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি ওঁকে দেখতে যাবেন আপা?"

একমুহূর্ত ভাবল দুর্গা। তারপর বলল, "আমাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে যান তো!"

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল পলাশ। ট্রাফিকের আলোর বদল হতেই সে রাস্তা পার হওয়ার জন্যে এগিয়ে যেতে দুর্গা তাকে অনুসরণ করল। রাস্তা পার হয়ে ফুটপাথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে পলাশ, পাঁচ-ছ'হাত পেছনে দুর্গা। স্কুলের দিকে নয়, তার অনেক আগেই বাঁ দিকের রাস্তা ধরল পলাশ। হঠাৎ দুর্গার মনে হল, এভাবে পলাশকে অনুসরণ করা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। সে নিউ ইয়র্কের অচেনা রাস্তায় একা কখনও হাঁটেনি। পলাশের যদি অসৎ উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তাকে কোনও খারাপ জায়গায় নিয়ে যেতেই পারে। আচমকা গলা চড়াল দুর্গা, "এই যে!"

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল পলাশ, "আজ্ঞে, আমি পলাশ।"

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"আপনি যেখানে যেতে চাইলেন... ওই তো, বাঁ দিক থেকে তিন নম্বর বাড়ি। আমরা এসে গেছি," কথাগুলো বলে আবার হাঁটতে শুরু

করল পলাশ। যে-বাড়িটা সে দেখিয়েছিল, তার সামনে পৌঁছে বলল, "উনি এই বাড়িতে ঢুকে গিয়েছেন।"

দুর্গা জেনেছে নিউ ইয়র্কের বেশিরভাগ ফ্ল্যাটবাড়ির সদর দরজা ঠেললেই খোলা যাবে না, দরজার পাশে সবক'টা ফ্ল্যাটের নম্বর লেখা বোর্ড আছে। যত নম্বর ফ্ল্যাটে যাওয়ার দরকার, তার নম্বরের বোতাম টিপলে সেই বিশেষ ফ্ল্যাটে বেল বাজবে এবং সেই ফ্ল্যাটের লোক কে এসেছে, তা জেনে নিয়ে দেখা করতে ইচ্ছুক হলে বোতাম টিপলে সদর দরজা খুলে যাবে। প্রতিটি নম্বরের ওপরে ফ্ল্যাটের কর্তার নাম লেখা রয়েছে।

দুর্গা বুঝতে পারছিল না সে কী করবে। এই সময় একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক ভেতর থেকে দরজা খুলে বাইরে পা বাড়ালেন। ওদের দেখে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, পলাশ বলল, "স্যার! ডু ইউ নো ইন হুইচ ফ্ল্যাট এ বাংলাদেশি ওল্ড ম্যান লিভস?"

"সরি!" মাথা নেড়ে লোকটি চলে গেল।

পলাশ বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না আপা। আমি ঠিক ওঁর খবর বের করে কাল আপনাকে জানিয়ে দেব। এখানকার লোক বেশি কথা বলে না, বললে আজই বের করে ফেলতে পারতাম।"

দুর্গা সমস্যাটা বুঝল। নাম জানে না, ফ্ল্যাটের নম্বর জানা নেই, তার ওপর এই ছেলে যে ঠিকঠাক এই বাড়ি বৃদ্ধের বাসস্থান বলে চিনতে পারছে কি না, তারও তো স্থিরতা নেই। অতএব আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও যুক্তি নেই। দুর্গা যে-রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই, রাস্তায় ফিরে যাচ্ছিল। পলাশ প্রায় ছুটে এসে তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আপা, বাঁ দিকের এই রাস্তা দিয়ে চলেন। দু'তিন মিনিটে আপনার বাসায় পৌঁছে যাবেন।"

অবাক হয়ে গেল দুর্গা, "আমার বাসা আপনি চেনেন?"

একটু লজ্জা পেয়েই যেন নিঃশব্দে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল পলাশ।

অবাক যতটা, বিরক্ত ততটাই হল দুর্গা। কিন্তু কিছু না-বলে পলাশের বলা পথে না-গিয়ে যে-পথ দিয়ে সে এখানে এসেছিল, সেই পথে ফিরে গেল মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে যেতে। তার কেবলই বৃদ্ধের মুখ মনে পড়ছিল। ভগবান যেন বৃদ্ধকে সুস্থ রাখেন।

রাত্রে স্বামীকে কথাটা বলতে চেয়েও বলল না দুর্গা। একদম অপরিচিত একটি যুবকের সঙ্গে অচেনা পথে হেঁটে সে বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ওই বৃদ্ধকেও সে চেনে না, তাঁর বাড়ি গিয়ে সে নিরাপদে থাকবে কি না, তা না জেনেই কী করে গিয়েছিল? স্বামী যদি জিজ্ঞাসা করে, যাকে চেনো না, কখনও দ্যাখোনি, তার অসুস্থতার কথা শুনে অচেনা জায়গায় কেন গেলে? তোমাকে কতবার বলেছি, ঢাকার অচেনা লোককেই বিশ্বাস করা যেখানে ঠিক নয়, তখন আমেরিকায় কখনওই করবে না। আমার কথা তুমি কেন শোনোনি? তোমার যদি কিছু হয়ে যেত তাহলে মেয়েটার কী হত?

এইসব কথা তো তাকে শুনতেই হত। তার ওপর স্বামী হয়তো নিজের যত অসুবিধা হোক, তার দোকানে যাওয়া বন্ধ করে দিত। এখন তার জীবনে যেটুকু আলো-হাওয়া এসেছে, তা ওই সময়টুকু দোকানে বসে অচেনা কাস্টমারদের সঙ্গে নানা রকম কথা বলার কারণে। স্বামীকে ব্যাপারটা বললে ওসব যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে বেঁচে থাকতে পারবে না। এতদিন তার জীবন ছিল একরকম। সেই বন্দিজীবন যত খারাপই লাগুক, তাতে অভ্যস্ত হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু একবার বাইরের আকাশ দেখে আবার খাঁচায় ফিরে যাওয়ার আগে মরে যাওয়া ঢের ভাল। সে ঠিক করল, কোনও অন্যায় যখন করেনি, নিরাপদে যখন ফিরে আসতে পেরেছে তখন আর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। স্বামীকে ঘটনাটা যদি সে না-বলে তাহলে কোনও অন্যায় সে করবে না। বরং তাতে শান্তি থাকবে। মনটা একটু খুঁতখুঁত করছিল, তবুও। মায়ের একটা কথা মনে পড়ল। দ্বিরাগমনে বাপের বাড়িতে ফিরে আসার পর মা বলেছিল, শ্বশুরবাড়ির লোকের ব্যবহার পছন্দ না-হলেই বরের কাছে নালিশ করবে না। তাতে শান্তি থাকবে।

পরদিন দোকানে যাওয়ার পথে সেই বড় ট্রাফিক সিগনালের সামনে যেতেই দুর্গা দেখতে পেল পলাশকে। পলাশ এগিয়ে এসে বলল, "আপা, একটা খারাপ খবর আছে। উনি হাসপাতালে ভরতি আছেন।"

"সে কী! কী করে জানলেন?" চমকে উঠল দুর্গা।

"কাল আপনি চলে যাওয়ার পর আমি আবার ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একজন বাঙালি মহিলাকে দরজা খুলতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করতেই জানলাম, তিনি ওই বুড়ো মানুষের মেয়ে। হৃদযন্ত্রের সমস্যার জন্যে কাল তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। অবস্থা কাল বিকেল পর্যন্ত ভাল ছিল না," তারপর গলার স্বর বদলে গেল পলাশের, "আমাকে উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কে আর কেন ওঁর বাবার কথা জানতে চাইছি! আমি তখন আপনার কথা বলেছিলাম।"

"কী বলেছেন?" একটু হকচকিয়ে গেল দুর্গা।

"যা ঘটেছিল। ওঁর বাবা আপনাদের দোকানে কিছু কিনতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ফেরার সময়ে রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলাম। খবরটা শুনে আপনি দেখতে এসেছিলেন কিন্তু কোন বাড়িতে উনি থাকেন, তা আমি বোঝাতে পারিনি বলে আপনি ফিরে গিয়েছেন," পলাশ বলল।

"ঠিক আছে। ওঁর বাড়ির লোকজন যখন দেখাশোনা করছেন তখন আর আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। আচ্ছা, চলি," দুর্গা পা বাড়াল। সিগনালের আলো পালটে যাচ্ছে।

"ওঁর খবর পেলে আপনাকে জানাব?" যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকেই চিৎকার পলাশ জিজ্ঞাসা করল।

দ্রুত রাস্তা পার হতে হতে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে এগিয়ে গেল দুর্গা।

স্বামী দোকানে থাকলে দুর্গার সুবিধে হয়। খদ্দেরদের সঙ্গে কীরকম কথা বলতে হয়, মেজাজ ঠান্ডা রেখে ভাল ব্যবহার কীভাবে করতে হয়, তা স্বামীর কাছে সে শিখতে পারছে। কোনও জিনিসের কত দাম, তা কম্পিউটারে যাচাই না-করেও স্বামী বলে দিতে পারে। ওর মতো স্মরণশক্তি পাওয়া সহজ ব্যাপার নয় কিন্তু দেখতে দেখতে অনেকটা শিখে ফেলেছে দুর্গা। কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে দুর্গা স্বামীকে লক্ষ করে। স্বামী খুব বিনীত হয়ে কাস্টমারদের সঙ্গে যখন কথা বলে, তখন তারা বেশ খুশি হয়। কিন্তু ক'দিন থেকে একটা অস্বস্তি তিলতিল করে দুর্গার মনে বেড়ে যাচ্ছিল। স্বামী মানুষটার সব ভাল, কিন্তু নিজের সম্পর্কে এতটাই উদাসীন যে, চোখে লাগে। যে শার্ট-প্যান্ট লোকটা একবার শরীরে তোলে, তা দশ দিনের আগে ধোয়াধুয়ি করে না। তাও শার্টটা না-পালটালে নোংরাটা লোকের চোখে পড়বে বলে বাধ্য হয়ে পালটায়। প্যান্ট অন্তত তিন সপ্তাহ স্বচ্ছন্দে পরে চলে। বেশ কয়েকবার এ ব্যাপারে দুর্গা আপত্তি জানিয়েছে কিন্তু কাজ হয়নি।

পোশাক সম্পর্কে উদাসীন লোকটা কি আয়নায় নিজের মুখটাকেও দ্যাখে না? একবার দাড়ি কামানোর পর নতুন দাড়ি গজিয়ে মুখটাকে বিশ্রীভাবে ঢেকে ফেললেও স্বামীর কোনও হেলদোল হয় না। এ নিয়ে অনেকবার আপত্তি জানিয়েছে দুর্গা। কাজ হয়নি। জেগে থাকলে মেয়ে তো বাবাকে কাছে ঘেঁষতেই দেয় না। রাত্রে ঘুমন্ত মেয়েকে যখন বাবা চুমু খেয়ে শান্তি পেতে যায়, তখন দাড়ির খোঁচায় ঘুম ভেঙে যাওয়া মেয়ের চিৎকারে কানে তালা লেগে যাওয়ায় উপক্রম হয়। রেগে গিয়ে সে স্বামীকে প্রশ্ন করেছে, "নোংরা হয়ে থাকতে তোমার এত ভাল লাগে কেন? আর-পাঁচটা ভদ্রলোকের মতো পরিষ্কার থাকতে পারো না?"

জবাব দেয় না স্বামী। মুখ নিচু করে সামান্য হাসে।

কিন্তু দুর্গার কথা এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। কোনও পরিবর্তন হয় না স্বামীর। কিন্তু প্রতিদিন দোকানের কাউন্টারের ওপাশে বসতে বসতে অচেনা ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলতে এত অভ্যস্ত হয়ে গেল দুর্গা যে এতকাল বয়ে এসেছিল যে-জড়তা, তা কখন উধাও

হয়ে গিয়েছে বুঝতেই পারেনি।

স্বামীরও সাহস বেড়ে গিয়েছিল। নিউ ইয়র্কের বাইরে, যেমন নিউ জার্সি অথবা ফিলাডেলফিয়া অথবা আর-একটু দূরে ওয়াশিংটনের পুজো বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্টল নিয়ে চলে যাওয়া শুরু করল স্বামী। সেখানে একদিন তো বটেই, কখনও দুই বা তিনদিন ধরে অনুষ্ঠান চলাকালীন স্বামী ব্যবসা বাড়াতে সফল হয়েছে। প্রথম প্রথম যাওয়ার আগে বলেছে, "তুমি সব সামলে নিতে পারবে তো?" মেয়েকে সন্ধেবেলায় বাড়ি নিয়ে আসতে হয় বলে দোকান বন্ধ করে দিতে হত। ভারী ভারী তালাগুলো দরজায় ঝুলিয়ে দিতে হিমসিম খেয়েছিল প্রথমদিন। স্বামী স্টল নিয়ে গিয়েছিল ওয়াশিংটনে। সারাদিন বেশ ভয়ে ভয়ে দোকানে কাটিয়েছিল দুর্গা। আশ্চর্য, সেদিনই বিক্রি হয়েছিল ন'শো বাইশ ডলার। ঘড়ি দেখে প্রথমে জানলাগুলো বন্ধ করেছিল দুর্গা। সেগুলো বন্ধ করার পরই দরজায় শব্দ হল।

দুর্গা গলা তুলে বলল, "সেল ক্লোজড। দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।"

এবার দরজাটা ঈষৎ ফাঁক হল, এক পা ভেতরে এসে পলাশ বলল, "আপা, আমি পলাশ। রাস্তা থেকে দেখলাম আপনি জানলা বন্ধ করছেন। আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

ছেলেটির দিকে তাকাল দুর্গা। ওর মুখে কোনও খারাপ অভিসন্ধি আছে বলে তার মনে হল না। তবু ইতস্তত করে কিছু বলতে হয় তাই জিজ্ঞাসা করল, "আপনি এখন কোথায় ছিলেন? কী করছিলেন?"

"এই তো, এখানেই—" কথা শেষ না করে হাসল পলাশ।

ব্যাগটা হাতে নিয়ে চাবির গোছা তুলে সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াতেই পলাশ হাত বাড়াল, "আমাকে দিন, আমি দরজায় তালাগুলো লাগিয়ে দিই।"

একটু ইতস্তত করে চাবির গোছা দিয়ে দিল দুর্গা। গোটা চারেক তালার সঠিক চাবি বেছে নিতে সময় লাগল। সবক'টা তালা লাগিয়ে সেগুলো টেনে দেখে চাবি ফেরত দিয়ে হাসল পলাশ, "ভাইয়া নেই?"

মাথা নেড়ে চাবি ব্যাগে রেখে সিঁড়ির দিকে এগোল দুর্গা।

"আপনি যদি আপত্তি না-করেন কাল সকালে যখন আসবেন, তখন আমি এখানে থাকব তালাগুলো খুলে দিতে। দাদা কি কাল আসবেন?"

দুর্গা কোনও জবাব না-দিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে চলল রাস্তায় নেমে। কিছু দূর যাওয়ার পর মনে হল, ছেলেটা তো তার উপকার করতেই এসেছিল, সে কেন খামোকা খারাপ ব্যবহার করল! আচ্ছা, ও কি সেই বৃদ্ধের খবর জানে? ভালভাবে কথা বললে ওই খবরটুকু তো জানা যেত।

দুর্গা দাঁড়াল পেছন ফিরে তাকিয়ে চলমান মানুষের ভিড়ে পলাশকে দেখতে পেল না! নিজের মনে মাথা নাড়ল দুর্গা।

দোকানে কাজের চাপ বাড়ছিল। তার ওপর বিভিন্ন মেলা বা উৎসবে স্টল নিয়ে যাওয়া ছাড়া বঙ্গসম্মেলন, বঙ্গমেলার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রবাসীদের আয়োজন করা উৎসব তো আছেই। এইসব উৎসবে স্টল নিয়ে গেলে ভাল মুনাফার সঙ্গে সঙ্গে জনসংযোগ বেড়ে যায়। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে টেলিফোনে অর্ডার এলে নিউ ইয়র্ক থেকে স্বচ্ছন্দে সাপ্লাই দেওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এর জন্যে প্রচুর সময় দিতে হয়। স্বামী দোকানের বাইরে থাকলে দুর্গাকে হিমসিম খেতে হয়। স্বামী ঠিক করল বঙ্গসম্মেলন বা বঙ্গমেলায় স্টল নিলে তিনদিন দোকান বন্ধ রেখে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে চলে যাবে। মেয়ে এখন স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারে। স্বামী-স্ত্রী স্টলে বসলে মেয়েকে সামলাতে অসুবিধা হবে না।

কিন্তু নিউ ইয়র্কে দুর্গাকে সাহায্য করতে একজন সাহায্যকারীর খুব প্রয়োজন। এরকম কাউকে রাখতে গেলে যে-মাইনে দিতে হবে, তা কী করে কমানো যায়, তা ভেবে পাচ্ছিল না স্বামী। শেষপর্যন্ত বিকল্প পথ ভেবে নিল সে।

মেয়ের দায়িত্ব যদি কোনও ঘরে-বসে থাকা মহিলাকে দেওয়া হয়, তাহলে খরচ অনেক কম হবে। সেই মহিলা সকালে বাড়িতে এসে মেয়েকে তৈরি করে স্কুলে পৌঁছে দেবে। দুপুরে স্কুল থেকে বেবিসিটার মহিলার কাছে পৌঁছে দেবে। আবার সন্ধের সময় মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসবে। দুর্গা ফিরে এলে তার ছুটি। টানা থাকতে হচ্ছে না। গোটা দিনে খুব বেশি হলে ঘন্টা তিন-চার থাকলেই হবে।

আমেরিকায় বেশির ভাগ বাঙালি পরিবারের দিদিমা-ঠাকুরমারা নাতি-নাতনিরা বড় হয়ে গেলে কার্যত কর্মহীন হয়ে পড়েন। সাধারণত মেয়ের বাড়িতে থাকলে পরিশ্রম কম করতে হয়, কিন্তু সময় কাটতে চায় না। বেশির ভাগ মহিলাই দেশে স্বামীকে হারিয়ে নাতি বা নাতনিকে মানুষ করতে আমেরিকায় এসে একসময় ভাবেন, দেশে ফিরে গেলেই বেঁচে যেতেন! কিন্তু ততদিনে দেশের মানুষের সঙ্গেও সম্পর্ক শিথিল হয়ে গিয়েছে। এরকম একজন মহিলাকে খোঁজার আগে বাংলাদেশ থেকে নিজের মাকে নিয়ে আসার কথা ভেবেছিল দুর্গা। কিন্তু মায়ের হার্টের সমস্যা দেখা দেওয়ায় প্লেনে চাপিয়ে দেশ থেকে এতটা দূরে নিয়ে আসতে সাহসী হল না স্বামী। তখন পরিচিত লোকজনকে চাহিদার কথা বলা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

কপাল ভাল বলে এক বৃদ্ধ দম্পতিকে পাওয়া গেল। একমাত্র মেয়ের সংসারে তাঁরা আছেন। বৃদ্ধ বললেন, "আপনার মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া-আসা করব, দুপুরে যেখানে থাকে সেখানে পৌঁছে দেব, সন্ধেবেলায় এবং সকালবেলায় আমার স্ত্রী মেয়েটিকে দেখাশোনা করবে। এতে আমাদের সময়টা বেশ ভাল কাটবে।"

পারিশ্রমিক হিসেবে যা দিতে হবে তা নিতান্ত কম বলে এক কথায় রাজি হয়ে গেল দুর্গা এবং তার স্বামী। মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় দেখা গেল সে তেমন ঝামেলা করছে না।

দুর্গা লক্ষ করছিল, স্বামী তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে না। আজকাল সে কার সঙ্গে কথা বলছে তা নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছে না। প্রথমে সে অবাক হচ্ছিল এবং সেই কারণে অস্বস্তি। কিন্তু ব্যবসা বাড়ছে। রোজগার আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে খাটনিও। সন্ধের পর বাড়িতে ফিরলেই মেয়ে যাঁর কাছে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, সেই প্রৌঢ়া বাড়ি চলে যান। তখন মেয়ে আশা করে মা তার সঙ্গে খেলবে, গল্প শোনাবে। কিন্তু তখন শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে মেয়ের জন্যে আলাদা রাতের খাবার তৈরি করে নিজেদের খাবার করার ইচ্ছে হয় না। স্বামী বাড়িতে থাকলে রাতের খাবার তাকে কিনে নিয়ে আসতে বলে দেয়। কিন্তু স্নান করে বিছানায় যেতে যখন প্রবল ইচ্ছে করে, তখন মেয়ের বকবকানির জন্যে মাথা ধরে যায়। স্বামী থাকলে তবু কিছুটা রক্ষে কিন্তু ইদানীং স্বামী যেন একটু ঘনঘন নিউ ইয়র্কের বাইরের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে যাচ্ছে। এই সময় দুর্গার মনে হয় তার আগের জীবন বরং ভাল ছিল। দিনরাত বন্ধ দরজার ভেতরে পড়ে থাকতে হলেও পরিশ্রম তেমন না-করতে হওয়ায় এরকম ক্লান্তির বোঝা টানতে হত না।

দোকানে যাচ্ছিল দুর্গা। কাছাকাছি কোথাও ছিল, সামনে চলে এল পলাশ। হেসে বলল, "আমি একটা চাকরির জন্যে অন্য শহরে গিয়েছিলাম তাই খবরটা আপনাকে দিতে পারিনি। আপনি কি জানেন?"

"কী খবর?"

"ওই দাদু এখন ভাল আছেন। হাসপাতাল থেকে ঘরে চলে এসেছেন।"

কথাটা শুনে মনে পড়ে গেল। কাজের চাপে বৃদ্ধ মানুষটির কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল সে। পলাশের কথা শুনে ভাল লাগল। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি জানলে কী করে?"

"আমি হাসপাতালে গিয়ে শুনেছি।"

"খুব ভাল কাজ করেছ," এগিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল দুর্গা, "তুমি যে কাজের জন্যে গিয়েছিলে তার কী হল?"

"না, মানে, আমার ইংরেজি বলা আরও ভাল করতে হবে," পলাশ বলল।

সেদিন স্বামীকে পলাশের কথা বলল দুর্গা। ছেলেটার সঙ্গে তার কবে কখন প্রথম পরিচয় হয়েছিল, মাঝেমাঝে রাস্তায় দেখা হয়, সেই বুড়ো মানুষটাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল ছেলেটি তা স্বামীকে জানায়নি সে। এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে স্বামীকে বিচলিত করতে চায়নি। কিন্তু আজ বলল।

"তুমি চিনলে কী করে?" স্বামী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"একজন কাস্টমারের সঙ্গে এসেছিল।"

"ও! কিন্তু চোর বদমাশ কি না তা তো জানো না। একটা গিফট আইটেম সরিয়ে নিলেই তো পঞ্চাশ ষাট ডলার হাওয়া হয়ে যাবে।"

"সেকথা ঠিক। কিন্তু তুমি যখন থাকো না, তখন আমার পক্ষে একা কাস্টমারদের সামলানো খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। খুব ক্লান্ত লাগে।"

"বুঝতে পারছি। তাহলে পাকাপাকি রাখার দরকার নেই। আমি যখন বাইরে থাকব, তখন যদি ডেলি বেসিসে কাজ করতে চায়, তাহলে ভেবে দেখা যেতে পারে। তবে প্রথমে ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হবে। ওর সঙ্গে দেখা হলে আমার কাছে আসতে বোলো।"

দু'দিন দেখতে পায়নি ছেলেটাকে, তৃতীয় দিনে দুর্গা দোকানের জানলা যখন খুলছে, তখন পলাশকে দেখতে পেল। নীচের রাস্তার উলটোদিকে লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে সিগারেট খাচ্ছে। কাউকে সিগারেট খেতে দেখলে খুব বিরক্ত হয় দুর্গা। বিয়ের পর স্বামীকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিল, সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস নেই তো? নেই শুনে স্বস্তি পেয়েছিল। এই ছেলেটি যখন বেকার হয়েও আমেরিকায় এসে সিগারেট খাচ্ছে, তাকে চাকরিতে নেওয়া ঠিক হবে না।

স্বামী জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছিল, জানলায় দাঁড়িয়ে দুর্গা বলল, "ওই যে, ওই ছেলেটা। তবে ওকে কাজ দেওয়ার দরকার নেই। ও সিগারেট খাচ্ছে। সিগারেটের গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না।"

কথাগুলো শুনে স্বামী দ্রুত জানলায় চলে এল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কোন ছেলেটা? এখানে তো প্রচুর বেকার দাঁড়িয়ে থাকে।"

"বললাম তো, ওকে দরকার নেই," দুর্গা বলল।

"আহা, দেখাও না আমাকে!" স্বামী যেন মজা পেল।

দুর্গা দেখিয়ে দিচ্ছে যখন, তখনই পলাশ মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকাল। সেটা দেখতে পেয়ে স্বামী তাকে ইশারা করল ওপরে উঠে আসতে। পলাশ যে খুব অবাক হয়ে গেছে, তা ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। একটু ইতস্তত করে সে রাস্তা পার করে এপাশে চলে এল।

পলাশ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকামাত্র দুর্গা জিজ্ঞাসা করল, "সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এখন কেমন আছেন?"

"ভাল। তবে বাসা থেকে বের হচ্ছেন না," পলাশ বলল।

"এই যে ভাই, তোমার নাম কী?"

"আজ্ঞে আলতাফ আহমেদ পলাশ," বলে আবার বলল, "সবাই পলাশ বলে।"

"কবে এসেছ দেশ থেকে?"

উত্তর দিল পলাশ। বেশ কিছুক্ষণ জেরার পর স্বামী জিজ্ঞাসা করল, "আমার এখানে কাজ করতে পারবে?"

"কী কাজ?" একটু অবাক হল পলাশ।

"এই দোকানের কাজকর্ম। তবে রোজ আসতে হবে না। আমি যেদিন যেদিন নিউ ইয়র্কের বাইরে যাব, সেসব দিন এলেই হবে," স্বামী বলল।

"আপনি মাসে কতদিন বাইরে যান?"

"ঠিক নেই," স্বামী গম্ভীর হয়ে বলল।

"তাহলে তো বেশির ভাগ দিন আমাকে বেকার থাকতে হবে," বেশ ম্লানমুখে বলল পলাশ।

স্বামী তাকাল দুর্গার দিকে। কথাটা যে খুবই সত্যি তাতে সন্দেহ নেই। দুর্গা অন্য দিকে মুখ ঘোরাল। সে যেন বলতে চাইল, তুমি যা ভাল বোঝো তাই করো। স্বামী পলাশকে বলল, "দ্যাখো ভাই, তোমাকে আমি চিনি না। তোমার ওপর বিশ্বাস আসার আগে এমন একজনকে আনতে হবে, যিনি তোমাকে সার্টিফাই করবেন। আছেন তেমন কেউ?"

পলাশ ঢোঁক গিলল। তারপর বলল, "আমার কাকাকে বলব।"

"আমেরিকায় সিটিজেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ। নিয়ে এসো তাঁকে। তবে তুমি যখন পার্ট টাইম করতে চাইছ না, তখন পুরোটা সময় করলে কত আশা করছ?"

"আপনি যা দেবেন।"

"বুঝলাম। শোনো, তুমি আমার এখানে বেশিদিন থাকবে না তা আমি জানি, ভাল চাকরি পেলেই এখান থেকে চলে যাবে," স্বামী বলল, "সেটাই স্বাভাবিক বলে আমি মনে করি। যাক গে, তুমি তোমার কাকাকে নিয়ে এসো, কথা বলি। আর তোমাকে প্রথম দু'মাস হাজার করে দেব। তারপর যদি কাজ দেখে খুশি হই মাইনে অনেক বাড়িয়ে দেব। তুমি এখন আসতে পারো।" মাথা নেড়েছিল স্বামী।

দুর্গা দেখল যাওয়ার সময় শুধু স্বামীকেই নয় তাকেও নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। সে চলে যাওয়ার পর স্বামী বলল, "এমনিতে মনে হচ্ছে এই ছেলেটা খারাপ নয়। ওর কাকাকে নিয়ে আসুক, কথা বলে দেখি।"

হঠাৎ রসিকতা করার ইচ্ছে হল দুর্গার। বলল, "তুমি তো ওর কাজ দেখার সময়ে হাজার ডলার করে দেবে বললে..."

"ভুল বলিনি। ওর কাকার সঙ্গে এসে পাসপোর্ট দেখাক, তাতে ভিসা আছে কি না দেখি। তার ওপর কাজের নমুনা না-দেখেই একগাদা মাইনে দেব কেন? আমি ঠিকই বলেছি।" স্বামী কোনও একটা কাজে কোথাও যাবে বলে পা বাড়াল।

"তুমি কি সব কাজ ঠিকঠাক করো?"

"তার মানে?" মুখ ফেরাল স্বামী।

"এই যে আমি, সকালবেলায় এসে সন্ধেবেলা পর্যন্ত দোকানে থাকছি, তার জন্যে আমাকে কত দিচ্ছ?" হেসে জিজ্ঞাসা করল দুর্গা।

"অ্যাঁ?" চমকে উঠল স্বামী, "এ কী বলছ তুমি?"

"ভুল বলছি?"

"নিশ্চয়ই। এ তো তোমার নিজের দোকান। আমিও দোকানটাকে নিজের মনে করি। আমি কি মাইনে নিই?" মাথা নাড়ল স্বামী।

"সেই তো মুশকিল। আমার যদি কিছু কিনতে ইচ্ছে করে আমি কিনতে পারব না। তোমার কাছে হাত পাততে হবে। তুমি যদি ওই ছেলেটার মতো আমারও একটা মাস-মাইনে ঠিক করে দিতে তাহলে খুব খুশি হতাম। সুবিধে হত আমার," এই সময় একজন দোকানে চলে আসায় প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল।

দুর্গা আশঙ্কা করছিল একা হলেই স্বামী এ নিয়ে কথা বলবে। এই রকম ভাবনা কেন মাথায় এল তা নিয়ে হাজারটা জেরা করবে। কিন্তু কিছুই করল না। রাত্রে বাড়িতে ফিরে এসে মেয়ের সঙ্গে খুনসুটি করল, ঢাকায় ফোন করে নিজে কথা বলে তাকেও বলতে দিল কিন্তু ওই প্রসঙ্গেই গেল না।

বেশ অবাক হল দুর্গা। এইভাবে কথা গিলে ফেলার অভ্যেস স্বামীর আগে কখনও ছিল না বলেই সে জানে। শেষপর্যন্ত আর থাকতে না-পেরে নিজেই কথা তুলেছিল, "তুমি কি টাকা চেয়েছি বলে আমার ওপর রাগ করেছ?"

"দূর! ব্যাপারটা আমারই ভাবা উচিত ছিল। প্রত্যেক মানুষের তো হাতখরচের প্রয়োজন হয়। তুমি যখন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে থাকতে, তখন যেসব জিনিসের দরকার হত না বাইরে বেরিয়ে কাজ করতে এসে তার যে খুব দরকার হয়ে পড়ে, সেটা আমার মাথায় ছিল না। একজন মহিলা তো একই পোশাকে দশদিন কাটাতে পারে না। তুমি বলার পরে আমার চোখ ফুটল।" হেসেছিল স্বামী।

মানুষটা যতই এক পোশাকে দিনের পর দিন থাকুক, মাসে দু'বারের বেশি দাড়ি কামাবার কষ্ট করতে না-চাইলেও মানুষটার মন যে খুব নরম, তার প্রমাণ তো সে প্রায়ই পায়, এখনও পেল। দুর্গা হাসল, "আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে মজা করছিলাম। আমার যা দরকার

তা তো চাইলেই তুমি দাও। আলাদা করে টাকা দেওয়ার কোনও দরকার নেই।"

শুনে স্বামী হেসেছিল, মুখে কিছু বলেনি।

দু'দিন পরে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছিল পলাশ। তিনি সম্পর্কে পলাশের কাকা। তাঁর বাড়িতেই সে থাকে। ভাইপোর কথা বলতে গিয়ে অনেক হা-হুতাশ করলেন ভদ্রলোক। স্টুডেন্টস ভিসা নিয়ে কানাডায় গিয়েছিল। সেখানে মন না-বসায় বর্ডার পার করে আমেরিকায় ঢুকে সোজা নিউ ইয়র্কে এসে তার বাড়িতে উঠেছে। এখন যা অবস্থা, দেশে ফিরে যেতে হলে ওকে কানাডায় গিয়ে প্লেন ধরতে হবে। কিন্তু যাওয়ার সময় যদি কানাডার বর্ডারে ধরা পড়ে, তাহলে বেশ কয়েক বছর জেলে কাটাতে হবে। এরকম ছেলেকে নিয়ে কী করবেন তা ভদ্রলোক ভেবে পাচ্ছেন না।

স্বামী এই রকম অনেক ঘটনার কথা জানে। আমেরিকার শ্রমিকদের একটা অংশ বিদেশি, যাদের আমেরিকায় থাকার ছাড়পত্র নেই। কিন্তু সেই বিদেশিদের দিয়ে অল্প মাইনেতে আমেরিকান মালিকরা দশ ঘন্টা কাজ করায়। নিয়মিত মাইনে না-দিলে কোথাও নালিশ জানানোর কোনও সুযোগ নেই। মাঝেমাঝে মার্কিন সরকার উদার হন। তাঁরা এই সব মানুষজনকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করে গ্রিন কার্ড দিয়ে থাকেন। যদিও সংখ্যাটা খুবই কম তবু আশায় আশায় অনেক আবেদন জমা হয়। যারা নির্বাচিত হয় না, তাদের একটা বড় অংশকে পুলিশ ধরে জেলে পাঠায়। যারা চতুর, তারা তাই আবেদন করে না।

কথা বলে খুশি হল স্বামী। পলাশের কাকার ঠিকানা লিখে নিয়ে পরের সোমবার থেকে ওকে কাজে যোগ দিতে বলল সে। দুর্গা দেখল চাকরিটা পেয়ে পলাশের মুখে খুশির আলো ছড়াল। স্বামীর প্রস্তাবিত বেতনে কোনও আপত্তি জানাননি পলাশের কাকাও।

কয়েক দিনের মধ্যেই স্বামী পলাশের কাজ লক্ষ করে খুশি হয়ে দুর্গাকে বলেছিল, "না, ছেলেটা ফাঁকিবাজ নয়। তবে ওর ওপর চোখ রেখো।"

"মানে?" তাকিয়েছিল দুর্গা।

"হাতটান আছে কিনা দেখতে হবে।"

"কী করে বুঝব! সব সময় তো ওর ওপর চোখ রেখে বসে থাকা সম্ভব নয়। কী যে বলো তার ঠিক নেই," বিরক্ত হয়েছিল দুর্গা।

স্বামী আর কথা বাড়ায়নি।

কিন্তু দুর্গার চোখে পলাশের পরিবর্তন ধরা পড়ল। এখন কাজের বাইরে পলাশ তার সঙ্গে কথা বলে যা না বললেই নয়। কাস্টমার দোকানে ঢুকলে সে না বলতেই এগিয়ে যায়। কিন্তু স্বামীর ফাইফরমাশ খাটার জন্যে যেন উদগ্রীব হয়ে থাকে। স্বামী তাকে বিভিন্ন কাজে এখানে ওখানে পাঠায়, সঙ্গে সঙ্গে সে যেন দৌড়ে গিয়ে কাজটা করে আসে।

আবেদনপত্র জমা দেওয়া, ইন্টারভিউয়ের ডাক এলে স্বামীর সঙ্গে গিয়ে হাজিরা দেওয়ার পর্ব আগেই হয়ে গিয়েছিল। স্বামী গ্রিনকার্ড হোল্ডার। মেয়ে এই আমেরিকায় জন্মসূত্রে নাগরিক, তাই তার গ্রিনকার্ড পাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। সেই গ্রিনকার্ড যেদিন এল, সেদিন মেয়ের স্কুলে ডাক পড়েছিল বাবা-মায়ের। মেয়ে এখন হাঁটার বদলে দৌড়তে ভালবাসে। দুর্গা অনেক চেষ্টা করেও মেয়েকে দিয়ে দুটো কি তিনটে শব্দের বেশি বাংলা বলাতে পারেনি। বাংলাদেশের ভাল স্কুলে যে-ইংরেজি শেখানো হয়, তাই শিখে এসেছিল দুর্গা। এখন মেয়ের মুখের ইংরেজি উচ্চারণ বুঝতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। বুঝিয়ে হয়নি, চোখ রাঙিয়ে বা ধমক দিয়েও নয়, দু'তিনবার হাতও তুলেছে সে কিন্তু কিছুতেই মেয়ে বাংলা বলবে না।

ভয়ে ভয়ে মেয়ের স্কুলে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল দুর্গা। তাদের পালা এলে টিচার হেসে বললেন, "তোমাদের মেয়ে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছে। ওকে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড ওপরে তুলে দিচ্ছি। ওকে যদি ঠিকঠাক গাইড করো তাহলে দেখবে অনেক ওপরে উঠবে।"

মা-বাবা কিছু বলার আগেই সামনে দাঁড়ানো মেয়ে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাম।" শুনে টিচার হাসলেন। স্বামীর মুখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পিতার গৌরব স্পষ্ট।

পায়ে চোট পেল স্বামী। রাস্তা পার হতে গিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে একটি স্কুটারের সামনে পড়ে গিয়ে আছাড় খেতে হয়েছিল। হাসপাতালে তিনদিন থেকে বাড়িতে শুয়ে থাকতে হয়েছিল পনেরোদিন। তখন হিমসিম খেয়েছিল দুর্গা। দোকানের সমস্যা সামলাতে পলাশ খুবই সাহায্য করলেও বাইরের কাজগুলোর জন্যে স্বামীর পরামর্শ নিয়ে দুর্গাকে বাইরে পা বাড়াতে হল। পলাশের ওপর কয়েক ঘন্টা দোকান ছেড়ে যেতে খুবই ভয় হচ্ছিল তার, কিন্তু এছাড়া তো কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু বাইরে যাতায়াত করতে করতে নিউ ইয়র্ক শহরটাকে নতুন মনে হল না দুর্গার।

শিশুরা একটু-একটু করে বড় হয়। কিন্তু মেয়েকে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে বড় হতে দেখছিল দুর্গা। অবশ্য দেখছিল আর কতক্ষণ! সেই সাতসকালে তার স্কুলে যাওয়ার পর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া, দেখা হয় রাত সাড়ে আটটায়। সেই প্রৌঢ়া শুধু অতিরিক্ত স্নেহের কারণে মেয়ের পাশে ছায়ার মতো থাকেন। দুর্গা ফিরে এলে ফোন করলে তাঁর স্বামী এসে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

মেয়ে তখন রাতের খাওয়া শেষ করে গল্পের বই নিয়ে বিছানায়। বাথরুম থেকে একটু তাজা হয়ে বেরিয়ে এসে মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে বসে কয়েকদিন আগে দুর্গা শুনেছিল, "ওঃ, মাম। প্লিজ! আই অ্যাম স্লিপিং!"

"তুই তো বই পড়ছিস। একটু কথা বল!" দুর্গা মেয়ের গায়ে হাত বোলায়।

বই বন্ধ করে সাড়ে চার বছরের মেয়ে চোখ বন্ধ করে বলেছিল, "ওয়েল। আই অ্যাম ফাইন। নো প্রবলেম!" মেয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

ব্যবসায় ভারী অসুবিধা হয়, ইন্ডিয়া থেকে যে-সময়ের মধ্যে মালপত্র এসে যাওয়ার কথা, তা সেই সময়ে না এলে। বা এসে গেলেও নানা সরকারি ঝামেলায় ডেলিভারি না-পাওয়া গেলে। তখন দু'বেলা দোকান থেকে বেরিয়ে ছোটাছুটি করতে হয়। ডেলিভারি পেয়ে গেলে আবার কিছুদিনের জন্যে সমস্যা থাকে না। কিছুদিন হল দোকানের যে-দিকটায় কাস্টমাররা সাধারণত যায় না, সেদিকে একটা ছোট ঘর তৈরি করা হয়েছে প্লাইউডের পার্টিশন দিয়ে। সেখানে একটা মেশিন বসিয়ে একটা ক্যাসেট থেকে একের পর এক ক্যাসেটে ইন্ডিয়ান গানের কপি করে নিচ্ছে স্বামী। তারপর সেই সব সাদা ক্যাসেটের ওপর শিল্পীর নাম আর গানের কথা ছাপা কাগজ সেঁটে বাক্সবন্দি করে রাখছে। আমেরিকা এবং কানাডার বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা বাংলা গান পছন্দ করেন কিন্তু সহজে ক্যাসেট হাতে পান না, তাঁরা মুখিয়ে থাকেন। ক্যাসেট প্রতি যা খরচ হয়, তার ছ'গুণ লাভ হয় স্বামীর।

ব্যাপারটা যে অবৈধ, তা বোঝার পর স্বামীর সঙ্গে তর্ক করেছিল দুর্গা। এটা ঠিক হচ্ছে না। একটা ক্যাসেট কিনে এনে গোপনে জাল ক্যাসেট তৈরি করে বিক্রি একদম বেআইনি। স্বামী প্রথমে কথা বলতে চাইলেও দুর্গার উত্তেজনা দেখে চুপ করে গিয়েছিল। দুর্গা একটু থামলে জিজ্ঞাসা করেছিল, "এই দোকানে পলাশ কাজ করছে, সেটা কি বৈধ? আমেরিকায় এই মুহূর্তে নাগরিক নয় এমন লোক কত আছে। তুমি তোমার কাজ করো, কোনটা বৈধ আর কোনটা অবৈধ তা নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না।"

বিরক্ত হয়ে এ বিষয়ে কথা বলা বন্ধ করেছিল দুর্গা। এত বড় দোকানটা তাকেই সামলাতে হত পলাশের সাহায্য নিয়ে। কিছুদিন থেকে ছেলেটাকে একটু বেশি চুপচাপ বলে মনে হচ্ছিল। সবসময় অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। একটু রেগে গিয়ে দুর্গা তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কী হয়েছে বলো তো?"

মুখ নিচু করল পলাশ। উত্তর দিল না।

আরও বিরক্তবোধ করল দুর্গা। গলা উঁচু করে বলল, "কী হল?"

"আমি বলতে পারব না। মাপ করবেন," পলাশ বলল।

"কী এমন ঘটনা ঘটেছে, যা তুমি বলতে পারবে না!" জিজ্ঞাসা করল দুর্গা।

"কাকা আমার জন্যে একটা ভাল চাকরির ব্যবস্থা করেছে," অখুশি গলায় বলল পলাশ।

"তাই?" কপালে ভাঁজ পড়লেও স্বাভাবিক হতে চাইল দুর্গা, "এ তো ভাল কথা! তোমার তো আনন্দিত হওয়া উচিত। দুঃখ-দুঃখ মুখ করছ কেন? আমার অসুবিধে হবে বলে ভাবছ?"

পলাশ উত্তর দিল না। এখনও দিন সাতেক সময় আছে। তারপর তাকে চলে যেতে হবে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে। একা থেকে চাকরি করতে হবে।

ছোট ঘরে গিয়ে স্বামীকে ব্যাপারটা জানাল দুর্গা। শুনে কপালে ভাঁজ পড়ল স্বামীর। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "দেখি, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে," বলে আবার নিজের কাজে মন দিল স্বামী।

মেয়ের জন্যে কিছু জামাকাপড় কেনার প্রয়োজন ছিল। স্বামী তো আছেই, পলাশের ওপর কাস্টমার সামলানোর ভার কিছুক্ষণের জন্যে দিয়ে বেরিয়েছিল দুর্গা। বেলা বারোটা থেকেই এখানে প্রচুর ভিড় হয়ে যায় দোকানে দোকানে, রাস্তায়। অবশ্য বেশিরভাগই টুরিস্ট। বাংলাদেশের মানুষ সংখ্যায় ভারী, ইন্ডিয়ারও কিছু টুরিস্ট আছে। ফুটপাথে হাঁটতে হাঁটতে দোকানগুলো দেখতে বেশ লাগে দুর্গার। এখন বাতাসে বেশি না-হলেও একটা শিরশিরানি ভাব। রোদ চড়া হলেও সেটা যায়নি। দুর্গা লক্ষ করছিল, টুরিস্টরা তাকে দেখছে। আমেরিকার এই একমাত্র বাজার এলাকা, যেখানে আমেরিকানদের কদাচিৎ চোখে পড়ে। বেশিরভাগ মানুষ কেনাকাটায় ব্যস্ত। দুর্গা একটা বড় শপিং মলে ঢুকে বাচ্চাদের পোশাক দেখছিল। এই সময় একটি পুরুষকণ্ঠ খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, "এক্সকিউজ় মি!"

দুর্গা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একজন সুদর্শন পুরুষ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

পুরুষটি জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি বাঙালি?

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল দুর্গা।

"থ্যাঙ্ক গড। খুব ভাল হল। আমিও বাঙালি। আপনি কি বাংলাদেশের?"

আবার মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল দুর্গা।

"খুব ভাল হল। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন, প্লিজ়!"

"কী ব্যাপারে?" কথা বলল দুর্গা।

"আজ আমার সহকর্মীর মেয়ের জন্মদিন। একটা ভাল গিফট দিতে চাই তাকে। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করতে পারছি না। আসলে আমি মেয়েদের জিনিসপত্র তো কখনও কিনিনি। খুব সমস্যায় পড়েছি," পুরুষটি যে বিব্রত হয়ে আছে তা ওর কথা বলার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল।

"আমি কী করতে পারি?" প্রশ্ন করল দুর্গা।

"আমি, আমাকে যদি আপনি একটু সাহায্য করেন!"

মাথা নাড়ল দুর্গা, "যাকে দিতে চান তার বয়স কত?"

মাথা নাড়ল পুরুষটি। তারপর বলল, "এক মিনিট," বলে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে নম্বর টিপল। সাড়া পেয়ে বলল, "আমি সিরাজ বলছি। দাদা, একটু সাহায্য চাইছি। মেয়ের বয়স কত? ও, ঠিক আছে। রাখছি।" যন্ত্রটাকে বন্ধ করে পুরুষটি, যার নাম সিরাজ, সে বলল, "মেয়েটি আজ এগারো বছরে পড়ল।"

"ও," দুর্গা এগিয়ে গেল যেখানে বালিকাদের পোশাক ঝোলানো আছে। নানা রকমের বাহারি জামা হ্যাঙারে ঝুলছে। দেখতে দেখতে নিজের অজান্তে শ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। তার ছোট্ট মেয়ে এই বয়সেই কিছুতেই ফ্রক গায়ে চাপাতে চায় না। তার পছন্দ ছেলেদের শার্ট-প্যান্ট।



একটা সেট পছন্দ করে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল, "ওর গায়ের রং কী রকম?"

"গায়ের রং? সর্বনাশ! আমি তো তাকে কখনও দেখিনি।"

"গায়ের রং না জানলে কোন জামা মানাবে তা ঠাওর করা কি সম্ভব?" দুর্গা হেসে জিজ্ঞাসা করল।

"এই রে!" বিব্রত দেখাল সিরাজকে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "কোনও একটা নিরপেক্ষ রং নেই যা যে-কোনও গায়ের রঙের সঙ্গে মানিয়ে যেতে পারে! আমি তো মেয়েটিকে কখনও দেখিনি। এইমাত্র কথা বললাম ওর বাবার সঙ্গে। আবার গায়ের রং জানার জন্যে ফোন করা কি শোভন হবে!"

খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা। দুর্গা বেছে বেছে দুটো আলাদা রঙের জামা বের করল যা যে-কোনও মেয়ে পরতে পারে। বলল, "বোধহয় এই দুটো ভাল লাগবে। যে কোনও একটা নিতে পারেন।"

"আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব..." সিরাজ বলল।

"এ মা! এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনি ভাবছেন কেন?" দুর্গা বলল।



"বেশ। এর একটাই নিয়ে নিই," সিরাজ বলতেই দুর্গা চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে মেয়ের জন্যে পছন্দসই জামা দেখতে না-পেয়ে ধীরে ধীরে দোকান থেকে বেরিয়ে এল।

নিউ ইয়র্ক তো বটেই গোটা আমেরিকায় এই একমাত্র জায়গা, যেখানে ফুটপাথে দাঁড়ালেই বাংলা কথা শোনা যায়। অবশ্য কিছু বাঙালি চেষ্টা করেন কায়দা করে ইংরেজিতে কথা বলতে। বেশির ভাগই হোঁচট খান। শুনতে বেশ মজা লাগে দুর্গার।

"আপনি আমাকে খুব সাহায্য করলেন," বলতে বলতে পাশে এসে দাঁড়াল সিরাজ। তার হাতে সদ্য কেনা জামার প্যাকেট।

"মেয়েদের পোশাক ছেলেরা কিনতে অস্বস্তি বোধ করে। বাড়ির মেয়েদের বললে আপনাকে সমস্যায় পড়তে হত না," দুর্গা হাসল।

"আমেরিকায় আমি একা। আত্মীয়রা দেশে আছেন।"

"বেড়াতে এসেছেন?"

"না না। চাকরির সুবাদে এসেছি। ঢাকার একটা বড় ফার্মে চাকরি করতাম। ওরাই এখানে পাঠিয়েছে পাঁচ বছরের জন্যে। আপনিও তো বাংলাদেশ থেকে এসেছেন," সিরাজ হাসল।

"কী করে বুঝলেন? কলকাতা থেকেও তো আসতে পারি।"

"আপনার বাচনভঙ্গি থেকে। কিছু যদি মনে না-করেন, আপনার নামটা জানতে পারি?"

"আমি দুর্গা। আচ্ছা, চলি," পা বাড়াল দুর্গা।

দু'দিন বাদে দোকান থেকে বেরনোর আগে স্বামী হাসতে হাসতে বলল, "তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি।"

কথা না-বলে চোখ কুঁচকে তাকাল দুর্গা।

"পলাশ আমাদের যে-সমস্যায় ফেলেছিল, সেই সমস্যা থেকে সে নিজেই উদ্ধার করেছে আমাদের। ওঃ, খুব চিন্তায় পড়েছিলাম," স্বামী বলল।

স্বামীর আপাদমস্তক দেখল সে। ভারমুক্ত মানুষকে যেমন দেখায়, তেমনই দেখাচ্ছে ওকে।

স্বামী বলল, "তোমার সামনে বেচারা লজ্জায় বলতে পারছিল না।"

দুর্গা জানে একটু আগে পলাশকে কয়েকটা জিনিস কিনতে বাইরে

পাঠিয়েছে স্বামী। সে কৌতুক বোধ করল, "আমার সামনে লজ্জা!"

মাথা নাড়ল স্বামী। নিজের পোশাকটা যে কতদিন পালটায়নি তা স্বামী বোধহয় নিজেই জানে না। ওর তুলনায় পলাশ আজকাল বেশ ধোপদুরস্ত পোশাক পরে দোকানে আসছে। স্বামী বলল, "পলাশ প্রেমে পড়েছে।"

"তোমাকে বলেছে?" একটু অবাক হল দুর্গা।

"বলতে কি চায়? চেপে ধরলে বলতে বাধ্য হল।" স্বামী বলল, "মাইনে না-বাড়ালে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মেয়েটিরও কিছু সমস্যা আছে। অন্তত এক বছর অপেক্ষা করতে হবে বিয়ের জন্যে। এখন ওই মেয়েটিকে নিউ ইয়র্কে একা রেখে চাকরি নিয়ে দূরে চলে যেতে ওর একদম ইচ্ছে করছিল না।"

"আশ্চর্য! এটা ওর সমস্যা। আমরা কী করব?" বিরক্ত হল দুর্গা।

"তা ঠিক, তবে পলাশ অন্য শহরে চলে গেলে আমরা যে বিপদে পড়ব, তাও খুব সত্যি কথা। শেষপর্যন্ত ও যখন আমাকে প্রস্তাবটা দিল, তখন ভেবে দেখলাম এটা সব দিক দিয়ে ভাল হবে," স্বামী বলল।

মাথা নাড়ল দুর্গা, "আজকাল তুমি বড্ড পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলো।"

স্বামী মুখ তুলে দুর্গাকে দেখল। তারপর বলল, "পলাশ প্রস্তাব দিয়েছে, আমরা যদি ওর বান্ধবীকে এই দোকানে চাকরি দিই, তাহলে ওর খুব উপকার হবে।"

"কী রকম?"

"মেয়েটা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দোকানের কাজে ব্যস্ত থাকবে। ওর একটা রোজগারও হবে। কাজ বা রোজগার নেই বলে এখন যেসব সমস্যা হচ্ছে, তা হবে না।"

"ওর কে কে আছে এখানে?"

"মাসির বাড়িতে থাকে। যশোরের মেয়ে।"

"দ্যাখো।" একটু থেমে দুর্গা বলল, "তুমি, যা ভাল বোঝো তাই করো।"

"তুমি একবার মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে দ্যাখো।"

স্বামীর কথাটা মেনে নিল দুর্গা। বলল, "ঠিক আছে, কাল আসতে বলো।"

বাইরে বেরিয়ে মিনিট দুয়েক হাঁটতেই দুর্গা দেখল সিরাজ একটা দোকানের সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। এই তল্লাটে ওকে আগে কখনও দ্যাখেনি সে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, "জামা পছন্দ হয়েছে?"

"খুউব," এগিয়ে এল সিরাজ, "দূর থেকে দেখে আমি তো ভাবতেই পারিনি আপনি আমাকে মনে রেখেছেন। অনেক ধন্যবাদ।"

"এখন এই পাড়ায়? কেনাকাটা করতে এসেছেন নাকি?" হাসল দুর্গা।

"না না," মাথা নাড়ল সিরাজ, "দেশে থাকতে গাড়ি চালাতাম। এখানে এসে তার প্রয়োজন হয়নি বলে চেষ্টা করিনি। কিন্তু অফিস থেকে বলেছে এখানে যাতে গাড়ি চালাতে পারি সে জন্যে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্যে আবেদন করতে। ওই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছিলাম।"

ড্রাইভিং লাইসেন্স! মনে মনে হেসে ফেলল দুর্গা। আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর নিয়ে কী লাভ। সিরাজ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি নিশ্চয়ই ড্রাইভিংয়ে অভ্যস্ত!"

"আমি? নাঃ। বাংলাদেশে যখন ছিলাম, তখন তো সুযোগই ছিল না। আর এখানে আসার পর..." কথা শেষ করল না দুর্গা। সে যে প্রায় গৃহবন্দি হয়ে ছিল তা লোকজনকে বলে কী লাভ!

"ড্রাইভিংটা শিখে নেওয়া উচিত। অন্তত আমেরিকায় বাস করার সময় এটা শেখা থাকলে বেশ কাজে লাগে," সিরাজ বলল।

"কিন্তু শিখে কী করব? আমার নিজের তো গাড়ি নেই।"

"আজ নেই, কাল হবে না তা তো কেউ বলতে পারে না। প্রয়োজনের সময় শেখাটা খুব কাজে লাগবে। তাই বলি, ড্রাইভিংটা শিখে নিন," সিরাজ বলল।

উদ্বেলিত হল দুর্গা। ঢাকায় যখন ছিল, তখন কল্পনাও করেনি সে গাড়ি চালাবে। তার ওপর সেই গাড়ি চালানোটা যদি আমেরিকায় হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

"কী ভাবছেন?" সিরাজ জিজ্ঞাসা করল।

"ইচ্ছে তো হচ্ছে। কিন্তু সময় বের করে গাড়ি চালানো শেখা কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে! কিন্তু কোথায় যেতে হবে?"

"কাছেই। বেশ বড় গাড়ি চালানোর স্কুল আছে। ওরাই গাড়ি দিয়ে শেখানোতে সাহায্য করে। তার জন্যে খুব বেশি চার্জও করে না," সিরাজ বলল। তারপর পকেট থেকে একটা ছাপা কাগজ বের করে এগিয়ে ধরল, "এটা রাখুন। এই লিফলেটে সব কিছু বিস্তারিত লেখা আছে। রোজ এক ঘন্টা ওদের কোচিং নিলেই দু'সপ্তাহেই লাইসেন্স পেয়ে যাবেন। এই ঠিকানায় কাল বিকেল পাঁচটায় যদি আসতে পারেন তাহলে ভাল হয়, আমি থাকব," সিরাজ বলল।

মাথা নেড়ে চলেছিল দুর্গা।

খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু স্বামীকে বলতে খুব সংকোচ হচ্ছিল দুর্গার। এই গাড়ি চালানো ব্যাপারটা নিয়ে স্বামীও কখনও মাথা ঘামায়নি। ওকে বললে যে মুখের ওপর না শুনতে হবে তার নব্বইভাগ সম্ভাবনা আছে। ঘোড়া নেই লাগাম কিনে কী হবে বলে হেসে উড়িয়ে দেবে। বাড়িতে ফিরে এসে সে কাগজটা পড়ল। সকাল সাড়ে আটটা থেকে কোচিং আরম্ভ হয়। প্রতিদিন ওরা এক ঘন্টা সময় দেয়। দেখে খুশি হল দুর্গা। সে দোকানে যাওয়ার আগেই এক ঘন্টা ড্রাইভিং শিখতে পারবে। ব্যাপারটা স্বামীকে বলার কোনও প্রয়োজন হবে না। সেই সঙ্গে আর-একটা কথা ভেবে খুশি হল দুর্গা। ব্যাপারটা সে সিরাজকে না-জানিয়েও করে নিতে পারে। তারপর যখন শেখা হয়ে যাবে, গাড়ি চালানোর লাইসেন্স পাবে তখন সিরাজকেও চমকে দেবে সে।

যেদিন শেষ হল শিক্ষানবিশি, পরীক্ষা দিয়ে সাময়িক লাইসেন্স পাওয়া গেল গাড়ি চালানোর, সেদিন মন আনন্দে আটখানা। সকালে যখন স্বামী তৈরি হচ্ছে তখন সে বলে ফেলল, "আজ আমি ওবেলায় দোকানে যাব।"

"বুঝতে পেরেছি, কেনাকাটা করতে যাবে। ঠিক আছে," স্বামী বলল।

"একটা অনুরোধ করব?"

"অবশ্যই," স্বামী জামার বোতাম লাগাচ্ছিল।

"তুমি এই প্যান্ট আর শার্ট কবে শরীরে তুলেছিলে?" জিজ্ঞাসা করল দুর্গা।

প্রশ্ন শুনে থমকে গেল স্বামী। তারপর বলল, "আবার..."

"হ্যাঁ, আবার! লোকে যখন জিজ্ঞাসা করে ওই লোকটি আপনার স্বামী নাকি, তখন হ্যাঁ বলতে আমার খুব লজ্জা লাগে," দুর্গা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কথাগুলো বললেও জানে, এতে কোনও কাজ হবে না। যে-লোকটা মাসে দু'দিন দাড়ি কামায় তাকে কে শোধরাবে।

একটাই শুধু পরিবর্তন হয়েছে। প্রচুর বলার পর সে করাতে পারেনি, মেয়ের জেদাজেদিতে বাবা তা করতে বাধ্য হয়েছে। দোকান থেকে হাঁটার দূরত্বে আট মিনিটের মধ্যে একটা তিন কামরার ফ্ল্যাট ইনস্টলমেন্টে কিনে ফেলেছে। ফ্ল্যাটের মালিকানা পাওয়া যাবে দিন চারেক পরে। এতে মেয়ে যত উৎফুল্ল, বাবা তত বিমর্ষ। দুর্গা এটুকু বুঝে খুশি, এখন থেকে একটু স্বস্তিতে থাকা যাবে।

আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফুরফুরে পায়ে ড্রাইভিং স্কুলে চলে এল দুর্গা। কথা বলে একদিনের জন্যে গাড়ি ভাড়া নিল সে। গাড়ির সামনে পেছনে লার্নার বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়ার পর যে-চমক সে চমকাল, এই জীবনে আগে কখনও সেই অভিজ্ঞতা হয়নি।

"অভিনন্দন," একমুখ হাসি নিয়ে বলল সিরাজ।

"খুব চমকে দিয়েছেন আমাকে।" দুর্গা বলল।

"যদি এটা খারাপ অর্থে হয় তাহলে ক্ষমা চাইছি।"

"আশ্চর্য ব্যাপার। আপনি সব জানতেন?" দুর্গা জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ। এরাই বলেছিল। আপনি নাকি খুব দ্রুত ড্রাইভিং শিখতে

পেরেছেন। কোনও ভুল না-করে লাইসেন্স পাওয়ার পরীক্ষায় পাশ করেছেন।"

"এসব খবর আপনি রাখতেন?" বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছিল দুর্গার।

"ওই আর কী!"

"আপনার লাইসেন্সের সমস্যা মিটে গেছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," সিরাজ মাথা নাড়ল, "গাড়ি নিয়ে ট্রায়াল দেবেন, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। আজ আপনার অফিস নেই?"

"আছে। কিন্তু আমি ছুটি নিয়েছি। চলুন, দেরি না-করে যাওয়া যাক। কোনদিকে যাবেন?"

গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে দুর্গা বলল, "আপনি বলুন।"

নিউ ইয়র্কের রাস্তায় সে গাড়ি চালাচ্ছে। হোক আজ ছুটির দিনের সকাল, রাস্তায় যানবাহন কম, তবু এই প্রথম পাশে ট্রেনার নেই, হাতে স্টিয়ারিং। অবশ্য এইসব গাড়িতে ক্লাচ থাকে না, শুধু গতি কমানো-বাড়ানো আর ব্রেকে সময়মতো পায়ের চাপ দিলেই সমস্যা এড়ানো যায়। তবু ট্রেনার ছাড়া এই প্রথম গাড়ি চালানো, হাঁটু যেন দুর্বল হয়ে পড়ছিল। সামনের গাড়িটাকে ওভারটেক করতে সাহস হচ্ছিল না দুর্গার। ব্যাপারটা লক্ষ করে সিরাজ বলল, "প্রথম দিনে খুব ভাল চালাচ্ছেন!"

দুর্গা কিছু না-বলে হাসল।

সিরাজ বলল, "ক্লাচ না-থাকায় দেশের তুলনায় এখানে গাড়ি চালানো অনেক সহজ। আচ্ছা, আমরা কোথায় যাচ্ছি!"

"কোথাও যাব বলে তো বের হইনি। আজ আমি ট্রেনার ছাড়া গাড়ি চালাব বলে ঠিক করেছিলাম," সোজা হয়ে বসে রাস্তায় চোখ রেখে বলল দুর্গা।

"খুব ভাল চালাচ্ছেন।"

"ধন্যবাদ," বলেই খেয়াল হল দুর্গার, "আপনি কিছুক্ষণ চালাবেন?"

"না না, আজ আপনার প্রথম দিন, আপনি চালান।"

"আপনি এখানে একা চালিয়েছেন!"

"দরকার হয়নি। দেশের অভ্যেসটা এখনও ভুলে যাইনি," সিরাজ বলল।

আরও কিছুক্ষণ গাড়ি চালানোর পরে দুর্গা বলল, "আমার মনে হচ্ছে আমরা শহর থেকে বেশ কিছুটা বাইরে চলে এসেছি, তাই না?"

"তাই তো মনে হচ্ছে। আমি এই পথ দিয়ে মাত্র একবারই গিয়েছিলাম, নিউ ইয়র্ক থেকে ঘন্টা দুই-সওয়া ঘন্টা দূরে অ্যাটলান্টিক সিটিতে। আপনি গিয়েছেন ওখানে? দারুণ ইন্টারেস্টিং জায়গা," সিরাজ তাকাল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জায়গাটার নাম আমি শুনেছি। কখনও যাওয়া হয়নি," মাথা নাড়ল দুর্গা, "ওখানে গেলে বিকেলের মধ্যে ফিরে আসতে পারব?"

ঘড়ি দেখল সিরাজ। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "অনায়াসে।"

"তাহলে আপনি এখন গাড়িটা চালান। ফেরার সময় আমি চালাব।"

গাড়ি একপাশে থামাল দুর্গা। দু'জনে জায়গা বদল করে নিলে সিরাজ গাড়ি চালু করে জিজ্ঞাসা করল, "দেশ থেকে টুরিস্টরা নিউ ইয়র্কে বেড়াতে এলে অ্যাটলান্টিক সিটিতে ক্যাসিনো দেখতে যাবেই। আর আপনি এখানে থেকেও ওখানে যাননি?"

উত্তর দিতে খারাপ লাগলেও দুর্গা বলল, "যাওয়া হয়নি, এই আর কী!"

"আমাদের দেশে তো প্রকাশ্যে কোনও রকম জুয়াখেলা বেআইনি। কিন্তু এখানে, এই অ্যাটলান্টিক সিটিতে আর ওয়েস্ট কোস্টের শহর লাস ভেগাসে আইনসম্মত ক্যাসিনো আছে, যেখানে সবাই জুয়া খেলতে যায়," সিরাজ বলল।

"সর্বস্বান্ত হয়ে যায় না?" তাকাল দুর্গা।

হাসল সিরাজ, "যারা সাঁতার জানে, তারা তো জলে ডুবে যায় না। যারা জানে না, মুশকিল হয় তাদেরই," তারপর একটু থেমে বলল, "ক্যাসিনোতে গিয়ে জুয়া খেলার কী দরকার, ব্যাপারটা দেখে আসাই ভাল।"

দুর্গার যে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল না, তা নয়। খুব সাধারণ পরিবারের মেয়ে এবং বউ হয়ে ক্যাসিনোতে জুয়ার আড্ডায় যাওয়াটা কি শোভন হচ্ছে! ওটা যদি নিষ্পাপ বেড়ানোর জায়গা হত, তাহলে তো এতগুলো বছরে স্বামী তাকে দেখাতে নিয়ে যেত। কিন্তু অস্বস্তির সঙ্গে কৌতূহলও হচ্ছিল তার। টুরিস্টরা যখন যায়, তখন তাদের মধ্যে বাড়ির মেয়ে-বউও থাকে, সেই টুরিস্টদের মধ্যে বাংলাদেশের মেয়ে-বউরাও থাকবে না এমন তো নয়, তাহলে ওরা যদি যেতে পারে তাহলে সে-ও একঝলক দেখে আসতে পারে।

"আপনার খিদে লাগলে বলবেন," গাড়ি চালাতে চালাতে সিরাজ বলল।

"আশেপাশে কোনও ঘরবাড়ি নেই, খাবারের দোকান কোথায় পাবেন!"

"এগজিট দিয়ে ঢুকলেই পেয়ে যাবেন।"

"ও! না, আমার খিদে পায়নি। আপনার পেলে বলুন," দুর্গা বলল।

"একযাত্রায় পৃথক ফল হয় নাকি! চলুন, ওখানেই খাওয়া যাবে।"

এক প্রকাণ্ড এবং অদ্ভুত জুয়ার জগৎ দেখল দুর্গা। বিশাল হলঘরে সাজানো স্লট মেশিনের সামনে বসে এই সকালবেলায় প্রবীণ-প্রবীণারা জুয়া খেলে চলেছে। বিভিন্ন মেশিন থেকে কয়েন পড়ার ঝনঝন শব্দ যেন কানের পরদায় ধাক্কা মারছে। সিরাজের পাশে মেশিনগুলোর মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রথমে যে-কথাটা দুর্গার মনে এল তা হল, এদের কোনও কাজ নেই! জীবনের যাবতীয় সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসে স্লট মেশিনের নেশায় ডুবে যাওয়াই এদের একমাত্র আনন্দ! একটি মেশিনের সামনে এক বৃদ্ধাকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে শুনল দুর্গা। দু'হাত মাথায় তুলে তিনি চেঁচাচ্ছেন, "জ্যাকপট, জ্যাকপট!"

সিরাজ সেদিকে তাকিয়ে বলল, "লাকি মহিলা। প্রচুর ডলার পেয়ে গেলেন।"

"কত?" জিজ্ঞাসা করল দুর্গা।

"জানি না। নিশ্চয়ই অনেক। নইলে ওইভাবে এই বয়সে কেউ চিৎকার করেন না। অবশ্য কত টাকা হারার পর আজ জ্যাকপট পেলেন তা জানি না। কী ইচ্ছে, একবার খেলে দেখবেন নাকি?" সিরাজ তাকাল।

"আপনার ইচ্ছে হলে খেলুন।"

"অনুমতি দিচ্ছেন?" হাসল সিরাজ।

"আশ্চর্য! আমি অনুমতি দেওয়ার কে!" মুখ ঘোরাল দুর্গা।

"আপনি একটু অপেক্ষা করুন, প্লিজ," দ্রুত বাঁদিকে চলে গেল সিরাজ। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে একটা খালি মেশিনের সামনের টুলে বসে বলল, "আমি ঠিক পাঁচ ডলার হারব।"

"হারবেন কেন? জিততে পারবেন না?"

"দেখি, পারি কিনা," দশটা কয়েনের প্রথমটা গর্তে ফেলতেই শব্দ বাজল। তারপর চারটে কয়েন বের হয়ে এল। হাসতে হাসতে সিরাজ বলল, "আপনি আমার গুড লাক। প্রথমেই দেড় ডলার জিতলাম।"

দুর্গা অবাক হল। এত সহজে দেড় ডলার জিতে গেল সিরাজ? ওই দেড় ডলারের জন্যে কত পরিশ্রম করতে হয় মানুষকে।

সিরাজ বলেছিল সে ঠিক পাঁচ ডলার হারবে। পাঁচ ডলার দিয়ে কিনে আনা কয়েন যন্ত্রের পেটে ঢুকিয়েও কোনও ফল না-পাওয়ায় উঠে দাঁড়াল সিরাজ, "যাক, আমার কোটা শেষ। চলুন।"

"মানে?" চোখ বড় করল দুর্গা, "আপনি পাঁচ ডলার হেরে গেলেন?"

"এটাকে হার বলবেন না। রবীন্দ্রনাথের গান আছে, জেনে শুনে বিষ করেছি পান, এটা সেই রকম। চলুন," পা বাড়াল সিরাজ।

দুর্গা দু'পাশে তাকাল, এর মধ্যে আরও ভিড় বেড়ে গেছে বিভিন্ন টেবিলে। সে জিজ্ঞাসা করল, "এই এখানে এত লোক খেলছে, এদের বেশির ভাগই হারছে?"

"সেটাই তো স্বাভাবিক। নইলে এত বড় ক্যাসিনো চালাবে কী করে! লোক জেনেশুনে এখানে বিষ পান করতে আসে," হাসল সিরাজ।

অবাক হয়ে তাকাল দুর্গা। তার মেজপিসি রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে থাকেন। প্রায়ই তাঁর অনুষ্ঠান থাকে। তার নিজের গলায় নাকি সুর ঠিকঠাক লাগে না কিন্তু মেজপিসির গানের সে খুব ভক্ত।

"কী হল?" দাঁড়িয়ে পড়া দুর্গার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল সিরাজ।

"আপনি রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত, তাই না?"

"বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে কি থাকা যায়! চলুন," পা বাড়াল সিরাজ। এবং এই মানুষটাকে আচমকা খুব পছন্দ হয়ে গেল দুর্গার।

সমুদ্রের ধারের বাঁধানো রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুর্গা দেখল সার সার অনেক অনেক ক্যাসিনো। সিরাজ বলে যাচ্ছিল, "এইসব ক্যাসিনো চব্বিশ ঘন্টাই খোলা থাকে। মানুষ এখানে আসে উত্তেজনার আগুন পোহাতে," তারপর একটু থেমে বলল, "চলুন, একটু খাওয়াদাওয়া করা যাক।"

একপাশে সমুদ্র অন্য পাশে ক্যাসিনোর সামনের বাঁধানো রাস্তা, মাঝখানে সুন্দর সাজানো রেস্তোরাঁগুলোতে এই সময়েই খাদ্যরসিকদের ভিড় জমে গেছে। দুর্গার অনুমান, সে চাইলেও সিরাজ তাকে খাবারের দাম দিতে দেবে না। এক্ষেত্রে নিজের পছন্দের খাবার খেতে না-চেয়ে সিরাজের পছন্দের ওপর নির্ভর করাই ভাল।

তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে সিরাজ যখন খাবার আনতে গিয়েছে তখন আচমকা দুর্গার মনে পড়ল, এরকম বড় রেস্তোরাঁয় তাকে নিয়ে স্বামী কখনও খেতে যায়নি। যাওয়ার কথা মনেই আসেনি ওর। অদ্ভুত ওই মানুষটা, সারা জীবন নিজের তৈরি বৃত্তের মধ্যেই মুখ বুজে রইল। এমনকী লোকটা ওর নিজের মেয়েকে নিয়েও বড় রেস্তোরাঁয় খেতে যাওয়ার কথা ভাবেনি। দূর থেকে সিরাজকে খাবার বয়ে নিয়ে আসতে দেখে দুর্গা ঠিক করল, সামনের রবিবারে সে স্বামীকে বলবে মেয়েকে নিয়ে বড় রেস্তোরাঁয় খেতে যেতে। স্বামী যদি যেতে অসুবিধে বোধ করে, তাহলে সে মেয়েকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আনবে। এইরকম ভাবার পরে বেশ স্বাভাবিক বোধ করল দুর্গা।

সিরাজ দুটো প্লেট টেবিলে রাখলে দুর্গা হাত নাড়ল, "ওরে বাবা! আমি এত খাবার খেতে পারব না। আপনি অর্ধেক নিয়ে নিন।"

সিরাজ হাসল, কিছু বলল না।

নতুন ফ্ল্যাটে বাবা-মা এবং মেয়ের জন্যে আলাদা আলাদা ঘর বরাদ্দ হল।

এই ব্যবস্থায় মেয়ে যে খুব খুশি হয়েছে তা তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। ওই ঘরটিকে সে নিজের জগৎ কল্পনা করে নিল। রোজ সকালে বাবা তাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যায়। স্কুল ছুটি হলে সেই প্রবীণা, যার সঙ্গে প্রায় জ্ঞান হওয়ার পর থেকে স্কুলে যাতায়াত করছে সে, বাড়িতে পৌঁছে সঙ্গ দেন দুর্গা ফিরে না-আসা পর্যন্ত। প্রবীণা অবাক হয়ে দেখেন মেয়েটিকে। ওর মধ্যে শিশুসুলভ কোনও চালচলন নেই। স্কুলের লাইব্রেরি থেকে সে তিন-চার ক্লাস উঁচুতে যেসব বই পড়ানো হয়, সেই বইয়ের কয়েকটা বাড়িতে এনে খুব খুশি হয়েছে। কারণ, সেই সব বই পড়ে অর্থ বুঝতে তার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। উলটে নিজের ক্লাসের বইগুলোকে খুব জোলো বলে মনে হচ্ছিল তার। এখন তার বয়স সাত। এই বয়সে সে ক্লাস সেভেনের অঙ্ক অনায়াসে করতে পারে। যখন পড়তে বসে, তখন সেই প্রবীণাকে সামনে বসিয়ে ইংরেজি ভাষায় অনর্গল নিজের পরীক্ষা নেয়। প্রবীণা যত শোনেন, তত মুগ্ধ হন। মেয়েটির ইংরেজি উচ্চারণ বাঙালিদের মতো নয়। বেশির ভাগ শব্দই অবোধ্য থাকে তাঁর কাছে। তবু শুনতে এবং মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে তাঁর খুব ভাল লাগে।

পরীক্ষার পর আবার অভিভাবকদের ডাক পড়ল স্কুলে। স্কুলের সেক্রেটারি এবং প্রিন্সিপাল দুর্গা এবং তার স্বামীকে নিয়ে আলাদা কথা বললেন। তাঁদের ধারণা, এই মেয়েটি অতি অসাধারণ মেধার মেয়ে। তাঁদের স্কুলে এই রকম কোনও ছাত্রী বা ছাত্র আজ অবধি পড়াশোনা করেনি, যার এতখানি মেধা আছে। তাকে আরও দু' ক্লাস উঁচুর সিলেবাস থেকে প্রশ্ন করা হবে। যদি তার উত্তর সন্তোষজনক হয়, তাহলে ওকে উঁচু ক্লাসে প্রোমোট করতে কোনও অসুবিধে নেই।

মেয়ে যে অনেকটাই অন্যরকম, তা বেশ কিছুদিন ধরে বুঝতে পারছিল দুর্গা এবং তার স্বামী। সাত বছরের মেয়ে শেক্সপিয়রের নাটকের সংলাপ স্মরণে রেখে কথা বলে কী করে তা ভেবে পান না তার শিক্ষকরা। সেই কথা তাঁরা মেয়ের বাবা-মাকেও বলেছেন।

মেয়ে যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ নাওয়া-খাওয়ার সময়টুকু বাদ দিলে সামনে বই ছাড়া বসে থাকে না। দুর্গার অবাক লাগে, এই এতটুকু মেয়ে কী করে জীবনের অনেক জটিল সমস্যা যে-লেখায় রয়েছে তা অবলীলায় পড়ে যায়। পড়ে মনে রাখে।

মেয়ের এই ব্যাপারটা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছিল দুর্গা। বলেছিল, "ওর টিচারও বলেছে, এটা খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার।"

মাথা নেড়েছিল স্বামী, সত্যি কথা! বয়সের আগে যদি ফল পেকে যায়, তাহলে তার কোনও স্বাদ থাকে না। কিন্তু কী করা যায় তাই বুঝতে পারছি না। ও নতুন ক্লাসে ওঠার দুই মাসের মধ্যেই সব পড়া শেষ করে যদি বসে থাকে, তাহলে বাকি দশ মাস কী করবে? তাই ওরা আরও দু'ক্লাস ওপরে তুলে দিতে চাইছে যাতে পুরো বছরটা পড়াশোনা নিয়ে থাকতে পারে। এরকম ঘটনা কখনও শুনিনি।"

"ওকে যদি ঢাকার স্কুলে ভরতি করা হয় তাহলে লাভ হবে? তুমি তো বলতে দেশের পড়াশুনার স্ট্যান্ডার্ড এখানকার চেয়ে অনেক ভাল," দুর্গা রাস্তা হাতড়াচ্ছিল।

"হতে পারে। কিন্তু মেয়েকে আমেরিকার স্কুল থেকে সরিয়ে বাংলাদেশের স্কুলে ভরতি করলে লোকে আমাদের পাগল বলবে। যা হবার তা এখানেই হোক। আরে বাবা, মেয়ে তো পড়াশোনায় খুব ভাল বলেই স্কুল থেকে ওকে অন্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই না?" কথা শেষ করেছিল স্বামী।

সাত বছরের মেয়ের দিকে তাকালে নিজের মেয়ে বলে মনে হয় না মাঝেমাঝে। দুর্গা ওর পাঠ্যবইয়ের বাইরের বইগুলো উলটে পালটে দেখে আর ভাবে এইটুকু মেয়ে কী করে এতখানি মেধা পেল!

অনেক ভেবে সে স্বামীকে বলল, "ওকে নিয়ে আমাদের একবার বাংলাদেশটাকে দেখিয়ে আনা উচিত। আমেরিকায় জন্মেছে বলে ও এদেশের নাগরিকত্ব পেয়ে গেছে কিন্তু ওর দেশ তো বাংলাদেশ।"

"তুমি কী বলতে চাও?" স্বামী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"একবার ওকে ওর দেশটাকে দেখিয়ে আনা উচিত," দুর্গা বলল।

কপালে ভাঁজ পড়ল স্বামীর। তারপর বলল, "আমাদের দু'জনের পক্ষে তো একসঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে যাওয়া সম্ভব নয়। হয় তোমাকে যেতে হবে নয় আমাকে। ওর স্কুল ছুটি থাকলে সেটা সম্ভব।"

"তুমিই ওকে নিয়ে ঘুরে এসো," দুর্গা বলল।

"আমি? মেয়ে আমার সঙ্গে যেতে চাইবে তো!"

"তোমার সঙ্গে না-গেলে আমার সঙ্গেও যাবে না," দুর্গা বলেছিল, "জোর করলে হয়তো মেয়ে যাবে কিন্তু দেশের জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গেও কি মানিয়ে নিতে পারবে? না পারুক, একবার জেনে আসা উচিত," বেশ ভেবেচিন্তে বলেছিল দুর্গা।

কিন্তু মেয়ে প্রস্তাব শোনামাত্র একটাই প্রশ্ন করেছিল, "হোয়াই?" দুর্গা বলেছিল, "মানে? আমরা কোত্থেকে এসেছি, আমাদের আত্মীয়স্বজন কারা, তা জেনে আসা প্রত্যেক মানুষের উচিত, তাই যাবি।"

"রুটস, আমার রুটসের কথা বলছ!"

"হ্যাঁ, তাই," দুর্গা জোরের সঙ্গে বলেছিল।

হেসেছিল মেয়ে, পরিষ্কার ইংরেজিতে বলেছিল, "সেটা জানবার জন্যে আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার কী দরকার! এই তোমাদের দু'জনকে তো দু'বেলা দেখছি। তাছাড়া সেই জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তো আন্টিকে দেখে আসছি। আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের তিনজনকে দেখলেই বাংলাদেশ দেখা হয়ে যায়।"

কথা খুঁজে পায়নি দুর্গা। স্বামীও আর এই ব্যাপার নিয়ে কথা তোলেনি। মেয়ে স্কুলের দুই ধাপ ডিঙিয়ে গিয়েছিল অবলীলায়।

ঢাকা থেকে ছোট দেওর ফোন করেছিল। খুব বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, "কাল রাত থেকে মায়ের বুকে খুব ব্যথা করছিল। আজ ভোরবেলায় হাসপাতালে ভরতি করেছি। কিন্তু কাল থেকে শুধু দাদাকে দেখতে চাইছে। দাদাকে দাও।"

দুর্গা বলেছিল, "তোমার দাদা একটু দরকারে বাইরে গিয়েছে। কিন্তু মা এখন কেমন আছেন?"

দেওর বলেছিল, "ভাল না বউদি। তোমরা তো মাকে ভুলেই গিয়েছ, মা কিন্তু ভোলেনি। দাদাকে বলবে, যদি একবার আসে, তাহলে ভাল হয়। মা শান্তি পাবে দাদাকে দেখে। রাখলাম।"

শাশুড়ি মানুষটি নিপাট ভালমানুষ। খুব অসুস্থ না-হলে পয়সা খরচ করে দেওর ফোনটা করত না। দুর্গার মনে হল, একটুও দেরি না-করে আজই স্বামীর ঢাকার বিমান ধরা উচিত।

স্বামী ফিরে এলে ব্যাপারটা জানাল সে।

চোখ ছোট করে ভাইয়ের বলা কথাগুলো শুনল স্বামী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক কী হয়েছে তা বলল?"

"বুকে ব্যথা নিয়ে হসপিটালাইজড হয়েছেন যখন... তোমাকে খুব দেখতে চাইছেন। আর দেরি না-করে আজই তোমার চলে যাওয়া উচিত," দুর্গা বলল।

স্বামীকে যেন একটু বিমর্ষ দেখাল। এবং শেষপর্যন্ত ব্যবসার ব্যাপারে দুর্গাকে অনেক সতর্ক করে অভাবনীয়ভাবে অল্প দামের একটা টিকিট জোগাড় করে রওনা হয়ে গেল।

স্বামী চলে যাওয়ার পর দুর্গার মনে হচ্ছিল বিরাট বোঝা আচমকা তার ঘাড়ে চেপে বসেছে। ভাগ্যিস তাকে মেয়ের পেছনে সময় দিতে হয় না। ওই বয়স্ক মহিলাই খুব যত্নের সঙ্গে মেয়ের দেখাশোনা করে চলেছেন।

দোকানে এখন কোনও পুরুষ নেই। পলাশের জায়গায় কাজ করছে ওর বান্ধবী। মেয়েটি খুব শান্ত। নাম দিলারা। কাজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পরে বাড়িতে ফিরে এসে স্বামী বলেছিল, "এই দিলারা মেয়েটি মনে হয় মন্দ নয়।"

"কী করে বুঝলে?" দুর্গা জিজ্ঞাসা করেছিল।

"হাতটান নেই এটা বুঝতে পেরেছি। তাই ভরসা করা যাবে।"

স্বামী ঢাকায় চলে গেলে দুর্গা বলল, "সব তো জানিস। হঠাৎই ওকে ঢাকায় চলে যেতে হয়েছে। দেওর ফোন করেছিল। শাশুড়ি বোধহয় আর বাঁচবেন না। তুই যদি এই ক'দিন, ওর ফিরে আসা পর্যন্ত, একটু বেশি সময় দিস, তাহলে খুব ভাল হয়। তাহলে আমি বাইরের কাজগুলো করতে পারি।"

দিলারা মাথা নেড়েছিল, "আমার কোনও অসুবিধে হবে না। যখন যেটা দরকার বলবেন, আমি নিশ্চয়ই করে দেব।"

পলাশ নিউ ইয়র্ক থেকে নতুন চাকরিতে অন্য শহরে চলে যাওয়ায় দিলারার একই সঙ্গে মন খারাপ এবং মন ভাল হয়ে গিয়েছে। সে নিজে চাকরির চেষ্টা করেছিল। আইনসম্মত মাইনে কেউ তাকে দিতে চায়নি, উলটে ইশারা-ইঙ্গিতে অন্য কিছু বুঝিয়েছিল। সে যখন খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল, তখন পলাশ তাকে এই দোকানের কথা বলে। কাজটা যে এত সহজে হয়ে যাবে ভাবেনি দিলারা। অনেকদিন হয়ে গেল, সে আপার সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্ক কী ধরনের তা বুঝে উঠতে পারল না। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো তার স্বভাবে নেই। পলাশও তাকে যাওয়ার আগে বলেছিল, কাজের বাইরে অন্য কিছু নিয়ে মাথা না-ঘামাতে। এই উপদেশটা সে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেছে।

নিউ ইয়র্কে এবার সেপ্টেম্বরের শেষেই শীত জানান দিচ্ছে। আজ বেশ জোর করে মেয়েকে শীতের পোশাক পরিয়ে স্কুলে পাঠিয়েছে দুর্গা। এখানকার আমেরিকান সাদা মেয়েদের যেমন শীত খুব কম লাগে, মেয়েরও সেই বাতিক হয়েছে।

দুপুরে সিরাজকে ফোন করল দুর্গা। কয়েকদিন যোগাযোগ নেই। ফোন বন্ধ। একটু অবাক হয়ে অফিসের নম্বরে ফোন করে জানতে পারল সিরাজ অসুস্থ, তাই অফিসে আসছে না। অসুখটা কী, তা জানাতে পারল না লোকটি।

দুর্গার মনে অস্বস্তি তৈরি হল। সিরাজ কবে থেকে অসুস্থ হল? নিশ্চয়ই খুব সাধারণ অসুস্থতা নয়। শেষ পর্যন্ত আবার ফোন করে অফিসের লোকটির কাছ থেকে সিরাজের ঠিকানা চেয়ে নিল দুর্গা।

বিকেল তিনটে নাগাদ দিলারাকে দোকান সামলাতে বলে সে সামনের স্টেশন থেকে মেট্রোতে উঠল। খুব বেশি দূরে নয়, কুড়ি মিনিটে যে-স্টেশনে সে নামল, সেখান থেকে সিরাজের বাসা বেশি দূরে নয়। লিফটে তিনতলায় উঠে দরজার গায়ের বেল বাজাল সে কিন্তু কোনও সাড়া পেল না।

দ্বিতীয়বার বাজিয়ে সাড়া না-পেয়ে যখন ফিরে আসবে বলে দুর্গা ভাবছিল ঠিক তখনই ভেতরে শব্দ হল, ধীরে ধীরে দরজা খুলল সিরাজ। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সে খুবই অসুস্থ তবু বিস্ময় ফুটে উঠল মুখে, "আরে! কী সৌভাগ্য। আসুন, আসুন।"

একপাশে সরে দাঁড়াল সিরাজ। দরজায় দাঁড়িয়ে দুর্গা সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, "আপনি ডাক্তার দেখিয়েছেন?"

"আরে তেমন কিছু নয়। অল্পস্বল্প জ্বরজারি তো হয়েই থাকে। আপনি ভেতরে আসুন, প্লিজ!"

দুর্গা ভেতরে ঢুকে একটি ছিমছাম বসার ঘর দেখতে পেল। সিরাজের দেখানো চেয়ারে বসে সে বলল, "আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনি বেশ অসুস্থ। ওষুধ খেয়েছেন?"

"খেয়েছি। কিন্তু একথা আপনি জানলেন কী করে?"

"জেনে গেলাম। এই ফ্ল্যাটে কি আপনি একাই থাকেন?"

"না না। আমার এক সহকর্মী পাশের ঘরে থাকেন। উনি এখন অফিসে তাই আলাপ করিয়ে দিতে পারছি না।"

"জ্বর কত?"

"ছিল। আজ সকাল থেকে নেই। আর দু'-একদিন বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাব। আমি ভাবতেই পারছি না আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন। নিশ্চয়ই অফিসে ফোন করে জানতে পেরেছেন!" হাসল সিরাজ।

"হ্যাঁ। ফোন করে জানার পর খারাপ লেগেছে," তাকাল দুর্গা।

কপালে ভাঁজ পড়ল সিরাজের।

দুর্গা হাসল, "অসুস্থ হয়ে বাড়িতে শুয়ে আছেন এবং সেটা অফিসকে জানাতেও পেরেছেন। আমার দোকানটা যে চেনেন না, তা তো নয়। একদিন ফোনও তো করেছিলেন। আর-একটা ফোন করে নিজের অসুস্থতার কথা জানালে যে মানে লাগত, তা বুঝতে পারিনি।"

হাতজোড় করল সিরাজ, "ক্ষমা চাইছি। জ্বর তো খুব বেশি ছিল না। তাই কাউকে বিব্রত করতে চাইনি।" মাথা নাড়ল সে, "আপনি এসেছেন আমাকে দেখতে আমি যে কী খুশি হয়েছি, তা বোঝাতে পারব না।"

"ঠিক আছে। ওষুধ ঠিকঠাক খাচ্ছেন তো?" উঠে দাঁড়াল দুর্গা।

"হ্যাঁ," মাথা নাড়ল সিরাজ, "এত তাড়াতাড়ি চললেন?"

"হ্যাঁ। দোকানের মালিক ঢাকায় গিয়েছেন। যে-মেয়েটি কাজ করছে তার ওপর দোকানের দায়িত্ব দিয়ে এসেছি। বেশি দেরি করা ঠিক হবে না," দরজার দিকে এগিয়ে গেল দুর্গা।

"একটা কথা বলব?" পাশে এসে দাঁড়াল সিরাজ।

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল দুর্গা।

"আজ নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে।"

হেসে ফেলল দুর্গা, "সাবধান, পরে যেন আফসোস না-করতে হয়।" তারপর দরজার বাইরে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুন, ভাল হয়ে একদিন দোকানে আসুন," দুর্গা চলে এল।

স্বামী কিছুদিন আটকে গেল। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে এলেন না শাশুড়ি মা। ফলে তাঁর শ্রাদ্ধশান্তি না-শেষ করে স্বামীর

পক্ষে নিউ ইয়র্কে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর খবরটা স্বামী সঙ্গে সঙ্গে জানায়নি। যখন জানিয়েছিল, তখন তিনদিন চলে গিয়েছে।

খবরটা শুনে দুর্গা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমাকে এখন, এই শ্রাদ্ধশান্তি না-হওয়া পর্যন্ত কী কী নিয়ম মানতে হবে জানো?"

"মাছ-মাংস-ডিম খেয়ো না, তাহলেই চলবে," স্বামী ফোনে বলেছিল।

"তোমার মেয়ে এক সপ্তাহ নিরামিষ খেয়ে যদি না-থাকতে চায়?"

"থাকবে না। জোর করে কী লাভ!" স্বামী বলেছিল, "তবে ওকে বোলো, নিরামিষ খেলে আমি খুশি হব।"

কথাটা রাত্রে বাড়ি ফিরে মেয়েকে বলেছিল। বাড়িতে এটাই এখন চলবে, বাবা-মা বাংলায় কথা বলে কিন্তু মেয়ে নিজের কথা ইংরেজি ছাড়া বলতে অভ্যস্ত নয়। এই কথ্য ইংরেজি শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে বাবা-মা, কিন্তু বলতে তাগিদ অনুভব করে না।

বাবা ফোনে যে-প্রস্তাব দিয়েছে, তা শুনে মেয়ে মাথা নেড়ে বলেছিল, "আমি মাছ মাংস ডিম কেন খাব না, তা যদি বুঝিয়ে বলো তাহলে ভেবে দেখব," শোনার পর দুর্গা আর কথা বাড়ায়নি।

স্কুলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল মেয়ে, বাবা ফিরে এল ঢাকা থেকে। নিজের ঘরে বই গোছাতে গোছাতে গলা শুনতে পেয়েছিল সে। হঠাৎ দরজার দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠল, মুখ থেকে শব্দ ছিটকে বেরোল। সেই শব্দের সঠিক কোনও অর্থ ছিল না, ভয়ার্তরাই ওই রকম শব্দ গলা থেকে বের করে।

"কী হল? চিনতে পারছিস না নাকি?" বাবা হাসল।

"ও মাই গড!" গালে আঙুল চলে এল মেয়ের, "কী হয়েছে তোমার? মাথার সব চুল ফেলে দিয়েছ কেন?" মেয়ের গলা থেকে বের হওয়া ইংরেজি শব্দগুলো জড়িয়ে মিশে একাকার হয়ে গেল।

"আমি হিন্দু। বাবা-মা মারা গেলে তার পারলৌকিক কাজ করার সময় এটা করতে হয়," বাবা বলল।

"করলে কী লাভ হয়?"

"কী হয় জানি না। বহুকাল ধরে এটা করা হচ্ছে। হয়তো যিনি চলে গেলেন, তাঁর আত্মা শান্তি পায়," বাবা বোঝাতে চাইল।

"ওঃ, নো, নেভার," মেয়ে বারবার দু'দিকে মাথা নাড়তে লাগল।

"কী হল?"

"তুমি বা মা যখন মারা যাবে, তখন কি আমাকেও ওইরকম মাথা শেভ করতে হবে? আমি ভাবতে পারছি না। তোমরা কি পাগল?" বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢেকে ককিয়ে উঠল মেয়ে।

"আরে না, না," বাবা হেসে ফেলল, "তোর ভয় নেই।"

দু'চোখে সন্দেহ, হাত সরিয়ে তাকাল মেয়ে।

"এটা মেয়েদের করতে হয় না। শুধু ছেলেরাই করে।"

"শুধু ছেলেরা কেন? মেয়েরাও তো বাবা-মায়ের সন্তান," মেয়ের গলায় এখন তেজ ফিরে এল। সন্দেহের চোখে তাকাল সে।

"এটাই নিয়ম। মেয়েদের বাদ দেওয়া হয়েছে।"

"ও মাই গড। আমাদের টিচার তাহলে ঠিক কথা বলেছিলেন।"

"কী বলেছিলেন?"

"এশিয়ান কান্ট্রিতে মেয়েদের সম্মান দেখানো হয় না। তারা বাড়ির লোকের কাছে মেড সার্ভেন্টের কাছাকাছি। তাদেরই সংসারের সব কাজ করতে হয়, আর সেই কাজগুলো উপভোগ করে ছেলেরা। তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও, আমি সহ্য করতে পারছি না," মেয়ে বলেছিল।

সেদিন খুব রেগে গিয়েছিল বাবা। তার মনে হচ্ছিল, মেয়েকে যদি নিউ ইয়র্কে না-পড়িয়ে ঢাকার কোনও স্কুলে পড়াত, তাহলে ও ভদ্রমানুষের মতো ব্যবহার করতে শিখত। দোকানে গিয়ে স্ত্রীকে ব্যাপারটা বলেছিল স্বামী।

সব শোনার পর মাথা নেড়েছিল দুর্গা। বলেছিল, "অদ্ভুত তো!"

"কী অদ্ভুত? কী বলতে চাইছ?"

"এই কথাটা কখনওই আমার মনে আসেনি তো। মা-বাবা তো ছেলেমেয়ে দু'জনেরই, তাহলে একজনকে গুরুত্ব দিয়ে আর-একজনকে উপেক্ষা করা হয় কেন?"

"ও," স্বামী বলেছিল, "তাহলে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও মাথা ন্যাড়া করলে যদি অধিকার দেওয়া হত, তাহলে তাদের কেমন দেখাত তা একবার কল্পনা করে দ্যাখো।"

অনেক কথা বলতে পারত দুর্গা। স্বামী কিছুক্ষণ পরে সামনে থেকে সরে গেল ওর স্বভাবমতো। কিন্তু একা বসে বসে একসময় দোকানের আয়নার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল দুর্গা। এই যে আয়নায় তার যে-চেহারা দেখতে পাচ্ছে, সেই চেহারাটা চুলবিহীন হলে কী রকম দেখাত? কল্পনা করতেই হাসিটা যে জোরালো হয়েছে, তা বোঝার আগেই দিলারা কাছে চলে এল, "কী হল, আপা?"

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, দিলারা, আমি যদি ন্যাড়া হই তাহলে আমাকে কেমন দ্যাখাবে রে?"

"ধেত!" শব্দটা বোধহয় অসাড়েই বেরিয়ে এল দিলারার গলা থেকে।

"ধেত কেন?" মজা পেল দুর্গা।

"মেয়েরা পাগল হলে ন্যাড়া করে দেওয়া হয়," সরে গেল দিলারা।

সাড়ে সাত বছর বয়সে ইন্টারস্কুল ট্যালেন্ট কনটেস্টে নাম দিয়েছিল মেয়ে। ওদের স্কুল থেকে বাকি যে-তিনটি ছেলেমেয়ে সঙ্গে ছিল, তারা ওর চেয়ে তিন ক্লাস উঁচুতে পড়ে। কনটেস্টের ফল প্রকাশিত হলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তো হতভম্ব, স্কুল বোর্ড থেকে মেয়ের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য চেয়ে পাঠানো হল।

আবার ডাক পড়ল স্কুলে। স্বামীর সঙ্গে দুর্গা স্কুলে পৌঁছে ব্যাপারটা জানতে পেরে অবাক হল। দু'দিন আগে জানা সত্ত্বেও মেয়ে বাড়িতে এই ব্যাপারটা জানায়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মেয়ের প্রতিভাকে আরও উৎসাহ দেওয়ার জন্যে ওকে ন' বছর বয়সেই ক্লাস নাইনে তুলে দেওয়া হবে। ওর সঙ্গে যারা টেস্টে নাম দিয়েছিল, তারা অনেক ওপরের স্ট্যান্ডার্ডের ছাত্রছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও কাছাকাছি যেতে পারেনি। স্কুল এই রকম ছাত্রীর জন্যে গর্বিত। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এই মেয়েটিকে পড়াশোনার জন্যে স্কুলকে কোনও অর্থ দিতে হবে না। তাকে পড়াশোনার ব্যাপারে দু'জন শিক্ষিকা সবসময় সাহায্য করবেন।

দোকানে যাওয়ার সময় স্বামীকে গম্ভীর হয়ে হাঁটতে দেখে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল, "মনে হচ্ছে তুমি খুব চিন্তায় পড়েছ?"

"চিন্তা তো বটেই। দু'ফুট লম্বা গাছে যদি কাঁঠাল ফলে, তাহলে তার ভেতরটা দরকচা হতে বাধ্য। মেয়ের অবস্থা তাই হবে বলে মনে হচ্ছে," স্বামী বলল।

"একথা স্কুলে বললে না কেন?"

"বলে কোনও লাভ হত না। নিউ ইয়র্কের স্কুলগুলোর মধ্যে এই স্কুলের যে-নাম হয়েছে, তা মেয়ের জন্যে। এখন হাজার বোঝালেও ওরা বুঝবে না।"

"এমন কেন ভাবছ! আমরা যা স্বপ্নেও করতেও পারিনি ও ওইটুকু বয়সে তা করে দেখাচ্ছে। ওকে তাই বাধা দেওয়া উচিত নয়," দুর্গা বলল।

সিরাজ ফোন করেছিল। খুব জরুরি প্রয়োজনে আজই দেখা করা দরকার। দুটো স্টেশন এগিয়ে সিরাজের সঙ্গে দেখা করল দুর্গা। হেসে জিজ্ঞাসা করল, "কী ব্যাপার?"

"চলুন, কোথাও গিয়ে বসি," সিরাজ এগিয়ে একটা কফি শপে ঢুকে দুটো কফি নিয়ে মুখোমুখি বসে বলল, "খুব সমস্যায় পড়েছি।"

দুর্গার কপালে ভাঁজ পড়ল। সেটা লক্ষ না-করে রাস্তার দিকে তাকাল সিরাজ, "মনে হল, আপনার সঙ্গে আলোচনা না-করলে স্বস্তি পাব না।"

দুর্গা চোখ সরাল না। মুখ ফিরিয়ে সেই চোখের দিকে তাকিয়ে সিরাজ বলল, "অফিস আমাকে ঢাকায় ফেরত নিয়ে যেতে চাইছে।"

"হঠাৎ?" মুখ থেকে শব্দটা সশব্দে বেরিয়ে এল দুর্গার।

মাথা নাড়ল সিরাজ, "আমি জানি না। আমাকে যে-সময়ের জন্যে পাঠানো হয়েছিল, তা শেষ হওয়ার অনেক আগেই কেন আমাকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে তা আমার জানা নেই। আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি ফিরে যাব কিনা।"

শ্বাস ফেলল দুর্গা, "ফিরে না-গেলে কি চাকরি থাকবে?"

"সম্ভবত না। আদেশ অমান্য করার জন্যে আমার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হবে এবং আমার চাকরিটা যাবে।" সিরাজের ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। সে দুর্গার দিকে কফির কাপ এগিয়ে দিল।

"তাহলে..." বাক্যটা সম্পূর্ণ করতে পারল না দুর্গা।

"হয় আমাকে বাংলাদেশে চলে যেতে হবে নয় চাকরিটা ছাড়তে হবে।"

"চাকরি ছেড়ে দিলে আমেরিকায় থাকবে কী করে?"

"উপায় আছে। অন্য কোনও কোম্পানিতে চাকরি পেলে নতুন চুক্তি অনুযায়ী এদেশে থাকার অনুমতি পাওয়া সম্ভব। আমার কাছে এখানকার দুটো কোম্পানির ওইরকম প্রস্তাব আছে," সিরাজ কাপ তুলে চুমুক দিল।

চুপচাপ কফিতে চুমুক দিয়ে রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দুর্গা বলল, "আমি বুঝতে পারছি না আমার কী বলা উচিত। আমি তো চাকরির জগৎটা একেবারেই জানি না। সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বললে হয় না?"

"আমি যে-কোম্পানিতে চাকরি করি, সেটা বাংলাদেশের প্রথম পাঁচটা কোম্পানির একটা। এরকম কোম্পানির চাকরি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেওয়ার কথা ওরা কেউ ভাবতেই পারে না," একটু থেমে সিরাজ বলল, "আমি যে কেন আমেরিকা ছেড়ে যেতে চাইছি না, তা ওদের বোঝাতে পারব না।"

"কেন?" স্বাভাবিক চোখে তাকাতে চাইল দুর্গা।

কয়েক সেকেন্ড দুর্গার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল সিরাজ। তারপর বলল, "কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

মিনিট কয়েক চুপচাপ কেটে যাওয়ার পর দুর্গা বলল, "হুট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। বরং অফিসের নির্দেশমতো ঢাকায় ফিরে গিয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিলে পরে আফসোস করতে হবে না।"

"আফসোস?" কপালে ভাঁজ পড়ল সিরাজের।

"হতে তো পারে। নিউ ইয়র্ক থেকে দেশে ফিরে যাওয়ার পর ঠান্ডা মাথায় সব কিছু ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে বলে মনে হচ্ছে।"

"আমি চলে গেলে খারাপ লাগবে না?"

"এখন যেরকম আছি, সেই রকমই তো থাকব। এখন হয়তো চার কিলোমিটার দূরে আছি, দেশে গেলে সেটা হয়তো চার হাজার কিলোমিটার হবে। সেটাকে চার ভেবে নেওয়া যাবে সিদ্ধান্তে না-পৌঁছনো পর্যন্ত," খুব শান্ত গলায় বলল দুর্গা। বলার পর নিজেই অবাক হল।

কফি শেষ হয়ে গেলে দুর্গা বলল, "মন যা চাইছে, তা সব সময় ঠিকঠাক না-ও হতে পারে। মনকে যাচাই করা দরকার। তাই না?"

মাথা নেড়েছিল সিরাজ।

চারদিন পরে ফোন এল। দোকানের স্টক মেলাচ্ছিল দুর্গা, রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই সিরাজের গলা শুনতে পেল, "নিউ ইয়র্ক অফিস আজ আমাকে রিলিজ করে দিল।"

"ও," কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না দুর্গা।

"খুব ইচ্ছে হচ্ছিল যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই।"

তোমার শব্দটি শুনে চোখ বন্ধ করল দুর্গা। তারপর বলল, "আমি তো দোকানেই আছি।"

"নাঃ। যাওয়ার আগে দেখা হলে একটুও ভাল লাগবে না। তবে যেদিন ফিরে আসব সেদিন এয়ারপোর্টের বাইরে এলেই যেন তোমায় দেখতে পাই," বলেই লাইনটা কেটে দিল সিরাজ।

ঠিক একদিন পরে কথাটা মনে এল দুর্গার। সিরাজের দেশের ফোন নম্বর ওর কাছ থেকে নেওয়া হয়নি। ঠিকানাটাও নয়। সে সিরাজের অফিসে ফোন করল। রিসেপশনের পরিচিত গলা জানাল, "উনি তো গতকাল ঢাকায় ফিরে গিয়েছেন," তারপর হেসে বলল, "উনি বোধহয় কাউকেই ঢাকার নম্বর দিয়ে যাননি।"

"কী করে জানলেন?"

"আরও দু'জন আজকে ফোনে ওঁর নম্বর চেয়েছিলেন।"

"ও," ফোন রেখে দিয়েছিল দুর্গা। নিজের অজান্তেই তার দু'চোখের পাতা ভিজে উঠেছিল। বেশ চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিল দুর্গা। ঠিক তখনই গলা কানে এল, "ভেতরে আসতে পারি? মে আই কাম ইন?"

কান্না মুছে হাসি আসছিল, সেটা সামলে দরজার দিকে তাকাল দুর্গা। এই রকম কথা মাঝেমাঝেই শুনতে হয় দোকানে থাকলে। প্রথম বাংলা বাক্য এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ইংরেজি অনুবাদও বলেন আগন্তুক। কখনও আগে ইংরেজি পরে বাংলাও শুনতে হয়। দুর্গা বলল, "আসুন।"

ভদ্রলোক দোকানের ভেতরে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তিনি কোথায়? হোয়ার ইজ় হি?"

"আপনি ঠিক কাকে খুঁজছেন?"

"ওনার। এই দোকানের মালিক।"

"আপনি ওখানে বসুন," বলে দুর্গা দিলারাকে ইশারা করল স্বামীকে ডেকে দিতে। দিলারা পরদাঘেরা ঘরে গিয়ে খবরটা দিয়ে এলে স্বামীকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নমস্কার, নমস্কার। আমাকে চিনতে পারছেন? লাস্ট বঙ্গসম্মেলনে আপনার স্টলে গিয়ে আলাপ করেছিলাম।"

স্বামীকে মাথা নাড়তে দেখল দুর্গা। চিনতে পেরেছে।

দুটো হাত এক করে ভদ্রলোক বললেন, "আমি হরেন্দ্রনাথ দত্ত। লাস ভেগাসে থাকি। আপনার সঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলিসে পরিচয় হয়েছিল। আই অ্যাম এইচ এন ডাট।"

স্বামী মাথা নাড়ল, "নিশ্চয়ই মনে আছে। বসুন বসুন। হ্যাঁ, বলুন, আমি কী করতে পারি। আমাকে আপনার মনে আছে, খুব খুশি হলাম।"

"আই কান্ট ফরগেট। কোনও কারণে কেউ মনে গেঁথে গেলে তাকে সহজে উপড়ে ফেলতে পারি না। নো," মাথা নাড়লেন হরেন্দ্রনাথ। তারপর দোকানটাকে ভাল করে মুখ ঘুরিয়ে দেখে বললেন, "গুড শপ।"

"আপনি নিউ ইয়র্কে কবে এসেছেন?" স্বামী জিজ্ঞাসা করল।

"ইয়েস্টারডে। গতকাল। আজ আপনার দেওয়া ঠিকানা দেখে চলে এলাম এখানে। হোয়াই আর ইউ স্ট্যান্ডিং? বসুন, সিট ডাউন প্লিজ," হরেন্দ্রনাথ বসতে ইশারা করে গলা নামালেন, "আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। কোনও কোনও মানুষকে দেখে মনে হয় লোকটা ভাল, আপনাকে দেখে আমার তাই মনে হয়েছে। শুনুন, আমি লাস ভেগাসে একটা বাংলা সংস্কৃতি মেলা করতে চাই। ঢাকা থেকে কলকাতা থেকে শিল্পীদের নিয়ে আসব। আপনি আমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারবেন? আই নিড ইয়োর হেল্প," হরেন্দ্রনাথ বললেন।

"আমি তো সামান্য মানুষ। ঠিক কী রকম সাহায্যের কথা বলছেন তা জানলে বলতে পারব কতটা করা আমার পক্ষে সম্ভব।" স্বামী বলল।

"আরে মশাই! আপনি তো বলেছিলেন দশ বারো বছর ধরে আমেরিকার নানা শহরের সম্মেলনে স্টল নিয়ে যাচ্ছেন। প্রচুর মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে। সেটা তো নিজের চোখে দেখেছি। আই হ্যাভ সিন দ্যাট," খুব জোরে মাথা নাড়লেন হরেন্দ্রনাথ।

"ঠিক কী করতে বলছেন আমাকে?" স্বামী প্রশ্ন করল।

"সিম্পল। খুব সোজা। এত দিন ধরে যেতে যেতে ঢাকা বা কলকাতার যে সব লোক স্টল ভাড়া নেন, তাদের সঙ্গে তো ভাল জানাশোনা হয়ে গিয়েছে আপনার। শিল্পীদের অনেককেই নিশ্চয়ই চেনেন। আপনি একটু আমার হয়ে ওদের সঙ্গে যদি যোগাযোগ করেন,

তাহলে নিশ্চয়ই কাজ হবে। আমি চাই দুই দেশের নামী শিল্পী, স্টলের মালিকদের নিয়ে এসে আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে, আমি কারও থেকে কম নই," সোজা হয়ে বসলেন হরেন্দ্রনাথ।

"আপনি বলছেন যখন, তখন আমি চেষ্টা করতে পারি।"

"ব্যস। তাহলেই হবে," হাসলেন হরেন্দ্রনাথ।

"আপনি কোন সময়ে অনুষ্ঠান করতে চাইছেন?"

"নভেম্বরে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন লাস ভেগাসে কখনওই বেশি শীত পড়ে না। ওই সময়টা একদম ঠিক হবে। প্রচুর লোক তখন জুয়া খেলতে ওখানে যায়। আরে, লাস ভেগাসের ক্যাসিনো, রেস্তোরাঁতে তো দুই-আড়াই হাজার বাংলাদেশি চাকরি করে। বেড়াতে যায় প্রচুর বাঙালি। দর্শকের অভাব হবে না," খুব গম্ভীর হয়ে কথাগুলো বললেন হরেন্দ্রনাথ।

"তাহলে তো সময় আছে," স্বামী বলল।

"অ্যাঁ। হোয়াট? এ কী কথা বললেন? সময় তো নদীর স্রোতের মতো বয়ে যাবে। এটা এপ্রিল। অ্যানাদার সেভেন মান্থ। মাঝখানে বঙ্গ সম্মেলন আরও কত কী হবে। তাই আমাদের এখন থেকে প্রিপারেশন শুরু করা দরকার। আপনি তৈরি থাকুন। নেক্সট মান্থেই আমি আর আপনি ঢাকা আর কলকাতায় গিয়ে সব ঠিকঠাক করে আসব। ওকে?"

"আমাকে যেতে হবে?" হকচকিয়ে গেল স্বামী।

"কী আশ্চর্য? হোয়াই দিস কোয়েশ্চেন? যেসব শিল্পী, স্টলের মালিক রেগুলার আসে তারা তো আপনাকে চেনে। আপনি গেলে কাজ হবে। তাছাড়া হবে লাস ভেগাসে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত জুয়ার শহরে। নীরস শহর নয়। সেই লোভেই অনেকে আসতে চাইবে। হে হে হে," আবার দু'পাশে তাকালেন হরেন্দ্রনাথ, "তাহলে কথা হয়ে গেল। আপনাকে আমি ডেটটা জানিয়ে দেব। বাই দ্য বাই, আপনার দোকানে টি বা কফির অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই বুঝি!"

"না। তবে আনিয়ে দিচ্ছি।"

"আপনার দেখছি কোনও পুরুষ স্টাফ নেই। ভাগ্যবান মানুষ।"

"মানে?"

"সিনিয়র যিনি, তিনি তো বেশ সুন্দরী। তা এদের ওপর দোকানের ভার দিয়ে গেলে সব ঠিক থাকবে তো। এরা কেমন? চুরি করে না তো?"

"না না," মাথা নাড়ল স্বামী।

"গুড। তবে বেশি বিশ্বাস না-করাই ভাল। বিশেষ করে সুন্দরী হলে তো নয়ই," চোখ বন্ধ করে হাসলেন হরেন্দ্রনাথ।

কথাগুলো খুব স্পষ্ট না-হলেও দুর্গার কানে যাচ্ছিল। সে দিলারাকে নিচু গলায় বলল যে-দোকানে অর্ডার দিলে চা দিয়ে যায়, সেখানে অর্ডার দিতে। দিলারা ফোন নিয়ে দোকানের বাইরে উঠে যেতেই স্বামী তার কাছে এসে বলল, "একটু এসো। আলাপ করিয়ে দিই।"

শোনামাত্র কাউন্টার থেকে বেরিয়ে হরেন্দ্রনাথের সামনে পৌঁছে হাত জোড় করল দুর্গা, "নমস্কার। আমার নাম দুর্গা। ওঁর মিসেস।"

"মি-মিসেস!" খুব অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন হরেন্দ্রনাথ।

"হ্যাঁ। কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না," দুর্গা জিজ্ঞাসা করল।

"না, না, এ কী! আমি কি তাই বলেছি!"

"বলেননি, ভেবেছিলেন। আমি যখন ওঁর স্ত্রী, তখন কি আমাকে একটু-আধটু বিশ্বাস করা যায়?" দুর্গা হাসল।

স্বামী বলল, "আঃ! কী হচ্ছে এসব। উনি একটা প্রজেক্ট নিয়ে এসেছেন। ওঁর সঙ্গে সম্মেলনে পরিচয় হয়েছিল।"

"শুনেছি। আশা করি আপনারা সফল হবেন। প্লিজ বসুন। আপনার জন্যে কফি বলা হয়েছে। এখনই এসে যাবে," দুর্গা ফিরে গেল তার জায়গায়।

চোখের সামনে মানুষটাকে বদলে যেতে দেখল দুর্গা। এতদিন লোকটা প্রায় অসামাজিক হয়ে ছিল। সকালে দোকানে এসে কাউন্টারে থাকত দুর্গা না-আসা পর্যন্ত, তারপর পরদাঘেরা খোপে ঢুকে ক্যাসেট প্রিন্ট করত চুপচাপ, রাত্রে দোকান বন্ধ করে বাজারে গিয়ে আলু-পেঁয়াজ-ডিম-মাছ কিনে বাড়িতে ফিরে এসে হিসেবের খাতা নিয়ে বসত। কোনও বন্ধু নেই, আড্ডা নেই এমনকী দু'ঘণ্টা দূরের আটলান্টিক সিটিতে গিয়ে ক্যাসিনোগুলোও ঘুরে দ্যাখেনি কোনও দিন। শুধু খবর রাখত, যোগাযোগ করত আমেরিকা বা কানাডার বিভিন্ন শহরে প্রতি বছর যেসব বঙ্গ সংস্কৃতি হয়, তাদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে। আর দুর্গাপুজোর সবচেয়ে বড় জমায়েতগুলোর খবর রাখত। সেখানে স্টল নিয়ে ব্যবসা করতে যেতে খুব উৎসাহ বোধ করত। বছরের বাকি সময় দেখে মনে হত ঝিমিয়ে থাকছে। এই মানুষটা হরেন্দ্রনাথ দত্তের সংস্পর্শে এসে বেশ চনমনে হয়ে গেল।

হরেন্দ্রনাথ আরও দু'জন পরিচিত যুবককে পরদিন দোকানে নিয়ে এসে স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তাদের একজনের বাড়ি চট্টগ্রামে, অন্যজনের কলকাতায়। কাস্টমারদের যাতে অসুবিধে না-হয়, তাই দোকানের কাউন্টারের বিপরীত প্রান্তে চেয়ার পেতে ওরা আলোচনায় বসল। কাউন্টারের এপাশে দাঁড়িয়ে দুর্গার মনে হল যে-দু'জন আজ হরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এসেছে, তাদের একজন যেন ঘনঘন পাশ ফিরে তার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু কেন তাকাবে? লোকটা দোকানে ঢুকেই জেনেছে যে, সে এই দোকানের মালিকের স্ত্রী। তারপর তো এইভাবে তাকানো শোভন নয়। দুর্গা মুখ ফিরিয়ে দিলারার দিকে তাকাল। দিলারা সদ্য আসা একটা প্যাকেট খুলছে। তার মনে হল যথেষ্ট সুন্দরী ও। প্রতিদিন কাজের মধ্যে দেখতে দেখতে ওর সৌন্দর্যের কথা আলাদা করে মনে আসেনি। ওই অল্পবয়সি মেয়েটি তো ছেলেদের নজরে আসবেই। সে দেখল হরেন্দ্রনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে তার দিকে এগিয়ে আসছেন। সামনে এসে হরেন্দ্রনাথ বললেন, "ম্যাডাম, এখন তো কোনও কাস্টমার নেই, তাই আপনি যদি আমাদের আলোচনায় যোগ দেন, তাহলে ভাল লাগবে।"

দুর্গা বলল, "ও মা। আমি গিয়ে কী করব? আপনারা যে-বিষয়ে কথা বলছেন, আমি তার বিন্দুবিসর্গ বুঝি না।"

বলামাত্র সেই যুবক চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়াল হরেন্দ্রনাথের পাশে, "আপনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন ম্যাডাম। আসলে আমাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকাটা খুব জরুরি," হাতজোড় করে হাসল যুবক।

হরেন্দ্রনাথ বলল, "আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি শোভন সেন কলকাতার মানুষ। এখানে অনেকদিন আছেন।"

"আমি ভয়েস অফ আমেরিকায় চাকরি করি। মেরিল্যান্ডে থাকি। দাদার আমন্ত্রণে নিউ ইয়র্কে এসেছি। আপনি তো ঢাকা থেকে..." চুপচাপ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল দুর্গা।

শোভন বলল, "আসুন না, একসঙ্গে কথা বলি," খুব মিষ্টি করে বলল শোভন। বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যা এড়িয়ে যেতে পারল না দুর্গা। শোভনই উদ্যোগ নিয়ে আর-একটি চেয়ার এগিয়ে দিল।

যে-ছেলেটি নতুন ক্লাসের ফার্স্ট বয়, দুর্গার মেয়ের চেয়ে সে অন্তত সাড়ে তিন বছরের বড়। ওর বাবা আমেরিকান, মা জার্মান। আলাপ হওয়ার পর ছেলেটি প্রথম প্রশ্ন করেছিল, "আচ্ছা, তোমার বয়স এখন কত?"

"আমি এখন নয়," টান টান মুখে জবাব দিয়েছিল মেয়ে।

"ওহ মাই গড!" ছেলেটির চোখ বড় হয়ে গেল, "আই কান্ট বিলিভ।"

হেসেছিল মেয়ে, "তোমার আরও মন দিয়ে পড়াশোনা করা উচিত।"

"কী বলতে চাইছ?" রেগে গেল ছেলেটি।

"এই ব্যাপারে একটা বিখ্যাত লাইন আছে, কল্পনার থেকে বাস্তব অনেক বেশি সত্যি। তুমি কত?" মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল।

"আমি এখন তেরো," ছেলেটি কাঁধ নাচিয়েছিল।

স্কুলের শিক্ষকদের বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছিল। একটি ন' বছরের মেয়ে শেক্সপিয়রের নাটক পড়ে সাবলীল ভঙ্গিতে কথা বলতে পারে, বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলার সময় একটুও আড়ষ্ট বোধ করে না। স্কুল থেকে স্কুলে



রটে যাচ্ছিল, ঐশ্বরিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বাংলাদেশের এই মেয়েটি। এত সাধারণ পরিবারে জন্মে কী করে এত বিশাল ক্ষমতা মেয়েটি পেল, তা নিয়েও আলোচনা চলছিল। তিনজন শিক্ষকের একটি কমিটি এসে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছেন, নানা প্রশ্ন করে তাঁরাও অবাক হয়েছেন।

তার ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েরা যতটা সম্ভব ওকে এড়িয়ে যেতে পারলে খুশি হয়। শুধু তেরো বছরের ছেলেটি হঠাৎ হঠাৎ এক-একটা উদ্ভট বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতে আসে। ব্যাপারটা মেয়েকে বেশ মজা দেয়।

একদিন ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোথায় থাকো?"

"বেশি দূরে নয়," গম্ভীর গলায় বলল মেয়ে।

"বাড়িতে আর কে-কে থাকেন?"

"মা-বাবা আর আমি। এনি প্রবলেম?"

"না না। আমার বাড়িতে শুধু আমি আর আমার মা।"

"বাঃ, খুব ভাল," মাথা নেড়ে স্কুলের লাইব্রেরির ভেতরে ঢুকে গেল মেয়ে। ছেলেটির আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল, মেয়েটি চলে যেতে হতাশ হল সে। তার মনে হল কীভাবে কথা বললে মেয়েরা খুশি হবে, তা জানা দরকার। তাকে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন সহপাঠিনী, যার বয়স তেরো পেরিয়েছে, কাছে এসে বলল, "ওইটুকু মেয়ে তোমাকে যে পাত্তা দিল না! আচ্ছা, মানলাম ও পড়াশোনায় খুব ভাল কিন্তু তাছাড়া ওর আর কী আছে? এখনও তো দেখলে শিশু বলে মনে হয়।"

"আমি ওসব জানি না।" কাঁধ নাচাল ছেলেটি।

হেসে ফেলল সহপাঠিনী, "জানতে হবে কেন? দেখলেই তো বোঝা যায়। আমার মনে হয় নেচার ওর মাথায় বেশি বুদ্ধি দিয়েছে বলে শরীরটাকে আর বাড়তে দেবে না। বাইশ বছর বয়সেও ওইরকম চিমসে হয়ে থাকবে। মন খারাপ করিস না," সহপাঠিনী চলে গেল।

দিন দশেক পরে ফোন পেল দুর্গা। ফোনের গলাটা একটু অচেনা লাগছিল। কিন্তু অনুমান করতে পারল সে। বলল, "বলুন, কী খবর?"

"এমনি তো সব ঠিক আছে কিন্তু আপনার সাহায্য চাইছি।"

"আমি ঠিক বুঝলাম না," অবাক হল দুর্গা।

"সেদিন অত কথা হল, হরেন্দ্রনাথবাবু খুশি হয়ে লাস ভেগাস চলে গেলেন কিন্তু তারপর হঠাৎ কী যে হল..." থেমে গেল শোভন।

"আমি এখনও বুঝতে পারছি না," দুর্গা একটু জোরেই বলল।

"আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করতে যেতে চাই। আপত্তি নেই তো!"

"বেশ, আসুন," বলল বটে কিন্তু মনে একটা খটকা থেকেই গিয়েছিল। সে যা অনুমান করছে, তা তো ভুলও হতে পারে! আচ্ছা, সরাসরি নিজের নাম বলতে কারও কারও কেন অসুবিধে হয়!

শোভন দোকানে এল বিকেল পাঁচটার পরে। কোনও প্রয়োজনে স্বামী নীচের রাস্তায় গিয়েছিল। সেখানেই দেখা হয়ে যাওয়ায় সঙ্গে করে নিয়ে দোকানে এসে বলল, "দ্যাখো, শোভনবাবু এসেছেন। আপনি বসুন, কথা বলুন, আমি কয়েকটা কাজ সারি," একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে স্বামী চলে গেল।

স্বামীর দূরে সরে যাওয়া শরীরের দিকে বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে শোভন বলল, "তাহলে আমি ভুল ভাবিনি।"

"কী ভেবেছিলেন?" জিজ্ঞাসা করল দুর্গা।

"সেদিন আলোচনার সময় আপনার স্বামী যেরকম উৎসাহ নিয়ে কথা বলছিলেন, তাতে সবাই খুব উৎসাহ বোধ করেছিলাম। পরে টেলিফোনে কথা বলার সময় উনি নানা বাহানা নিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন," দুর্গার দিকে তাকাল শোভন।

"বাহানা!" দুর্গা অবাক হল। সে এসবের কিছুই জানে না। স্বামী যে এদের এড়িয়ে যাচ্ছে সেকথা তাকে একবারও বলেনি।

"হ্যাঁ। কখনও বলছেন দোকানের যা চাপ, তা আপনার ওপর চাপিয়ে দিলে ব্যবসার বারোটা বেজে যাবে। এটা নাকি উনি আগে ভাবেননি। তাছাড়া দোকানের ব্যবসা সংক্রান্ত বাইরের কাজগুলো আপনাকে করতে হয়। উনি যদি ঢাকায় গিয়ে অর্গানাইজ করেন অথবা

এখানে এসেও দোকানে সময় না-দিতে পারেন, তাহলে ব্যবসা লাটে উঠবে, আপনিও বিরক্ত হবেন। এসব কথা শুনে হরেন্দ্রনাথবাবু খুব অবাক হয়েছেন। ওঁর এইরকম মত বদলাল কেন বলুন তো?" খুব আন্তরিক গলায় প্রশ্ন করল শোভন।

"এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে উনি আলোচনা করেননি," হেসে বলল দুর্গা, "উনি সিদ্ধান্ত বদল করেছেন, এটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

"আমরা যে বিপদে পড়লাম," বিমর্ষ মুখে বলল শোভন।

"ধরে নিন, হরেন্দ্রনাথ সেদিন এসে যখন প্রস্তাবটা দিলেন, তখনই উনি কাজটা করতে রাজি হননি। সেটা জানার পর কি হরেন্দ্রনাথবাবুর মনে হত তিনি জলে পড়েছেন! পৃথিবীতে কোনও কাজ কারও জন্যে আটকে থাকে না," দুর্গা কথাগুলো বলে জানতে চাইল, "চা খাবেন?"

শোভন বলল, "না, ধন্যবাদ। এই সময় চায়ের দরকার নেই," তারপর মাথা নাড়ল সে, "হরেন্দ্রনাথবাবু খুব আপসেট হয়ে পড়েছেন। উনি চাইলে ঢাকার যেসব মানুষ ইউরোপ-আমেরিকায় অনুষ্ঠানে সাহায্য করেন, শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। কিন্তু সেটা উনি চান না।"

"কেন? বাঙালি শিল্পী, নামী শিল্পী হলেই তো সমস্যা মিটে যায়।"

"হরেন্দ্রনাথবাবুর মতে, এঁদের তো বছরের পর বছর এদেশের বাঙালিরা দেখে আসছে। অনেকবার অনুষ্ঠানে একই গান শুনেছে। তাই উনি ভাল শিল্পী, যাঁরা এদেশে আগে আসেননি অথচ পরিচিতি আছে, তাঁদের নিয়ে আসতে চাইছেন। আমিও ওঁর সঙ্গে একমত," শোভন বলল।

এই মনোভাব ভাল লাগল দুর্গার। সে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু ওই সব শিল্পীদের নির্বাচন করা বেশ শক্ত ব্যাপার।"

"ম্যাডাম, যা শক্ত তাই তো শেষপর্যন্ত মূল্যবান হয়।"

"হুঁ। কিন্তু একটা কথা, আমাকে ম্যাডাম বলবেন না। দু'চারটে কথায় যাদের সঙ্গে বাক্যালাপ শেষ হয়, তারা ম্যাডাম বললে অস্বস্তি হয় না। আমার নাম দুর্গা। খুব সাধারণ নাম," দুর্গা বলল।

"আদৌ না। যে-মহিলা দশ হাতে দশ রকম অস্ত্র নিয়ে শত্রু বিনাশ করেন, তাঁকে একমাত্র পাগলেই সাধারণ মহিলা বলতে পারে।"

"কানা ছেলের নামও আদর করে পদ্মলোচন রাখা হয়, তাই না? এসব বাদ দিন। দেখুন আমার স্বামী জীবনে দুটো অ্যাডভেঞ্চার করেছেন। প্রথমটা এই আমেরিকায় এসে কিছুদিন থেকে গ্রিন কার্ড পেয়ে এই ব্যবসা শুরু করেছেন; দ্বিতীয়টা হল, আমাকে বিয়ে করেছেন, এদেশে নিয়ে এসেছেন। প্রথম কয়েক বছর আমাকে নিয়ে কী করবেন, স্থির করতে পারেননি, শেষে যখন পারলেন তখন নিশ্চিন্ত হলেন। আমার কথা থাক। আপনাদের এই প্রজেক্টটা আমাকে খুব আকর্ষণ করছে। খুব ইন্টারেস্টিং।"

উৎসাহিত হল শোভন, সোজা হয়ে বসে বলল, "আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন? তাহলে দারুণ হয়!"

"আমি চাইলেই তো হবে না, আরও দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আপনি হরেন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে কথা বলুন। ওঁর আপত্তি থাকতে পারে। আগে সেটা জানা দরকার," দুর্গা বলল।

"নিশ্চয়ই। আমি এখনই ওঁকে ফোন করছি।"

"না। এখনই করবেন না। পরে ভাল করে ভেবে করবেন।"

"বেশ। দু'জনের কথা বলছিলেন!"

"দ্বিতীয়জন অবশ্যই আমার স্বামী। আপনারা ওঁর কাছে যে-প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, তা আমি গ্রহণ করছি, তা ওঁর পছন্দ না-ও হতে পারে?"

"যদি উনি পছন্দ না-করেন?"

হাসল দুর্গা, "পরস্পরের মতামতকে যদি শ্রদ্ধা না-জানাই, তাহলে একসঙ্গে থাকব কী করে? আজই আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব।"

গোটা মুখে হাসি ছড়িয়ে গেল শোভনের। বলল, "প্লিজ, ওঁকে একটু বুঝিয়ে মানে উনি যাতে রাজি হন, সেই চেষ্টা করবেন।"

"কেন?" অন্য দিকে তাকাল দুর্গা, "তাতে কী লাভ হবে?"

"আমার মন বলছে, আপনি সঙ্গে থাকলে আমরা দারুণ কাজ করতে পারব। হরেন্দ্রনাথবাবু যখন শুনবেন তখন..."

হাত তুলে শোভনকে থামিয়ে দিল দুর্গা, "প্লিজ! এখনই কাউকে এসব বলতে যাবেন না। আমি আগে ওঁর সঙ্গে কথা বলি, তারপর..."

"আপনার ফোন নম্বর পেতে পারি?" দুর্গার মুখের দিকে তাকাল শোভন।

"দোকানের ল্যান্ডলাইন নম্বর না আমার মোবাইল নম্বর?"

"দ্বিতীয়টা পেলে বেশি কমফর্টেবল বোধ করব।"

একটা কাগজে নিজের মোবাইল ফোনের নম্বর লিখে দিল দুর্গা।

কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসে দুর্গা মেয়ের স্কুলের খামটা পেয়ে বেশ হকচকিয়ে গেল। চিঠিতে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান এবং স্কুলশিক্ষা নিয়ে একটি বিশেষ দু'দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে সানফ্রান্সিসকোতে। ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার বিভিন্ন স্কুলের দশজন সেরা ছাত্রছাত্রীকে ওই সেমিনারে অংশ নেওয়ার জন্যে নির্বাচন করা হয়েছে। দুর্গা ওই চিঠিতে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের তালিকার চতুর্থ নামটি দেখে বিহ্বল হল। মেয়ের নাম। বেশ উত্তেজিত এবং অবশ্যই অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সে মেয়ের ঘরে ঢুকে দেখল সে পড়ার টেবিলে বইমুখে বসে আছে।

দুর্গা তাকে চিঠিটা দেখাল, "এই চিঠির কথা জানিস?"

মেয়ে মাথা ঘুরিয়ে কয়েক সেকেন্ড কাগজটির ওপর চোখ রেখে আবার বইয়ের ওপর নজর রেখে বলল, "ইয়া।"

"তোর, তোর কেমন লাগছে?" আবেগে দুর্গার গলা স্থির ছিল না।

"ইটস ওকে। গুড নিউজ," মেয়ে কাঁধ নাচাল।

"তোর বাবা সঙ্গে যাবে কিনা জানি না, আমি তো যাবই," বেশ গর্বের গলায় বলল দুর্গা। তাদের মেয়ে, একজন সাধারণ ঘরের বাঙালি মেয়ে আমেরিকায় প্রথম দশজন ছাত্রছাত্রীর একজন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে, ঢাকায় থাকলে কি একথা ভাবতে পারত?

মেয়ের গলা থেকে আলতো শব্দ বেরোল। হাত বাড়িয়ে সে কাগজটা টেনে নিয়ে দেখাল চিঠির একেবারে নীচে, যিনি চিঠি পাঠিয়েছেন, তাঁর সইয়ের তলায় লাইন টেনে একটু ছোট হরফে লেখা হয়েছে, নির্বাচিতদের অভিভাবকদের জন্যে ক্যাম্পাসে থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই। যাবতীয় দায়িত্ব বোর্ডের প্রতিনিধিরা বহন করবে। দুর্গা অবাক হয়ে দেখল মেয়ে তার কলম টেবিল থেকে তুলে সেই বিজ্ঞপ্তির পাশে দুটো লাইন টেনে দিয়ে আবার পড়ায় মন দিল।

দুর্গা কাগজটা টেনে নিয়ে বিষয়টা পড়ে এই ভেবে অবাক হল, মেয়ে যখন এই চিঠি আগে দ্যাখেনি, তখন চিঠির শেষের খুদে অক্ষরগুলো পড়ল কখন? তাহলে কি ও তখন ভাণ করল? এই চিঠির প্রতিলিপি ওকে স্কুলের প্রিন্সিপাল আজ দেখিয়ে দিয়েছেন? কিন্তু মেয়ে অকারণে কেন, কখনওই মিথ্যে কথা বলে না। তাহলে কি যে কয়েক সেকেন্ড সে চিঠির ওপর নজর রেখেছিল, তার মধ্যেই পুরোটা পড়ে ফেলেছে? এটা কি সম্ভব? তার চোখের সামনে মেয়ে যে কয়েক সেকেন্ড কাগজে নজর রেখেছিল, তাতে পুরো চিঠিটাই পড়া যাবে না, আর ও চিঠি শেষ করে খুদে অক্ষরগুলোও পড়ে ফেলল!

দুর্গা বেরিয়ে এল। তার মনে হচ্ছিল মেয়ের মধ্যে কোনও ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে। কী করে বাংলাদেশের এক অতি সাধারণ পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও ও এমন ক্ষমতার অধিকারী হল, তার কি কোনও ব্যাখ্যা আছে? সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছিল। হঠাৎ দুর্গার খেয়াল হল। মেয়ে মিষ্টি একদম খায় না। কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে ও শুধু পায়েসের ভক্ত। পায়েস পেলে কয়েক চামচ ও খাবেই।

আজ বাথরুম থেকে বেরিয়ে দুর্গা পায়েস রান্না করতে ব্যস্ত হল। অনেক দিন পরে পায়েস রান্না করছে সে। কৌটোর দুধ এমনিতেই মিষ্টি হয়, ঠিক ম্যানেজ করা মুশকিল। খুব সতর্ক হয়ে রান্না যখন শেষ, তখন স্বামী বাড়িতে ফিরল। হাসিমুখে তাকে চিঠিটা দিলে স্বামী চেয়ারে বসে চিঠি পড়ল। তারপর বলল, "কী কাণ্ড। আমি তো ভাবতেই পারছি না!"

"গর্ব হচ্ছে না?" দুর্গা জিজ্ঞাসা করল।

"হবে না? আমাদের বংশে কেউ এত দূরে পৌঁছবে ভাবতেই পারছি

না। ঢাকার সব আত্মীয়স্বজনকে ব্যাপারটা জানাতে হবে।”

“তারা তো কেউ তোমার মেয়েকে চোখেই দ্যাখেনি,” দুর্গা বলল।

“না দেখুক। ও তো আমাদের বংশের মেয়ে,” স্বামী একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করল, “ও কী বলছে? খুব খুশি তো?

“তোমার মেয়েকে আমি বুঝতে পারি না। এই চিঠি পড়ে ওর মুখে একচিলতে হাসিও ফুটল না,” দুর্গা বলল, “ও ভালবাসে বলে পায়েস বানালাম। কেমন হল কে জানে! চিঠির শেষটা দ্যাখো, ওরা আমাদের থাকার ব্যবস্থা করবে না।”

“ও।”

“সানফ্রান্সিস্কোয় মেয়ে একা যাবে? আমরা সঙ্গে যাব না?”

“মেয়ের সঙ্গে ওঁর স্কুলের টিচার নিশ্চয়ই যাবে।”

“তা যাক। আমরা শুনব না সেমিনারে মেয়ে কী বলছে?”

“তুমি কাল স্কুলে গিয়ে জানতে চাও, যদি আলাদা গিয়ে হোটেলে থাকো তাহলে সেমিনারে যেতে পারবে কিনা!”

“তুমি, তুমি যাবে না?”

“দু’জনে গেলে দোকানের কী হবে?” স্বামী তার ঘরে চলে গেল। স্বামীর শরীরটাকে পেছন থেকে দেখল দুর্গা। কোনও হেলদোল নেই, নিজের ঘরে ঢুকে গেল। একটা ব্যাপার ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে, মেয়ের ব্যাপারে স্বামী কখনওই নিজের মতামত চাপিয়ে দেবে না। মেয়ের যখন ছয় কি সাত বছর বয়স, তখন থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিল স্বামী। কখনওই মেয়ের সঙ্গে তর্ক করত না। যা বলার তাকে দিয়ে বলাত। কিন্তু মেয়ের পোশাক, প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস দেওয়ার সময় একটুও কার্পণ্য করত না। বেশি খরচ হচ্ছে বলে অসন্তোষও প্রকাশ করত না।

দুর্গার ক্রমশ ধারণা হল, মেয়ের অলৌকিক মেধা, স্কুলের প্রিন্সিপালের মেয়ের জন্যে গর্বিত কথাবার্তা স্বামীকে যতটা খুশি করেছে, তার চেয়ে নিজের অতিসাধারণ মেধার জন্যে তাকে লজ্জিত করেছে। আমেরিকায় এসে থেকে যাওয়া প্রচুর মানুষ যখন ইংরেজিতে কথা বলে তার সঙ্গে শিক্ষিত ইংরেজিবলিয়েদের খানিকটা পার্থক্য থাকেই। এরা মূলত শ্রমজীবী মানুষ। বেশিরভাগই ব্যাকরণ মেনে বাক্য বলেন না। ওই ভাবে কথা বলতে অভ্যস্ত স্বামী মেয়ের স্কুলে গিয়ে চেষ্টা করে যতটা কম কথা বলতে। যাওয়ার সময় দুর্গাকে বলত, “আমি ওদের উচ্চারণ ঠিক বুঝতে পারি না। যদি কিছু জানতে চায় তাহলে তুমি উত্তর দিয়ো।”

স্কুলে গিয়ে ইংরেজি শেখার পর থেকে মেয়ে বাড়িতে ফিরে এসে মায়ের সঙ্গে সেই কথাগুলো বারবার আওড়াত। প্রতিদিন শুনতে শুনতে ইংরেজি শব্দগুলোর নতুন উচ্চারণ কানে বসে গিয়েছিল দুর্গার।

কিছুদিন হল দুর্গার মনে হচ্ছে, মেয়েকে বাবা বেশ সমীহ করে চলে। আজ মেয়ের এত বড় খবর পেয়ে অবশ্য স্বামী খুশি হয়েছে কিন্তু সেই খুশিটা মেয়ের সঙ্গে উপভোগ করার সময় নিজের অক্ষমতা স্পষ্ট করে দিল। মানুষটাকে এই মুহূর্তে খুব অসহায় বলে মনে হল দুর্গার।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলে প্রথমে সে মেয়ের ঘরে গেল। সেই একই ভঙ্গিতে বসে মেয়ে কী সব লিখে যাচ্ছে। কাছে গিয়ে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল, “অনেকক্ষণ হল, এবার শুয়ে পড়।”

মেয়ে মুখে কিছু বলল না, মাথা নেড়ে বোঝাল, শোবে।

“পায়েস কেমন লাগল?”

“থ্যাঙ্ক ইউ মম,” মায়ের দিকে না-তাকিয়ে মেয়ে বলল।

মেয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে ডাইনিং স্পেসের আলো নিভিয়ে দুর্গা স্বামীর ঘরের দিকে তাকাল। মাত্র ন’বছরের মেয়ে পড়াশুনায় যে-খ্যাতি পাচ্ছে, তা মানুষটাকে যেন জড়সড় করে দিচ্ছে। সে স্বামীর ঘরের দরজায় মৃদু শব্দ করে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করতে না-করতেই সেটা খুলে গেল। কোনও প্রশ্ন না করে স্বামী দুর্গার দিকে তাকাল।

“ঘুমিয়ে নিশ্চয়ই পড়োনি?”

“পড়ব।”

“কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?”

“কোনও জরুরি কথা আছে? কোনও দরকার?”

“না। শুয়ে পড়ো,” দুর্গা নিজের ঘরে চলে এল।

কয়েকদিন পরে দুর্গা দোকানে থাকাকালীন শোভনের ফোন এল, “আপনার সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করছি!”

“সরি, সরি। ক’দিন একটা এমন ঝামেলায় ছিলাম যে, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার সময় পাইনি,” দুর্গা বলল।

“মনে হচ্ছে ভয়ংকর সমস্যায় পড়েছিলেন। সেটা কি এখনও রয়েছে?”

হেসে ফেলল দুর্গা, “সমস্যা তো চট করে চলে যাওয়ার জন্যে আসে না। আচ্ছা, বলি আপনাকে, আমার একটি মেয়ে আছে তা নিশ্চয়ই জানেন না!”

“জানি, মানে হরেন্দ্রনাথবাবুর মুখে শুনেছি। সে নাকি ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী। মেধাবী বললে কম বলা হবে।”

“উনি জানলেন কী করে?” অবাক হয়ে প্রশ্ন করল দুর্গা।

“আপনার হাজব্যান্ডের কাছে হরেন্দ্রনাথবাবু শুনেছেন। উনি তো ভেবে ফেলেছেন, লাস ভেগাসে আমাদের সম্মেলনে আপনাদের মেয়েকে বেশ বড়সড় সংবর্ধনা দেবেন। আজ অবধি কোনও বাঙালি এমন কৃতিত্ব দেখায়নি। আচ্ছা আপনার মেয়ের বয়স এখন কি নয়?” শোভন জিজ্ঞাসা করল।

“হ্যাঁ। কী করে যে ও পড়াশোনায় এত ভাল হল, তা ভগবান জানেন। আচ্ছা, আমি যদি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিই তাহলে আমাকে কী করতে হবে? দেখতেই পাচ্ছেন, এই ব্যবসাটার বেশিরভাগটা আমাকেই সামলাতে হয়। এটা সামলে আমি কতটা কী পারব বুঝতে পারছি না!” জিজ্ঞাসা করল দুর্গা।

“প্রথম কথা, যা করার তা আপনাকে নিউ ইয়র্কে বসেই করতে হবে। বাইরে ছোটাছুটি যা করার তা আমরাই করব। আমরা ঠিক করেছি নিউ ইয়র্কেই আমরা ফেস্টিভালের মূল অফিস করব। ফেস্টিভাল শুরুর তিন সপ্তাহ আগে অফিস লাস ভেগাসে স্থানান্তরিত হবে। এতে নিশ্চয়ই আপনার অসুবিধে হবে না?” বেশ বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করল শোভন।

হেসে ফেলল দুর্গা, “কিন্তু কী করতে হবে তা বললেন না?”

“আপনার পক্ষে যা করা সম্ভব, তার বেশি কিছু করতে বলা হবে না। এসব ব্যাপারে হরেন্দ্রনাথবাবু আপনার সঙ্গেও আলোচনা করবেন। আমি যদি কাল আপনাকে ফোন করি আপত্তি নেই তো?

হেসে ফেলল দুর্গা। বলল, “আজ ফোন রাখছি।”

ফোন রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ ভাবল দুর্গা। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল স্বামী কাছেপিঠে নেই। সে এগিয়ে গিয়ে কাপড়ের পরদা সরিয়ে ছোট ঘরটায় উঁকি মারতেই দেখল স্বামী চেয়ারে বসে যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। এই ব্যাপারটা সে কিছুকাল হল মেনে গিয়েছে। স্বামী যা করছে তা খুবই অন্যায় কাজ, সে আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু সেই আপত্তি কানে তোলেনি স্বামী। কলকাতা-ঢাকার বিখ্যাত শিল্পীদের গানের সিডির ডুপ্লিকেট বিক্রি করা যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তা জেনেও অতিরিক্ত লাভের আশায় স্বামী বিরত হচ্ছে না। শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে দুর্গা। এই একটা ব্যাপার উপেক্ষা করলে অশান্তি থেকে দূরে থাকা যায়। দুর্গা একটু গলা তুলে বলল, “কথা আছে।”

কাজ থামাল স্বামী। কিন্তু মুখ না-ফিরিয়ে বলল, “কী ব্যাপারে?”

“শোভনবাবুরা যে-সম্মেলন করবেন, তাতে অংশ নেবে বলে কথা দিয়েও তুমি সরে দাঁড়াচ্ছ কেন? তোমার অসুবিধে কোথায়?” জিজ্ঞাসা করল দুর্গা।

“বলেছিলাম, কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম ওসব আমার জন্যে নয়।”

“কেন নয়?”

“সম্মেলনের দায়িত্ব নিলে এত কষ্ট করে এই যে ব্যবসাটা দাঁড় করিয়েছি, তা ভেসে যাবে। তাছাড়া ওসব গানবাজনা নাচ নাটক

সম্পর্কে আমার যেমন কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তেমন আগ্রহও নেই। আর হ্যাঁ বলেছিলাম বলে ভেবেচিন্তে না বলতে পারব না? এখনও তো কোনও কাজ আরম্ভ হয়নি," মুখ নামাল স্বামী, যেন যা বলার তা তার বলা হয়ে গেছে, "শুনলাম, হরেন্দ্রনাথবাবু খুব আপসেট হয়ে পড়েছেন। আমি সম্মেলনের মঞ্চের অনেক দূরে যেখানে স্টল থাকে, সেখানে ব্যবসা করতে যাই, ওর বেশি কিছু না। আমি দুঃখিত, না-ভেবেচিন্তে হরেন্দ্রনাথবাবুকে সম্মতি দিয়েছিলাম।" এবার মুখ ফেরাল স্বামী, "তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে আমার বদলে তুমি ওদের সঙ্গে যোগ দাও না। হয়তো নতুন ধরনের কাজ তোমার ভাল লাগবে? দোকানে যদি সবসময় হাজির না-থাকতে পারো, চিন্তা কোরো না, আমরা তো আছি।"

পেছন থেকে স্বামীর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এল দুর্গা। স্বামীর কথা বলার ধরন তার পছন্দ হয়নি। যে-সরল সাদাসিধে কথা ওর মুখে শুনতে সে অভ্যস্ত, এখনকার কথা যেন তা থেকে অনেক আলাদা।"

নিজের চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ গুম হয়ে ছিল সে। এই সময় পর পর কয়েকজন কাস্টমার দোকানে আসায় ভাবনাটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারল সে।

কিন্তু দোকান থেকে বেরিয়ে আসার আগে সে ফোন করল শোভনকে। বলল, "দেখুন, এই অনুষ্ঠান অর্গানাইজ করার ব্যাপারে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। প্রথম দিকে যদি আমাকে কিছু হালকা কাজ দেওয়া হয়, তাহলে আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে পারি।"

আচমকা যেন খুশিজড়ানো চিৎকার ছিটকে বের হল শোভনের গলা থেকে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ। প্রথম দিকে যাতে আপনার ওপর কোনও চাপ না-পড়ে সেই ব্যাপারে আমি নজর রাখব। আপনি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন।"

"তাহলে ঠিক আছে," হাসল দুর্গা।

বাড়িতে ফেরার পর মেয়ের আন্টি চলে যাওয়ার আগে দুর্গার সামনে এলেন, "তাহলে আগামীকাল থেকে আসতে হবে না?"

"আগামীকাল থেকে? কে বলল?" দুর্গা অবাক।

"স্কুল থেকে আপনাদের যে-চিঠি দিয়েছে, তা ও নিয়ে এসেছে। ওর মুখেই শুনলাম কাল স্কুল ওকে সানফ্রান্সিসকোতে নিয়ে যাবে," প্রৌঢ়া বললেন, "দিদি, ওইটুকু মেয়েকে আপনারা কেন একা ছেড়ে দিচ্ছেন? আমি পারতাম না, সঙ্গে যেতাম। পড়াশোনায় যত ভাল হোক না-কেন, জীবন সম্পর্কে তো কোনও জ্ঞান ওই মেয়ের নেই।"

"ঠিকই বলেছেন। আপনাকে আমি ফোন করে সব জানাব," মুখ নিচু করে বলল দুর্গা।

ভদ্রমহিলা বেরিয়ে গেলে মেয়ের ঘরের দরজা ঠেলে তাকাতেই দেখতে পেল সে খাটে শুয়ে আছে কিন্তু হাতে বই ধরা। মাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মেয়ে বই পাশে নামিয়ে রেখে বলল, "গুড ইভনিং মা।"

"গুড ইভনিং।" দুর্গা মেয়ের খাটের পাশে এসে দাঁড়াতেই মেয়ে একটা খাম এগিয়ে ধরল।

"কী এটা?" বলে খামটা হাতে নিয়ে দুর্গা দেখল ওপরে তাদের স্বামী-স্ত্রীর নাম লেখা, একপাশে নীচের দিকে স্কুলের নাম ছাপা।

খামটা খুলে ভেতর থেকে চিঠিটা বের করল দুর্গা। স্কুল থেকে জানিয়েছে, আগামীকাল দুপুর বারোটায় মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে হবে। তার সঙ্গে তিনদিনের বাইরে যাওয়া এবং হোস্টেলে থাকার পোশাক দিতে হবে। মেয়ের তিনদিনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে একটা লিস্ট তৈরি করে ব্যাগে দিয়ে দিতে হবে। মেয়ের যাবতীয় দায়িত্ব সেমিনার কর্তৃপক্ষ নেবে। তাছাড়া স্কুলের প্রিন্সিপালও সঙ্গে থাকবেন।

"এই চিঠিতে কী লেখা আছে তা তুই জানিস?" দুর্গা জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়ল মেয়ে, "প্রিন্সিপাল টৌল্ড মি।"

"তুই পারবি আমাদের ছাড়া একা যেতে?" দুর্গা সরাসরি জিজ্ঞাসা করল।

"ওয়েল, আমি তো সকালে বাড়ি থেকে তোমাদের ছাড়া স্কুলে যাই, ফিরেও আসি। আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে," মেয়ে চোখ বন্ধ করল।

সারাদিন স্কুলে কাটানো আর তিন দিন তিন রাত নিউ ইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকোতে গিয়ে একা থাকা যে এক কথা নয়, তা বলতে গিয়েও দুর্গা কথা বাড়াল না। মেয়ের মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে ও একা যাওয়ার সিদ্ধান্তে একটুও ভয় পায়নি।

মেয়েকে একা ছাড়তে একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না। নিউ ইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো প্লেনে উড়ে যেতে অন্তত সাড়ে ছ'ঘন্টা সময় লাগবে। বাসে বা ট্রেনে যাওয়ার কথা সাধারণত কেউ ভাবে না। অতদূরে ওইটুকু মেয়ে একা চলে যাবে? হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল নিশ্চয়ই সঙ্গে থাকবেন, ওখানে গেলে অন্যান্য স্কুলের ছেলেমেয়েদের পাশে পাবে কিন্তু ওদের কারও সঙ্গে কি ও কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারবে? তাছাড়া এখনও ওর শরীরের পরিবর্তন হয়নি বটে তবে অনেকের তো ন'-সাড়ে নয় বছর বয়সেই তা হয়ে যায়। ওখানে গিয়ে সেরকম কিছু হয়ে গেলে ওইটুকু মেয়ে সামলাবে কী করে?

নিজের ঘরে ফিরে এসে দুর্গা ভাবল, স্বামী ফিরে এলে এ বিষয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করবে। কিন্তু পরে মনে হল, এর চেয়ে স্কুলের প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলা অনেক কাজের হবে।

স্কুলের শেষ সুভেনিয়রটা বের করে প্রিন্সিপালের ফোন নম্বর নিয়ে ডায়াল করল দুর্গা। ভদ্রমহিলা সাড়া দিলে নিজের পরিচয় দিল সে। ভদ্রমহিলা বেশ খুশি হলেন, "আমি আপনাকে ফোন করতাম। আপনাদের মেয়ে আমার স্কুলের গর্ব। যে-সম্মান সে এনে দিয়েছে, তা আমরা কখনও কল্পনাও করিনি। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। আমি ওর সঙ্গে যাচ্ছি। ওর যাতে কোনও অসুবিধা না-হয়, তা আমি লক্ষ রাখব। ও আজকে একটা চিঠি নিয়ে গিয়েছে। ওখানে যা যা দিতে বলা হয়েছে, তা দিলেই হবে। বলুন, আর কিছু..."

"ম্যাডাম, এই প্রথম ও আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে..." কথা শেষ করল না দুর্গা।

"আমি লক্ষ রাখব। এ নিয়ে ভাববেন না," তারপর একটু হেসে বললেন, "আপনি তো জানেন মেয়েদের জীবনের এক-চতুর্থাংশ সময় বাবা-মায়ের সঙ্গে কাটে। সেটা যখন হবেই তখন ওকে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিন।"

একটু ইতস্তত করেও মেয়ের জন্যে যে-দুশ্চিন্তা হচ্ছে সেকথা প্রিন্সিপালকে বলল না দুর্গা। তার নিজের পরিবর্তন এগারোর আগে হয়নি। সেই বয়সে মেয়ের যেতে দেড় বছর বাকি। এখনই চিন্তা করে লাভ কী!

পরের দিন স্কুল শুরুর সময়েই দুর্গা আর তার স্বামী মেয়েকে স্কুলে নিয়ে এল। প্রিন্সিপাল ওদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন, "গুড মর্নিং। আমি ভেবেছিলাম আজ আপনারা মেয়েকে একটু দেরিতে স্কুলে পৌঁছে দেবেন, আপনারা অন্য দিনের মতো ক্লাস শুরুর সময়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছেন বলে অনেক ধন্যবাদ।"

দুর্গা বলল, "আপনি সঙ্গে যাচ্ছেন বলে আমরা অনেক নিশ্চিন্ত।"

"কোনও চিন্তা করবেন না। আমরা সবাই প্রে করছি যাতে সানফ্রান্সিসকোতে আপনাদের মেয়ে আমাদের স্কুলের নাম উজ্জ্বল করে।"

বিদায় নেওয়ার সময় দুর্গা মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেও ওর বাবা ম্লান হাসিমুখে মাথা নাড়ল। বলল, "ফোন করিস।"

এই প্রথম বাড়ির বাইরে। এতকাল গোটা দিন বাবা অথবা মায়ের মুখ দেখতে পেত না, যেটুকু সময় দেখত বাইরে এসে সেই না-দেখাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল না মেয়ের। নিউ ইয়র্কের কেনেডি এয়ারপোর্টে বিমানে উঠে বসে সে বই খুলে বসেছিল। বিমান আকাশে উড়লে জানলার বাইরে তাকায়নি। প্রিন্সিপাল পাশে বসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মেঘ দেখবে না?"

"আমি যদি ফেরার সময় আকাশ দেখি..." মেয়ে কথা শেষ করল না। প্রিন্সিপাল হেসে মাথা নাড়লেন।

সুন্দর গেস্ট হাউসের ঘর। সেখানে জিনিসপত্র রেখে প্রিন্সিপাল নিজের ঘর হয়ে খাবারের ঘরে এলেন। বললেন, "আজ অনেকখানি উড়ে এসেছি আমরা। এখন সন্ধে হয়ে গেছে। রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়াই ভাল। দরজা ভাল করে বন্ধ করে রাখবে। কোনও প্রয়োজন হলে বেল বাজাবে অথবা থ্রি ওয়ান টু নম্বরে ডায়াল করবে। আমার ঘরের ফোন নাম্বার।"

এরকম ঝাঁ চকচকে ঘরে কখনও থাকেনি মেয়ে। যেমন বিছানা, তেমনই আসবাব। বাথরুম যে এরকম হতে পারে, তা ওর জানা ছিল না।

ঝিমুনি এল। পোশাক বদলে শুয়ে পড়ল মেয়ে। শোওয়ামাত্র তার মনে পড়ল বাবার মুখ, মায়ের মুখ। বাবা মানুষটা কথা কম বলে, তার সঙ্গে বলেই না বলা চলে। স্কুলে তাকে পৌঁছে দিতে এসেছিল দু'জনে। যাওয়ার সময় বাবা বলেছিল, ফোন করিস। তখন কি বাবার মুখে খুশির হাসি ফুটে উঠেছিল? বুঝতে পারেনি মেয়ে।

এই ঘরে একটা ফোন আছে। সেটার দিকে তাকাতেই উঠে বসল সে। নিশ্চয়ই এই ফোনে বাড়িতে কথা বলা যাবে। সে বিছানা থেকে নেমে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ফোনটাকে দেখল। একটা বোর্ডে কোথাও ফোন করতে হলে আগে কী নম্বর টিপতে হবে, তা লেখা রয়েছে। কোনও সমস্যা নেই। মেয়ে বাবার নম্বর টিপতেই বুঝতে পারল ওদিকে জানান দিচ্ছে। খানিক বাদে বাবার গলা শুনতে পেল সে। যদিও টেলিফোনে সে বাবার গলা কখনও শোনেনি কিন্তু এই নম্বর আর কারও ধরার কথা নয়।

দ্বিতীয়বার একটু জোরে হ্যালো শুনতেই মেয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ করল, "আমরা পৌঁছে গিয়েছি। খুব ভাল হোটেলে আছি। এখন ঘুমাতে চাইছি। গুড নাইট," রিসিভার নামিয়ে রাখল মেয়ে।

সম্মেলন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুর্গা। মেয়ে এখন বাড়িতে নেই। পুরো রাত আর গোটা দিনের বেশির ভাগ সময় স্বামীর সঙ্গে একই বাড়িতে থাকলেও কথা হয় গোটা কয়েক। তার চেয়ে অনেক বেশি কথা হয়েছে শোভনের সঙ্গে। কী কী কাজ নিউ ইয়র্কে বসে দুর্গাকে করতে হবে তার একটা তালিকা তৈরি করে পরের দিন নিউ ইয়র্কে এসে সে আলোচনা করবে বলে স্থির হয়েছে।

কিন্তু বিকেলবেলায় টেলিফোনটা এল। একজন মহিলা দিলারাকে চাইল। দিলারা তখন নতুন আসা প্যাকেট খুলে জিনিসের তালিকা তৈরি করছিল। দুর্গা তাকে ফোন ধরতে বলল।

দিলারা এগিয়ে এসে 'হ্যালো' বললে দুর্গা নিজের কাজে মন দিল। কিন্তু তার পরেই দিলারার উত্তেজিত গলা কানে এল, "কে? কে আপনি?"

দুর্গা চোখ তুলে তাকাল। দিলারা তখন বেশ উত্তেজিত, "দেখুন, আমি আপনাকে চিনি না। আপনার কাছাকাছি পলাশ থাকলে ওকে ফোনটা দিন। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই," তারপর কয়েক সেকেন্ড দিলারা বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে রিসিভার আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তার মুখ এখন লালচে। তার পরেই দিলারা অত্যন্ত কাতর গলায় বলে উঠল, "পলাশ, এই মেয়ে কে? এসব কী বলছে ও? পলাশ, তুমি ভাল আছ তো? প্লিজ, কথা বলো পলাশ!"

তারপর ওপাশ থেকে উচ্চারিত কথাগুলো শুনতে শুনতে দিলারার হাত থেকে ফোনটা খসে পড়ল মাটিতে। দুর্গা দেখল শরীর দুলে উঠল দিলারার। দুর্গা কিছু করার আগেই মেয়েটা চেতনা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল নীচে। চিৎকার করে ছুটে গেল দুর্গা। দিলারার হুঁশ নেই।

দুর্গা চিৎকার করে স্বামীকে ডাকল, "শুনছ?"

হয়তো এই প্রথম স্ত্রীর মুখে ওই গলায় 'শুনছ' শব্দটি শুনে হতচকিত হলেও দ্রুত চলে এল স্বামী। তারপর ধরাধরি করে দিলারাকে শুইয়ে দিল দুর্গা। জলের বোতল থেকে জল দিলারার কপালে, ঘাড়ে ছিটিয়ে দিতে লাগল। এই সময় স্বামী জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছিল?"

"একটা ফোন এসেছিল। সেই ফোনের কথা শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে জ্ঞান হারাল," দুর্গা ঝুঁকে ওকে ডাকল, "দিলারা, এই দিলারা!"

"আমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসব?" স্বামী উঠে দাঁড়াল।

"একটু অপেক্ষা করো," আরও দু'বার দিলারার কপালে, গালে হাত বুলিয়ে দেওয়ার পরে ধীরে ধীরে চোখ খুলল সে। কয়েক সেকেন্ড ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকার পর ডুকরে কেঁদে উঠল।

দুর্গা স্বামীকে ইশারা করল, ডাক্তারের দরকার নেই। তারপর দিলারাকে জিজ্ঞাসা করল, "কে ফোন করেছিল? এত আপসেট হয়ে পড়লে কেন?"

বলামাত্র দুর্গাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল দিলারা। তারপর তার কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

দুর্গা চাপা গলায় বলল, "আঃ, কী করছ? এটা দোকান। যে-কোনও মুহূর্তে কাস্টমার আসবে। শান্ত হও।"

কান্না গিলতে গিলতে দিলারা বলল, "আমি আর বাঁচতে চাই না আপা।"

যেহেতু এই এলাকা একটি ব্যবসাকেন্দ্র এবং সত্তরভাগ ব্যবসায়ী বা তাদের ব্যবসার কর্মচারীরা বাংলাদেশের মানুষ, তাই কয়েক বছর হল একজন বাঙালি ডাক্তার ছোট চেম্বার খুলে বসেছেন। তাঁকে শারীরিক সমস্যা বোঝাবার সময় যেহেতু ইংরেজি বলার প্রয়োজন হয় না এবং রোগী দেখে প্রেসক্রিপশন লেখার বৈধ অনুমতি তাঁর আছে, তাই বিকেল তিনটের পর রোগী সামলাতে ভদ্রলোক হিমসিম খান। সকালের দিকে তাঁর চেম্বার একেবারেই খালি থাকে। চাকরি করতে দূর দূর থেকে আসা কর্মচারীরা এই এলাকায় এসে দুপুর শেষ না-হলে ডাক্তার দেখানোর সুযোগ পায় না। ডাক্তার মৃদুভাষী। তিনি রোগের বিবরণ মন দিয়ে শুনে প্রেসক্রিপশন লিখে দেন তাঁর স্ত্রীকে। স্ত্রী পেশাদারি ব্যাপারগুলো সামলান।

এই সময় ভিড় নেই বলে স্বামী ডাক্তারকে নিয়ে আসতে পারল। কী হয়েছে তা জেনে নিয়ে ডাক্তার পরীক্ষা শুরু করলেন। সেটা শেষ করে প্রেসক্রিপশনে লিখলেন, "চিন্তামুক্ত বিশ্রাম দরকার।"

সেটা দেখে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক কী হয়েছে?"

"কোনও কারণে মানসিক আঘাত পেয়েছে। আজকের দিনটা বিশ্রাম নিলে অনেকটা ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তার কিছু নেই। ওর নাম কী?"

"দিলারা," দুর্গাই উত্তর দিল।

ডাক্তার প্রেসক্রিপশনে নামটা লিখে বললেন, "নামকরণে ভুল হয়নি," তারপর সম্মানদক্ষিণা নিয়ে বিদায় নিলেন। স্বামী গেল এগিয়ে দিতে।

দুর্গা জিজ্ঞাসা করল, "এখন তোর কী রকম লাগছে?

কথা বলল না, বড় শ্বাস ফেলল দিলারা।

"বাড়ি চলে যেতে পারবি?" দুর্গা জিজ্ঞাসা করামাত্র হু হু করে কেঁদে উঠল দিলারা, "আমি বাঁচতে চাই না, ও এরকম করবে কখনও ভাবিনি!"

"এসব নিয়ে আর ভাবিস না। শরীর আরও খারাপ হবে," দুর্গা বলল।

"আমি মরে যেতে চাই আপা। আমি অন্ধের মতো নির্ভর করেছিলাম।"

"সেটাই তো ভুল হয়েছিল। চোখ থাকতেও না-দেখে কেন অন্ধ হয়ে ছিলি? কত দিনের পরিচয় তোদের?"

"চার বছর। উঃ।"

"যে-মেয়েটা ফোন করেছিল তাকে তুই চিনিস?"

চোখ উপচে জল গড়াল গালে। কথা না বলে মাথা নেড়ে দিলারা জানাল, না, সে চেনে না। তারপর আঙুলে চোখের জল মুছল।

"তোকে নাম বলেছে?"

"না! উঃ। ওর কথা আর বোলো না!"

"তাহলে কেঁদে ভাসাচ্ছিস কেন? তোর সঙ্গে চার বছর ধরে প্রেম করার পর কয়েক মাস অন্য শহরে গিয়ে যে-ছেলে আর একটা মেয়ের প্রেমে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়, তার জন্যে কেন কাঁদছিস তুই?" বেশ রাগী গলায় প্রশ্ন করে উঠে দাঁড়াল দুর্গা, "এক কাজ কর। ওই রেকর্ডের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। আমি ওনাকে বলে দেব, আজ ও-ঘরের কাজ বন্ধ রাখতে। যা।"

"আমি, আমি বিষ খাব!" ফিসফিস করে দিলারা কথাগুলো বললেও কানে এল দুর্গার। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ওপরে উঠে সজোরে নেমে এল দিলারার গালে। দিলারার গালে দুর্গার সেই চড়ের শব্দ কানে যেতে হতভম্ব হয়ে গেল স্বামী। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর ডুপ্লিকেট সিডির ঘরে দৌড়ে চলে গেল দিলারা। তার পা ঠিক জায়গায় পড়ছিল না।

স্বামী এগিয়ে এল, "এ কী করলে?"

দুর্গা উত্তর দিল না। পিছু ফিরে চোখের জল মুছতে না-মুছতেই স্বামীর গলা কানে এল, "আসুন।"

নিজেকে যতটা সম্ভব সহজ করে দুর্গা ফিরে তাকাল। তিনজন নারী এবং একজন পুরুষ দোকানে এসেছেন। স্বামী তাঁদের সঙ্গে কথা বলছে। দুর্গা মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল।

একটু একটু করে দোকানের আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে এল।

দুপুরে স্বামী কাছে এল, "শোনো, মাঝে মাঝেই মেয়েটা কাঁদছে বলে মনে হচ্ছে। ওকে এখন দোকানে রাখা ঠিক হবে না। তুমি যদি ওকে এখন বাড়িতে নিয়ে যাও, তাহলে ভাল হয়। আমি দোকান সামলাচ্ছি।"

প্রস্তাবটা মনে ধরল দুর্গার। দিলারাকে একটু স্বাভাবিক করে দোকান থেকে রওনা হল। কিন্তু তার সতর্ক নজর থাকল মেয়েটার ওপর। ওর মুখ চোখ ভাল লাগছিল না। পুরোটা পথ, যা রোজ হেঁটেই সে যাতায়াত করে, আজ দিলারার কথা ভেবে ক্যাব নিল দুর্গা, ক্যাবে ওঠামাত্র শোভনের ফোন এল, "নিউ ইয়র্কে এসেছি। দোকানে কি কাজের চাপ আছে?"

"না।"

"তাহলে কোথায় দেখা করা যেতে পারে?"

"আজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পরে ফোন করব," লাইন কেটে দিল দুর্গা। পাশে বসা দিলারা তখন জানলার বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। দিলারাকে দুর্গা জিজ্ঞাসা করল, "নিউ ইয়র্কে তোমার নিকট আত্মীয় কে আছেন?"

"নিকট?" মাথা নাড়ল দিলারা, "আর কাউকে আমি নিকট মানুষ বলে মনে করি না। আজ আমার সব শেষ হয়ে গেছে!"

বিরক্ত হল, কিন্তু কথা বাড়াল না দুর্গা।

ইদানীং দুপুরের এই সময়ে বিশেষ বাড়িতে আসা হয় না। বাড়িতে ঢোকার পরেও দিলারার কান্না থামছিল না। দুর্গা তাকে মেয়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, "কার জন্যে এত চোখের জল জানি না। সেই ছেলে তো এর মধ্যেই আর একজন মেয়ের সঙ্গে আকাশে উড়ছে। লজ্জা করছে না ওইরকম ছেলের জন্যে কেঁদে ভাসাতে। যাক গে, এখানেই বিশ্রাম নে। আমি ভাত বসাচ্ছি, হয়ে গেলে ডাকব।"

মেয়েকে ফোন করল দুর্গা। ফোন বন্ধ। সে মাথা নাড়ল। নিশ্চয়ই ওদের সেমিনার শুরু হয়ে গিয়েছে। বুক ভরে বাতাস নিল দুর্গা। বাংলাদেশের একটি সাধারণ পরিবারে জন্মে সে কখনওই কল্পনা করেনি, একদিন আমেরিকায় এসে থাকবে, নিউ ইয়র্ক শহরে তাদের নিজস্ব দোকান থাকবে। এই নিউ ইয়র্কে মেয়ে জন্মানোর পর আড়াইখানা ঘরের বন্ধ দরজা জানলার ভেতরে সে যখন দিনের পর দিন চোখের জল ফেলে কাটিয়েছে, তখন কি কল্পনা করেছিল একদিন স্বাধীনতা পাবে! লোকে বলে বাবা বা মা কিংবা বংশের ধারা সন্তানেরা পেয়ে থাকে। কিন্তু তার বা স্বামীর বংশের ধারা বলতে যা ছিল, তা কি পাঁচজনকে বলার মতো? স্বামীর শেষ পরীক্ষার ফল ছিল অতি সাধারণ। ওই বিদ্যে নিয়ে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে বাংলাদেশে দারিদ্রসীমার নীচে থেকে ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। স্বামী একটা হস্তশিল্পের প্রদর্শনীতে বড় কোম্পানির কর্মী হিসেবে এসেছিল নিউ ইয়র্কে। প্রদর্শনী শেষ হলে সবাই যখন ফিরে গিয়েছিল, তখন দুঃসাহসী হয়ে থেকে গিয়েছিল আমেরিকায়। এই দোকানে সেই দোকানে নামমাত্র মাইনেতে পালিয়ে পালিয়ে চাকরি করেছিল কয়েক বছর। আর তার পরেই ওর কপাল খুলে গিয়েছিল। প্রতি বছর বেআইনিভাবে আমেরিকায় থাকা বহিরাগতদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে মার্কিন সরকার। নাম-ঠিকানা লিখে আবেদন জানাতে হয়। অগুনতি আবেদনকারীর মধ্যে প্রথম দিকে নাম-ওঠা কয়েকজনকে অবশ্যই নাগরিকত্ব দেওয়া হয়, বাকিদের জায়গা হয় কারাগারে।

স্বামীর কপাল ভাল ছিল। নাগরিকত্ব পেয়ে, প্রথমে চাকরি, পরে ব্যবসা শুরু করল। দেশে বাস করা অভিভাবকরা পাত্রী পছন্দ করে তার বিয়ে দিল। এই মানুষ সেই সন্তানের বাবা, যে-সন্তানকে আজকে শিক্ষক শিক্ষিকারা মিরাকল গার্ল বলছেন! স্কুলের প্রিন্সিপাল একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁদের বংশে নিশ্চয়ই মেধাবী সন্তান অনেকেই আছেন, তাদের মেধার বিবরণ তিনি জানতে চান। দুর্গা যখন সত্যি কথাটা জানিয়েছিল, তিনি খুব অবাক হয়েছিলেন। অনেকের মতো তাঁর ধারণা ছিল পূর্বপুরুষের অনেক কিছু পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এর প্রমাণ বহুবার পাওয়া গিয়েছে।

ভাত হয়ে গেলে ফ্রিজ থেকে রান্না করা মাংসের বাটি বের করে গরম করল দুর্গা। চুপচাপ এই কাজগুলো করার সময় তার মনে হচ্ছিল দুটো মানুষের মন, স্বভাব কখনওই এক হতে পারে না। বিয়ের আগে সে কখনওই প্রেমের কথা ভাবেনি। বিয়ের পর তেমন কিছু বোঝার আগে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। স্বামীর সঙ্গে কখনওই তার প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়নি। আর প্রেমের একটা বড় অংশ যদি ভালবাসা হয়, তাহলে সে স্বীকার করতে বাধ্য, মেয়ের সঙ্গেও কোনও দিন সেই সম্পর্ক তৈরি হয়নি। যতদিন পেটে ছিল, ততদিন মেয়ের কিছু করার ছিল না। বাইরে বেরিয়ে এসে যতদিন মেয়েকে মায়ের ওপর নির্ভর না-করলে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না, ততদিনের কথা বাদ দিলে যখন থেকে তার অস্বাভাবিক মেধা বুদ্ধি বেড়ে উঠতে লাগল, তখন থেকেই তো দূরত্ব বাড়ল। বাড়তে বাড়তে এখন তো একেবারে আলাদা জগৎ।

ব্যবসাটার হাল ধরার জন্যে স্ত্রীকে দোকানে নিয়ে গিয়েছিল স্বামী। কারণ মেয়ে তখন স্কুলে ভরতি হয়েছে। সারাদিন কিছু করার নেই। আর দোকানের বিক্রি ছাড়া অন্য উপায়ে রোজগারের নেশা চাপায় একজন অতি বিশ্বস্ত মানুষ দরকার। স্ত্রী ছাড়া সেই কাজ আর কে করতে পারে!

আমেরিকায় আসার পর ঘরে যখন প্রায় বন্দি হয়ে ছিল দুর্গা, তখন এক নিঃসঙ্গতাবোধে আক্রান্ত ছিল সে। দোকানে কাজ করতে এসে প্রথমদিকে তা কিছুটা কেটে গেছে বলে মনে হলেও, তা যেন আঠার মতো মনের গায়ে লেগেই ছিল। স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব বাড়ার পর যার সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি হল, সে যে তাকে শুধুই একজন পরস্ত্রী ছাড়া অন্য কিছু ভাবেনি তা দুর্গা কল্পনা করেনি। ধীরে ধীরে যখন লোকটার ওপর সে নির্ভর করতে শুরু করেছিল, তখনই ধাক্কা খেল। পরিস্থিতি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, একজন বিবাহিতা মহিলা আবার কন্যার মা-ও, তার সঙ্গে পার্ট টাইম প্রেম করা যায় কিন্তু জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বোধ হয় তাকে কল্পনা করা যায় না।

এই যে এখন শোভনের সঙ্গে কাজের যে-সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, সেটা যে শুধুমাত্র কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা একটু একটু করে অনুমান করছিল দুর্গা। অথচ শোভনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আঠারো-উনিশ বছর বয়সে মেয়েরা অন্ধের মতো যেরকম এগিয়ে যায়, এগিয়ে গিয়ে তাদের অন্তত শতকরা আশিভাগ ধাক্কা খায়, তিরিশের কোঠায় পৌঁছে সেই একই ভুল দুর্গা করবে?

তিনদিনের সেমিনারের প্রথম দু'দিন চমৎকার কাটল। বিকেল তিনটেয় সেমিনার শেষ হতেই প্রিন্সিপাল তাদের নিয়ে সানফ্রান্সিসকো শহর দেখাতে নিয়ে যেতেন। মেয়ের কাছে এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। কিন্তু তার মন পড়ে থাকত বাইরে নয়, ঘরে ফিরে তৃতীয় দিনের

সেমিনারে তাকে যে-পেপার পড়তে হবে, তা ঘষামাজা করতে। ওদের সঙ্গে থাকতেন বস্টনের এক শিক্ষক, যিনি প্রিন্সিপালের অনেক দিনের পরিচিত। তিনি যে-ছাত্রটিকে বস্টন থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন সে যে দুর্গার মেয়ের চেয়ে বয়সে অনেক বড়, তা দেখলেই বোঝা যায়। লম্বায় পাঁচ ফুট তিন-চার ইঞ্চি, দোহারা চেহারা। নাম টমাস। খুব শান্তশিষ্ট স্বভাব, কথা বলে নিচু গলায়। মেয়ের পাশে দাঁড়ালে যথেষ্ট ঢ্যাঙা দেখায়।

ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী। দ্বিতীয় দিনে সে তার পেপার পাঠ করল। এই সেমিনারের আলোচনার বিষয় ছিল, 'পৃথিবীতে মানুষ না-জন্মালে সভ্যতার কতটা সংকট বাড়ত?' টমাসের নিবন্ধপাঠ শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে শুনে খুশি হল। হাততালিতে ভরে গেল প্রেক্ষাগৃহ। সবাই যখন করতালি দিয়ে উৎসাহিত করছে, তখন শ্রোতাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে সে তার আসনে বসার আগে বাঁ পাশে তাকাল, "লাইক ইট?"

মাথা নাড়ল মেয়ে, "ইটস গুড। ইয়া, গুড!"

বিরতিতে টমাসের পেপার নিয়ে আলোচনা করছিলেন দর্শকরা। এত অল্প বয়সে দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত লেখা লিখেছে সে। কেউ বললেন, বস্টন হল পড়াশোনার শহর, পড়ুয়াদের জায়গা, সেখানে তো টমাসের মতো মেধাবী ছাত্র থাকবেই।

কথাগুলো কানে আসছিল। কিন্তু ছাত্রীকে ভরসা দিলেন প্রিন্সিপাল। বললেন, "কে কী লিখেছে তা নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। তুমি যা লিখেছ, তা মোটেই খারাপ হয়নি। কাল তোমাকেও শ্রোতারা উৎসাহিত করবে।"

কিন্তু সেই সন্ধেবেলায় মেয়ে ওই একই বিষয় নিয়ে আর-একটা লেখা লিখল। যে-লেখাটি তার প্রিন্সিপাল পড়েছিলেন, তা ছিল অনেক রকমের তথ্য দিয়ে সাজানো। এই লেখাটির শুরু আদিম মানুষকে দিয়ে। পৃথিবীতে তার উত্তরপুরুষের সংখ্যা আজ বেড়েই চলেছে। যে-মানুষ আফ্রিকায় জন্মেছে, তার বিজ্ঞান-ভাবনার সঙ্গে চিনে জন্মানো মানুষের বিজ্ঞান-ভাবনা এক খাতে বইলে সভ্যতা হয়তো এক পা-ও এগিয়ে যেত না। ভাবনা এক হলে আচরণে পার্থক্য কী থাকত? মানুষ জন্মেছিল বলেই বিজ্ঞান এগিয়ে যেতে পেরেছে। মোটামুটি একটা খসড়া করেও পছন্দ হল না মেয়ের। তৃতীয়বারের লেখাটা তাকে খানিকটা খুশি করল।

পরের দিন সেমিনারের শেষ দিন। প্রেক্ষাগৃহ উপচে পড়ছে আমন্ত্রিত শ্রোতায়। প্রথম দু'জনের পর নিউ ইয়র্কের মেয়ের নাম ঘোষণা করা হল। গত দু'দিন ধরে অংশ নেওয়া সব ছাত্রছাত্রী হাতে কাগজ নিয়ে পাঠ করছে। কিন্তু আজ নাম ঘোষণার পরে মেয়ে যখন মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তখন তার হাতে কোনও কাগজ নেই। সেটা দেখে প্রেক্ষাগৃহে মৃদু গুঞ্জন উঠল। 'পৃথিবীকে সংকটমুক্ত করার জন্যে মানুষের জন্মানোর প্রয়োজন ছিল।' লাইনটি সুন্দর গলায় উচ্চারণ করে পাঁচ সেকেন্ড থামল মেয়ে। আর সেই নীরবতায় মুগ্ধ হয়ে প্রেক্ষাগৃহে করতালির ঝড় উঠল। ঝড় স্তিমিত হয়ে এলে তার বক্তব্য বলতে শুরু করল মেয়ে। যেন চোখের সামনে রাখা কোনও কাগজে লাইনের পর লাইনে যা লেখা রয়েছে, তা সাবলীল গলায় পড়ে যাচ্ছে মেয়ে, শ্রোতাদের এমনই বোধ হচ্ছিল। কিন্তু সামনে কোনও কাগজ নেই, যা সে বলছে তা হয় তাৎক্ষণিক অথবা স্মৃতি থেকে তুলে নিয়ে এসে বলে চলেছে জোরালো গলায় তা বুঝতে পেরে বক্তব্য শেষ হওয়ামাত্র প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত শ্রোতা উঠে দাঁড়িয়ে করতালিতে উৎফুল্ল হল। সেই শব্দের ঝড়ের কাছে নতমুখী হয়ে রইল মেয়ে, ঝড় স্তিমিত হলে নিজের আসনে বসে পড়ল। তার প্রিন্সিপাল দৌড়ে চলে এলেন কাছে। সে উঠে দাঁড়াতেই জড়িয়ে ধরে বললেন, "অপূর্ব! আমি কী বলব, কীভাবে প্রশংসা করব তার শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি তোমার জন্যে গর্বিত।"

মেয়ে লাজুক হাসি হেসে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাম!"

আধঘন্টার বিরতি ঘোষণা করা হল। যে-ছেলেটির বক্তব্য একটু আগে প্রশংসিত হয়েছিল সে এগিয়ে এসে বলল, "দারুণ বলেছ! তোমার মেমরি খুব পাওয়ারফুল।"

"তার মানে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল মেয়ে।

"অতক্ষণ ধরে প্রতিটি শব্দ নির্ভুলভাবে বলে গেলে, মুখস্থ করে বলায় বোধহয় তুমি অনেকদিন ধরে অভ্যস্ত। তাই না?"

ঠিক তখনই টমাস এসে বলল, "কনগ্রাটস! চমৎকার হয়েছে।"

মেয়ে হেসে বলল, "ধন্যবাদ," তারপর সামনে দাঁড়ানো ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার একটু ভুল হয়েছে।"

"ভুল? আমার? কী রকম?" ছেলেটি চোখ ছোট করল।

"আমি আজ এখানে যা বললাম, তা যা অনুভব করেছি, তাই বললাম। মুখস্থ করে কিছু বললে কথাগুলো সাজানো হয়ে যায়। তাই না? এই যেমন, এখন আমরা যা বলছি, তা কেউ সাজিয়ে বলছি না। ঠিক কিনা!"

"ওঃ মাই গড!" ছেলেটির চোখ বিস্ফারিত হল, "তুমি মুখস্থ না-বলে চটজলদি বক্তৃতা দিলে! দ্যাটস গ্রেট!" বলে ছেলেটি সরে গেল সামনে থেকে।

আধঘণ্টা পরে প্রেসিডেন্টের ভাষণের পর অনুষ্ঠানের ঘোষক অংশগ্রহণকারী ছেলেমেয়েদের বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করলেন। প্রত্যেকের প্রশংসা করে জানালেন অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য, বিশ্লেষণ-পদ্ধতি এবং বিষয়ের উপস্থাপনার আঙ্গিকগুলো বিচার করে এই বছরের কমিটি শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিচ্ছে—

প্রবল করতালির মধ্যে নিউ ইয়র্কের মেয়ের নাম ঘোষণা করা হল।

করতালি স্তিমিত হয়ে এলে ঘোষণা করা হল, শ্রেষ্ঠ বক্তাকে দশ হাজার ডলার পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হল। শোনামাত্র শ্রোতারা আবার করতালির ঝড় তুললেন।

সব শব্দ স্তিমিত হলে মেয়ের স্কুলের প্রিন্সিপাল বললেন, "আমি তোমার মা-বাবাকে সুখবর জানাচ্ছি। তুমি পাশে থাকো, আমার কথা শেষ হলেই তুমি কথা বলবে।"

উচ্ছ্বসিত হয়ে মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন প্রিন্সিপাল। মেয়েকে দশ হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এই চেক স্কুলের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হলেও নিউ ইয়র্কে ফিরেই তিনি মেয়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেবেন। কথা শেষ করে তিনি বললেন, "এবার আপনি মেয়ের সঙ্গে কথা বলুন।"

মেয়ে ম্যাডামের মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে বলল, "হাই মম।"

দুর্গা কথা বলতে গিয়ে শব্দ উচ্চারণ করতে পারল না। তার গলা থেকে হুড়মুড়িয়ে কান্না বেরিয়ে এল। মেয়ে অবাক হয়ে বলল, "মম! কী হয়েছে?"

দুর্গা কথা বলতে গেল কিন্তু তার স্বরনালিতে জড়িয়ে থাকা কান্না প্রতিবন্ধকতা তৈরি করল। মেয়ে যখন দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করছে, তখন কোনও রকমে স্বর ফুটল গলায়, "না না, কিছু হয়নি। আমি খুব খুশি, খুউব। তুই, তোরা কাল কোন ফ্লাইটে আসবি?"

"আমি জানি না। ম্যামের সঙ্গে কথা বলো। বাট, তোমার কী হয়েছে? মম, তুমি কি অসুস্থ?"

বড় শ্বাস ফেলল দুর্গা, বলল, "নারে, আমি আজ খুব সুস্থ।"

ফোন রেখে বাঁ দিকে তাকাল দুর্গা। দিলারা মুখ নিচু করে বসে আছে। এই দু'দিন ওকে নিজের সঙ্গে রেখেছে দুর্গা। একটা মানুষের আচরণ আচমকা এতটা পালটে যেতে পারে, তা ধারণায় ছিল না তার। দেখলেই মনে হয়, মেয়েটার জীবনে উৎসাহিত হওয়ার মতো কিছু অবশিষ্ট নেই। মেয়েটার কাছে গিয়ে দুর্গা বলল, "মেয়ে ফোন করেছিল।"

দিলারা একবার তাকাল। তারপর মুখ নামিয়ে নিল।

"সেমিনারে ওর বক্তৃতা পুরস্কৃত হয়েছে। ওইটুকু মেয়ে অনেক বড় ছেলেমেয়েদের চেয়ে এত ভাল বলেছে যে, ওকে দশ হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।"

"সত্যি?" হঠাৎ সোজা হয়ে বসল দিলারা।

"হ্যাঁ।"

"ও বড় বড় ছেলেদের হারিয়ে পুরস্কার পেয়েছে?"

"শুধু ছেলে নয়, মেয়েও ছিল।"

অদ্ভুত খুশির আলো ফুটে উঠল দিলারার মুখে। হাসিটা ফুটেছিল দুর্গার উত্তরটা শোনার আগেই।

পরদা ফেলা ঘরের ভেতর উঁকি দিল দুর্গা। চোখ বন্ধ করে বসে আছে স্বামী। দুর্গা বলল, "মেয়ের ফোন এসেছিল।"

সোজা হয়ে বসে চোখ খুলল স্বামী, "ও।"

"আজ ওদের সেমিনার শেষ হয়েছে। ও প্রথম পুরস্কার হিসেবে দশ হাজার ডলার পেয়েছে। ভাবতেই পারছি না।"

বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুল অদ্ভুতভাবে ঘোরাল স্বামী। যার ঠিক অর্থ দুর্গা বুঝতে পারল না। মেয়ের এত বড় ভাল খবর পেয়ে একটুও উচ্ছ্বাস দেখাল না? কী অদ্ভুত মানুষ! নাকি এই পুরস্কার স্বামীকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, মেয়ের সঙ্গে দূরত্ব আরও বেড়ে গেল!

শেষ বিকেলে ডিনার ছিল। সেমিনারে যেসব ছেলেমেয়েরা অংশ নিয়েছে এবং তাদের স্কুলের শিক্ষক-অভিভাবকরা একত্রিত হয়ে গল্প এবং খাওয়াদাওয়া করল। অবশ্য সংগঠকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ হল নিউ ইয়র্ক থেকে আসা ছাত্রীটি, যে-মাত্র সাড়ে ন'বছর বয়সেই স্কুলের শেষ পরীক্ষায় যে-কোনও বিষয়ে অনায়াস দক্ষতা দেখিয়েছে।

সেমিনারে যে-মেয়েটি বক্তব্য পেশ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল, ডিনারের পর সে মুখে লাজুক হাসি নিয়ে চুপচাপ বসেছিল।

ডিনারের পর যে যার ঘরে ফিরে আসছিল। আগামীকাল সকালেই এরা সবাই যে যার শহরে ফিরে যাবে। ভবিষ্যতে যে আবার দেখা হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। তবু কেউ কেউ পরস্পরের টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করে করমর্দন সেরে নিচ্ছিল।

টমাস বলল, "আর দেরি করা ঠিক নয়।"

মাথা নাড়ল মেয়ে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তার স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছে অনুমতি চাইল, ঘরে ফিরে যেতে চায় সে।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, "সিয়োর। কিন্তু আর মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। তুমি এখানেই ততক্ষণ থাকো।"

পাশে দাঁড়িয়েছিল টমাস। খুব বিনীত ভঙ্গিতে সে বলল, "ম্যাম আমি তো আমার ঘরে ফিরে যাচ্ছি। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে ওকে ওর ঘরের দরজায় পৌঁছে দিতে পারি।"

প্রিন্সিপাল কিছু বলার আগেই মাথা নাড়ল মেয়ে, "আমার মনে হয় একটা ভুল হচ্ছে। আমি অক্ষম নই। একাই সহজে যে ঘরে থাকছি, সেই ঘরে যেতে পারব।"

প্রিন্সিপাল বললেন, "খুব ভাল কথা। কিন্তু তোমরা একসঙ্গে গেলে তো কারও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। ঠিক আছে, এক ঘন্টা পরে আমি ফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলব।"

ওরা তিনতলায় উঠে এল। টমাস বলল, "আজকের দিনটাকে আমি কোনও দিন ভুলব না," তারপর শব্দ করে হাসল।

"হাসছ কেন?"

"হাসছি একটা কথা মনে পড়ে গেল বলে। আমার বন্ধুদের এক বা একাধিক বান্ধবী আছে। তারা তাদের নিয়ে কত গল্প করে। আমি শুনি চুপ করে, কারণ, আমার কোনও বান্ধবী নেই," টমাস বলল।

"বান্ধবী নেই?"

"না!"

"সে কী! তোমার স্কুলে কি মেয়েরা পড়ে না?"

"আরে না না। ওরা তো সহপাঠিনী, বান্ধবী নয়। আচ্ছা, তোমার কি স্টেডি বয়ফ্রেন্ড আছে?"

"স্টেডি বয়ফ্রেন্ড! সেটা কী রকম?" মেয়ে অবাক হল।

"ওহ, মাই গড! তুমি এত জানো আর এটা জানো না?" টমাস কাঁধ ঝাঁকাল।

"না। সবাই কি সব কিছু জানে? এই ইউনিভার্সে কতগুলো নক্ষত্র আছে, তা আমরা জানি না। তাই না?" মেয়ে বলল।

"এই দুটো এক হল?" অবাক গলায় বলল টমাস।

ততক্ষণে ওরা যে-ঘরে মেয়েটি থাকছে, তার দরজার সামনে পৌঁছে গেছে। টমাস বলল, "যাঃ, এত তাড়াতাড়ি পথটা শেষ হয়ে গেল! ব্যাড লাক, তোমার সঙ্গে ভাল করে ব্যক্তিগত গল্প করার সুযোগ পেলাম না।"

"তুমি কতক্ষণ গল্প করতে চাইছ?" মেয়ে টমাসের মুখের দিকে তাকাল।

"এই ধরো, দশ কি পনেরো মিনিট।"

"ওকে!" দরজার তালা চাবি ঘুরিয়ে খুলল মেয়ে, "এসো। প্লিজ়!"

ঘরের এক পাশে টেবিল, দু'পাশে দুটো চেয়ার। উলটোদিকে পরিপাটি বিছানা। মেয়ে বলল, "বোসো। বলো, কী বলবে?"

টমাস বসল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, "এখানে আসার আগে আমি কল্পনাই করিনি তোমার মতো একজনের সঙ্গে দেখা হবে। আচ্ছা, আমরা কি বন্ধু হতে পারি না?"

"তোমাকে বন্ধু মনে না-করলে এই ঘরে বসে কথা বলতাম?"

"থ্যাঙ্ক ইউ। তোমার হাতটা ধরতে পারি?"

"কেন? আমার হাতে কী আছে?"

"আমি তোমাকে অনুভব করতে চাই। হাত ধরলে তুমিও আমাকে নিশ্চয়ই অনুভব করবে," হাসল টমাস।

"কেউ আমাকে বলেনি যে, হাত ধরলেই যার হাত ধরলাম তাকে অনুভব করা যায়," হেসে হাত বাড়াল মেয়ে, "ওয়েল, আমার হাত ধরে তুমি বলো তো ঠিক কী অনুভব করছ?"

বাড়ানো হাতের দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চিত বোধ করল টমাস। সে ধীরে ধীরে বাড়ানো হাত পাঁচ আঙুলে ধরে বলল, "তোমার হাত খুব ঠান্ডা!"

হাসল মেয়ে, "কী অনুভব করছ?"

জবাব দিল না টমাস। যেন আরও নিবিড়ভাবে অনুভব করতেই সে তার দু'চোখ বন্ধ করল। মেয়ে লক্ষ করল টমাসের হাতে যেন কাঁটা ফুটে উঠেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, "আরে! কী হল তোমার?"

হঠাৎ এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল টমাস। তারপর একটি কথাও না-বলে প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দরজা খুলে। যাওয়ার সময় বেশ জোরে বন্ধ করে গেল দরজাটা।

খুব অবাক হল মেয়ে। এইরকম আচরণ টমাস কেন করল, তার কোনও ব্যাখ্যা সে খুঁজে পাচ্ছিল না। তার মনে হল, এমন হতে পারে আচমকা টমাস খুব অসুস্থ বোধ করছিল। তাই তাকে বিব্রত না-করে নিজের ঘরে চলে গেছে? তার কি এখন উচিত ব্যাপারটা প্রিন্সিপালকে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া? কিন্তু কী করবে তা ঠিক করার আগেই দরজায় শব্দ হল। মেয়ে কি-হোলে চোখ রেখে প্রিন্সিপালকে দেখতে পেল। সে দরজা খুলতেই প্রিন্সিপাল বললেন, "তুমি ঠিক আছ? কোনও অসুবিধে নেই তো?"

হেসে মাথা নেড়ে 'না' বলল সে।

"খুব ভাল। ও হ্যাঁ, আমরা সকাল সাতটায় ব্রেকফাস্ট করব। ন'টার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে। তোমার বাড়িতে আমি ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি। ওঁরা তোমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে আসবেন," বললেন প্রিন্সিপাল, "আজ আর পড়াশোনা করতে হবে না, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। গুড নাইট।"

প্রিন্সিপাল চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দিল মেয়ে।

পোশাক বদলে বিছানায় যাওয়ার আগে তেজি আলো নিভিয়ে মৃদু নীলচে আলো জ্বেলে দিতেই কেউ দরজায় শব্দ করল। এই ক'দিন এ সময় কেউ দরজায় শব্দ করেনি। অবাক হয়ে সে বন্ধ দরজার পাশে গিয়ে কি-হোলে চোখ রাখল।

টমাসের মুখ কি-হোলে দেখতে পেল সে। কিন্তু মুখটা যেন অস্থির হয়ে আছে। ওইভাবে চলে যাওয়ার পরেও টমাস কেন ফিরে এল?

মেয়ে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল, "কী ব্যাপার?"

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে টমাস মেয়ের দুটো হাত ধরে বলল, "আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। বিশ্বাস করো, আই লাভ ইউ।"

অবাক হয়ে তাকাল মেয়ে। সেই দৃষ্টি দেখে টমাস কী বুঝল তা

সে-ই জানে, আচমকা দু'হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিল বুকে।

মেয়ে প্রতিবাদ করল, "আরে! তুমি কী করতে চাইছ?"

পাগলের মতো মাথা নাড়ল টমাস, "আই লাভ ইউ ডার্লিং। প্লিজ, প্লিজ লাভ মি! আমার দিকে তাকাও প্লিজ!"

"ওকে! ওকে—! আর কিছু?" কথা খুঁজে পাচ্ছিল না মেয়ে।

মুখ নামিয়ে মেয়ের কপালে, চোখের পাতায় চুমু খেতে লাগল টমাস। সেই সঙ্গে বিড়বিড় করে বলে গেল, "আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ," আচমকা মেয়ের মনে হল তার শরীরে কোনও শক্তি নেই। টমাস তার শরীরটাকে বিছানার ওপর তুলে বিবস্ত্র করল।

ঠিক তখনই যেন চেতনা ফিরল মেয়ের। চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, "কী করছ? তুমি এসব কী করছ?"

"লেটস এনজয়। আমি শুনেছি পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশি আনন্দ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। লেটস এনজয়!"

"আনন্দ? কী রকম আনন্দ?" শেষ শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র তীব্র চিৎকার যেন ছিটকে বেরিয়ে এল মেয়ের গলা থেকে। যেন তার শরীরের সর্বত্র এক ভয়ংকর যন্ত্রণা জন্ম নিয়ে সমস্ত দেহকোষে ধাক্কা খেয়ে দু'হাতে আর পায়ে যে-শক্তি জোগাল, তার আঘাতে ছিটকে খাট থেকে পড়ে গেল টমাস। বিছানায় সাদা চাদর তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সেই চিৎকারের পরই মেয়ে নিথর হয়ে রয়েছে বিছানায়। কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পোশাক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে টমাস। প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে সে পেছন ফিরে খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও পা চালাল। ঠিক সেই সময় একজন হোটেল কর্মচারী সেখান দিয়ে দিয়ে আসছিল। টমাসের আচরণ তাকে বিস্মিত করল। দ্রুত খোলা দরজার সামনে পৌঁছে ভেতরে উঁকি মেরে সে চিৎকার করে উঠল।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে মেয়েকে যখন হাসপাতালে ভরতি করা হল, তখনও তার চেতনা ফিরে আসেনি। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রিন্সিপাল ডাক্তারদের কাছে জানতে চাইছিলেন ঠিক কী হয়েছিল।

ডাক্তাররা পরীক্ষা করার পর জানালেন, মেয়েটিকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ওর শরীর এখন সদ্য বালিকাবেলা পার হচ্ছে, যৌবন খানিকটা দূরে রয়েছে। এই অবস্থায় ধর্ষণের কারণে মেয়েটির যৌন অঙ্গ তো বটেই অভ্যন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। তার রক্তপাত হয়েছে প্রচুর।

সেই হোটেল কর্মচারীর বর্ণনা থেকে পুলিশ টমাসকে গ্রেফতার করেছে। টমাস খুব ভেঙে পড়েছে। সে স্বীকার করেছে, মেয়েদের সঙ্গে শারীরিক মিলনের অভিজ্ঞতা তার অনেকবার হয়েছে। এই মেয়েটির পরিণতি যে এইরকম হবে তা সে কল্পনা করতে পারেনি।

টিভি এবং বেতারে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। স্থানীয় কাগজ খবরও ছাপল। মেয়ের স্কুল থেকে ফোন এল যখন, তখন রাত ন'টা। দুর্গা ফোনটা ধরে হকচকিয়ে গেল। চিৎকার করে মেয়ের বাবাকে ডাকল। মেয়ের বাবা তখন বাড়ি ফিরে এসে বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। ধড়মড়িয়ে উঠে পাশের ঘরে যেতেই দুর্গা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "মেয়ের প্রিন্সিপাল ফোন করছেন। সে নাকি এখন হাসপাতালে। অজ্ঞান হয়ে আছে। এখনই সানফ্রান্সিসকোতে যেতে বলল!"

"সে কী!" ফ্যালফ্যাল করে তাকাল স্বামী, "কী হয়েছিল?"

"আমি জানি না, কিচ্ছু জানি না। শুধু বলল, তাড়াতাড়ি যেতে। এয়ারপোর্টে নেমে কোথায় যেতে হবে, তা বলে দিয়েছে। এক্ষুনি চলো।"

"এক্ষুনি?" তোতলাল স্বামী।

"আশ্চর্য! তোমার মেয়ে জ্ঞান হারিয়ে হাসপাতালে রয়েছে আর তুমি সময়ের হিসেব করছ?" চিৎকার করল দুর্গা।

"মাথা ঠান্ডা করো। চিৎকার করে কোনও লাভ নেই," স্বামী বলল, "তুমি রাতের ফ্লাইট ধরে চলে যাও। আমি সিট বুক করে দিচ্ছি। যদি অবস্থা ভাল না-হয় তাহলে আমি কাল পৌঁছে যাব। যাওয়ার আগে দোকান বন্ধ করে যেতে হবে। ওই মেয়েটা তো বাড়ি চলে গেছে। ওর ওপর দোকানের দায়িত্ব দেওয়া ঠিক হবে না। কাল সকালে সরকারি অফিসাররা আসবে ইন্সপেকশনে। যাওয়ার দরকার হলে দুপুরে যেতে পারি। আমি তোমার টিকিট বুক করে দিচ্ছি," স্বামী ঘরে চলে গেল, বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে থাকল দুর্গা।

নিউ ইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো উড়ে গিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে যখন দুর্গা হাসপাতালে পৌঁছল, তখন ভোরের আলো ফুটে গিয়েছে। পৌঁছে খবর পেল মেয়ের জ্ঞান ফিরেছে কিন্তু সকাল ন'টার আগে দেখা করা যাবে না।

ঠিক পৌনে ন'টায় দেখা হল প্রিন্সিপালের সঙ্গে। তিনি বারবার ক্ষমা চাইলেন। তিনদিন চমৎকার কাটিয়ে শেষ সন্ধ্যায় এমন কাণ্ড হবে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। মেয়ের জ্ঞান ফিরেছে আজ ভোর চারটের সময়। ডাক্তার বলেছেন, মেয়ের সঙ্গে দেখা করার আগে ওর মা যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

প্রিন্সিপাল দুর্গাকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারের কাছে এলেন। মহিলা ডাক্তার তাদের বসতে বলে জানালেন, "মেয়েটির মস্তিষ্ক এত পরিণত কিন্তু শরীর থেকে শৈশব সদ্য যাওয়ায় তাল রাখতে পারেনি। আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আজই ওর ইউটেরাসে অপারেশন করতে হবে।"

প্রিন্সিপাল বললেন, "অপারেশনের জন্যে খারাপ কিছু হতে পারে?"

"খারাপ!" মাথা নাড়লেন ডাক্তার, "কী করে বলব! অনেক মহিলা বিয়ের পর অনেক চেষ্টা করেও মা হতে পারেন না, আবার কেউ কেউ মা হতেই চান না। আপনার মেয়ে যদি ভবিষ্যতে মা না-হতে পারে, তাহলে এই শতাব্দীতে সেটা ভাল না খারাপ, ঠিক কী বলা উচিত আমি জানি না," ঘড়ি দেখলেন ডাক্তার, "চলুন, মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বলে আসবেন।"

লিফটে অনেক ওপরের তলায় উঠে একটি ঘরের দরজায় আলতো আওয়াজ করে ওদের সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার ভেতরে ঢুকতেই একজন মহিলা কর্মচারী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে বলল, "গুড মর্নিং!"

"মর্নিং!" ডাক্তার এগিয়ে গেলেন বিছানার পাশে, "গুড মর্নিং মাই লেডি। হেয়ার ইজ় এ সারপ্রাইজ় ফর ইউ!"

গলা অবধি চাদরে ঢাকা, মুখ ঘোরাল মেয়ে।

ডাক্তার বললেন, "কেমন লাগছে এখন?"

"আই অ্যাম ফাইন।"

"কে এসেছে দেখেছ?"

এবার যেন জোর করে চোখ খুলল মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে, "মা!" গলায় উত্তাপ ছড়াল, "তুমি কখন এলে?"

দুর্গা দ্রুত মেয়ের পাশে গিয়ে মাথায় হাত রাখা মাত্র কান্না ছিটকে উঠে এল গলায়। কথা বলতে পারল না দুর্গা।

প্রিন্সিপাল জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কেমন লাগছে?"

"ভাল। আমি ভাল আছি," মেয়ে কথাগুলো বলতেই ডাক্তারের মোবাইল বেজে উঠল। নিচু গলায় কথা বললেন তিনি, "হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আপনাকে আমি পাঁচ মিনিটের বেশি কথা বলতে দিতে পারি না। ওকে!"

ফোন বন্ধ করে ডাক্তার বললেন, "একজন ভদ্রমহিলা তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। তুমি যদি কথা বলতে না-পারো—"

মাথা নাড়ল মেয়ে, "পারব। কিন্তু কী কথা?"

ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হল। একজন মহিলা মুখ বাড়িয়ে ভেতরে আসার অনুমতি চাইলেন। ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে মহিলার সঙ্গে কথা বলে ভেতরে নিয়ে এলেন। মহিলা খাটের কাছে এসে বললেন, "হ্যালো! আমি লিজা। তোমাকে বেশি সময় বিরক্ত করব না। যে-ছেলেটি তোমার ওপর অত্যাচার করেছে, সে কি তোমার বন্ধু?"

মাথা নেড়ে না বলে, কয়েক সেকেন্ড পরে মুখে বলল, "এখানেই আলাপ।"

"তোমার ঘরে সে কী করে এল?"

"আমি ঘরে আসছিলাম, ও সঙ্গে ছিল।"

"মেডিকাল রিপোর্ট বলছে তোমাকে ভয়ংকরভাবে রেপ করেছিল ছেলেটি।"

"ভয়ংকরভাবে রেপ মানে?"

ভদ্রমহিলা ডাক্তারের দিকে তাকালেন। ডাক্তার বললেন, "যার জন্যে তুমি অনেকটা সময় জ্ঞান হারিয়েছিলে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল জ্ঞান ফিরতেই। এখন তুমি শুয়ে আছ ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে বলে। এর জন্যে তো ছেলেটা দায়ী, তাই না? উনি তাই জিজ্ঞাসা করছেন।"

মহিলা বললেন, "ছেলেটিকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তা নিশ্চয়ই জানো!"

"অ্যারেস্ট? কেন অ্যারেস্ট করল?"

"তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ও কাজটা করেছে, তাই।"

"না তো," দ্রুত মাথা নাড়ল মেয়ে।

"সে কী! ছেলেটি তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে রেপ করেনি?"

"না, না। ও যখন অদ্ভুত গলায় আদর করতে করতে অন্যরকম আনন্দ পেতে চাইল, তখন আমি কোনও আপত্তি করিনি।"

"তার মানে ছেলেটা তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজটা করেছে?"

প্রবলভাবে মাথা নাড়ল মেয়ে, "না, না। এটা ঠিক কথা নয়। আমি তো বুঝতেই পারিনি ও কী করতে চাইছে। ওঃ, মাই গড কী ভয়ংকর!"

ভদ্রমহিলা ডাক্তারের দিকে তাকালেন। ডাক্তার ঈষৎ ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি বলছ ও জানত না কী করতে চাইছিল?"

মাথা নাড়ল মেয়ে। তারপর বলল, "ইটস হরিবল। আমি ক্লাসিকাল লিটারেচারে পড়েছি, পুরুষরা এই আগলি ওয়েতে প্লেজার পেয়ে খুশি হয়। মেয়েদের জন্যে এটা খুব পেনফুল। তাই না মম?"

"তুমি কি ছেলেটির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছ না?"

"হোয়াই? আই ডোন্ট নো! ইট ওয়জ় আওয়ার ফল্ট," বলতে বলতে মেয়ের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এল। ডাক্তার দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মেয়ের একটি হাত তুলে নিয়ে পাল্‌স দেখলেন। সোজা হয়ে বললেন, "নো মোর। আপনারা এবার যান। ওকে একা থাকতে দিন।"

সবাই যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন দুর্গা ডাক্তারকে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি আর-একটু ওর কাছে থাকতে পারি?"

ডাক্তার ঘড়ি দেখলেন, "দশ মিনিট। আমি চেষ্টা করছি অপারেশন থিয়েটার খালি পেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর অপারেশন করে ফেলতে। বসুন, কথা বলবেন না," ডাক্তার ঘরের দরজা টেনে বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন।

মেয়ে শুয়ে আছে। মাথা একপাশে ঈষৎ হেলানো। দুর্গা পাশে বসে কপালে হাত রাখল। বেশ তপ্ত শরীর। সাড়ে ন' বছর বয়সেই মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয়ে গেল মেয়ের। কিন্তু, দুর্গা ভেবে পাচ্ছিল না, যে-ছেলেটি কাজটা করল, তার বিরুদ্ধে কেন কোনও অভিযোগ জানাল না মেয়ে। ওর একটা হাত নিজের দু' হাতের আশ্রয়ে ধরে রাখতে চাইল দুর্গা।

জ্ঞান ফিরছে, মুখ যন্ত্রণায় নীলচে, চাকাওয়ালা বিছানায় শুইয়ে মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হল অপারেশন থিয়েটারে। পেছন পেছন আসছিল দুর্গা। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল প্রায় মুখের ওপর। কান্না চাপতে পারল না দুর্গা। তখন কাঁধে চাপ পড়তে মুখ ঘুরিয়ে দেখল পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছেন প্রিন্সিপাল।

দু'হাতে তাকে ধরে ওপাশের সোফায় বসালেন ভদ্রমহিলা। দুর্গা কান্না গিলতে পারল। কিছু সময় চুপচাপ যাওয়ার পর প্রিন্সিপাল বললেন, "আপনি শান্ত হোন। মেয়ে হয়ে জন্মালেই মা হতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আমি তো তেইশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলাম। এখন বাহান্ন। আমার নিজের কোনও সন্তান হয়নি। সন্তান হওয়ার বয়স চলে গেছে। অনেক মহিলা বিয়ে না-করে চমৎকার থাকেন। মা হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁদের কথা ভাবুন।"

"এসব কথা বলছেন কেন?"

"আমি শুনলাম এখন ওর যে-অপারেশন হচ্ছে তার ফলে ও কোনও দিন সন্তানের জন্ম না-ও দিতে পারে," প্রিন্সিপাল বললেন।

দাঁতের তলায় ঠোঁট চলে এল। চোখ বন্ধ হল দুর্গার। মেয়ের বলা কথাগুলো চলকে উঠল মনে, "মেয়েদের জন্যে এটা খুব পেনফুল, তাই না মম?"

প্রিন্সিপাল বলে যাচ্ছিলেন, "ওর অনেক খ্যাতি হবে। সাড়ে ন'বছরে যে-মেয়ে এই জায়গায় পৌঁছয়, উনিশ বা উনত্রিশে তার নাম গোটা পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে। দেখবেন, মিলিয়ে নেবেন।"

দরজার গায়ে এতক্ষণ জ্বলে থাকা লাল আলো আচমকা নিভে গেল। একটু পরে ডাক্তার বেরিয়ে এসে হাসিমুখে বললেন, "আপনারা এখন বিশ্রাম করতে পারেন," তারপর দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "ও ভাল আছে। তবে বিকেলের আগে দেখা করবেন না। আপনার মেয়ের জ্ঞান ফিরে এলে কী বলেছিল, জানেন?"

দুর্গা তাকাল। ডাক্তার বললেন, "বলেছিল, ভগবান তোমাকে ধন্যবাদ," হেসে মাথা নেড়ে ডাক্তার ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী





পান্থনিবাস

প্রণব বর্ধন

গবেষণা ও অধ্যাপনার কাজে প্রায়শই আমি দুনিয়াময় ঘুরে বেড়াই। কিছুদিন আগে ইউনাইটেড এয়ারলাইনস বিমানসংস্থা থেকে আমাকে জানাল, ওদের হিসেব অনুযায়ী আমি কেবল ওদের বিমানেই ভ্রমণ করেছি ত্রিশ লক্ষ মাইলের বেশি, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে চাঁদে বারো বার গিয়ে ফিরে আসার দূরত্ব। এ ছাড়া অন্যান্য সংস্থার বিমানেও তো চড়ি। এই দীর্ঘ ভ্রমণের ইতিহাসে নানা দেশে নানাবিধ অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা নিয়ে অন্যত্র কিছু লিখেছি, এই প্রবন্ধে বিভিন্ন দেশে হোটেলে থাকার হরেকরকমের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি বিচিত্র উদাহরণ তুলে ধরব।

বৈচিত্রের কথা বলার আগে প্রথমেই একটা বিশেষ সাদৃশ্যের কথা বলে নিই। আজকাল বিভিন্ন দেশে বড় হোটেলগুলি, বিশেষ করে সেই সব হোটেলের ঘরগুলির অভ্যন্তর, ক্রমশই একরকম দেখতে হয়ে যাচ্ছে। বিছানা, ঘরের দেওয়াল, মেঝের কার্পেট, বসার টেবিল-চেয়ার, ফুলদানি, স্নানাগার— সব যেন কোন এক অলিখিত আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে একভাবে সাজানো। ওই সব হোটেলে সকালবেলা ঘুম ভাঙলে ঘুমচোখে প্রথমে ঠাহর হয় না কোন দেশে, কোথায় আছি। অন্তর্নিহিত কেউ যেন কপালকুণ্ডলার মতো জিজ্ঞেস করতে থাকে, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' পরে নিজেকে বলি পথ ঠিক হারাইনি, তবে পথশ্রান্ত আমি, এই পথের শেষ সম্পর্কে কেমন যেন এক উদাস বিষণ্ণতা সর্বদা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, পাথেয়ও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে বুঝতে পারি।

বড় হোটেল নয়, মাঝারি মধ্য কলকাতার একটি তিন-তারকার হোটেল দিয়ে এই গল্পমালা শুরু করি। অনেকদিন আগে, আমার মা-

বাবা তখন জীবিত, ওঁরা শান্তিনিকেতনে থাকেন, কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় আমাদের বহুকালের ভাড়াবাড়িটি এক আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। আমি বিদেশ থেকে কলকাতা পৌঁছলাম একদিন বিকেলে, ভাবলাম রাতটা ওই ভাড়াবাড়িতে কাটিয়ে পরদিন সকালের ট্রেনে শান্তিনিকেতন যাব। কিন্তু ওই বাড়িতে গিয়ে দেখি, বাড়িময় লোক গিজগিজ করছে পারিবারিক কোনও আচার-অনুষ্ঠান উপলক্ষে, ওখানে থাকলে শান্তিনিকতনে যাওয়ার আগে লেখার যে-কাজটা শেষ করে যাব ভেবেছিলাম, সেটি হবে না। তখন ঠিক করলাম সে রাতটা কোনও হোটেলে গিয়ে উঠি। তখন আমার সুটকেসটি ওই বাড়িতেই রেখে কাছাকাছি হোটেলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম, হোটেল ঠিক হলে পরে সুটকেসটি নিয়ে যাব। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ধরে ধর্মতলার দিকে হাঁটতে লাগলাম। গণেশ অ্যাভিনিউয়ের মোড়ের কাছাকাছি একটি হোটেলের নিয়ন বাতি ও দালানটির বহির্ভাগ দেখে মনে হল, ওটি অন্তত তিন তারা হোটেলই হবে। ভেতরে ঢুকে, তারপর ঘর ও দাম দেখে মনে হল, অন্তত এক রাতের জন্য চলনসই।

তখন ওরা আমাকে কিছু কাগজপত্র দিল ভরে সই করার জন্য। সে সব হয়ে যাওয়ার পর ওরা আমাকে ঘরের চাবি দিতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ বলল, "আপনার মালপত্র কই?"

আমি বললাম, "সুটকেসটা একটা বাড়িতে রেখে এসেছি, খানিকক্ষণ পর গিয়ে নিয়ে আসব।"

তখন বলল, "না, মালপত্র না আনা পর্যন্ত আপনাকে আমরা ঘর দিতে পারব না।"

আমি বললাম, "এ তো অদ্ভুত কথা, মালপত্রের সঙ্গে হোটেলের ঘর পাওয়ার সম্পর্ক কী?"

তখন লোকটি যা বলল তাতে একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। বলল, "খালি হাতে ঘরে ঢুকছেন, আপনি যে কোনও খুনি নন কী করে বুঝব?"

ঠিক বুঝলাম না, খুনিরা কি সবসময় মালপত্রবিহীন হয়ে হোটেলে থাকে? কিন্তু লোকটি এ ব্যাপারে এতই বদ্ধপরিকর যে, আমি বিরক্ত হয়ে সেই হোটেলটি ছেড়ে চলে এলাম, অন্য হোটেল খোঁজাতেও ক্ষান্তি দিলাম।



পরে মনে হল লোকটি যদিও খুনের কথা বলল, আসলে খুনের কাছাকাছি অন্য একটি গর্হিত কাজের কথা ওর মাথায় রয়েছে, অর্থাৎ ও ভেবেছে, মালপত্রবিহীন আমি কোনও অবৈধ যৌনক্রীড়ার জন্য সাময়িকভাবে ঘরটি ব্যবহার করব। বন্ধুবর অশোক রুদ্রর কাছে শুনেছি, একবার উনি কলকাতার একটি পাঁচ তারা হোটেলে উঠেছেন, তখন ওঁর পরিচিত এক নামজাদা অধ্যাপিকা ফোন করলেন, ওঁর সঙ্গে গবেষণার ব্যাপারে কী আলোচনা করতে চান। অশোক রুদ্র তাঁকে হোটেলে এসে দেখা করতে বললেন, কিন্তু হোটেলের লোকেরা ওই অধ্যাপিকা মহিলাকে অশোক রুদ্রর ঘরে যাওয়া আটকে দিল। ওই হোটেলের ঘরে একা পুরুষের সঙ্গে কোনও একা মহিলার দেখা করা নিষিদ্ধ। আশা করি আজকাল আমাদের হোটেলগুলিতে খরিদ্দারের চরিত্ররক্ষার দায়িত্ববোধ একটু শিথিল হয়েছে।

এ ব্যাপারে জাপানিরা অনেক বেশি খোলামেলা। একবার টোকিওয় একটি পাঁচ তারা হোটেলে কনফারেন্স সূত্রে গেছি, আমাকে হোটেলের লোকেরা বলল, ওদের ঘণ্টা হিসেবে ঘরভাড়া। আমি কত ঘণ্টার জন্য ঘর চাই জানতে চাইল। ঘণ্টা জানতে চাওয়ার কারণ সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত, জাপানি হোটেলে ঘরের অভ্যন্তরে পূর্ব-উল্লিখিত আন্তর্জাতিক নিয়মে মাপা একঘেয়েমি থেকে একধরনের ব্যতিক্রমের কথা বলি। শৌচাগারে বসার আসন বা কমোডের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের বোতাম থাকে, সেগুলি টিপলে কমোডের ভেতর থেকে বিভিন্ন বেগে বিভিন্ন উষ্ণতায় জলের তীব্র ধারা এসে আপনার পশ্চাদ্দেশ ধুয়ে দেবে।

জাপানি হোটেল সম্পর্কে অন্য একটা গল্প বলি। একবার টোকিয়োয় একটি বড় হোটেলে উঠেছি। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক বন্ধু আমাকে সন্ধ্যায় খেতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। আমার হোটেলের নাম শুনে বললেন, ওই হোটেলেই একটি ভাল খাওয়ার জায়গা আছে, তোমাকে সেখানেই খাওয়াব। নির্দিষ্ট সময়ে উনি আমাকে নিয়ে ওই হোটেলের একটি রেস্তরাঁয় ঢুকে তারপর তার গভীর অভ্যন্তরে একটি নিভৃত কুঠুরিতে নিয়ে বসালেন। সেখানে আর কেউ নেই, কেবল ধড়াচুড়ো পরা এক পাচক, একটি উনুন আর তার পাশের টেবিলে ছড়ানো বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ। আমার বন্ধু এক-একটি খাদ্যের কথা বলছেন, আর পাচকটি সেই অনুযায়ী সামনেই রেঁধে আমাদের পরিবেশন করছে। কলকাতায় রান্নাঘরে বসে মা'র কাছে উনুন থেকে সদ্য-করা লুচি বেগুনভাজার পর এরকম টাটকা রান্না করা উপাদেয় খাবার অনেকদিন খাইনি।

খাওয়ার কথায় বলি, পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের হোটেলে সকালের প্রাতরাশ বড় মার্কামারা, হয় কন্টিনেন্টাল অর্থাৎ কফি আর রুটি, অথবা ইংরেজ প্রথায় একপ্রস্ত ডিমভাজা ও সসেজ-বেকন ইত্যাদি, যা কিনা হৃদয়যন্ত্রটির পক্ষে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর খাবার। সেদিক দিয়ে চিনদেশে বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর কিছু স্বাস্থ্যকর বিকল্প পাওয়া যায়। ওখানে কুঁচোচিংড়ি কাঁচালঙ্কা দিয়ে জাউভাত— চিনেরা যাকে বলে কঞ্জি— আমার প্রিয় প্রাতরাশ।

সকালবেলা ঘুম ভাঙা নিয়ে দুটো গল্প বলি। একবার তাইল্যান্ডে একটি বড় হোটেলে ঘুমোচ্ছি, ভোরের দিকে হোটেলের বাগানের ধারে সুইমিং পুল থেকে ভীষণ দাপাদাপির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি একদল মধ্যবয়সি জাপানি ট্যুরিস্ট বা পর্যটক সাঁতারের জামা পরে লাইন করে পুলের চারপাশে দাঁড়িয়েছে, আর ওদের দলের কর্ণধার— হাফ-প্যান্ট পরিহিত এবং হাতে একটি পতাকা— যে-মুহূর্তে হুইস্‌ল বা বাঁশি বাজাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ দলের আর সবাই ধপ করে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে, আবার বাঁশি বাজলে সবাই পটাপট জল থেকে উঠে পড়ছে। জাতীয় সংহতি একেই বলে, ভ্রমণকালেও এর বিরাম নেই।

অন্য গল্পটি আমাদের দেশেই হিমালয়ের পাদদেশে হৃষীকেশ শহরে অনেককাল আগের। মাকে ওখানকার গঙ্গা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। গঙ্গার জল ওখানে স্বচ্ছ নীলাভ এবং খরস্রোতা, কলকল শব্দে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামছে। আমরা গঙ্গার ধারেই একটি ছোট হোটেলে ছিলাম, রাতে নদীর জলের কলকল শব্দে ভাল ঘুম আসত। প্রথমদিন খুব ভোরে নদীর দিক থেকে আসা অবিরত প্রচণ্ড ঝংঝং শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না কিসের শব্দ ওটা। হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখি, নদীর বুকে খরস্রোতের মধ্যে ভাসতে



ভাসতে কয়েকজন লোক খুব মেহনত করে জলটাকে যেন আটকাতে চেষ্টা করছে। নদীর পারে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ব্যাপারটা খোলসা হল। ভোরবেলা হাজার হাজার পুণ্যার্থী নদীর উঁচু দিকে মন্দিরের কাছে পুণ্যকাজের অংশ হিসেবে নদীতে পয়সা ছুড়ে ফেলে, আর সেখান থেকে মাইলখানেক দূরে নদীর নীচের দিকে এই লোকগুলি জলের মাঝখানে বড় বড় চুম্বক দিয়ে খরবেগে বয়ে যাওয়া পয়সাগুলিকে আটকে ফেলে, বড় বড় চুম্বকের গায়ে ধাক্কা খেয়ে পয়সার রাশি ঝংঝং শব্দ করছে। যুগপৎ পুণ্যার্জন ও অর্থোপার্জনের ঢালাও সুন্দর ব্যবস্থা।

এবার বড় হোটেলের আশপাশে চোর-ডাকাতদের গল্প বলি। একবার ব্রাজিলের রিও দে জিনেরো শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি পাঁচতারা হোটেলে আমাদের কনফারেন্স চলছে, দুপুরের খাওয়ার সময় শুনলাম, ওই হোটেলের দরজা থেকে তিন-চার মিনিট হাঁটার দূরত্বে একটি বিখ্যাত রেস্তরাঁয় আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে। হোটেল থেকে বেরনোর সময় দেখলাম, আমাদের দলটিকে আগলে আগলে কয়েকজন দৈত্যাকার লোক আমাদের সঙ্গে হাঁটছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, কনফারেন্সের কর্মকর্তারা রাস্তায় আমাদের সুরক্ষার জন্য এদের ভাড়া করেছে। আমরা সবাই বলাবলি করলাম এসব এদের বাড়াবাড়ি। সেদিন বিকেলেই কনফারেন্স চলাকালীন আমাদের দলের এক মহিলা কাউকে কিছু না বলে পাঁচমিনিটের জন্য হোটেলের দরজার অল্প দূরেই একটি স্টেশনারি দোকানে কী কিনতে গেছেন, ফিরে এসে শ্বাসরুদ্ধকরভাবে বললেন, হোটেলের বাইরে সদর রাস্তার উপর কয়েকটি ছেলে ওঁকে ঘিরে ফেলে নিমেষের মধ্যে ওঁর হাতের ব্যাগটি কেড়ে নিয়েছে।

আমি একবার কেনিয়ার নাইরোবি শহরে একটি পাঁচতারা হোটেলে উঠেছি, ওখানেই আমাদের কনফারেন্স চলছে। একদিন দুপুরে খাওয়ার পর ভাবলাম, সারাক্ষণ মিটিংয়ের বদ্ধ ঘরে বসে আছি, একচক্কর বাইরে ঘুরে আসি, বাইরে দিনটাও সুন্দর মনে হচ্ছে। হোটেল থেকে বেরোতে যাচ্ছি, দরজায় প্রহরীটি আমাকে আটকে দিল। বলল, "তুমি হোটেলের অতিথি, তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের। তোমাকে রক্ষীবিহীন অবস্থায় এভাবে বেরোতে দেব না, এই ভরদুপুরে জনবহুল রাস্তাতেও নয়।"

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ শহরেও একই দশা। আমি তখন ভাবছিলাম, ধনবৈষম্য আমাদের দেশেও যেভাবে বাড়ছে, আমাদেরও হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই এই ব্রাজিল, কেনিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো ধনবিষম দেশে নিরাপত্তার অভাবের দশা হবে।

একবার স্পেনের মাদ্রিদ শহরে কনফারেন্স উপলক্ষে একটি বড় হোটেলে উঠেছি। একদিন সন্ধ্যায় স্পেনের তখনকার রাজা হুয়ান কার্লোস আমাদের দলটিকে নৈশভোজে অভ্যর্থনা করবেন, আমাদের হোটেলেরই প্রায় উলটোদিকে একটি বড় হলঘরে। সেখানে যাওয়ার জন্য হোটেল থেকে বেরোচ্ছি আমাদের দলের এক অধ্যাপিকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে। কথার তোড়ে অস্পষ্টভাবে লক্ষ করলাম দু'টি অল্পবয়সি মেয়ে আমার পাশ কাটিয়ে দ্রুত চলে গেল। তার আধ মিনিট পরে কেমন খেয়াল হল, মেয়ে দু'টি যেন আমার বড় বেশি গা ঘেঁষে গেল। কোটের ভেতরদিকের পকেটে হাত দিয়ে বুঝলাম, আমার পয়সা ও ক্রেডিট কার্ডের থলিটি উধাও। চারিদিকে তাকিয়ে মেয়ে দু'টিকে দেখতে পেলাম না। কিছুটা দূরে একজন পুলিশকে দেখতে পেয়ে তাকে গিয়ে বললাম। মেয়ে দু'টির নিতান্ত দুর্ভাগ্য, ওরা বুঝতে পারেনি, ওখানে রাজা আসবেন বলে চারদিকে সাদা পোশাকের পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি পুলিশবেশী লোকটিকে বলামাত্র সে একটা বাঁশি দিয়ে সংকেত দিল। দু'-তিন মিনিট পরে বুঝলাম ওদের ধরে ফেলেছে, রাস্তার অন্য পার থেকে একটি পুলিশ এসে আমার থলিটি আমার হাতে দিয়ে বলল, "দেখে নাও ভেতরে সব ঠিক আছে কি না।"

অনেকদিন আগে একবার মহারাষ্ট্রের পুণেতে ব্লু ডায়মন্ড হোটেলে উঠেছি। একদিন সন্ধ্যায় ওই হোটেলের বার বা পানশালায় আমার খুব কাছেই বসে বিয়ার খেতে খেতে দু'টি মেয়ে গল্প করছে, রক্তাভ গেরুয়া বেশধারী স্বর্ণকেশী বিড়ালাক্ষী জার্মান মেয়ে, বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, ওরা ওই হোটেলে থাকে না, থাকে কাছেই ওদের গুরু ভগবান শ্রী রজনীশের আশ্রমে। আশ্রমে বিয়ার পাওয়া যায় না বলে ওরা প্রায়ই হোটেলের এই পানশালাটিতে আসে। আর-একদিন ওখানে আমাকে দেখতে পেয়ে মেয়ে দু'টি এসে আমার সঙ্গে গল্প করতে বসে গেল। খানিকক্ষণ জার্মানি নিয়ে গল্প করার পর আমি আমার কৌতূহল নিবারণার্থে আশ্রম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম। ওরা মনে হল সাদাসিধেভাবেই তার উত্তর দিল। একসময় বলল, "তোমার যখন এত কৌতূহল, একদিন এসো না আশ্রমে, আমরা তোমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব।"

আমি তো একবাক্যে রাজি। ঠিক হল পরদিন সকাল দশটায় হোটেল থেকে আমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমার কপাল মন্দ, পরদিন সকালে আমাকে দেখতে পেয়েই মেয়ে দু'টি দৌড়ে এসে বলল, "তোমাকে

একটা বিষয় বলতে ভুলে গেছি, তুমি কি স্নান করার সময় মাথার চুল ধোওয়ার শ্যাম্পু ব্যবহার করো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, অন্য সবার মতো আমিও করি।"

তখন মেয়ে দু'টি মুখ করুণ করে বলল, "তা হলে তোমাকে আর আশ্রমে নেওয়া যাচ্ছে না।"

আমি বললাম, "আমি তো আশ্রমে গিয়ে স্নান করব না।"

ওরা বলল যে, গুরু রজনীশের নাকি সাংঘাতিক রকমের শ্যাম্পুর গন্ধে এলার্জি, তাই কেউ যদি কয়েকদিন আগেও মাথায় শ্যাম্পু ব্যবহার করে থাকে, তা হলে তার আশ্রমে প্রবেশ নিষেধ।

আমি বললাম, "আমি যদি রজনীশের সঙ্গে দেখা না করে আশ্রমের অন্যত্র যাই, তা হলে সমস্যাটা কী?"

ওরা বলল যে, এ ব্যাপারে ভীষণ কড়াকড়ি, আশ্রমে ঢোকার দরজায় নাকি দু'জন ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা জাঁদরেল সুইডিশ মহিলা দাঁড়িয়ে থাকে, তারা প্রত্যেকের মাথা মিনিটখানেক শুঁকে তবে আশ্রমে ঢোকার অনুমতি দেয়।

সে যাত্রায় ওই ধরনের হেডনিস্ট বা ভোগসুখবাদী ধর্মের আশ্রমের জীবনযাত্রা দেখা হল না।

সম্প্রতি একদিন লন্ডনে বিমানবন্দর থেকে শহরে আমার হোটেলে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। খিদে লেগেছে, কিন্তু হোটেলের রেস্তরাঁটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ওরা বলল তুমি হোটেলের পানশালায় যাও, অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে, ওখানে কিছু খাবার পেয়ে যাবে। পানশালায় আমার খাওয়া শেষ হয়ে আসছে, এমন সময় একটি মেয়ে দরজা দিয়ে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারপর সোজা আমাকে এসে পূর্ব-ইওরোপীয় উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, "তোমার নাম কি অশোক?"

আমি বললাম, "না। কেন কী ব্যাপার?"

মেয়েটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশের মতো হবে, মসৃণ কালো লম্বা চুল, চোখেমুখে একটা লালিত্য আছে, কিন্তু পরনের বেশে, জুতোর উঁচু হিলে আর ঠোঁটের লিপস্টিকে স্বল্প উগ্রতার ছাপ। মেয়েটি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে তারপর বলল, "অশোক ফোনে আমাকে এই হোটেলের যে নম্বরের ঘরে আসতে বলেছে, সেখানে অনেকক্ষণ টোকা দিয়ে পেলাম না। ভাবলাম, এই পানশালায় যদি পাই। অশোক নামটা তো ভারতীয়, তাই না? আর তোমাকেও দেখে ভারতীয় মনে হচ্ছে।"

আমি বললাম, "তুমিও যেমন অশোককে চেনো না, আমিও এ হোটেলে অশোক নামে কাউকে চিনি না।"

মেয়েটি বলল, "দেখি, আবার আধঘণ্টা পরে ওর ঘরে চেষ্টা করব," তারপর ক্লান্তদৃষ্টিতে আমার খাদ্য-পানীয়ের দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, "এটা তো বড় হোটেল, এখানে বিয়ারের দাম নিশ্চয়ই খুব বেশি!"

আমি বললাম, "বোসো, আমি তোমাকে এক গ্লাস বিয়ার খাওয়াতে পারি।"

মেয়েটি খুশি হয়ে বসে পড়ল।

ও রোমানিয়ার মেয়ে, সেখানে কলেজ পর্যন্ত পড়েছে, কিন্তু ওদেশে চাকরি-বাকরির অবস্থা খুব খারাপ, সম্প্রতি লন্ডনে এসেছে, আপাতত দেহব্যবসা করে জীবনধারণ করে। এই ব্যবসায় লন্ডনের উঁচু মাত্রার কয়েকটি এসকর্ট এজেন্সিতে নাম লিখিয়েছে, তারাই বিভিন্ন বড় হোটেলে শাঁসালো খরিদ্দারদের ঘরে পাঠায়, আয়ের চল্লিশ শতাংশ নিয়ে নেয়, তবে ইন্টারনেটে বা আন্তর্জালে উজ্জ্বল বিজ্ঞাপন দেওয়া থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও নানাবিধ সমর্থন জোগায়। লন্ডন শহরটি ওর পছন্দ, খালি প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি আর ঠান্ডা ছাড়া। আমরা কথা বলার মাঝখানেই ওর মোবাইল বা চলভাষ যন্ত্রটিতে একটি ফোন এল, ও ওর ভাষায় এক মিনিট কথা বলার পরই তাড়াতাড়ি ফোন ছেড়ে দিল। ও একটু হেসে আমাকে বলল, বুখারেস্ট থেকে ওর মা ফোন করেছিল। তারপর বলল, "লন্ডনে আমি কী করছি জানতে পারলে মা আমাকে খুন করে ফেলবে।"

আমি ওকে বললাম তোমার এত কম বয়সে রোগের একটা বড় ঝুঁকি নিচ্ছ, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? ও বলল যে, এ সম্পর্কে ও খুব সাবধান, তা ছাড়া প্রতি দু'-তিন মাসে একবার করে ডাক্তার দেখায়। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল, "আসলে কী জানো, প্রথমে এই লাইনে ঠিক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যে এসেছি তা নয়, আবার কেউ যে খুব জোর-জবরদস্তি করেছে তাও নয়।" বুখারেস্টে কম বয়সে কলেজে থাকতে কলেজের বাইরের একটি বেপরোয়া গুন্ডাপ্রকৃতির, বলিষ্ঠ বাহুতে উলকিমারা, দুর্দান্ত আকর্ষক ছেলের প্রেমে পড়ে যায় ও। সেই প্রেমের মাদকতা এমনই ছিল, ছেলেটি যে কিছুদিনের মধ্যেই ওকে নানাভাবে নানা অজুহাতে ব্যবহার করছে, ছেলেটির বন্ধুবান্ধব এমনকী কিছু বাইরের লোকের লালসার ইন্ধন হিসেবেও ব্যবহার করছে, সেটি বুঝতে মেয়েটির খুব দেরি হয়ে যায়। ও ভাবত ওর আর ছেলেটির মধ্যে যে গভীর প্রেমের বন্ধন, তার জন্য অনেক রকমের ত্যাগস্বীকার করা যায়। এ ছাড়া ওরা ওকে নানারকম বিলাসভূষণ কিনে দিত। জাজ্বল্যমান উদ্দাম নৃত্যের আসরে নাচার সুযোগ করে দিত। বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেত। খাওয়াত। যে বিলাস ওর মা'র স্বল্পবিত্ত সংসারে সম্ভব হত না। শেষে ছেলেটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর দেখল, ও ইতিমধ্যে এমন একটা শৌখিন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, সেটা থেকে বের হয়ে আসা কঠিন। কিছুদিন অল্পস্বল্প অন্য কাজ করতে গিয়ে বুঝল, অত কম পয়সায় অত খাটুনি ওর পোষাবে না। তার চেয়ে, মেয়েটি অবসন্ন দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে নিপাট দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "কিছুক্ষণের জন্য দু'পা ফাঁক করে রাখলে অনেক বেশি উপার্জন হয়, তা লোকে আমাকে যতই অলস বলুক না কেন।" এই উপার্জন বুখারেস্টের তুলনায় লন্ডনে অনেক বেশি, তা ছাড়া এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ভাল।

হঠাৎ ওর একরাশ চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "যাই, আবার গিয়ে অশোকের ঘরে টোকা মারি।"

বিয়ার খাওয়ানোর জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আর আমার গালে আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে মেয়েটি উঠে পড়ল।

হোটেলের দরজায় টোকা মারার কথায় আমার অন্য একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। অনেক বছর আগে ব্যাঙ্কক শহরের একটা বড় হোটেলে উঠেছি। ক্লান্ত ছিলাম, তাই রাত এগারোটার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছি। মধ্যরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, দরজায় কেউ একটা মৃদু টোকা মারছে মনে হল। ঘুমচোখে দরজা খুলে দেখি মিনি স্কার্ট পরা ফুটফুটে একটি কিশোরী, সে আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমার মালিশ বা হাত-পা টিপে দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না। আমি একটু চেঁচিয়েই বললাম, 'না,' আর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলাম। তারপর বিছানায় শুয়ে আর ঘুম এল না, বারবার মনে হতে লাগল মেয়েটির প্রতি অত রূঢ় হওয়ার দরকার ছিল না, আরও নম্রভাবে 'না' বলা যেত।

সেই অনুশোচনার খোঁচা সম্প্রতি আবার অনুভব করলাম বিখ্যাত মার্কিন কবি রবার্ট হাস-এর একটি কবিতা পড়ে। কবিতাটি থেকে আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি:

"....in the thick heat
Of the Bangkok night. Not more than fourteen, she saunters up to you
Outside the Shangri-la Hotel
And says, in plausible English,
"How about a party, big guy?"
Here is more or less how it works:
The World Bank arranges the credit and the dam
Floods three hundred villages, and the villagers find their way
To the city where their daughters melt into the teeming streets,
And the dam's great turbines, beautifully tooled...
Have become hives of shimmering silver
And, down river, they throw that bluish throb of light
Across her cheekbones and her lovely skin."

শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী



বোম

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

আবার সেই গন্ধ! গন্ধটা যেন কেউ ওর স্মৃতির সঙ্গে সেলাই করে দিয়েছে! গন্ধের যে এমন টান থাকতে পারে, আগে কোনওদিন বোঝেনি বোম। ঘুরতে-ফিরতে আজকাল প্রায় সারাক্ষণ গন্ধটা ওর চারপাশে ছোট্ট প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ায়। আর ওর মনে পড়ে, খোলা চুলে ওর দিকে তাকানো। মনে পড়ে, সামান্য হাসির আলো ফুটে ওঠা চোখ।

মনখারাপ হয়ে যায় বোমের। ও জানে আলো দিয়ে তৈরি করা মেয়েটা কোনওদিন ওর হবে না। বনানীকে কোনওদিন পাবে না ও। না-পাওয়া নিয়ে কী করে বাঁচে মানুষ! না-পাওয়ার মধ্যে কী থাকে? কষ্ট! শূন্যতা! একাকিত্ব!

নরেন সামন্তর বিধবা বোন বনানী। বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে বিধবা হয়ে ফিরে এসেছিল বাড়ি। ওর বর গলায় দড়ি দিয়েছিল। কেন দিয়েছিল সেটা রহস্য।

তারপর থেকে এই চার বছর বনানীর আবার বিয়ে দিতে পারেনি নরেন। মেয়ে নাকি অপয়া! মেয়ের নাকি নানা দোষ আছে! এইসব কথা ওদের গ্রামের চারদিকে কানাঘুষোয় ছড়িয়ে আছে।

বোম বোঝে আসলে বনানীর জন্য যতটা না এই সব কথা ছড়িয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ছড়িয়েছে সাধারণ লোকজনের মনে নরেনের ওপর বিদ্বেষ থেকে।

লোকটা আসলে আস্ত রাক্ষস। মানুষকে নিজের দরকারে ব্যবহার করতে ওর মতো দক্ষ মানুষ খুব কমই আছে।

এই যে বোম, ওকেও তো ব্যবহার করল

সারা জীবন।

ছেলেবেলা থেকেই বোমের বাবা-মা নেই। জেঠুর কাছে লাথি-জুতো খেয়ে মানুষ। তবে পড়াশোনায় ভাল ছিল। কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পাশও করেছিল। তারপর জেঠুই ওকে পাঠিয়েছিল নরেনের কাছে, গ্রামের স্কুলে চাকরির জন্য। কিন্তু সেখানে কী হল? না, নরেনের জন্য ওকে বোমা বানানোর কাজ করতে হল!

প্রথমে এসব করতে চায়নি বোম। কিন্তু নরেনকে চটানো যাবে না। সেইজন্য জেঠু ওকে বাধ্য করেছিল এই কাজটা করতে।

মাস্টার নামে একজন আর বোম। এই দু'জনে মিলে কিছু সহকারী নিয়ে বোমা বানায়। শব্দ আর ধোঁয়ার বোমা তৈরি করে বোম, আর মাস্টারের কাজ স্প্লিন্টার ভরা মানুষ মারার বোমা তৈরি।

আর, ওই বোমা বানানোর কাজটাই ওর ভাল করে বেঁচে থাকার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। না হলে আজ চলে যাওয়ার দিনে এমন করে ডাক পড়ত!

থানা-পুলিশের ঝামেলা এই কাজে নেই। সব নরেনের হাত করা আছে। কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে মরে আছে বোম। ব্যোমকেশ নামটা বোমা বানাতে শুরু করার পর থেকে বোম হয়ে গিয়েছে! সবাই ওই নামেই ডাকে। এটা যে কী অপমানের ওর কাছে! এই জন্য কি ওর রসায়ন নিয়ে পড়েছিল?

এই সব কিছুর মধ্যে ওর আলো বলতে ছিল বনানী! কেউ কীভাবে ওরকম করে তাকাতে পারে কারও দিকে!

বুকের মধ্যে ছমছম করত বোমের। মনে হত সত্যি কি ওর দিকে তাকায় বনানী? নাকি ওর মনের ভুল? কোনও কিছুই তো হল না ওর জীবনে! এটাও যে হবে না, জানে। তাও কেন ওভাবে তাকায় বনানী?

তারপর এসেছিল সেই দিনটা। কিসের যেন উপোস ছিল। বাড়িতে ওর জেঠিমা, জেঠতুতো দিদিসহ গ্রামের প্রায় সব মহিলাই উপোস করেছিল। বনানীও ছিল সেই দলে।

বিকেলে কাজ সেরে বোম নরেনদের কুয়োতলায় এসেছিল হাত-পা ধুতে। আর দেখেছিল, বনানীও কুয়োতলায় এসেছে বাড়ির একটা কাজের মেয়ের সঙ্গে। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছিল বনানীর। তারপর আচমকা বনানী মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। কাজের মেয়েটা কী করবে বুঝতে না পেরে চিৎকার করে উঠেছিল ভয়ে।

বোম আর সাত-পাঁচ ভাবেনি। এগিয়ে গিয়ে বনানীকে পাঁজাকোলা করে তুলে ঘরে দিয়ে এসেছিল। পালকের মতো নরম শরীর বনানীর। আর কী সুন্দর গন্ধ আসছিল ওর শরীর থেকে! বোমের মনে হয়েছিল গন্ধ-বন্ধনে সারা জীবন আটকে গেল ও!

কুয়োতলা থেকে ওই ঘর অবধি যেতে মিনিটখানেক লেগেছিল বড়জোর। কিন্তু তারপর থেকে বোম মনে মনে কতবার যে ওই পথটা পার করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। শুধু মনে হয়েছে, বনানীকে যখন ও নিয়ে যাচ্ছিল, বনানী কি ওর জামাটা শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছিল! না, তা কী করে হবে! ওর যে জ্ঞান ছিল না।

আজও এই গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময় ওই গন্ধটাই ওকে আটকাচ্ছে। কিন্তু ও জানে বনানীকে ও পাবে না। সুবল মণ্ডলের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করেছে নরেন। সুবলের বয়স বেশি হলেও টাকা বিস্তর। ক্ষমতাও। সেখানে কেন বত্রিশ বছর বয়েসের বেকার বোমের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবে নরেন!

কলেজে ওর বন্ধু ছিল রাজা। কলকাতায় থাকে। ফোনে যোগাযোগ ছিল। সেই রাজা এবার যখন বলল যে, ওদের এনজিও-তে একটা চাকরি খালি আছে, বোম করবে কি না, তখন বোম আর দ্বিধা করেনি। কেন করবে না চাকরি! এখানে তো ওর কিছু নেই। আর ওর সামনে দিয়ে বনানী অন্যের হয়ে যাবে, সেটাও দেখতে পারবে না।

আজ সন্ধেবেলা বেরিয়ে যাওয়ার কথা বোমের। কিন্তু কপালটাই খারাপ ওর! না হলে আজই ওকে এভাবে পাকড়ে নিয়ে আসে নরেনের লোক!

বোম তো নরেনকে বলেছিল যে, আর এসব করবে না। কলকাতায় চাকরি পেয়েছে! তখন আপত্তি করেনি রাক্ষসটা। আর আজ যাওয়ার সময় এমন করে এখানে ডেকে আনার কী মানে?

নরেনের ঘরের সামনে এল বোম। ঢোকার আগে দেখল, ঘরের ভিতর থেকে দু'জন শহুরে লোককে সঙ্গে করে বেরিয়ে যাচ্ছে জগা।

॥ ২ ॥

হারামি! পয়সাওলা লোকগুলো সব শালা হারামি! জগা মনে মনে বলল। আজ হারামিপনার মাশুল দিতে হবে সুবল মণ্ডলকে! ওর বোনের দিকে নজর দেওয়া! কোন সাহসে বলে যে, ওর সঙ্গে রাত কাটাতে হবে? জগাদের টাকা নেই বলে কি ওরা মানুষ নয়? ওইটুকু বোন ওর। সবে ষোলো হয়েছে, তার দিকে হাত বাড়াবে ওই জন্তুটা? আজ শালাকে এমন ডোজ় দেবে না!

চোয়াল শক্ত করে ব্যাগটার গায়ে হাত বোলাল জগা। বাবুর বাড়ি থেকে দু'পিস তুলে এনেছে সবার চোখের আড়াল দিয়ে। অতগুলোর ভেতর থেকে দুটো কম পড়লে কেউ বুঝতে পারবে না। মাস্টারের বানানো জিনিস! ইস্পেশাল।

জগা শেষ গ্লাসটা চোঁ করে মেরে উঠে দাঁড়াল। তরল আগুন গলা জ্বালিয়ে পেটের দিকে নেমে গেল। মাথাটা অক্ষয় কুমারের মতো নেচে উঠল। বাবুর বাড়িতে কাজ করলে এটা উপরি। ভাল জিনিস আনায় বাবু।

আসলে না এনেও উপায় নেই। সামনে ভোট। সেখানে বাবুকে জিততে হলে ওদের ওপরেই তো ভরসা করতে হয়। তাই ভাল খাবার, ভাল মাল না হলে ওরা কাজ করবে কেন? খালি পেট আর শুকনো গলায় কি অ্যাকশন হয়!

না, জগা নিজে সরাসরি অ্যাকশনে নামে না। ও হল সাপ্লায়ার। মুখে গামছা বেঁধে কাঁধের ব্যাগে করে বোমা, বন্দুক নিয়ে গিয়ে দেয় লড়াকু ছেলেপিলেদের হাতে! তারাই আর বিরোধীদের দাঁড়াতে দেয় না।

সামনেই ভোট। বাবুও দাঁড়িয়েছে। জিতলেই এমএলএ। আর সেটা হলেই এই চকমানিকপুরে বাবুকে, মানে নরেন সামন্তকে আর কে পায়! ওদের বাবু বলে দিয়েছে যে, ওরা হল সৈনিক। ওদের হাতেই বাবুর ইজ্জত। ইজ্জত না আরও কিছু! সবাই জানে নরেন সামন্ত একটা গুন্ডা! যে নিজের ভাইকে খুন করে তার বউকে বিয়ে করেছে, সে ভাল মানুষ নাকি! সবাই জানে গাঁয়ের অধিকাংশ জমি-জমা নরেন স্রেফ গায়ের জোরে বাগিয়ে রেখেছে। কিন্তু এখনকার দিনে যেহেতু টাকাই ঈশ্বর, তাই নরেনকে সামনে সবাই তোয়াজ করে চলে। সামান্য কথা বললেই পায়ে পড়ে যায়। সবাই ওর সামনে এমন করে হাসে, যেন কার দাঁত কত বেশি দেখা যায় তার প্রতিযোগিতা চলছে!

নরেনকে একদম ভাল লাগে না জগার। কিন্তু কী করবে! পেটের দায় বড় দায়! এমনিতে জমিতে খাটান দেয় ও। আর নরেনের দরকারে এসব মারদাঙ্গার দলে থাকে।

এবার অবশ্য ইস্পেশাল ব্যাপার। পার্টি থেকে টিকিট পেয়েছে নরেন।

"কী রে শুয়োর, ফোকটাই মাল পেলেই এত গিলতে হবে!"

কানাইয়ের কথায় মুখ তুলে তাকাল জগা। মনে হল একটা তাগড়া খিস্তি দেয়। কিন্তু তারপরেই মত পালটাল। কানাই গুহ, নরেনের খাস লোক। একে ভুলভাল বললে আর রেহাই নেই।

জগা হাসল একটু, "এই হয়ে গেছে কানাইদা। কয়েকটা বাকি আছে। তাই..."

কানাই বিরক্ত হয়ে তাকাল, "জানোয়ার! মাল খেয়ে বোমা সরাবি? পড়ে ফেটে গেলে? যা, ভেতরে যা। বাবু ডাকছে তোকে। দেখ কী বলেন! যা। ছাগল!"

নরেন ডাকছে। সেরেছে! এবার কী হবে রে ভাই! নরেন তো ওকে ডাকে না। মানে ওদের মতো মশা-মাছিদের দিকে তো নরেন ফিরেও তাকায় না। তা হলে ডাকছে কেন?"

জগার মাথা টাল খাচ্ছে। পেটে গিয়ে তরল কাজ চালু করে দিয়েছে। কিন্তু নরেন

ডেকেছে বলে কথা! সেখানে টালমাটাল হলেই লাথি মেরে বের করে দেবে।

ও একবার পড়ে থাকা বাকি বোমাগুলোর দিকে তাকাল। নিতাই আর বংশী আস্তে আস্তে সরাচ্ছে বাকিগুলো। বেশ কিছুটা দূরে বড় পুকুরপাড়ের পাশে, বাঁশবাগানের মাঝে একটা মাটির বাড়িতে বোমা তৈরি করে বোম আর মাস্টার। সেখান থেকে ওরা নিয়ে আসে এগুলো। আজও এনেছে।

"কী রে, যা!" কানাই হুংকার দিল আবার।

ইঃ, কত আওয়াজ! শালা হারামি! আবার মনে মনে গালি দিল জগা। তারপর হাতে থাকা বাজারের ব্যাগটা সাবধানে পাশের বেঞ্চে রেখে, একটা পুরনো প্লাস্টিকের ময়লা বোতল তুলে, তার থেকে জল বের করে মাথায়-মুখে ছিটিয়ে নিজেকে খানিকটা ঠিক করার চেষ্টা করল।

কানাই জিজ্ঞেস করল, "ওই ব্যাগে কী আছে রে?"

জগা ছোঁ মেরে ব্যাগটা তুলে নিয়ে কোনওমতে বলল, "ও কিছু না। আমার ওষুধ। আমি যাই।"

জগা বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে ভাবল আর-একটু হলেই হয়েছিল আর কী! কানাই ব্যাগটা দেখতে চাইলে খুব বিপদে পড়ত! জিনিস দুটো হাতছাড়া হয়ে যেত। এটা হতে দেওয়া যাবে না কিছুতেই। কারণ, তা হলে সুবল মণ্ডলকে শিক্ষা দেবে কী করে!

বড় বাড়িটার পেছনের দিক থেকে একটা সরু পথ বাড়ির সদরের দিকে চলে গিয়েছে। আধো জ্যোৎস্নার হলদে-কালো ছিট-ছিট আলোয় সেই পথ দিয়ে এগোতে লাগল জগা। পা টলছে সামান্য। মাথাও ঘুরছে। কিন্তু মনের জোরে সবটা ঠিক রেখেছে ও। ব্যাগটা আঁকড়ে রেখেছে ভাল করে। এটাকে পড়ে যেতে দেওয়া যাবে না কিছুতেই। এতে রয়েছে সুবল মণ্ডলকে জব্দ করার ওষুধ। নরেনের ওই ঘর থেকে সরিয়ে নেওয়া দানাভরা দুটো লাল-সাদা মাল! বোমা!

॥ ৩ ॥

সুজয় ক্যামেরাটা পাশের চেয়ারে রেখে বিরক্ত হয়ে বলল, "এখন সন্ধে সাতটা বাজে, আর এখন তুই কুড়ি কিলোমিটার দূরে শিমুলতলি যাবি? পাগল নাকি? সকাল আটটা থেকে চক্কর মারছি। শালা, আর পারছি না। ভারী ক্যামেরা হাতে করে শুট করা চাট্টিখানি কথা নাকি?"

দেবু যেন শুনতেই পেল না। ও সামনের দিকে তাকিয়ে নরেনকে বলল, "নরেনবাবু, আপনি যে লোকটাকে সঙ্গে দেবেন বললেন, সে কোথায়? এখন বেরোতে না পারলে শুট করা যাবে না। এমনিতে আর্টিফিশিয়াল লাইটে শুট করতে হবে। গ্রামের তাঁতিদের দিকটা মিস করলে তো পুরো ব্যাপারটাই দাঁড়াবে না!"

সুজয়ের মনে হল হাতের ক্যামেরাটা দেবুর মাথায় মারে ছুড়ে। কোনও কথা যদি শোনে!

দেবু খুব ঢ্যাটা ছেলে। মানছে যে, ভোটের আগে একটা টিভি চ্যানেল থেকে ওরা এসেছে গ্রামবাংলার পরিস্থিতিটা লোকের সামনে তুলে ধরবে বলে! মানছে যে, খুব টাইট শেডিউলে কাজ করতে হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে এভাবে পারা যায়? কাল একটু ভোর ভোর বেরিয়ে শুট করে নিলেই হত। তা নয় এখন যেতে হবে। অজানা, এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে যেতে হবে! দেবুটা পাগল।

নরেনবাবু এলাকার ক্ষমতাশালী মানুষ। ভোটে দাঁড়িয়েছে এবার। কিন্তু মুখ চোখ আর কথা বলার ভাষা দেখেই সুজয় বুঝেছে ফালতু লোক। দশ বছর হয়ে গেল টিভি চ্যানেলের ক্যামেরাম্যান ও। কম লোক তো দেখল না! আর, বেশির ভাগ সময় পলিটিকাল নিউজ় করতে হয় ওকে। এসব ত্যাঁদোর লোককে ও দেখলেই চিনতে পারে।

"বাবু, আসব?" ঘরের বাইরে থেকে একটা নড়বড়ে গলার স্বর এল এবার।

নরেন বড় সোফটায় ঘুরে বসে তাকাল দরজার দিকে। সুজয়ও তাকাল। একটা লোক। রোগা। গাল ভাঙা। ময়লা হাফ শার্ট, লুঙ্গি পরা। হাতে ধরা একটা বাজারের ব্যাগ।

"আয়," নরেন গম্ভীরভাবে ডাকল লোকটাকে।

লোকটা কেন্নোর মতো গুটিয়ে ঘরে ঢুকে একপাশে সরে দাঁড়াল।

নরেন দেবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ও জগা। ও-ই নিয়ে যাবে আপনাদের। শিমুলতলির বাসিন্দা। পথঘাট সব চেনে। আপনাদের তো গাড়ি আছে। ও সামনে বসে যাবে।"

"দারুণ," দেবু উঠে সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "সুজয়দা চলো। আর দেরি করা ঠিক হবে না। এটা সেরে কাল বাঁকুড়ার দিকে বেরিয়ে যাব।"

সুজয় দাঁত কিড়মিড় করল। কিন্তু ও জানে উপায় নেই। দেবু যখন বলেছে, তখন করতেই হবে।

ক্যামেরাটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। নরেনের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল। তারপর বাইরের দিকে পা বাড়াল।

নরেন জগার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবি। শিমুলতলিতে মান্নান আছে। ওর কাছে এদের পৌঁছে দিবি। বুঝলি? যা।"

মান্নান নরেনেরই লোক। শিমুলতলির তাঁতিদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়ে ওদের দেখাবে। শুট করতে সাহায্য করবে। কে জানে পার্টির লোকের সামনে তাঁতিরা কতটা নিজেদের কথা মন খুলে বলতে পারবে!

নরেনের ঘর থেকে বেরনোর সময় সুজয় দেখল, হাটুরে ধরনের লোকের সঙ্গে একটা তিরিশ-বত্রিশের ছেলে, পিঠে একটা বড় ব্যাগ নিয়ে নরেনের ঘরে ঢুকল। ছেলেটো বেশ সুন্দর দেখতে। কিন্তু মুখটা গোমড়া।

বাইরে ওদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। সাদা এসইউভি। পেছনে ক্যামেরা রেখে সুজয় সিটে উঠে বসল। দেবু আগেই বসে পড়েছিল।

সুজয় দেখল জগা লোকটা সামান্য ইতস্তত করছে। লোকটা যে মদ খেয়ে আছে, বুঝতে পারছে। পাশ দিয়ে আসার সময় ভালই গন্ধ পেয়েছে!

ও জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল, "জগা ভাই, সামনে উঠে পড়ো। কেমন?"

গাড়িটা গলি থেকে বেরিয়ে বড়রাস্তায় উঠল। গ্রামের রাস্তা। খুব খারাপ অবস্থা। গাড়িতে যাচ্ছে, না ঝড়ের মধ্যে সমুদ্রে নৌকো করে এগোচ্ছে কে জানে!

"দাদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?" সামনে থেকে জগা পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করল।

দেবু বলল, "কী?"

"আচ্ছা, আপনারা তো টিভির লোক! আপনাদের সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ আছে, না?"

"কেন বলো তো?" দেবুর গলায় বিস্ময়।

জগা ইতস্তত করল একটু। তারপর বলল, "না মানে, তা হলে একটু সুবল মণ্ডলের নামে নালিশ করতাম আর কী।"

"সুবল মণ্ডল? সে কে?"

জগা বলল, "সাক্ষাৎ শয়তান স্যার। নরেনবাবুর কাছের লোক। বড় ব্যবসা। বছর পঞ্চাশেক বয়স। ভোটে নরেনবাবুর হয়ে টাকা ঢালছে। নরেনবাবুর যে বিধবা বোন আছে, বনানী, তাকেও শুনছি বিয়ে করবে। শয়তানটা তো নিজের বউকে মেরেছিল আগেই। নরেনবাবুর যা দাপট তার চেয়ে শতগুণ বেশি দাপট নিয়ে ঘোরে মালটা!"

সুজয় আর না থাকতে পেরে বলল, "সে না হয় হল। তাতে পুলিশ কী করবে? ও যে নিজের বউকে মেরেছে সে জন্য ধরবে?"

"না না, সে জন্য কে ধরবে?" জগা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। গাড়ির ভেতরে সস্তা মদের গন্ধটা যেন আরও ছড়িয়ে পড়ল। গা গুলিয়ে উঠল সুজয়ের।

সুজয় বলল, "তবে?"

জগা আবার ইতস্তত করল, "আসলে বাবু, মানে... ইয়ে..."

দেবু খবরের গন্ধ পেয়ে সামান্য এগিয়ে বসল। সামনের সিটের ব্যাকরেস্টটা ধরে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "কোনও কেস আছে নাকি?"

"আমার বোন। ওর দিকে নজর দিয়েছে শয়তানটা," কথাটা বলে জগা কেমন যেন ছেড়ে দিল শরীরটা, "আমার বোনের বয়স ষোলো। নাম বিনি। ওর দিকে হাত বাড়াতে চায়। বাবা বেঁচে থাকার সময় সুবলের কাছে বাড়ি বন্ধক দিয়ে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়েছিল। এখন নাকি সেটা বেড়ে সুদে-আসলে আড়াই লাখ হয়েছে। এখন ও মানে..."

সুজয় বলল, "তোমার বোনকে বিয়ে করতে চায়?"

"না না, বিয়ে করবে না। ও বিয়ে করবে নরেনবাবুর বোনকে। আর আমার বোনকে... মানে... ইয়ে... বুঝতেই তো পারছেন..."

সুজয়ের মাথাটা ঝাঁঝাঁ করে উঠল। সুবল লোকটি যে জ্যান্ত রাক্ষস!

"ওকে পুলিশে দেওয়া যায় না?" জগা গাড়িটাকে ডান দিকে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে ঘুরে বসল।

গাড়িটা আরও বেশি দুলছে। বড়রাস্তা থেকে মাটির ভাঙা রাস্তায় ঢুকে মনে হচ্ছে এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ওপর দিয়ে চলেছে ওরা। গাড়ি না উলটে যায়!

সুজয় শক্ত করে গাড়ির জানলার ওপরে রাখা হাতল চেপে ধরে বসল।

দেবু বলল, "দ্যাখো, এভাবে মুখের কথায় তো কিছু হবে না। কোনও প্রমাণ না পেলে..."

"জানতাম!" জগা মাথা নাড়ল, "সেইজন্যই তো পেটো নিয়ে যাচ্ছি! হারামির বাড়িতে দুটো ঝাড়ব আজ রাতেই!"

"পেটো মানে?" সুজয়ের মনে হল ও কি ঠিক শুনল!

প্রচণ্ড দুলতে থাকা গাড়িতে কোনওমতে ব্যালেন্স রেখে জগা হাতের ব্যাগটা তুলে বলল, "এখানে আছে। দুটো। লাল-সাদা।"

"গাড়িতে তুমি... পেটো নিয়ে..." দেবু কী বলবে বুঝতে পারল না।

সুজয়ের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল ভয়ে। এমন রাস্তায়, এমন প্রচণ্ড দুলতে থাকা গাড়ির মধ্যে কেউ মদ খেয়ে, পেটো নিয়ে যায়! পাগল নাকি! এ তো যে-কোনও সময় ফেটে যাবে!

সুজয় চিৎকার করে ওদের গাড়ির ড্রাইভার মুকুন্দকে বলল, "এই, গাড়ি থামা! থামা গাড়ি!"

ওর বলার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যে, মুকুন্দ খারাপ রাস্তার একপাশে কোনওমতে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে দিল।

জগা কী হয়েছে বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকাল সুজয়ের দিকে।

সুজয় সময় নষ্ট না করে গাড়ি থেকে নেমে সামনের দরজা খুলে জগার হাত ধরে টানল, "নামো তুমি! নামো বলছি! পেটো নিয়ে এই পথ দিয়ে গাড়ি করে যাওয়া? ফেলো পেটো, ফেলে দাও বলছি! ফেলো!"

জগা গাড়ি থেকে নেমে এসে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। মানে, ঠিক যেন বুঝতে পারছে না ও কী করেছে।

সুজয় বলল, "পেটো দুটো ফেলে দাও। দাও! মানুষ মারতে উঠেছ তুমি! ফেলো! না হলে পুলিশে দেব তোমায়।"

জগা ভয় পেয়ে গেল এবার। শুনশান গ্রামের রাস্তায় এদিক-ওদিক তাকাল। দু'পাশে বড় মাঠ। তাতে নানা গাছপালার জটলায় জায়গাটা কেমন যেন ছায়া ছায়া! ওই বড় গাছগুলোর পেছনে নরেনবাবুর একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ তৈরির কারখানা আছে ও জানে। যদিও এই সন্ধেবেলা সেটা বন্ধ থাকে! এখন কী করবে ও!

জগা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ফেলব বোমা দুটো? রাস্তায় তো বসিয়ে দেওয়া যায় না! তবে কি ফাটিয়ে দেব?"

সুজয় বলল, "যা পারো করো। আগে ফেলো, এখনই!"

জগা মাথা নিচু করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। তারপর ব্যাগের ভিতর থেকে বের করল দুটো পেটো। কাছ থেকে নাম না জানা একটা পাখি টিট্টি স্বরে ডেকে উঠল! ডাকটার মধ্যে কেমন যেন একটা গা-ছমছমে ভাব আছে! জগা মাথা নাড়ল। বলল, "ভগবান বলে সত্যি কিছু নেই। এবারও বেঁচে গেল সুবল!"

॥ ৪ ॥

জায়গাটা খাসা। সবার আড়ালে মাঠের একপাশে এরকম একটা জায়গা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার! সুবল উঠে বসে জামাটা পরে নিল। চৌকিতে এখনও মেয়েটা শুয়ে আছে। তবে ওইদিকে মুখ করে। ষাট পাওয়ারের আলোয় মেয়েটার ঘামে ভেজা পিঠটা দেখা যাচ্ছে! চকচক করছে। কিন্তু সুবল আর উত্তেজিত হচ্ছে না এখন। একটু আগে এই মেয়েটার সঙ্গেই শোওয়ার সময় কত না উত্তেজিত ছিল। কিন্তু যেই শরীর শান্ত হয়ে গিয়েছে, মনে কেমন একটা বৈরাগ্য এসে ভর করছে সুবলের। আসলে এমন দশ মিনিটের বৈরাগ্য সমস্ত পুরুষই টের পায় বলে ধারণা সুবলের। শরীর শান্ত হয়ে যাওয়ার পরের কিছুক্ষণ সব পুরুষই হয়তো সাধু হয়ে ওঠে!

জামা পরার পরে ও বিছানা থেকে উঠে ধুতিটা পরল। তারপর মেয়েটার দিকে দেখল আর-একবার। লাইনে নতুন নেমেছে মেয়েটা। বয়স বেশি নয়। ওই দূরের কাটাপোলের দিকে যে পট্টিটা আছে, সেখান থেকে মাধো নিয়ে এসেছে।

আসলে ওইসব পাড়ায় সুবল যায় না। বদনাম হওয়ার ভয় থাকে। তাই মাধো নিয়ে আসে এখানে। নরেনের কারখানার পাশে একটা ঘর আছে। তাতে তক্তপোশ থেকে ফ্রিজ— কী নেই! এটার চাবি নরেন দিয়ে রেখেছে ওকে। না দিয়েই-বা যাবে কোথায়! নরেনের টিকি যে বাঁধা আছে ওর কাছে! না হলে কে ওই অপয়া বিধবা বোনকে বিয়ে করবে? ভোটে জেতার জন্য যে টাকা খরচ করছে নরেন, সেটার জোগান কে দেবে!

"মাধো এসে তোকে টাকা দেবে। কাপড় পরে নে। আমি গেলাম," সুবল কথাটা বলে ঘরের বাইরে এল।

ঘরের বাইরে একটা বারান্দা। মাথায় টিনের শেড। আবছা অন্ধকার। চাঁদের আলোয় যেটুকু দেখা যায় আর কী।

ওকে দেখে মাধো এগিয়ে এল। লোকটা বিশ্বস্ত। কথা শোনে। ওর বড় দাদা কানাই নরেনের হয়ে কাজ করে।

সুবল দেখল মাধোর পেছনেও একজন আছে। চিনতে পারল ঠিক। রাধু। বিনির বড় দাদা। এসেছে তবে! না এসে যাবেই-বা কোথায়!

রাধু, গোপাল আর জগা। তিন ভাই ওরা। ওদের বাবা মারা যাওয়ার আগে শিমুলতলির বাড়িটা গচ্ছিত রেখে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়েছিল। সেটার মূল্য তো ওদের দিতে হবে! হয় আড়াই লাখ দাও, নয়তো বিনিকে দাও!

না না, বিয়ে করবে না বিনিকে। কিন্তু রাখবে ওকে। টাউনে একটা বাড়িভাড়া করে রাখবে সুবল। বাঁধা মেয়েমানুষ করে রাখবে। আসলে যেদিন থেকে বিনিকে ও দেখেছে মাথাখারাপ হয়ে আছে। কী শরীর মেয়েটার! এমন ডাঁটো মেয়ে ও কোনওদিন দেখেনি। একে না পেলে পুরুষ হওয়াই বৃথা। তাই হিসেবটা সোজা। হয় টাকা দাও নয় বিনি দাও। আর না হলে ভিটে ছাড়ো।

সুবল মাধোকে বলল, "ভেতরেরটাকে টাকা দিয়ে বিদেয় কর। আর হ্যাঁ, যেন পেছনের দরজা দিয়ে যায়।"

মাধো ঘরে ঢুকে গেলে, জামার হাতা গুটোতে গুটোতে সুবল এগিয়ে গেল রাধুর দিকে।

"কী ঠিক করলি?" সুবল রাধুর পিঠে হাত রেখে ওকে বারান্দা থেকে নামিয়ে সামনের সামান্য খোলা জায়গায় নিয়ে এল।

এদিকটা বেশ নির্জন। সামনে বড় গাছ। গাছের ও-পারে গ্রামের রাস্তা। কিন্তু এখান থেকে দেখা যায় না। চারিদিকে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। জোনাকি উড়ছে। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে সুবল একটা সিগারেট ধরাল।

রাধু বলল, "এটা কী বলছেন আপনি! নিজের বোনকে এমন করে... এ কি সম্ভব!"

"আপনে বাঁচলে বাপের নাম," সুবল হাসল, "শালা, যেদিন পোঁদে লাথি মেরে বের করে দেব বাড়ি থেকে, সেদিন বোন বোন বলে জপ করিস। শোন, আর দশ দিন সময় দিলাম। টাকা মিটিয়ে দে। না হলে মাধো গিয়ে বিনিকে তুলে আনবে। দেখব,

কার কত দম আছে আটকায়। যা এখন। যা।”

রাধু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল ওর দিকে। আরও কয়েকবার কাকুতিমিনতি করল। তারপর মাথা নিচু করে সাইকেল নিয়ে চলে গেল।

হাসল সুবল। পৃথিবী হল শক্তিমানদের। এখানে কুঁইকুঁই করেছ কী, সবাই কুকুরের মতো ব্যবহার করবে! ওঃ বিনির কথা ভাবলেই আবার শরীরটা কেমন যেন করে উঠছে। মেয়েটাকে কি মাধো সত্যি টাকা দিয়ে বিদেয় করে দিল! না হলে...

সুবল পেছনে ঘুরল ঘরে ঢুকবে বলে আর ঠিক তখনই কাছেই একটা রাতচরা পাখি টিট্টি স্বরে ডেকে উঠল। সুবলের কেমন যেন একটা মনে হল। ও দ্রুত পেছন ফিরে মাথা তুলে তাকাল। দেখল, বলের মতো কী একটা জিনিস সামনের বড় গাছটা টপকে ওর দিকে ধেয়ে আসছে!

॥ ৫ ॥

আবার সেই গন্ধ! গন্ধটা যেন কেউ ওর স্মৃতির সঙ্গে সেলাই করে দিয়েছে! গন্ধের যে এমন টান থাকতে পারে আগে কোনওদিন বোঝেনি বোম।

নরেনের সামনে বসেও সেই গন্ধটা পাচ্ছে ও। বোম জানে এ মনের ভুল। কিন্তু তবু পাচ্ছে। মনের ভেতরে একটা একটা করে রঙিন নুড়িপাথর জমছে! আর তার ভারে বোম ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে জলের তলায়।

এখান থেকে পালাতে হবে ওকে। বনানীকে কোনওদিন ও নিজের মনের কথা বলতে পারবে না। তার চেয়ে এই চলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু সেখানেও বাধা! কেন এখন ওকে ডেকে আনল নরেন! আর কী চায়! এতদিন তো মুখ বুজে বোমা বানানোর কাজটা করে দিয়েছে। এবার কি রেহাই দেবে না!

নরেন তাকাল ওর দিকে, “আরে, তুই আজকেই চলে যাচ্ছিস নাকি? একদম ব্যাগপত্তর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিস!”

“আমি তো আপনাকে বলেইছিলাম নরেনদা...” বোম চোয়াল শক্ত করল।

“না না, আজ যাওয়া হবে না তোর। আরে, গেলেই হল নাকি! হরেন পাল শুনলাম ভোটের আগে বিস্তর হাঙ্গামা বাঁধাবে! আমার আরও বোমা চাই। সেসব বানিয়ে দিয়ে তারপর যাবি।”

“নরেনদা, কাল থেকে আমার জয়েনিং। আমি তো আপনাকে বলেইছিলাম,” বোম অবাক হয়ে তাকাল!

“শোন, ওসব ভাটের চাকরি পরে করবি। আগে আমার কাজ করতে হবে তোকে। যা বানিয়ে দিয়েছিস তাতে চলবে না। ম্যাক্সিমাম তো শুধু শব্দ আর ধোঁয়া! ওতে আর হবে না। বোমার মধ্যে মাল ভরে শ'দুয়েক বানাতে হবে। জাল কাঠি, পেরেক, বল বেয়ারিং সব আমি এনে রেখেছি। আজ রাত থেকেই কাজ শুরু করে দে। মাস্টারের শরীর খারাপ। তাই ও কয়েকদিন পারবে না ওসব বানাতে।”

বোম বলল, “এ আমি পারব না। কানাইদা আছে। ও মাস্টারের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে ওসব বোমা বানানো। ওকে দিয়ে বানিয়ে নিন। আমায় ছেড়ে দিন দাদা।”

“পারবি না?” নরেন আচমকা উঠে এল নিজের জায়গা থেকে। তারপর বোমের চুলের মুঠি শক্ত করে ধরে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, “শুয়োরের বাচ্চা, জিভ টেনে ছিঁড়ে দেব তোর! আমায় না করছিস! আমায় না করলে জানিস তো...”

কিন্তু কথা শেষ হওয়ার আগেই আচমকা দুম দুম করে দুটো বোমার শব্দ ভেসে এল দূর থেকে! নরেন সচকিত হয়ে তাকাল বাইরের দিকে। বোমের চুলের মুঠো ছেড়ে দিল। চোখেমুখে বিভ্রান্তি!

বোম দেখল, কানাই প্রায় দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল তার একটু পরেই। উত্তেজিত গলায় বলল, “দাদা, আপনার ব্যাগের কারখানার ওদিকে অ্যাটাক হয়েছে। মাধো ফোন করেছিল। সুবলদা পড়ে গিয়েছে। সাড় নেই। এ শিওর হরেন পাল। জানি না ওরা কতজন আসছে! আপনি চলুন।”

নরেন তাকাল বোমের দিকে। বলল, “দেখলি তো! দেখ। এই জন্যই বলেছিলাম। তুই যাবি না কোথাও। একদম চুপ করে বসে থাক। আমি আসছি।”

এই বলে কানাইকে নিয়ে দ্রুত ঘর থেকে উত্তেজিত ভাবে বেরিয়ে গেল নরেন।

ফাঁকা ঘরে পিঠে ব্যাগ নিয়ে বসে রইল বোম। আর ঠিক তখনই গন্ধটা আবার পেল ও। সেই অদ্ভুত অবশ করে দেওয়া গন্ধ। মনের মধ্যে এভাবে কেন রয়ে গেল গন্ধটা? ওকে সারা জীবন কষ্ট দেবে বলে!

চোখ বন্ধ করল বোম। আর তখনই কে যেন আলতো করে হাতটা ধরল ওর।

কে?

চোখ খুলল বোম। সঙ্গে-সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে এল ওর। দেখল, একদম সামনে এসে আকাশজোড়া চোখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে বনানী!

॥ ৬ ॥

বাড়ির পেছনে অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা দু'জন। সামনে মোটর বাইক। চাবিটা ও তুলে দিয়েছে বোমের হাতে! বোমের হাত ঠান্ডা। থিরথির করে কাঁপছে! বাড়িতে নরেন আর ওর পোষা কুকুরগুলো নেই। সব কারখানার মাঠের দিকে গিয়েছে। অ্যাকশন হবে!

এটাই সুযোগ। বোমকে এখান থেকে, এই নরক থেকে বের করার এটাই সুযোগ। বনানী তাই আর দেরি করেনি। বোমকে সটান নিয়ে এসেছে বাড়ির পেছনে। দুটো গাড়ি আর চারটে মোটর বাইক রাখা থাকে এখানে। বোমের হাতে একটা বাইকের চাবি তুলে দিয়েছে ও। পালিয়ে যাক ছেলেটা। বেঁচে যাক। ওর না হয় জীবন বলে কিছু নেই। তাই বলে বোমের জীবন এমন হবে কেন!

বনানীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে নরেন বিয়ে দিয়েছিল ওকে। সেই বিয়ে ছ'মাসও কাটেনি, বর আত্মহত্যা করেছিল! আসলে ওর বরের সম্পর্ক ছিল নিজের বউদির সঙ্গে। বউদির সন্তান হবে এই খবর পেয়ে ওর বর আর নিজেকে সামলাতে পারেনি! ঝুলে পড়েছিল ফ্যানের সঙ্গে।

বনানীর কোনও দোষ নেই। তাও ওকে কষ্ট পেতে হল। গ্রামে বাজে কথা রটল। একরকম কুঁকড়ে শামুকের মতো গুটিয়ে গেল ওর জীবন।

আর তখনই ও দেখেছিল বোমকে। শান্ত, নম্র একটা ছেলে। নরেন যাকে দিয়ে খারাপ কাজ করায়!

দূর থেকে যত বোমকে দেখত, তত ভাল লাগত ওর। চোখে চোখ পড়লে সরিয়ে নিত না চোখ। বোম ভয় পেত। মাথা নিচু করে নিত। মনে, শরীরে কষ্ট হত বনানীর।

তাই একদিন আর না পেরে কুয়োতলার কাছে বোমকে দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার ভান করেছিল। ওর যা ইচ্ছে ছিল, সেটাই হয়েছিল। বোম ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ঘরে। চোখ বন্ধ করে হলেও ও বোমের শ্বাস-প্রশ্বাস টের পাচ্ছিল। বকুল ফুলের গন্ধ আসছিল বোমের শরীর থেকে। ও শক্ত করে ধরে রেখেছিল বোমের জামা! কোনওদিন ও বোমকে পাবে না। কিন্তু এইটুকু সান্নিধ্য তো মুঠো করে রেখে দিল সারা জীবন।

বোম বাইকে বসে তাকাল ওর দিকে!

হেলমেটটা ওর মাথায় পরিয়ে থুতনির কাছে লকটা আটকে দিল বনানী।

বোম বলতে গেল কিছু। কিন্তু বনানী বলতে দিল না। আঙুল রাখল ঠোঁটের ওপর। মাথা নাড়ল। বলল, “দ্রুত চলে যাও তুমি। ট্যাঙ্কে তেল ভর্তি আছে!”

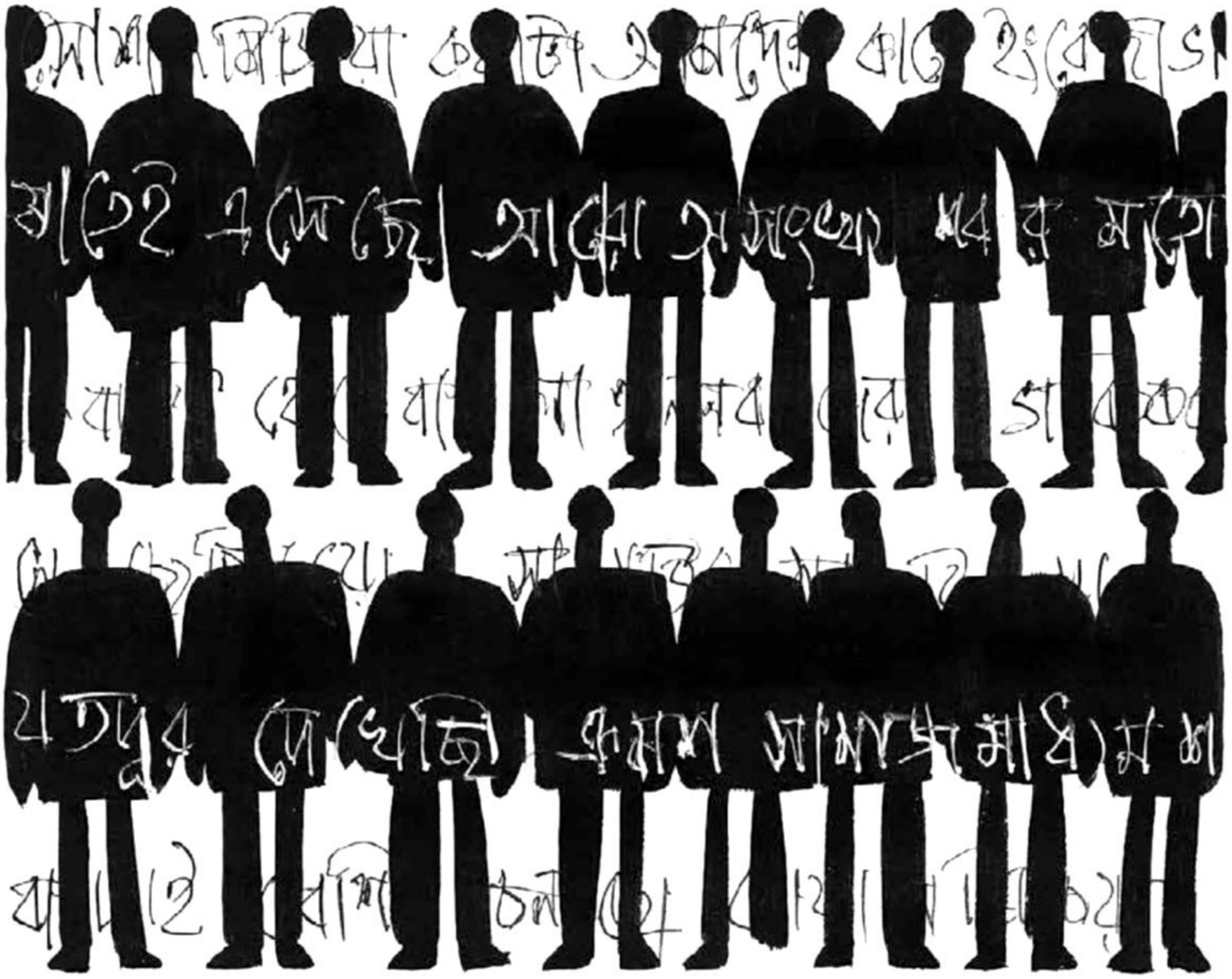
বোম তাও বলল, “এভাবে আমায় সাহায্য করলে! নরেনদা জানলে...”

বনানী বলল, “মানুষকে দীর্ঘদিন চেপে, বেঁধে রাখলে, সে একদিন বোমার মতো ফেটে পড়ে, জানো না! আজ না হয় আমি ফেটে পড়লাম!”

বোম বলল, “আমি আসব আবার... তোমায় এখান থেকে...”

বনানী আবছায়ার মধ্যে তাকাল বোমের দিকে। তারপর অস্ফুটে বলল, “না এলেই-বা কী! শুধু পাওয়ার মধ্যেই তো আর ভালবাসার পূর্ণতা থাকে না! তোমার গন্ধটুকু তো রইল আমার কাছে। এই অনেক!”

শিল্পী: মহেশ্বর মণ্ডল



যে সমাজ সে-ই মাধ্যম

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

সোশ্যাল মিডিয়া কথাটা আমাদের কাছে ইংরেজি ভাষাতেই এসেছে, আরও অসংখ্য শব্দের মতো। তার পর আমরা তার একটা বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজেছি, যেমন, আজও মাঝে মাঝে খুঁজি, কিছু কাল পরে— ইংরেজির কাছে আত্মসমর্পণ ষোলো কলা পূর্ণ হলে— হয়তো আর একেবারেই খুঁজব না। তো, ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের স্বাভাবিক নিয়মে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা বেছে নিয়েছি সামাজিক মাধ্যম। সেখান থেকে, সম্ভবত এক কথায় প্রকাশ করার তাগিদেই, পৌঁছেছি সমাজমাধ্যম-এ। যত দূর দেখছি, ক্রমশ সমাজমাধ্যম শব্দটাই বেশি চলছে। সোশ্যাল মিডিয়া অবশ্যই চলছে আরও অনেক বেশি, কিন্তু তার আর কী করা? ইংলিশ মিডিয়ামের সঙ্গে বাংলা মিডিয়াম লড়বে, সংস্কৃতিধন্য পশ্চিমবঙ্গে তেমনটা আশা করাই বাতুলতা।

কেবল শব্দসংক্ষেপের কারণেই নয়, সমাজমাধ্যম কথাটা অন্য কারণেও বেশ কাজের। কেন, সেটা একটু বলার চেষ্টা করছি। কারণ, তার সঙ্গে এই লেখার মূল বক্তব্যের একটা বিশেষ যোগাযোগ আছে। সমাজমাধ্যমের মধ্যে একই সঙ্গে দুটো ধারণা নিহিত আছে। এক দিকে,

শব্দটা সোজাসুজি সামাজিক মাধ্যমের প্রতিশব্দ, অর্থাৎ এমন এক মাধ্যম, যার সামাজিক চরিত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে একটা খুচরো তর্ক উঠতে পারে যে, সোশ্যাল মিডিয়া, তার যে প্রতিশব্দই ব্যবহার করি না কেন, নাম হিসেবে বিভ্রান্তিকর। কারণ, অন্য যে মাধ্যমের কথাই ভাবা হোক, তা-ও তো সামাজিক বই কিছু হতে পারে না, পরিচিত সংবাদমাধ্যম কি অসামাজিক? এ তর্ক কেবল খুচরো নয়, নেহাতই কুতর্ক। অনেকটা বছর পঁচিশ আগেকার সেই তর্কের মতো, যখন সেই সময়ের নতুন ধারার গান বোঝাতে 'জীবনমুখী গান' কথাটা চালু হল আর তা শুনে পুরনো ধারার কেউ কেউ ফুঁসে উঠলেন, 'আমরা কি তবে মরণমুখী গান গেয়ে এসেছি?' জীবনমুখী নামটি খুবই নির্বোধ ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু যাঁরা সে নাম দিয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই এই বিশেষণের বিপরীত শব্দ হিসেবে মরণমুখী ভাবেননি, ভেবেছিলেন জীবনবিমুখ। সে ভাবনার ঠিক-ভুল এখানে আলোচ্য নয়, অবান্তর তর্কের নমুনা হিসেবেই এই দৃষ্টান্ত দেওয়া। সামাজিক মাধ্যম বা (তার সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে) সমাজমাধ্যম শব্দটি ব্যবহার করা মানে কখনওই অন্য মাধ্যমকে অসামাজিক বলা বোঝায় না, এই মাধ্যমগুলির সামাজিক চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সংবাদপত্র বা পত্রিকা, টেলিভিশন, ওয়েব-ম্যাগাজিন বা নিউজ় পোর্টালের মতো ডিজিটাল পরিসরের নানা সংবাদ-ভাণ্ডার, এই সবের থেকে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার ইত্যাদির মৌলিক স্বাতন্ত্র্য হল, সেখানে সমাজের নাগরিকরা নিজেরাই তথ্য ও মতামত বিনিময় করছেন, সেই বিনিময় তার চরিত্রে এক ধরনের সামাজিক আদানপ্রদান। এই মাধ্যমগুলিতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন বা ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমের অজস্র লেখা ও ছবি প্রতিনিয়ত প্রচারিত হয়, কিন্তু তাতে ওই সামাজিক আদানপ্রদানের ব্যাপারটা মিথ্যে হয়ে যায় না, বরং সেই লেনদেনের মধ্য দিয়েই ওই সব লেখা ও ছবির প্রচার সামাজিকতার এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মাত্রা অর্জন করে।

আর এই সূত্রেই এক ভিন্ন মাত্রা অর্জন করে সমাজ ও সামাজিকতার ধারণাটিও। সেটাই সমাজমাধ্যম শব্দটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। সামাজিক মাধ্যম বা তার ইংরেজি উৎস-শব্দ সোশ্যাল মিডিয়া যখন বলি, তখন মিডিয়া/ মাধ্যমই প্রধান বা প্রমুখ, সামাজিক/ সোশ্যাল তার বিশেষণ। সমাজমাধ্যম বললে আপেক্ষিক গুরুত্বের অঙ্ক বদলে যায়, সমাজ-এর ওজন মাধ্যম-এর সমান হয়ে ওঠে, কিংবা তার চেয়ে কিছুটা বেশিই হয়তো। এবং এই পরিবর্তনটাই বাস্তবেও সত্য। অর্থাৎ, বাস্তবেও সমাজমাধ্যমের পরিসরে সমাজ ব্যাপারটা মাধ্যমের সমান হয়ে উঠেছে। কেন এ কথা বলা, তার একটু বিস্তারিত আলোচনা দরকার। প্রথমত, মাধ্যম শব্দটিকে আর-একটু ভাল করে নজর করা যেতে পারে। মাধ্যম যখন বলছি, তখন নিশ্চয়ই দুই বা ততোধিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্যে, এক কথায় দু'টি বর্গের মধ্যে সংযোগের কথা ভাবছি, তা না হলে মাধ্যমের প্রশ্ন ওঠে না। যে মধ্যস্থতা করে, সে-ই মাধ্যম, এটা নেহাত সরল হিসেব। যেমন, সংবাদপত্র বা টেলিভিশন চ্যানেল পাঠক-দর্শকের সঙ্গে সংবাদ সরবরাহকারীদের সংযোগ সাধন করে, তাই তারা সংবাদমাধ্যম। এবার, সমাজমাধ্যমের একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল, সেখানে সংবাদের (বা বিনোদনের কিংবা যে-কোনও তথ্যের) স্রষ্টা বা জোগানদারের সঙ্গে তার উপভোক্তার মধ্যে কাউকে বিশেষ ভাবে মধ্যস্থতা করতে হয় না, আদানপ্রদান চলে সরাসরি, অনেক ক্ষেত্রেই এই দুই বর্গের মধ্যে বিভাজনরেখাও স্পষ্ট বা নির্দিষ্ট নয়, যে জোগানদার, সে-ই আবার উপভোক্তা। সুতরাং মাধ্যম কথাটা তার আদি ভূমিকা বা গুরুত্ব অনেকটাই হারিয়ে ফেলে। একটু গলা চড়িয়ে বললে, চিরাচরিত অর্থে মাধ্যম বলতে যা বোঝায়, সমাজমাধ্যম চরিত্রে তার থেকে আলাদা। অন্য ভাবে দেখলে, মাধ্যম শব্দটির অর্থের একটা সম্প্রসারণ ঘটে গেছে, যেমন অন্য বহু শব্দেরই ঘটে।

এখানেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে আর-একটা ব্যাপার। এই সম্প্রসারণের প্রক্রিয়ায় সমাজ নিজেই হয়ে ওঠে মাধ্যম। আমরা যখন সমাজমাধ্যমে লিখছি, আঁকছি, পড়ছি, বলছি, শুনছি, তখন আমরাই পরস্পরের কাছে মাধ্যম হয়ে উঠছি। প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ, তৃতীয় পক্ষ, বহু পক্ষ সেখানে এক অনন্ত পারস্পরিকতায় সম্পর্কিত হচ্ছে, যে সম্পর্ক তার মূল চরিত্রেই সর্বদা সর্বত্র চলমান, পরিবর্তনশীল। আর ঠিক সেই কারণেই বলেছি, সমাজমাধ্যম শব্দটি সমাজমাধ্যমের ধারণার সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে যায়। সমাজ এবং মাধ্যমের মধ্যে এক ধরনের সমীকরণ ঘটে গেছে, এই বাস্তবটি ওই শব্দে চমৎকার প্রতিবিম্বিত হয়। এমনকী, আমরা ভাবতেই পারি যে, সমাজমাধ্যমকে 'সমাজ আশ্রিত মাধ্যম' হিসেবে না দেখে 'যে সমাজ, সে-ই মাধ্যম', এ-ভাবেও দেখব, কর্মধারয়ের বদলে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস হিসেবে ভাঙব। ব্যাকরণ তো জীবনকেই অনুসরণ করে।

প্রশ্ন হল, সমাজ এবং মাধ্যমের এই সমীকরণের পরিণাম কী হয়েছে, কী হতে পারে? এই লেখায় আমরা সংবাদের উপরেই মনঃসংযোগ করব, বিনোদনের প্রসঙ্গে যাব না। কারণ, দু'টি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও দুই জগতের গতিপ্রকৃতির মধ্যে তফাত বিস্তর, তাই সীমিত পরিসরে একসঙ্গে দু'টি বিষয়ের আলোচনা করতে গেলে দুইয়েরই ক্ষতি হবে। আমরা দেখতে চাইব, নাগরিকরা নিজেরাই যদি সংবাদ আদানপ্রদানের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ান, সেটা সমাজবাস্তবকে কী ভাবে প্রভাবিত করে? বলা বাহুল্য, এ-প্রশ্নের পরিসর খুব বেশি বিস্তৃত, একে নানা দিক থেকে বিচার করে দেখা যায়— সমাজবাস্তব ব্যাপারটা বহুমাত্রিক এবং জটিল, তার পরিসরে থাকে অনেক ধরনের বিষয়। কিন্তু আমাদের কাছে তার মধ্যে একটি দিক বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তার নাম: গণতন্ত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটা দাঁড়ায়: সমাজমাধ্যম কি সমাজে গণতন্ত্রের প্রসারের পথ প্রশস্ত করেছে বা করছে, নাকি সে-পথে নতুন নতুন কাঁটা বিছিয়ে চলেছে? এক কথায় বললে, সোশ্যাল মিডিয়া বা সমাজমাধ্যম গণতন্ত্রের অনুকূল না প্রতিকূল, বন্ধু না শত্রু?

আজ থেকে দশ, কিংবা পাঁচ বছর আগেও এই প্রশ্নের উত্তরে গোটা পৃথিবী নির্দ্বিধায় সমস্বরে বলত: বন্ধু। ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি যখন মোবাইল ফোনের কল্যাণে আক্ষরিক অর্থেই প্রথম মানুষের করায়ত্ত হল, তখন এ বিষয়ে কার্যত কারও কোনও সন্দেহ ছিল না যে, এই প্রযুক্তি-বিপ্লব গণতন্ত্রকে প্রসারিত করবে। অনেকেই মনে করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এর মঙ্গলজনক ভূমিকা হবে অকল্পনীয়। দু'টি কারণে সে দিন এই ভাবনা স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ছিল। এক, প্রচলিত তথা মূলধারার সংবাদমাধ্যমের অ-গণতন্ত্র। গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে দুনিয়া জুড়েই সংবাদমাধ্যমের মালিকানায় এবং নিয়ন্ত্রণে বড় পুঁজির দাপট বেড়েছে। বিশ্ব-অর্থনীতিতে পুঁজির পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠার অঙ্গ হিসেবেই এই প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ছিল। এর পাশাপাশি, বস্তুত এর সংলগ্ন প্রক্রিয়া হিসেবেই বেড়েছে সংবাদমাধ্যমের বিজ্ঞাপন-নির্ভরতা। তার বিপুল প্রভাব পড়েছে সংবাদের উপরে। সেই প্রভাবের বিশদ বিবরণ দেওয়া এখানে অ-সম্ভব, অপ্রয়োজনীয়ও। কিন্তু মূল সমস্যা এই যে, বহু ধরনের এবং বহু মতের সংবাদ পরিবেশনের সুযোগ অনেক কমে গেছে। এক দিকে বড় পুঁজির দাপটে ছোট আকারের সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব কমেছে, অন্য দিকে সমাজের যে সচ্ছল শ্রেণি বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে প্রাসঙ্গিক, বড় সংবাদমাধ্যম তার মনোমত সংবাদ এবং সংবাদ পরিবেশনের ধরনকেই উত্তরোত্তর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, বিশেষ করে মার খেয়েছে সেই সব সংবাদ

এবং আলোচনা, যা বড় পুঁজির অপছন্দ। সংবাদের বহুত্ব গণতন্ত্রের এক অপরিহার্য শর্ত, সেই শর্ত লঙ্ঘনের সম্ভাবনা এই পরিবেশে স্বভাবতই অনেক বেড়ে গেছে।

এই প্রেক্ষাপটে সমাজমাধ্যমের আবির্ভাব। সেখানে যে-কোনও নাগরিক যা চান যে ভাবে চান সে ভাবেই তা লিখতে পারেন, যে যখন খুশি যত বার খুশি তা দেখতে পারে, স্বাভাবিক অবস্থায় বাধা দেওয়ার কোনও উপায় নেই। খবরের কাগজ কী লিখল, কী ভাবে লিখল, টেলিভিশনের সংবাদ চ্যানেল কোন খবরের উপর জোর দিল, কোন খবরকে আড়ালে রাখল, তার পরোয়া না করে কথা, ছবি, অডিয়ো, ভিডিয়ো, যার যা ইচ্ছে সমাজমাধ্যমের অনন্ত পরিসরে ছড়িয়ে দিতে পারেন, দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায় বসে যে-কেউ তা তৎক্ষণাৎ জানতে পারবেন। গণতন্ত্রের, আক্ষরিক অর্থেই, অসীম সম্ভাবনা বই কী!

এই সম্ভাবনার একটি দ্বিতীয় মাত্রাও গুরুত্বপূর্ণ বলে বন্দিত হয়েছিল। রাজনৈতিক মাত্রা। মনে করা হয়েছিল, নীতিকারদের উপর চাপ সৃষ্টি করে নীতিতে ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটানোর সুযোগ নাগরিকদের হাতে এনে দিয়েছে সমাজমাধ্যম। বহু মানুষ সেই মাধ্যমকে ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যে সংযোগসাধন করে দ্রুত আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন এবং সেই আন্দোলনের চাপে রাষ্ট্র তথা ক্ষমতাশালীদের মত ও পথ পরিবর্তনে বাধ্য করতে পারেন, এটাই রাজনৈতিক সম্ভাবনা। স্পষ্টতই, গণতান্ত্রিক সম্ভাবনা। বস্তুত, ফলিত গণতন্ত্রের প্রকরণ হিসেবে এর চেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় কোনও কিছুর কথা ভাবাই কঠিন। এই দশকের শুরুতে পশ্চিম এশিয়ায় ও উত্তর আফ্রিকায়— পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদী ভাষায় বললে মধ্যপ্রাচ্যে— যে বিপুল আন্দোলনের বাঁধ ভাঙল, সেই 'আরব বসন্ত' এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে প্রমাণ করে দিল। সেই পালাবদলের নাম দেওয়া হল 'টুইটার বিপ্লব'। নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভোটের বাক্সে বা মেশিনে নিজের পছন্দটি জানিয়ে দিয়েই নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার পালন সাঙ্গ হবে, নিজেদের গণতান্ত্রিক ভূমিকা জানানোর বা শাসনতন্ত্রকে প্রভাবিত করার আর কোনও কার্যকর উপায় হাতে থাকবে না— প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের এই চিরাচরিত ধারণা ভেঙে গেল সমাজমাধ্যমের দাপটে, এক ধরনের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অবিরত অনুশীলনের পথ খুলে গেল। সমাজমাধ্যমে অবাধ এবং তাৎক্ষণিক যোগাযোগের কল্যাণে, বলা চলে, জ্ঞানের গণতন্ত্র থেকে উঠে এল কর্মের গণতন্ত্র। সমাজমাধ্যমের গণতান্ত্রিক অমিতসম্ভাবনা নিয়ে উদ্দীপনা ও উত্তেজনা অস্বাভাবিক ছিল না। রাজনীতি যদি সম্ভাব্যতার শিল্প হয়, তবে নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তি সেই সম্ভাব্যতাকে এক অভূতপূর্ব মাত্রা দিল। গণতান্ত্রিক রাজনীতির নতুন এক মনোহর ছবি আঁকলেন সমাজমাধ্যমের গুণমুগ্ধ পর্যবেক্ষকরা।

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি। সমাজমাধ্যম গণতন্ত্রের এবং গণতান্ত্রিকতার উপকার করছে না অপকার, তা নিয়ে তর্কের শেষ নেই। একটা স্তরে তর্কটা একেবারে প্রত্যক্ষ নির্বাচনী রাজনীতি নিয়ে, সেই রাজনীতির ওপর সমাজমাধ্যমের প্রভাব নিয়ে। এই প্রভাবের সবচেয়ে বেশি আলোচিত উদাহরণটি অবশ্যই ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচন সংক্রান্ত। কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা কাহিনি সেই নির্বাচনের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে গেছে এবং সেই ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। কলঙ্কের মাত্রা ও তার স্বরূপ যেমনই হোক না কেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, সমাজমাধ্যম এই নির্বাচনে এমন একটা ভূমিকা নিয়েছে, যা সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব। ঠিক যেমন অভূতপূর্ব ভারতের ষোড়শ ও সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে সমাজমাধ্যমের ভূমিকাও। পাঁচ বছর আগে জাতীয় রাজনীতির ময়দানে আবির্ভাবের সময়েই নরেন্দ্র মোদী দেখিয়ে দিয়েছিলেন, ভোটের যুদ্ধে সমাজমাধ্যম কতখানি সফল হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় দফার অভিযানে সেই হাতিয়ারের কৃৎকৌশল সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে গেল। এই দু'টি নির্বাচনে সমাজমাধ্যমের ভূমিকায় যে বিবর্তন ঘটল, আমাদের এই আলোচনার পক্ষে তার তাৎপর্য অপরিসীম। অতঃপর সেটাই অল্প কথায় বলার চেষ্টা করব।

রাজনৈতিক দল ও নেতারা নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের মতো করে সমাজমাধ্যমকে ব্যবহার করবেন, সেটা খুব স্বাভাবিক। নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে সেই কাজটিই প্রবল উদ্যমে এবং দক্ষতার সঙ্গে করেছিলেন। ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী তৈরি করে বহুতর মানুষের কাছে নিমেষে পৌঁছে যাওয়ার পরিকাঠামো তাঁকে ও তাঁর দলকে নির্বাচনী ময়দানে কতটা এগিয়ে দিয়েছিল, তা বুঝে উঠতে বিরোধী দলনেতাদের অনেক সময় লেগেছিল, তত দিনে তাঁরা বেবাক হেরে গেছেন। কিন্তু পাঁচ বছর অনেক সময়। পাঁচ বছর সময় পেয়েও বিরোধীরা সেই কৌশল শিখে নিয়ে গুরুমারা অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারলেন না কেন? এ-বারের নির্বাচনী প্রচারপর্বেও সমাজমাধ্যমে আধিপত্যের মাপকাঠিতে বিজেপি শুধু এগিয়েই থাকল না, অন্যদের বহু যোজন পিছনে ফেলে রাখল। এবং, অবশ্যই, নির্বাচনী ফলাফলে সেই দাপট আঠারো আনা প্রতিফলিত হল। এমন নয় যে, বিরোধীরা কেউ শাসকদলের কৌশলটা শিখে নেওয়ার চেষ্টা করেনি। রাহুল গাঁধীর কংগ্রেস সমাজমাধ্যমকে নিজেদের প্রচারের কাজে ব্যবহার করার জন্য নানা ভাবে উদ্যোগী হয়েছে, পাশাপাশি বিজেপি ও তার দোসরদের অপপ্রচার এবং মিথ্যা প্রচারের স্বরূপ উন্মোচনের জন্যও সমাজমাধ্যমকে নানা ভাবে ব্যবহার করেছে। একটা সময় টুইটারে কংগ্রেস সভাপতির অনুসরণকারীর সংখ্যা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিয়েছে, বিশেষত দ্বিতীয় জনের অনুসরণকারীদের মধ্যে একটা বড় অংশ কার্যত 'ভুয়ো' প্রমাণিত হওয়ার পরে। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে, সমাজমাধ্যমের লড়াইটা এ-বার একতরফা ছিল না। অথচ ভোটদাতাদের রায় প্রকাশিত হলে দেখা গেল, জয়ী এক জনই, তাঁর নাম নরেন্দ্র মোদী। এই জয়কে অবশ্যই 'সমাজমাধ্যমের অবদান' বলা যাবে না। আর, তার বিস্তর কারণ আছে, কিন্তু সে আলোচনার জায়গা এটা নয়। তবে এই ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজমাধ্যমের সাম্প্রতিক বিবর্তনকে বিচার করলে এই মাধ্যমের চরিত্র কী ভাবে পালটাচ্ছে সে বিষয়ে কিছু ধারণা মিলতে পারে এবং সেই সূত্রেই সমাজের স্বভাবচরিত্র পরিবর্তনের ধাঁচটাও আর-একটু ভাল ভাবে বোঝা যেতে পারে।

নির্বাচনের পূর্ববর্তী বছরখানেকের সময়পর্বটির কথা ভাবলে বোঝা যাবে, ভারতীয় রাজনীতির পরিসরে দু'ধরনের সমস্যা বিভিন্ন উপলক্ষে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। এক দিকে ছিল কৃষি সংকট, বেকার সমস্যা, আর্থিক উন্নয়নের শ্লথগতি ইত্যাদি প্রশ্ন, অন্য দিকে ছিল ধর্ম ও সম্প্রদায়ভিত্তিক অশান্তি, অতিজাতীয়তা, নিরাপত্তার মতো বিষয়। এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দু'ধরনের প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা চরিত্রগত ফারাক আছে। প্রথম গোত্রের বিষয়গুলি নিয়ে আবেগ-উত্তেজনা সৃষ্টি করা কঠিন, দ্বিতীয় বর্গের সমস্যাকে কেন্দ্র করে তেমন আবেগ বা উত্তেজনার উচ্চফলনশীল চাষ হতে পারে এবং বিশেষ করে ভারতে, হয়েই থাকে। এই তফাতটা চিরকালই আছে। কিন্তু সমাজমাধ্যমের দুনিয়ায় তাতে একটা বাড়তি মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট। সমাজমাধ্যমের পরিসরে কোনও একটি বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে, বিভিন্ন মতামতের আদানপ্রদান ও তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে, নানাবিধ

স্বার্থের সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটা মীমাংসায়, বা অন্তত একটা যুক্তিসংগত অবস্থানে পৌঁছনো অথবা সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করা কঠিন, কার্যত অসম্ভব।

বস্তুত, এই পরিসরটিতে সেই ধরনের বিষয়ই জনপ্রিয় এবং বহু-আলোচিত হয়, যা নিয়ে নিরুত্তাপ যুক্তির বদলে উত্তপ্ত আবেগে উৎসাহিত হওয়ার সুযোগ বেশি। কারণ, তা বহু মানুষকে সহজে উত্তেজিত করতে পারে, অনেকের চট করে অনেক কিছু বলার সুযোগ থাকে এবং কথা কাটাকাটির একটা জোরদার পরিবেশ তৈরি হয়— সবচেয়ে বড় কথা, যে প্রশ্নে দুটো দল তৈরি হয়ে যায়, যাদের মতামত পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত। সামগ্রিক ভাবে মতামত যে বিপরীত হতে হবে তার কোনও প্রয়োজন নেই, কিন্তু কোনও একটি মূল প্রশ্নে, বা যাকে মূল প্রশ্ন বলে মনে করা হচ্ছে সে বিষয়ে মত উলটো হলেই চলবে। সেই প্রশ্নটি জাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার মতো কোনও ধারণাও হতে পারে, নরেন্দ্র মোদীর মতো কোনও ব্যক্তি বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতো কোনও প্রতিষ্ঠানও হতে পারে, আবার এই দু'ধরনের বিষয়ের সমন্বয়ও হতে পারে। সাম্প্রতিক অতীতে এটাই ঘটেছে। অন্য সব রকমের প্রশ্ন এবং আলোচনাকে অনায়াসে পিছনে ফেলে, আড়ালে রেখে সামনে চলে এসেছে জাতীয় নিরাপত্তা এবং 'সাংস্কৃতিক সংহতি'র প্রশ্ন, যে প্রশ্নে সঙ্ঘ পরিবারের মতের সঙ্গে বিরোধীদের মতের ফারাক বিপুল ও অসেতুসম্ভব। কিন্তু প্রশ্নটা বিরোধীরা তোলেননি, তুলেছেন শাসকরা। তর্ক আবর্তিত হয়েছে তাঁদের ধারণা, বিশ্বাস ও কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ, তর্কের ফল যা-ই হোক না কেন, তর্কের বিষয় নির্ধারণ করেছেন নরেন্দ্র মোদীরা। ভোটের ফলে সেই আধিপত্যের প্রতিফলন ঘটেছে। কে কেমন খেলেছেন, সেটা দ্বিতীয় প্রশ্ন। প্রথম (এবং প্রধান) প্রশ্ন ছিল, খেলাটা কে ঠিক করে দিয়েছে? উত্তর একটাই। নির্বাচনের ফল সেই উত্তরই দিয়েছে।

এই নির্বাচনী ফলাফলের পিছনে সমাজমাধ্যমের ভূমিকা কতখানি, সে প্রশ্ন এখানে আলোচ্য নয়। নির্বাচনী প্রচার এবং ফলাফলের প্রেক্ষাপটে সমাজমাধ্যমের পরিসরে সমাজের যে ছবিটা ফুটে উঠতে দেখলাম আমরা, সেটাই বিবেচনার বিষয়। সে ছবি সমাজের গণতান্ত্রিকতা সম্পর্কে ভরসা দেয় না। বরং গণতান্ত্রিকতার একটি মূল শর্তের প্রতি এক গভীর অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। ভিন্নমত সম্পর্কে, বিভিন্ন মত সম্পর্কে নাগরিকদের মনে শ্রদ্ধা এবং সেই শ্রদ্ধাজনিত অভিনিবেশ থাকবে, সেই যথার্থ বিচারশীল মন নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের অবস্থান নীতি খতিয়ে বিচার করবেন, সেই বিচারশীলতার ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক নির্বাচনে আপন পছন্দ স্থির করবেন, এমনটাই ধ্রুপদী গণতন্ত্র দাবি করে এসেছে, এই দাবি ছেড়ে দিলে সে ধর্মভ্রষ্ট হয়। এই কারণেই গণতন্ত্র স্বভাবত এবং অনিবার্য ভাবে উদার। আজ যাকে অনুদার গণতন্ত্র (ইললিবারাল ডেমোক্র্যাসি) বলা হচ্ছে, সে বস্তুটি সোনার পাথরবাটি ছাড়া কিছু নয়। সেই কারণেই বলেছি, সমাজমাধ্যমে যুক্তিসম্মত আলোচনার বদলে উত্তেজনাসর্বস্ব কথা-কাটাকাটির যে প্রবল প্রতাপ গোটা নির্বাচনী মরসুমে দেখা গেল, তা গণতন্ত্রের মূল ধর্মের পরিপন্থী। সমাজমাধ্যমে উন্মোচিত আমাদের এই নাগরিক সত্তা গণতান্ত্রিক নয়।

এবং এ কথা কেবল নির্বাচনী মরসুমেই সত্য, এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। সামগ্রিক ভাবে সমাজমাধ্যমে যে কথোপকথন চলে, তার অধিকাংশই যুক্তিনির্ভর বিচারের গণতান্ত্রিক ধারা থেকে বহুলাংশে বিচ্যুত। হয় সেখানে কোনও একটি অবস্থান বা মতের পক্ষে বহু জন আপন 'ভাল লাগা' অর্থাৎ সমর্থন জানাতে ব্যস্ত হন, অথবা তার বিপক্ষে তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে ব্যগ্র। এই পরিস্থিতি বা পরিণতির দায় সমাজমাধ্যমের হতে পারে না, সে মাধ্যম মাত্র। সমাজ এমন আচরণ করছে, কারণ সমাজ এ-রকম। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, সমাজমাধ্যমের ভুবনে যথেচ্ছ বিচরণের অবকাশ সমাজের এই আচরণকে এ ভাবে ফেটে পড়ার বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে। প্রযুক্তি সমাজের স্বভাবচরিত্র ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে না, কিন্তু সমাজ কী ভাবে ভাববে এবং কী ভাবে চলবে, সেটা প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে ঠিক হয় না। সমাজমাধ্যমের প্রযুক্তি সমাজকে 'নিজের মাধ্যম' হয়ে ওঠার যে সুযোগ দিয়েছে, সমাজ তাকে ব্যবহার করেছে নিজেকে বিভিন্ন প্রশ্নে দুই যুযুধান শিবিরে ভাগ করে নিতে। বলা চলে, এমনই সমাজ আমরা তৈরি করেছি এবং লালন করে চলেছি, যাকে ওপর থেকে বা বাইরে থেকে ভাগ করার দরকার হয় না, সে নিজেই নিজেকে আড়াআড়ি ভাগ করে নিতে তৎপর।

তর্ক উঠবে, সমাজমাধ্যম সত্যিই কতখানি সমাজের সদস্যদের 'নিজের মাধ্যম'? এই পরিসরে নাগরিকরা কতটা অবাধ, কতটা স্বাধীন? প্রশ্নটি দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কারণ রাজনৈতিক, দ্বিতীয় কারণ অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক কারণটি নিতান্ত সহজবোধ্য। যে বিভাজনের কথা বলেছি, তার পিছনে রাজনীতির কারবারিদের ভূমিকা বিপুল। বিশেষ করে বিভাজনের রাজনীতি যাঁদের কারবারের প্রধান মূলধন, তাঁদের। সমাজমাধ্যমের নানান তরজা খতিয়ে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, আমাদের ভাগ-করার রাজনীতি এখানেও আমাদের ক্রমাগত ভাগ করছে, অনেক সময়েই আমরা পুতুলনাচের সত্যটাকে না জেনে বা খেয়াল না করে পুতুলনাচের কুশীলব হয়ে পড়ছি। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বিলক্ষণ জানি, প্রায় যে-কোনও বিষয়ে ভিন্নমতের আদানপ্রদানকে দলীয় রাজনীতির বলয়ের বাইরে রাখা কতখানি কঠিন।

অর্থনীতির লীলা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মতর, সাদা চোখে ধরা না-ও পড়তে পারে। সেই লীলার পিছনে আছে সমাজমাধ্যমের বিরাট এবং নিরন্তর-স্ফীত-হয়ে-চলা বাণিজ্য। কেবল স্ফীত নয়, এই বাণিজ্যে উত্তরোত্তর সমস্ত প্রতিযোগিতার মুখে ছাই দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকটি সংস্থার একচেটিয়া আধিপত্য বেড়ে চলেছে। সেই আধিপত্যের লাগাম যাঁদের হাতে, তাঁরা অভিসন্ধি করে মানুষকে যুক্তিহীন কলহের মানসিকতায় দীক্ষিত করে তুলছেন, এমন নয়। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সমাজমাধ্যমের সাহায্যে মানুষে মানুষে সংযোগের প্রকরণগুলিকে তাঁরা যে ভাবে নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করছেন, তার ফলে সংযোগ ব্যাপারটার নাড়িনক্ষত্রই বহুলাংশে বদলে গেছে। কে কী বলছে, কে কোন কথা বা ছবি অন্যদের সঙ্গে ভাগ করছে, কে কার বার্তায় কেন সমর্থন বা প্রশংসা জ্ঞাপন করছে, এ-সবের বিচার সেই বাণিজ্যের কাছে গৌণ, বস্তুত অপ্রাসঙ্গিক। বার্তা দেওয়া হচ্ছে, মন্তব্য করা হচ্ছে, এটাই যথেষ্ট। তার কারণ, সমাজমাধ্যমের নিয়ন্ত্রক ব্যবসায়ীর কাছে ওই বার্তার প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ কোনও মূল্য নেই, কত লোক ওই বার্তার মাধ্যমে ভুবনজালে ধরা দিলেন, তাঁদের রুচি, পছন্দ এবং সর্বোপরি ক্রয়ক্ষমতা কতখানি, সেটাই একমাত্র বিচার্য। হ্যাঁ, কে কোন বার্তা দিচ্ছেন বা কোন বার্তায় সমর্থন (অথবা প্রতিবাদ) জানাচ্ছেন, তা থেকে যদি তাঁর ব্যবসায়িক মূল্য বা সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনও ধারণা পাওয়া যায়, তা হলে নিশ্চয়ই কারবারি তাতে বিলক্ষণ আগ্রহী হবেন, কিন্তু ওই পর্যন্তই। আদ্যন্ত মুনাফার তাগিদে চালিত এই সমাজমাধ্যমের দুনিয়ায় যুক্তি বা বিচারের মূল্য থাকবে না, সেটা অপ্রত্যাশিত নয়। এবং, যুক্তি বা বিচার যদি মূল্যহীন হয়, তবে যা পড়ে থাকে, তার নাম দলাদলি। আর সেই কারণেই সমাজমাধ্যমের অর্থনৈতিক ভিতটির সঙ্গে আমাদের দলীয় রাজনীতির ইমারতটি চমৎকার মানানসই। সমাজ তথা নাগরিকরা এই দ্বৈত পরিচালকের

নির্দেশনায় পরস্পরকে বলছেন: আগে বলো তুমি কোন দলে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই অনন্ত বিভাজন থেকে আমাদের মুক্তি আছে কি না। এ প্রশ্নের কোনও হাতে-গরম উত্তর নেই, থাকার কারণও নেই। তবে একটা কথা খুব সহজেই বোঝা যায়। সমাজমাধ্যমের নিজস্ব প্রযুক্তি ও পদ্ধতিতেই উত্তরণের সুযোগ রয়েছে। আমরা সেই সুযোগ নেব কি না, সেটা আমাদেরই ঠিক করতে হবে। আমরা বলতে, আক্ষরিক অর্থেই আমি, আপনি, আমরা সবাই। যারাই ওই একচেটিয়া অর্থনীতির নায়ক আর বিভাজনের রাজনীতির কারবারিদের অঙ্গুলিহেলনে চলতে রাজি নই, তাদের সকলেরই দায়িত্ব স্বক্ষম হওয়া। সেই স্বক্ষমতা নিজের কথা নিজে ভাবার এবং বলার। যে ভাবনার ভিত্তিতে কোনও দলতন্ত্রের মন্ত্র থাকবে না, থাকবে যুক্তিসম্মত বিচার এবং বাস্তবসম্মত বিবেচনার সামর্থ্য। সেই সামর্থ্য আমাদের প্রত্যেকেরই আছে, কিন্তু থাকাটা যথেষ্ট নয়, তাকে জাগ্রত এবং সচেতন ভাবে ব্যবহার করা জরুরি। প্রযুক্তি আমাদের নিজের মাধ্যম হয়ে ওঠার ক্ষমতা দিয়েছে। সেই ক্ষমতা বিচ্ছিন্ন ভাবে, একক গরিমায় প্রয়োগ করার নয়, সামাজিকতার পরিসরেই তার প্রয়োগ সার্থক হতে পারে। সেটাই গণতন্ত্রের কাঠামোয় সমাজিকতার স্বধর্ম।

শেষ করার আগে একটা কথা বলা দরকার। এই গণতান্ত্রিক সামাজিকতায় সর্বসম্মতির কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, বরং ভিন্নমতের আদানপ্রদান এবং তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়েই তাকে অর্জন করা সম্ভব। হয়তো তার জন্য সমাজমাধ্যমের ভুবনে অন্য ধরনের কোনও বিকল্প পরিসর তৈরি করে নিতে হবে আমাদের। তেমন বিকল্প ইতিমধ্যেই নানা ভাবে তৈরি হচ্ছেও— নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, নির্দিষ্ট মানসিকতার ভিত্তিতে তৈরি নানা 'ভার্চুয়াল' গোষ্ঠী নিজেদের মতো করে একটা সামাজিকতা গড়ে তুলছে, এমন নিদর্শন বিস্তর। সংখ্যা বা পরিমাণের বিচারে নিদর্শনগুলি যৎসামান্য, ব্যতিক্রমী। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে নতুন পথ খোঁজার কাজটা কবেই বা সংখ্যার জোরে হয়েছে?

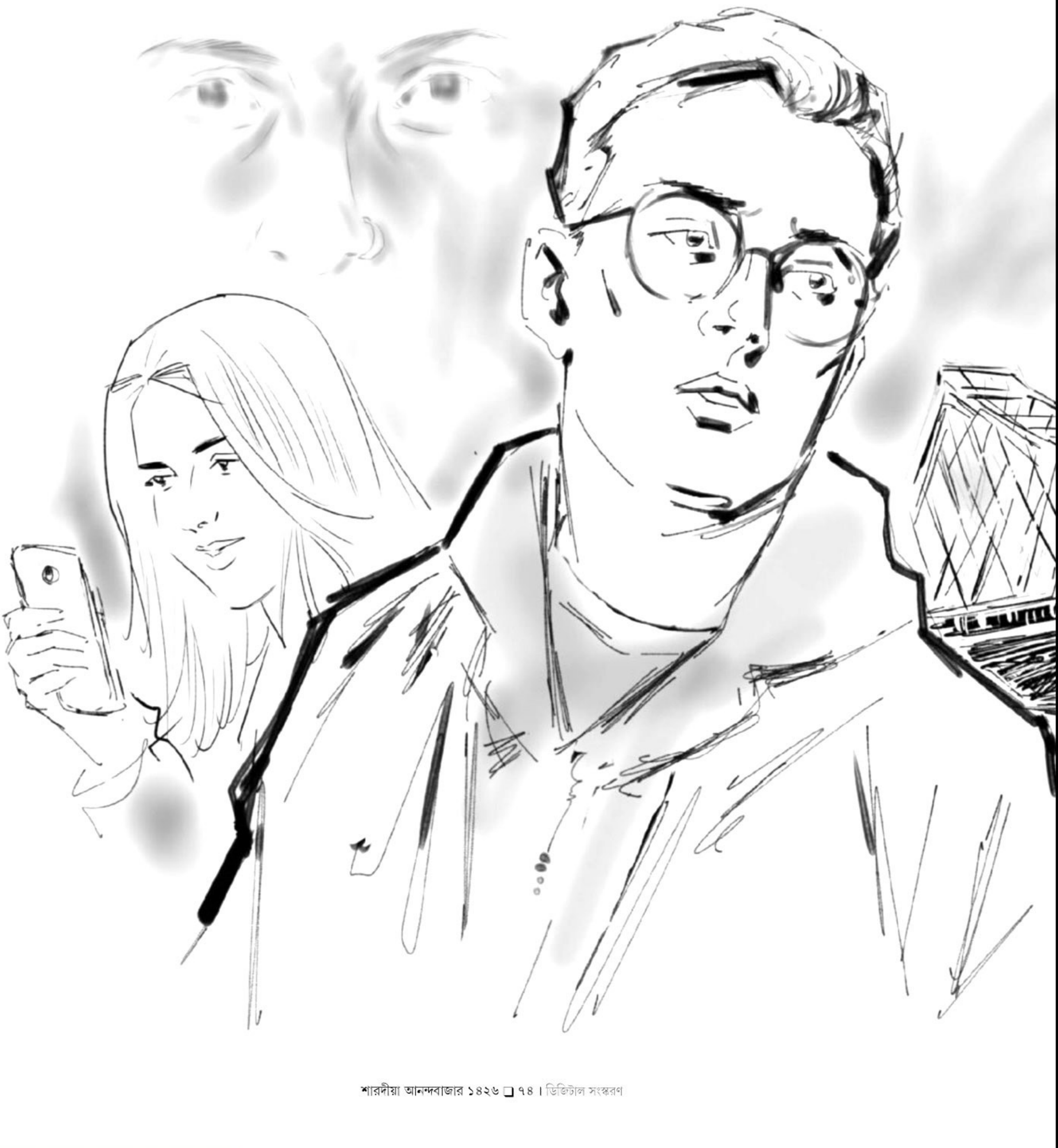
শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী

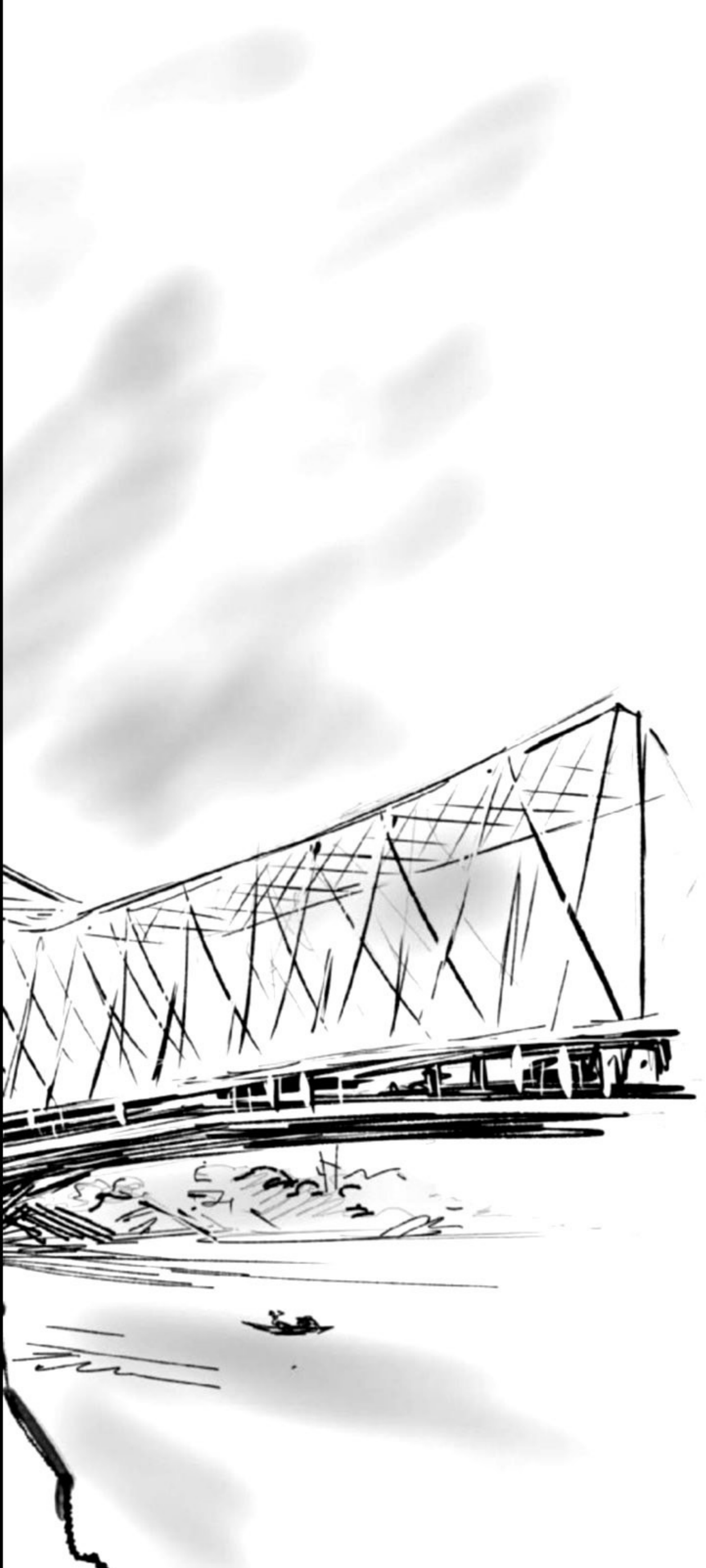


হুগলির কুলিয়াড়া গ্রামের রায় পরিবারের পটদুর্গা শিল্পী: স্বপন রাম সৌজন্য: দীপঙ্কর ঘোষ

ফুলমতী

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়





“তারপর?”

“তারপর সেই দৈত্যটা একটা বড় লাঠি দিয়ে বাগানের সব গাছগুলো ভাঙতে-ভাঙতে বড়-বড় লাল চোখ করে আমাদের বাড়ির দিকে এগোতে থাকল। এগোতেই থাকল।”

ছোট্ট আবেল ভয় পেয়ে চোখটা কুঁচকে বন্ধ করে বলল, “তারপর?”

“দৈত্যটার এক হাতে ইয়া বড় একটা লাঠি আর অন্য হাতে একটা খাঁচা। আমার সোনাকে ধরে সেই খাঁচায় পুরে নিয়ে যাবে।”

আবেল ঠাকুরমার বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে, বন্ধ চোখের পাতা দুটো আরও চিপে রুদ্ধশ্বাসে বলল, “তারপর?”

“তারপর যেই না লাঠি দিয়ে বাড়ির দরজাটা ভেঙেছে দৈত্য, দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফুলমতীমাঈ।”

আবেলের একটা স্বস্তির শ্বাস পড়ল। ঠাকুরমার বুকের থেকে মুখটা বের করে চোখ খুলে বলল, “ফুলমতীমাঈ কোথা থেকে এল?”

“অনেক দূরের একটা দেশ থেকে। সেই দেশে একটা নদী আছে, তার নাম গঙ্গা।”

“ম্যাজিক গঙ্গা?”

“হ্যাঁ, ম্যাজিক গঙ্গা।”

“গঙ্গা নদী দিয়ে নৌকায় চেপে এল ফুলমতীমাঈ?”

“না সোনা। গঙ্গা নদী একটা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। ফুলমতীমাঈ একটা জাহাজে চেপে সেই সমুদ্রে গিয়ে তারপর আরও অনেকগুলো সমুদ্র পেরিয়ে দুষ্টু দৈত্যটাকে জব্দ করতে এসেছিল।”

“তারপর? ফুলমতীমাঈ কী করল দৈত্যকে?”

“ফুলমতীমাঈ চোখ পাকিয়ে বলল, ‘কাওত বা...’”

“কাওত বা মানে?”

“মানে... মানে... কি রে! ফুলমতীমাঈ বলল, ‘কি রে! তোর এত বড় সাহস? তুই এসেছিস আমার সোনা ছেলেকে খাঁচায় ভরে ধরে নিয়ে যেতে? ফুলমতীমাঈ নাম হায় হামার...’”

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে প্রথম কিস্তি

প্রিয়তমা,

বিশ্বাস করো আমার জীবনে তিনটে মাত্র স্বপ্ন! প্রথম স্বপ্নটা ছিল, ছোটবেলায় ঠাকুরমার মুখে ফুলমতীমাঈ-এর যে রূপকথার গল্পগুলো শুনে ঘুমোতো যেতাম, ফুলমতীমাঈ-এর সেই দেশটাকে একবার নিজের চোখে দেখা। দ্বিতীয় স্বপ্ন, একদিন টেসেল আইল্যান্ডে সমুদ্রের ধারে একটা নিভৃত জায়গায় তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে ফুলমতীমাঈ-এর রূপকথা আর না রূপকথার যে গল্পগুলো বুকে বয়ে বেড়াচ্ছি, সেগুলো তোমাকে শোনানো। সেই গল্পগুলোর পরতে-পরতে জড়িয়ে রয়েছে ভারতবর্ষ আর আমাদের ছয়পুরুষ আগের একটা জটিল অগ্রন্থিত ইতিহাস। আর তৃতীয় স্বপ্ন... থাক, আগে প্রথম দুটো স্বপ্নের কথা বলি।

আমার প্রথম স্বপ্নটা পূর্ণ হয়েছে। ফুলমতীমাঈ-এর দেশ দেখে আজ ফিরে যাচ্ছি। আর তাতেই আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে নতুন আরেকটা গল্প। মুশকিল হচ্ছে আলাদা-আলাদা গল্পের সুতোগুলো মূল

গল্পের জট থেকে ছাড়িয়ে নিতে না পারলে তোমাকে আমি কিছুতেই সব গুছিয়ে বলতে পারব না। তখন থেকে ভেবে চলেছি টেসেল আইল্যান্ডে তোমাকে নিয়ে গিয়ে কীভাবে ফুলমতীমাঈ-এর পুরো গল্পটা গুছিয়ে শোনাব।

আজ ফুলমতীমাঈয়ের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার ঠিক আগে ঈশ্বর বোধহয় সেই সমাধানটা আমার মাথায় দিয়ে দিলেন। কলকাতা এয়ারপোর্টে পৌঁছে আমার রুকস্যাক আর গিটারের বাক্স কেবিন লাগেজে দিয়ে সিকিওরিটি চেক-ইন করে সবে গেটের দিকে এগোচ্ছি, এমন সময় ডিসপ্লে বোর্ডে দেখলাম আমার দিল্লি যাওয়ার ফ্লাইট দু'ঘন্টা পিছিয়ে গিয়েছে। খবর নিয়ে জানলাম, দিল্লিতে ঘন কুয়াশার জন্য নাকি সকাল থেকে ফ্লাইট শেডিউল সব ঘেঁটে রয়েছে। ভারতীয় সময়ে এখন সন্ধে সাত'টা দশ। অতএব আগামী দু'ঘন্টা আমাকে এখানেই বসে কাটাতে হবে।

আমার সঙ্গে কোনও হ্যান্ড লাগেজ নেই। এমনকী, আমার ওয়ালেটে সেরকম পয়সাও নেই যে সময় কাটানোর জন্য একটা বই বা পত্রিকা কিনব। পত্রিকা তো দূরের কথা আমার ওয়ালেটে সেইটুকু পয়সাও নেই যে, এয়ারপোর্টের কফি শপগুলো থেকে এক কাপ ক্যাপুচিনো কিনে খেতে পারি। আমি বেহিসেবি নই। না, না, ভেবো না ভারতবর্ষে এসে আমার টাকাকড়ি সব ছিনতাই হয়ে গিয়েছে। আসলে ফুলমতীমাঈ ধার জিনিসটা সবচেয়ে অপছন্দ করতেন বলে ঠাকুমা এমন একটা নীতি আমার মনের মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন যে, আমার কাছে কোনদিন কোনও ক্রেডিট কার্ড থাকে না। চিন্তা করো না, কাল ভোরের ফ্লাইটে দিল্লি থেকে আমস্টারডম ফিরে যাওয়ার টিকিট আর পাসপোর্টটা আমার জ্যাকেটের পকেটে ঠিকঠাকই আছে।

যাইহোক, এই পরিস্থিতিতে দেখলাম আমার পকেট পাউচে ট্যাবটা রয়েছে। যেখানে বসে আছি, সেটা ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন। ঘন্টা দু'য়েক সময় ইউ-টিউবে একটা সিনেমা দেখেও কাটিয়ে ফেলতে পারতাম। কিন্তু ফুলমতীমাঈয়ের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগের কিছু মুহূর্ত ঠিক সিনেমা দেখে কাটাতে ইচ্ছে করছিল না। বারবার মনে হচ্ছিল, এই ক'দিনের তোলা ছবিগুলো দেখি। ওখান থেকে বেছে রাখি কোন-কোন ছবি আলাদা করে তোমাকে দেখিয়ে ফুলমতীমাঈ আর তার দেশের গল্প শোনাব।

তখনই মনে হল টেসেল আইল্যান্ডে তোমাকে সব গুছিয়ে বলতে গেলে তার সূত্রগুলো একটা-একটা করে ছোট-ছোট কিস্তিতে ট্যাবে লিখে রাখি। এই সূত্র ধরেই তোমাকে ফুলমতীমাঈয়ের পুরো গল্পটা গুছিয়ে বলব, ছবি আর ভিডিয়ো দেখাব।

তাই গোড়া থেকেই, অর্থাৎ প্রথম সূত্রর ভূমিকা থেকে শুরু করি। ফুলমতীমাঈয়ের দেশে আসার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছিল তিন মাস আগে যেদিন, কলকাতার এক কলেজের সঙ্গে আমাদের কলেজের মিউচুয়াল স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে আমার যাওয়ার মনোনয়নের খবরটা পেয়েছিলাম। সেদিনই মনে-মনে ঠিক করে কলকাতা কলেজের চার দিনের শিডিউল প্রোগ্রামের পরে, বাড়তি তিন রাত্রি থেকে যাওয়ার ইচ্ছেটা আমাদের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর প্রফেসর মেয়ারকে বলেছিলাম। প্রফেসর মেয়ার কড়া ধাতের মহিলা। ওঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে আমিও খুব একটা গুছিয়ে বলতে পারিনি। তবে উনি কিছু একটা বুঝেছিলেন। আমাকে সংক্ষেপে কারণ জানিয়ে লিখিত আবেদন করতে বলেছিলেন। শেষপর্যন্ত উনি রাজি হবেন কিনা আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

তবে সংক্ষিপ্ত কারণ লেখার আগে নিজের মতো করে কারণটা লম্বা করেই লিখেছিলাম। আড়াই পাতা। তারপর সেটা কেটে ছোট করতে-করতে দুটো মাত্র অনুচ্ছেদে নামিয়ে এনেছিলাম। তার নির্যাসটা বেশ জটিল। ছোটবেলা থেকে ঠাকুরমার মুখে ফুলমতীমাঈর রূপকথার যে গল্পগুলো শুনেছি, বড় হয়ে ফুলমতীমাঈর আসল যে, না রূপকথার রিয়্যালিটির জীবন জানতে পেরেছি। জেনেছি, আমাদের পারিবারিক জটিল ইতিহাসের রিয়্যালিটি আর ভারতবর্ষ, সব মিলিয়ে আমি চোখের সামনে অগমেন্টেড রিয়্যালিটির যে ছবিটা দেখতে পাই, সেটা নিয়ে ভবিষ্যতে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করা, তার জন্য ঘুরে-ঘুরে কিছু ছবি তোলা, মানুষজনকে চেনা, এগুলোই ছিল লেখায়।

আই.টি আমার সাবজেক্ট হলেও, ভেবেছিলাম ওই অগমেন্টেড রিয়্যালিটির কথা বলে কিছু হবে না। প্রফেসর মেয়ার তো সাহিত্যের অধ্যাপিকা। অথচ আশ্চর্যজনক ভাবে প্রফেসর মেয়ার আমার আবেদনপত্রটা পড়ে, রিডিং গ্লাসের ওপর দিয়ে আমার মুখের দিকে একবার গম্ভীর মুখে তাকিয়ে, তিন রাত্রি কেটে, দু'রাত্রি লিখে খসখস করে সই করে মঞ্জুর করে দিয়েছিলেন আমার প্রার্থনা। প্যাসেজ মানির ব্যবস্থা হয়ে গেল। আমার রিটার্ন টিকিট দু'দিন পরে কাটা হলো। এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের পর সবাই যখন ফিরে গেল, টুকটাক কাজ আর স্কলারশিপের জমানো সামান্য টাকাকে সম্বল করে আমি একাই রয়ে গেলাম ফুলমতীমাঈর দেশে।

এর মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র রয়ে গেল ঐশী চট্টোপাধ্যায় নামের একটি মেয়ে। কলেজের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে আলাপ হয়েছিল ওর সঙ্গে। মেয়েটি প্রবল উৎসাহী, প্রাণবন্ত। সবসময় ছটফট করছে। এদেশে আসার আগে অবশ্য বাড়তি দু'দিন কেমন করে কাটাব তা ইন্টারনেট থেকে পড়ে খুঁজে পেতে নিজের মতো একটা ছক করে নিয়ে এসেছিলাম। তার প্রথমেই ছিল আমার জমানো সামান্য পুঁজিতে দু'রাত্রি কাটাতে পারব, কলকাতায় সেরকম কয়েকটা হোটেলের নাম। সেই হোটেলগুলো কেমন জানার জন্যই ঐশী এবং আরও কয়েকজন সদ্য বন্ধুকে দেখিয়ে মতামত চেয়েছিলাম।

হোটেলগুলোর নাম আর এলাকা শুনে আমার ভারতীয় বন্ধুরা হইহই করে আপত্তি জানিয়েছিল। পরামর্শ দিচ্ছিল কোনও পাঁচতারা হোটেলে থাকতে। আমি যখন কিছুতেই ওদের আমার আর্থিক অবস্থাটা বুঝিয়ে উঠতে পারছিলাম না, ঐশী সোজা ফোন করেছিল ওর বাবাকে। ঠিক হয়েছিল ঐশীর বাবা খোঁজ নিয়ে পৌঁছে দেবেন ঠিকঠাক হোটেলে। ঐশী আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ওদের বাড়ি।

তোমাকে যে গল্পটা বলব, তার প্রথম সূত্র এখান থেকেই শুরু করা যাক।

॥ ১ ॥

"মাম্মা, দরজাটা খোলো... শিগগিরি..."

মেয়ের আচমকা ফোন পেয়ে ঘাবড়ে গেলেন মহাশ্বেতা।

"কোথায় তুই? কী হয়েছে?"

"আঃ! বলছি। তুমি তাড়াতাড়ি দরজাটা খোলো না...," ফোনটা কেটে দিল ঐশী।

মহাশ্বেতার বুকের মধ্যে ধুকপুকুনি বেড়ে গেল। কী হল মেয়েটার? এমনিতেই কলেজের একটা প্রোগ্রাম নিয়ে মেতে আছে ক'দিন। রাত্রি সাড়ে সাতটা, আটটার আগে বাড়ি ফিরছে না। এখন পৌনে ন'টা! মধ্যে দু'বার ফোন করেছেন মেয়েকে। কেটে দিয়েছে। আজকাল আবার নতুন কায়দা করেছে। ফোন কেটে দেওয়ার পর একটা এসএমএস... 'বিজ়ি। টক টু ইউ লেটার।'

গ্যাস বার্নারের ওপর থেকে ফ্রাইং প্যান নামিয়ে তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাটের সদর দরজাটা খুললেন মহাশ্বেতা। বাইরে কেউ নেই। তারপর দরজা খোলা রেখেই বারান্দায় এসে ঝুঁকে বাইরেটা দেখলেন। কোথাও মেয়েকে দেখতে পেলেন না। এরকম আচমকা টেনশনের সময়ে প্রথমেই কৌস্তভকে ফোন করে দেন। সেটা করতে গিয়েই দরজার কাছে মেয়ের গলা পেলেন, "মাম্মা... মাম্মা... এদিকে এসো..."

দ্রুত পায়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে এসে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন মহাশ্বেতা। ঐশী বেশ উত্তেজিত। আর ঠিক ওর পিছনে একটু ইতস্তত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছেলে। বিস্মিত হওয়ার এখানেই শেষ নয়। ছেলেটা পাক্কা সোনালী চুলের সাহেব। চোখে একটা হ্যারি পটার মার্কা গোল-গোল চশমা। পিঠে একটা বিশাল রুকস্যাক আর গিটারের বাক্স। এত রাত্রে এই ছেলেটাকে ঐশী

কোথা থেকে এনে হাজির করল?

"মাম্মা ও হচ্ছে আবেল। তোমাকে ওর কথা বলেছিলাম না?"

ঐশীর স্বভাবই হচ্ছে অনর্গল রেডিয়ো জকিদের মতো কথা বলে যাওয়া। ওদের কলেজের সঙ্গে হল্যান্ডের একটা কলেজের স্টুডেন্টস এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম চলছে। ওখানকার কয়েকজন ছেলেমেয়ে এসেছে। পড়াশোনা শিকেয় তুলে ক'দিন ধরে সেই নিয়েই মাতামাতি চলছে। বাড়িতে যতক্ষণ থাকছে মেয়েটা ওদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বকবক করে যাচ্ছে। কীসব নাম সাহেব ছেলেমেয়েগুলোর! অত মনে রাখা যায় নাকি? কিন্তু যতটুকু মেয়ের মুখে জেনেছিলেন, সেইমতো আজকেই ছিল প্রোগ্রামের শেষদিন। যতদূর জানতেন, আজকের রাতের ফ্লাইটেই ওদেশ থেকে আসা ছেলেমেয়েগুলোর আমস্টারডম ফিরে যাওয়ার কথা। এই ছেলেটা ফ্লাইট মিস করল নাকি?

মহাশ্বেতা সন্দিগ্ধ চোখে আবেলের দিকে তাকালেন। ইতস্তত ভাব কাটিয়ে আবেল দু'হাত জড়ো করে মাথা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে সাহেবি উচ্চারণে বলল, 'নমস্কার মাঈজি।'

একটু আগের টেনশন কখন যেন মিলিয়ে গিয়েছে। 'মাঈজি' শব্দটা শুনে রাগে মাথাটা 'দপ' করে জ্বলে উঠল মহাশ্বেতার। আর কোনও সন্দেহ রইল না, ছেলেটা নির্ঘাত ফ্লাইট মিস করেছে আর যেচে পড়ে এই আপদকে নাচতে-নাচতে বাড়িতে নিয়ে এসেছে ঐশী। এখন এই আপদকে বাড়ি থেকে দূর করে আজ ঐশীর একদিন কি নিজের একদিন করবে মহাশ্বেতা।

'সিট আবেল সিট। ফিল কমফর্টবল।' ঐশী ছেলেটাকে আপ্যায়ন করে বসাতে দেখে মহাশ্বেতার রাগ আরও বাড়তে থাকল। গুম হয়ে ভিতরের ঘরে ঢুকে মহাশ্বেতা গম্ভীর গলায় ডাকলেন, "ঐশী, আগে এদিকে শুনে যা।"

"অ্যাকচুয়ালি সি ইজ় ভেরি নাইস। বাট সি টেকস আ লিটল বিট টাইম..." অস্বস্তিকর অবস্থা কাটাতে ঐশী আবেলকে ইংরেজিতে বোঝাতে থাকল, "আসলে মা'কে বলিনি তো, তুমি আসছ। মা বেশ অবাক হয়ে গিয়েছে। মা কিন্তু ভীষণ অতিথিপরায়ণ। তুমি একটু পরেই বুঝতে পারবে। বসো। আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।"

ভিতরের ঘরে ঢুকেই ঐশী দেখল, মা থমথমে মুখে একরাশ প্রশ্ন মাখিয়ে রেখে রাগে ফেটে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে। মা শুরু করার আগে নিজেই বলতে শুরু করে দিল। চাপা গলায় বলতে থাকল, "হোয়াট ইজ় দিস মাম্মি? ও তোমাকে 'নমস্কার মাঈজি' বলল, আর তুমি নমস্কার করা দূরে থাক, ছেলেটাকে বসতে পর্যন্ত বললে না। ইন্ডিয়ান কালচার সম্পর্কে কী ভাববে বলতো?"

মহাশ্বেতার গলা কিন্তু নিচুতে থাকল না, "নিকুচি করেছে ইন্ডিয়ান কালচার। কেন নিয়ে এসেছিস ছেলেটাকে?"

"বলছি বাবা, উফ! বলার কোনও স্কোপই তো দিচ্ছ না। ও ক'দিন কলকাতায় থাকার জন্য রয়ে গিয়েছে।"

"মানে?", মহাশ্বেতা রীতিমত আঁতকে উঠলেন, "ওকে আমাদের বাড়িতে থাকতে নিয়ে এসেছিস নাকি?"

"আঃ মাম্মি! আওয়াজ নীচে। শুনতে পাবে।"

"নিকুচি করেছে 'আওয়াজ নিচে'। এখনই বিদেয় কর ছেলেটাকে। এখন মানে এই মুহূর্তে।"

ঐশী বিরক্ত গলায় চোখমুখ কুঁচকে বলতে শুরু করল, "আরে বাবা দাঁড়াও না। না চেঁচিয়ে সবটা শোনও আগে। কুল। কে বলল তোমাকে যে ওকে আমাদের বাড়িতে রাখতে নিয়ে এসেছি? অ্যাকচুয়ালি একজন গেস্টকে এই অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে এলে তাকে বাড়িতে থাকার অফার দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি তো তোমাকে জানি। তুমি কিছুতেই সেটা হতে দেবে না। শোনও, ছেলেটা ইন্টারনেট দেখে কয়েকটা হোটেল বেছে রেখেছে। অনলাইনে হোটেলগুলোর মিক্সড রিভিউ আছে। তাই কোনটা ভাল হবে জানতে চাইছিল। আমি ড্যাডিকে বলেছি হেল্প করে দিতে, সিম্পল। ড্যাডি এখনই এসে পড়বে। অ্যাট লিস্ট ড্যাডি যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ ওর সঙ্গে তো একটু কর্ডিয়াল বিহেভ করতে পার উইথ আ সুইট স্মাইল অন ইয়োর ফেস।"

মহাশ্বেতার কপালে ভাঁজ পড়ল। কৌস্তভ পর্যন্ত জানে যে ঐশী ছেলেটাকে বাড়িতে নিয়ে আসছে? সেটা ফোন করে একবার জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি পর্যন্ত? মেয়ের ওপর থেকে যাবতীয় রাগ এবার বরের দিকে ঘুরে গেল। খাটের ওপর ধপ করে বসে মহাশ্বেতা বললেন, "তুই আর তোর বাপ মিলে যা খুশি কর। আমি এর মধ্যে নেই। আর বসার ঘরেও আমাকে একেবারে ডাকবি না।"

ঐশী বসার ঘরে ফিরে এল। আবেল শান্ত হয়ে বসে আছে। আবেল যে কতটা ভদ্র ছেলে সেটা মাকে বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। আবেলের সোফার উল্টোদিকের সোফায় ধপ করে বসে বলল, "ড্যাডি ইজ় অন হিজ় ওয়ে। ডু ইউ লাইক টু হ্যাভ সাম ওয়াটার অর কোল্ড ড্রিংক?"

"নো। থ্যাংকস," আবেল ইংরেজিতে বলতে থাকল, "আমি বোধহয় তোমাদের একটু অসুবিধেয় ফেলে দিলাম। আসলে তোমার বাবার সঙ্গে ফোনেও কথা বলে নিতে পারতাম।"

"না, না। কোনও অসুবিধে নয়। ড্যাডি এখনই আসছে," মনে-মনে মায়ের ওপর খুব রাগ হল ঐশীর। ছেলেটা বাংলা না বুঝতে পারে, তা বলে পাশের ঘর থেকে কেউ ওরকম চিৎকার করে? কোনটা সুমধুর অমৃত বচন আর কোনটা মুণ্ডুপাত করা সেটা বোঝার জন্য বাংলা ভাষাটা জানার প্রয়োজন হয় না।

মুখে হাসি ফুটিয়ে ঐশী বলল, "মা আসলে আমার ওপর এত রাগারাগি করছে কেন জানো? আমি মাকে কিছু না বলে তোমাকে নিয়ে এসেছি বলে। মায়ের কোনও প্রস্তুতি নেই। বাড়িতে এই সময় কেউ এলে মা রাতের খাবার না খাইয়ে ছাড়ে না। আর তুমি কী খাও, না খাও মা তো জানে না। তুমি বিদেশি। আমরা বাঙালিরা তেল ঝাল মশলা বেশিবেশি খাই..."

পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বভাবমতো অনর্গল কথা বলে যেতে থাকল ঐশী। আবেলের শান্ত মুখটা দেখে বুঝতে পারছে না, ছেলেটা সত্যিই কতটা বিশ্বাস করছে! এরমধ্যে বাড়ি ফিরে এলেন কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়। দরজা ঐশীই খুলল। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার হল না। কৌস্তভ একমুখ হেসে উষ্ণ গলায় বললেন, "হাই আবেল।"

আবেল উঠে দাঁড়াল। দু'হাত জড় করে মাথা অল্প ঝুঁকিয়ে বলল, "নমস্তে বাপুজি।"

সম্বোধন শুনে কৌস্তভের মুখ অল্প বিস্মিত হল। ঐশী ফিক করে হেসে বলল, "এইসব সৌমাল্য শিখিয়েছে ওকে। আঙ্কেল-আন্টির জায়গায় বাপুজি-মাঈজি বলা। কেন জানো তো? ও আমাদের প্রোগ্রামে গিটার বাজিয়ে ভোজপুরি গান শুনিয়েছে। ওই যে গো ওই গানটা, 'ক্যায়সে বনি, ক্যায়সে বনি, ফুলোরি বিনা চাটনি ক্যায়সে বনি।' সেই শুনে সৌমাল্য শিখিয়েছে। পাজির পা ঝাড়া ছেলে সব। কিন্তু ওর উচ্চারণটা কি মিষ্টি লাগছে, তাই না ড্যাডি? তোমাদের শোনাব বলে আমি আর শুধরে দিইনি। গানও শুনিয়ে দিতাম, কিন্তু... ওদিকে তিনি রেগেমেগে তেলে বেগুন হয়ে আছেন।"

কৌস্তভ আলগোছে ঐশীকে থামতে বলে সোফায় ছড়িয়ে বসে টাইয়ের নট'টা আলগা করতে-করতে বললেন, "তো আবেল, এই প্রথমবার কলকাতায় এলে?"

"হ্যাঁ বাপুজি। ভারতেই এই প্রথম এলাম। আমার এত ইচ্ছে ছিল কলকাতাকে দেখার। এই সুযোগটা যে হঠাৎ পেয়ে যাব ভাবিনি।"

কৌস্তভ কৌতূহলী গলায় জিগ্যেস করলেন, "কলকাতা! লন্ডন, প্যারিস, মস্কো, নিউ ইয়র্ক ছেড়ে কলকাতা কেন?"

"আসলে..."

আবেলের কথার ওপর ঐশী বলে উঠল, "ওর কলকাতা নিয়ে জানার আগ্রহর শেষ নেই। কিন্তু ভিক্টোরিয়া থেকে ইকো পার্ক যেখানেই সিটি ট্যুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদের, কিছু দেখেই ওর মন ভরেনি। কিন্তু প্রিন্সেপ ঘাটে গিয়ে তো পুরো পাগল। আমরা যখন হৈ-হৈ করে গ্রুফি তুলছি, ও হাঁ করে গঙ্গা দেখছিল।"

ঐশী থেমে গেল। মহাশ্বেতা কৌস্তভের গলা পাওয়ার পর ঘরের ভিতর আর চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। এবার একটা হেস্তনেস্ত দেখতে চান। কৌস্তভ মহাশ্বেতার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে 'এসো' বলতেই পিত্তি জ্বলে গেল। তবু নিজেকে বোঝালেন। বাপ-মেয়েকে ওই ছেলেটার সামনে বসে থাকতে দিলে সব হাতের বাইরে চলে যাবে। আবেলের দিকে একবারও না তাকিয়ে কৌস্তভের পাশে এসে বসে বললেন, "তোমাদের মতলবটা কী বলো তো?"

"চা করো একটু। বলছি তোমাকে।"

মহাশ্বেতা খর চোখে কৌস্তভের দিকে তাকিয়ে উঠে গেলেন। যেমন মেয়ে, তেমন বাপ! এক কাপ চা খাইয়ে যদি ছেলেটাকে বিদেয় করানো যায়, তাই সই। রাত্রি বাড়ছে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। মহাশ্বেতা উঠে যেতে কৌস্তভ আবার আবেলকে প্রশ্ন করলেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তোমার কলকাতা সম্পর্কে এই বয়সে আগ্রহ কিভাবে হল? 'ফুলোরি বিনা চাটনি' গানটা কোথায় শিখলে?"

একটু সোজা হয়ে বসে আবেল বলল, "আমরা ওলন্দাজ। আসলে বাপুজি, ছোটবেলা থেকে ঠাকুরমার কাছে একটা গল্প শুনেছি। সেই গল্পে ভীষণভাবে ভারতবর্ষ আছে, কলকাতা আছে। গানটাও ঠাকুরমার কাছে ছোটবেলায় শুনে শিখেছি। সবসময় তাই মনে হয়েছে, ছোটবেলা থেকে কলকাতা সম্পর্কে যে ছবিগুলো মনের মধ্যে তৈরি হয়েছে সেই শহরটাকে নিজের চোখে একবার দেখি।"

কৌস্তভ একবার মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। ঐশীর মুখে একটা মুগ্ধতা। ঠোঁট উল্টে চাপা গলায় বলল, "মাম্মি বুঝবে না।"

কৌস্তভ আবেলের দিকে চেয়ে একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বললেন, "বুঝতে পেরেছি। তোমাদের পরিবারের সঙ্গে কলকাতার কিছু একটা যোগসূত্র আছে! আসলে কলকাতা একটা খুব পুরনো শহর। একসময় ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিল। সেইসময় কাছাকাছি বিভিন্ন জায়গায় ফরাসি, ওলন্দাজ, আর্মেনিয়ন, পর্তুগিজদেরও উপনিবেশ ছিল। শুনেছি তোমাদের দেশেরও একটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তা, তোমার পূর্বপুরুষরা সেইসময়ে কেউ কলকাতায় ছিলেন নাকি?"

আবেল মাথা নাড়ল, "না বাপুজি। আমার পূর্বপুরুষরা কেউ কখনও ভারতে আসেননি। আমিই প্রথম। তাই নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে।"

কৌস্তভ একটু অবাক হলেন। এখনও এরকম অনেক ইউরোপিয়দের দেখা যায়, যাদের পূর্বপুরুষরা কখনও না কখনও রুজি-রোজগারের জন্য অথবা সরকারি কর্মচারি হয়ে ভারতবর্ষে জীবন কাটিয়েছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর তারা দেশে ফিরে গিয়েছেন। সেইসূত্রে উত্তরপুরুষদের কারও-কারও আগ্রহ রয়ে গিয়েছে এই দেশটার প্রতি। তারা দেখতে আসে। কিন্তু এই ছেলেটা একদম অন্যরকম কথা বলছে।

মহাশ্বেতা দু'কাপ চা এনে সেন্টার টেবিলে ঠকাস করে রেখে বললেন, "রাত্রি হচ্ছে কিন্তু!"

ফোনে মেয়ের কাছে সংক্ষেপে শুনেছেন। আবেল যাতে বুঝতে পারে, তাই সেই কথাগুলোই ইংরেজিতে কৌস্তভ মহাশ্বেতাকে বলতে থাকলেন, "আবেল কিন্তু আমাদের কলকাতা অনুরাগী। ওদের কলেজের প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাওয়ার পর ও কয়েকদিন স্পেশাল পারমিশন নিয়ে রেখেছে কলকাতাকে একটু নিজের মতো করে ঘুরে দেখবে বলে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, কোন হোটেলে ও থাকবে তা নিয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্ত। ওর সঙ্গে কথা বলে হোটেল ঠিক করে পৌঁছে দিয়ে আসব ওকে।"

"আবার পৌঁছে দিয়ে আসব! কেন অ্যাপ ক্যাবগুলো কি আজ ধর্মঘট করেছে? যত্ত আদিখ্যেতা।" মহাশ্বেতা গজগজ করে উঠলেন।

ঐশী বাবাকে সমর্থন করে মাথা ঝাঁকাতে থাকল। বাবাকে সবকিছু বলে এই ব্যবস্থা করেছে। কথা ছিল আবেলকে নিয়ে বাবার অফিসের কাছে চলে যাবে। ওখান থেকে হোটেল। কিন্তু বাবা একটা মিটিংয়ে আটকে গিয়েছিল। মোবাইল সায়লেন্ট করা ছিল। তাই বাধ্য হয়ে বাবাকে টেক্সট করে আবেলকে কিছুক্ষণের জন্য বাড়িতে নিয়ে এসেছে। মা সেসব শোনার কোনও সুযোগই দেয়নি।

মুখে 'আদিখ্যেতা' বললেও মহাশ্বেতা একটু নিশ্চিন্ত হতে গিয়েও যেন হতে পারলেন না। ছেলেটা বিদেয় হবে! তবে এখন চিন্তা অন্য। ছেলেটা ক'দিন কলকাতার হোটেলে একা-একা থাকবে। তারমধ্যে আবার ঐশী যেন ধেইধেই করে ওই হোটেলে গিয়ে মেলামেশা না করে। মেয়েটা শুধু ধিঙ্গিই হয়েছে, বুদ্ধিতে বাড়েনি। বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন, "যেখানে ইচ্ছে, যতদিন ইচ্ছে থাকুক না কেন, যত ইচ্ছে কলকাতা দেখুক। অন্যর ঘাড়ে চড়া কেন?"

আবেল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "থ্যাংক ইউ ফর দ্য নাইস টি, মাঈজি।"

মাঈজি শব্দটা শুনলেই ভিতরে কীরকম একটা চিড়বিড়ানি হচ্ছে। মহাশ্বেতা ইংরেজিতে সেরকম স্বচ্ছন্দ নন। তবুও না বলে থাকতে পারলেন না, "আমাকে মাঈজি বলতে তোমাকে কে শিখিয়েছে? ঐশী?"

আবেল হেসে বলল, "আই নো হিন্দুস্থানি ল্যাঙ্গোয়েজ থোড়া থোড়া।"

ঐশী হৈ-হৈ করে উঠল, "অ্যাই। ড্যাডি-মাম্মিকে একটু শোনাও।"

আবেল গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, "আই মে ট্রাই। আই নো ভেরি লিটল।"

"যেটুকু জানো সেটুকুই বলো।"

"আই অ্যাম অ্যাট আ লস টু ফিগার আউট আ হোটেল ইন কলকাত্তা।" তারপর একটু থেমে ভেবে কেটে-কেটে বলার চেষ্টা করল, "কলকাত্তা মাই হোটেলিয়া না মিলি। কা করি?"

কৌস্তভ বাকরুদ্ধ হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন! ঐশী হাসিতে ফেটে পড়ল। যে মহাশ্বেতা এতক্ষণ রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে মুখ থমথমে করেছিলেন, তিনি পর্যন্ত ফিক করে হেসে ফেলে বললেন, "এ কী ভাষা বলছে গো?"

"ভোজপুরি।" তারপর আবেলের দিকে চেয়ে কৌস্তভ বললেন, "এই ভাষা তুমি কোথায় শিখলে?"

"শিখিনি এখনও। ইন্টারনেট থেকে একটু-একটু শেখার চেষ্টা করছি। ইন্টারনেটে হিন্দি শেখার অনেক সাইট আছে। কিন্তু ভোজপুরি শেখার সেরকম কোনও রিসোর্স নেই। ইউটিউবে অনেক ভোজপুরি সিনেমা আর গান পাওয়া যায়। কিন্তু ভাষাটা শেখার কোনও ভিডিয়ো পাচ্ছি না। শব্দগুলো অনেকটা হিন্দির মতো, কিন্তু আমার মনে হয়েছে হিন্দির সঙ্গে ভোজপুরি ভাষার অনেক তফাত আছে।"

"বাংলাও জানো?"

আবেল ঠোঁট উল্‌টিয়ে মাথা নাড়ল, "না বাপুজি।"

কৌস্তভ মহাশ্বেতার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললেন, "থ্যাঙ্ক গড!" তারপর আবেলকে বললেন, "এবার আমিও একটু ঘেঁটে যাচ্ছি। একদিকে তুমি কলকাতা দেখতে চাও, 'ফুলোরি বিনা চাটনি' গানটা জানো। আরেকদিকে ভোজপুরি শিখতে চাও। কলকাতার প্রধান আঞ্চলিক ভাষা কিন্তু বাংলা। ভোজপুরি ভারতবর্ষের কয়েকটা রাজ্য যেমন বিহার, উত্তরপ্রদেশের কিছু অঞ্চলের ভাষা। ভারতবর্ষ আসলে একটা বিরাট দেশ, এখানে অনেক ভাষা। কলকাতায় বেশ কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে এখানে এসেছেন, তারা ভোজপুরি ভাষায় কথা বলেন। ভোজপুরি ভাষা আমরা কিছুটা বুঝতে পারি। এছাড়া কিন্তু কলকাতার সঙ্গে ভোজপুরি ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই।"

"আসলে আমি ভোজপুরি ভাষাটা শিখতে চাই। ভোজপুরি ভাষা ফুলমতীমাঈয়ের ভাষা ছিল।"

"ফুলমতীমাঈ... উনি কে?" কৌস্তভ অবাক গলায় জানতে চাইলেন। মহাশ্বেতা আর ঐশীও জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকল।

আবেল মাথাটা নামিয়ে নিয়ে নরম স্বরে বলল, "আমার ভার্চুয়াল ঈশ্বরী!"

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে দ্বিতীয় কিস্তি

ফুলমতীমাঈ কে?

কারও কাছে ফুলমতীমাঈয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে এই প্রশ্নটা তো অবধারিত, তাই না প্রিয়তমা? বিশেষ করে তাকে যদি আবার ভার্চুয়াল ঈশ্বরী বলি ব্যাপারটা আরও হেঁয়ালি হয়ে যায়। অথচ জানো, ছোটবেলায় এই প্রশ্নটা আমার মনে কোনওদিন আসেনি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ঠাকুমার কাছে যে ফুলমতীমাঈয়ের রূপকথার মতো গল্পগুলো শুনে বড় হয়েছি, সেই ফুলমতীমাঈয়ের একটা বিবর্ণ সাদাকালো ছবি আমাদের বাড়িতে নেই। কোনও তেল রঙে আঁকা পোর্ট্রেটও নেই। তিনি বিভিন্ন বয়সে কেমন দেখতে ছিলেন তা নিয়ে আমার কোনও কৌতূহল ছিল না। কারণ ছোটবেলা থেকেই আমার মনের মধ্যে ফুলমতীমাঈয়ের একটা ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছে। সেই ছবির মুখ ঈশ্বরীতুল্য। মা মেরির মতো কোমল, নিষ্পাপ, করুণাময়ী। স্বপ্নে আমার বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে ফুলমতীমাঈয়ের সঙ্গে।

কিন্তু এসব স্বপ্নের ভার্চুয়াল রিয়্যালিটির কথা। বাস্তবে আমার বাবা একটা সময়ে ফুলমতীমাঈয়ের অতীত জানার খুব চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। তাই বংশ পরম্পরায় জানা তথ্যগুলোর ওপরই ভরসা করতে হয়েছিল। কয়েকটা তারিখ, ভারতের একটা প্রত্যন্ত গ্রামের নাম দোপোহোরি আর ফুলমতীমাঈয়ের বাবার নাম, রামাশীষ।

রামাশীষ, ব্যস ওই নামটুকুই। পদবী পর্যন্ত নেই। দোপোহোরি গ্রামের নামটা নিয়েও বাবার মনে একটা সংশয় ছিল। ভারতের কিছু অঞ্চলে এই কথাটার আবার মানে 'নেশাহার'। গুগল ম্যাপ ঘেঁটে এরকম কোনও জায়গার নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। হয়তো এরকম হতে পারে জায়গাটার নাম এখন পাল্টে গিয়েছে অথবা যে ব্রিটিশ গ্রামের নামটা শুনে খাতায় নথিভুক্ত করেছিলেন, তিনি গ্রামের নামের উচ্চারণই ঠিক করে বুঝতে পারেননি। অথবা বংশ পরম্পরায় নামটার বানানগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছে।

সেই প্রবাদপ্রতিম কথাটাই মনে পড়ছে। নামে কী এসে যায়? তোমাকে গল্প গুছিয়ে বলার জন্য ধরেইনি, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম বিহারে দোপোহারি চরম দারিদ্র জর্জরিত প্রত্যন্ত এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে অনাহার, অশিক্ষা, কুসংস্কার, জাতপাতসহ আরও অনেক আনুষঙ্গিক সমস্যা ছিল। রামাশীষ ছিল সেই গ্রামের এক বাসিন্দা। ঋণে জর্জরিত হয়ে স্থানীয় জমিদারের এক অর্থে ক্রীতদাস হয়ে ছিল মানুষটা। অমানুষিক পরিশ্রমের পরও সামান্য পারিশ্রমিক চাইলে জমিদারের নায়েব নিরক্ষর রামাশীষকে দুটো পয়সা ঠেকিয়ে জমা খরচের খাতায় সুদের হিসেব দেখাত। সামান্য প্রতিবাদ করলে কপালে জুটত জুতো, লাথি, কখনও বা চাবুকের ঘা।

বিপত্নীক রামাশীষ নিজের ঋণ জর্জরিত জীবনের সমস্যা নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকত যে মনে থাকত না তার শতচ্ছিন্ন চালার কুঁড়েঘরে দশ বছরের এক বিধবা মেয়ে আছে, ফুলুয়া। ছ'বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল পাশের গ্রামের একটা লোকের সঙ্গে। লোকটা তার সদ্য শৈশব উত্তীর্ণ শরীরে অনেক ব্যথা দিয়েছিল। তারপর হাজার সামাজিক নিয়মের বেড়াজালে ওকে বেঁধে দিয়ে দুম করে মরে গেল। তখন ফুলুয়ার বয়স মাত্র আট।

এই মৃত্যুর অভিঘাত ফুলুয়াকে স্পর্শ করেনি। ব্যাপারটা যেন খানিক স্বাভাবিকই ছিল। বাড়িতে বোনেদের মরে যেতে দেখেছে। গ্রামে ওর বয়সি অনেক মেয়েকেই দেখেছে এভাবে বিধবা হয়ে ফিরে আসতে। বিধবা হয়ে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ফুলুয়াকে যখন ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গ্রামে ফিরিয়ে দিয়ে গেল, তখন নিজের পোয়াতি মা ঘরে পা রাখার আগে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসার অপরাধে ফুলুয়ার লিকলিকে শরীরকে ঝাঁটা দিয়ে পিটিয়েছিল। ফুলুয়া মুখে টুঁ শব্দও করেনি। চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল ফেলেনি।

ফুলুয়ার বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসার কিছু মাস পরে রামাশীষের দীর্ঘ দিনের মনস্কামনা পূর্ণ করে জন্ম হল এক ছেলে, লহুর। রামাশীষের বউয়ের পঞ্চম গর্ভ। ফুলুয়া আর লহুর মধ্যে আরও তিন কন্যা সন্তান হয়েছিল রামাশীষের। তারা কেউ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়, কেউ কলেরা বা ম্যালেরিয়ার মতো রোগে ভুগে বিনা চিকিৎসায় মরে গিয়েছিল। তবে লহুর জন্ম দেওয়ার ধাক্কাটা আর সামলাতে পারেনি রামাশীষের বউ। অতিরিক্ত রক্তপাতে মরেই গিয়েছিল। মায়ের এই মৃত্যুও কিন্তু ফুলুয়াকে স্পর্শ করেনি। বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে মরে যাওয়াও দোপোহারি গ্রামে স্বাভাবিক ছিল।

বউ মরে গেলেও শত দারিদ্রের মধ্যেও রামাশীষ খুশি হয়েছিল। বংশ রক্ষা করার জন্য ঘরে একটা ছেলের জন্ম হয়েছে। বউ না থাকার সমস্যাটা বুঝতে দেয়নি ফুলুয়া। আট বছর বয়সেই মেয়েটা ম্যাজিকের মতো মা হয়ে উঠেছিল। আর এই মা হয়ে ওঠাটাই কাল হয়েছিল ফুলুয়ার। ওই বয়স থেকেই ফুলুয়া সারাদিন চেষ্টা করত দুটো শস্য জোগাড় করে হাত পুড়িয়ে বাবা আর ভাইয়ের অন্নসংস্থান করার।

রামাশীষ চিরকালই কোনওরকমে দু'পয়সা উপার্জন করতে পারলে এক পয়সা মদের পিছনে খরচ করত। মদ তাকে সাহস জোগাত সব দুঃখ ভুলতে। মনের মধ্যে যা আছে তা গলা ছেড়ে বলতে। যেদিন মদ জোটাতে পারত সেদিন আকণ্ঠ পান করে রাতের অন্ধকার ঘরের ছেঁড়া মাদুরের ওপর শুয়ে চালার ফাঁকফোকর দিয়ে আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে একটাই স্বপ্ন দেখত, তার সব ধারদেনা শোধ হয়ে গিয়েছে। কোনও বড়লোক হয়ে ওঠার স্বপ্ন নয়, শুধু ছোট্ট এই স্বপ্নটাই দেখতে ভালোবাসত রামাশীষ। আর তখন বুঝতেও পারত না, তিন হাত দূরে নিকষ অন্ধকারে ফুলুয়া তার না ফুটে ওঠা স্তনে ভাইয়ের মুখ চেপে আপ্রাণ চেষ্টা করছে যাতে খিদের জ্বালায় সে কেঁদে উঠে বাপুজির স্বপ্নটা ভেঙে না দেয়।

এভাবেই এক-একটা দিন কাটত রামাশীষ আর ফুলুয়ার। কিন্তু লহুর যখন দু'বছর বয়স, এক সপ্তাহের জ্বরে বিনা চিকিৎসায় সেও মরে গেল। এই প্রথম মৃত্যু চরম আঘাত করল দশ বছর বয়সী ফুলুয়াকে। ফুলুয়ার নিজস্ব এক টুকরো পৃথিবীটা বিরাট এক শূন্যস্থান হয়ে উঠল। দু'বছরের শিশু বলে হিন্দুদের সৎকারের নিয়ম মেনে লহুকে পোড়ানো হয়নি। কবর দেওয়া হয়েছিল। বাচ্চাদের কবর দেওয়ার জন্য গ্রামের বাইরে ছিল একটা পতিত জমি। ফুলুয়া সারাদিন সেখানে গিয়ে বসে থাকত। কৃষ্ণের ভজন গাইত। গ্রামের লোক ভাবতে আরম্ভ করল ওকে ভূতে বা ডাইনিতে ধরেছে।

এতটা যখন তোমাকে বলে ফেলব, তুমি নিশ্চয়ই তখন বুঝবে, এই ফুলুয়াই পরবর্তীকালে হয়ে উঠবেন আমার 'ফুলমতীমাঈ'। কিন্তু এর পরের অংশ শোনার আগে তোমার মনঃসংযোগ মাঝে-মাঝেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে এইটা ভেবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিম বিহারে দোপোহারি গ্রামের ফুলুয়ার সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীতে রটারডামে থাকা আমাদের ভ্যান ডার বার্গ পরিবারের কী সম্পর্ক? কেনই বা তিনি আমার ঠাকুরমার রূপকথার নায়িকা বা আমার ভার্চুয়াল ঈশ্বরী?

প্লিজ প্রিয়তমা, তুমি শেষপর্যন্ত সব ধৈর্য ধরে শুনো। কারণ, এই উত্তরটা পেতে গেলে ইতিহাসের সরণি ধরে অনেকটা হাঁটতে হবে। সেই ইতিহাস নথিবদ্ধ নয়। বংশ পরম্পরায় শোনা। তাই অনেক ফাঁকফোকর গজিয়ে গিয়েছে।

ঐশীর বাবারও তাই হয়েছিল। আমার কথা শুনতে-শুনতে বারবার আনমনা হয়ে অনেক প্রশ্ন করছিলেন। ঐশীর বাবাকে এত বিস্তারিত সব বলার সময় ছিল না। খুব সংক্ষেপে ফুলমতীমাঈ এর ছেলেবেলার জীবন কেমন ছিল বলে যেটা আমি জেনেছি, সেটা সোজা চাপিয়ে দিলাম ঠাকুরমার ওপর। বললাম, ঠাকুরমার কাছে ভারতবর্ষের এইসব গল্প শুনেছি। স্বভাবতই ঐশীর বাবা বেশ বিস্মিত হয়েছিলেন। আমি আর বেশি খুলে বলিনি। আসলে বেশ বুঝতে পারছিলাম আমি দুম করে ঐশীদের বাড়িতে পৌঁছে যাওয়াটা ঐশীর মা পছন্দ করছিলেন না। তা ছাড়া ঐশীর বাবা অফিস থেকে ক্লান্ত

হয়ে ফিরেও রাজি হয়েছিলেন আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিতে। আর রাত্রি না বাড়িয়ে তাই ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

॥ ২ ॥

আবেল ভ্যান ডার বার্গ।

শান্ত দেখতে ছেলেটাকে বেশ ভালো লেগে গিয়েছে কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়ের। কড়া অনুশাসনে বাড়িতে সংসার চালান মহাশ্বেতা। বাড়িতে মেয়ে আছে। তাই যতই শান্ত দেখতে হোক, ভদ্র ব্যবহার হোক, কিছুতেই ২২-২৩ বছরের এই ছেলেটাকে বাড়িতে থাকার অনুমতি দেবার কথা মহাশ্বেতা স্বপ্নেও ভাববেন না। অথচ কৌস্তভের মনে হল, ছেলেটাকে বাড়িতে থাকতে দিলে মন্দ হত না! ছেলেটা বেশ গল্প করতে পারে। যদিও ফুলমতীর সঙ্গে ছেলেটা বা ওর পরিবারের কী সম্পর্কসূত্র সেটা এখনও পরিষ্কার হয়নি, পৃথিবীর অন্য গোলার্ধে থেকে যাবতীয় ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, ফুলপরীর গল্প ছেড়ে ছেলেটার ঠাকুরমাই বা কেন উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের হতদারিদ্রের গল্প শোনাতেন, সেটাও স্পষ্ট নয়? তবে ছেলেটা যে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষকে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের গ্রামের দারিদ্রকে মনে রেখেছে, সেটা ওর কথায় স্পষ্ট।

কৌস্তভ নিজে গাড়ি চালিয়ে আবেলকে হোটেলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন। ঐশীর বন্ধুরা ভেবেছিল বিদেশি ছেলে। সঙ্গে প্রচুর ডলার বা ইউরো এনেছে। পাঁচতারার নিচে কোনও হোটেলে থাকবে না। সেটা ভুল ভেবেছিল। সঙ্গে বেশি ডলার নেই আবেলের। তবে যেটুকু ওর ক্ষমতা সেই পয়সায় কলকাতায় থাকার মত অগুন্তি হোটেল আছে। কিন্তু ছেলেটা কলকাতার ঠিক কী দেখতে চায়, সেটা এখনও পরিষ্কার করে বুঝতে পারেননি কৌস্তভ। তাই শহরের কোন প্রান্তে থাকলে সুবিধে হবে সেটাও বুঝে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া কমবয়সী একটা বিদেশি ছেলেকে একা-একা শহরের অনেক হোটেল থাকতে নাও দিতে পারে।

তবে ছেলেটা নিজেই ম্যাপ দেখে কয়েকটা হোটেল বেছে রেখেছে। সবই মধ্য কলকাতায়। সদর স্ট্রিট এলাকায়। ওই অঞ্চলে কিছু হোটেলের বদনাম থাকলেও, অফিসে একজনকে ফোন করে হোটেলের নামগুলো বলে, তার মধ্যে একটা বেছে দিয়েছেন। নিউ মোনালিসা হোটেল। জেনেছেন, এই হোটেলের কোনও সমস্যা নেই। বিভিন্ন বয়সি বিদেশি পর্যটকরা এই হোটেলে থাকতে আসে।

রাতের কলকাতা। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস দিয়ে গাড়িটা স্পিড লিমিটের নিয়ম মেনেই চালাচ্ছেন কৌস্তভ। মা ফ্লাইওভার ধরলেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন, গাড়িতে ওঠার পর থেকেই আবেল কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। জানলার বাইরে দিয়ে রাতের কলকাতা দেখছে। একদিকে পরপর পাঁচতারা হোটেল। অন্যদিকে মাঠ, ভেড়ি, অন্ধকার। আবেল সেইদিকে চেয়ে আছে।

কৌস্তভ বললেন, "তোমাদের দেশে তো অনেক খাল-বিল।"

"হ্যাঁ বাপুজি। আমাদের দেশে বেশিরভাগটাই নদী, ক্যানাল।"

"তোমার বাড়ি কোথায়? প্রপার আমস্টারডামে?"

"না, রটারডাম। আমস্টারডাম থেকে ঘণ্টাখানেক দূরে। আপনি কখনও এসেছেন আমস্টারডামে?"

"না, যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। ভিনসেন্ট ভ্যান গগের জন্মস্থান, অ্যানা ফ্রাঙ্কের বাড়ি, দারুণ-দারুণ টিউলিপের বাগান, কতকিছু দেখার আছে তোমাদের দেশে।"

আবেল অল্প হেসে বলল, "হ্যাঁ বাপুজি। ঐশী তো আসবে। স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এরপর ওরা আসবে আমাদের দেশে। তখন আপনি আর মাঈজি চলে আসুন না। রটারডামে আমাদের বাড়িতে থাকবেন। আমার বাবা-মা খুব খুশি হবেন। ভারতীয়দের ওঁরা খুব পছন্দ করেন। আপনি নিশ্চয় সাইকেল চালাতে জানেন। সাইকেল চালিয়ে আপনারা আমাদের শহর নিজের মতো ঘুরে-ঘুরে দেখবেন বাপুজি।"

কৌস্তভের একটু খারাপ লাগল। যে ছেলেটাকে বাড়িতে না রেখে হোটেলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন, সে কীরকম আন্তরিকভাবে ওদের বাড়িতে গিয়ে থাকার কথা বলছে! গলাটা একটু মোলায়েম করে বললেন, "তোমাকে একটা কথা বলব আবেল? ঐশীর বন্ধুরা তোমাকে যেমন শিখিয়েছে, তুমি এখানে রাস্তাঘাটে ঘোরার সময় অপরিচিতদের যাকে-তাকে বাপুজি-মাঈজি বলো না।"

আবেল একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, "কেন?"

"আসলে কলকাতায় তো বাঙালি বেশি। তার ওপর তুমি বিদেশি। বাঙালিরা একজন বিদেশির মুখে ঠিক এরকম সম্বোধন শুনতে অভ্যস্ত নয়।"

আবেল মুখ নিচু করে বলল, "ও তাই! আপনি কিছু মনে করছেন না তো?"

হেসে ফেললেন কৌস্তভ, "না, না। আমাকে বলতে পার। বাপুজি মানে বাবা বা পিতৃস্থানীয় কাউকে বলা হয়। তুমি তো কিছু-কিছু হিন্দি ভোজপুরি জানো। আমাদের দেশে মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধীকেও 'বাপুজি' বলা হয়। তবে যা বললাম, বাঙালিদের মধ্যে বাপুজি বলার রেওয়াজ নেই।"

আবেল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

"তা, কলকাতায় তোমার কী দেখতে সবচেয়ে ভাল লাগল?"

"আপনাদের দেশের সবচেয়ে পবিত্র নদী, গঙ্গা।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঐশী বলছিল, প্রিন্সেপ ঘাটে তোমার গঙ্গা দেখতে খুব ভালো লেগেছিল।"

"খুব অল্প সময়ই ওখানে থাকতে পেরেছিলাম। কলেজের ঠিক করে দেওয়া সিটি টুরে আরও অনেক জায়গা দেখতে যাওয়ার তাড়া ছিল। গঙ্গার জল ছুঁয়ে দেখে আসতে পারিনি। আচ্ছা, আপনাদের এখানে তো সাইকেল চলে। হোটেল থেকে সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়?"

"না। কলকাতায় ওভাবে টুরিস্টরা সাইকেলে ঘোরে না। আচ্ছা, তুমি ঠিক ঘুরে-ঘুরে কী দেখতে চাইছ? মানে আমি যদি বুঝতে পারতাম, তাহলে তোমাকে একটু সাহায্য করতে পারতাম। ফুলমতী ব্যাপারটা যতদূর বুঝলাম, ফুলমতী, যার ডাক নাম ফুলুয়া, সে একজন বিহার বা উত্তর প্রদেশের কিশোরী। ভোজপুরি ভাষায় কথা বলত। আমাদের দেশের উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণের ব্যাপারটাও তুমি জান। কন্যাসন্তানের সমস্যাটাও জান। বুঝলাম, ফুলমতীরা নিম্নবর্ণের ছিল, গরিব। উচ্চবর্ণের জমিদাররা ওদের ওপর অত্যাচার করত। এই অবস্থা এখনও অনেক জায়গায় আছে। কিন্তু তার সঙ্গে রটারডামে তোমার ঠাকুরমা যে গল্প বলেছিলেন তার যোগসূত্র খুঁজে উঠতে পারছি না। উনি কি কখনও এদেশে ছিলেন?"

আবেল মাথা নাড়ল, "না। আপনাকে বললাম না, আমাদের বংশে আমিই প্রথম ভারতে এলাম।"

"হুম," আনমনা হয়ে পড়লেন কৌস্তভ।

"বুঝতে পারছি বাপুজি যে আমি আপনাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না। ফুলমতীমাঈয়ের গল্প আমাদের পরিবারে অনেকটা রূপকথার মতো। কিন্তু ফুলমতীমাঈয়ের জীবনটা একেবারেই রূপকথার মতো ছিল না। ফুলমতীমাঈয়ের কোনও ছবি আমাদের বাড়িতে নেই। কিন্তু আমাদের ভ্যান ডার বার্গ পরিবারের প্রত্যেকের মনে ফুলমতীমাঈয়ের একটা ছবি আঁকা আছে। আমাদের কাছে ভারতবর্ষ মানে ফুলমতীমাঈয়ের দেশ, পবিত্র দেশ। বাড়িতে যখন বাবা মাকে বললাম, কলেজের প্রোগ্রামে ভারতের কলকাতায় যাচ্ছি, বাবা মা দু'জনেই বলেছে ফুলমতীমাঈয়ের দেশের অনেক-অনেক ছবি তুলে আনতে।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু কোথায়-কোথায় ঘুরে তুমি ওঁর স্মৃতি বিজড়িত জায়গার ছবি তুলবে?"

"আমি একটু ইন্টারনেটে রিসার্চ করেছি। আপনাদের শহরে খিদিরপুর বলে একটা জায়গা আছে, আর তার থেকে এগিয়ে গেলে মেটিয়াবুরুজ বলে আরও একটা জায়গা আছে। আসলে একটা

সাইকেল পেলে আমি নানা জায়গা ঘুরে ঠিক খুঁজে নিতাম।"

"কী?"

"একটা ঘাট।"

কৌস্তভ আরও অবাক হলেন! গঙ্গা তো কলকাতা শহরের মধ্যে দিয়েই বয়ে গিয়েছে। প্রিন্সেপ ঘাট দেখা হয়ে গিয়েছে। মিলেনিয়াম পার্কের কাছেই কী সুন্দর দেখা যায়। পাশেই আছে আউটরাম ঘাট। আরও ঘাট দেখতে সাইকেল চালিয়ে খিদিরপুর, গার্ডেন রিচ, মেটিয়াবুরুজ যেতে চাইছে কেন ছেলেটা? খিদিরপুর বন্দর এলাকা আর মেটিয়াবুরুজে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের শেষ জীবনটা কেটেছিল। এখন দর্জির কাজ হয় বলেই জানেন। তাছাড়া ওখানে গার্ডেনরিচ ওয়র্কশপ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আর কিছু ভারি শিল্পের কারখানা আছে। কলকাতায় দেখার অনেক জিনিস আছে। বিদেশি পর্যটকরা এসে কখনও খিদিরপুর মেটিয়াবুরুজে গিয়ে গঙ্গা দেখতে চায় বলে এর আগে শোনেননি। তাও এরকম কমবয়সি একটা ওলন্দাজ ছেলে!

"আমিও বুঝতে পারছি বাপুজি, আমি যেসব জায়গার ছবি তুলে নিয়ে যেতে চাইছি সেইসব জায়গা খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়। স্থানীয় কেউ না থাকলে চিনিয়েও দিতে পারবে না। স্থানীয় ভাষা জানাও খুব দরকার। আপনাকে কি একটা অনুরোধ করতে পারি? ঐশীকে কি কাল আমার সঙ্গে থাকতে বলতে পারি?"

কৌস্তভ বেশ বিপাকে পড়লেন। নিজে সবসময় মনে করেন মেয়ের ব্যাপারে আধুনিক মনোভাবে মহাশ্বেতার চেয়ে কয়েক মাইল এগিয়ে। একটু আগেই ভাবছিলেন, ছেলেটাকে বাড়িতে থাকতে না দেওয়াটা মধ্যযুগীয় মানসিকতা। তবে এবার নিজেই ঢোঁক গিললেন।

"আসলে আবেল, শহরের যে প্রান্তে খিদিরপুর ওদিকটা ঐশী কিছুই চেনে না। ওকে সঙ্গে রেখে কোনও সাহায্য তোমার হবে না। আমি বরং একটা কাজ করে দিতে পারি। আমি কাল তোমার জন্য একটা গাড়ি আর ড্রাইভার জোগাড় করে দিচ্ছি। পয়সাকড়ি নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। এটা আমার তরফ থেকে তোমাকে উপহার। ড্রাইভারকে বলবে তুমি কোথায়-কোথায় যেতে চাও, তোমাকে নিয়ে যাবে। বাংলা, হিন্দি ছাড়া কাজ চালানোর মতো অল্পস্বল্প ইংরেজিও জানে। ওকে বলে দিও কোথায় যেতে চাও। তবে খিদিরপুর কিন্তু বন্দর এলাকা।"

"আমি জানি। গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ বাপুজি।"

"ঠিক আছে। তুমি কিন্তু এখনও তোমার ফুলমতীমাঈয়ের সম্পর্কে সবটা বলনি।"

আবেল ট্যাবটা খুলে নিজের লিখে রাখা কিছু তথ্য পড়ে শোনাতে থাকল, "আপনাকে বললাম না বাপুজি, ফুলমতীমাঈ আমার কাছে ছোটবেলা থেকে শোনা এক রূপকথার চরিত্র। ফুলমতীমাঈয়ের জন্ম যেখানে বাস্তবে সেই দোপোহোরি গ্রামটা বেরিলি, গোরক্ষপুর, বারানসী, মির্জাপুর এইরকম কোনও শহরের কাছে ছিল বলেই আমাদের পরিবারের সবার অনুমান। তবে ফুলমতীমাঈয়ের রেজিস্ট্রেশন কার্ডে 'ক্যালকাটা' লেখা ছিল। যদি জানতাম দোপোহোরি গ্রামটা ঠিক কোথায়, তাহলে প্রথমেই সেই গ্রামের ছবি তুলতে যেতাম।"

"রেজিস্ট্রেশন! কলকাতা? তোমার এই ফুলমতী কতদিন আগে ছিলেন বলো তো?"

আবেল চট করে হিসেব করে বলল, "উনি বেঁচে থাকলে আজকে বয়স হত ১৫০ বছর। ধরে নিতে পারেন উনি দোপোহোরি গ্রাম থেকে ট্রাফিকড হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য এত গরিব ছিলেন এবং এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, ওঁর হয়তো আর কোনও উপায়ন্তর ছিল না।"

"১৫০! ২০১৯ মাইনাস ১৫০," বিড়বিড় করে অঙ্ক কষে কৌস্তভ বললেন, "১৮৬৯। ওই সময়ের মেটিয়াবুরুজ। ওই সময়ে তো মনে হচ্ছে ওয়াজিদ আলি শাহের সময়। তোমার ফোনে ইন্টারনেট আছে আবেল?"

"আছে।"

"কিছুতেই সালটা মনে পড়ছে না। একটু গুগল সার্চ করে দ্যাখো তো। ১৮৬৯, ওয়াজিদ আলি শাহ, মেটিয়াবুরুজ।"

আবেল গুগল ঘেঁটে বলল, "উইকিপিডিয়ায় তথ্য পাচ্ছি ওয়াজিদ আলি শাহ অযোধ্যার নবাব ছিলেন। ১৮৫৬ সালে লর্ড ডালহউসি তাকে নির্বাসিত করেন। উনি মেটিয়াবুরুজে শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন।"

"রাইট! রাইট! ঠিকই ধরেছি।" কৌস্তভ একটু তৃপ্ত হলেন। আস্তে-আস্তে ফুলমতীর ব্যাপারটা একটু জোড়া লাগার দিকে যাচ্ছে। ট্রাফিকড শব্দটা বলেছে ছেলেটা। ফুলমতীকে তাহলে অভাবের তাড়নায় ওয়াজেদ আলির জমানায় খিদিরপুরে আসতে হয়েছিল। ওলন্দাজরা ভালো জাহাজি ছিল। আবেলের পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই কেউ খিদিরপুরে এসেছিল। সেই থেকে ফুলমতীর সঙ্গে সম্পর্ক। হয়তো সেই পূর্বপুরুষের দুরারোগ্য কোনও অসুখ করেছিল। ফুলমতী শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলেছিল। তাই সেই জাহাজি ভ্যান ডার বার্গ দেশে ফিরে গিয়ে বংশ রক্ষা করতে পেরেছে, তাই আজ আবেলের অস্তিত্ব আছে, তাই গোটা পরিবারের এত কৃতজ্ঞতা।

কিন্তু কৌস্তভের চটজলদি মিলিয়ে ফেলা অঙ্কটা একেবারে ধূলিসাৎ করে আবেল বলল "ওয়াজিদ আলি শাহর সঙ্গে ফুলমতীমাঈয়ের কোনও সম্পর্ক নেই বাপুজি। সত্যি কথা বলতে, ভারতবর্ষের ইতিহাসটা খুব বড়, খুব বিচিত্র। ফুলমতীমাঈয়ের প্যাসেজটুকু ছাড়া এত বড় ইতিহাস, নবাব আর ব্রিটিশদের শাসন নিয়ে আমার কোনও কৌতূহল বা আগ্রহ নেই।"

"বেশ, তোমার জানা ইতিহাসটা তাহলে তোমার মুখ থেকেই শুনি।"

একটু দম নিয়ে আবেল শুরু করল, "এটাও বেশ দীর্ঘ ইতিহাস। আপনি আপনার বাড়িতে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কথা বলছিলেন না, আমাদের দেশের ভাষায় কোম্পানিটার নাম ছিল ভেরিনিগদি ওস্তইন্ডিস কোম্পানি। এটা ছিল পৃথিবীর প্রথম মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। পৃথিবীর প্রথম স্টক মার্কেটের শুরু এই কোম্পানিকেই কেন্দ্র করে। একটা সময়ে কলকাতা বন্দরে এদের ব্যবসা ছিল। ইংরেজ এবং ফরাসিদের মতো ওলন্দাজরাও ইউরোপ-আমেরিকায় চিনি, কফি, চকোলেট ইত্যাদির ব্যবসা করত। দক্ষিণ আমেরিকায় আটলান্টিকের উপকূলে ক্রিস্টোফার কলম্বাস গায়ানা আবিষ্কার করার পর দেখা গিয়েছিল, সেই দেশটা উন্নতমানের চিনি আর কফি চাষ করার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। এর পরের বছরগুলোতে নানা যুদ্ধ, হানাহানি রাজনৈতিক বিনিময় চুক্তির পর গায়ানা তিন টুকরো হয়ে তিনটি দেশের উপনিবেশ হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ গায়ানা, ফ্রেঞ্চ গায়ানা আর আমাদের ডাচ গায়ানা। আমার পূর্বপুরুষরা, ভ্যান ডার বার্গ পরিবার ডাচ গায়ানায় প্ল্যানটেশন মালিক ছিলেন। ওঁরা এসেছিলেন ব্রাজিল থেকে। বংশানুক্রমে আখের চাষ করে চিনির রফতানির ব্যবসা করতেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময় চিনির খামারগুলোই ছিল গোটা ডাচ উপনিবেশের মূল অর্থনীতির ভিত।"

"বাঃ!" ইতিহাস শুনতে সবসময়ই ভালো লাগে। বিশেষ করে যদি সেটা কেউ আবেলের মতো গুছিয়ে বলতে পারে। কৌস্তভ বললেন, "তোমার পূর্বপুরুষরা তাহলে ওলন্দাজ গায়ানার জমিদার ছিলেন?"

"শুধু আমার পূর্বপুরুষরাই নন। সেই অর্থে আপনি জমিদার বললে, আরও অনেক জমিদার পরিবার ছিল। কয়েকটা পরিবারের কথাই আমি শুধু জানি। যেমন, বুগার্ড পরিবার, ভ্যান ডিক পরিবার, ডি জং পরিবার। বড়-বড় এলাকা নিয়ে এদের আখের চাষ করার খেত, খামার, চিনি তৈরির কারখানা ছিল। আখের চাষ করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা বিশাল সংখ্যক আফ্রিকার ক্রীতদাসদের নিয়ে এসেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধ ক্রীতদাসদের অপরিসীম

পরিশ্রমে ফুলেফেঁপে উঠেছিল আমাদের মতো পরিবারগুলির চিনির ব্যবসা। তারপরে উদ্ভূত হয়েছিল নতুন এক সংকটের।"

"কীরকম?"

"উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে গোটা ইউরোপ জুড়ে প্রতিটি দেশে এমনকী আমেরিকাতেও অবলুপ্ত হতে শুরু করেছিল ক্রীতদাস প্রথা। নিষিদ্ধ হতে শুরু করেছিল ক্রীতদাস কেনা-বেচার ব্যবসা বা কোনও ক্রীতদাসকে প্রভুর কাছে রেখে দেওয়া। ১৮৬৩ সালে প্রবল আন্তর্জাতিক চাপে ইউরোপের শেষ দেশ হয়ে আমরা অর্থাৎ ওলন্দাজরা পর্যন্ত ক্রীতদাস প্রথা অবলুপ্ত করতে বাধ্য হই। তার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল আমার পূর্বপুরুষদের আখের চাষ আর চিনির ব্যবসায়। এরপর মুক্ত ক্রীতদাসদের চুক্তি শ্রমিক করে বছরদশেক চাষ করার মরিয়া চেষ্টা হয়েছিল। তবে সেটা ফলপ্রসূ হয়নি। ক্রমশই আফ্রিকার মুক্ত ক্রীতদাসরা ডাচ গায়ানা থেকে চলে যেতে শুরু করলে, খেতে আখ চাষ করার মানুষ একেবারে কমে যেতে শুরু করেছিল।"

কৌস্তভের মোবাইলটা বেজে উঠল। ডিসপ্লেতে মহাশ্বেতা। কৌস্তভ গাড়ি চালাতে-চালাতেই ফোনটা ধরলেন।

"তুমি কোথায়?"

"এই তো থিয়েটার রোডে।"

"যাচ্ছ না ফিরছ?"

"উফ, জানো না থিয়েটার রোড ওয়ান ওয়ে, যাচ্ছি।"

"এখনো পৌঁছয়নি! গরুর গাড়ি চালাচ্ছ নাকি? তাড়াতাড়ি ওকে হোটেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এসো।"

"একটু সময় লাগবে। হোটেলে একটু বলে-টলে ব্যবস্থা করতে হবে।"

"ওই করো। বাপ-মেয়ে মিলে বনের মোষ তাড়াও। আর এদিকে আমি না খেয়ে বসে আছি।"

"আরে তোমার কথা ভেবেই তো পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। না হলে হোটেল ওকে তাড়িয়ে দিলে আবার যদি আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয় তখন লঙ্কাকাণ্ড করবে। প্লিজ় তুমি খেয়ে নাও।"

ছেলেটা বাংলা বোঝে না। তবু ফোনটা ছেড়ে আবেলের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন কৌস্তভ। আবেলেও মৃদু হেসে বলল, "কিছু না মনে করলে একটা কথা বলব বাপুজি?"

"বলো।"

"গাড়ি চালাতে-চালাতে মোবাইল ফোন না ধরাই ভালো। আপনি একটা লাল সিগন্যাল খেয়াল করেননি। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারত।"

"ঠিক বলেছ আবেল, সরি। আসলে কিছু-কিছু এমন জরুরি ফোন আসে, সেটা না ধরলে আরও বড় বিপর্যয় হয়ে যায়। যাকগে, যেটা বলছিলে... ক্রীতদাসের অভাবে প্ল্যানটেশন ধাক্কা খেল। তারপর?"

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে তৃতীয় কিস্তি

জানো প্রিয়তমা, ঐশীর বাবাকে আমার বেশ সহজ-সরল মনের মানুষ বলেই মনে হয়েছে। গল্প করতে ভালোবাসেন। সবচেয়ে বড় কথা ইতিহাস শুনতে বেশ আগ্রহী। তবে ফুলমতীমাঈয়ের ছোটবেলার কথা প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বিহার, উত্তরপ্রদেশের কথা, অর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কথা, জাত-পাতের কথা আমার ঠাকুরমা জানালেন কি করে সেই বিস্ময় কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করার জন্যই একটার পর একটা প্রশ্ন করছিলেন। উনি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না, আমাদের সাত পুরুষের বংশে আমিই প্রথম ভারতে এলাম!

অবশ্য অবাক হওয়ারই কথা। আর অন্যকে বিশ্বাসই বা করাই কীভাবে? আমার ঠাকুরমা জীবনে ভারতে আসেননি। আমাদের পরিবারের কারও বৈবাহিক সূত্রেও ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। সেখানে এক ওলন্দাজ বৃদ্ধা রাতের পর রাত তার নাতিকে ফুলমতীমাঈয়ের রূপকথা গল্পগুলো বলে, ভোজপুরি গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়েছেন। নাতির ভয় করলে অভয় দিয়েছেন ফুলমতীমাঈ আছেন। তারপর সেই নাতি বড় হয়ে উঠলে তাকে ফুলমতীমাঈয়ের সত্যিকারের জীবনের না রূপকথা গল্পগুলো ভেজা চোখে শুনিয়েছেন। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের, সেই ঠাকুরমা নিজেও ফুলমতীমাঈকে কোনদিন চোখে দেখেননি।

যাইহোক, কথায়-কথায় ঐশীর বাবা যখন জানতে চাইলেন, সেই প্ল্যানটেশন সংকটের সময়ের কথা, ট্যাবের গুগল ম্যাপে দেখলাম আর মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে হোটেলে পৌঁছে যাব। অত অল্প সময়ে কতটুকুই বা বলা যায়! বলতে গেলে তো শুরু করতে হবে হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ আর তার চিরশত্রু আলডার্ট বুগার্ড-এর সময় থেকে।

এই সূত্রটা এবার না বললে তুমিও ধরতে পারবে না ফুলমতীমাঈয়ের জীবনের পরের বাঁকগুলো কবে, কেন, কীভাবে এসেছিল।

॥ ৩ ॥

১৮৭১ সাল।

আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্বে ডাচ গায়ানায় এক আখের খেতের মধ্যে দিয়ে দুলকি চালে ঘোড়ায় চেপে চলেছেন আলডার্ট বুগার্ড। আলডার্ট বুগার্ডের এটা প্রাত্যহিক ভ্রমণ। আজকাল কখনও-কখনও মেয়ে এমিলিকে নিয়েও সকালে ঘুরতে বেরোন। যুবতী এমিলি সবে ঘোড়ায় চাপতে শিখেছে। অধিকাংশ দিন নিজের ঘোড়ার পিঠে বাবার পাশে থাকে।

আজকে অবশ্য এমিলিকে আনেননি আলডার্ট বুগার্ড। এমিলি সঙ্গে থাকলে তাও কথা বলতে বলতে মন খানিকটা অন্যদিকে থাকে। কয়েকদিন ধরে মনের মধ্যে এক গভীর চিন্তা হচ্ছে। আনমনা হয়ে যাচ্ছেন। তারমধ্যেই একা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে চারদিকটা দেখতে-দেখতে গভীর চিন্তার মধ্যে পুরনো একটা দুশ্চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আখের চাষ আর তেমন হচ্ছে কই? যত দিন যাচ্ছে লোকবলের অভাবে চাষ করানোই যাচ্ছে না। চিনি কলগুলোরও তথৈবচ অবস্থা। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হাপিত্যেশ করে বসে থাকে কখন ডাচ-গায়ানার বুগার্ড খামার থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট চিনি আসবে। বছরের পর বছর এটাই হয়ে এসেছে। কিন্তু বছরদশেক আগে আমস্টারডাম থেকে নেওয়া একটা সিদ্ধান্তে গোটা চিত্রই আমূল বদলে গিয়েছে।

ডাচ-গায়ানায় আখ আর কফির চাষ করানো হত আফ্রিকা থেকে কিনে আনা ক্রীতদাসদের দিয়ে। বিভিন্ন দেশে ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপের সঙ্গে আর যুঝতে না পেরে দশ বছর আগে নেদারল্যান্ডকেও একই পথে হেঁটে লোপ করে দিতে হয়েছে দাসপ্রথা। আলডার্ট বুগার্ড-এর তীব্র রাগ হয় আমস্টারডামের রাজনৈতিক নেতাগুলোর ওপর। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় একবারও ভাবল না, ওলন্দাজদের গায়ানার মতো কৃষি প্রধান উপনিবেশগুলোয় এরপর কীভাবে চাষআবাদ হবে।

এসব ভাবনা মাথায় পাক খেতে শুরু করলেই আমস্টারডামের প্রতি ভিতর থেকে তীব্র রাগ বের হওয়ার পাশাপাশি চিন্তা হয় ভবিষ্যতের কথা ভেবে। এভাবে চললে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে নিজের সাজানো বুগার্ড বাংলো ছেড়ে সপরিবার হয় পথে নামতে হবে, না হয় জাহাজে চেপে এই ডাচ গায়ানা দেশটা ত্যাগ করতে হবে।

ঘোড়ায় চড়ে আলডার্ট বুগার্ড নিজের জমির শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এলেন। রোজের মতো দেখলেন উল্টোদিক থেকে ওর মতোই ঘোড়ায় চড়ে নিজের জমির প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে আছে হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ। আলডার্ট রোজই হেনড্রিককে দেখে মনে-মনে হাসেন। বুগার্ড

পরিবার আর ভ্যান ডার বার্গ পরিবারের বহু বছরের পুরনো শত্রুতা আর রেষারেষি সর্বজনবিদিত। এই রেষারেষি আর শত্রুতার উৎস চাষ আর দাস। তার সঙ্গে আছে খুন। কেউ কারওর চেয়ে জমিদারির ঠাটবাঁট মেজাজে কম যায় না। কিন্তু এখন ওই দাসের সমস্যাই সব এলোমেলো করে দিচ্ছে।

হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ এখন চাইছেন বিবদমান সব প্ল্যানটেশন মালিকদের এক ছাতের তলায় এনে একটা সিন্ডিকেট করে আমস্টারডামের ওপর চাপ সৃষ্টি করে একটা সমাধানসূত্র বের করার। হেনড্রিক ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলের আরেক প্রভাবশালী প্ল্যানটেশন মালিক গিলবার্ট ডি জংকে রাজি করিয়ে ফেলেছেন। এখন আপ্রাণ চেষ্টা করছেন আলডার্ট বুগার্ডকে দলে টানার।

আলডার্ট বুগার্ড নিজেও ভেবে দেখেছেন এভাবে ১০ বছর পেরিয়ে গেল। তেমনভাবে কোনও সমাধানসূত্র বেরচ্ছে না। প্রথম-প্রথম ভাবা হয়েছিল যে, আফ্রিকান নিগারগুলোকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হলেও, তারা যেরকম কাজ করছিল, সেরকমই কাজ করবে। চুক্তি করে নিগারগুলোকে যৎসামান্য মাইনে দিতে হবে। সেইমতো ভুলিয়ে-ভালিয়ে কিছু বছর তবু চাষ করানো গিয়েছিল। কিন্তু তারপর? যত দিন যাচ্ছে স্বাধীনতা পাওয়া নিগারগুলো যেন তত সাপের পাঁচ পা দেখছে। যে লোকগুলোর পায়ে শিকল বাঁধা না থাকলে ঠিক মতন হাঁটতে পারে না, পিঠে চাকুক না পড়লে চাঙ্গা হতে পারে না, তারা স্বাধীনতা পেয়ে কী করবে? তাই, যা হওয়ার তাই হয়েছে। দিনে-দিনে নিগারগুলো খেয়ালখুশি মতো কাজ করতে শুরু করেছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাদের কাজ করার কথা, তারা কুঁড়ে হয়ে গিয়ে কাজ ছেড়ে সারারাত ধরে গানবাজনা নাচানাচি করছে আর দিনের বেলায় ঘুমোচ্ছে।

আলডার্ট বুগার্ড নিজেও নানা রকম কৌশল নিয়েছেন। কালো নিগারগুলোকে ফুর্তি করার জন্য টাকা ধার দিয়ে তার সুদ উসুল করতে লোকগুলোকে খেতে আটকে রাখার চেষ্টা করেছেন। তবে সেই কৌশলও বেশিদিন টেকেনি। যতদুর খবর নিয়েছেন, ভ্যান ডার বার্গ আর ডি জংরাও এরকম নানা কৌশল নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই ভ্যান ডার বার্গের এই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাটার হয়তো দরকার আছে। কিন্তু ভ্যান ডার বার্গের এই উদ্যোগ নিয়ে গভীর সন্দেহ আছে আলডার্ট বুগার্ডের মনে। তাঁর দৃঢ় ধারণা, হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ এই ওলন্দাজ উপনিবেশের নেতা হয়ে আমস্টারডামের নজরে পড়তে চায়। যে লোকটার জমির পরিমাণ আলডার্টের অর্ধেক, যার আভিজাত্য বুগার্ডের অর্ধেকেরও কম, তাকে কীভাবে নেতা হতে দেওয়া যায়?

আলডার্ট বুগার্ড আজ আবার হেনড্রিকের তোষামোদ পাওয়ার লোভে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। ভাবখানা যেন একটু বিশ্রাম নিতে নামলেন। একটু আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গি করেও চোরা চোখে নজর রাখলেন হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গের কী প্রতিক্রিয়া হয়।

হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গও খেয়াল করছিলেন প্রভাবশালী ধুরন্ধর বুগার্ডকে। বুড়োটাকে একেবারে পছন্দ করতে না পারলেও এই মুহূর্তে উপেক্ষা করতে পারছেন না। গতবছর বুড়ি বউটা মরে যাওয়ার পর বুড়ো বৃদ্ধ বয়সে আবার এক সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করে তোফা আছে। কিন্তু কিছুতেই বুঝছে না, এরকম তোফা যে আর বেশিদিন থাকা যাবে না। আজকাল আবার লোক দেখিয়ে ওর প্রথম পক্ষের সুন্দরী যুবতী মেয়েটাকে পাশে নিয়ে ঘোড়ায় ঘোরে। মেয়েটা থাকলে কথা বলা যায় না। আজ মেয়েটা নেই দেখে হেনড্রিকও ঘোড়া থেকে নামলেন। তারপর মনের মধ্যে যাবতীয় চিড়বিড়ানি নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকলেন আলডার্টের দিকে।

"গুড মর্নিং মিস্টার বুগার্ড।"

আলডার্ট ঈষৎ তাচ্ছিল্য করে হেনড্রিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও তুমি! মর্নিং।"

"আজকে আপনাকে একা দেখছি?"

"তাতে কি তোমার কোনও সমস্যা হচ্ছে?"

অপমান হজম করে হেনড্রিক কথা ঘুরিয়ে আসল প্রসঙ্গে এলেন, "সমস্যা তো আমার একার নয়। আপনার পরিবার, আমার পরিবার আমাদের সকলের। আপনাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। পেয়েছেন আশা করি।"

আলডার্টের বিলক্ষণ মনে আছে চিঠিটার কথা। তবে সেটা যে নিতান্ত গুরুত্বহীন সেটা বোঝাতে একটু চিন্তা করার ভান করে বললেন, "হ্যাঁ, একটা চিঠি তোমার পেয়েছিলাম বটে। কিছু একটা মিটিং এর প্রস্তাব করেছ তুমি। আসলে বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত আছি এখন। দুঃখিত। একটা উত্তর দেওয়া উচিত ছিল আমার। সময় করে উঠতে পারিনি।"

হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গের চোয়াল শক্ত হল। বুড়োর তাচ্ছিল্য করার স্বভাব গেল না। চিঠিতে যথাসম্ভব গুছিয়ে সব ব্যাপার লিখেছিলেন। সেই চিঠি পড়ে মনে না রাখার কথাই নয়। আর কিসের ব্যস্ততা দেখাচ্ছে আলডার্ট বুগার্ড? আখের চাষ, চিনির ব্যবসা সব যখন লাটে উঠতে বসেছে তখন আর কিসের ব্যস্ততা? তবে এখন মাথা গরম করার সময় নয়। যা কিছু করার ঠান্ডা মাথায় অঙ্ক করে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে করতে হবে।

হেনড্রিক একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "বুঝতে পারছি আপনি ব্যস্ত মানুষ। আপনার এত বড় প্ল্যানটেশনে অনেক সমস্যা। সেসব নিয়ে সবাই মিলে আলোচনা করতেই তো আপনাকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে আগামী রবিবার পারামারিবো ক্লাবে একটা মিটিং-এ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আপনার মতামত গুরুত্বপূর্ণ হবেই বলে মনে হয়েছিল আমার।"

আলডার্ট একটা সিগার ধরিয়ে বললেন, "মানে আমার পরামর্শ চাও, তাই তো? আমি আমার পরামর্শ তোমাদের অনেক আগেই জানিয়েছি। আমস্টারডামে রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের কাছে আবেদন পাঠাও। বলো, আমাদের দেশের চিনি আর কফির সুনাম এবং অর্থনীতির স্বার্থে ক্রীতদাস থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। সুতরাং ক্রীতদাস প্রথাটা ফিরিয়ে আনা উচিত।"

হেনড্রিক মনে-মনে বললেন, "মুর্খ!" বুড়ো কোনও কিছুর খবর রাখে না। অনেক কিছুই ইতিমধ্যে হতে চলেছে। মুখে বললেন, "আমার ভাইপো সম্প্রতি লন্ডন থেকে ফিরে এসেছে। ও বেশ কিছু জরুরি খবর নিয়ে এসেছে।"

"কে মার্কাস? বেঞ্জামিন আর সোফি খুন হওয়ার পর যাকে লন্ডনে ইংরেজি শেখাতে পাঠিয়েছিলে?" আলডার্ট অর্থপূর্ণ তির্যক হাসলেন।

"সেটা জরুরি নয়। জরুরি হচ্ছে ও কী খবর নিয়ে এসেছে।"

"আমার কাছে লন্ডন না গিয়েও অনেক খবর থাকে।"

দাঁতে দাঁত চেপে হেনড্রিক বললেন, "কোন খবরের কথা আপনি বলছেন জানি না। তবে আমাদের প্রতিবেশী দেশ দুটো, ব্রিটিশ গায়ানা আর ফ্রেঞ্চ গায়ানা কিন্তু নিজেদের ব্যবস্থা অনেকদিন হল করে ফেলেছে। আর আপনি যদি ভেবে থাকেন রাজা ক্রীতদাস প্রথা ফিরিয়ে আনার কথা পুনর্বিবেচনা করবেন, তাহলে ভুল ভাবছেন। কোনও জাহাজে যদি এখন লুকিয়ে আনা একজন চোরাই ক্রীতদাসও ধরা পড়ে, তাহলে সাংঘাতিক জরিমানা হচ্ছে।"

আলডার্ট নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করতে সিগারে টান দিয়ে বললেন, "স্বাধীনতা যে সবসময় ভালো ফল দেয় তা নয়। ক্রীতদাস থাকবে কি থাকবে না, এই নিয়ে টালবাহানা তো বহুদিন ধরে চলেছে। যেসব দেশ আগেভাগে এই প্রথা তুলে দিয়েছিল তারা কোনও সুফল আজ পর্যন্ত পেয়েছে কি? বরং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অনেক বেশি দূরদর্শী ছিলেন। শুধুমাত্র আমাদের দেশগুলোর কথা ভেবে দাসপ্রথার ওপর আরও জোর দিয়েছিলেন।"

"নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বহু বছর হল সেন্ট হেলেনা দ্বীপে মারা গিয়েছেন। সেই ইতিহাস আর ভেবে কী হবে?"

"তাহলে কার কথা ভাবব? ওই আমেরিকার যে প্রেসিডেন্টের কথা তুমি মাঝে-মাঝেই বলো? আব্রাহাম লিঙ্কন? গৃহযুদ্ধ সামলাতে

গিয়ে আততায়ীর হাতে মরল যে? সে যে একপাল মুক্ত ক্রীতদাসদের পাঠিয়েছিল এদেশে, তাদের দিয়ে কাজের কাজ কিছুই তো হয়নি। তারাও আমাদের পুরনো নিগারগুলোর সঙ্গে মিশে নাচতে-গাইতে আর ঘুমোতে শিখে গিয়েছে।"

হেনড্রিক অধৈর্য হয়ে বললেন, "এসব নিয়ে তর্ক করার সময় এখন নয় মিস্টার বুগার্ড। আমেরিকা তো অনেক দূরের দেশ। পাশাপাশি দেশদুটো দেখুন। ব্রিটিশ গায়ানা আর ফ্রেঞ্চ গায়ানার কথা বলছি। এটা তো অস্বীকার করতে পারবেন না, ওই দেশগুলোতে অনেক আগে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ হয়েছিল। তারই একটা প্রভাব এসে পড়েছিল আমাদের দেশের ক্রীতদাসদের মধ্যে।"

"ব্রিটিশরা হাড় পাজি। গোটা পৃথিবীর রাজা হতে চায়। আমাদের দেশটাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য ওরা চক্রান্ত করছে। অবশ্য তোমাকে আর কী বলব? তোমার পরিবারের ছেলেকে তো লন্ডনে পাঠিয়েছিলে ব্রিটিশ কূটকচালি শিখে আসতে।"

চোয়াল শক্ত করে হেনড্রিক বললেন, "কেন ওকে লন্ডনে পাঠিয়েছিলাম সেই প্রসঙ্গটা নিয়ে কি আপনি আবার আলোচনা করতে চাইছেন?"

প্রসঙ্গটা ঘোরাতে আলডার্ট বুগার্ড বিরক্তি দেখিয়ে আবার তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, "তা, কী শিখে এসেছে তোমার আদরের ভাইপো মার্কাস? সেসব শোনানোর জন্যই কি মিটিং ডেকেছ?"

হেনড্রিক এবার সম্পূর্ণ ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। কঠিন গলায় বললেন, "দেখুন মিস্টার বুগার্ড, ব্রিটিশরা কিন্তু বহুবছর আগে নিজেদের সমাধান বের করে নিয়েছে। আর এই সমাধানের পিছনে ওরা অনেক মাথা লাগিয়েছিল। আফ্রিকান ক্রীতদাসগুলো যখন মুক্তি পেয়েছিল তখন ব্রিটিশরাও আমাদের মতোই ভুগেছিল।"

আলডার্ট হেনড্রিককে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "নতুন কোনও কথা বলছো না তুমি। ৫০ বছরের ওপর হতে চলল ব্রিটিশরা ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু ওরা বারবার বলেছে এই উপমহাদেশগুলোয় আখ চাষ করার জন্য নিগারদের মত উপযুক্ত লোক গোটা পৃথিবীতে আর নেই। বরাবরের ধুরন্ধর ওরা। নিজেদের জন্য ওই নিগারদেরই ভলেন্টিয়ার রিক্রুটমেন্ট ব্যবস্থা করেছে আর এধার ওধার থেকে লোক ধরে এনেছে।"

"ভুল মিস্টার বুগার্ড, ভুল। মুক্ত ক্রীতদাসদের সঙ্গে চুক্তি আমরাও করেছিলাম। ব্রিটিশদের মতো আমরাও সফল হইনি। তারপর ব্রিটিশরা অন্য পন্থা নিয়েছে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি সব খবর রাখেননি।"

আলডার্ট বুগার্ডের আঁতে লাগল। সিগারে লম্বা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে গলা চড়িয়ে বললেন, "তুমি ভুল হেনড্রিক। সব খবর আমার কাছে আছে। তা তুমি এত খবর রাখো, এই খবরটা রেখেছ কি যে ব্রিটিশরা এখন যাদের ধরে নিয়ে আসছে, তারা আমাদের বাপ ঠাকুরদা যেরকম চাষ করিয়ে নিতে পারত সেরকম পারছে কিনা? এসব দেশে এসে থাকাটাই মানিয়ে নিতে পারছে না। ব্রিটিশদের ধান্দাটা ছিল একেবারে আলাদা। নিজেরা ওপর ওপর দাসপ্রথা তুলে দিয়ে অন্যদেশগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করা আর তলে-তলে অন্য ব্যবস্থা করা। কিন্তু পুরো দুর্বুদ্ধি অ্যাটলান্টিকে ডুবেছে। এই নিয়ে স্পেন আর পর্তুগালের সঙ্গে কী একটা চুক্তি করেছিল না ওরা?"

হেনড্রিকের বিরক্তি চরমে পৌঁছচ্ছে। আলডার্ট বুগার্ড বুড়োটা শুধু সাত পুরুষের তীব্র ব্রিটিশ বিরোধীই নয়, একবগ্গা, গোঁয়ার, দুনিয়াদারির কোনও খবর না রাখা একটা কুয়োর ব্যাঙ। নেহাত এই উপনিবেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে সব প্ল্যানটেশন মালিকদের এক হতে হবে বলে এত চেষ্টা করা। কথা না বাড়িয়ে সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এলেন হেনড্রিক, "ব্রিটিশদের সঙ্গে চুক্তি করে আমস্টারডামও চেষ্টা করছে আমাদের এখানে চাষ করার ভালো জাতের শ্রমিক পাঠাবার।"

"ভালো জাত!" আলডার্ট-এর মুখে সিগারটা ঝুলে গেল। অবিশ্বাস্য লাগছে কথাটা। ব্রিটিশরা আবার নতুন কৌশলে নিগারদের নিয়ে আসবে? আবার আখের চাষ, সুগার প্ল্যানটেশনে সুদিন ফিরে আসবে?

হেনড্রিক আলডার্ট বুগার্ড এর চোখমুখে বিস্ময় দেখে বুঝতে পারলেন কাজ হয়েছে। এখন আগ্রহের ভিতটা আরেকটু মজবুত করে দেওয়া দরকার। হেনড্রিক বললেন, "তাই আমাদের প্ল্যানটেশন মালিকদের একসঙ্গে আলোচনায় বসা দরকার। চাহিদা জোগানের অঙ্কটা বুঝে শ্রমিকদের বিলি বণ্টনটা হিসেব করে রাখতে হবে। এই কারণেই আমি পারামারিবো ক্লাবে মিটিংয়ের প্রস্তাব করেছিলাম। মিস্টার ভ্যান ডিক, মিস্টার ডি জং সমেত অধিকাংশ প্ল্যানটেশন মালিকরা আমার সঙ্গে একমত। বাকি আছেন শুধু আপনি। এই কারণেই আগামী রবিবার পারামারিবো ক্লাবে মিটিংয়ে আসার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম।"

আবার এক মুখ সিগারের ধোঁয়া ছড়িয়ে আলডার্ট বুগার্ড বললেন, "পারামারিবো ক্লাবের চেয়ে আমার বুগার্ড বাংলোর বৈঠকখানা অনেক বড়। বাবুর্চিটাও ভালো। উৎকৃষ্ট পানীয় আছে। ভ্যান ডিক, ডি জংদের নিয়ে তুমি আমার বাংলোতেই নিয়ে আসতেই পার।"

হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ আবার চোয়াল শক্ত করলেন। কিন্তু এখন জেদ দেখানোর সময় নয়। দেশের অর্থনীতি বাঁচাতেই হবে। আলডার্ট বুগার্ডকে সিন্ডিকেটের বাইরে রাখলে ভবিষ্যতে অন্য সমস্যা হবে।

আলডার্ট ঘোড়ার পিঠে বাঁধা হোলস্টার থেকে বন্দুক বের করে একটা গাছের দিকে তাক করে ট্রিগার টানলেন। গুড়ুম করে আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে একটা পাখি ঝটপট করে মাটিতে পড়ল।

"আপনার নিশানা অব্যর্থ মিস্টার বুগার্ড।"

বন্দুকের নলে ফুঁ দিয়ে বুগার্ড বললেন, "সন্দেহ ছিল নাকি তোমার?" তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠে জিন টেনে বিদ্রূপের স্বরে বললেন, "পাখিটা তোমার জমিতে পড়ল। নিয়ে নিও, সুস্বাদু। আর হ্যাঁ, যেদিন আমার বাংলোতে আসবে সেদিন তোমার ভাইপো মার্কাসকেও নিয়ে এস। লণ্ডনের জল হাওয়ায় মাতব্বর হয়ে কী শিখল সময় পেলে শুনব।"

আবেল ভ্যান ডার বার্গের ই-ফাইল থেকে চতুর্থ কিস্তি

কিছু নিশ্চয় বুঝতে পারলে প্রিয়তমা! অবশ্য ভ্যান ডার বার্গ আর বুগার্ড পরিবারের মধ্যে শত্রুতা আরও পুরনো। বংশানুক্রমিক বলতে পার। ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনেছি, ভ্যান ডার বার্গ পরিবার নাকি ক্রীতদাসদের দিয়ে রাতের অন্ধকারে বুগার্ডদের চাষ নষ্ট করতে পাঠাত। কিন্তু বুগার্ডদের লোকেরা তাদের ধরে ফেলত এবং অকথ্য অত্যাচার করে মেরে ফেলত। তখন ভ্যান ডার বার্গ পরিবার ওই ক্রীতদাসদের কোনও দায় নিত না। বলত, ওরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এর ঠিক উল্টোটাও হত। তবে শত্রুতা চরমে উঠেছিল হেনড্রিকের দাদা-বউদি বেঞ্জামিন আর সোফি ভ্যান ডার বার্গ এর খুনের পর। এক রাতেই দু'জনে খুন হয়েছিলেন বুগার্ডদের খেতের প্রান্তে আফ্রিকানদের মেরুন কলোনির কাছে।

কী ভাবছ প্রিয়তমা? আমার ভার্চুয়াল ঈশ্বরী ফুলমতীমাঈয়ের গল্পের সূত্র তৈরি করতে বসে খেই হারিয়ে ভ্যান ডার বার্গ আর বুগার্ড পরিবারের গল্পের সূত্রে আটকে আছি কেন? আসলে ফুলমতীমাঈয়ের গল্প বলতে বসলে হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ আর আলডার্ট বুগার্ডের কথা কিছুতেই এড়ানো যাবে না।

ঠিক আছে, আপাতত স্বাদ বদলাতে ইতিহাসের পাতা বন্ধ করে ঐশীর বাবার কথায় ফিরে যাই। তোমাকে বললাম না, মানুষটা বেশ ভালো। ভোজপুরি, হিন্দি ভাষার কয়েকটা শব্দ, কয়েকটা গান জানলেও বাংলা ভাষার একটা শব্দও আমি জানি না। ভাগ্যিস, ঐশীর বাবা আমাকে ভাষাপ্রয়োগ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তবে ওই হোটেলে পৌঁছে দেওয়া বা ছোটখাটো ব্যবহারিক ব্যাপার বুঝিয়ে দেওয়াই নয় ভারতীয়রা যে পরোপকারী, উনি তাঁর উজ্জ্বল উদাহরণ।



ফুলমতীমাঈয়ের দেশে আমি যে রূপকথার নুড়িগুলো খুঁজে দেখতে চাই, উনি তাঁর সমস্ত চেষ্টা করলেন। ব্যস, ঠিক এখানেই জন্ম নিল আরেকটা সূত্রের। সেটা এবার একটু শোনো।

॥ ৪ ॥

"থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ বাপুজি।"

হোটেলের রিসেপশনিস্টের হাত থেকে ঘরের চাবি নিয়ে আবেল বলল।

কৌস্তভ একটু নিশ্চিন্ত হলেন। আবেলের লিস্ট থেকে হোটেলটা উনিই বেছেছেন। ছোট হোটেল। নীচের তলায় রিসেপশন আর একটা রেস্তোঁরা। দোতলা-তিনতলায় থাকার ঘর।

"আপনাকে কি একটু কফি খেয়ে যেতে বলতে পারি বাপুজি?"

কৌস্তভ ঘড়ি দেখলেন। মহাশ্বেতা ইতিমধ্যেই একবার ফোন করেছে, রাত্রিও হচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণ মিশেই ছেলেটার প্রতি একটা টান অনুভব করছেন। ছেলেটা যেভাবে পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট জায়গাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে, সেই জায়গাটার প্রতি একটা টান অনুভব করছে, সেই টানটা নিজের মধ্যেও অনুভব করছেন কৌস্তভ। পূর্বপুরুষরা ছিলেন পূর্ববঙ্গের। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এপারে চলে এসেছিলেন। ঠাকুরমার কাছে কতই তো শুনেছিলেন ওদেশের কথা। ঠাকুরমার সইদের কথা। সেসব গল্প বলার সময় ঠাকুরমার গলায় যেমন আবেগ-উত্তেজনা থাকত, সেরকমই থাকত লুকনো চাপা দীর্ঘশ্বাস, চোখে বাষ্প। চোখ বুজলে দেখতে পেতেন সেও ছিল এক রূপকথার দেশ। পূর্বপুরুষদের যে দেশটা দেখার জন্য মনের মধ্যে খণ্ড-খণ্ড চিত্র লুকিয়ে আছে, বাস্তবে কিন্তু নদীমাতৃক সেই দেশটাকে দেখার জন্য আবেলের মতো এমন খিদে কখনও হয়নি।

"বেশ। চলো। একটু কফি খাওয়া যাক। কিন্তু কফি আমার তরফে।"

রেস্তোঁরা মোটামুটি ফাঁকাই। একটা টেবিলে দু'জন বিদেশি রাতের খাবার খাচ্ছে। খুব ছোট কোঁচকানো চুল আর গায়ের রঙ দেখে নাইজেরিয় মনে হচ্ছে। অন্য একটা টেবিলে দু'জন ভারতীয়। একটু উঁচু গলায় হিন্দিতে কথা বলছে। কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে ব্যবসা সংক্রান্ত কথা।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে আবেলকে আরও ভালো করে বুঝতে কৌস্তভ প্রশ্ন করলেন, "তুমি কী নিয়ে পড়াশোনা করছ? ইতিহাস?"

আবেল হেসে উত্তর দিল, "না বাপুজি। কম্পিউটার সায়েন্স। এখন অগমেন্টেড রিয়্যালিটি নিয়ে কাজ করছি।"

"অগমেন্টেড রিয়্যালিটি?" কথাটা মাঝে-মাঝে এখন শুনতে পান কিন্তু বিষয়টা খুব পরিষ্কার নয় কৌস্তভের কাছে। আজকাল সেমিনারে ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ কথাটা প্রায়ই শোনেন। ডেটা সর্বস্ব পৃথিবী। সেখানে অগমেন্টেড রিয়্যালিটির কথাও খুব হয়। এই সুযোগে সেটা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করলেন, "বিষয়টা কীরকম?"

"রিয়েল লাইফ এনভায়রনমেন্ট আর ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্টকে একসঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। অনেকরকম অ্যালগরিদম ডেভেলপ করে কোডিং করতে হয়।"

"যেমন?"

আবেল একটু চিন্তা করে সহজ উদাহরণ দিল, "যেমন ধরুন কোনও আসবাবপত্রের ক্যাটালগ দেখতে-দেখতে আপনি ভাবলেন সেটা ঘরে সাজালে কেমন দেখতে লাগবে। এখন দেখবেন অনেক অ্যাপ দিয়েই সেটা করা যায়। আপনার ঘরের একটা ছবি মোবাইলে তুললেন, তারপর ক্যাটালগ থেকে একটা একটা করে আসবাবের ছবি ড্রাগ করে আপনার বসার ঘরের ছবির মধ্যে বসিয়ে দেখলেন কেমন মানাবে। বা যেমন ধরুন..." বলতে-বলতে আবেল নিজের ট্যাবটা বের করেও একটু সংযত হয়ে বলল, "আপনি মোবাইল অ্যাপে 'পোকেমন গো' খেলাটা কখনও দেখেছেন বাপুজি?"

কৌস্তভ মাথা নাড়লেন, "না। তবে পোকেমন বলে একটা কার্টুন আছে শুনেছি।"

"ঐশী নিশ্চয় জানে। সময় পেলে কখনও দেখবেন। খুব ইন্টারেস্টিং একটা অগমেন্টেড রিয়্যালিটি গেম।"

"ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ তে ক্লাউড কম্পিউটিং, বিগ ডেটা অ্যানালিসিস, অগমেন্টেড রিয়্যালিটি, স্যাস এসব খুব শুনি। ইন্ডাস্ট্রি ১.০ বুঝেছি সেই শিল্পবিপ্লব যখন যন্ত্রপাতি দিয়ে উৎপাদন প্রথম শুরু হল, ইন্ডাস্ট্রি ২.০ বুঝেছি যখন ব্যাচ প্রসেসিং শিল্পে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনল। তারপর ৩.০, শিল্পে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হল। কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ ব্যাপারস্যাপারগুলো বুঝতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। বলা হচ্ছে আগামীদিনে ডেটাই পৃথিবী রাজত্ব করবে। ডেটা ইজ কিং।"

আবেল হাসল, "ডেটা তো ইতিমধ্যেই রাজ্যপাট শুরু করে দিয়েছে বাপুজি। আপনার হাতের মোবাইলটা দেখুন, আপনার দৈনন্দিন জীবনের সব কাজের সহায়ক কোনও না কোনও অ্যাপ আছে। সে ব্যাঙ্কের কাজই হোক, খাবার অর্ডার করাই হোক, ট্রেন-প্লেনের টিকিট কাটা হোক, ক্যাব ডাকা হোক বা সিনেমা দেখা।"

"ঠিকই বলেছ। তা, অগমেন্টেড রিয়্যালিটি দিয়ে আর কী-কী হবে?"

আবেল একটু চুপ করে উদাস গলায় বলল, "ইতিমধ্যেই ডিজিটাল টুইনের কথা ভাবা হচ্ছে।"

"ক্লোন?"

"ঠিক সেই অর্থে ক্লোন নয়। ধরুন, একটা রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে অবিকল তার ডেটা দিয়ে তৈরি ডিজিটাল যমজ। আসল মানুষটার ধরুন কোনও অপারেশন হবে, তার আগে কম্পিউটারে তার ডিজিটাল টুইনের ওপর ডেটা অ্যানালিসিস করে দেখা সেই অপারেশন কতটা নিঁখুত হবে বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কী হবে? কিম্বা ধরুন, মানুষটা একটা পরিবেশ আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে অন্য পরিবেশে, অন্য আর্থ-সামাজিক অবস্থায় গিয়ে কতটা মানিয়ে নিতে পারবেন।"

"তুমি এরকম প্রোগ্রাম করেছ?"

"আমাদের কলেজের এক প্রজেক্টে ফরমুলা ওয়ান রেসিং কারের একটা ডিজিটাল টুইন বানিয়েছিলাম। তারপরেই মনে হয়েছিল আমার মনের মতো একজন মানুষের ডিজিটাল টুইন কেন বানাতে পারব না? দরকার তো শুধু কিছু ইমেজ, ইমাজিনারি আর ডেটা রেফারেন্সের।"

ব্যাপারটা বোঝা ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে। সায়েন্স ফিকশন মনে হচ্ছে। প্রসঙ্গে ইতি টানতে কৌস্তভ বললেন, "খুব ভাল। তবে এই ডেটা রেভলিউশন, ডিজিটাল যুগেও তোমার পড়াশোনার বাইরে ভারতবর্ষ বিশেষ করে কলকাতা সম্পর্কে এত আগ্রহ দেখে খুব ভালো লাগছে। তোমার সঙ্গে কথা বলে কী মনে হচ্ছে জানো? আমিও যদি দু'দিন ছুটি নিয়ে তোমার সঙ্গে কলকাতা শহরটা দেখতে পারতাম। সত্যি, জন্ম থেকে এই শহরে থাকলাম কিন্তু কোনদিন নিজের মতো করে ঘুরে দেখা হয়নি। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই। জানো, আমার শহরের জাদুঘরটাই দেখা হয়নি।"

"শুধু কলকাতার জাদুঘরই নয়, আপনদের শহরে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের মেরিটাইম মিউজিয়ম আছে। আগেকার দিনের জাহাজ, কলকাতার ঘাট ইত্যাদি নিয়ে অনেক কিছু আছে। পরশু সকালে সেটা দেখতে যাব বলে ঠিক করেছি।"

"তাই! দ্যাখো আমি জানিই না, এরকম একটা মিউজিয়ম আছে।"

আবেল সেই নিষ্পাপ সরল হাসিটা হেসে বলল, "আপনি আমাদের দেশে আসুন। অনেক সুন্দর-সুন্দর মিউজিয়ম আছে।"

আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে কৌস্তভ বললেন, "দেখি। তবে বুঝতে পারছি কলকাতায় তোমাকে শুধু গাড়ি-ড্রাইভার দিলে হবে না। তুমি গঙ্গা দেখতে চাইছ?"

"গঙ্গার ঘাট বাপুজি।"

"হ্যাঁ ঘাট। আমার মনে হচ্ছে তোমাকে একজন গাইড দেওয়া দরকার। উত্তর কলকাতা থেকে রিভার ক্রুজ় করে দক্ষিণের দিকে যেতে পারলেই অনেকগুলো ঘাট তুমি দেখতে পাবে। গাইড ঘাটগুলোর নাম বলে দেবে।"

"সেরকম ক্রুজ এই সময়ে নেই বাপুজি।"

কৌস্তভ বিস্মিত হয়ে বললেন, "তুমি জানো?"

"ইন্টারনেটে খোঁজ নিয়ে দেখেছি। আপনাদের শহরে পুজোর সময়, বিশেষ-বিশেষ কিছু সময় ছাড়া এরকম ক্রুজ পাওয়া যায় না। অন্তত এখন নেই। অবশ্য অনেক ফেরি আছে। ইন্টারনেটে এই ফেরিঘাটগুলোর ছবি দেখতে-দেখতেই আমার জায়গাগুলো নিজের চোখে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। ঘাটগুলোর সঙ্গে অনেক ইতিহাস, গল্প জড়িয়ে আছে বাপুজি। বিশেষ করে খিদিরপুর মেটিয়াবুরুজের কাছে গঙ্গার ঘাট।"

"বাবা!" কৌস্তভের বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, "দাঁড়াও দেখি চেষ্টা করে। ব্যবস্থা করতে পারলে কাল সকালে এখানে গাড়ির সঙ্গে কাউকে পাঠিয়ে দেব, যে তোমাকে সকালের দিকে ঘুরিয়ে কয়েকটা গঙ্গার ঘাট দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারবে।"

"অনেক ধন্যবাদ বাপুজি।"

"আরও একটা কথা আবেল। তুমি ছেলেমানুষ, বিদেশি। দুম করে কাউকে বিশ্বাস করে ফাঁদে পড়ে যেও না। টাকাকড়ি, টিকিট-পাসপোর্ট সাবধানে রাখবে। তুমি ডিনার করে নাও। আমি উঠি আজকে। ঐশীর ফোন নম্বর তো তোমার কাছে আছে। কোনও প্রয়োজন হলে জানাবে।"

কফিটা শেষ করে দাম মিটিয়ে আবেলের কাছে বিদায় নিয়ে কৌস্তভ হোটেলের বাইরে এসে গাড়িতে ওঠার আগে একটা সিগারেট ধরালেন। আবেলের জন্য কিছু করতে চাওয়ার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে জোরালো হয়ে উঠেছে। যেরকম কথা দিয়েছেন, অফিসের ট্রাভেল এজেন্সিকে ফোন করে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটা গাড়ি বুক করলেন। তারপর একটু ভেবে নিয়ে অফিসের সহকর্মী অর্জুনকে ফোন করলেন। ছেলেটা প্রচুর খোঁজ-খবর রাখে।

"অর্জুন, সরি এত রাতে ফোন করছি।"

"না, না স্যার। বলুন না।"

"আসলে একটু দরকার ছিল। আমার মেয়ের এক বন্ধু... বন্ধু মানে কিছু ছেলেমেয়ে ওদের কলেজের একটা স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে হল্যান্ড থেকে এসেছিল, তাদের মধ্যে একটি ছেলে কলকাতা দেখবে বলে কয়েকদিনের জন্য রয়ে গিয়েছে। সদর স্ট্রিটে নিউ মোনালিসা হোটেলে উঠেছে। ট্রাভেলসকে বলে কাল সকালে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। ড্রাইভার দিলীপকে দিতে বলেছি। তবে সঙ্গে একজন গাইড খুঁজছি বুঝেছ। ছেলেটির খিদিরপুর ডক, গঙ্গার ঘাট, জাহাজ, এইসব দেখার ইচ্ছে। আছে কেউ সেরকম জানাশোনা? জায়গাগুলো একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতে পারবে?"

অর্জুন কখনও ঊর্ধ্বতন কাউকে নেতিবাচক বলে না। কিছু না ভেবেই কৌস্তভকে আশ্বস্ত করল, "দেখছি স্যার।"

"তুমি একবার কার একটা কথা বলেছিলে না? ক্লক টাওয়ার থেকে হেরিটেজ ওয়াক করায়।"

দিশাটা কৌস্তভ দেখিয়ে দিতে অর্জুন একটু চিন্তা করে বলল, "আপনি ওই যে কী সাম দাশগুপ্তর কথা বলছেন কি স্যার?"

"হতে পারে। নাম মনে নেই। দ্যাখো না একটু।"

"দেখছি স্যার। ফোন নম্বরটা আছে বোধহয় আমার মোবাইলে। আপনাকে জানাচ্ছি। কলকাতায় যদি থাকে ঠিক রাজি করিয়ে দেব। আর না থাকলেও কাউকে না কাউকে ঠিক জোগাড় করে দেব। চিন্তা করবেন না স্যার, হয়ে যাবে। একটু রাতে আপনাকে ফোন করলে অসুবিধে নেই তো?"

"না, না। একটু সিরিয়াসলি দ্যাখো। আর শোনও, ওর পারিশ্রমিকটা আমি দিয়ে দেব। একটু কম করে করতে বলো। গাড়ি তো থাকবে, বেশি হাঁটা নয়। কয়েকটা বেছে-বেছে ঘাট দেখিয়ে

দেবে। একবেলায় যতটা হয়।"

"বুঝতে পেরেছি স্যার।"

"থ্যাঙ্ক ইউ," সিগারেট টান দিয়ে ফেলে গাড়িতে উঠে পড়লেন কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়।

ফুটপাথে ল্যাম্পপোস্টের চেয়ে একটু দূরে আবছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মিতালির মুখে একটা ছোট্ট হাসি খেলে গেল। রাত যত বাড়ে, মাথার মধ্যে অ্যান্টেনাগুলো তত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। লোকটা গাড়ি করে এল। সাহেব ছেলেটাকে নিয়ে লটবহরসুদ্ধ হোটেলে ঢুকল। তারপর বেরিয়ে যাওয়ার সময় সিগারেট খেতে-খেতে কাকে একটা গলগল করে সব কথা উগড়ে দিয়ে গেল। অপূর্ব। কথাগুলো ভেঙে ছোট-ছোট তথ্য করে নিলে প্রত্যেকটা তথ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাহেব ছেলেটা হল্যান্ডে থাকে। সঙ্গে মালপত্র মানে বড় একটা র‍্যাকস্যাক। আর গিটারের বাক্স। ছেলেটা খিদিরপুরের ডক আর গঙ্গার ঘাট দেখতে চায়। ছেলেটার জন্য কাল সকালে একটা গাড়ি ঠিক হয়েছে। চাই আরেকজন গাইড। গোটা রাত পড়ে রয়েছে। আর এই শহরে মিতালি পালের চেয়ে বড় গাইড আর কে আছে?

আবছায়া অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এল মিতালি। আস্তে-আস্তে ফুটপাথ ধরে এগিয়ে এল নিউ মোনালিসা হোটেলের সামনে। হোটেলের রেস্তোঁরাটার রাস্তার দিকে কাচের দেওয়াল। কাচের দেওয়ালের ওপারে দেখা যাচ্ছে একটা টেবিলে দুটো নিগ্রো বসে খাচ্ছে, আরেকটা টেবিলে দুটো লোক বসে মদ খাচ্ছে। ছেলেটা একাই বসে একটা টেবিলে। সামনে একটা সুপের বাটি। কিন্তু ছেলেটার খাওয়ার দিকে মন নেই। একটা ট্যাব মুখের সামনে খুলে খুটুর-খুটুর করছে।

হোটেলের গেটের দিকে পা বাড়াল মিতালি। যথারীতি প্রথমেই পথ আটকাল সিকিওরিটির লোকটা, "কী রে? কে ডেকেছে?"

ভিতর থেকে যদি ডাকের ব্যবস্থা থাকে এই গুঁফো কুতকুতে চোখের লোকটার কোনও সাধ্য নেই ওকে আটকানোর। কিন্তু এই শিকার তো নিজেকেই ধরতে হবে। লোকটাকে যেভাবে ম্যানেজ করে, সেভাবেই আজকে করল। চোখ মটকে একটা ইশারা করল। দু'পয়সা মাইনে পাওয়া লোকটার পুরুষাঙ্গ শক্ত করে দেওয়ার জন্য ওই চোখের মটকানিই যথেষ্ট। লোকটার চোখমুখই পাল্টে গেল। কিছু বলতে পারল না।

হোটেলের ভিতরে ঢুকে প্রথমে রিসেপশন পড়ে। মিতালির মনে একটা ধুকপুকুনি হচ্ছিল। রিসেপশনে কে আছে? ওই টাক মাথা ভুঁড়িওয়ালা লোকটা নাকি ক্যাবলা কার্তিক ছেলেটা? দূর থেকে দেখেই মনটা হালকা হয়ে গেল। ক্যাবলা কার্তিক ছেলেটা আছে। ভুঁড়িওয়ালা লোকটা বিনা পয়সায়, বিছানায় অনেক পিষেছে। তবু কেস পেলে চোখ রাঙায়। আবার কেসের শেষে বখরাও চায়। ক্যাবলা কার্তিকের কোনওটার সাহস নেই। তবে চোখ দিয়ে যেভাবে শরীর চাটে একবার বিছানায় তুলতে পারলে সারা জীবন গোলাম হয়ে থাকবে।

শার্টের দুটো বোতাম খুলে বিভাজিকাটা বিপজ্জনক ভাবে স্পষ্ট করে রিসেপশন ডেস্কের ওপর দুটো টোকা মেরে চুইংগাম একটু বেশি চিবোতে-চিবোতে মিতালি বলল, "হাই!"

ক্যাবলা কার্তিক ছেলেটা কম্পিউটর মনিটর থেকে চোখ তুলে এক ঝলক মুখের দিকে তাকিয়ে সোজা বুকের দিকে তাকাল। তারপর টাইয়ের নট ঠিক করতে-করতে বলল, "ও তুমি।"

চুইংগাম চিবোতে-চিবোতে জিভ বের করে ওপরের ঠোঁটটা চেটে মিতালি বলল, "ভিতরে যাচ্ছি। বলে গেলাম। পেমেন্ট পেলে কমিশন দিয়ে যাব।"

ছেলেটা কিছু বলতে পারল না। টাইয়ের নট টানটানি করে এপাশ-ওপাশ করল। মিতালি আপনমনে হাসল। এই হোটেলের টেকো বুড়ো, ছোট পুরুষাঙ্গের ভুঁড়িওয়ালা লোকটাকে বিনে পয়সায় ব্যবসার খাতিরে শরীর অনেকবার দিয়েছে। শুধু রগড়ের জন্য এই ক্যাবলা কার্তিককেও একদিন বিছানায় নিতে হবে।

রেস্তোঁরার দরজাটা ঠেলে ঢুকে সময় নষ্ট না করে সরাসরি লক্ষ্যের সামনে এসে দাঁড়াল মিতালি।

"হাই!"

আবেল ট্যাব থেকে মুখ তুলে তাকাল। কালো জামা আর নীল জিনস পরা এক ঝকঝকে শ্যামলা যুবতী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নরম স্বরে আবেল প্রত্যুত্তর করল, "হ্যালো।"

"আমি কি এখানে একটু বসতে পারি?"

আবেল চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল অনেক টেবিলই ফাঁকা। তবু মেয়েটা ওর সঙ্গে বসতে চাইছে। একটু নির্লিপ্ত গলায় বলল, "ওকে।"

মিতালি একটু ঝুঁকে বসল যাতে বিভাজিকা আরও গভীর থাকে। স্তন দুটো আরও সম্মোহনী হয়। এই লাইনে একটু জাতের খদ্দের ধরতে এক অ্যাংলো মেমসাহেবের কাছে 'স্পোকেন ইংলিশ'-এর কোর্স করে নিজের চেষ্টায় ঘষে-মেজে ইংরেজি ভাষাটা ভাল রপ্ত করে রেখেছে যাতে, কালো চুলের টাকা আর সোনালি চুলের ডলারের মধ্যে দ্বিতীয়টাকেই ইংরেজি কপচিয়ে প্রাথমিকভাবে ধরতে পারে। পরে সব ভাষাই তো এক। শীৎকারের ভাষা।

"থ্যাঙ্ক গড! ডিনার করার সময় কারওর সঙ্গে কথা বলার একজন পেলাম। তুমি কি ডিনারের অর্ডার করে দিয়েছ?" মিতালি জিগ্যেস করল।

"হ্যাঁ," আবেল অবাক চোখে মিতালির দিকে তাকিয়ে বলল।

"গুড। অ্যায়াম রোজি," মিতালি হাতটা আবেলের দিকে বাড়াল।

"আয়্যাম আবেল।"

আবেল আলতো করে হাতটা ছুঁতেই মিতালি শক্ত করে চেটো ধরে চেষ্টা করল আবেলের তালুতে যথাসম্ভব উষ্ণতা ঢেলে দেওয়ার। তারপর গলাকে মোহিনী করে বলতে থাকল, "আসলে আমার একা-একা খেতে ভাল লাগে না। রেস্তোঁরাগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং জায়গা। খেতে এসে কত নতুন-নতুন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হয়। এই রেস্তোঁরাতেই আমার কত বন্ধু হয়েছে! এই তো গত সপ্তাহে কানাডার এক মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। মেয়েটার সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে, ও বায়না ধরল আমার সঙ্গে এই শহর ঘুরে দেখবে। শপিং করবে। ছুটি নিতে হল একদিন।"

আবেল খেয়াল করল উগ্র মেয়েটা খেতে এলেও অর্ডার করেনি কিছু। নিজের মতো একতরফা কথা বলে যাচ্ছে। মেয়েটার চোখে একটা বিষণ্ণ ক্লান্তি আছে। নিছক কথা বলার জন্যই আবেল জিগ্যেস করল, "তুমি কি এই হোটেলেই উঠেছ?"

মিতালি দ্রুত পুরুষমানুষের মুখের অব্যক্ত ভাষা, শরীরের চাহিদা পড়ে নিতে পারে। এই ছেলেটার মুখে কাঙ্খিত সেই রেখাগুলো এখনও ফুটে ওঠেনি। তবে প্রশ্নটা অর্থবহ। একে আরও একটু বুঝতে হবে। চুলটা ঝাঁকিয়ে মিতালি বলল, "হ্যাঁ। ওই শুধু রাতে শোওয়ার জন্যই। কাজের বাইরে যতক্ষণ পারি আমি এই শহরে ঘুরি। এত কিছু দেখার আছে!"

"ঠিক।"

মিতালি চোখ ছোট করে আবেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, তুমি কি হল্যান্ডের ছেলে?"

আবেল খুব আশ্চর্য হল। একজন ইউরোপীয়র মুখ দেখে মেয়েটা নির্ভুল বলে দিতে পারল কোন দেশের!

"তুমি কী করে অনুমান করলে?"

মিতালি চোখ মটকে হাসল, "ঠিক। মিলে গেল তো। জানো, আমার বিদেশি বন্ধুদের সঙ্গে প্রথম আলাপেই আমি বলে দিই, সে কোন দেশের। শুনে ওদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। বলে তুমি কি ভারতীয় জ্যোতিষবিদ্যা জানো? আসলে আলাদা-আলাদা দেশের মানুষের চেহারায় আলাদা-আলাদা ফিচার্স আছে। মন দিয়ে স্টাডি করলেই বোঝা যায়। আমি দেখেছি হল্যান্ডের ছেলেরা খুব সুদর্শন আর ভালো বন্ধু হয়। আচ্ছা, আমরা কি বন্ধু হতে পারি? নাকি

আমরা এতক্ষণে বন্ধু হয়েই গিয়েছি?"

"ঠিক আছে, আমরা বন্ধু।"

"থ্যাঙ্ক ইউ," ঠোঁট ছুঁচলো করে মিতালি বলল, "তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব উদ্‌যাপন করতে একটা ড্রিঙ্ক নেওয়া যাক।"

"সরি। আমি আসলে মদ খাই না।"

মিতালি একটু মিইয়ে গেল। ছেলেটা মদ খায় না! খেলে হয়তো কাজটা একটু সহজ হত। এমনিতেই ছেলেটার মুখে এখনও কামভাব ফুটে ওঠেনি। কপালে বিজবিজে ঘামের দানাও নেই। একটু-একটু করে চেষ্টা করতে হবে। দু'দিন ধরে কোনও খদ্দের নেই। এর সঙ্গে অন্যভাবে খেলতে হবে।

"ঠিক আছে কোনও ব্যাপার নয়। চলো আমরা গল্প করি। কেমন লাগছে আমাদের শহর?"

"খুব ভালো। অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল ভারতবর্ষ দেখব। ফুলমতীমাঈয়ের দেশ," আবেগে আচমকা বলে ফেলল আবেল।

"ফুলমতীমাঈ?" মিতালি অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল। এই নামের কোনও দেবী বা গুরুমার কথা শোনেনি।

আবেল নিজেকে একটু সামলে নিল। আবেগে ফুলমতীমাঈয়ের নামটা মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "তুমি তোমার ডিনার অর্ডার করলে না?"

সেই কোন দুপুরে ভাত-ডাল খেয়েছে। তারপর পেটে আর কিছুই পড়েনি। ছেলেটা যদি ডাকে কিছুমাত্র সাড়া দিত ওর পয়সায় রাতে মদ আর খাবারটা হয়ে যেত। এখন খালি পেটেই ছেলেটাকে সামলাতে হবে।

"আসলে আমি একটু দ্বিধায় ছিলাম রাত্রে আর ডিনার করব কি করব না! সন্ধেবেলায় হাবিজাবি এতকিছু খেয়েছি যে পেট একদম ভর্তি। জাঙ্ক ফুড আমি একদম অপছন্দ করি কিন্তু আজ খেয়ে ফেলেছি। তবু অভ্যাসের বসে এখানে এলাম। আর এসেই তোমার মতো বন্ধু পেয়ে গল্প করতে-করতে মনে হচ্ছে আর না খেলেও হবে। জাস্ট একটা বিয়ার নিয়ে একটু গল্প করলে তুমি কি কিছু মনে করবে?"

"না। নিতে পার। তোমার ইচ্ছে।"

বড্ড কাঠ-কাঠ কথা বলছে ছেলেটা। যেভাবেই হোক লাইনে আনতে হবে। মিতালি রেস্তোঁরার মধ্যে একবার চোখ বোলাল। ওয়েটাররা সবাই চেনা। ভাগ দিতে হয় ওদেরও। কায়দা করে হাতটা একটু তুলে বলল, "এক্সকিউজ় মি।"

শিউচরণ এগিয়ে এল। মিতালি কায়দা করে বলল, "ওয়ান বিয়ার প্লিজ়।"

শিউচরণ অল্প হেসে চাপা গলায় বলল, "সেটিং হো গাই ক্যা?"

"ঘর পে।"

ফুলমতীমাঈয়ের ভাষা। ভাষাটা যে বুঝতে পারল সেটা বুঝতে দিল না আবেল। মিতালি মেকি বিরক্তি দেখিয়ে বলল, "বুঝেছ, এই এক নিয়ম আমাদের দেশে। একটু রাত্রি হলেই বার বন্ধ। রেস্তোঁরায় আর মদ পরিবেশন করবে না। আচ্ছা, বিয়ারটা যদি তোমার ঘরে দিতে বলি? বিয়ারটা খেতে-খেতে আমরা একটু আড্ডা দিয়ে তারপর ঘুমোতে যাব।"

অবেল এক মুহূর্ত ভাবল। কলকাতা শহরটাকে ঘুরে দেখার জন্য খুব অল্প পুঁজিই আছে। তবুও বলল, "ঠিক আছে। ওয়েটারকে তাহলে বলে দাও, বিয়ারের দামটা আমার হিসাবের মধ্যে রাখতে।"

মিতালির মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল।

আবেল ভ্যান ডার বার্গের ই-ফাইল থেকে পঞ্চম কিস্তি

রোজ়ি ওরফে মিতালি।

টেসেল আইল্যান্ডে সমুদ্রের ধারে তোমার কোলে মাথা দিয়ে ওর ছবিটা যখন ট্যাবে দেখাব তুমি আমার মাথাটা তুলে দিয়ে চোখ পাকাবে নাকি? প্লিজ় প্রিয়তমা, মিতালির কথাও তোমাকে ধৈর্য ধরে শুনতে হবে।

মেয়েটা আমার ডাইনিং টেবিলে উল্টো দিকের চেয়ারে বসার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বুঝে গিয়েছিলাম ও হচ্ছে কল গার্ল। অনেকটা ব্যাঙ্কক বা ফুকেতের রাস্তার ধারে পাবের মেয়েদের কথা যেমন শুনেছি সেরকম। যারা যেচে পড়ে আলাপ করে অন্যের পয়সায় বিয়ার খেয়ে আরও গভীরে টেনে নিয়ে যেতে চায় সেরকম কল গার্ল। এটা তো ভীষণ চেনা ফাঁদ! ট্রিপ অ্যাডভাইসরের ব্লগে এই হোটেলের রিভিউয়ে বলা আছে। ঐশীর বাবা প্রকারান্তরে সাবধান করে গিয়েছিলেন। তবু আমি রাজি হয়েছিলাম। শুনে খুব আশ্চর্য হবে, তাই না? জানি, জেনেশুনে একজন কল গার্লের ফাঁদে পড়তে যাচ্ছি, এটা পড়ে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে কেউ যদি আশ্চর্য হয়, সেটা হবে তুমি! আসলে সেই মুহূর্তে আমার মাথার মধ্যে কেউ যেন বলছিল, রিয়্যালিটি, রিয়্যালিটি। ফুলমতীমাঈয়ের দেশে নানা মানুষ চেনার এই সুযোগ হাতছাড়া করও না আবেল। ডেটা, ডেটা, অসংখ্য ডেটা দরকার তোমার।

তোমাকে একটু সাসপেন্সে রেখে এই রিয়্যালিটির গল্পটা আপাতত একটু মুলতুবি রেখে বরং মনে হচ্ছে হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ আর তার ভাইপো মার্কাস ভ্যান ডার বার্গের যে গল্পটা শুরু করে ইতিহাসের পাতাটা মুড়ে বন্ধ করে রেখেছিলাম, সেটা খুলে ইতিহাসটাকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যাই। প্রায় দেড়শ বছর আগের সেই দিনটা থেকে আবার শুরু করি। যেদিন ওলন্দাজ গায়ানার এক শুকনো আখের খেতে ঘোড়ার জিন টেনে আলডার্ট বুগার্ড বিদ্রূপের স্বরে হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গকে বলছিলেন, বুগার্ড বাংলোতে মিটিং এর দিন মার্কাসকেও নিয়ে আসার কথা। হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গও রাজি হয়েছিলেন।

আমার কী মনে হয় জানও প্রিয়তমা? এই প্রস্তাব আর রাজি হওয়াটাই হলো আমার জন্মলগ্ন। ঈশ্বর সেদিন সেটা মুচকি হেসে অনুমোদন করেছিলেন। আর তারপরে ঈশ্বর ভারতবর্ষের এক প্রত্যন্ত দোপোহোরি গ্রামের শিশুদের কবরস্থানে গভীর অবসাদ নিয়ে বসে থাকা দশ বছরের ফুলুয়াকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন আমার জন্য ফুলমতীমাঈ হয়ে ওঠার প্রস্তুতি নিতে।

আবার বোধহয় তোমাকে গুলিয়ে দিলাম। আচ্ছা, পরে বুঝিয়ে বলছি। আপাতত মাথায় ইতিহাসের যে সূত্রটা সেজে আছে সেটা লিখে নিই।

হেনড্রিক তখন যে কোনও মূল্যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যানটার্সদের সঙ্গে মিটিং করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তার জন্য চিরশত্রু বুগার্ড বাংলোতে যেতেও আপত্তি ছিল না। তাচ্ছিল্য বা বিদ্রূপই হোক, মার্কাসকে সেই মিটিং এ নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব পেয়ে নিজের হাতটাই যেন আরও শক্ত হয়ে উঠেছিল। ঝকঝকে স্মার্ট যুবক মার্কাসের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, শান্ত হয়ে যুক্তি শানিয়ে কথা বলতে পারত। তবুও মিটিংয়ে কীভাবে পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে হবে হেনড্রিক তার তালিম দিতে শুরু করেছিলেন ভাইপোকে। চারদিক থেকে নানা তথ্য জোগাড় করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। আর বারবার শিখিয়ে দিয়েছিলেন, বাবা মায়ের খুনি হিসেবে সন্দেহের তালিকায় এক নম্বরে থাকা বুগার্ডের বিরুদ্ধে জমে থাকা আক্রোশকে যেন কয়েক ঘন্টার জন্য ভুলে থাকে মার্কাস।

তারপর এলো বুগার্ড বাংলোতে প্ল্যানটেশনে মালিকদের মিটিংয়ের দিন।

॥ ৫ ॥

শেষ পর্যন্ত আলডার্ট বুগার্ডের জেদ বজায় থাকল। পারামারিবো ক্লাবে প্ল্যানটার্সদের মিটিং না হয়ে আলডার্ট বুগার্ডের বাংলোতেই হওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বুগার্ড বাংলোটা অন্য প্লান্টারদের বাংলোর তুলনায় ঈষৎ বড়। ছোট একটা টিলার ওপর দোতলা বাংলো। দোতলায় একটা সাজানো বারান্দা আছে। আলডার্ট সেখানে একটা

আরামকেদারায় বসে এককালে চুরুটে টান দিয়ে, চারদিকে নিজের আখের খেতের দিকে তাকিয়ে ক্রীতদাসদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখে চোখের আরাম পেতেন। বেশ কয়েক বছর সেই আরাম আর নেই। দিনে-দিনে আখ চাষ কমে যাচ্ছে। আজ কিন্তু আবার সেই পুরনো চোখের আরামটা ফিরে পেলেন, যখন দেখতে পেলেন ঘোড়ায় চড়ে অন্য প্ল্যানটার্সরা টিলার ওপর ওর বাংলোর দিকে আসতে বাধ্য হচ্ছে।

আলডার্ট জানতেন হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ সবাইকে নিয়ে আসবেই। কারণ এই উদ্যোগটা ওরই। সন্দেহ ছিল ভ্যান ডিক আর ডি জংদের নিয়ে। মিটিং হচ্ছে বুগার্ড বাংলোতে। অথচ আলডার্ট নিজে লোক পাঠিয়ে ওঁদের কোনও আমন্ত্রণই জানাননি। যাকে যা বলার হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গই বলেছে। ঠিক যেন নিজের পোষা সেক্রেটারির মত কাজ করছে চিরশত্রু লোকটা।

আলডার্ট বুগার্ডের আর্থিক অবস্থা আগের মতো নেই ঠিকই। চিনির খামার থেকে আয় অনেক কমে গিয়েছে। কিন্তু আজকের মিটিংয়ের আয়োজনের কোনও কার্পণ্য করেনি আলডার্ট। শুধু সেরা পানীয় আর সেরা খাবারের বন্দোবস্তই নয়, নিজের সেরা স্যুট পরে সেরা চুরুটের বাক্স নিয়ে বাংলোর বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছেন।

এমন সময় পিছন থেকে দুটো নিটোল ফর্সা হাত কাঁধের ওপর দিয়ে আলডার্টের বুকের ওপর পড়ল। পিঠে লিজ়ার স্তনের স্পর্শ পেলেন। মেয়েটা যেন বয়সটাকে বাঁক ঘুরিয়ে যৌবনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আলডার্টের মাঝে-মাঝে আপসোস হয়। বড্ড বেশিদিন অপেক্ষা করেছেন প্রথম স্ত্রী লরেনের মৃত্যুর পর। লিজ়াকে অনেক আগেই বিয়ে করা উচিত ছিল। লিজ়ার হাতে কয়েকটা চুম্বন দিয়ে হাতটা ধরে সামনে টেনে এনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন আলডার্ট। কি অপূর্ব সেজেছে আজ লিজ়া। প্রসাধনে মুখের সৌন্দর্য হাজার গুণ বেড়ে গিয়েছে। আঁটোসাটো গাউন আর চুলের বাহার পাগল করে দিচ্ছে।

"তোমার আজকের এই এত সাজ কি অতিথিদের জন্য? এই রূপ, এই সাজ কিন্তু ওদের দেখার জন্য নয়। হলফ করে বলতে পারি যতগুলো ছোটলোক আজ আসছে, তারা প্রত্যেকে আজ রাত্রে স্বপ্নে তোমাকে দেখে বীর্যস্খলন করবে।"

"ইস! কেউ যদি কারর স্ত্রী সম্পর্কে এত বাজে কথা বলতে পারে, সে হলে তুমি। আমি কি সেজেছি? তোমার আদরের মেয়ে কি সেজেছে দ্যাখো। কেউ যদি অতিথিদের জন্য তার রূপ দেখাতে সেজে থাকে সে হচ্ছে তোমার মেয়ে।"

আলডার্ট একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, "আর তুমি?"

"আমি আজ ভীষণ খুশি।"

"আমিও। ছোটলোকগুলো দল বেঁধে নতজানু হতে আসছে বলে। যখন আলোচনা হবে তখন একবার দেখো, এই ডাচ গায়ানায় বুগার্ড পরিবারের জায়গাটা কোথায় আর ছোটলোকগুলো আমাকে কীরকম তোষামোদ করে।"

"আমি জানি সেটা। সবসময় শুনতে পাই। গর্দভগুলোর তোমার পরামর্শ ছাড়া গতি নেই। এরপর তো তুমি মিটিং নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে যাবে। তার আগে তোমাকে একটা খুব জরুরি কথা বলার ছিল।"

লিজ়া নিচু হয়ে আলডার্টের কানে একটা চুম্বন দিয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে থাকলেন। আর ক্রমশ বিস্ফারিত হয়ে উঠতে শুরু করল আলডার্টের মুখ। তারপর চোখটা বন্ধ করে নিলেন।

চোখটা খুলে আলডার্ট বুগার্ড দেখলেন টিলা বয়ে ভ্যান ডার বার্গ, ভ্যান ডিক, ডি জংরা বাংলোর সামনে পৌঁছে গিয়েছে। মনটা ফুরফুর করছে। খুব তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করতে শুরু করলেন ওদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার দৃশ্যটা। আরও উপভোগ করছেন হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গের ভাইপো মার্কাসকে নিয়ে আসা।

আলডার্ট ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন লিজ়া নেই। গলা ছেড়ে ডাকলেন, "কোফি।"

এক কৃষ্ণাঙ্গ নিঃশব্দে সামনে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়াতে আলডার্ট কঠিন গলায় বলে উঠলেন, "ওরা এসেছে। কী-কী বলেছিলাম মনে আছে তো?"

বারান্দা থেকে উঠে গিয়ে ঘরের মধ্যে অহেতুক খানিক সময় কাটিয়ে একতলায় বসার ঘরে নেমে এলেন আলডার্ট। প্রথমেই চোখ পড়ল মার্কাসের ওপর। মার্কাসকে শেষ যখন দেখেছিলেন, তখন ছেলেটা কিশোরও হয়নি। এখন ঝকঝকে চেহারার যুবক। হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গের ভাইপোকে নিয়ে শ্লাঘা আছে। তবে প্রকাশ্যে তাচ্ছিল্য দেখালেও আলডার্ট বুগার্ডের কৌতূহল আছে, ছেলেটা লন্ডন থেকে কী শিখে এলো জানার।

কেউ-কেউ আলডার্টকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। হেনড্রিকও। অগ্রজকে সম্মান জানাতে মার্কাসেরও উঠে দাঁড়ানো উচিত ছিল। কিন্তু মার্কাসের ভিতরে তখন রাগ গনগন করছে। এই লোকটা এক রাত্রে তার বাবা-মাকে খুন করেছে। ইচ্ছে করছে টুঁটিটা এখনই চিপে ধরে। নেহাত কাকা শিখিয়ে এনেছে ভবিষ্যতে অনেক বড় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আজ শান্ত হয়ে থাকতে বলে, নিজেকে সংযত রাখল মার্কাস।

পানীয় নিয়ে মিটিংটা শুরু হল বুগার্ড বাংলোর বৈঠকখানায়। প্ল্যানটার্সদের মধ্যে সবচেয়ে অধৈর্য গিলবার্ট ডি জং। মিটিং এর শুরুতেই গিলবার্ট ফেটে পড়লেন, "অন্য কোনও কিছু ভাবার আগে আমাদের অনতিবিলম্বে কিছু কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এই নিয়ে চারবার হল নিগারগুলো আমার আখের খেত জ্বালিয়ে দিয়েছে। মিস্টার বুগার্ড, আপনি আমাদের মধ্যে অগ্রজ। কিছু একটা ব্যবস্থা ভাবুন।"

খবরটা আলডার্ট বুগার্ডের কাছে ছিল। তবু তাড়িয়ে-তাড়িয়ে খবরটা শোনার জন্য বললেন, "আবার কবে হল?"

"ওই পরশু রাতে। নিগারগুলো মেরুন কলোনিতে মদে চূড় হয়ে হাতে মশাল নিয়ে ওদের ওই উদ্ভট নাচ-গান করছিল। তারপর যথারীতি মশালগুলো আখের খেতে ছুড়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।"

আলডার্ট বুগার্ড আয়েশ করে একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, "এই জন্য আমি বারবার বলছি আমস্টারডামকে কড়া ভাষায় বলতে যে ওদের কালো চামড়ার ওপর চাবুকের ঘা শুকিয়ে যাওয়ার আগে দাস প্রথা আবার ফিরিয়ে আনতে।"

হেনড্রিক শুধু মিটিংয়ের আয়োজনই করেননি, বুগার্ড বাংলোতে এসে নিজের পঞ্চইন্দ্রিয় সজাগ রেখেছেন। দেখতে পাচ্ছেন, বুগার্ড বাংলোতে কিছু কালো দাস-দাসী যথেষ্ট বিনীত হয়ে চুপচাপ কাজ করছে। অর্থাৎ নিজের বাংলোয় কাজ করার জন্য আলডার্ট কিছু বশংবদ কালো মানুষকে নামমাত্র চুক্তিতে ধরে রাখতে পেরেছেন। রাতের অন্ধকারে এই লোকগুলোকে দিয়েই গিলবার্ট ডি জংয়ের খেতে আগুন লাগানোয় আলডার্টের কোনও হাত নেই তো?

রুবেল ভ্যান ডিক পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "দাসপ্রথা বোধহয় আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। দশ বছর হয়ে গেল সব ওলন্দাজ কলোনি থেকে দাস প্রথা উঠে গিয়েছে।"

গিলবার্ট ডি জং আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "উঠে গিয়ে তো আমাদের সমস্যাটা তো তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে। আমরা কি রাজাকে রাজস্ব দিচ্ছি না? আমস্টারডামকে এই সমস্যার দায়িত্ব নিতে হবে।"

আলডার্ট বুগার্ড নিজের মেজাজে ফিরে এসে বললেন, "অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে। আমি বারবার বলছি সে কথা। প্রথমেই যে নিগারগুলো মেরুন কলোনি করে থাকার অধিকার পেয়েছে এখানে, তাদের এ দেশ থেকে ঝাড়ে বংশে দুর করে দিতে হবে।"

হেনড্রিক মুচকি হাসলেন। আলডার্ট যখন তেজের সঙ্গে এই কথাটা বলছেন, তখন টেবিলের ওপর খাবার এনে রাখছে একজন নিগার চাকর।

রুবেল ভ্যান ডিক বললেন, "সবাইকে দূর করে দিলে তো যেটুকু চাষ করার শ্রমিক পাচ্ছি এখন, সেটুকুও পাব না।"

"কেন?" আলডার্ট বুগার্ড হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সেই ব্যবস্থা করার জন্যই তো আমার বৈঠকখানায় হেনড্রিক এই মিটিংটা করতে অনুরোধ করেছে।"

হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। একটাও কথা

না বলে সবার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছিলেন। মার্কাসকেও শিখিয়ে এনেছেন কিছু বলতে না। তবে বুঝতে পারলেন এখনই মুখ খোলার সময়। ব্যাপারটা সবাইকে একটু-একটু করে বোঝাতে হবে। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, "আফ্রিকা নয়। ভাবা হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে শ্রমিক আনার কথা।"

"ইন্ডিয়া!" চোখটা কুঁচকে উঠল আলডার্ট বুগার্ডের, "ইন্ডিয়া মানে তো এশিয়া। বাদামি চামড়া। ব্রিটিশ গায়ানাতে তো ওরা বেশ কিছু বছর ধরে ইন্ডিয়া থেকে শ্রমিক আনছে। নানা সমস্যা হচ্ছে শুনেছি ওদের।"

"দুঃখিত মিস্টার বুগার্ড। আপনার ধারণা কিছুটা ভুল। প্রথম-প্রথম সমস্যা ছিল ঠিকই। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ইন্ডিয়ানরা খেত খামার করায় বিশেষ দক্ষ। ব্রিটিশরা প্রথমে চিন থেকে শ্রমিক এনেছিল। কাজে দেয়নি। অন্যদিকে নিগারদের আর কোনওদিনই পাওয়া যাবে না। যারা এখানে রয়ে গিয়েছে তাদের অবস্থা তো দেখছেনই। মেরুন কলোনি বানিয়ে নিজেদের ফুর্তিতে আছে। ইন্ডিয়ান শ্রমিকদের পাওয়া ছাড়া আমি কোনও বিকল্প দেখছি না।"

"আমি দুঃখিত হেনড্রিক। তোমার দাদা-বউদি নিগারদের হাতে খুন হওয়ার পর তোমার মনোভাব বেশ পাল্টে গিয়েছে। নিগারদের ওপর প্রতিশোধ যদি নিতে চাও, ওদের আবার ক্রীতদাস বানাও। আর তোমার দেওয়ালে টাঙানো চাবুকগুলো থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেল।"

আলডার্টের চোখের দিকে চোখ রেখে হেনড্রিক বললেন, "প্রতিশোধ তো আমি একদিন নেবই মিস্টার বুগার্ড। মরার আগে এই ছেলেটার কাছে নাহলে আমি কি জবাবদিহি করে যাব?"

হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ এরপর মার্কাসকে ইশারা করলেন শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে আসা কথাগুলো বলার জন্য। কাকার শেখানো মত আলডার্ট বুগার্ডের ওপর যাবতীয় রাগ-ঘৃণাকে লুকিয়ে মার্কাস সপ্রতিভ ভঙ্গিতে, পিঠ টান করে বলতে শুরু করল, "শ্রমিক চুক্তি নিয়ে কথা হচ্ছিল। যদি অনুমতি দেন, তাহলে এ ব্যাপারে আমি লন্ডন থেকে যেঁটুকু জেনে এসেছি বলি। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই গোটা পৃথিবীতে ব্রিটিশরাই হচ্ছে এখন সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য। ওরা বলে ওদের সাম্রাজ্যে কখনও সূর্যাস্ত হয় না। কিন্তু এত শক্তিশালী সাম্রাজ্য হয়েও ৩৮ বছর আগে নানা চাপে পড়ে ওরা ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম বলব। স্যার জন গ্ল্যাডস্টোন। জন গ্ল্যাডস্টোনের ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ব্রিটিশ গায়ানায় বিপুল পরিমাণ কফি আর চিনি চাষের খেত ছিল। অন্যদিকে তার ছিল বিশাল এক ক্রীতদাস কেনাবেচার ব্যবসা। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এমপি-ও ছিলেন। ক্রীতদাসপ্রথা বিলুপ্ত করার জন্য ব্রিটিশ রাজতন্ত্র তাকে বিপুল পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেয়। কিন্তু তিনি এককালীন ক্ষতিপূরণ পেয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তার আসল চিন্তা ছিল আখ চাষের ভবিষ্যৎ। তিনি অনেক ভেবে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতের কলকাতা দফতরে আর্জি জানিয়েছিলেন, চাষের জন্য যোগ্য ভারতীয় কুলি পাঠানো যায় কিনা দেখতে। কলকাতা দফতর থেকে সঙ্গে-সঙ্গেই জবাব পেয়েছিলেন, কোনও সমস্যা নেই। কারণ ইতিমধ্যেই ওঁদের কলোনি মরিশাসে চাষের জন্য এরকম কুলি পাঠানো হয়েছে। অতএব ব্রিটিশ গায়ানায় যথাযথ একটা চুক্তির ব্যবস্থা করে স্যার জন গ্ল্যাডস্টোন কুলির যোগানের চাহিদা কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।"

রুবেল ভ্যান ডিক মাথা ঝাঁকিয়ে মার্কাসকে সমর্থন করে বললেন, "ঠিক। ব্রিটিশ গায়ানায় বহুবছর ধরেই জাহাজে করে এশীয় কুলি নিয়ে আসা হচ্ছে।"

হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ বললেন, "আমরাও কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও বিকল্প দেখছি না। আফ্রিকার নিগারদের আর কোনওভাবেই পাওয়া যাবে না। দশ বছর হয়ে গেল, পরিস্থিতি দিনের পর দিন খারাপই হয়ে যাচ্ছে। বিকল্প হিসেবে তাই ইন্ডিয়ান কুলি ছাড়া আমাদের গতি নেই।"

"ইন্ডিয়া! ইন্ডিয়া!" চোখটা কুঁচকে উঠল আলডার্ট বুগার্ডের, "কালো চামড়ার দাসের জায়গায় বাদামি চামড়ার কুলি। ব্রিটিশ গায়ানাতে ওরা বেশ কিছু বছর ধরে ইন্ডিয়া থেকে কুলি আনছে মানছি, কিন্তু নিগারদের তুলনায় তাদের চেহারা দেখেছ? আমি একজনকে দেখেছি। যে কাজ নিগার দাসগুলো করতে পারত, ইন্ডিয়ান কুলিগুলো সেই কাজ পারবে? সারাদিনে কতগুলো আখ কাটতে পারবে আর কতগুলো আখের বোঝা মাথায় নিয়ে কারখানায় পৌঁছতে পারবে? এইসব নিয়েই তো নানা সমস্যা হচ্ছে শুনেছি ওদের। না পারছে ওরা মানিয়ে নিতে, না আছে ওদের নিগারদের মত গায়েগতরে খাটার ক্ষমতা।"

হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ বললেন, "আমি আবার বলছি মিস্টার বুগার্ড। ঠিক করে খবর নিন ব্রিটিশ গায়ানা, ত্রিনিদাদে ইন্ডিয়ান কুলিদের দক্ষতা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।"

গিলবার্ট ডি জং বলে উঠলেন, "আমি আপনাদের দু'জনের কথাই মানছি। এই মতবিরোধ মেটাতে আমার অভিমত হচ্ছে এক জাহাজ ইন্ডিয়ান কুলি এনে দেখাই যাক না। আমরা আমস্টারডামে জানাই আমাদের এই প্রস্তাবের কথা।"

মার্কাস ইঙ্গিতে কাকার অনুমতি নিয়ে বলল, "আমস্টারডাম ইতিমধ্যেই বিষয়টা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে..."

"নতুন শ্রমিক আসছে বুঝি?"

পিছন থেকে সুরেলা নারীকণ্ঠ শুনে মার্কাসের কথা থেমে গেল। ঘাড়টা ঘোরাতেই চোখের ওপর একটা বিদ্যুৎ যেন ঝলক খেলে গেল। অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটাকে মার্কাস চেনে। আলডার্ট বুগার্ডের মেয়ে এমিলি। অনেকবার দূর থেকে দেখেছে মেয়েটাকে। বাবার পাশে ঘোড়ায় চেপে ঘোরে। কিন্তু ওই দূর থেকেই দেখেছে। ধারালো চেহারা। মাথার টুপিটা কপালের অর্ধেকটা ঢেকে থাকে। এখন একদম সামনাসামনি চোখ ঝলসে দেওয়া রূপ দেখছে। মাথায় টুপি নেই। একরাশ কোঁকড়ানো সোনালি চুলের ঢাল কাঁধ ছাপিয়ে নেমেছে। অসম্ভব সুন্দর দুটো চোখ। ধারালো নাক। মাখনের মত ত্বক। গোলাপি লং গাউনে এত মানিয়েছে ওকে যেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দর্জি ওটা ওর জন্যই তৈরি করেছে।

মার্কাসের এই মুগ্ধ চোখের চাউনি এমিলির নজর এড়াল না। মার্কাসকে আরও বিমূঢ় করতে দু'গালে টোল ফুটিয়ে মিষ্টি হাসল। তারপর আলডার্ট বুগার্ডকে বলল, "সরি বাবা। তোমাদের আলোচনা কানে আসাতে কৌতূহল চাপতে পরলাম না। একটু কি এখানে বসতে পারি?"

আলডার্ট বুগার্ডের অবশ্য এমিলির কৌতূহল স্বাভাবিক মনে হল। এমিলি যবে থেকে সহঘোড়সওয়ার হয়েছে, খেতে, ঘুরতে-ঘুরতে তিনি তো মেয়েকে এই একটাই কথা বলেছেন। একটা সমাধান বেরবেই। শুকনো খেতগুলোয় আবার লম্বা-লম্বা আখের গাছে ভরে উঠবে। তাছাড়া মেয়েকেও দেখানো দরকার নিজে অন্য প্লান্টার্সদের কাছে কত গুরুত্ব পান।

আলডার্ট বুগার্ড একটা ফাঁকা সোফা দেখিয়ে বললেন, "বসো। তবে আজকে একটা জিনিস মাথায় রেখো। আমাদের মাননীয় অতিথিদের আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি যেন না হয়, সেটা তোমাকে দেখতে হবে।"

হেনড্রিক বলে উঠলেন, "মাদামকে দেখছি না।"

এমিলি কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই আলডার্ট বলে উঠলেন, "ওর শরীর ক'দিন ভালো যাচ্ছে না, বিশ্রাম নিচ্ছে। তো হ্যাঁ, মার্কাস তুমি যেন কী বলছিলে? আমস্টারডাম ইতিমধ্যেই বিষয়টা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে কি কিছু করতে পেরেছে?"

এমিলি বসেছে ঠিক মার্কাসের উল্টোদিকে। কীভাবে কি বলবে কাকার সঙ্গে গতকাল অনেক অনুশীলন করেছে। এমিলি চেয়ে আছে মার্কাসের চোখের দিকে। আর তাতেই মার্কাসের সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। কোনরকমে বলতে শুরু করল, "হ্যাঁ, জন গ্ল্যাডস্টোনের ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ব্রিটিশ গায়ানায় বিপুল পরিমাণ কফি আর চিনি

চাষের খেত খামার ছিল...”

গিলবার্ট ডি জং ছটফট করে উঠে বললেন, “এসব তো তুমি বললে মার্কাস। মিস্টার বুগার্ড জানতে চাইছেন, আমস্টারডাম কী ব্যবস্থা করছে?”

এমিলি চাপা হেসে উঠল। মার্কাসের কান একটু যেন গরম হয়ে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বলল, “দুঃখিত। আমি আসলে জন গ্ল্যাডস্টোনের কথাটা বলছিলাম কারণ উনি ইংল্যান্ডের লিভারপুলে থাকেন। আমাদের কুলি নিয়ে আসার জন্য লিভারপুল থেকে একটা জাহাজ পাঠানো হচ্ছে ইন্ডিয়ার ক্যালকাটা পোর্টে।”

আলডার্ট বুগার্ড রেগে উঠলেন, “দাঁড়াও, দাঁড়াও। তার মানে আমস্টারডামের সঙ্গে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইতিমধ্যেই একটা চুক্তি হয়ে গিয়েছে। সেটা হেনড্রিক জানো। কিন্তু জেনেও আমাদের সবাইকে অন্ধকারে রেখেছিলে এতদিন! এ ঘোরতর অন্যায়।”

হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ ঠিক করেছিলেন, যথাসম্ভব চুপ করে থাকবেন। অন্যদের প্রতিক্রিয়া দেখবেন। তারপর আসল প্রসঙ্গ পাড়বেন। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে সবার প্রতিক্রিয়া দেখতে গিয়ে অপ্রত্যাশিত একটা প্রতিক্রিয়া তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এমিলিকে দেখে মার্কাসের প্রতিক্রিয়া। অবশ্য এমিলির মতো সুন্দরী মেয়েকে দেখলে মার্কাসের মতো যুবকের এই মুগ্ধ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ শান্ত গলায় বললেন, “সেই জন্যই তো আজকের মিটিং। চিন্তাটা শুধু আমাদের নয়, আমস্টারডামেরও। আমাদের কাছ থেকে রাজস্ব ওরা পায়। আর একটু আগে মিস্টার ডি জং যা বললেন, এক জাহাজ ইন্ডিয়ান কুলি এনে দেখাই যাক না। পাঁচ বছরের চুক্তি হবে ওদের সঙ্গে। আমাদেরও অধিকার থাকবে কুলিদের বেছে আমাদের প্ল্যানটেশনে নেওয়ার।”

আলডার্ট বুগার্ড চুরুটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, “চুক্তি! চুক্তি করেই সর্বনাশ হচ্ছে আমাদের জাতিটার। এককালে আমেরিকার ম্যানহাটনে হাডসন নদীর ধারে কী সুন্দর ছিল আমাদের লিটল আমস্টারডাম! ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সুন্দর ব্যবসা করছিল। ওরা চুক্তি করে ওই শহরটা দিয়ে দিল। আর তার নাম হয়ে গেল নিউ ইয়র্ক। লিটল আমস্টারডামের বদলে আমরা পেলাম এই দেশটা। ডাচ গায়ানা। আমি কিন্তু প্রথমেই বলে দিয়েছি, ব্রিটিশরা অত্যন্ত ধূর্ত। ওদের সঙ্গে চুক্তি করে নতুন শ্রমিক আনাচ্ছ আনাও। কিন্তু ব্রিটিশরা যেন শক্ত সমর্থ জোয়ান কুলি পাঠায়। ওদের উপনিবেশগুলোতে ভালো-ভালো কুলিগুলোকে পাঠিয়ে, ঝড়তি পড়তি কুলিগুলোকে এখানে যেন না পাঠায়।”

গিলবার্ট ডি জং বললেন, “আমরা বরং ভাবি জাহাজ ভর্তি কুলি এলে আমরা কীভাবে তার ভাগ বাঁটোয়ারা করে ঐক্যমত থাকব। আমস্টারডাম কি এই নিয়েও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে কোনও চুক্তি করেছে? তুমি কিছু জেনে এসেছ মার্কাস?”

মার্কাস যেন কথাটা শুনতেই পেল না। তার সামনে এখন ঝলমল করছে একটাই সত্যি, এমিলি।

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে ষষ্ঠ কিস্তি

প্রিয়তমা, হেনড্রিক আর মার্কাস ভ্যান ডার বার্গ যে আমার পূর্বপুরুষ সেটা হয়তো আমার পদবি মিলিয়ে নির্ভুল আন্দাজ করে ফেলতে পেরেছ। যাই হোক, এরপর তোমাকে বাকি পরিচয়গুলো একটু খোলসা করে বলে দিলে তাদের নিয়ে এই গল্পটার হাত ধরে এগোতে সুবিধে হবে।

মার্কাস ভ্যান ডার বার্গ হলেন আমার প্রপিতামহ আর এমিলি হলেন আমার প্রপিতামহী। মানে বংশ তালিকা করলে ছয়-ধাপের ব্যবধান। দুম করে এইটুকু শুনে নিশ্চয়ই তোমার মন ভরল না। আমি তো শুধু ঝকঝকে সুঠাম যুবক মার্কাস আর দারুণ সুন্দরী এমিলির প্রথম সাক্ষাতের দিনটার কথা বলেছি। এটাও বলেছি যে দু'জন দুটো বিবদমান, যুযুধান পরিবারের সদস্য ছিলেন। মার্কাসের বাবা-মা বেঞ্জামিন আর সোফি ভ্যান ডার বার্গের খুনের পিছনে যে আলডার্ট বুগার্ডের হাত আছে সেটাও মার্কাসের অজানা ছিল না। অথচ মার্কাস বুগার্ড বাংলোতে এমিলিকে দেখে একেবারে কুপোকাত হয়ে পড়েছিলেন।

সেই আদি অনন্তকাল থেকে প্রেম তো এভাবেই তার নিজস্ব আঁকাবাঁকা গতিপথেই চলে এসেছে, তাই না প্রিয়তমা? এই জায়গায় পৌঁছে তুমি নিশ্চয়ই ভাববে প্রেমের কোন পথ ধরে তারপর তাঁরা দুম করে আমার প্রপিতামহ আর প্রপিতামহী হয়ে গেলেন? মধ্যে নিশ্চয়ই ঘাত-সংঘাতের প্রেম কাহিনি আছে। কেমন ছিল তাদের প্রেমকাহিনি? কাদের মতো? রোমিয়ো-জুলিয়েট? ক্লিওপেট্রা-অ্যান্টনি? পাওলো-ফ্রান্সেসকা? রেট বাটলার-স্কারলেট ও'হারা? নাকি ভারতবর্ষের সেলিম-আনারকলি বা লায়লা-মজনুর মতো?

বিশ্বাস করো প্রিয়তমা, এই মহাবিশ্বের আরও হয়তো অসংখ্য প্রেমিক-প্রেমিকার নাম হতে পারে। তালিকাটা বেড়েই যাবে। কিন্তু আমার প্রপিতামহ আর প্রপিতামহীর প্রেম কাহিনিটা কোথাও একটু অন্যরকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা।

দেখেছ, এই হচ্ছে আমার সমস্যা। একটু-একটু করে ছোট-ছোট সূত্রতে লিখে রাখতে চাইছি টেসেল আইল্যান্ডে তোমার কোলে মাথা দিয়ে কীভাবে তোমাকে শোনাব গল্পগুলো, আর মাঝে-মাঝেই জট পাকিয়ে লিখে ফেলছি অন্য কথা। আসলে কি জানো? আমি তো অগমেন্টেড রিয়্যালিটি নিয়ে প্রোগ্রাম লিখি। রিয়্যালিটি আর ভার্চুয়ালের মিশেল তৈরি করি। সেই প্রোগ্রাম লেখার সময় মাঝে-মাঝেই লিখে ফেলি কিছু অবাঞ্ছিত কোড। সেই অবাঞ্ছিত কোডিং যখন প্রোগ্রামটাকে আটকে দেয়, জট ছড়ানোর জন্য ভাবনাচিন্তাগুলোর নতুন পথ খুঁজতে হয়।

যাকগে, যে সূত্রটা তোমার জন্য লিখে রাখছিলাম, সেখানেই ফিরে আসি। মার্কাস যে এমিলিকে দেখে প্রথমদিনই কুপাকাত হয়ে গিয়েছিলেন, সেটা আলডার্ট বুগার্ড বুঝতে না পারলেও হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ কিন্তু বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো? শেষ অঙ্ক একটাই। তার ফলাফলও এক। শুধু সমাধানের পথে অঙ্কটাকে কষে ফেলার মানুষের আর ঈশ্বরের ধাপগুলো একেবারে ভিন্ন। যেমন নিউ মোনালিসা হোটেলে মনে-মনে একটা অঙ্ক কষে রোজি আমার কাছে এসেছিল। আর আমিও একটা অঙ্ক কষে রেখেছিলাম। কিন্তু তারপর অঙ্কের ধাপগুলো কীভাবে সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে এগোল সেটাও বেশ।

দ্যাখো, তোমার জন্য এলোমেলো করে সূত্র লিখতে-লিখতে কী সুন্দর সময় কেটে গেল। অবশেষে ডিসপ্লেতে দেখছি দিল্লির ফ্লাইটের গেট দিয়েছে। বোর্ডিং কল হওয়ার পর, লম্বা কিউতে দাঁড়ানোর আগে নিউ মোনালিসা হোটেলের প্রথম রাত্রির সূত্রটার এই ফাঁকে উল্লেখ করে রাখি। তারপর বোর্ডিং করে সিট বেল্ট বেঁধে ফেলার পর দু'ঘন্টার ওপর সময় পাব তোমাকে সেই রাতের কথাটা কীভাবে বলব মনের মধ্যে গুছিয়ে রাখতে।

॥ ৬ ॥

নিউ মোনালিসা হোটেলের প্রতিটা সিঁড়ির ধাপ মিতালির চেনা। তবু আবেলের পিছন-পিছন সন্তর্পণে ওপরে উঠতে থাকল মিতালি। শিউচরণকে ইশারায় বলা আছে। ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি পেড়ে ফেলতে পারলে একটা অ্যাপ ক্যাব ধরে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে লাস্ট ট্রেনটা ধরে ফেলা যাবে।

আবেল নিজের ঘরের সামনে এসে মিতালির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, “এসো।”

ঘরের নম্বরটা ততক্ষণে মিতালির দেখা হয়ে গিয়েছে, ১০৩। এই ঘরের খাট ডবল বেডের তুলনায় একটু ছোট। জানলাটা দিয়ে হোটেলের পিছন দিক দেখা যায়। খাট ছাড়া আছে একটা সিঙ্গল

সিটের সোফা আর একটা সেন্টার টেবল। খাট আর জানলার মধ্যে অপরিসর জায়গাটায় রাখা আছে আবেলের র‍্যাকস্যাক আর গিটারের বাক্স।

টানটান করে ধবধবে সাদা চাদর পাতা বিছোনো। দিনের শেষে এরকম শান্ত-নিস্তরঙ্গ বিছানা দেখলে কীরকম একটা সম্মোহিনী ক্লান্তি আসে। কিন্তু এখন সেসব ভাবলে চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঠান্ডা বিছানাটায় শরীরের সব উষ্ণতা দিয়ে উথাল-পাথাল করে তার দাম বুঝে নিয়ে লাস্ট ট্রেন ধরতে হবে। ধীরেসুস্থে কাজটা ধরতে হলে সোফায় বসাই দস্তুর। কিন্তু সেই সময় হাতে নেই। মিতালি বিছানাতেই বসল। ঘরের মধ্যে ঈষৎ মেকি চোখ বুলিয়ে বলল, "ওয়াও! তুমি গিটার বাজাও?"

"একটু আধটু।"

মিতালি এই প্রসঙ্গে আর কথা বাড়াল না। এই বয়সের কিছু সাহেবি ছেলেমেয়ে খ্যাপাটে টাইপের হয়। উৎসাহ পেয়ে গিটার বাজিয়ে প্যানপ্যানানি গান শোনাতে শুরু করে দিলেই মুশকিল। আবেল সোফায় এসে বসল। মিতালি এই লাইনের অভিজ্ঞতা নিয়েও বুঝে উঠতে পারছে না, হাতের সামনে ওকে পেয়েও ছেলেটার মধ্যে উত্তাপ জাগতে আর কতক্ষণ লাগবে? আজকের কাজটা মিটিয়ে ফেলে কালকে আবার আসতে পারবে কিনা?

"তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে?" মিতালি প্রশ্ন করল।

"হুম!" বিরক্তি লুকিয়ে আবেল বলল, "তোমার রুম নম্বর কত?"

"২০৯, ওপর তলায়। বিরক্ত হচ্ছ? আমায় তাড়িয়ে দিতে চাইছ?"

"না। সরি। এমনি জানতে চাইলাম।"

"একটা কাজ করলে হয় না? ধরো কাল আমি ছুটি নিলাম। আমরা প্রিন্সেপ ঘাট বলে একটা জায়গায় যাব। কাছেই। গঙ্গার ধারে। ওখানে নৌকা আছে। আমরা নৌকায় ঘুরব।"

আবেলের মতামতটা জানার আগেই দরজার বেলটা বেজে উঠল। এই ঘরটা আবেলের। ভিতরে আসার অনুমতি আবেলেরই দেওয়া উচিত। কিন্তু তার আগেই মিতালি বলে উঠল, "কাম ইন।"

যা ভেবেছিল, তাই। শিউচরণ। হাতে একটা ট্রেতে বিয়ারের বোতল, বিয়ার মাগ। সঙ্গে একটা বাটিতে খানিকটা চানাচুর। ট্রেটা সেন্টার টেবিলের ওপর রেখে বটল ওপেনার দিয়ে ছিপিটা খুলে রুম সার্ভিসের স্লিপে সই করানোর পরও শিউচরণ দাঁড়িয়েই থাকল। আবেল বুঝতে পারল না ওয়েটার দাঁড়িয়ে আছে কেন? মিতালি চাপা গলায় বলল, "ও বোধহয় কিছু বকশিস আশা করছে।"

"নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।" আবেল পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু টাকা বের করে বেছে একটা দশ টাকার নোট শিউচরণের হাতে দিল।

এই বাজারে দশ টাকা! শিউচরণের মনে হল দুটো বাছা খিস্তি দিয়ে টাকাটা ওর মুখে ছুড়ে মারে। মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করার জন্য টাকা আছে, বকশিস দেওয়ার বেলায় দশ টাকার একটা নোংরা নোট। শিউচরণ জ্বলন্ত চোখে মিতালির দিকে তাকাল। মিতালিও ততক্ষণে বুঝে গিয়েছে। ডলার আর টাকার নামতাটা এই দুধেভাতে ছেলেটার এখনও মুখস্থ হয়নি। তবে মুঠোতে যে নোটগুলো উঠে এসেছিল সেগুলো দেখা হয়ে গিয়েছে। ওর মধ্যে সবকটা চকচকে গোলাপি নোট ওর চাই। চোখের ইশারায় শিউচরণকে ঠান্ডা হয়ে বেরতে বলে মাগে বিয়ার ঢালতে আরম্ভ করল মিতালি। শিউচরণ একটু বেশি জোরেই আওয়াজ করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিয়ারের মাগে একটা চুমুক দিয়ে খানিকটা চানাচুর তুলে মুখে দিল মিতালি। একেবারে মিয়ানো চানাচুর। নিশ্চয়ই নিচে রেস্তোঁরায় যে লোকগুলো মদ খাচ্ছিল তাদের উচ্ছিষ্ট চানাচুর। পুরো পয়সাটা এই সাহেব ছেলেটা দেবে, তবুও এটা মিতালি খাবে জেনেই শিউচরণ মিয়ানো এঁটো চানাচুর এনেছে। তবে এসব নিয়ে এখন ভাবলে চলবে না। তাড়াতাড়ি কাজে নামতে হবে।

"তোমার গার্লফ্রেন্ডকে নিশ্চয়ই খুব মিস করছ?"

আবেল কোনও উত্তর না দিয়ে হাসল। মিতালি চোখ মটকে বলল, "ধরে নাও না, যতক্ষণ তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমার কাছে নেই, আমাদের শহরে যতদিন তুমি আছ, ততদিন আমিই তোমার গার্লফ্রেন্ড। কী, ভালো লাগছে না আমাকে?"

"না। তুমি ভালো বন্ধু।"

"আচ্ছা, তুমি যখন দেশে ফিরে যাবে, মনে থাকবে আমাকে?"

"নিশ্চয়ই মনে থাকবে।"

মিতালি ঠোঁট ওলটাল, "কীভাবে মনে থাকবে আমাকে? তুমি আমার একটা ছবিও তুললে না। এসো, একটা সেলফি তুলি।"

আর অপেক্ষা করল না মিতালি। উঠে এসে আবেলের হাতটা ধরে টেনে নিজের পাশে বসিয়ে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে যথাসম্ভব শরীরের ছোঁয়া দিয়ে গালে-গাল ঠেকিয়ে কয়েকটা সেলফি তুলল। আবেল বাধা দিল না। মিতালি ভিতরে-ভিতরে উৎসাহ পেল। আদপে জাতটা পুরুষমানুষের। যতই মুনি ঋষির কাঠিন্যর মুখোশ পরে থাকুক, কোনও না কোনও তাপে মুখোশটা খসবেই। সেই অপ্সরাদের সময় থেকে যুগ-যুগ ধরে এটাই হয়ে এসেছে।

"থ্যাঙ্ক ইউ," আবেল সরে আসতে চাইল।

মিতালি হাতটা আবেলের গলায় জড়িয়ে রেখেই বলল, "সে কী! তুমি তোমার ট্যাবে আমাদের ছবি তুললে না? নাকি তোমার নম্বরটা আমাকে দেবে, হোয়াটসঅ্যাপ করে দেব? তোমার কাছে আমার ছবি না থাকলে আমাকে মনে থাকবে কীভাবে?"

আবেল আলতো করে মিতালির হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা করতেই মিতালি দু'হাতের তালু দিয়ে জোরে আবেলের গালদুটো ধরে ঠোঁটে গভীর একটা দীর্ঘ চুমু দিল। তারপর আবেলের একটা হাত উঠিয়ে নিয়ে নিজের স্তনের ওপর রাখল।

"মাত কর মাঈ..."

মিতালি একটু চমকে উঠল! নিজের কানে ঠিক শুনল কী? সাহেব ছেলেটা শিউচরণের ভাষায় কথা বলে উঠল। আবেলকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিল। বিছানায় যেতে চায় না। কিন্তু ঠোঁটে ঠোঁট দিয়েছে। স্তনে হাত দিয়েছে। এটা ভাঙিয়েই গোলাপি নোটগুলো নিয়ে নিতে হবে। একটাই শুধু সাবধানতা... বেশি জোরাজুরি করে ভয় দেখিয়ে টাকা নিলে ইন্টারনেটে হোটেলগুলোর ওয়েবসাইটে ছেলেটা যদি উল্টোপাল্টা কিছু লিখে বসে, আর সেটা যদি ওই ভুঁড়িওয়ালা কামুক ম্যানেজারটার চোখে পড়ে, আর কোনদিন এই হোটেলে ব্যবসা করতে আসতে পারবে না।

ঘড়ি দেখল মিতালি। কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর বড়জোর পনেরো মিনিটের মধ্যে বিয়ারটা শেষ করে বেরিয়ে না পড়তে পারলে শিয়ালদহে লাস্ট ট্রেনটা ধরতে পারবে না।

আবেল মিতালির পাশ থেকে উঠে সোফায় বসে মাটির দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে রাখল। আনমনে এক খাব্‌লা চানাচুর তুলে মুখে পুরেই থু-থু করে ঘরে ছড়িয়ে বিয়ারের গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে আবেলের দিকে চেয়ে থাকল। ছেলেটা মাথাটা তুলছেই না।

আবার বিয়ারে চুমুক দিল মিতালি। খালি পেটে স্ট্রং বিয়ার একটু দ্রুতই ঝিম ধরাচ্ছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে আবেলের দিকে ধোঁয়া ছড়াল মিতালি। 'খুকখুক' করে অল্প কেশে উঠল আবেল। এবার টাকাটা আদায় করে নিতে হবে। ছেলেটা হিন্দি বোঝে। বলতেও পারে। তবুও একটা টুসকি দিয়ে ইংরেজিতেই মিতালি বলল, "হ্যালো! এই যে, আমার দিকে তাকাও।"

আবেল আস্তে-আস্তে মুখটা তুলে বলল, "একটা কথা বলব?"

ব্যাঁকা হেসে মিতালি, "আমায় বেরিয়ে যেতে বলবে, তাই তো?"

আবেল মাথা নাড়ল, "না। তুমি ইচ্ছে করলে রাতে আমার ঘরে থেকে যেতে পার।"

"আচ্ছা," মিতালি কামুক হেসে বলল, "শেষপর্যন্ত তাহলে ইচ্ছে করছে?"

আবেল আবার চুপ করে গেল। এবার অসহ্য লাগতে শুরু করল মিতালির। সময় বেশি নেই। হয় গোলাপী নোটগুলো নিয়ে এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে না হলে কাঁচা ডলার বা ইউরো আছে কিনা জেনে

নিয়ে কোনও গণ্ডগোল না পাকিয়ে রাতে থাকার দর ঠিক করতে হবে। সেক্ষেত্রে বাড়িতে জানিয়ে দিতে হবে লাস্ট ট্রেন ফেল করে রাতটা শুক্লার বাড়িতে থাকতে হচ্ছে।

আবেল মিতালির হাতের সিগারেট দেখিয়ে বলল, "সিগারেট, অ্যালকোহল... এভাবে এই বয়সে নিজের শরীর শেষ করে দিচ্ছ কেন?"

কিছু মুহূর্ত আছে যখন কিছু কথা শুনলে মাথাটা দিকবিদিক শূন্য হয়ে যায়। ঢকঢক করে মাগের পুরো বিয়ার শেষ করে সিগারেটে আরও দুটো লম্বা টান দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে মিতালি শার্ট খুলে ফেলে হিসহিসে গলায় বলল, "এদিকে তাকাও, আমার শরীরটার দিকে। তোমার কী মনে হচ্ছে? আমার শরীরে কোনও ধার নেই? শরীরটা শেষ হয়ে গিয়েছে?"

আবেল চোখটা সরিয়ে নিতে গিয়েও পারল না। লাল সস্তার অন্তর্বাসের চারদিকে খয়েরি চামড়ায় ফুটে আছে অসংখ্য সিগারেটের ছ্যাঁকা।

"কী দেখছ? কে নষ্ট করেছে আমার শরীরটা? এই দাগগুলো কে সিগারেট খেয়ে দিয়েছে?"

মাথাটা আবার নামিয়ে নিয়ে আবেল আস্তে-আস্তে বলতে শুরু করল, "আমস্টারডামে রেড লাইট ডিস্ট্রিক। ছোট-ছোট ঘুপচি ঘর। শুধু ঘরের রাস্তার দিকে বড় কাচের জানলা। ভিতরে লাল আলো। সেই আলো মেখেই দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েরা। খুব কষ্ট ওদের..."

এসিতে ঠান্ডা লাগছে। মিতালি শার্টটা আবার পরে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কাঁধ ঝাঁকাল, "একটু ধন্দে ছিলাম। তোমার গোল-গোল চশমার পিছনে চোখদুটো দেখে মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল দুধের দাঁত পড়েনি। এখন তো দেখছি তুমি ঝানু জিনিস। এই বয়সেই বাজারি মেয়ের কাছে যাচ্ছ। আমস্টারডাম আমি দেখিনি। তবে শুনেছি ওখানকার রেড ডিস্ট্রিকের কথা। খুব বড় কারবার। তা, কত বছর বয়স থেকে যাচ্ছ ওখানে? সপ্তাহে কতবার যাও? তাহলে এত ন্যাকামি করছ কেন? কোনও রোগ-টোগ নেই আমার। কন্ডোমও আছে ব্যাগে।"

"আমি আমস্টারডামে থাকি না। আমি থাকি রটারডামে। আমস্টারডামে আমার কলেজ।"

"বুঝেছি। কলেজ কেটে প্রতিদিন ওখানে গিয়ে বাপের দেওয়া পয়সা মেয়েদের চরণে উপুড় করে দিয়ে আস।"

"তোমাকে একটা গল্প শোনাতে চাই, শুনবে?"

হেসে উঠল মিতালি, "আমি গল্প শুনতে আর শোনাতে দুটোরই চার্জ নিই। আমার কাছে অনেক গল্প আছে। পাচার, অত্যাচার, ধর্ষণ, রগরগে প্রেমের গল্প। কোনটা শুনবে? আর শোনও তোমার প্যানপ্যানে গল্প শুনতেও যদি আমাকে পুরো রাত্রি থাকতে হয়, আমার পুরো চার্জ লাগবে।"

"তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার খিদে পেয়েছে। আচ্ছা, নীচের রেস্তরাঁ কি এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে?"

"কে আর জানবে বলো, তুমি আমাকে খাওয়াতে চাইবে। আর তার জন্য রেস্তরাঁ খুলে রাখবে।"

আবেল উঠে গিয়ে র‍্যাকস্যাকের একটা পকেট খুলে কিছু চকোলেট আর চিজ়ের কিউব নিয়ে এসে সেন্টার টেবিলের ওপর রাখল। বিদেশি চকোলেট দেখে মিতালির চোখদুটো চকচক করে উঠল। বিদেশি কেন, দেশি চকোলেটই কতদিন খায়নি! একসঙ্গে তিন চারটের রাংতা খুলে মুখে পুড়ে আরামে চোখ বুজল। নাঃ! আজকে আর লাস্ট ট্রেন ধরা যাবে না। রাতটা এই ঘরেই থাকতে হবে। বাড়িতে শুধু একটা ফোন করে বলে দিতে হবে, শুক্লার বাড়িতে রয়ে গিয়েছে।

বিয়ারের বোতলের শেষটুকু মাগে উপুড় করে একটা চিজ় কিউবের রাংতা খুলতে-খুলতে বলল, "সিগারেট ভাল নয়, মদ ভাল নয়। চিজ় বুঝি খুব ভালো জিনিস? ডাক্তার আমার বাবাকে ঘি, মাখন, চিজ়, ডিমের কুসুম, পাঁঠার মাংস সব খেতে বারণ করে দিয়েছে। অবশ্য খেতে বারণ না করলেও ওসব রোজ কেনার ক্ষমতা আমাদের নেই।"

"তোমার বাড়ি কোথায়? বাড়িতে কে কে আছেন?"

"অত জেনে তোমার কী হবে? তোমার জন্য আমি আজ রাতে বাড়ি ফিরতে পারিনি, ব্যস। আজ রাতে আমি এখানেই থাকব। বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে না আমার পেশা কী?"

"আমি জানি তুমি অনেক মিথ্যে বলেছ। রিসেপশনে চাবির হুকগুলোতে দেখেছি এই হোটেলে ২০৯ নম্বর কোনও ঘর নেই।"

"আজব জিনিস তুমি! আমার পেশা কী বুঝে ঘরে নিয়ে এসেছ! অথচ আমার শরীরটাকেই চাও না। যাকগে রাতে থাকার জন্য আমার ছ'হাজার লাগবে। তিনটে দু'হাজারের নোট।"

বিয়ারটা শেষ করে খাটে শরীরটাকে এলিয়ে দিল মিতালি। আবেলও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ্যাকেটের পকেট থেকে ট্যাব বের করল।

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে সপ্তম কিস্তি

দিল্লির ফ্লাইটে কিছুক্ষণ বসার পর পকেট থেকে ট্যাব বের করে আবার তোমার জন্য সূত্র লিখতে বসলাম প্রিয়তমা। আজকে দেখলাম পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের লোকদের মতো ভারতীয়রাও বেশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। উড়ানে দু'ঘন্টা বিলম্ব হওয়ার জন্য যাত্রীদের মধ্যে বেশ একটা অসন্তোষ ছিল। সেটা অবশ্য একদিকে স্বাভাবিক। বেশ রাত করেই দিল্লি পৌঁছবে ফ্লাইট। সবাই তো আর আমার মত কানেক্টিং ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ধরবেন না। অনেকেই বাড়ি ফিরছেন বা হোটেলে। পৌঁছতে-পৌঁছতে মাঝরাত হবে। কিন্তু আজকাল অসন্তোষ খুব দ্রুতই অসহিষ্ণুতায় গড়িয়ে যায়।

আমার রুকস্যাক আর গিটারের বাক্স দুটোই চেক-ইন লাগেজে দিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে রয়েছে একটা মাত্র হ্যান্ডব্যাগ। কেবিনে সেটা জায়গা করে রাখবার সময় একজন সহযাত্রীর একটা ব্যাগ একটু সরিয়ে রাখতেই তিনি ভীষণ রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। ব্যাপারটা সামলাতে দু'জন এয়ার হোস্টেসকে পর্যন্ত এগিয়ে আসতে হয়েছিল। তারপর তাদের সঙ্গে তর্কাতর্কি। খুবই সামান্য একটা ব্যাপার। তবু সূত্র লিখতে গিয়ে প্রথমেই এটা লিখে ফেললাম কেন জান প্রিয়তমা? কী ভাবছ, আবার সেই অনাবশ্যক অবাঞ্ছিত কোডিং? না প্রিয়তমা। সহিষ্ণুতা আর অসহিষ্ণুতা। সেই মুহূর্তে আমার তোমার কথা খুব মনে হচ্ছিল।

আমার সিট নম্বর ৬-এফ, জানলার দিকে ডানার সামনে। আমি তো আর সিট বেছে ওয়েব চেক-ইন করিনি। কাউন্টার চেক-ইন করেছিলাম। অনুরোধ করেছিলাম, শুধু যাতে জানলার ধারে সিট পাওয়া যায়। ঈশ্বর বোধহয় সেই অনুরোধ মঞ্জুর করে ৬-এফ সিটের ব্যবস্থাটা করে দিয়েছিলেন।

ট্যাক্সিং করে রানওয়ের মুখে প্লেনটা অনেকক্ষণ টেক-অফ ক্লিয়ারেন্সের জন্য দাঁড়িয়েছিল। জানলার বাইরে অন্ধকার। শুধু কিছু অ্যাভিয়েশনের আলো দপদপ করছিল। ওই আলোগুলো দেখে আমার অদ্ভুত একটা মনখারাপ মাখানো অনুভূতি হচ্ছিল। বিশ্বাস করো, ভীষণ-ভীষণ তোমার অভাব অনুভব করছিলাম। বারবার মনে হচ্ছিল পাশের হ্যান্ডরেস্টে যদি তোমার মাখনের মত পেলব উষ্ণ হাত থাকত, তোমার আঙুলের মধ্যে আঙুলগুলো ঢুকিয়ে তোমার কাঁধে মুখটা গুঁজে হয়তো একটু চোখের জল ফেলতাম। তুমি তোমার কোমল আঙুলগুলো দিয়ে আমার চুলে বিলি কেটে দিতে।

আমি জানলার কাচে নাক ঠেকিয়ে বসেছিলাম। প্লেনটা টার্বো চার্জ করে হুহু করে রানওয়ে দিয়ে দৌড়তে শুরু করে নিঁখুত টেক-অফ করেছিল। বিশ্বাস করো, প্রিয়তমা সেই মুহূর্তে আমার মনটা এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। কলকাতা শহরটা একটু-একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। বিন্দু আলোর মালা। ফিতের মতো রাস্তায় আলোর বিন্দু নিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে। শহরটাকে একদিকে চিরে আটকে দিয়েছে বিমর্ষ গঙ্গা। তারপর প্লেন মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে চলল। মেঘের তলায় হারিয়ে গেল শহরটা। কলকাতাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। আমি মনেমনে প্রণাম জানালাম ফুলমতীমাঈকে। জানি না, আবার কোনওদিন সুযোগ হবে কিনা এই শহরটায় আসার।

এরপরেই একটা আশ্চর্য ব্যাপার হলো। একজন এয়ার হোস্টেস আইল দিয়ে সার্ভিস ট্রলিটা এগিয়ে নিয়ে আমার সিটের সামনে দাঁড়িয়ে আমার বোর্ডিং পাসটা চাইল। তারপর আমাকে একটা চিকেন স্যান্ডউইচ আর কফি দিল। এমনিতে এটা ইকনোমিক ক্লাসের ডমেস্টিক ফ্লাইট। খাবার কিনে খেতে হয়। এবং তার যথেষ্ট দাম। কিন্তু আমি জানতামই না যে, প্রফেসর মেয়ার আলাদা করে আমার ফেরার ফ্লাইটের টিকিট করার সময় এই কমপ্লিমেন্টারি মিলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। সঙ্গে যথেষ্ট পয়সা ছিল না বলে এয়ারপোর্টে কিছু খেতে পারিনি। তাই খুব উপভোগ করে স্যান্ডউইচ আর কফি খেলাম। একটু ক্লান্তও লাগছিল। একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। ঘোর ভাঙল পাইলটের অ্যানাউন্সমেন্টে। ওই যে পাইলট আধা অস্ফুট স্বরে রুটিনমাফিক তথ্য জানান না, প্লেনটা কত উচ্চতা দিয়ে যাচ্ছে? দিল্লি কতক্ষণে পৌঁছব? বাইরে তাপমাত্রা কত? ডানদিকে হিমালয় ইত্যাদি-ইত্যাদি। কিন্তু এরমধ্যেই আরও একটা তথ্যে আমরা শিরদাঁড়া টানটান হয়ে উঠল। পাইলট জানালেন আমরা সামনে বারাণসী পেরিয়ে লখনউয়ের দিকে চলেছি। তার মানে কি এখন পশ্চিম বিহারের ওপর আছে প্লেনটা?

আমি জানলার কাচে আবার নাক ঠেকালাম। মেঘ নেই। তবে বাইরে নিকষ অন্ধকার। মাঝে-মাঝে একটা আধটা বিন্দু আলো। কে জানে ওর মধ্যেই হয়তো একটা হলো দোপোহারি গ্রাম।

॥ ৭ ॥

দয়ারাম মিশ্র ইংরেজদের বড় ভরসার লোক। কলকাতায় গিলেন্ডার কোম্পানির ইংরেজ সাহেবরা সাগরপারে কুলির যোগান দিতে দয়ারামের মতো আড়কাঠির উপর বেশ ভরসা করে। কাজটা অবশ্য বহুদিন ধরে করছেন দয়ারাম। জাহাজে চেপে কালাপানি পেরিয়ে কোন দেশে লোকগুলো যায় দয়ারামের জানা নেই। ইংরেজদের অবশ্য লোক চালান করার বেশ কিছু নিয়মকানুন পদ্ধতি আছে। পাঁচ বছরের জন্য লোকগুলো দেশান্তরী হবে। তাদের নারীসঙ্গ, পরিবারসঙ্গ, গৃহ প্রতিপালনের ক্ষেত্র যাতে অন্তরায় না হয়, সেটাও সাহেবরা নজরে রাখতে বলেছেন। ডাক্তার লোকগুলোকে দেখে শক্ত-সামর্থ্য, রোগভোগ নেই, দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা করার জন্য উপযুক্ত বলে কাগজ করে দেয়। তারপর সেই কাগজ নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে একেকটা নাম নথিভুক্ত করে পাঁচ বছরের চুক্তি করা হয়। সব চুকবুকে লোকগুলো ডকের ডিপোতে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই দয়ারাম এজেন্ট সাহেবের কাছে কমিশন পায়। জোয়ান হলে পাঁচ টাকা। জেনানা, বাচ্চা হলে দু'টাকা। এছাড়া দেহাত থেকে লোকগুলোকে নিয়ে আসার খরচ। সেই হিসেবও এদিক-ওদিক করে বেশ কিছুটা থাকে।

এতদিন কাজ করে দয়ারাম শুনেছে এজেন্ট সাহেবরা কিন্তু লোকপিছু অনেক টাকা পায়। কিন্তু দয়ারামের ভাগ্যে ওই কানাকড়িটুকুই জোটে। অবশ্য তাই বা কম কিসে? ওই টাকা থেকেই খিদিরপুরে জমি কিনে দোতলা বাড়ি করে নিয়েছে।

ইংরেজদের সঙ্গে এত বছরের অভিজ্ঞতায় লোক জোগাড় করার আঁটঘাট অবশ্য দিব্যি শিখে গিয়েছে দয়ারাম। তবে সমস্যা যে একেবারে হয় না তা নয়। প্রথম-প্রথম বিহারে নিজের জানাশোনা গ্রামগুলো থেকেই লোক ধরত দয়ারাম। কখনও-কখনও মেলায় ওত পেতে থাকত। পড়াশোনা না জানা লোকগুলোকে বেশি বোঝাতে হত না। দুর্ভিক্ষ বা বন্যা পীড়িত হলে তো কথাই নেই। গৃহহীন অভুক্ত লোকগুলোকে একটু লোভ দেখালেই কাজ হয়ে যেত। গ্রামে গেলে বাড়ির লোকগুলোকে বোঝাত, কয়েকদিন পরেই তারা প্রচুর বড়লোক হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু বছরের পর বছর পার করেও তাদের যখন আর ফিরে আসতে দেখতে পাচ্ছে না কেউ, গ্রামের লোকেরা দয়ারামকে সন্দেহ করতে শুরু করে দিয়েছে। জবাব চাইছে।

দ্বিতীয় সমস্যা অন্য। এই গরীবগুর্বো লোকগুলোর জমিদার মহাজনদের কাছে অনেক ধার থাকে। যতটুকু না ধার, সুদ তার চারগুণ! সেই টাকা শোধ করতে না পারলে লোক ভাগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে জমিদার মহাজনরা লেঠেল দিয়ে বাধা দেয়। তাদের সঙ্গে আলাদা রফা করতে হয়। বেশ কিছু টাকা তাতেও বেরিয়ে যায়।

দয়ারাম ক'দিন ধরেই ভাবছিল, এবার এই লোক চালানের ব্যবসা ছেড়ে অন্য ধান্দা করবে। অনেকে বলছে কাঁচা কয়লার ধান্দায় ভালো মুনাফা আছে। তারমধ্যেই একদিন ডেকে পাঠাল এজেন্ট সামারটন সাহেব। গিলেন্ডার কোম্পানির জন্য বিহার থেকে চারশো কুলি জোগাড় করে নিয়ে আসতে হবে। তবে এবার আর ইংরেজ সাহেবদের জন্য নয়। ওলন্দাজ সাহেবদের জন্য। তার নিয়মকানুনও একটু বেশি।

দয়ারাম নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করলেও কিছু জিনিস নিজের মাথার মধ্যে ঢোকাতে পারে না। যেমন ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে ওলন্দাজ সাহেবদের সম্পর্ক। গোরা সাহেবগুলোর চামড়ার রং এক হলেও জাত যে আলাদা সেটা দয়ারাম বোঝে। তাই ওলন্দাজ সাহেবদের জন্য প্রথম কাজ করার সুযোগ দয়ারাম হাতছাড়া করতে চাইল না।

দয়ারাম অনেক মাথা খাটিয়ে একটা তালিকা তৈরি করেছে। এবার আগে যেসব গ্রাম থেকে লোক পাঠিয়েছে, সেগুলো বাদ দিয়ে নতুন-নতুন প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে লোক জোগাড় করবে। সেইমতো এসে হাজির হয়েছে দোপোহারি গ্রামে। সঙ্গে রেখেছে স্থানীয় জমিদারের নায়েব বৈজুকে। জমিদারকে বলেকয়ে দিয়ে থুয়েই বৈজুকে সঙ্গে করে দোপোহারিতে এসে হাজির হয়েছে।

সময়টা দুপুর। সকাল থেকে জমিতে হাড় ভাঙা খাটুনি খেটে লোকগুলো গাছের তলায় এসে একটু বিশ্রাম নেয়। কারও কারও জেনানা বাচ্চারা এই সময় দুপুরের খাবার নিয়ে আসে। সবাইকে এক জায়গায় পাওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। সেইসময়েই এসে হাজির দয়ারাম আর বৈজু। দয়ারাম লোকগুলোর কাছে অপরিচিত। কিন্তু বৈজুকে দেখেই লোকগুলো ভয়ে কেঁপে উঠল। বৈজুর চেয়েও ভয় বৈজুর হাতে ধরা লাল শালু বাঁধা খাতাটা। ওটাতেই লেখা আছে ধারের হিসেব। সে ধার শোধই হয় না। আশঙ্কা, আজ কাছারিতে জমিদারের সামনে আবার ডাক পড়বে।

তবে বৈজুর মেজাজ আজ অন্যরকম মনে হল। বাঁ হাতের তালুতে খৈনি ডলতে-ডলতে লোকগুলোকে একজায়গায় ডেকে বট গাছের তলায় জড়ো করল। তারপর মুখের মধ্যে খৈনি পুরে দয়ারামকে দেখিয়ে বলল, ভাগ্য বদল করার একটা সুযোগ দিতে কলকাতা থেকে ভগবানের দূত এসেছে।

কী সেই ভাগ্যবদলের সুযোগ?

দয়ারাম বলতে শুরু করল, ইংরেজরা ওদের দেশে কাজ করার একটা সুযোগ দিচ্ছে। এ সুযোগ আসলে ইংরেজদের দেওয়া নয়, বাবা ভোলেনাথের দেওয়া। ইংরেজদের কাজ করলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। সেই টাকা নিয়ে দেশে ফিরে এলে সকলে শুধু জমিদার জোতদারদের সুদ সমেত ধার শোধ করতেই পারবে না, তারপরেও এত টাকা থাকবে যে নিজের জমি কিনতে পারবে, গরু কিনতে পারবে, বাড়ি করতে পারবে, ধারদেনা না করে নিজের টাকায় পণ দিয়ে মেয়েদের ভালো বিয়ে দিতে পারবে।

রামাশীষের এইটুকু শুনেই ঘোর লেগে গেল। জমি, গরু, বাড়ি এসব তো অনেক পরের কথা। জীবনে একটাই স্বপ্ন দেখে। তার সব দেনা সুদ সমেত শোধ হয়ে গিয়েছে। তারজন্য যেখানে যতদূরে যেতে হয় তৎক্ষণাৎ রাজি। অন্য অনেকের অবস্থা রামাশীষের মোত হলেও, কেউ-কেউ একটু সতর্ক। মনে অনেক প্রশ্ন আছে। ইংরেজদের দেশটা কোথায়? কতদূর? কতদিনের জন্য কাজ করতে যেতে হবে? সেই সময়ে পরিবারকে কে দেখবে? কোথা থেকে জুটবে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের টাকা।

বৈজু আশ্বস্ত করে দিল, জমিদার সে টাকা দেবে। সেই ধার ফিরে

এসে শোধ করে দিলেই চলবে।

বাকিটা বোঝাল দয়ারাম। কীভাবে কোনদিন গ্রামের বাইরে পা না রাখা অশিক্ষিত মূর্খ মানুষগুলোর আস্থা অর্জন কী করে করতে হয় তা তার বিলক্ষণ জানা। দয়ারাম বলল, ইংরেজদের দেশ বেশি দূরে নয়। কলকাতায় গিয়ে জাহাজে চেপে কালাপানি পেরিয়ে তিন চারদিন যেতে সময় লাগে। আর সেখানে তিন মাসের মাত্র কাজ। ওদেশে আখের চাষ শুরু হয়ে গিয়েছে। ফলনটা তুলে দিয়ে চলে এলেই হবে। ইংরেজরা এর আগে কখনও আখের চাষ করেনি। তাই একাজ যারা করতে পারে সেরকম দক্ষ অভিজ্ঞ লোকদেরই নিয়ে যেতে চাইছে ইংরেজরা। কেউ যদি পরিবার নিয়ে যেতে চায় সে কথাও বিবেচনা করে দেখা হবে। যা কিছু হবে সবই কাগজে কলমে লেখাপড়া করে হবে।

রামাশীষ ভেবেছিল সবার আগে হাত তুলবে। কিন্তু তার আগেই হাত তুলে বসল লালন। লালনের ওঠানো হাতটা দেখে দয়ারাম আর বৈজুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। দয়ারামের গলা থেকে ঝুলছিল একটা থলি। সেই থলিটা ঝন্‌ঝন্‌ করে বাজিয়ে দয়ারাম বের করে আনল দু'আনার দুটো পয়সা। সবাইকে দেখিয়ে লালনের হাতে দিল সেই মুদ্রাদুটো। রাজি হওয়ার জন্য অগ্রিম বকশিস।

আর বেশি কিছু করতে হল না দয়ারামকে। গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো এবার দয়ারামের সামনে লাইন করে দাঁড়াল। এবারও রামাশীষের ইচ্ছে ছিল সবার আগে দাঁড়ানোর। কিন্তু সেটা হয়ে গেল বারো-তেরো জনের পিছনে। তার ভাগ্য খুলতে লাইনের সামনে ভগবানের দূত অবধি পৌঁছতে পারবে কিনা সেই দুশ্চিন্তায় দুরুদুরু বুকে রামাশীষ লক্ষ করল, দয়ারাম কিন্তু সবাইকে নিচ্ছে না। আর যাদের নিচ্ছে, বৈজু ওর খাতায় তাদের নাম টুকে নিচ্ছে।

দয়ারামের হাতে সময় নেই। হা-ঘরের লোকগুলোর আর গুছিয়ে নেওয়ার কী আছে? চার আনা দিয়ে বাঁধা হয়ে গিয়েছে। বেশি চিন্তা ভাবনার সুযোগ দিলেই বিগড়ে যেতে পারে। মাথায় উল্টোপাল্টা প্রশ্ন জন্মাতে পারে। কালকেই নির্বাচিত লোকদের নিয়ে রওনা হবে কলকাতার দিকে।

দোপোহারি মত তীব্র দারিদ্র লাঞ্ছিত নিস্তরঙ্গ জীবনের গ্রামে এই ঘটনা একটা যুগান্তকারী আলোড়ন। ঈশ্বর প্রেরিত এই সুযোগ যে সবাই পেয়েছে তা নয়, দয়ারাম বেছে-বেছে বত্রিশজন লোককে নিয়েছে। তবে আশ্বস্ত করেছে আবার ফিরে এসে অন্যদের সুযোগ দেবে।

খবর সবার শেষে পৌঁছল ফুলুয়ার কাছে। দুলারীর মত ফুলুয়ার দু'একজন সমবয়সী বান্ধবী ছাড়া ফুলুয়ার খবর কেউ রাখে না। মেয়েটা ডাইনি হয়ে যাচ্ছে বলেও অনেকে মনে করে। এত বড় একটা খবর শোনার পর দুলারী ছুটল কবরস্থানে ফুলুয়াকে খবরটা দেওয়ার জন্য। উত্তেজনায় হাঁফাতে-হাঁফাতে বান্ধবীকে সব বলে আসল কথা বলল, "তোর বাপুজিও যাচ্ছে!"

প্রথমে শুনে ফুলুয়ার কোনও ভাবান্তর হল না। দোপোহারির অনেকের মতো তার কাছে পাশের গ্রামও যা, সাগর পেরিয়ে দেশান্তরও তা। সমুদ্র বস্তুটা দেখতে কেমন, জাহাজই বা কত বড় হয়, কোনও ধারণাই নেই। আশার কথা একটাই, বাপুজি অনেক টাকা উপার্জন করে আনবে। তাদের অভাব, দেনা আর থাকবে না। দেনা শোধ করতে না পারার জন্য বাপুজির পিঠে আর চাবুক, লাথি জুটবে না।

দুলারী ক্রমশ জানাল দোপোহারির কারা কারা একা আর কারা কারা পরিবার নিয়ে যাচ্ছে। তারপর মুখ ছোট করে জিগ্যেস করল, "তুইও তোর বাপুজির সঙ্গে চলে যাবি ফুলুয়া?"

এই ভাবনাটা এতক্ষণ ফুলুয়ার মনে আসেনি। কিন্তু দুলারীর কাছে শোনার পর থেকে মনের মধ্যে পাক দিতে থাকল। এর উত্তর একমাত্র দিতে পারে বাপুজি।

দোপোহারিতে সে এক আশ্চর্য পূর্ণিমার রাত। গ্রামের মানুষরা স্পষ্টত দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। এক, যারা সৌভাগ্যবান। ভাগ্য ফেরাতে কাল যারা ভগবানের দূত দয়ারামের সঙ্গে রওনা দেবে। দুই, সেইসব হতভাগারা যারা যাওয়ার সুযোগ না পেয়ে ঋণের সুদের বোঝাটা আরও বাড়ানোর জন্য গ্রামেই রয়ে যাবে।

রামাশীষ আজ চার আনা পেয়েছে। সেই পয়সাটাও বৈজুর সামনে। বৈজু সেটা কেড়ে নেয়নি। উল্টে আশ্বাস দিয়েছে ফুলুয়ার যাতে কোনও অসুবিধে না হয়, দেখবে। ফুলুয়াকে নিয়ে প্রথমে একটু দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও বৈজুর আশ্বাস পেয়ে আর বিশেষ ভাবল না রামাশীষ। গ্রাম ছেড়ে যেতেও দুঃখ নেই। ধুতির কোঁচড়ে চার আনা, চোখে স্বপ্ন নিয়েই বিভোর। ভাটিখানায় গিয়ে মনের আনন্দে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরল।

বাপুজি বাড়ি ফিরলে ফুলুয়া চুলা জ্বালিয়ে হাত পুড়িয়ে রুটি করে। বাড়িতে আটা থাকলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু ফুলুয়ার মনটা আজ যেন কেমন একটা অস্থির-অস্থির করছে। কাল থেকে কার জন্য চুলা জ্বালাবে? একাই থাকতে হবে এখন।

রামাশীষ মদের নেশায় বুঁদ হয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। আজ আর পিঠে ব্যথা নেই। চোখের ওপর ফুটিফাটা চালা। সেই চালা বয়ে জ্যোৎস্না ঝড়ে পড়ছে। ওই রুপোলি আলো অধরা স্বপ্নকে যেন বাস্তব করে দিচ্ছে। রামাশীষের মনে হচ্ছে ঋণমুক্ত হাওয়ায় ভাসছে। তারমধ্যে ভেসে এল ফুলুয়ার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, "বাপুজি!"

"তুই খেয়ে শুয়ে পড় বিটিয়া।"

মদ খেয়ে এসে এরকম কথা রামাশীষ হামেশাই বলে থাকে। তবুও খাওয়ার জন্য ফুলুয়া পীড়াপীড়ি করে। আজ কিন্তু পীড়াপীড়ি না করে বলল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব বাপুজি।"

"তুই শুনেছিস বিটিয়া? একদম চিন্তা করিস না। আমি তো কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসব। সবাইকে বলে দিয়েছি তোর কথা। ভয় করলে দুলারীকে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে থাকবি। চুলা চালাতে যা লাগবে বৈজু ব্যবস্থা করবে।"

"কিন্তু যেখানে যাচ্ছ, সেখানে তোমার চুলা কে জ্বালাবে বাপুজি? অনেকেই তো পরিবার নিয়ে যাচ্ছে।"

"লালন, মোতি, লখন, সুদামার মত অনেকে তো একাও যাচ্ছে। কথা হয়ে গিয়েছে আমাদের। সবাই মিলে ব্যবস্থা হয়ে যাবে, চিন্তা করছিস কেন?"

একটু চুপ করে থেকে ফুলুয়া বলল, "না, আমি তোমার সঙ্গে যাব বাপুজি।"

দশ বছরের বিধবা মেয়েটার গলায় যে এরকম তেজ আর জেদ আছে আগে কোনদিন খেয়াল করেনি রামাশীষ। বউ মরে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি। বাহ্যিকভাবে ফুলুয়ার অস্তিত্বটা সবসময় মনে না থাকলেও ভিতর থেকে কোথাও একটা নির্ভরশীলতা গড়ে উঠেছে। ফুলুয়ার কাছে ঠিক খবরই এসেছে। কয়েকজনের পরিবার নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে দয়ারাম। সেটা দেখে রামাশীষেরও যে একবার ফুলুয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা মনে হয়নি, তা নয়। কিন্তু চার আনা নিয়ে নেওয়ার পর দয়ারাম মিশ্রকে আর ফুলুয়ার কথা জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। যদি রেগে পয়সাদুটো কেড়ে নিয়ে যাওয়াটাই বাতিল করে দিত।

ফুলুয়া অবশ্য ততক্ষণে নিজের মতিস্থির করে ফেলেছে। সব গুছিয়ে ফেলে দুটো পোঁটলা বেঁধে ফেলেছে। বড় পোঁটলা বাপুজির জন্য আর ছোটটা নিজের জন্য। ঘরে আছেই বা কী? দুটো পোঁটলা বাঁধতে আর কত সময় লাগে? তারপর সারা রাত ঘুম হল না ফুলুয়ার।

ভোরের আলো ফুটল। ফুলুয়া পুকুরে গিয়ে স্নান করে নিজের সবচেয়ে ভালো সাদা থানটা পরে নিল। আলো ফুটতেই দোপোহারি থেকে যারা ভাগ্য ফেরাতে যাবে, তারা এক জায়গায় জড়ো হতে থাকল। তাদের ঘিরে বুকের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস জমিয়ে যারা যাবে না তারাও।

রামাশীষের মনে তখনও সংশয়। বৈজুর খাতায় নাম তোলা নেই ফুলুয়ার, দয়ারাম মিশ্র রাজি হবে তো?

আরও একটু আলো ফুটতেই দয়ারাম মিশ্র হাজির হল। রামাশীষ একবুক দ্বিধা নিয়ে আমতাআমতা করে বলল ফুলুয়ার কথা। আর কি আশ্চর্য! দয়ারাম ঘোমটা টানা ফুলুয়ার ওপর এক ঝলক চোখ বুলিয়েই রাজি হয়ে গেল। তবে ফুলুয়ার জন্য দু'আনার দুটো পয়সা আর দিল না।

ফুলুয়ার পাশেপাশেই ছিল দুলারী। দয়ারামের রাজি হতে দেখেই দুলারী মুখ কালো করে খপ করে চেপে ধরল ফুলুয়ার হাত। ফুলুয়ার বয়স যেন এক রাতে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। ঠিক রামাশীষের মতোই দুলারীকে বলল, "চিন্তা করছিস কেন? ক'দিন পরেই তো ফিরে আসব।"

অনেক দূর যেতে হবে। দয়ারাম মিশ্র আর অপেক্ষা করল না। সার দিয়ে সবাইকে দাঁড় করিয়ে যাত্রা শুরু করল। দোপোহারি গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে ফুলুয়ার বুক হু হু করে উঠল। কিছু কি ফেলে যাচ্ছে? মাথায় পোঁটলাটা নিয়ে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘোমটা অল্প তুলল। গ্রামবাসীর মধ্যে মাথা নিচু দুলারী দাঁড়িয়ে আছে। আর গ্রামের একদম পশ্চিম কোণে কবরস্থান। যেখানে আজ থেকে একাই শুয়ে থাকবে লছু।

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে অষ্টম কিস্তি

ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের পরে জন গ্ল্যাডস্টোন ইনডেঞ্চার সিস্টেম নাম দিয়ে আরও একটা অনুরূপ প্রথার প্রচলন করতে পেরেছিলেন, ওলন্দাজরা শেষপর্যন্ত সেই পথেই হাঁটল। তার মডেলও এক। শুধু আইনকানুনগুলো একটু আলাদা।

তবে নামেও যেমন কিছু এসে যায় না তেমনই আইনেই বা কি এসে যায়? গরিবগুর্বো নিরক্ষর অসহায় লোকগুলো কি আর বোঝে কোন চুক্তিতে দয়ারাম মিশ্রর মতো দালালরা তাদের বুড়ো আঙুলের ছাপ নিয়ে নিচ্ছে। বিশ্বাস করো প্রিয়তমা, আমি কতদিন স্বপ্নে দেখেছি লাইন করে একদল মানুষ দোপোহারি গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাদের সবার শেষে ছোট্ট ফুলুয়া ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। আর করুণ মুখ নিয়ে গ্রামের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে দুলারী। নিষ্পলক হয়ে চেয়ে রয়েছে যতক্ষণ না রাস্তায় ফুলুয়া ছোট হতে-হতে একটা বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যায়।

দোপোহারি গ্রামটা যেমন ভারতবর্ষের কোথায় জানি না, সেরকমই জানি না সেসময় কতটা কষ্ট করে ওঁদের কলকাতা শহরে আসতে হয়েছিল। প্রথমদিককার কোনও তথ্য বা সরকারি নথি নেই। শুধু জানা যায় দয়ারাম মিশ্রর মত দালালদের কথা। যারা সুবিধামতো ওঁদের সম্পূর্ণ ভুল বোঝাত। তাঁরা বুঝতেও পারতেন না বড়লোক হয়ে ফেরার যে স্বপ্ন নিয়ে তারা পারি দিচ্ছেন, তা আসলে হচ্ছে যাবজ্জীবন দেশান্তর।

মানুষ চালান করার এই দালালরাজ তো মানব সভ্যতার অঙ্গ হয়ে এই ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ র যুগেও রয়ে গিয়েছে, তাই না প্রিয়তমা? দালালদের মিথ্যে স্বপ্ন আর প্রলোভনে প্রত্যেকদিন কত মেয়েরা চালান হয়ে যাচ্ছে। আবার দ্যাখো, এই যে ফ্লাইটে আমি দিল্লি চলেছি এই ফ্লাইটেরই কোনও এক সিটে হয়তো বসে আছে দু'চোখে স্বপ্ন মাখা এক যুবক, যে হয়তো মধ্যপ্রাচ্যের কোনও দেশে যাচ্ছে। দালালের দেওয়া সব মিথ্যে আশ্বাসগুলো কয়েক ঘন্টা পরেই হয়তো ভেঙে খানখান হয়ে যাবে যখন তার নিয়োগকর্তা তার পাসপোর্টটা নিয়ে অনন্তকালের জন্য নিজের কাছে রেখে দেবে।

গল্পের এই গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে সূত্র হিসাবে আমি তোমাকে এইসব লিখতে চাইছি না প্রিয়তমা। আমি তোমাকে শুধু ফুলমতীমাঈ আর তার দেশের গল্পটুকুই লিখতে চাইছি। কিন্তু বারবার গল্পের সুতোয় জট পাকিয়ে ফেলছি। কিন্তু দেখে নিও, টেসেল আইল্যান্ডে সমুদ্রের তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে একটুও খেই হারিয়ে না ফেলে তোমাকে গল্পটা নির্মেদ শোনাব।–

যাইহোক, বড় হয়ে বাড়িতে ফুলমতীমাঈয়ের সম্পর্কে আলোচনায় সেই সময়ের কথা যেটুকু শুনেছি, রামাশীষ, লালন, মোতি, সুদামার মতো লোকেরা একবার গ্রামের সীমানাটুকু পার করলেই দয়ারাম মিশ্রদের কড়া নজরে বন্দি হয়ে যেত। প্রথমে তাদের লখনউ, ফৈজ়াবাদ, পটনার মত কোনও শহরের ডিপোতে নিয়ে আসা হত। ডিপো মানে এক ধরনের জেলখানা। সেই ডিপোতে একে-একে এনে জমা করা হতো অন্য গ্রাম থেকে লোকও। ডাক্তার, ম্যাজিস্ট্রেটের ছাড়পত্র নেওয়া হত। তারপর সবাইকে নিয়ে আসা হত কলকাতার মূল ডিপোতে।

ওলন্দাজদের জন্য ডাচ গায়ানায় চুক্তি করে ভারতীয় কুলিদের নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথম জাহাজ এসেছিল লিভারপুল থেকে। সেই জাহাজের নাম ছিল 'লাল্লা রুখ'। জাহাজটার নাম 'লাল্লা রুখ' কেন দেওয়া হয়েছিল জানি না! খোঁজ করতে গিয়ে জেনেছি মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মেয়ে ছিলেন 'লাল্লা রুখ'।

'লাল্লা রুখ' জাহাজটা কিন্তু ব্রিটিশদের মূল বন্দরে এসে নোঙর করেনি। ব্রিটিশরা ওলন্দাজদের জন্য সব আলাদা ব্যবস্থা রেখেছিল। কুলিদের জন্য আলাদা ডিপো, আলাদা বন্দর ইত্যাদি। রামাশীষদের রাখা হয়েছিল বন্দর থেকে কয়েক মাইল দূরে ভবানীপুর ডিপো বলে একটা জায়গায়। সেখানে শুধু দোপোহারি থেকে লালন, মোতি, সুদামাদের নিয়েই এসে রাখা হয়নি, বেরিলি, গোরখপুর, মির্জ়াপুর, আজমগড়, ফৈজ়াবাদ, বারাণসী ইত্যাদি জায়গার ধারেকাছে প্রত্যন্ত গ্রামগুলো থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল রামাশীষদের মতোই বহু মানুষকে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ হিন্দু হলেও মুসলমান ধর্মের মানুষও কিছু ছিলেন।

তারপর এল সেইদিনই। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩। ভবানীপুর ডিপো থেকে বাছা হল ৪১০ জনকে। পুরুষদের দেওয়া হল একজোড়া ধুতি, মহিলাদের একজোড়া শাড়ি। তাদের জাহাজের খোলে ভর্তি করে 'লাল্লা রুখ' ছাড়বে।

প্রিয়তমা, ভারত মহাসাগর থেকে শুরু করে আটলান্টিকের নীল সমুদ্রের জলের ঢেউ আমি স্বপ্নে মাঝে-মাঝে দেখি। যখন অগমেন্টেড রিয়্যালিটির প্রোগ্রাম লিখি, ডেটা মডেলিং করি, তখন কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যের প্রাচীর কীভাবে ভেঙে চুরমার করে দেব ভাবি। প্লেনের জানলার বাইরে দিয়ে নিচে যখন ওই বিক্ষিপ্ত আলোর বিন্দুগুলো দেখছি, তখন একবার যেমন মনে হচ্ছে ওই বিন্দু আলোগুলো দেড়শ বছর আগের দোপোহারি গ্রামের, আবার মনে হচ্ছে ওই আলোর বিন্দুর মধ্যে আজকেও কোথাও রাতের রুটি জোগাড় করার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে মিতালি, কালকে আরও একটা কাজ পাওয়ার অপেক্ষা করে রয়েছেন শচীবাবু বা কোনও বাড়ির বসার ঘরে রয়েছে ঐশী আর ওর বাবা মা। আর কেউ যেন আমার মাথার মধ্যে বলছে, আবার ফিরে এসো এই দেশটায়।

তোমাকে আমি শচীবাবু নামটা বললাম। অথচ শচীবাবু কে, সেটা বলা হয়নি। এবার ওঁর পরিচয়ের সূত্রটা উল্লেখ করে রাখি। ওঁর কথা না বললে কলকাতা দেখার অনেক কথা বলাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

॥ ৮ ॥

সদর স্ট্রিটে নিউ মোনালিসা হোটেল খুঁজে নিতে কোনও অসুবিধে হল না শচীকান্ত লাহিড়ীর। আচমকাই কাজটা পেয়েছেন কাল বেশ রাতের দিকে। কিন্তু তারপরেই শুরু হয়েছিল টেনশন। ঠিক করে করতে পারবেন তো? করতে পারলেই অর্জুন সান্যালের অফিসে গিয়ে পাওয়া যাবে কড়কড়ে একটা পাঁচশ টাকার নোট আর মুক্তি পাওয়া যাবে আদ্যিকালের একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে।

কাল রাত্রে ফোনের কথা আবার মনে পড়ল শচীকান্তর। মোবাইলে একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন।

"শচীকান্তবাবু বলছেন?"

"আজ্ঞে।"

ও প্রান্তে যেন স্বস্তির শ্বাস পড়ল, "উফ্! ল্যান্ডলাইন ছেড়ে দিয়ে মোবাইল নিয়েছেন। নম্বর তো জানাবেন মশাই অফিসে!"

তখনও বুঝতে পারছেন না ও প্রান্তে গলাটা কার। ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করতেই উত্তর পেলেন, "অর্জুন সান্যাল। আচ্ছা শুনুন আপনি লঞ্চ পারাপার করে আমাদের সালকিয়ার ফ্যাক্টরিতে আসতেন না?"

শচীকান্ত বেশ অবাক! যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন, সেখানে অর্জুন সান্যাল লেবার অফিসার ছিলেন। শচীকান্ত সামান্য কেরানি ছিলেন। তাও আট বছর হল রিটায়ার করেছেন। তারপর থেকে ফ্যাক্টরি বা অফিসের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। সেই অর্জুন সান্যাল এত রাত্রে ফোন করে এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না।

"যখন চাকরি করতেন তখন কলকাতার গঙ্গা নিয়ে একটা বই লিখেছিলেন না?"

উত্তর দিতে গিয়ে শচীকান্তর গলা একটু কেঁপে গিয়েছিল। তখন লঞ্চে একটা ডেলি প্যাসেঞ্জারির দল হয়েছিল। তারা প্রতিদিন যাতায়াতের পথে গঙ্গার দূষণ দেখত। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান তখনও সরকার করেনি। দলটার হুজুগ হয়েছিল একটা বই লেখার। শচীকান্তর লেখার হাত ভালো। লিখেও ফেলেছিলেন বইটা। সবাই মিলে তথ্য জোগাড় করে দিয়েছিল। চাঁদা করে নিজেদের পয়সাতেই ছাপতে হয়েছিল বই। কিন্তু বিপত্তি হয়েছিল একটাই। লিখতে গিয়ে তার ফ্যাক্টরি থেকেও গঙ্গায় বর্জ্য ফেলা হচ্ছে, তা অফিসের ফাইলের তথ্য দিয়ে লিখে ফেলেছিলেন। সেই নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। তথ্য চুরির দায়ে চাকরি যে চলে যায়নি সেই ভাগ্যি। তবে অফিসে খুব গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মূল দফতর ছেড়ে ক্যান্টিন দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়েছিল। তথ্যের কোনও ফাইলে হাত দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

"আছে নাকি সেই বইটা?" অর্জুন সান্যাল রহস্য করে জিগ্যেস করেছিলেন।

"না স্যার।" শচীকান্ত আরও ঘাবড়ে যাচ্ছিলেন। চিরকালের ভিতু প্রকৃতির মানুষ। ওই একবারই অমন একটা দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। এতদিন পরে আবার মামলা মোকদ্দমা হল নাকি? আদালতে তো কোনও কোনও মামলা কুড়ি পঁচিশ বছর পরও ওঠে।

"যাঃ নেই। আচ্ছা পাণ্ডুলিপিটা আছে নাকি?"

"না, স্যার। সেটাও নেই। তবে পাণ্ডুলিপি বলতে যে খাতাটায় লিখেছিলাম...মানে ডায়েরি একটা... সেটা আছে।"

"বাঃ! তাহলেই হবে। শুনুন একটা কাজ আছে..."

কাজ শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন শচীকান্ত। টেনশন কেটে গিয়েছিল। বরং খুব ভালো লেগেছে। কাজ, আঃ! কতদিন পর একটা কাজ পেলেন। শচীকান্ত আর দু'বার ভাবেননি। সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। কৌস্তুভ চট্টোপাধ্যায়কেও চেনেন। হেড অফিসের বড়সাহেব। তবে কাজটা বিনা পয়সায় করাবেন না অর্জুন সান্যাল। পাঁচশ টাকা দেবেন। কিন্তু কাজটা ঠিক করে করতে পারবেন তো?

আজকাল নাকি ইন্টারনেটেই সব তথ্য পাওয়া যায়। গোটা পৃথিবীর প্রতিটা রাস্তা, গলিঘুঁজির ম্যাপ নাকি গুটিয়ে রাখা আছে মুঠো ফোনের মধ্যে। শচীকান্তর স্মার্ট ফোন নেই। সাধারণ একটা মুঠো ফোন আছে। তাতেই কাজ চলে যায়। কাল রাতে কাজটা নিয়ে ফেলে যখন ঘুম চটে মনের মধ্যে সংশয় তৈরি হয়েছিল, তখন নিজেই নিজেকে বুঝিয়েছেন, যে শহরে জন্মেছেন, যে শহরে জীবনের আটষট্টি বছর কাটিয়ে ফেলেছেন, একটা বিদেশি ছেলেকে আধবেলা সেই শহরটা ঘুরিয়ে দেখানো আর কী এমন কাজ? দেখতে তো চেয়েছে কলকাতা গঙ্গার কয়েকটা ঘাট। তা ছাড়া একটা গাড়ি থাকবে সঙ্গে।

হোটেলে ঢোকার আগে কাঁধের শান্তিনিকেতনী ঝোলা থেকে বহু বছরের পুরনো ডায়েরিটা বের করলেন শচীকান্ত। আজ অনেক ভোরে উঠে স্নান-পুজো করে মাথায় মোটামুটি ছকে ডায়েরিতে টুকে রেখেছেন কোথা থেকে শুরু করবেন, তারপর কীভাবে এগোবেন? কোন-কোন গঙ্গার ঘাট দেখাবেন? আর লিখে রেখেছেন সদর স্ট্রিটের এই নিউ মোনালিসা হোটেলের নাম ও ওলন্দাজ ছেলেটার নাম, আবেল ভ্যান ডার বার্গ।

হোটেলে ঢুকে একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন শচীকান্ত। রিসেপশনে কেউ নেই। পিছনে পাঁচটা ঘড়িতে পাঁচটা বিভিন্ন শহরের সময় দেখাচ্ছে। মধ্যের ঘড়িটা কলকাতার। সময় দেখাচ্ছে সাতটা কুড়ি। বড্ড সকাল-সকাল হয়ে গেল বোধ হয়। হোটেল এখনও ঘুমন্ত। একটা লোক ঝাড়ু দিচ্ছে। অর্জুন সান্যাল কোনও নির্দিষ্ট সময় বলেননি। বলেছিলেন, সকাল-সকালই পৌঁছে যেতে আর নিজেকে 'হেরিটেজ ওয়াকার' পরিচয় দিয়ে বলতে কৌস্তুভ চট্টোপাধ্যায় পাঠিয়েছেন। গাড়িকেও সেভাবে বলা আছে। হোটেলের বাইরে ইতস্তত কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কোনও গাড়িটা ওঁদের জন্য বলা আছে কে জানে!

ঝাড়ুদারকে গিয়ে শচীকান্ত ফাঁকা রিসেপশন দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাই, কেউ নেই?"

নির্লিপ্ত গলায় লোকটা রিসেপশনের উলটোদিকে একটা সোফাসেট দেখিয়ে বলল, "বসুন। আসবে।"

ব্যাগ সামলে একটু ইতস্তত করে পিঠ টান করে সেই সোফায় গিয়ে বসলেন শচীকান্ত। সামনে টেবিলের ওপর কয়েকটা পাট না ভাঙা আজকের ইংরেজি-বাংলা খবরের কাগজ। আলগোছে তারই ওপর চোখ বোলাতে থাকলেন।

একটু পরে দুটো গলার আওয়াজ শুনে রিসেপশন ডেস্কের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। ছেলেটার পরনে টাই-কোট দেখে বুঝলেন সে হোটেলের ম্যানেজার গোছের কিছু। তবে নীল জিনসের প্যান্টস আর কালো জামা পরা মেয়েটা হোটেলের বোর্ডার না কোনও কর্মচারী বুঝতে পারলেন না। ওদের মধ্যে কিছু একটা বিষয় নিয়ে তর্ক হচ্ছে। ছেলেটা এক ঝলক শচীকান্তকে দেখে স্বর নিচে নামাল। মেয়েটার গলা অবশ্য একইরকম উঁচুতে থাকল।

কানে হিয়ারিং এড আছে শচীকান্তর। ব্যাটারিটা ক'দিন আগে বদলেছেন। এখন বেশ স্পষ্ট শোনা যায় কথা। এবার খবরের কাগজটা তুলে খুলে মুখের সামনে ধরে কান পাতলেন ওদের কথায়। ওদের তর্কের মধ্যে গিয়ে ছেলেটার কথা জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। অপেক্ষা করতে হবে।

ছেলেটা বলল, "আমি তো বলছি রোজি, স্যার জেনে যাবেন তুমি রাতে ছেলেটার ঘরে ছিলে।"

"সকালবেলাতে তুমি চুকলি করলে জেনে যাবে।"

"আঃ! আমি কেন বলতে যাব? করিডরের সিসিটিভি ফুটেজ দেখলেই বুঝে যাবে।"

"এরপর থেকে ঘরের মধ্যেও লুকিয়ে সিসিটিভির ক্যামেরা লাগিয়ে রাখ।"

"মানে?"

"তাহলে বুঝতে পারবে, ছিলাম। কিন্তু সেক্স হয়নি। কোনও পেমেন্ট দেয়নি।"

"বারবার এক কথা বলছ, কেন? তুমি তাহলে ছিলে কোন যুক্তিতে? স্যার এসব মানবেন না। স্যারের যা কমিশন দিয়ে যাও।"

"আচ্ছা মাকাল তো তুমি। বিশ্বাস করছ না। বলছি তো শিয়ালদহে গিয়ে লাস্ট ট্রেন ধরার আর সময় ছিল না বলে রয়ে গিয়েছিলাম। নাহলে কোথায় থাকতাম আমি? তোমার পাশে শুতে দিতে? সে ধক তো নেই।"

"এসব স্যার বুঝবেন না।"

"আরে বাবা! টাকা পেলে আমি কোথায় রাখব? আমার ব্যাগ সার্চ করো। বুক পকেটে, প্যান্টের পকেটে যেখানে ইচ্ছে হাত ঢুকিয়ে চেক করো। সেয়ানার সেয়ানা ছেলে একটা। কোথায় থাকে জানো? অ্যামস্টারডামে। কলেজে পড়ে। এই বয়সেই ওখানকার সোনাগাছিতে যায়। গোল-গোল চশমা পরে ভাব করছিল এমন যেন ভাজা মাছটা উলটে খেতে পারে না। আসলে মুরোদ নেই শালার। বলে কিনা গঙ্গা দেখতে এসেছে। শরীর বেচে খাই। গুণ্ডা মস্তানি করি না বলে টাকা কেড়ে নিতে পারিনি।"

"ঠিক আছে, তুমি যাও এখন। স্যার যখন আসবেন তখন স্যারকে

এ সব বুঝিও।"

"যাচ্ছি। নিউ মার্কেটে একটা কাজ সেরে বাড়ি যাব এখন। বিকেলে আসব। দেখবে ওর কাছে আজ যেন আর অন্য কোনও মেয়ে না আসে। পুরো পয়সা উসুল করব আজকে।"

মেয়েটার গলার আওয়াজ থেমে গেল। শচীকান্ত তবুও খানিকক্ষণ খবরের কাগজে অহেতুক মুখ ডুবিয়ে রাখলেন। মেয়েটার কথা থেকে পুরো আন্দাজ করে ফেলেছেন মেয়েটা কে! একই সঙ্গে মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন ঝুলছে। মেয়েটা কয়েকটা শব্দ বলেছে, আমস্টারডাম, কলেজে পড়ে, গঙ্গা দেখতে এসেছে। অর্জুন সান্যাল একই কথা বলেছিল। তার সঙ্গে বলেছিল সরল সাধাসিধে কলেজ পড়ুয়া ছেলে। একটা স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এখানে এসে দিনকতক বেশি রয়ে গিয়েছে। মেয়েটা কি রাতে ওই ছেলেটার ঘরেই ছিল? মেয়েটা কি সত্যি কথা বলছে? রাতে ওর ঘরে ছিল কিন্তু কোনও যৌন মিলন হয়নি? অবশ্য এইসব মেয়েরা কি আর সত্যি কথা বলে?

"এক্সকিউজ় মি। আপনি কি কাররও সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?"

হিয়ারিং এডে গমগম করে উঠল গলাটা। শচীকান্ত মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা নামিয়ে দেখলেন রিসেপশনের ছেলেটা জিজ্ঞাসু চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি কাগজটা পাট করে শশব্যস্ত হয়ে রিসেপশনের সামনে এসে সপ্রতিভ হয়ে বলার চেষ্টা করলেন, "গুড মর্নিং স্যার। আমি শচীকান্ত লাহিড়ী।"

ছেলেটা শচীকান্তকে দেখে একটু বিরক্ত মুখে বলল, "কোনও দরকারে এসেছেন?"

"হ্যাঁ, মানে আমাকে অর্জুন সান্যাল মানে কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় পাঠিয়েছেন।"

"কে কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়? কী ব্যাপারে?"

"আপনাদের এখানে একজন বোর্ডার আছেন, বিদেশি, আমস্টারডাম থেকে এসেছেন। নাম হচ্ছে... আবেল..." আবার নামটা গুলিয়ে গেল শচীকান্তর। তাড়াতাড়ি শান্তিনিকেতনী ব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করে বললেন, "আবেল... আবেল ভ্যান ডার বার্গ।"

নামটা শুনে ছেলেটার মুখটা একটু কৌতূহলী হলো, "কী দরকার ওর সঙ্গে?"

"অর্জুনবাবু মানে কৌস্তভস্যার বলেছেন ওকে একটু কলকাতা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতে। একটা গাড়িও পাঠিয়ে দেবেন।"

"আপনি আগে নামটা ঠিক করে বলুন তো। একবার বলছেন অর্জুনবাবু আবার বলছেন কৌস্তভস্যার। এরা কে তাই তো বুঝতে পারছি না!"

"ওই তো কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় সাহেবই কাল নিজে এসে অ্যাবেল সাহেবকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন।"

ছেলে মাছি তাড়ানোর মতো হাত নাড়তে থাকল, "না, না। আমার কাছে গেস্ট কোনও ইনফর্মেশন দিয়ে রাখেনি। আমরা দালাল, সেলসম্যান, গাইড, রাস্তার মেয়েছেলে কাউকে হোটেলের মধ্যে অ্যালাউ করি না।"

শচীকান্ত মরিয়া হয়ে বললেন, "আমি হেরিটেজ ওয়াকার।"

"ওই একই হলো। আমার কাছে কোনও ইনফর্মেশন নেই।"

একটু হতভম্ব হয়ে শচীকান্ত বললেন, "তাহলে?"

ছেলেটা এবার রীতিমতো বিরক্ত হল, "সে আমি কী বলব? হোটেলের গেটে অপেক্ষা করুন। গেস্ট যখন বুঝবেন, আপনাকে মোবাইলে ফোন করে ডেকে নেবেন।"

"মোবাইল? আমার মোবাইল নম্বর তো ওর কাছে নেই।"

ছেলেটা রেগে উঠে গলা চড়াল, "এতো মশাই সাতসকালে মহা মুশকিল। আপনি বাইরে যান তো।"

শচীকান্তর কাজ এইখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়েই রিসেপশনে এসে হাজির হল আবেল। শচীকান্ত অবশ্য আবেলকে চিন্তে পারেননি, পারার কথাও না। আবেলের কথার মধ্যে একটা উচ্চারিত নামেই শচীকান্তর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল আবেলের পরিচয়।

শচীকান্ত দেখলেন সোনালি চুলের গোল-গোল চশমা পরা ছেলেটা রিসেপশনের ছেলেটাকে বলল, "গুড মর্নিং।"

"গুড মর্নিং স্যার।"

"আমার জন্য মিস্টার কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়ের একটা গাড়ি পাঠানোর কথা। ড্রাইভার এসেছে কি?"

"এখনও কেউ আসেনি স্যার।"

"ঠিক আছে। আমি রেস্তোঁরায় ব্রেকফাস্ট করছি। এলে অপেক্ষা করতে বলবেন।"

ড্রাইভার আসেনি। কিন্তু অন্য কেউ এসেছে। সে এক হাত দূরত্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ শচীকান্তর কথাটা একবারও বললও না রিসেপশনের ছেলেটা। অবশ্য কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় আর গাড়ির ড্রাইভার শুনে শচীকান্তর কোনও সন্দেহ রইল না, যার কাজ করতে এসেছেন সে সামনেই দাঁড়িয়ে। ছেলেটার নাম আবেল। তবে পদবী বারবার গুলিয়ে যাচ্ছে। বিশেষত টেনশনের সময়। বারবার পদবী মনে হচ্ছে ভ্যাঙ্কুবার। তাড়াতাড়ি শান্তিনিকেতনী ব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করে পড়ে তিনবার মনে-মনে মুখস্থ করার মতো আউরে নিলেন, ভ্যান ডার বার্গ, ভ্যান ডার বার্গ, ভ্যান ডার বার্গ।

"মিস্টার ভ্যান ডার বার্গ।"

আবেল একটু অবাক হয়ে শচীকান্তর দিকে ঘুরে তাকাল। রোগা, নির্মেদ চেহারার ঋজু এক বৃদ্ধ। সাদা জামা-প্যান্ট। জামার বোতামগুলো কলার পর্যন্ত লাগানো। সকালবেলাতেই স্নান করা ভিজে চুল টানটান করে আঁচড়ানো। কপালের মাঝখানে একটা খুব ছোট্ট লাল-সাদা তিলক। কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা কাপড়ের ব্যাগ।

শচীকান্ত যথাসম্ভব সপ্রতিভভাবে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করলেন, "আমি শচীকান্ত লাহিড়ী। হেরিটেজ ওয়াক করাই। কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় স্যার আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে কলকাতার কয়েকটা বিশেষ জায়গা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য।"

আবেলের অবাক ভাব কাটল না। তবে ভিতরে-ভিতরে খুব খুশি হল। ফুলমতীমাঈয়ের দেশের মানুষগুলোর মন সত্যিই ভালো। শুধু গাড়ি নয়, ঐশীর বাবা গতকাল গাইডের কথাও বলেছিলেন। এক রাতের মধ্যে ব্যবস্থা করে তাকেও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

"নমস্তে।" অ্যালেন হাত জোড় করে অল্প ঝুঁকে নমস্কার করল।

বিদেশিরা ভারতবর্ষে এলে প্রথমেই বোধহয় এই শিষ্টাচার শেখে। শচীকান্ত প্রত্যুত্তরে নমস্কার বলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে 'নমস্তে'ই বললেন।

আবেল বলল, "মিস্টার চট্টোপাধ্যায়ের ওপর আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়ব। উনি আবার গাড়িরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আশাকরি তারমধ্যে চলে আসবে। আসুন না ভিতরে।"

শচীকান্ত একবার রিসেপশনের ছেলেটার দিকে চাইলেন। যে একটু আগে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে চাইছিল, সে এখন আর কিছুই বলতে পারছে না। বুকের মধ্যে একটা ঠান্ডা স্বস্তি। আবেলের পিছন-পিছন রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন।

ব্রেকফাস্ট শুরু হয়েছে। একদিকের কাউন্টারে নানা রকম খাবার। আবেল বলল, "চলুন একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করতে-করতে কথা বলি।"

শচীকান্ত সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, "আমি সকালে খেয়ে বেরিয়েছি। আপনি ধীরেসুস্থে খেয়ে নিন না। আমি অপেক্ষা করছি।"

আবেল জোরাজুরি করল না। একটা টেবিলে শচীকান্তকে বসতে বলে নিজের খাবার আনতে গেল। শচীকান্ত লোভী নন, দৃষ্টি খিদেও নেই। কিন্তু এখানে এই সকালবেলাতেই কতরকম খাবার পাওয়া যায় সেটা দেখতে কৌতূহলী হয়ে পড়লেন। আর সেই কৌতূহলের সঙ্গে মিশে ছিল আবেলকে বুঝে ওঠা। নিষ্পাপ যুবকের মুখ। সে কিনা রাত কাটিয়েছে একটা পতিতার সঙ্গে! ব্যাপারটা মিলিয়ে নিতে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, এই অস্বস্তি অনর্থক। একবেলার কাজটা করলেই পাঁচশ টাকা আর পুরনো অফিসের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে, সেটাই আসল। ছেলেটা তো

আর সোনাগাছি ঘুরতে যেতে চায়নি। দেখতে চেয়েছে গঙ্গার কয়েকটা ঘাট।

কিছু ফলমূল, দুধ-কর্নফ্লেকস, বান রুটি নিয়ে আবেল টেবিলে ফিরে এসে বলল, "খুব ভালো হল আপনাকে পেয়ে। নাহলে অল্প সময়ে যা দেখতে চাই দেখে উঠতে পারতাম না।"

ছেলেটা খদ্দের। খদ্দেরকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। কৌস্তুভ চট্টোপাধ্যায় বড় সাহেব। তার কাছে ছেলেটা প্রশংসা করে গেলে এরকম টুকিটাকি আরও কাজ হয়তো ভবিষ্যতে পাওয়া যেতে পারে। সময় নষ্ট না করে তাই খদ্দেরের মন রাখতে শচীকান্ত বলতে শুরু করলেন, "আমারও সবচেয়ে কী ভালো লাগছে জানেন মিস্টার..."

"আপনি আমাকে আবেল বলুন।"

শচীকান্ত নিশ্চিন্ত হলেন। আর অন্তত ওই বারবার পদবি গুলিয়ে যাওয়া নিয়ে ভাবতে হবে না।

"ঠিক আছে। ধন্যবাদ। আমার সবচেয়ে কী ভালো লাগছে আবেল, কেউ একজন কলকাতার ঘাটগুলো দেখতে চাইছেন। কলকাতা শহরের মূল তো ঘাট-ই। সেই কবে, ১৬৯০ সালে জোব চার্নক এই একটা ঘাটে নেমেই পত্তন করেছিলেন কলকাতার। কলকাতার ঘাটগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। বলছি আপনাকে। এক মিনিট..."

শান্তিনিকেতনী ঝোলা থেকে পুরনো ডায়েরি বের করে ব্যস্ত হয়ে পাতা ওলটাতে শুরু করলেন শচীকান্ত। আবেল বলল, "ওসব পরে হবে। আপনি অন্তত একটু চা খান।"

হাত তুলে ওয়েটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল আবেল। শিউচরণেরই প্রথম চোখে পড়ল। আসলে যতবার ছেলেটাকে দেখছে, রাগ মিটছে না। কাল সারারাত রোজিকে নিয়ে ফূর্তি করেছে ওদিকে বকশিস দেওয়ার বেলায় দশ টাকা। একটা বদলা নেওয়ার জন্য ভিতরটা নিশপিশ করছে।

শিউচরণ এগিয়ে এল।

"এক কাপ চা, ওঁর জন্য।"

ব্রেকফাস্টের এই সময়ে চা এমনিই কমপ্লিমেন্টারি দিতে পারত শিউচরণ। কিন্তু বলল, "বাইরের গেস্টের চা, আলাদা চার্জ লাগবে।"

আবেল শিউচরণের দিকে তাকিয়ে চা দিতে চোখের ইশারা করল।

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে নবম কিস্তি

জানো প্রিয়তমা, আমার মন শচীবাবুকে দেখে আরও অস্থির হয়ে উঠেছিল। ঐশীর বাবার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কাল রাত্রে যেমন বলেছিলেন তেমনই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমার একটুও সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করছিল না। ভিতরে-ভিতরে ছটফট করছিলাম, ঠাকুরমার মুখে ছোটবেলায় যে ম্যাজিক গঙ্গার কথা শুনতাম, কখন তার জলে হাত দিয়ে বুঝতে পারব সেই ম্যাজিকটা ভার্চুয়াল না রিয়েল।

আসলে কী জানো তো? সেই ডেটা। অনেক খুঁজেও আমার কাছে কোনও তথ্য নেই। কিন্তু ভারতীয় রেলপথের ইতিহাস ঘেঁটে আমার মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, রামাশীষরা কলকাতায় জলপথে এসেছিলেন। যদিও তথ্যে পেয়েছি ১৮৬৪ সালে কলকাতা দিল্লির মধ্যে রেলপথ তৈরি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু রামাশীষদের কি সেটা ব্যবহার করতে দেওয়া হত? দোপোহারি গ্রামও নিশ্চয়ই কোনও রেল স্টেশনের পাশে ছিল না। তাই আমার মনে হয় দীর্ঘ পথ অক্লান্ত হেঁটে কোনও এক গঙ্গার ঘাট থেকে নৌকায় গাদাগাদি করে এসে রামাশীষরা কলকাতার এমন কোনও একটা ঘাটে এসে নেমেছিলেন, যেটা হয়তো কিছুক্ষণ পরই শচীবাবু আমাকে দেখিয়ে দেবেন।

কাল রাত্রে আমার ঘরে যখন রোজি ভীষণ ক্লান্ত শরীর নিয়ে অঘোরে ঘুমচ্ছিল, আমি সোফায় অনেকক্ষণ জেগে বসে-বসে ভাবছিলাম, দশ বছরের ছোট্ট মেয়ে ফুলুয়া কি কোনদিন রাতে এরকম নিশ্চিন্ত ঘুমতে পেরেছিল যখন দোপোহারি থেকে কলকাতায় এসেছিল বা তারপর সাগরপাড়ি দিয়েছিল।

বিশ্বাস করো, আমার চোখে যখন তন্দ্রা চলে এসেছিল, আমি কানের কাছে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম জাহাজের ভোঁয়ের আওয়াজ। জাহাজটা দুলে উঠল। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি আর অবোধ্য চুক্তিতে সই করে একদল গরীব মানুষ চলেছে তাদের ভাগ্য ফেরাতে। তাদের বিশ্বাস ঈশ্বর প্রেরিত জাহাজের খোলের মধ্যে মাত্র দু'দিন কষ্ট করে সফর করলেই তারা পৌঁছে যাবে সোনা কুড়িয়ে পাওয়ার সেই দেশে।

জাহাজ ক্রমশ আরও সমুদ্রের গভীরে যায়। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই শুধু জল আর জল। সমুদ্র থেকে মহাসমুদ্র। চারদিকে শুধু রাশি-রাশি নীল জল। বড়-বড় ঢেউ। গাদাগাদি করে অত মানুষ যাচ্ছেন, তাদের পর্যাপ্ত খাবার তো দূরস্থান, পর্যাপ্ত পানীয় জল পর্যন্ত নেই। জাহাজের সেই দুলুনি সবার সহ্য হয় না। বমি করে, ডায়রিয়া হয়, অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবু তারা ভাবে আজ সন্ধেয় নীল জলের মধ্যে যে কমলা সূর্য ডুবেছে, রাত পোহালে কাল সকালে সেই সূর্য উঠে দেখিয়ে দেবে দূরে সেই সোনার ডাঙা, যা ভাগ্যদেবতার আপন দেশে। আশায় বুক বেঁধে মুসলমানরা স্মরণ করে বিসমিল্লাহকে, নিয়ম করে পাঁচ বার নমাজ পড়ে। হিন্দুরা সূর্যস্তব করে, হনুমানচালিশা পড়ে। একে অন্যর মন ভালো করতে মনগড়া গল্প শোনায়। ফুলুয়া কখনও-কখনও খুব চাপা গলায় লহুর জন্য কৃষ্ণর ভজন গায়।

আচ্ছা প্রিয়তমা, টেসেল আইল্যান্ডে তোমার কোলে মাথা দিয়ে তোমাকে সূত্র ধরে এই গল্পটা বলব তখন যদি সূর্য কমলা হয়ে ওঠে বা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামে, তুমি উঠে চলে যাবে না তো? আমি জানি তুমি যাবে না।

॥ ৯ ॥

আজ দিনটা মার্কাসের কাছে অন্যরকম। পারামারিবো বন্দরের একটু দূরে একটা পরিত্যক্ত জেটি আছে। জায়গাটা ভালো লাগে মার্কাসের। সময় পেলে মাঝে-মাঝে আসে এই নির্জন জায়গায়। আজকে ওখানে এসে আচমকাই ঘোড়ার পিঠে দেখতে পেয়ে গেল এমিলিকে। এমিলির সঙ্গে ওর বাবা আলডার্ট বুগার্ড নেই। ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক প্রৌঢ় আফ্রিকান চাকর। মার্কাস এই চাকরটাকে বুগার্ড বাংলোতে দেখেছিল।

এমিলি যেখানে ঘোড়ার পিঠে রয়েছে তার সামনে নদীর খাঁড়ি। এমিলির হাতে একটা লম্বা চোঙা দূরবীন। সেই দূরবীন দিয়ে খাঁড়ি পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখছে।

এই নিরিবিলি পরিত্যক্ত জায়গায় এমিলিকে দেখতে পাওয়াটা অপ্রত্যাশিত। বুগার্ড বাংলোয় মিটিংয়ের দিন যেদিন এমিলিকে সামনাসামনি দেখে চোখ ঝলসে গিয়েছিল, সেদিন থেকেই বুকের মধ্যে একদম বসে গিয়েছে এমিলি। ব্যাপারটা বোধহয় প্রথমদিনেই বুঝতে পেরেছিল কাকা হেনড্রিক। সেদিন মিটিং থেকে ফেরার পথে আবার সেই স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

"এই জায়গায় এলে তোমার বাবা আর মায়ের মৃত্যু আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। দাদা-বউদি বিকেল বেলায় ঘোড়ায় চড়ে কুকুর নিয়ে বেরোল। তারপর সারারাত কোনও খোঁজ নেই। ভোরবেলায় ঘোড়া দুটো আর কুকুরটাকে খুঁজে পাওয়া গেল। আর ওই দূরে যে জায়গাটা দেখছ, ওই গাছটা, ওখানেই পাওয়া গিয়েছিল তোমার বাবা আর মায়ের ছুরিবিদ্ধ লাশ।"

"যেহেতু বুগার্ডদের খেতের প্রান্তরে বাবা মায়ের লাশদুটো পাওয়া গিয়েছিল, তাই কি আমরা ধরে নিই, আলডার্ট বুগার্ডের হাত ছিল..."

"ধরে নিই!" হেনড্রিক আরও গম্ভীর হয়ে উঠে বলেছিলেন, "তোমার গলাটা আজ হঠাৎ অন্যরকম কেন শোনাচ্ছে মার্কাস?"

"না, আসলে আমি বাবা মায়ের মৃত্যু নিয়ে অনেক ভেবেছি কাকা।"

"মৃত্যু নয় মার্কাস। দাদা আর বউদিকে খুন করা হয়েছিল। দাদার বুকে যে ছুরিটা বিঁধে ছিল, আলডার্ট বুগার্ড স্বীকার করেছিলেন সেটা ছিল ওর সংগ্রহের ছুরি।"

"আলডার্ট বুগার্ড এও বলেছিলেন সেই ছুরিটা ওর বাড়ি থেকে চুরি

হয়েছিল।"

"চুরি! হুম, তুমি আজ সেটা বিশ্বাস করছ?"

"না, বলছি। ছোটবেলা থেকে তো এটাই শুনেছি। বাবা আর মাকে মেরুন কলোনির আফ্রিকানরা খুন করে বুগার্ডদের খেতে একটা গাছের তলায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। আর তোমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ওই খুনের পিছনে আলডার্ট বুগার্ডের হাত ছিল। তার কিছুদিন পরেই তো তুমি আমাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলে।"

"কোনও উপায় ছিল না মার্কাস। ভীষণ একটা অশান্ত সময় ছিল তখন। নিগাররা তখন সদ্য স্বাধীন হয়ে যা ইচ্ছে করছে। ওরা হয়তো তোমাকেও মেরে ফেলত।"

"ওরা মানে কারা? বুগার্ড না আফ্রিকানরা?"

"দ্যাখো মার্কাস, বুগার্ড পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের শত্রুতা এই ডাচ গায়ানায় কারও অজানা নয়। এর আগেও দুটো পরিবারের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু মৃত্যু হয়েছে। আলডার্ট বুগার্ডের ছুরিবিদ্ধ লাশ যাতে মেরুন কলোনির কাছে পাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা করে ফেলা আমার কাছেও খুব কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু আমি জানি, বুগার্ড পরিবারকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সেটা উপায় নয়। তাই আমি ধৈর্য ধরেছি। তোমাকেও বারবার ধৈর্য ধরার কথা বলেছি।"

"কিসের ধৈর্য?"

"লন্ডন থেকে তোমাকে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে এনেছি আরও বুদ্ধিমান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। আমি সেইদিনেক স্বপ্ন দেখি যেদিন এই ডাচ গায়ানার সবচেয়ে বড় চিনি ব্যবসায়ী হবে তুমি। এখানে আর কোনও পরিবারের ব্যবসা থাকবে না। আলডার্ট বুগার্ডরা মুছে যাবে।"

মার্কাস চুপ করে গিয়েছিল। চিরকুমার কাকার এই স্বপ্ন কাকা বহুবার বলেছে। ভ্যান ডার বার্গ পরিবারের সঙ্গে শুধু বুগার্ড পরিবারেরই নয়, কাকার স্বপ্ন ডাচ গায়ানায় যত পরিবারের সঙ্গে রেষারেষি আর শত্রুতা আছে তাদের সব চাষবাস আর চিনির ব্যবসা গ্রাস করে মার্কাসকে চিনির ব্যবসার একছত্র অধিপতি করে দেবে। হেনড্রিক সেদিন আরও একটা ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেছিলেন, "ইতিহাস কী শিখিয়েছে আমাদের জানো মার্কাস? সুন্দরীরা চিরকাল সংকল্পে অটুট পুরুষদের বিপথগামী করেছে।"

যুবক মার্কাসের দুচোখের পাতা পুড়িয়ে মনের মধ্যে চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে এমিলি হেনড্রিকের বলা কথাগুলো মজ্জাগত করতে দেয়নি। সেদিন মিটিং এর পর বেশ কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে এক জাহাজ কুলি আসছে এই ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছে। হেনড্রিকের সঙ্গে মার্কাস ঘোড়ার পিঠে চেপে নিজেদের খেতের পরিদর্শনে বেরোয়। তখন মাঝে-মাঝে দেখে আলডার্ট বুগার্ডও এমিলিকে নিয়ে নিজেদের খেত পরিদর্শন করছেন। কিন্তু হেনড্রিক কখনই আর আলডার্টের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে কথা বলেননি। মার্কাসেরও তাই এমিলির সঙ্গে আর কোনও কথা বলার সুযোগ হয়নি।

আজ একটা অভাবনীয় সুযোগ এসেছে। পরিত্যক্ত এই জেটিতে এমিলি একা। আর ভাগ্যবলে মার্কাসও একা।

এমিলি চোখে দুরবীন দিয়ে মগ্ন হয়ে অথৈ জল দেখছে। ঘোড়াটাকে প্রায় নিঃশব্দে এমিলির ঘোড়ার পাশে এনে এমিলিকে চমকে দিয়ে মার্কাস বলে উঠল, "কী দেখছ?"

দুরবীন নামিয়ে নিজের টুপিটা সামলিয়ে এমিলি বিস্মিত চোখে বলল, "ও তুমি!"

"চিনতে পেরেছ তাহলে?"

এমিলি মিষ্টি করে গালে টোল ফেলে হেসে বলল, "চিনতে পারব না কেন? মার্কাস। আমাদের বাড়িতে তুমি এসেছিলে।"

এই হাসি বারবার মার্কাসের বুকে শরাঘাত ঘটায়। সেটা সামলে উঠে বলল, "তা সমুদ্রে কী দেখছিলে?"

"গাঙচিল। দেখবে?"



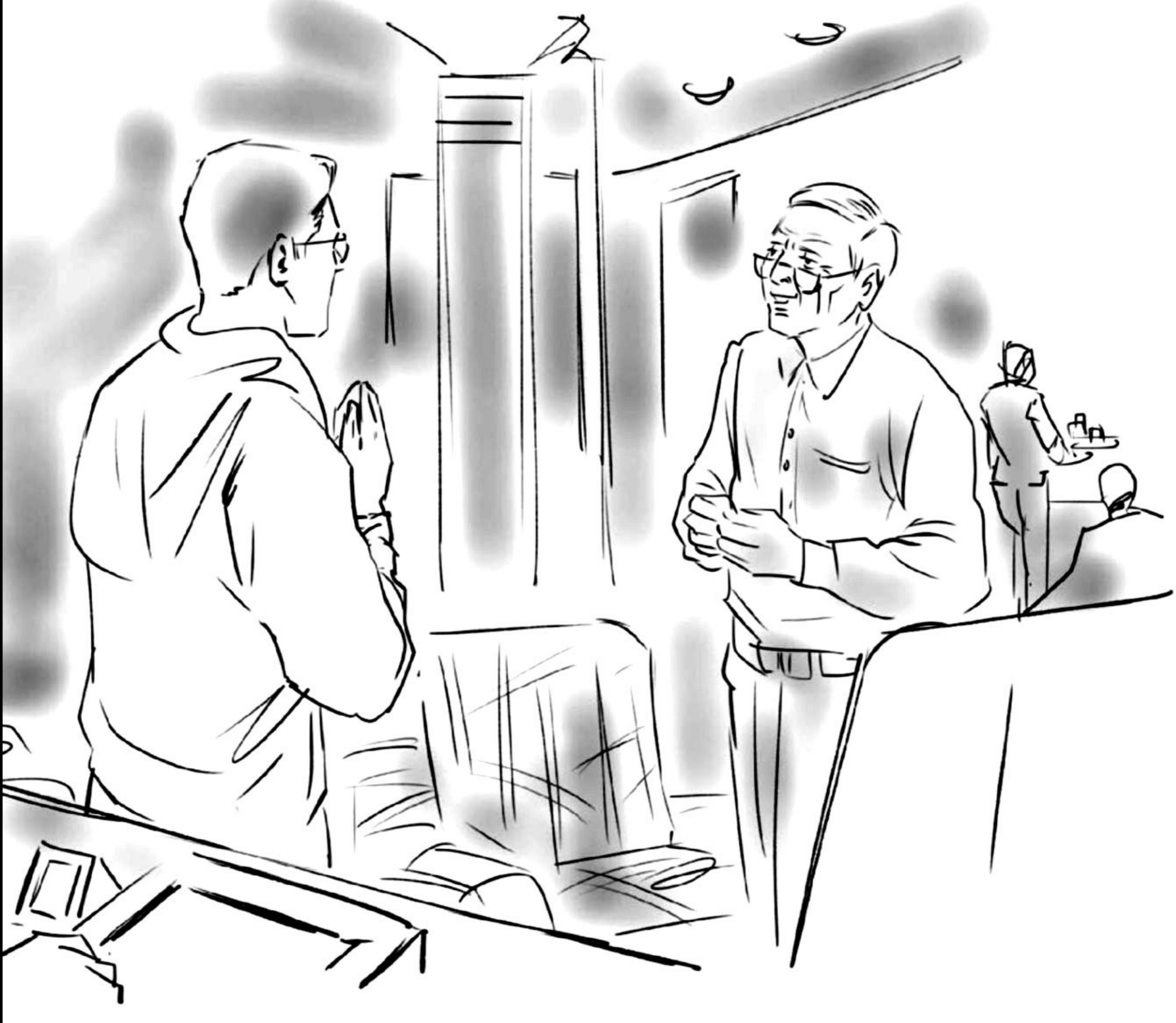
এমিলি দুরবীন বাড়িয়ে দিল। মাখনের মত হাত ছুঁয়ে দেখতে ভিতরটা আনচান করে উঠল মার্কাসের। বলল, "বুগার্ডদের জমিদারি থেকে এতদূরে এসে তুমি সমুদ্রের ধারে গাংচিল দেখতে আসনি। অনুমান করি কী দেখতে এসেছ?"

এমিলির গালে রক্তিম আভা দেখা দিল। মার্কাস হেসে বলল, "একটা জাহাজ খুঁজছ। কবে সেটা আসবে পারামারিবো বন্দরে? ঠিক কিনা?"

এমিলির মুখে লাজুক হাসি বলে দিল মার্কাস সত্যি ধরে ফেলেছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে মার্কাস নেমে আড়মোড়া ভেঙে বলল, "সেই জাহাজের কথা বলতে পারি, যদি তুমিও নেমে আসো।"

মার্কাস হাতটা বাড়াল। সেই হাতটা ধরে নামল এমিলি। এমিলির সঙ্গে আসা আফ্রিকান চাকরটা তীক্ষ্ণ চোখে খেয়াল করছিল সব। মার্কাস বলল, "চলো আমরা জেটির ওপরে গিয়ে বসে কিছুক্ষণ কথা বলি।"

একটু এগোতেই জেটির একপাশে একটা গাছের গুঁড়ি আর বড়-বড় কয়েকটা পাথর। তার দুটো বেছে নিয়ে মুখোমুখি বসল মার্কাস আর এমিলি। মার্কাসের মনে হতে থাকল, এই মুহূর্তের যেন শেষ না



হয়। ঘড়ির কাঁটা যেন আটকে থাকে। এমিলিও বেশ বুঝতে পারছিল মার্কাসের কাছে এটা একটা মুগ্ধ জাদু মুহূর্ত।

সপ্রতিভ হয়ে মার্কাস বলতে শুরু করল, "তুমি যে জাহাজ খুঁজতে এসেছ, ভারতবর্ষের কলকাতা বন্দর থেকে সেটা রওনা দিয়েছে গত ফেব্রুয়ারি মাসে।"

এমিলি মাথা ঝাঁকাল, "জানি। আমাদের বাড়িতে একটা অ্যাটলাস আছে। বাবা সেটা দেখিয়ে আমাকে চিনিয়েছে কলকাতা জায়গাটা কোথায়। বাবার কাছে খবর আছে কলকাতা থেকে ব্রিটিশ গায়ানায় জাহাজ আসে তিন মাসে। অথচ এটা মে মাস। তিন মাস হয়ে গেল। জাহাজটা এখনও এলো না।"

মার্কাস হেসে উঠল, "তাই বুঝি তুমি দূরবীন দিয়ে জাহাজ খুঁজতে এসেছ। নাকি ভাবছ, জাহাজ দুম করে চলে এলে যে ভারতীয় কুলিরা আসবে, তাদের সব প্ল্যানটেশন মালিকরা কাড়াকাড়ি করে নিয়ে নেবে, তোমরা কিছুই পাবে না।"

"তা নয়। আসলে বাবা ভাবছে জাহাজের কী হলো? আখ চাষের সময় এগিয়ে আসছে। খেতে কাজ করার লোক নেই। এখন যদি জাহাজডুবি হয়ে যায় বা জলদস্যুদের হাতে জাহাজ লুঠ হয়ে যায় এই ভেবে ভেবেই বাবার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

"তাই বুঝি উনি আজ তোমার সঙ্গে নেই। অত চিন্তার কিছু নেই। জাহাজটা লিভারপুলে তৈরি। লিভারপুল থেকে জাহাজ যখন কলকাতায় পৌঁছতে পেরেছে তখন নিশ্চয়ই মজবুত জাহাজ। আর জলদস্যুরা হানা দিয়ে কী পাবে? ধনরত্ন তো কিছু নেই। আছে কুলি। এখন তো পৃথিবীর কোনও দেশে ক্রীতদাস নেই। ওই কুলিগুলোকে লুঠ করে জলদস্যুরা কী করবে? কোথাও তো আর বিক্রি করতে পারবে না। ধরা পড়লে সাংঘাতিক জরিমানা।"

এমিলি একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বলল, "তোমার কথা শুনে একটু নিশ্চিন্ত লাগছে।"

"কিন্তু এই কথাগুলো তুমি কি তোমার বাবাকে গিয়ে বলতে পারবে যে আমার কাছ থেকে শুনে এসেছ?"

ভ্যান ডার বার্গ দের সঙ্গে বাবার মনোভাব এমিলি জানে। শুধু ভ্যান ডার বার্গদের সম্পর্কে কেন? বাবা যে কোনও প্ল্যানটেশন পরিবারকেই দু-চোখে দেখতে পারে না, সেটাও এমিলির বিলক্ষণ

জানা।

"ও কিন্তু দেখছে।" মার্কাস ইঙ্গিতে আফ্রিকান চাকরটার দিকে তাকিয়ে বলল।

"কে কোফি? কোফি আমাদের বাড়ির খুব বিশ্বস্ত লোক। ওদের পুরো পরিবার আমাদের বাড়ির সব কাজ করে। বাবার মাঝে-মাঝে খুব চিন্তা হয়, যেভাবে নিগাররা জাহাজে চেপে আফ্রিকায় ফিরে যাচ্ছে, কোফিরাও চলে গেলে কী হবে?"

মার্কাস হাসতে থাকল, "বিশ্বস্ত লোক বলেই তো চিন্তা। যখন তোমার বাবাকে বলে দেবে সমুদ্রের ধারে বসে তুমি আমার সঙ্গে এখানে বসে গল্প করছিলে, তখন কী হবে?"

এমিলি চোখ পাকাল, "আমরা গল্প করছি কি? তুমি ঠিকই ধরেছিলে, আমি জাহাজের খোঁজ করতে এসেছিলাম। এই মাসে আমাদের প্ল্যানটেশনে থেকে আরও নিগাররা চলে যাচ্ছে। এটা নিয়ে ভেবে-ভেবেই দুশ্চিন্তায় বাবার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই জাহাজের খবর নিতে এসেছিলাম।"

"আচ্ছা, তোমাদের বাড়ি যেদিন গিয়েছিলাম, তোমার মা অসুস্থ ছিলেন, এখন কেমন আছেন?"

এমিলি চমকে তাকাল মার্কসের দিকে। তারপর দায়সারা বলল, "একটু ভালো। মায়ের চেয়েও এখন চিন্তা বাবাকে নিয়ে। বাবা বলছে, মাত্র এক জাহাজ কুলি আসছে। এক জাহাজ কুলিতে আর কী হবে? এতগুলো প্ল্যানটেশন।"

মার্কাস হাত তুলে এমিলিকে আশ্বস্ত করল, "অত চিন্তা করো না। এটা মাত্র প্রথম জাহাজ। আরও অনেক জাহাজ ভর্তি কুলি আসবে ভারতবর্ষ থেকে।"

এমিলি আবার উদাস মনে জলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কি জানি কবে আসবে! বাবা যখন অ্যাটলাস নিয়ে হিসেব করে, আমার সব অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস মনে হয়।"

"কি ওই জলদস্যু?"

"নাঃ!"

"তাহলে?"

"মনে হয় ভারতবর্ষ দেশ কেমন? সেখানকার মানুষগুলো কেমন দেখতে? নিগারদের মতোই কি?"

"না, খানিক আলাদা। বাদামি চামড়া। আমি লন্ডনে দেখেছি।"

"তুমি অনেকদিন লন্ডনে ছিলে তাই না?"

"হ্যাঁ, আমার বাবা-মা মারা যাওয়ার পর কাকা আমাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

"লন্ডন খুব সুন্দর, তাই না?"

"তা সুন্দর। আমাদের এখানকার তুলনায় একদম অন্যরকম।"

এমিলি আনমনা গলায় জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, তোমার কাকা তোমাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কেন?"

এবার অস্বস্তিতে পড়ল মার্কাস। এ প্রসঙ্গে কথা বললে অস্বস্তি বেড়েই যাবে। গলা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, "বাবা মা খুন হয়ে যাওয়ার পর কাকার মনে হয়েছিল এই জায়গা নিরাপদ নয়। তা ছাড়া লন্ডনে পড়াশোনা করার সুযোগ অনেক বেশি।"

"ও! আমি শুনেছিলাম..." আনমনা গলাতেই এমিলি বলতে শুরু করতেই মার্কাস এমিলিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "থাক না ওইসব কথা। বরং তোমার অ্যাটলাসের কথা শুনি।"

"সেই ভাল। জানো, আমি যখন বাবার সঙ্গে অ্যাটলাস দেখি, আমার শুধু ভারতবর্ষ আর আফ্রিকাই নয়, পৃথিবীর অনেক দেশ দেখতে ইচ্ছে করে। আল্পসের পাহাড় থেকে টেমস নদীর ওপর লন্ডন ব্রিজ পর্যন্ত সবকিছু।"

মার্কাস হাসল। মনেপ্রাণে চাইছিল এই সময় যেন মুড়িয়ে না যায়। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই বেলা গড়াচ্ছে। নরম গলায় বলল, "তোমার আর আমার ইচ্ছেয় খুব মিল। আমি তো শুধু লন্ডন আর ইউরোপের কয়েকটা দেশ দেখেছি। কিন্তু পৃথিবীতে কত দেশ। ঈশ্বর যদি সহায় হন, কোনদিন হয়তো তোমার আমার স্বপ্ন একসঙ্গে পূর্ণ হয়ে যেতে পারে।"

এমিলি ভুরু কুঁচকে বলল, "মানে?"

মার্কাসের হাসি আরও চওড়া হল। একটা নুড়ি পাথর তুলে নিয়ে জলের দিকে ছুড়ে বলল, "আপাতত তুমি রোজ তোমার দূরবীন নিয়ে এখানে এসো। যে স্বপ্নটা এখন আমরা সবাই দেখছি, ভারতবর্ষের কুলিরা এসে আবার আমাদের দেশটাকে পুরনো সোনালি দিনগুলোতে ফিরিয়ে দেবে, সেই জাহাজ তোমার দূরবীনে কবে ধরা পড়ে দেখি।"

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে দশম কিস্তি

লাল্লা রুখ জাহাজটাকে আমরা আপাতত বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর হয়ে ৯০০০ মাইল পাড়ি দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে আসতে দিই, কী বলো প্রিয়তমা? জাহাজ যতদিন না এসে পৌঁছয়, মার্কাস আর এমিলি তাদের সদ্য জন্ম নেওয়া প্রেমের কুঁড়িটা সুন্দর এক ফুল ফোটার জন্য এগিয়ে নিয়ে যাক দিনের পর দিন সেই পরিত্যক্ত জেটিটায় এসে। চলো, আমরা ততক্ষণে অন্য যে সূত্রগুলো গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছটফট করছে, সেগুলো একটু নাড়াচাড়া করে নিই।

জানি এই কথাটা যখন বলব, তুমি জিজ্ঞেস করবেই রোজির ব্যাপারটা তোমাকে অত গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলাম কেন? অবাঞ্ছিত কোডিং এর মতো ছেঁটে ফেললেই তো পারতাম। কিন্তু এই গল্পে রোজি ওরফে মিতালির ভূমিকা এখনও অনেকটা বাকি আছে। এই সূত্রেই তোমাকে সেটা আরও খানিকটা বলব।

ইন্টারনেট থেকে আমি যথাসম্ভব খোঁজখবর করে এসেছিলাম। ডেটা রিসার্চ। কিন্তু ক্লাউড কম্পিউটিং-এও ভুল হয় যদি অসংখ্য ডেটার মধ্যে লজিক গেটে কাজের ডেটাটা নজর এড়িয়ে প্রসেসড না হয়। আসল বিষয়টা হচ্ছে ইন্টারনেটে প্রচুর ডেটা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে যে তথ্যটা আমার চোখে পড়েনি সেটা হল একটা রাজনৈতিক দলের বড় সমাবেশ। কলকাতা শহরের একেবারে কেন্দ্রে হবে সেই মিটিং। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ মিছিল করে এসে সেই মিটিংয়ে যাবে। সেদিন কলকাতা শহরের একটা অংশ জুড়ে যান চলাচল কার্যত অচল হয়ে যাবে।

আমার মনে হয় ডেটা প্রায়োরিটির মতো শচীবাবু বা ঐশীর বাবাও এই সমাবেশের ব্যাপারটা খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি। অবশ্য ভাবলেই বা কী হতো? আমার তো আর ফেরার টিকিটটা বদলে নিতে পারতাম না। রূপকথার গঙ্গাকে ছোঁয়ার আর কোনও বিকল্প ছিল না।

ব্যাপারটা প্রথম খেয়াল করাল ঐশীর বাবার পাঠানো গাড়ির ড্রাইভার দিলীপ। আর ওদিকে রোজি...

এই রে, এইমাত্র পাইলট বললেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দিল্লি এয়ারপোর্টে নেমে পড়ব। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সব বন্ধ করে ল্যান্ডিং এর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিতে। অতএব ট্যাব আপাতত কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করতেই হচ্ছে।

॥ ১০ ॥

কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়ের অফিসের ডিউটি স্লিপ নিয়ে গাড়িটা সময় মতো পৌঁছে গেল নিউ মোনালিসা হোটেলের সামনে। ড্রাইভার দিলীপ ছেলেটা অল্পবয়সী, ছটফটে। শচীকান্তর মত দ্বিধাগ্রস্ত নয়। হোটেল থেকে পিক আপ করার বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। তবে বেশিরভাগই হয় হোটেল থেকে অফিস বা এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া। বড়জোর কোনও শপিং মল। এবারের ডিউটি একটু বিচিত্র। কলকাতা ঘুরিয়ে দেখাতে হবে।

হোটেলের দিকে আসতে-আসতে দিলীপ ভেবে পাচ্ছিল না, কলকাতায় আর ঘুরে দেখার কী আছে? কাজের দিন। তার ওপর ব্রিগেডে সমাবেশ আছে। একটু বেলা বাড়লেই, ব্রিগেডে যাওয়ার জন্য

দলে দলে মিছিলগুলো বেরিয়ে পড়বে। তাই কলকাতা দেখানোর একটা প্ল্যান মনে-মনে ছকে নিয়েছিল দিলীপ। সদর স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে ভিক্টোরিয়া হয়ে মা ফ্লাইওভার ধরবে। তারপর ভিআইপি রোড ধরে রাজারহাট নিউটাউন হয়ে আবার হোটেলে ফিরে আসবে। রাস্তা থেকেই ইকো পার্কে অনেক কিছু দেখা যায়। আড়াই তিন ঘন্টায় হয়ে যাবে। মিছিলের জ্যামে পড়বে না। পরের ডিউটি আছে বিকেল তিনটেয়। মধ্যের সময়টায় প্রাইভেট পুল দু'একটা মেরে দিতে হবে।

ক্লায়েন্ট সাহেব। ডিউটি স্লিপে নাম লেখা আছে আবেল ভ্যান ডার বার্গ। খটোমটো নাম। নিশ্চয়ই কোনও বুড়ো ইংরেজ হবে। মুশকিল একটাই। এদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলা। তবে এসব নিয়ে আর বিশেষ ভাবল না দিলীপ। অন্য কোনও রুটে যেতে চেয়ে ইংরেজিতে বেশি বকবক করলে বলবে মোবাইলের ম্যাপে পিন করে দিতে। তারপর যাওয়া গেলে যাবে, না গেলে যাবে না। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি ডিউটিটা মিটিয়ে ফেলা যায়।

হোটেলের রিসেপশনে গিয়ে মনের মধ্যে ছক কষে রাখা সব অঙ্ক গুলিয়ে গেল। রিসেপশনের লোকটাকে সাহেবের নাম বলতেই উল্টোদিকের একটা সোফা দেখিয়ে দিল। সেখানে বসে আছে সোনালি চুলের গোল-গোল চশমা পরা একটা ছোকরা ছেলে আর সাদা জামা প্যান্ট পরা একটা বুড়ো।

দিলীপ এগিয়ে গিয়ে ডিউটি স্লিপটা দেখাতেই ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল, "হাই, আই অ্যাম আবেল।"

এরকম দস্তুর সবাই দেখায় না। একটু থতমত খেয়ে আলগোছে হাত মেলাল দিলীপ। সঙ্গের খোঁচর বুড়োটাকে দেখেই মেজাজ খিঁচরে গিয়েছে। বাঙালি বুড়ো মানেই কলকাতা দেখাতে গিয়ে আনসান জায়গায় যেতে বলবে। যেখানে-সেখানে নামবে আর সময়ের শ্রাদ্ধ করবে। কাজের কথাটা তাই প্রথমেই বুড়োটাকে বলে নিল দিলীপ, "আমাকে কিন্তু দুটোর মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে কাকু। তিনটেয় এয়ারপোর্ট ডিউটি আছে। আর জানেন তো, আজ ব্রিগেডে মিটিং আছে।"

শচীকান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "হ্যাঁ, আমরা রেডি হয়েই বসে আছি। চলো।"

গাড়িতে ওঠার সময় শচীকান্ত সামনের দরজা খুলে বসতে যেতেই আবেল হাঁ-হাঁ করে উঠল, "সামনে কেন, পিছনে আসুন।"

শচীকান্ত পিছনে উঠে বসতেই দিলীপ গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রসকষহীন গলায় বলল, "কোথায় যাব?"

"সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরো।" শচীকান্ত নির্দেশ দিলেন।

বেলা বেশি বাড়েনি। এখনও ওয়ান ওয়ের শাসনগুলো শুরু হয়নি। দিলীপ নিউ মার্কেটের দিকে রাস্তা ধরল।

শচীকান্তও ইংরেজিতে খুব একটা সড়গড় নন। আস্তে-আস্তে বলতে শুরু করলেন, "এই অল্প সময়ে আমরা যতটা পারব উত্তর কলকাতার দিকে ঘাটগুলো দিয়ে শুরু করব। উত্তর কলকাতাটাই আসলে পুরনো কলকাতা।" তারপর শান্তিনিকেতনী ব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করে পাতা উলটে বলতে থাকলেন, "আপনি শুনলে হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাবেন কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ৪২টার মতো ছোট-বড় ঘাট আছে। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং কলকাতা পৌরসভা এই ঘাটগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করেন..."

আবেল আলতো করে শচীকান্তর ডায়েরির ওপর হাতটা রেখে বলল, "অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন বিহার উত্তর প্রদেশ থেকে মানুষরা কলকাতায় আসতেন, তখন কি জলপথেই আসতেন?"

শচীকান্ত চুপ করে গেলেন। এই প্রশ্নের উত্তর একেবারেই জানা নেই। তখন কি রেলপথ তৈরি হয়েছিল? রাস্তায় এলেই বা কীভাবে আসতেন তাঁরা? গরুর গাড়িতে? কতদিন লাগত? এসব প্রশ্ন কখনও মনের মধ্যে আসেনি। তাই জানাও নেই। ভাসা-ভাসা উত্তর দিলেন, "হতে পারে বজরায়। গঙ্গায় তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা ছিল।"

"আমারও তাই মনে হয়। একটা সম্ভাবনা। ইন্টারনেটে খুঁজেছি। সদুত্তর পাইনি। তবে এইটুকু বুঝেছি গরীবগুর্বো মানুষগুলো নিশ্চয়ই ঘোড়ার গাড়ি চেপে আসেননি। হয়তো দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে, অসম্ভব কষ্ট স্বীকার করে..."

হঠাৎ আবেল বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। শচীকান্ত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন বাইরে ডান দিকে নিউ মার্কেট। বলে উঠলেন, "এটা নিউ মার্কেট। কলকাতার প্রথম শপিং মল বলতে পারেন। আগে নাম ছিল হগ মার্কেট।"

পিছন থেকে দিলীপের কাঁধে আলতো করে দুটো টোকা মেরে আবেল থামতে বলল।

'এই হারামিগিরি শুরু হল। যেখানে-সেখানে গাড়ি দাঁড় করানো।' মনে-মনে খিস্তি দিয়ে দিলীপ গাড়ি থামাতেই আবেল দরজা খুলে নেমে পড়ল। তারপর লম্বা-লম্বা পা বাড়াল।

"রোজ়ি। রোজ়ি।"

মিতালি চট করে নিজের মেকি নামটা ধরতে পারেনি। কিন্তু আবেল যখন একদম পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আবার 'রোজ়ি' বলে ডাকল, পিছন ফিরে আবেলকে দেখে খুব অবাক হল।

"তুমি কি আমার পিছু নিয়েছ নাকি?"

আবেল সরল হাসি হেসে মাথা নাড়ল, "না। তুমি বাড়ি যাওনি?"

"কেন?"

"না এমনি। তুমি বলেছিলে না আজকে তোমার ছুটি। কলকাতা ঘুরে দেখবে। যাবে? আমার সঙ্গে সোফার ড্রিভন গাড়ি আছে।"

এতো আজব ছেলে! কাল সারারাত একা পেয়ে কিছু করেনি আর এখন বলছে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা ঘুরবে। কাল রাতটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। আর কত চেষ্টা করতে পারত? শেষকালে হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়েই গিয়েছিল। ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে দেখেছে ছেলেটা পাশে এসে শোয়নি পর্যন্ত। হাতে ট্যাব নিয়ে সোফায় কাত হয়ে ঘাড় গুঁজে ঘুমচ্ছে।

একটু দূরেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির মধ্যে থেকে ড্রাইভার আর একটা বুড়ো সটান চেয়ে রয়েছে। ঘুরতে যেতে পারত ছেলেটার সঙ্গে যদি সঙ্গে ওই ব্যান্ডপার্টি না থাকত। মিতালি কাঁধ ঝাঁকাল, "তুমি তো আমার পেশাটা জেনে গিয়েছো। বিছানায় শুতে তোমার কোনও আগ্রহ নেই। তোমার সঙ্গে ঘুরে আমার কী লাভ? তিন দিন ধরে আমার কোনও ব্যবসা নেই। আজকে কিছু বাজার করে বাড়ি যেতেই হবে। এই যে লাল বড় বাড়িটা দেখছ, ওর পিছনে সস্তায় বাজার পাওয়া যায়। কিন্তু সেটুকু কেনার পয়সাও আমার নেই।"

আবেল পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকার গোছা বের করল। কালকে এই গোছা দেখেছে মিতালি। কয়েকটা গোলাপী নোট থাকলেও, খুব বেশি টাকা নয়। অবশ্য ওর বড় রুকস্যাকে বা কার্ডে আরও অনেক টাকা থাকতে পারে।

গোছটার থেকে একটা পাঁচশ টাকার নোট বের করে মিতালির হাতে দিয়ে আবেল বলল, "এটা নাও। বন্ধুর তরফ থেকে। বিশ্বাস করো আমি ছাত্র। খুব বেশি টাকা নেই আমার কাছে। এই যে গাড়ি গাইড দেখছো, এটা আমার এক বন্ধুর বাবা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি নিজের পয়সায় করতে পারতাম না। আমি তো ভেবেছিলাম একটা সাইকেল ভাড়া করে ঘুরব আমাদের দেশের মতো। কিন্তু সেটা যে কলকাতায় সম্ভব নয় সেটা এখানে এসে বুঝেছি।"

পেশাদার হলেও কখনও-কখনও সবকিছু কেমন যেন ঘেঁটে যায়। হাতের মুঠোয় টাকা নিয়ে মিতালি কিছুক্ষণের জন্য কথা হারিয়ে ফেলল। আবেল মিষ্টি হেসে বিদায় নিয়ে গাড়িতে ফিরে এসে বসল। দিলীপ গাড়ি স্টার্ট করে একটু এগোতেই মিতালি ছুটে এল গাড়ির কাছে। কাচের জানলায় টোকা দিতেই আবেল কাচ নামিয়ে হাসিমুখে বলল, "কিছু বলবে?"

"হ্যাঁ," হাতের মুঠোর টাকা দেখিয়ে বলল, "আমি ভিখিরি নই। তবে বন্ধুত্বের টাকাও নিই। এটা অগ্রিম নিলাম। আজ তোমাকে রাতের কলকাতা দেখিয়ে দেব, যেটা তোমাকে কেউ দেখাতে পারবে না।"

কথাগুলো বলে মিতালি এক ঝলক শচীকান্তর দিকে তাকাল। শচীকান্ত মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন।

আবেল বলল, "রাতের কলকাতা নয়, দিনের আলোয় অন্যরকম কলকাতা দেখতে যদি চাও, আসতে পার আমাদের সঙ্গে।"

মিতালি একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে চোখ মটকে বলল, "বুঝেছি। তাহলে তোমার টাকা রেখে দিচ্ছি এসকর্ট চার্জ হিসাবে। কিন্তু আমাকে দশ মিনিট টাইম দিতে হবে।"

"দশ মিনিট?" আবেল ঘড়ি দেখল।

"হ্যাঁ, বাড়িতে বাজার পাঠাতে একজনকে ফোন করে ব্যবস্থা করতে হবে।"

"ঠিক আছে।"

দিলীপকে দাঁড়ানোর কথা বলতেই দিলীপ বিরক্ত হয়ে গাড়িটা পার্ক করে বলল, "এখানে পার্কিং লাগবে কিন্তু। ওটা আপনাদের দিতে হবে, অফিস দেবে না।"

যদিও মেয়েটার সঙ্গে সাহেব ছেলেটার কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতে কিন্তু দিলীপ অনেক কিছু ইংরেজি শব্দ বুঝে ফেলল। অ্যাডভান্স, ফ্রেন্ডশিপ, এসকর্ট। মেয়েটাকে তো দেখে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কী ধরনের মেয়ে! চুয়িংগাম চিবোতে-চিবোতে জিভ চাটছে, চোখ মারছে। আর সাহেবগুলো তো এখানে এসব করতেই আসে। পকেট ভর্তি টাকা। সাত সকালেই মেয়েগুলোকে অ্যাডভান্স দেবে রাতে বিছানায় শোবে বলে। এসব সাহেবদের এডস থাকে। সকালে সাহেবটা হ্যান্ডশেক করেছিল। হাতটা কীরকম ঘিনঘিন করে উঠল দিলীপের। গাড়িটা পার্ক করে দরজাটা খুলে বোতলের জল দিয়ে হাতটা ধুতে আরম্ভ করল।

"কী হল?" শচীকান্ত জিগ্যেস করলেন।

দিলীপ কোনও উত্তর না দিয়ে দরজা বন্ধ করে বলল, "কাকু, উলটোপালটা রাস্তায় নিয়ে যাবেন না। বললাম না আপনাকে আজকে ব্রিগেডে বড় একটা সমাবেশ আছে। সকালে এফএমে পুলিশ বলেছে চার দিক থেকে মিছিল আসবে বলে অনেক রাস্তা বন্ধ করে দেবে।"

আজকাল বাড়ি থেকে বিশেষ বেরন না বলে মিটিং মিছিলের খবর রাখেন না শচীকান্ত। তবে মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে শচীকান্তও মনে-মনে একটু বিরক্ত হতে থাকলেন। মেয়েটাকে তো দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। সকালে হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে দেখেছিলেন। মেয়েটা যে আবেলের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে সে তো নিজের কানেই শুনেছেন। মেয়েটা যতই তখন বলুক শারীরিক সম্পর্ক হয়নি, এখন আর কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না শচীকান্তর। নিজেকে আবার বোঝালেন এসব ভেবে কাজ কী? বরং ড্রাইভার যেমন বলছে, ভালোয়-ভালোয় মিছিল বেরনোর আগে কয়েকটা ঘাট ঘুরিয়ে দেখিয়ে দুটোর মধ্যে হোটেলে ফিরিয়ে দিয়ে সোজা অর্জুন সান্যালের অফিসে গিয়ে পাঁচশ টাকা পেমেন্ট নিয়ে নেবেন।

"আপনাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি মিস্টার লাহিড়ী?" আবেল বলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলুন না।"

"বাঙালিরা কাউকে কী বলে সম্বোধন করেন?"

"মানে?"

"মানে, আপনাকে আমি মিস্টার লাহিড়ীর বদলে বাংলায় কী বলে সম্বোধন করতে পারি?"

শচীকান্ত ঈষৎ হেসে উঠলেন, "ও আচ্ছা। বুঝেছি। আপনি লাহিড়ীবাবু বলতে পারেন। আমাকে অনেকে শচীবাবু বলেও ডাকেন।"

"বাবুয়া… শচীবাবুয়া।"

এবার শচীকান্তর সঙ্গে দিলীপও হেসে উঠল, "খুব শখ দেখছি বাংলা শেখার।"

শচীকান্ত সংশোধন করে দিলেন, "বাবুয়া নয় বাবু, বাবু।"

"আচ্ছা। বাবু। আমি আসলে বাবুয়া শব্দটা শিখেছিলাম।"

"আপনি বাংলা শব্দ শিখেছেন?"

"বাংলা নয় ভোজপুরি। একটু,একটু। বাবুয়া। বিটিয়া। আপনি জানেন ভোজপুরি?"

শচীকান্ত মাথা নাড়লেন, "না। তা এত ভারতীয় ভাষা থাকতে আপনার হঠাৎ ভোজপুরি ভাষার প্রতি আগ্রহ কীভাবে হল?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আনমনে আবেল বলল, "ইন্ডাস্ট্রি ৪.০। বিগ ডেটা। স্যাস। অগমেন্টেড রিয়্যালিটি।"

"মানে?" শচীকান্ত কিছু বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলেন।

সম্বিত ফিরিয়ে আবেল বলল, "সে এক লম্বা গল্প। আসলে কি জানেন, ইন্টারনেটে ছবি, ভিডিয়ো আর তথ্য দেখে একটা দেশকে জানা যায় না। যাইহোক, আপনাকে বলে রাখি আমার কয়েকটা জিনিস কেনাকাটার আছে। কোথায় পাব একটু যদি সাহায্য করে দেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলুন না।"

আবেল জ্যাকেটের পকেট থেকে ট্যাব বের করে নোট করে রাখা একটা স্ক্রিন খুলে বলতে শুরু করল, "একটা লোটা, একটা কম্বল, একটা ধুতি, একটা লাঠি, একটা সুতির শাড়ি, কয়েকটা রেশমি চুড়ি।"

"এতো পুরো পাগলা কাকু।" শব্দগুলো বুঝে দিলীপ একটা গুটখার পাউচ খুলে মুখে ঢেলে বলল।

শচীকান্ত মৃদু ধমক দিয়ে দিলীপকে বললেন, "আঃ!"

মিতালি দশ মিনিটের আগেই ফিরে এল। শচীকান্ত মিতালিকে আবেলের পাশে বসতে দিয়ে সামনে দিলীপের পাশে গিয়ে বসলেন। দিলীপ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, "বলুন, কোথায় যাব কাকু?"

"তুমি সোজা চলো। আগে কাশীপুর যাব।"

অফিস টাইম শুরু হয়নি। এখনও শহর কলকাতার পরিচিত জানজট শুরু হয়নি। মিছিলও বের হয়নি। দিলীপ যতটা পারল জোরে সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে গাড়ি ছোটাতে থাকল। আবেল রাস্তার দুদিকে বাড়িগুলো দেখতে-দেখতে শহরটার চরিত্র বোঝার চেষ্টা করতে থাকল। কিন্তু যেটা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে সেটা যেন কিছুতেই ধরতে পারছে না।

বউবাজারের কাছে এসে শচীকান্ত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন এরমধ্যেই পিছনের সিটে মাথা হেলিয়ে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে। আর আবেল হাঁ করে জানলা দিয়ে বাইরে দেখছে। গলাটা একটু খাঁকরিয়ে শচীকান্ত আবেলকে বলতে শুরু করলেন, "ভারতবর্ষ নিয়ে আপনার যখন এত আগ্রহ তখন স্বামী বিবেকানন্দর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?"

আবেল একটু চুপ করে থেকে বলল, "না শুনিনি। আসলে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার আগ্রহ খুব নির্দিষ্ট। ভারতবর্ষ ফুলমতীমাঈয়ের দেশ। আমার কাছে ভারতবর্ষ মানে শুধু ফুলমতীমাঈ।"

"ফুলমতীমাঈয়ের নামটা আপনি আগেও একবার বলেছিলেন। কে ছিলেন তিনি?"

"একজন খুব সাধারণ ভারতবাসী। বাঁচার স্বপ্ন কীভাবে দেখতে হয় সেটাই হয়তো উনি জানতেন না। কিন্তু উনি একটা অসাধারণ কাজ করে ফেলেছিলেন। তাঁর জন্যই আমার জন্ম। তাঁর জন্যই হয়তো আমি আজ এখানে। আমার কাছে উনি একজন রূপকথার পরি ধরতে পারেন। তাঁর ঠিক কোথায় জন্ম হয়েছিল তার ল্যাটিটিউড, লংগিটিউড জানি না। যেটা জানি সেটা হচ্ছে, দশ বছর বয়সে তার একটা নতুন জীবন শুরু হয়েছিল কলকাতার এক ঘাটে। সেই ঘাটটার ল্যাটিটিউড, লংগিটিউড অবশ্য জানি। অর্থাৎ লোকেশন জানি। বলব আপনাকে।"

পুরো ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতো শোনাল শচীকান্তর কাছে।

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে একাদশ কিস্তি

আমার প্রপিতামহ মার্কাস ভ্যান ডার বার্গ একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন আমার হবু প্রপিতামহী এমিলিকে নিয়ে গোটা বিশ্ব ঘুরে দেখবেন। হবু বললাম এই জন্য যে, যেদিন সেই স্বপ্নটা মার্কাস

কথাগুলো বলে মিতালি এক ঝলক শচীকান্তর দিকে তাকাল। শচীকান্ত মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন।

আবেল বলল, "রাতের কলকাতা নয়, দিনের আলোয় অন্যরকম কলকাতা দেখতে যদি চাও, আসতে পার আমাদের সঙ্গে।"

মিতালি একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে চোখ মটকে বলল, "বুঝেছি। তাহলে তোমার টাকা রেখে দিচ্ছি এসকর্ট চার্জ হিসাবে। কিন্তু আমাকে দশ মিনিট টাইম দিতে হবে।"

"দশ মিনিট?" আবেল ঘড়ি দেখল।

"হ্যাঁ, বাড়িতে বাজার পাঠাতে একজনকে ফোন করে ব্যবস্থা করতে হবে।"

"ঠিক আছে।"

দিলীপকে দাঁড়ানোর কথা বলতেই দিলীপ বিরক্ত হয়ে গাড়িটা পার্ক করে বলল, "এখানে পার্কিং লাগবে কিন্তু। ওটা আপনাদের দিতে হবে, অফিস দেবে না।"

যদিও মেয়েটার সঙ্গে সাহেব ছেলেটার কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতে কিন্তু দিলীপ অনেক কিছু ইংরেজি শব্দ বুঝে ফেলল। অ্যাডভান্স, ফ্রেন্ডশিপ, এসকর্ট। মেয়েটাকে তো দেখে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কী ধরনের মেয়ে! চুয়িংগাম চিবোতে-চিবোতে জিভ চাটছে, চোখ মারছে। আর সাহেবগুলো তো এখানে এসব করতেই আসে। পকেট ভর্তি টাকা। সাত সকালেই মেয়েগুলোকে অ্যাডভান্স দেবে রাতে বিছানায় শোবে বলে। এসব সাহেবদের এডস থাকে। সকালে সাহেবটা হ্যান্ডশেক করেছিল। হাতটা কীরকম ঘিনঘিন করে উঠল দিলীপের। গাড়িটা পার্ক করে দরজাটা খুলে বোতলের জল দিয়ে হাতটা ধুতে আরম্ভ করল।

"কী হল?" শচীকান্ত জিগ্যেস করলেন।

দিলীপ কোনও উত্তর না দিয়ে দরজা বন্ধ করে বলল, "কাকু, উলটোপালটা রাস্তায় নিয়ে যাবেন না। বললাম না আপনাকে আজকে ব্রিগেডে বড় একটা সমাবেশ আছে। সকালে এফএমে পুলিশ বলেছে চার দিক থেকে মিছিল আসবে বলে অনেক রাস্তা বন্ধ করে দেবে।"

আজকাল বাড়ি থেকে বিশেষ বেরন না বলে মিটিং মিছিলের খবর রাখেন না শচীকান্ত। তবে মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে শচীকান্তও মনে-মনে একটু বিরক্ত হতে থাকলেন। মেয়েটাকে তো দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। সকালে হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে দেখেছিলেন। মেয়েটা যে আবেলের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে সে তো নিজের কানেই শুনেছেন। মেয়েটা যতই তখন বলুক শারীরিক সম্পর্ক হয়নি, এখন আর কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না শচীকান্তর। নিজেকে আবার বোঝালেন এসব ভেবে কাজ কী? বরং ড্রাইভার যেমন বলছে, ভালোয়-ভালোয় মিছিল বেরনোর আগে কয়েকটা ঘাট ঘুরিয়ে দেখিয়ে দুটোর মধ্যে হোটেলে ফিরিয়ে দিয়ে সোজা অর্জুন সান্যালের অফিসে গিয়ে পাঁচশ টাকা পেমেন্ট নিয়ে নেবেন।

"আপনাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি মিস্টার লাহিড়ী?" আবেল বলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলুন না।"

"বাঙালিরা কাউকে কী বলে সম্বোধন করেন?"

"মানে?"

"মানে, আপনাকে আমি মিস্টার লাহিড়ীর বদলে বাংলায় কী বলে সম্বোধন করতে পারি?"

শচীকান্ত ঈষৎ হেসে উঠলেন, "ও আচ্ছা। বুঝেছি। আপনি লাহিড়ীবাবু বলতে পারেন। আমাকে অনেকে শচীবাবু বলেও ডাকেন।"

"বাবুয়া... শচীবাবুয়া।"

এবার শচীকান্তর সঙ্গে দিলীপও হেসে উঠল, "খুব শখ দেখছি বাংলা শেখার।"

শচীকান্ত সংশোধন করে দিলেন, "বাবুয়া নয় বাবু, বাবু।"

"আচ্ছা। বাবু। আমি আসলে বাবুয়া শব্দটা শিখেছিলাম।"

"আপনি বাংলা শব্দ শিখেছেন?"

"বাংলা নয় ভোজপুরি। একটু,একটু। বাবুয়া। বিটিয়া। আপনি জানেন ভোজপুরি?"

শচীকান্ত মাথা নাড়লেন, "না। তা এত ভারতীয় ভাষা থাকতে আপনার হঠাৎ ভোজপুরি ভাষার প্রতি আগ্রহ কীভাবে হল?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আনমনে আবেল বলল, "ইন্ডাস্ট্রি ৪.০। বিগ ডেটা। স্যাস। অগমেন্টেড রিয়্যালিটি।"

"মানে?" শচীকান্ত কিছু বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলেন।

সম্বিত ফিরিয়ে আবেল বলল, "সে এক লম্বা গল্প। আসলে কি জানেন, ইন্টারনেটে ছবি, ভিডিয়ো আর তথ্য দেখে একটা দেশকে জানা যায় না। যাইহোক, আপনাকে বলে রাখি আমার কয়েকটা জিনিস কেনাকাটার আছে। কোথায় পাব একটু যদি সাহায্য করে দেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলুন না।"

আবেল জ্যাকেটের পকেট থেকে ট্যাব বের করে নোট করে রাখা একটা স্ক্রিন খুলে বলতে শুরু করল, "একটা লোটা, একটা কম্বল, একটা ধুতি, একটা লাঠি, একটা সুতির শাড়ি, কয়েকটা রেশমি চুড়ি।"

"এতো পুরো পাগলা কাকু।" শব্দগুলো বুঝে দিলীপ একটা গুটখার পাউচ খুলে মুখে ঢেলে বলল।

শচীকান্ত মৃদু ধমক দিয়ে দিলীপকে বললেন, "আঃ!"

মিতালি দশ মিনিটের আগেই ফিরে এল। শচীকান্ত মিতালিকে আবেলের পাশে বসতে দিয়ে সামনে দিলীপের পাশে গিয়ে বসলেন। দিলীপ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, "বলুন, কোথায় যাব কাকু?"

"তুমি সোজা চলো। আগে কাশীপুর যাব।"

অফিস টাইম শুরু হয়নি। এখনও শহর কলকাতার পরিচিত জানজট শুরু হয়নি। মিছিলও বের হয়নি। দিলীপ যতটা পারল জোরে সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে গাড়ি ছোটাতে থাকল। আবেল রাস্তার দুদিকে বাড়িগুলো দেখতে-দেখতে শহরটার চরিত্র বোঝার চেষ্টা করতে থাকল। কিন্তু যেটা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে সেটা যেন কিছুতেই ধরতে পারছে না।

বউবাজারের কাছে এসে শচীকান্ত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন এরমধ্যেই পিছনের সিটে মাথা হেলিয়ে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে। আর আবেল হাঁ করে জানলা দিয়ে বাইরে দেখছে। গলাটা একটু খাঁকরিয়ে শচীকান্ত আবেলকে বলতে শুরু করলেন, "ভারতবর্ষ নিয়ে আপনার যখন এত আগ্রহ তখন স্বামী বিবেকানন্দর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?"

আবেল একটু চুপ করে থেকে বলল, "না শুনিনি। আসলে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার আগ্রহ খুব নির্দিষ্ট। ভারতবর্ষ ফুলমতীমাঈয়ের দেশ। আমার কাছে ভারতবর্ষ মানে শুধু ফুলমতীমাঈ।"

"ফুলমতীমাঈয়ের নামটা আপনি আগেও একবার বলেছিলেন। কে ছিলেন তিনি?"

"একজন খুব সাধারণ ভারতবাসী। বাঁচার স্বপ্ন কীভাবে দেখতে হয় সেটাই হয়তো উনি জানতেন না। কিন্তু উনি একটা অসাধারণ কাজ করে ফেলেছিলেন। তাঁর জন্যই আমার জন্ম। তাঁর জন্যই হয়তো আমি আজ এখানে। আমার কাছে উনি একজন রূপকথার পরি ধরতে পারেন। তাঁর ঠিক কোথায় জন্ম হয়েছিল তার ল্যাটিটিউড, লংগিটিউড জানি না। যেটা জানি সেটা হচ্ছে, দশ বছর বয়সে তার একটা নতুন জীবন শুরু হয়েছিল কলকাতার এক ঘাটে। সেই ঘাটটার ল্যাটিটিউড, লংগিটিউড অবশ্য জানি। অর্থাৎ লোকেশন জানি। বলব আপনাকে।"

পুরো ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতো শোনাল শচীকান্তর কাছে।

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে একাদশ কিস্তি

আমার প্রপিতামহ মার্কাস ভ্যান ডার বার্গ একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন আমার হবু প্রপিতামহী এমিলিকে নিয়ে গোটা বিশ্ব ঘুরে দেখবেন। হবু বললাম এই জন্য যে, যেদিন সেই স্বপ্নটা মার্কাস

প্রথম দেখেছিলেন তখনও এমিলিকে বিয়ের প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়ে উঠতে পারেননি। কারণ অবশ্য তোমায় আগেই বলেছি। সেই সময় চারদিকে অনেক বাধাবিপত্তি ছিল। বেশ জটিল। তবে প্রিয়তমা, আশাকরি আমস্টারডাম পৌঁছনোর আগে সেইসব জটিল গল্পের সূত্রগুলো জট ছড়িয়ে গুছিয়ে লিখে উঠতে পারব। এখন আপাতত খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তারিখের কথা লিখে রাখি।

তারিখটা হল ৪ঠা জুন ১৮৭৩।

ওইদিন অবশেষ লাল্লা রুখ পারামারিবো বন্দরে এসে নোঙর করল। অর্থাৎ ভারতবর্ষের কলকাতা বন্দর থেকে ডাচ গায়ানার পারামারিবো বন্দরে আসতে সময় লাগল প্রায় চার মাস। এই চার মাসের দীর্ঘ পাড়ি দিতে গিয়ে জাহাজেই মারা গিয়েছেন ১১ জন। তাঁদের সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সমাহিত করা হয়েছে। জীবিত বাকিদের অধিকাংশই তখন শারীরিক মানসিক ভাবে প্রায় ভেঙে পড়েছেন। এই দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার অধিকাংশ সময়টা কাটাতে হয়েছে জাহাজের অন্ধকার খোলের ভিতর। জাহাজ যখন-যখন যাত্রাপথে রেশন তোলার জন্য কোনও বন্দরে থেমেছে, তাঁদের অধিকার ছিল না জাহাজ থেকে নামার। কখনও কখনও জাহাজ ভয়ঙ্কর সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ সামলাতে খড়ের মতো দুলেছে, কখনও প্রবল বৃষ্টিপাতে খোলের মধ্যে জল ঢুকেছে। সেই জল তাঁদেরই ছেঁচে বের করতে হয়েছে। এইসব সইতে-সইতে মানুষগুলোর চোখের স্বপ্ন মুছে কীরকম যেন বোধশূন্য হয়ে পড়েছিল সবাই। পারামারিবো বন্দরে এসে যখন খোলা হাওয়ার মধ্যে মাটিতে পা পড়ল তাঁদের, মানুষগুলোর মনে হল নতুন জীবন পেলেন।

ওঁদের দেখে পারামারিবো বন্দরে তখন ওলন্দাজ প্ল্যানটেশন মালিকদের সে কি উল্লাস! তবে এঁরা যে আফ্রিকানদের চেয়ে আলাদা সেটা ওলন্দাজরা প্রথম দর্শনেই বুঝে গেলেন। বাদামি পুরুষদের পরনে ছোট করে পরা ময়লাটে ধুতি। মাথায় ফেটি করে কাপড় বাঁধা। কার কার গায়ে মলিন ফতুয়া। মহিলাদের গায়ে শাড়ি। ঘোমটা টানা। এঁদের গায়ের রঙ বা চেহারা, কোনটাই আফ্রিকানদের মতো নয়।

সরকারি নিয়মে প্রথমদিন সবাইকে এক জায়গায় আটকে রাখা হল। আরেক দফা স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে। স্নান করিয়ে পরিষ্কার করানো হবে। রোগমুক্ত কিনা দেখা হবে। তারপরে সরকারি তত্ত্বাবধানে প্রত্যেকের একটা করে নম্বর পড়বে। তারপরে একেকজনের সঙ্গে প্ল্যানটেশন মালিকদের সঙ্গে চুক্তি হবে। সেই চুক্তির একটা ধারা ছিল কোনও চুক্তি শ্রমিক তার নিজের প্ল্যানটেশন মালিকের চৌহদ্দির বাইরে লিখিত অনুমতি ছাড়া যেতে পারবেন না।

জানি প্রিয়তমা, চুক্তির এই ধারাটা পড়ে তুমি একটা মিল খুঁজে পাচ্ছ। ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ সভ্যতার ঝাঁ চকচকে আধুনিক ডেটা দুনিয়ার মোড়কের পিছনে অনেক আদিম শর্ত আজও বদলায়নি।

প্রিয়তমা, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, যে ফুলুয়ার কথা আমি বারবার বলেছি, তার কী হল?

পুরুষ কুলিরা বিভিন্ন প্ল্যানটেশনে ভাগ হবেন। যারা পরিবার নিয়ে আসতে পেরেছেন, স্বভাবতই তাদের পরিবার তাদের সঙ্গে থাকবেন। তবে রামাশীষ ছিলেন একদম ব্যতিক্রমী। শুধু বাপ-মেয়ে এসেছে, তাও আবার দশ বছর বয়সী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে, এরকম আর একজনও ভারতীয় কুলি ছিলেন না।

ঘটনা হচ্ছে, রামাশীষ জানতেন না কোন মালিক কেমন হবেন। তার ভাগ্যে অনেকটা লটারির মত জুটল ভ্যান ডার বার্গ প্ল্যানটেশন। অবশ্য এটা অন্যদিন হলে কী হত জানা নেই। মনে হয় না রামাশীষের মতো স্বাস্থ্যের অধিকারীকে হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ চাইলে আলডার্ট বুগার্ড অত সহজে ছেড়ে দিতেন। কিন্তু সেদিন আলডার্ট বুগার্ড ছিলেন ভীষণ খুশি। দিনটা যে ছিল ৪ঠা জুন ১৮৭৩।

॥ ১১ ॥

আজ পারামারিবো বন্দর যেন উৎসব মুখর। শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে জাহাজ কুলি বোঝাই করে এসেছে। যে সব প্ল্যানটেশনের মালিকরা হাজির হয়েছেন তাদের মধ্যে উৎসাহ আর তৎপরতা তুঙ্গে। নানান ঘাত প্রতিঘাতের পর অবশেষে নতুন রকম কুলিদের পাওয়া গিয়েছে। যেটুকু খবর পাওয়া গিয়েছে ব্রিটিশ গায়ানায় এই ভারতীয় কুলিরা এখন যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে।

কুলি বাছতে মার্কাসও কাকা হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ-এর সঙ্গে এসেছে। গিলবার্ট ডি জং, রুবেল ভ্যান ডিকরাও এসেছেন। তবে মার্কাস খেয়াল করল সবচেয়ে খোশ মেজাজে আছেন আলডার্ট বুগার্ড। মার্কাস বুঝতে পারছিল না মাস আটেক আগে বুগার্ড বাংলোতে ভারতীয় কুলিদের দক্ষতা সম্পর্কে যেরকম সন্দিহান ছিলেন আলডার্ট, দাসপ্রথা আবার ফিরিয়ে আনার ভীষণভাবে পক্ষে ছিলেন, তিনি আজ কীভাবে এত উৎসাহ পাচ্ছেন।

এই প্রশ্নটার সবচেয়ে ভালো উত্তর হয়তো দিতে পারবেন হেনড্রিক। কিন্তু আলডার্ট বুগার্ড সম্পর্কে কোনও অতিরিক্ত কৌতূহল দেখানোর ব্যাপারে মার্কাস সাবধানী। গত কয়েক সপ্তাহে বেশ কয়েকবার পরিত্যক্ত জেটিতে নিভৃতে দেখা হয়েছে এমিলির সঙ্গে। মার্কাস এখনও মুখ ফুটে এমিলিকে নিজের প্রাণের ইচ্ছেটা না বলতে পারলেও যে কোনদিন কথাটা বলার জন্য ভিতরে-ভিতরে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। তবে কাকা যে এখনও কিছু টের পায়নি, সে ব্যাপারে মার্কাস নিশ্চিন্ত। জানতে পারলে কাকা অনর্থ করতই।

এরমধ্যেই হঠাৎ করে অপ্রত্যাশিত খবর পেল মার্কাস।

গিলবার্ট ডি জং মার্কাসের কাঁধে একটা চাপড় মেরে একটু দূরে আলডার্ট বুগার্ডকে দেখিয়ে বললেন, "বুড়োটার উল্লাস আজ খেয়াল করেছ?"

মার্কাস হেসে বলল, "হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। খুব ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন।"

"শুধু ফুরফুরে মেজাজে? একদম দিলদরিয়া। খবরটা পেয়েছ তো?"

"কোন খবরের কথা বলছেন?"

গিলবার্ট ডি জং আকাশের দিকে একমুখ চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে খ্যাকখ্যাক করে হাসতে-হাসতে বললেন, "তোমার কাকা তোমাকে বলেনি? বুড়োটা আজ ভোরে আবার বাপ হয়েছে।"

"মানে?" মার্কাসের ঠিক যেন বোধগম্য হল না গিলবার্ট ডি জং-এর কথা। এমনিতে আলডার্ট বুগার্ডের সঙ্গে অধিকাংশ প্ল্যানটেশন মালিকদের সুসম্পর্ক নেই। যে যাকে দেখতে পারে না তার নামে যথেচ্ছ গালিগালাজ আর কুৎসা করে। তা ছাড়া এমিলির সঙ্গে অনেক গল্প হয়েছে। পরিবারের কথাও হয়েছে। কিন্তু এমিলি একবারও বলেনি যে তার সৎমা গর্ভবতী। ব্যাপারটা একটু অবিশ্বাস্য। এমিলি আলডার্ট বুগার্ডের একমাত্র মেয়ে। বয়স প্রায় উনিশ। এত বছরের ব্যবধানে আলডার্ট আবার বাবা হলেন?

গিলবার্ট চুরুটে টান দিয়ে মার্কাসের কাঁধে চাপড় দিতে দিতে বললেন, "বাপ হয়েছে মানে বাপ হয়েছে! একেবারে ছেলের বাপ হয়েছে।" তারপর চোখ মটকে বললেন, "আমার শুধু বাচ্চাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। ছেলেটাকে দেখলে ছেলের দুগ্ধবতী মাকেও দেখা যাবে। চলি। আজকে অনেক কাগজপত্তরের কাজ আছে। বুগার্ড বাংলোতে নতুন বাপ পার্টি দিলে আবার দেখা হবে।"

গিলবার্ট ডি জং ব্যস্ত হয়ে চলে যাওয়ার পরও মার্কাস খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। আজ এমিলিও নিশ্চয়ই ওর বাবার মতো খুব খুশি। মন ফুরফুরে হয়ে আছে। আজকেই হয়োত সবচেয়ে ভালো সময় এমিলিকে প্রাণের ইচ্ছে, মনের কথাটা বলে দেওয়া। কিন্তু এমিলি কি আর আজকে এসেছে? প্রথমত বাড়িতে ভাই হয়েছে। মাকে ছেড়ে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ আর দ্বিতীয়ত বহু প্রতীক্ষিত জাহাজ আজকে চলে এসেছে। দূরবীন নিয়ে এমিলির আর সেটাকে খুঁজতে আসার দরকার নেই।

তবু যেন মার্কাসের মনে হল, এমিলি এসেছে। কাকার চরম ব্যস্ততা খেয়াল করে বন্দরের বাইরে বেরিয়ে এসে মার্কাস ঘোড়ায়

উঠে বসল। এমিলির সঙ্গে যে জায়গাটায় দেখা করে ঘোড়ায় করে সেই পরিত্যক্ত জেটিটায় যেতে মিনিট কুড়ি লাগবে। মনে একটা দ্বিধা নিয়েও সেই জায়গাটায় একবার না গিয়ে থাকতে পারল না মার্কাস।

তবে জায়গাটায় পৌঁছনোর আগেই মনটা খুশিতে ভরে উঠল। যে ক্ষীণ সম্ভাবনাটা মনে করেছিল সেটাই সত্যি হয়েছে। এমিলির সাদা ঘোড়াটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে কোফি। আর জলের দিকে মুখ করে একটা পাথরের ওপরে চুপ করে বসে রয়েছে এমিলি।

এমিলির ঘোড়াটার পাশে ঘোড়া থেকে নামল মার্কাস। আনমনা এমিলি মার্কাসের ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজটা শুনতে পায়নি। আজ একটা গোলাপ ফুল নিয়ে আসা উচিত ছিল। ভুল হয়ে গেল। বন্দরের একপাশে ছিল ছোট্ট একটা বাগান। সেখানে গোলাপ ছিল। মার্কাস এদিক ওদিক তাকাল। নাঃ! এখানে একটা বুনো ফুল গাছের ঝোপও নেই।

এমিলির দিকে হাঁটতে-হাঁটতে হটাৎ পায়ে কী একটা ঠোক্কর খেল। চোখটা সেদিকে যেতেই মুখে হাসি ফুটল মার্কাসের। খুব সুন্দর একটা শাঁখ। নিচু হয়ে শাঁখটা তুলে বালি ঝেড়ে নিল। তারপর সেটা হাতের মুঠোয় নিয়ে এগিয়ে গেল এমিলির দিকে। পিছন থেকে এমিলির হাতটা ধরে তালুতে শাঁখটা দিয়ে বলল, 'অভিনন্দন!'

চমকে উঠল এমিলি। আর এমিলির মুখটা দেখে আরও চমকে উঠল মার্কাস। একদম শুকনো মুখটা। দুটো চোখ দিয়ে জল নামছে।

"কী হয়েছে তোমার এমিলি?"

ঠোঁট টিপে এমিলি কোনরকমে বলল, "কিছু না।"

"কিছু তো নিশ্চয়ই হয়েছে। আজকে তোমার এত আনন্দের দিন," এমিলির সামনের পাথরটায় বসতে-বসতে মার্কাস বলল।

এমিলি দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগল। খুব উদ্বিগ্ন হয়ে কী হয়েছে জানার জন্য নরম গলায় খানিকক্ষণ পীড়াপীড়ি করার পর মার্কাস একটু শক্ত হল। দু'হাত দিয়ে এমিলির মুখের ওপর থেকে হাত দুটো ধরে সরিয়ে দিয়ে বলল, "কী হয়েছে, আমাকে তোমায় বলতেই হবে এমিলি।"

এতক্ষণ স্নায়ুর সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত হার মানল এমিলি। হারিয়ে যাওয়া চোখ নিয়ে মার্কাসের দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ থেকে আমি আর আলডার্ট বুগার্ডের মেয়ে নই।"

কিছুই না বুঝে উঠতে পেরে মার্কাস বলল, "মানে?"

"আমি কোনওদিনই আলডার্ট বুগার্ডের নিজের মেয়ে ছিলাম না। আজ আলডার্ট বুগার্ড নিজের সন্তানের বাবা হয়েছেন। আজ থেকে আর আমার ওঁর মেয়ে সেজে থাকার দরকার নেই।"

"কি বলছ তুমি?"

"সত্যিই বলছি।"

"তুমি বোধ হয় তোমার বাবার কথার কোনও ভুল মানে বুঝেছ। আমাদের এই ওলন্দাজ গায়ানা খুব ছোট একটা জায়গা। এখানে প্ল্যানটেশন মালিকরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের নাড়ির খবর রাখে। তুমি যদি আলডার্ট বুগার্ডের নিজের মেয়ে না হয়ে থাক, এই খবরটা এখানে প্রত্যেকে জানত। আমার কাকা পর্যন্ত বলেন বুগার্ড ফার্মের তুমি হচ্ছ উত্তরাধিকারী। তোমার বাবার তোমাকে নিয়ে অনেক গর্ব।"

"গর্ব ছিল। কিন্তু যেদিন বাবা জানতে পারলেন আমার নতুন মাকে তিনি নিজে গর্ভবতী করে ফেলতে পেরেছেন, সেদিন থেকেই ওঁর আমাকে নিয়ে গর্ব কমতে শুরু করেছে।"

"তার মানে তোমার মা নিজের মা নন?"

"এই কথাটা আমি একবারও মনে করি না। আলডার্ট বুগার্ডকে আমি চিরদিন নিজের বাবাই ভাবব। যেরকম শ্রদ্ধা করে এসেছি সেরকম শ্রদ্ধাই করব। তোমাকে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, আমার বাবা-মা জীবনে একবারই অ্যামস্টারডামে গিয়েছিল। সেখানে বছর দুয়েক ছিল। ফেরার সময় আমাকে নিয়ে এসেছিল। সবাই ভেবেছিল মা আমাকে গর্ভে ধারণ করে অ্যামস্টারডামে জন্ম দিয়েছিল। আমার জন্মদাত্রী মা ছিলেন অন্য কেউ। আমার জন্মদাত্রী মা কে আমি জানি না। কিন্তু যিনি আমাকে অপত্য স্নেহ দিয়ে প্রতিপালন করে তুলেছেন, তিনিই আমার মা। সত্যিকারের মা। এটা ছিল বাবার একটা পরিকল্পনা। কারণ অ্যামস্টারডামে ডাক্তাররা বলেছিল, বাবার কোনও সমস্যা আছে। বছর দেড়েক আগে আমার পালিত মা মারা যাওয়ার পর বাবা আবার বিয়ে করল। তারপর আমস্টারডামের ডাক্তারদের ভুল প্রমাণ করে আজ নিজের সন্তানের বাবা হয়েছে। গর্ভধারণের সমস্যা ছিল মায়ের।"

মার্কাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এমিলির হাত দুটো শক্ত করে ধরে বলল, "কিচ্ছু এসে যায় না এমিলি। কিচ্ছু এসে যায় না। আলডার্ট বুগার্ড তোমাকে মেয়ে হিসেবে অস্বীকার করলে সুবিধেই হলো। তোমার আমার মধ্যে আর বুগার্ড পরিবার ভ্যান ডার বার্গ পরিবারের প্রাচীরটা আর থাকল না। আমরা একসঙ্গে থাকব। একসঙ্গে গোটা বিশ্ব ঘুরে দেখব। আমি তোমাকে ভালোবাসি এমিলি। খুব খুব ভালবাসি"

মার্কাস উঠে হাঁটু গেড়ে বসে হাত এগিয়ে বলল, "আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তুমি কি রাজি?"

এমিলি আবেগে কেঁদে ফেলে আবার দু'হাতে মুখ ঢেকে বলল, "আমিও তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু আমার ভালবাসা, আমার চাওয়াতে কী এসে যায়?"

"কেন?"

"যে কথাটা তোমাকে বললাম, সেটা পৃথিবীর আর কেউ জানে না। যে জানবে তাকে বাবা গুলি করে মেরে দেবে। তুমি জানো না বাবা কত'টা নিষ্ঠুর।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মার্কাস মাথাটা ঝুঁকিয়ে বলল, "জানি। আমার কাকার দৃঢ় বিশ্বাস আমার বাবা মায়ের মৃত্যুর জন্য তোমার বাবাই দায়ী। যে মেরুন কলোনির কাছে গাছের তলায় আমার বাবা মায়ের মৃতদেহ দুটো পাওয়া গিয়েছিল সেটা ছিল তোমাদের খেত। এমনকী বাবার বুকে যে ছুরিটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা ছিল তোমাদের বাড়ির ছুরি।"

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে ভারাক্রান্ত গলায় মার্কাস বলল, "কিন্তু বিশ্বাস করো, এটা জানার পরও তোমার প্রেমে পড়া থেকে আমার আত্মা আমাকে আটকাতে পারেনি। আমি বারবার বিশ্বাস করে এসেছি, এইসব হিংসা খুনোখুনিতে তোমার কোনও দোষ নেই। তুমি নিষ্পাপ, পবিত্র। বরং এখন তোমার কথা শুনে, তোমার ধমনিতে যে আলডার্ট বুগার্ডের রক্ত নেই জেনে নিজেকে খুব হালকা লাগছে।"

এমিলি একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল, "কিন্তু আরও কিছু সত্যি জানলে তোমার হয়তো আর নিজেকে আর হালকা লাগবে না। ভয় করছে, তোমাকে বলব কিনা?"

"কেন ভয় করছে কেন?"

"কারণ এই সত্যি তোমার পরিবার নিয়ে।"

কৌতূহলী হয়ে মার্কাস নড়েচড়ে উঠল, "কীরকম?"

"তোমার কখনও মনে হয়নি মার্কাস যে তোমার কাকা তোমাকে কেন লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন? তোমার কাকা কেন কোনদিন বিয়ে করেননি?"

"প্রথম প্রশ্নটা তুমি আগেও আমাকে করেছ। বলেছিলাম তোমাকে। বাবা আর মা খুন হয়ে যাওয়ার পর কাকার মনে হয়েছিল এই জায়গাটা নিরাপদ নয়। তাছাড়া লন্ডনে পড়াশোনা করার সুযোগ অনেক বেশি। আর তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা খুব সোজা। অনেকেই বিয়ে না করে চিরকুমার থাকতে চায়। এটা ব্যক্তিগত পছন্দ। তোমার প্রশ্ন দুটোর মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি?"

এমিলি মাথা ঝাঁকাল, "আছে। জানি না উত্তরটা দিলে তুমি নিতে পারবে কিনা। তোমার বাবা-মা ছিলেন খুব নরম। ক্রীতদাসদের প্রতি খুব দরদী। ক্রীতদাসদের প্রতি অত্যাচার একদম সহ্য করতেন না। ওদের অধিকারের জন্য বলতেন। ওদের আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। নিয়মিত মেরুন কলোনিতে যেতেন ওঁরা। ওদের কল্যাণ আর উন্নতির চেষ্টা করতেন। ওঁদের গানবাজনা শুনতে খুব পছন্দ

করতেন। এ সবের জন্য ক্রীতদাসদের খুব প্রিয় কাছের মানুষ ছিলেন ওঁরা। আবার একই কারণে অনেক প্ল্যানটেশন মালিকদের চক্ষুশূল হয়ে উঠছিলেন। তার মধ্যে যেমন আমার বাবা ছিলেন তেমনই তোমার কাকা হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গও ছিলেন। তোমার কাকা কোনদিন বিয়ে করেননি কেন জানো? উনি প্রত্যেকদিন রাত্রে ক্রীতদাসীদের ধর্ষণ করতে ভালোবাসতেন। এটাই ছিল ওঁর যৌন পছন্দ। তাই নিয়ে তোমার মা-বাবার সঙ্গে মতান্তর চরমে উঠেছিল।"

মার্কাস হাত তুলে এমিলিকে থামিয়ে বলল, "তাই আমার কাকা আমার বাবা মাকে খুন করিয়ে দিলেন? অন্য প্ল্যানটেশন মালিকরা পথের কাঁটা দূর হতে দেখে খুশি হলেন। তুমি তাই বলতে চাও?"

এমিলি চুপ করে থাকল। মার্কাস মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে থাকল, "এই গায়ানায় প্ল্যানটেশন মালিকদের একটা সমস্যা কি জানো তো? প্রত্যেক পরিবার অন্য পরিবারের জন্য একটা করে কেচ্ছার গল্প সবসময় মাথায় নিয়ে ঘোরে। আলডার্ট বুগার্ড আমার বাবা মাকে খুন করানোর পর এই গল্পটা তৈরি করেছেন।"

এমিলি অসহায় হয়ে বলে উঠল, "এটা আমার বাবার বলা গল্প নয়। এটা আমাকে কোফি বলেছে। কোফি কখনও মিথ্যে কথা বলে না। আদ্যোপান্ত সৎ মানুষ একজন। আর তোমাকে তোমার কাকা কেন লন্ডনে পড়তে পাঠিয়েছিলেন জানো? কারণ তোমার অনাথ মুখ এখানে নিগাররা দেখত পেলে ওদের আক্রোশটা আরও সংঘবদ্ধ হয়ে তোমার কাকার বিরুদ্ধে আগুন জ্বলত।"

বিশ্বাস হচ্ছে না মার্কাসের। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। অথচ কথাগুলো অন্য কেউ নয় এমিলি বলছে। শরীরটা কীরকম অস্থির লাগছে। মাথা কাজ করছে না। মাথাটা ঝুলিয়ে বসে রইল মার্কাস। বিড়বিড় করে বলল, "এসব যদি সত্যি হয়, আমার জীবনটাই যেন মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে।"

এমিলি দু'হাত দিয়ে মার্কাসের দুটো গাল ধরে মুখটা উঠিয়ে বলল, "না মিথ্যে হচ্ছে না। আমার ধমনীতে আলডার্ট বুগার্ডের রক্ত নেই শুনে তুমি যেমন আজ এত নিশ্চিন্ত, সেরকম তুমিও অমন কোমল হৃদয়ের বাবা-মায়ের সন্তান জেনেই খুব নিশ্চিন্তে অনেক আগেই তোমার প্রেমে পড়েছি।"

এমিলি ওর ঠোঁট দুটো ডুবিয়ে দিল মার্কাসের ঠোঁটে।

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে দ্বাদশ কিস্তি

খুব বেশি এই দফায় তোমার জন্য লিখতে পারব না প্রিয়তমা। ট্যাবের চার্জ কমে এসেছে। ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালে পৌঁছে প্রথমেই একটা মোবাইল চার্জিং স্টেশন খুঁজে ট্যাবটাকে আবার পুরো চার্জ করে নিতে হবে। এখন বাসে করে ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালের দিকে যেতে-যেতে যতটুকু চার্জ আছে লিখি।

এক দুপুরে পরিত্যক্ত এক জেটিতে আমার প্রপিতামহ মার্কাস ভ্যান ডার বার্গ আর প্রপিতামহী এমিলি নির্মল জলের সামনে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে নিজেদের প্রেমে শিলমোহর লাগালেন। সাক্ষী রইল দুটো সাদা ঘোড়া আর একজন মাত্র কালো মানুষ, কোফি।

প্রিয়তমা, নিশ্চয়ই ভাবছ এই গল্পটার একটা ধারা ভারতবর্ষের মাটিতে এখানেই অর্থাৎ দিল্লিতে শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। আর যেদিন টেসেল আইল্যান্ডে তোমাকে এই গল্পটা বলব, গল্পের এই মোড়ে তোমার কোল থেকে মাথাটা তুলে নেওয়া উচিত। প্রিয়তমা, গল্পের এই ধারাটা এখানে সত্যিই শেষ হয়ে যেত যদি সেদিনই কয়েকটা নির্মম সত্যি জানার পর মার্কাস আর এমিলি লুকিয়ে একটা জাহাজে চেপে ওলন্দাজ গায়ানা ছেড়ে অন্য কোনও দেশে সুখের ঘরকন্না করতে চলে যেতেন ওই 'অ্যান্ড দে হ্যাপিলি লিভড এভার আফটার' এর মতো। কিন্তু গল্পের অনেক সূত্র যে এখনও জট পাকিয়ে রয়েছে। তার একটা গিঁট হল, মার্কাস আর এমিলি ঠিক করেছিলেন ওলন্দাজ গায়ানাতে থেকেই তাদের প্রেমের পরিণতি খুঁজবেন।

ইতিহাসের পাতায় আমরা আপাতত আছি ৪ঠা জুন ১৮৭৩ এ। সেইদিনই দশ বছরের ফুলুয়া দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা করে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পৃথিবীর উল্টো পিঠে এক অজানা দেশে পা রেখেছে। মনে আছে, তোমাকে একটা সূত্রে বলেছিলাম যে ঈশ্বর ভারতবর্ষের এক প্রত্যন্ত দোপোহোরি গ্রামের শিশুদের কবরস্থানে গভীর অবসাদ নিয়ে বসে থাকা দশ বছরের ফুলুয়াকে একদিন নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন ফুলমতীমাঈ হয়ে ওঠার প্রস্তুতি নিতে। সেই প্রস্তুতির দ্বিতীয় ধাপ সম্পূর্ণ হল।

এটা ভাবলেই আমার গায়ে কাঁটা দেয়। আর সেরকমই গায়ে কাঁটা নিয়ে বর্তমানে আমি চলেছি ম্যাজিক গঙ্গার প্রথম ঘাটটা দেখতে। ভিতরে-ভিতরে তখন আমার ভীষণ উত্তেজনা। আমার খালি মনে হচ্ছিল এবার আমার ভার্চুয়াল ঈশ্বরীর একটা ছবি আমি খুঁজে পাবই। আর সঙ্গে অনেক অনেক ডেটা। কলকাতা শহরের গঙ্গার ঘাটগুলো আমাকে সেই ছবি আর ডেটা খুঁজে দেবেই।

তাই তোমার কোল থেকে মাথা তুলে নেওয়ার সময় এখনও হয়নি। এরপর কী হল শোনও প্রিয়তমা।

॥ ১২ ॥

সামনে কুলকুল করে বইছে গঙ্গা। একপাশে জেটি। আর গঙ্গায় নামা ঘাটের ধাপ।

আবেলের সঙ্গে-সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে নেমে এসেছে মিতালি। আবেল ঘাটের শেষ ধাপে নেমে একটু ঝুঁকে গঙ্গার জলে আঙুলগুলো ঠেকিয়ে চোখটা বন্ধ করে নিল।

"মা গঙ্গা, সারাজীবন তো পাপই করে যাচ্ছি, একটু পূণ্য দাও," মিতালি বিড়বিড় করে বলতে-বলতে গঙ্গার জল নিয়ে মাথায় ছেটাতে থাকল। ঘাট দেখে খুব চেনা মনে হচ্ছে। ছোটবেলায় কোনদিন বাবার সঙ্গে এই ঘাটে এসেছিল কি? মনে পড়ছে না। তবে মনে পড়ছে এই ঘাটের কাছেই একটা মন্দির আছে। আবেলের কানের কাছে বলল, "আমি একটা মন্দির দেখে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি।"

রতনবাবু ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে অনেক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন শচীকান্ত। এ বড় পবিত্র স্থান। পাশেই রামকৃষ্ণ মহাশ্মশান। উলটোদিকে বেলুড় মঠ। কর জোড়ে প্রণাম করে চোখ খুললেন শচীকান্ত। ঘাটে ইতস্তত কিছু লোক। তার মধ্যেই খুঁজে পেলেন আবেলকে। এই প্রণাম করার সময়টুকুর ফাঁকেই তরতর করে নেমে গিয়েছে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে। শচীকান্ত একটু শিউরে উঠলেন। গঙ্গার বয়ে আনা পলিমাটিতে ঘাটের শেষ ধাপগুলো খুব পিচ্ছিল। অসাবধানে পা পড়লেই গঙ্গায় পড়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ডেকে উঠলেন, "আবেল!"

আবেল উঠে এল। আঙুলের ডগায় খানিকটা গঙ্গামাটি। সেটা দেখিয়ে বলল, "আচ্ছা, এখানে কোথাও একটা ছোট পাত্র কিনতে পাওয়া যাবে? এই মাটি একটু সংগ্রহ করে নিয়ে যেতাম।"

"দেখছি। তবে আমরা তো আরও খানিকগুলো ঘাট দেখব। অন্য জায়গা থেকেও সংগ্রহ করতে পারি। জানেন আমাদের হিন্দু ধর্মে কিন্তু এই গঙ্গা জল, গঙ্গা মাটিকে খুব পবিত্র ভাবা হয়। সব মাঙ্গলিক আচারে এই দুটো জিনিসের অবশ্যম্ভাবী দরকার হয়।"

"কিন্তু এতো দেখছি প্রচণ্ড দূষণ।"

শচীকান্ত চুপ করে গেলেন। সেই বই লেখার দিনগুলো মনে পড়ে গেল। তারপর যা হয়েছিল সেই অস্বস্তিটা এখনও যায়নি। ওই সামান্য ভয়েই কাজটা নিয়ে আর এগোননি। মুহূর্তের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হল। গলাটা নামিয়ে নিয়ে বললেন, "সেটা সভ্যতার অবদান। গঙ্গার দু'দিকেই তো গড়ে উঠেছে যত কলকারখানা, বসতি। অবশ্য এখন সরকারি নিয়মের অনেক কড়াকড়ি হচ্ছে," তারপর কথাটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বললেন, "আচ্ছা, ওই মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে কোথায় গেল?"

"কে রোজি? বলল একটা মন্দিরে একটু প্রণাম করে আসছে। অনেক ধন্যবাদ শচীবাবু। জানেন, এই ঘাটটায় দাঁড়িয়ে গঙ্গাজল ছুঁয়ে

আশ্চর্য একটা অনুভূতি হল। আমার ঠাকুরমা ছোটবেলায় একটা রূপকথা বলতেন। তাতে ফুলমতীমাঈ ছিলেন, আপনাদের দেশ ছিল, এই গঙ্গা, গঙ্গার ঘাট ছিল। চুপ করে গঙ্গাজল ছুঁয়ে আমার মনে হল আমার হাতের আঙুলগুলোয় ঠাকুরমার বলা শব্দগুলোকে ছুঁয়ে গেল।"

শচীকান্ত এই হেঁয়ালির মানে বুঝতে না পেরে শুকনো হেসে জলের গতির দিক দেখে বললেন, "এখন ভাঁটা। জল বঙ্গোপসাগরের দিকে বইছে।"

আবেল বলতে থাকল, "আমার মন কী বলছে জানেন শচীবাবু? এরকমই কোনও ঘাটে ফুলমতীমাঈ প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন।"

এই ফুলমতীমাঈ ব্যাপারটা কিছুতেই ধরতে পারছেন না শচীকান্ত। আবেল ট্যাবটা বের করে কয়েকটা ছবি তুলল। শচীকান্ত ঘড়ি দেখলেন। অন্তত বেশ কয়েকটা ঘাট না দেখিয়ে দিলে অর্জুন সান্যালকে বলা যাবে না কাজটা ঠিকমতন করে দিয়েছেন।

শচীকান্তর চুপ করে থাকা মুখটা দেখে আবেল বুঝতে পারল কিছুই ওঁর বোধগম্য হচ্ছে না। অবশ্য না হওয়ারই কথা। দোষ দেওয়া যায় না। এ যেন অগমেন্টেড রিয়্যালিটির জটিল একটা কোডিং সমাধান করার মতো কাজ। কোথায় গিয়ে যে সমাধানটা হবে কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না।

আবেল আনমনা ভাব কাটিয়ে জিজ্ঞেস করল, "যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে একটা প্রশ্ন করি শচীবাবু? আপনি কতদিন এই হেরিটেজ ওয়াক, টুরিস্ট গাইডের পেশায় আছেন?"

চমকে উঠলেন শচীকান্ত। এই পুণ্যস্থানে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নের মিথ্যে উত্তর দেওয়া যাবে না। কিন্তু এতক্ষণ ছেলেটার সঙ্গে সময় কাটিয়ে সত্যিটাই বা মুখ ফুটে বলেন কি করে যে উনি কোনও টুরিস্ট গাইডই নন। আজকে যে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার হেতু বহুদিন আগে লেখা অস্বস্তিকর একটা বই।

চুপ করে থাকার কারণটা আবেল বুঝতে পারল কিনা নিশ্চিত হতে পারলেন না শচীকান্ত। আবেল নিজের মনেই বলে চলল, "মাফ করবেন। আপনাকে প্রশ্নটা এভাবে হয়তো করা উচিত নয়। আপনি অভিজ্ঞ। নিশ্চয়ই অনেক-অনেক মানুষকে নিয়ে এই ইতিহাস সফর করিয়েছেন। মানুষ ইতিহাস থেকে কি স্মৃতি কুড়িয়ে পায় বলুন তো?"

শচীকান্ত কপালে আঙুল ছুঁইয়ে বললেন, "জানি না।"

"আমি একটা অদ্ভুত ইতিহাস খুঁজছি জানেন। যার কোনও সার সত্য হয়তো নেই। আর যদি থেকেও থাকে তাহলে পৃথিবীর কোন মহাফেজখানায় সেই নথি আছে বলে আমার জানা নেই। কিছু ডেটা যদি পাওয়া যেত শচীবাবু।" আবেল আক্ষেপ করে বলল।

ইতিমধ্যে দিলীপের দুটো সিগারেট খাওয়া হয়ে গিয়েছে। নিজের মনে গজগজ করে উঠল, বুড়ো আর সাহেবের কাররই কোনও তাল নেই। সেক্সি দেখতে মেয়েটাও কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছে। যা সময় এখানে লাগাচ্ছে এরপর তো মিছিলের জ্যামে গাড়ি টানতে হবে।

আবেল হাতের মাটিটা দেখিয়ে বলল, "শচীবাবু একটু যদি মাটি নেওয়ার পাত্রটা দেখেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখছি।"

শচীকান্ত একটা চায়ের দোকানে এলেন। দোকানদারকে বললেন, "ভাই, একটা কৌটো পাওয়া যাবে? একটু গঙ্গামাটি নিতাম।"

দোকানদার এক ঝলক আবেলের হাতের মাটিটা দেখে নির্লিপ্ত গলায় বলল, "না।"

"কোথায় পাবো বলুন ভাই?"

"রতনবাবু রোডে যান। প্লাস্টিকের দোকানে পাবেন।"

শচীকান্ত বুঝতে পারলেন দোকানদারকে কোনও ব্যবসা না দিলে সাহায্য পাবেন না। আবেলকে জিগ্যেস করলেন, "চা খাবেন?"

আবেল মৃদু হেসে বলল, "না। আপনি খান।"

এবার আর আপত্তি করলেন না শচীকান্ত। দোকানদারকে চিনি ছাড়া একটা লিকার চা দিতে বলে চেয়ে নিলেন একটা খালি কাগজের কাপ। সেই কাপে আবেলকে আপাতত মাটিটা নেওয়ার ব্যবস্থা করে চায়ের দোকানের জলের জগ নিয়ে আবেলের হাতটা পরিষ্কার করতে ঢালতে থাকলেন।

"থ্যাঙ্ক ইউ শচীবাবু। সত্যি আপনি না থাকলে এরকম একটা সুন্দর ঘাট দেখা হত না। একটু আগে আপনি বলছিলেন ৪২টা ঘাট আছে। সব ঘাটই কী এরকম?"

"না। নানা রকমের ঘাট আছে। ছোট বড়। এখানেই কাছাকাছি উত্তর দিকে আরও দুটো ঘাট আছে। প্রামাণিক ঘাট আর সতীদাহ ঘাট। আমাদের হাতে তো অত বেশি সময় নেই। তাই সব দেখা যাবে না। তবে মোটামুটি ঘাটগুলো সব ছোট-বড় এরকমই দেখতে। যেসব ঘাট থেকে ফেরি চলে সেখানে জেটি আছে।"

"সতীদাহ ঘাট। সতীদাহ শব্দটা চেনা-চেনা লাগছে। মানেটা কী বলুন তো?"

একজন মধ্যবয়স্ক লোক চায়ের দোকানে বেঞ্চে বসে খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে লক্ষ্য করছিল শচীকান্ত আর আবেলকে। সোনালি চুলের সাহেবই কৌতূহলের কারণ। লোকটা খবরের কাগজ থেকে মুখ বের করে বলল, "সাহেবদের আবার আমাদের কুসংস্কার গুলো দেখাতে এনেছেন নাকি?"

শচীকান্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "না। না।"

"তবে কি গঙ্গা? ছোকরার তো খুব ভক্তি দেখছি। কোন দেশের?"

"নেদারল্যান্ড।"

"ওলন্দাজ। তা, ওকে এখানে নিয়ে এসেছেন কেন? কাছেই তো কুঠিঘাট আছে। বরাহনগর বাজার দিয়ে গঙ্গার দিকে চলে যান। ওখানেই তো ওলন্দাজদের কুঠি ছিল।"

চায়ের দোকানদার চা এগিয়ে দিল শচীকান্তর দিকে। শচীকান্ত আফসোস করে উঠলেন। কুঠিঘাটের নামটা ডায়েরিতে টোকা থাকলেও, ইতিহাস মনে ছিল না। কিন্তু কুঠিঘাট যে ওলন্দাজদের ঘাট ছিল, এই তথ্যটা তো জানতেন। আজকাল সবকিছু কেমন ভুলে যাচ্ছেন।

শচীকান্ত চায়ের কাপে লম্বা লম্বা ফুঁ দিয়ে দ্রুত চা ঠান্ডা করতে থাকলেন। আবেল সেটা দেখে বলল, "আপনি সময় নিন। আর আমাদের ড্রাইভার ছেলেটা চা খাবে না? রোজ়ি এখনও আসেনি।"

আবেল ট্যাবটা বের করে আবার গঙ্গার ঘাটের দিকে এগিয়ে ছবি তুলতে শুরু করল। শচীকান্ত দেখলেন একটু দূরেই দাঁড়িয়ে প্যাকেট থেকে গুটখা খাচ্ছে দিলীপ। ব্যস্ত হয়ে ওকে ডাকলেন, "এই যে ভাই, শোনো।"

গুটখার খালি প্যাকেট রাস্তায় ফেলে দিয়ে হেলেদুলে এগিয়ে এসে দিলীপ বলল, "কী হয়েছে কাকু?"

"চা খাবে?"

"না, একটু জলদি করুন কাকু। এরপর কোথায় যেতে হবে?"

"কুঠিঘাট। বরাহনগর বাজারের কাছেই। চেনও?"

দিলীপ বিরক্ত হয়ে উঠল, "এই সব আনসান লাফরার জায়গায় কেন যাচ্ছেন কাকু?"

যে লোকটা খবরের কাগজ পড়ছিল সে প্রতিবাদ করে উঠল, "বরাহনগর বাজার, কুঠিঘাট সব আনসান জায়গা হলো? এখানকার কী চেনো হে তুমি? কতদিন গাড়ি টানছ?"

দিলীপ গজগজ করতে-করতে গাড়ির দিকে চলে গেল। তবে লোকটার রাগ যেন কমল না। শচীকান্তর দিকে তাকিয়ে বলতেই থাকল, "মশাই, সাহেবদের ঘাট দেখাতে এনেছেন। দেখান। ভালো কথা। কিন্তু ওকে বলে দিন মেয়েদের ঘাটের দিকে যেন গিয়ে ছবি-টবি না তোলে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার খেয়াল আছে। বলে দিচ্ছি।"

এরমধ্যেই মিতালি ফিরে এল। কপালে একটু থ্যাবড়ানো সিঁদুরের দাগ। হাতের মুঠোয় একটা হলুদ গাঁদা ফুল আর কয়েকটা নকুলদানা। খুশি-খুশি গলায় বলে উঠল, "তোমাদের সঙ্গে এসে ভালোই হল। সকাল সকাল একটু পুণ্য হল। উপোস ছিল। পুজো দিয়ে দিলাম। নাও পুণ্যর ভাগ নাও।"

আবেলের হাতে কয়েকটা নকুলদানা দিয়ে মাথায় ফুল ঠেকিয়ে নিজের ব্যাগে রাখতে-রাখতে বলল, "আমিও চা বিস্কুট খাব।"

শচীকান্ত তাড়াতাড়ি চা খাওয়ার পর্বটা শেষ করিয়ে দিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

"এরপর আমরা কোথায় যাচ্ছি শচীবাবু?"

শচীকান্ত উত্তর দেওয়ার আগেই আবেলের ট্যাবে হোয়াটস অ্যাপ ভিডিয়ো কলে ভেসে উঠল ঐশীর মুখ।

"হাই!"

"হাই। উফ কখন থেকে তোমাকে ট্রাই করছি, কিছুতেই কানেক্ট করতে পারছি না।" ঐশী ঝলমলে মুখে বলে উঠল।

"তাই? বোধহয় তাহলে নেটওয়ার্কের কোনও সমস্যা ছিল। যাই হোক, অনেক ধন্যবাদ বাপুজিকে। উনি এত সুন্দর সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, ড্যাডি সকালেই বলেছিল খোঁজ নিতে। তা, তুমি কোথায় এখন?"

"এই তো একটা ঘাট দেখলাম। কী সুন্দর গঙ্গা! এখন আরেকটা ঘাট দেখতে যাচ্ছি।"

"তোমার ঘোরা কখন শেষ হবে?"

"মনে হয় দুটোর মধ্যে হয়ে যাবে।"

যদিও অন্যদের কথোপকথন শোনা অন্যায়, তবুও শচীকান্ত নিজেকে দোষারোপ করলেন না। হিয়ারিং-এডের ব্যাটারিটা বদলে দেওয়ার পর কোম্পানির ছেলেটা বলেছিল, "এবার না চাইলেও এক মাইল দূরের সব কথা শুনতে পাবেন।" শচীকান্ত আবেলের কথাকে সমর্থন করে মাথা ঝাঁকালেন।

"তাহলে আজকে আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করতে পারি। তুমি হোটেলে ফিরবে তো?"

বরাহনগর বাজারের জ্যামে আটকা পড়ে দিলীপ বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, "দেখছেন কাকু কী জায়গায় গুঁতিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন। এর চেয়ে বাবুঘাট যেতে পারতেন।" কথাগুলো বলে দিলীপ দরজা খুলে নেমে আবার একটা গুটখার পাউচ খুলে মুখে ঢালল।

আবেল ঐশীকে বলল, "আমার একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। কাল রাত্রে ট্যাবটা চার্জ করা হয়নি। আমি যদি এখন ছেড়ে দিই, কিছু মনে করবে?"

"না, ঠিক আছে। হোটেলের কাছাকাছি পৌঁছে ফোন করো।"

আবেলের সঙ্গে ওদিকের মেয়েটার সব কথা মিতালিও শুনতে পাচ্ছিল। যৌনকর্মীদের মন খারাপ করতে নেই। তবু যেন মনটা একটু খারাপই হয়ে গেল। হঠাৎ করে বাবার একটা প্রায়শই বলা কথা মনে পড়তে থাকল। মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তিন গুণ। স্বত্ব, রজঃ ও তম। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "এই জড় জগৎ সত্ত্ব, রজ এবং তম, প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।"

তম অর্থাৎ অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার।

মিতালি আনমনা গলায় আবেলকে বলল, "কাল রাতে তুমি আমার বাড়ির কথা জানতে চাইছিলে না? আমার বাবা একজন পুরোহিত। খুব গরিব পুরোহিত।"

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে ত্রয়োদশ কিস্তি

বাসে করে ডোমেস্টিক টার্মিনাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালে এসে কাস্টমস ইত্যাদি নিরুপদ্রবে করে অ্যামস্টারডাম যাওয়ার জাম্বো ফ্লাইটে বোর্ড করে ফেলেছি। তবে এবার আর জানলার ধারে সিট পাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি প্রিয়তমা। কিন্তু সিটে বসে দূরের খোলা জানলাগুলো দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, আকাশের রং ফিকে হচ্ছে। একটু পরেই ভোরের আলো ফুটবে আর ফ্লাইট টেক-অফ করবে। ফ্লাইটটা আমস্টারডাম যাওয়ার পথে দুবাইয়ে একটা স্টপওভার আছে। আপাতত দুবাই পৌঁছতে ঘন্টা চারেক সময় লাগবে। অনেকটা সময়। জানোই তো, ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে খাওয়াদাওয়া আরাম সবকিছুরই প্রাচুর্য। তাই বলতে পারি, এবার তোমার জন্য সূত্রটা খুব আরাম করেই লিখছি।

এই আরামেই মনে হচ্ছে, আচ্ছা টেসেল আইল্যান্ডে সমুদ্রের ধারে নিভৃত সেই জায়গাটায় তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে গল্পটা বলতে-বলতে আরামে যদি একটা সময়ে ঘুমিয়ে পড়ি, লাইট হাউসের আলোটা জ্বলে ওঠে, দ্বীপ থেকে শেষ জাহাজটা দিনের শেষে চলে যাওয়ার আগে ভোঁ বাজিয়ে ওঠে, তখন আকাশের তারাদের নিয়ে তুমি এই গল্পটা শেষ পর্যন্ত শুনবে তো? আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই শুনবে। এই গল্পেই তো তোমার আমার সম্পর্কের পরিণতি আছে। আর টেসেল আইল্যান্ডে রাতের তুলনায় এখন দিনটা তো অনেক লম্বা, তাই না প্রিয়তমা? অত তাড়াতাড়ি সূর্যাস্ত হবেই না। আমি ঢের সময় পাব তোমাকে সূত্র ধরে সবটুকু শোনাতে।

যাকগে! আপাতত সূত্রগুলো নিয়ে যেমন এগোচ্ছিলাম, সেরকমই এগোই। ট্যাবটা যখন এয়ারপোর্টের মোবাইল চার্জিং স্টেশনে পুরো চার্জ করে নিয়েছি, তখন বড় করেই লিখি।

মার্কাস আর এমিলি ঠিক করেছিল ওলন্দাজ গায়ানাতে থেকেই তাদের প্রেমের পরিণতি খুঁজবে। পরিত্যক্ত জেটিতে এমিলির ওষ্ঠের উষ্ণ চুম্বন নিয়েই কিন্তু মার্কাস সেদিন সব ভুলে যায়নি। মার্কাস এমিলির কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করেছিল। কী সেই প্রতিজ্ঞা? মার্কাসের বাবা মা, বেঞ্জামিন আর সোফিয়া ভ্যান ডার বার্গ যে কাজটা করতেন, অর্থাৎ আফ্রিকার ক্রীতদাস মানুষগুলোর প্রতি মানবিক ব্যবহার, কল্যাণ এবং উন্নতির চেষ্টা করার যে কাজটা তাঁরা করতে শুরু করেছিলেন, ভারতবর্ষ থেকে আসা নতুন মানুষগুলোর জন্য সেই কাজটাই সে প্রথম দিন থেকে করবে। এবং কোনও কুলি মহিলা যাতে হেনড্রিকের লালসার শিকার না হয় সেটা দেখবে।

সেদিন এমিলিকে বিদায় দিয়ে মার্কাস আবার ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এল পারামারিবো বন্দরে। সদ্য আমদানি করা ভারতীয় কুলিদের বিলিবণ্টনের ব্যবস্থা তখনও চলছে। তোমাকে এখানে বলি, আফ্রিকান ক্রীতদাসদের চারটে ভাগে ভাগ করে রাখা হত। এক, যারা মাঠে কাজ করত। দুই, যারা বাড়ির কাজকর্ম করত। তিন অপ্রাপ্তবয়স্করা আর চার বৃদ্ধ হয়ে যারা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। যদিও ভারতীয় কুলিদের মাঠে আখ চাষ করার জন্যই চুক্তি করে আনা হয়েছিল কিন্তু দয়ারামের মত দালালরা কিছু কম দক্ষতাসম্পন্ন মানুষকে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। প্ল্যানটেশনে মালিকরা তখন আলোচনা করছেন সেরকম কুলিদের কাকে কাকে বাড়ির কাজের জন্য নেওয়া যায়।

হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ নিজের জন্য সক্ষম কুলিদেরই বেছে নিয়েছিলেন। শুধু একটা ক্ষেত্রে গিয়ে একটা অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সে হল ফুলুয়া। রামাশীষের সঙ্গে এসেছে। রামাশীষকে নিলে ওকেও নিতে হয়। কিন্তু সারাদিন মেয়েটা থাকবে কোথায়? হেনড্রিক পরিবারসুদ্ধ একটা কুলিকেও বাছেননি। হেনড্রিক তাই ঠিক করলেন ফুলুয়াকে নিজের বাংলোয় রাখবেন।

কুলিরা থাকবে কোথায় এটা নিয়ে জাহাজ আসার আগেই মাসখানেক ধরে বেশ কয়েক দফা আলোচনা হয়ে গিয়েছে। মোটামুটি ঠিক হয়েছে, আফ্রিকার ক্রীতদাসরা যারা নিজেদের বস্তিতে থাকার আস্তানাগুলো ছেড়ে চলে গিয়েছে, সেখানেই ভারতীয় কুলিদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে। সেগুলো মোটেই থাকার পক্ষে ভালো জায়গা নয়। দীর্ঘ অব্যবহারে আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। সেই দিক বিচার করলে ভ্যান ডার বার্গ বাংলো অনেক স্বচ্ছন্দে থাকার জায়গা।

মার্কাস একটু আগেই এমিলির কাছে শুনে এসেছে হেনড্রিকের যৌন পছন্দের অন্ধকার দিক। ভিতরে ভিতরে সাবধান হয়ে উঠল মার্কাস। যে প্রতিজ্ঞাটা একটু আগে নিয়েছে তার প্রথম কাজই হচ্ছে, এটাকে আটকানো।

কিন্তু কোথায় সেই মেয়েটা? অত কুলির মধ্যে মার্কাস পাগলের মধ্যে খুঁজতে শুরু করল ফুলুয়াকে। ফুলুয়ার সঙ্গে মার্কাসের প্রথম দর্শন ঠাকুরমা আমাকে যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই বলি।

'ভারতবর্ষ যেহেতু ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল আর মার্কাস অনেকদিন লন্ডনে ছিল, দেশটায় না গিয়েও ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেকটাই ধারণা মার্কাসের ছিল। মার্কাস জানত ভারতবর্ষ হচ্ছে অনেক দেবদেবীর দেশ। কুলি আমদানির রেকর্ডের পাতায় মেয়েটার একটা নাম লেখা আছে। আমার মন বলে সেই নাম ফুলমতী। সেই ফুলমতীকে খুঁজে পেয়ে মার্কাস একেবারে পাথর হয়ে গেল। রোগা হাড় জির্‌জিরে একটা মেয়ে। গায়ে ময়লা একটা শাড়ি। মুখের অর্ধেকটা ঢেকে রয়েছে মাথার ঘোমটা। তার ফাঁক দিয়েই মুখটা যতটুকু দেখা যাচ্ছে, তার একদিক ভারি মিষ্টি, কোমল। আরেকদিকে পাথরের মত শক্ত। তার দীঘল চোখে অনেক স্বপ্ন অথচ মুখের পেশীগুলো একেবারে অভিব্যক্তিহীন। সে ঠিক যেন এক হিন্দু দেবী অথবা স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক পরী।'

মার্কাস তুখোড় বুদ্ধিতে হেনড্রিককে বোঝাতে শুরু করল, ফুলমতীকে একখন বাড়িতে নিয়ে গেলে নানা অসুবিধে হবে। প্রথমত ওরা আমাদের ভাষা জানে না। দ্বিতীয়ত, নাবালিকা। তৃতীয়ত, ভারতীয়রা খুব রক্ষণশীল। ফুলমতী বাড়িতে থাকলে কুলিদের মধ্যে যদি কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তাহলে হেনড্রিকের এই এত কষ্টসাধ্য উদ্যোগের কোনও দাম থাকবে না। অন্য প্ল্যানটেশন মালিকরা দুষবে। আগামীদিনে ভারতবর্ষ থেকে আরও যে কুলি ভর্তি জাহাজ আসবে তাতে হেনড্রিকের আর কোনও কর্তৃত্ব থকবে না।

বয়স অল্প হলেও মার্কাস যুক্তিতে চিরকাল প্রখর। হেনড্রিক নিমরাজি হতে একরকম বাধ্য হলেন। রামাশীষের সঙ্গে ফুলমতী ভ্যান ডার বার্গ কুলি বস্তিতেই থাকতে আরম্ভ করল। কিন্তু মার্কাসের চিন্তা দূর হল না। সব পুরুষ কুলিরা যখন চাষের কাজে বেরিয়ে যায়, ফুলমতী একা একাই থাকে। মার্কাস এই সময়গুলোয় যেতে আরম্ভ করল ফুলমতীর কাছে। একটু একটু করে অত্যন্ত ধীর লয়ে আমাদের ওলন্দাজ ভাষা আর অল্প অল্প লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করতে থাকল।

এত কাজের চাপেও মার্কাসের মন থেকে থেকেই ছটফট করে ওঠে এমিলির জন্য। বুঝলে প্রিয়তমা, এই সময়ে অদ্ভুত এক সমস্যা হল।

আলডার্ট বুগার্ড ছেলের নাম রেখেছেন জুলিয়েন। আর এই জুলিয়েনকে নিয়েই যাবতীয় ঘটনা নতুন বাঁক নিল। যদি তুমি এই মুহূর্তে মনে করছ, এমিলি যখন আলডার্ট বুগার্ডের ঔরসজাত মেয়ে নয় এবং বৃদ্ধ বয়সে আলডার্ট বুগার্ড জুলিয়েনের বাবা হওয়ার পর এমিলির অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছিলেন তখন এমিলির সঙ্গে মার্কাসের প্রেমের সম্পর্কে আলডার্ট বুগার্ডের কোনও আপত্তি থাকবে না, তাহলে ভুল করছ।

যদি তুমি এই মুহূর্তে মনে করছ, হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ-এর ভাইপোর প্রতি আসল ভালোবাসাটাও কতটা খাঁটি আমরা জেনে ফেলেছি। সুতরাং এহেন দু'জন যুবক-যুবতী যদি নিজেদের সংসার পাতবেন ঠিক করে ফেলেছেন, তাহলে মনে করাই যেতে পারে পারিবারিক আপত্তি আর বিশেষ থাকবে না, তাহলেও তুমি ভুল করছ।

তুমি ভুল করছো কারণ সমাজের কাছে আলডার্ট আর হেনড্রিক দু'জনেই যে মুখোশ পরে ছিলেন।

এমিলির জন্মরহস্য যদি জানাজানি হত আলডার্ট বুগার্ডের পিতৃত্ব নিয়েই হয়তো হাসাহাসি হত। হয়ত গিলবার্ট ডি জং চুরুটে টান দিয়ে মার্কাসের কাঁধে চাপড় দিতেদিতে বলতেন, "বুড়োটা বাপ হয়েছে। আমার শুধু বাচ্চাটাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। তার গায়ের রং কেমন? তোমার আমার মতো নাকি ওই নিগারগুলোর মত?"

আর হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ যদি সম্পর্কটা মেনে নিতেন, তাহলে বুগার্ডের খেতে ওঁর দাদা বউদি বেঞ্জামিন আর সোফি ভ্যান ডার বার্গ লাশ পাওয়ার পিছনে কতটা বুগার্ডদের হাত আছে আর কতটা কালো আফ্রিকানদের সাদা চামড়ার ওলন্দাজদের প্রতি রোষ, সেই জটিল সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কটা অন্য প্ল্যানটার্সরা নতুন করে কষতে আরম্ভ করলে হেনড্রিকের মুখোশটাই একদিন পারামারিবো ক্লাবে খসে পড়ত।

সত্যিটা হল, মুখোশ পরে নিতে হয়েছিল অনেককেই। মার্কাসও তার মধ্যে ব্যতিক্রম নয়।

কাকার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে মার্কাসের সময় লেগেছিল। শুধু আবেগের বশে প্রেমিকার কথা বিশ্বাস করা নয়, প্রেমিকার ওষ্ঠর উষ্ণ চুম্বনের আশ্লেষকে সরিয়ে রেখে মার্কাস সত্য উদ্ঘাটন করতে চেয়েছিল। এবং ফুলমতীর কাছে যাওয়া ছাড়াও, অত্যন্ত গোপনে মেরুন কলোনিতে দিনের পর দিন গিয়ে সেই মর্মান্তিক সত্যিটা জেনে অনুগত ভাইপোর মুখোশ আরও চেপে বসিয়ে নিয়েছিল নিজের মুখে।

মুখোশ পরে নিয়েছিল এমিলিও। সৎমা লিজ়া বয়সে অল্পই কিছু বড় ছিলেন। আলডার্টের সঙ্গে বিয়ের পর থেকেই লিজ়া এমিলির প্রতি আলডার্টের অপত্য স্নেহ দেখে সংসারের আপন নিয়মে ঈর্ষাকাতর ছিলেন। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেননি একটি মাত্র পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়ে নিজের মর্যাদা আর গুরুত্বকে অনেক বাড়িয়ে তুলতে পারবেন। ছোট্ট জুলিয়েন তখন আলডার্ট বুগার্ডের জীবনের আরেক নাম। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে এমিলি তখন প্রত্যেকদিন একটু একটু করে জুলিয়েনের পরিচারিকা হয়ে উঠছে। জুলিয়েনের পরিচর্যার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন কোফির স্ত্রী আলমা। কিন্তু লিজ়ার এক অদ্ভুত ছুঁৎমার্গ ছিল। কালো মানুষের হাতে ছেলের পরিচর্যা করাবেন না। এই সমস্যার উত্তর ছিল এমিলি। কিন্তু যে মেয়ে এতদিন বাবার আদুরে মেয়ে হয়ে বড় হয়েছে সে হঠাৎ একটা বাচ্চার পরিচারিকা হওয়ার জন্য পটীয়সী হয়ে উঠবে কী করে? তবু স মায়ের অজস্র গালমন্দ খেয়ে, লাঞ্ছনা সহ্য করে আপ্রাণ চেষ্টা করত এমিলি। আর বুগার্ড বাংলোর বাইরে? সেই মুখোশ।

দিনের পর দিন এরকম মুখোশের মিছিলে ঘটনার আবর্ত দেখতে দেখতে ঈশ্বরও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে তিনিও একদিন দিয়ে বসলেন ঘোড়ার আড়াই চাল। এবার সেটা তোমাকে শোনাই প্রিয়তমা।

॥ ১৩ ॥

জায়গাটা ভ্যান ডার বার্গ বা বুগার্ডের খেত থেকে অনেক দূরে।

এমিলি আর মার্কাসের প্রেমটা যত ঘন হচ্ছে ওরা তত দূরে সরে যাচ্ছে নিজেদের খামার থেকে। দেখা হওয়াটা সহজ নয়, তাই নিয়মিতও নয়। সুযোগ এবং সময়ের অপেক্ষা করতে হয়। এমিলি এবং মার্কাস চেষ্টা করে নিজেদের মেলামেশা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে। বিষয়টা হয়তো লোকচক্ষুর আড়ালেই ছিল। কিন্তু হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ অত্যন্ত গোপনে এটা নজরে রেখেছিলেন।

সেরকম সময়ই একদিন। জুলিয়েনকে ঘুম পাড়িয়ে লিজ়ার কাছ থেকে ফুসরত পেয়ে বাড়ির বাইরে এসে মুক্তির শ্বাস নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে নিজেদের খেতের প্রান্তে চলে এসে ঈশ্বরের কাছে প্রাণপণে মার্কাসকে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রার্থনা করতে লাগল এমিলি। ঈশ্বর খামখেয়ালী। কোনদিন প্রার্থনা তাঁর কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। আবার একেকদিন সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করে দেন। সেদিন এমিলি নিজের প্রিয় দূরবীন দিয়ে চরাচরে খুঁজে খুঁজতে ঠিক পেয়ে যায় ঘোড়ার পিঠে বসা মার্কাসকে। ঘোড়ার লাগামটা সেই মুহূর্তে আলগা হয়ে যায়। ছুটতে আরম্ভ করে ঘোড়াটা। আর তাই দেখে ওর দিকে ছুটে আরম্ভ করে মার্কাসের ঘোড়াটাও। নিঃশব্দে ছুটতে আরম্ভ করে আরেকটা মানুষও। কোফি।

আজও তাই হলো। ঈশ্বর আজ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে হেস্তনেস্ত করবেন ঠিক করেছেন। অতএব এমিলির দূরবীনে ধরা দিল ঘোড়ার পিঠে মার্কাস। এমিলি ঘোড়া ছোটাল। কিন্তু একটু দূরে গিয়েই খেয়াল করল কোফি পাশে নেই। ঘোড়াটাকে থামিয়ে পিছু মুড়ে দেখল বেশ খানিকটা দূরে একটা গাছের তলায় বসে পড়েছে কোফি। ঘোড়াটাকে

থামতে দেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর দৌড়ে আসতে লাগল। এমিলি দাঁড়িয়েই থাকল। শেষপর্যন্ত কোফি যখন এসে পৌঁছল ততক্ষণে ও বড় খাবি খেতে-খেতে রীতিমতো হাঁপাচ্ছে।

এমিলি উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে তোমার কোফি? শরীর খারাপ?"

কোফি খাবি খেতে-খেতে বলল, "না মালকিন। বয়স আমাকে থাবা মারছে। চলুন। মালিকের ঘোড়া এগিয়ে আসছে।"

"আঃ! কোফি। কতবার তোমাকে বলেছি, আমাকে আর মালকিন বলবে না। এখন তোমরা স্বাধীন। শুধু আমার বাবার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আছ।"

কোফি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "স্বাধীনতা আমি কি বুঝি না মালকিন। একটা দেশে জন্মেছিলাম আমি। লোকে বলে সে দেশটার নাম আফ্রিকা। সে দেশটা কেমন আমার মনে নেই মালকিন। শুধু মনে আছে খুব ছোট ছিলাম তখন আমি। আমার বন্ধুদের সঙ্গে জঙ্গলে খেলছিলাম। হঠাৎ একদল জোয়ান লোক কোথা থেকে এসে আমাকে মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে দিল। যখন জ্ঞান ফিরল তখন বুঝতে পারলাম আমার চারদিকে পাটাতন। নড়তে-চড়তে পারছি না। দিনের পর দিন অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে একদিন আমাদের ডাঙায় নামিয়ে পায়ে লোহার বেড়ি পরানো হলো। সেদিন থেকে আমি..."

এমিলি হাত তুলে কোফিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "চুপ কর কোফি। তুমি জানো এই গল্প আমি সহ্য করতে পারি না। তুমি আর দাস নও।"

কোফি ম্লান হাসল, "আমার ছেলেমেয়েরা, যারা মেরুন কলোনিতে থাকে, গানবাজনা করে, রাতভোর ফুর্তি করে, ওরা আর দাস নয়। ওরা স্বাধীন।"

কোফি কোনদিন এভাবে কথা বলে না। এমিলি একটু চিন্তিত হয়ে বলল, "কী হয়েছে তোমার কোফি, সত্যি করে বলো তো?"

কোফি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "আমি কয়েকদিন ধরে খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখছি।"

"খারাপ স্বপ্ন? কী খারাপ স্বপ্ন?"

"সেই আমার ছেলেবেলা। বন্ধুদের সঙ্গে জঙ্গলে খেলছি।"

এমিলি হেসে উঠল, "ওমা, এটাকে খারাপ স্বপ্ন বলছ কেন?"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কোফি বলল, "সবাই বলে, ছেলেবেলার স্বপ্ন দেখলে বেশিদিন বাঁচে না। আমিও আর বেশিদিন বাঁচব না মালকিন। একটাই শুধু ইচ্ছে যে জঙ্গলটা থেকে আমাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেই জঙ্গলটায় গিয়ে যদি মরতে পারতাম। কিন্তু জানি না তো আমার সেই দেশটা কোথায়, কতদূর, কীভাবে যাওয়া যায় সেখানে।"

কোফির গলায় এরকম কথা কখনও শোনেনি এমিলি। মনটা ভারী হয়ে গেল। বলল, "আমি মার্কাসকে জিজ্ঞেস করব। ওর কাছে অনেক খবর থাকে।"

"চলুন মালকিন। উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।"

এমিলি পৌঁছে গেল মার্কাসের কাছে। তারপর পাশাপাশি দুটো সাদা ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে এমিলি আর মার্কাস। ঘোড়া দুটো চলছে দুলকি চালে। খুব সুন্দর একটা গোলাপী গাউন পরা এমিলিকে আজ খুব মনমরা দেখছে মার্কাস। মার্কাস সহানুভূতির গলায় জিগ্যেস করল, "তোমার রূপসী মুখটা আজও এত দুঃখী দেখাচ্ছে কেন?"

"আমি আর নিতে পারছি না মার্কাস। তুমি কিছু একটা ব্যবস্থা করো।"

"বুঝতে পারছি। আমাদের হয়তো এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু বাবা মায়ের যে কাজটা করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি সেটাকে গুছিয়ে নিতে না পারলে আমার শান্তি নেই। ভারতীয় কুলিদের আরও জাহাজ আসছে কলকাতা বন্দর থেকে। কিন্তু তাদের থাকার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এখনও করা নেই। কিন্তু আমাকে সময় দিতে হবে। কাজটা আমি শুরু করে দিয়েছি। তুমি কিচ্ছু ভেবো না। শিগগিরি আমি একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।"

মার্কাসের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে মনটা ক্রমশ ভাল হতে শুরু করল এমিলির। কথায়-কথায় জানতে চাইল, "আচ্ছা, ওই কুলি মেয়েটা কেমন আছে?"

"কে ফুলমতী?" মার্কাস এমিলির মন আরও ভালো করে দিতে বলল, "দেখবে ওকে? ওদের ভাষায় দারুণ গান গাইতে পারে। গানের কথার মানে বুঝতে পারবে না কিন্তু সুর শুনলে তোমার মন ভালো হয়ে যাবে। যাবে ওর গান শুনতে?"

"কিন্তু ও তো থাকে তোমাদের প্ল্যানটেশনে। ওখানে আমি কীভাবে যাব? জানাজানি হয়ে গেলে?"

"ও এইসময়টা একাই থাকে। পুরুষ কুলিগুলো সবাই তো এখন খেতে আছে। দূরে। কাকাও আজ পারামারিবো গিয়েছে। সন্ধের আগে ফিরবে না। চলো..."

খানিকটা জোর করেই মার্কাস এমিলিকে নিজেদের প্ল্যানটেশনের দিকে নিয়ে গেল। তার একটা উদ্দেশ্য যদি ফুলমতীর গান শুনিয়ে মন ভালো করানো হয়, আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় কুলিদের কল্যাণের জন্য ও যে কাজটা সত্যিই কতটা করছে সেটা দেখানো। ইতিমধ্যেই বুগার্ডের কুলিদের থাকার ব্যবস্থার চেয়ে ভ্যান ডার বার্গ-দের ব্যবস্থা অনেক ভালো করে ফেলেছে।

একটু দুরুদুরু বুকেই মার্কাসের সঙ্গে ভ্যান ডার বার্গ কুলিদের বস্তিতে এল এমিলি। ঘোড়া দুটো কোফির জিম্মায় রেখে বস্তির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দেখল সব ঘরের দরজা বন্ধ। রামাশীষের ঘরের দরজাও বন্ধ পেল মার্কাস। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল, "ফুলমতী।"

ভিতরে থেকে কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না। দরজাটাও খুলল না। মার্কাস আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করে কোনও উত্তর না পেয়ে বলল, "ওরা একটা ছোট মন্দির করেছে এখানে। হয়তো ওখানে আছে। খুব পুজো করতে ভালোবাসে মেয়েটা। ওদের পুজোর গানকে কী বলে, শব্দটা আমি শিখেছি। ভজন। বলছিল কিছুদিন পরে ওদের একটা বড় পুজো আছে। ছট পুজো। দাঁড়াও ওখানে যাওয়ার আগে তোমাকে দেখাই নতুন যে কুলিরা আসছে তাদের থাকার কীরকম ব্যবস্থা করেছি আমি। জানো বাবার একটা ডায়েরি পেয়েছি। বাবা নিজের হাতে এঁকে আফ্রিকানদের যেমন থাকার ব্যবস্থা ভেবেছিলেন, যেরকম কলোনি ভেবেছিলেন, ঠিক সেরকমই আমি করেছি।"

পুরনো বস্তিটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে নতুন ভারতীয় কুলিদের বস্তি। মার্কাসের স্বপ্নের কলোনি। সেই কলোনি অপেক্ষায় আছে কলকাতা থেকে পরের জাহাজ আসার। সেই কলোনির একটা সদ্য নির্মিত ঘরে ঢুকে মার্কাস এমিলিকে ডাকল, "ভিতরে এসে দ্যাখো, আমরা ঘরগুলো কেমন তৈরি করেছি।"

মাটির থেকে খানিকটা উঁচুতে মাচা করে একচালার সার সার ঘর। সেরকমই একটা নিঝুম ঘরে ঢুকে এমিলি দেখল ভিতরে কোনও আসবাব নেই। বুগার্ড বাংলোর সবচেয়ে ছোট ঘরটার বৈভবের সঙ্গেও তুলনা করা যায় না এই ঘরটা। তবু কেন যেন এমিলির ভালো লেগে গেল ঘরটা। ঠান্ডা অথচ অদ্ভুত একটা উষ্ণতা ছড়িয়ে আছে ঘরটার মধ্যে। বলল, "ইস! আমাদেরও যদি এরকম একটা নিজেদের ঘর থাকত। শুধু তুমি আর আমি থাকতাম মার্কাস।"

মার্কাস পিছন থেকে এমিলির কোমরটা জড়িয়ে ধরে গ্রীবায় নাক ডুবিয়ে ফিসফিস করে বলল, "হবে। আমাদেরও খুব সুন্দর ছবির মত একটা বাংলো হবে।"

দুই যুবক যুবতীর নিশ্বাস গরম হয়ে ঘন হতে থাকল। তার অবধারিত পরিণতিতে মার্কাস মাটিতে এমিলিকে শুইয়ে দিয়ে ওর শরীরটাকে আদর করতে করতে পাগল হয়ে উঠল। নিজের হাতে টেনে খুলে ফেলল এমিলির গোলাপি গাউন। দুটো শরীর মিশে গিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠে তৃষ্ণা মিটিয়ে নিজেদের জড়িয়ে শুয়ে চোখে অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করল এমিলি আর মার্কাস।

থামতে দেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর দৌড়ে আসতে লাগল। এমিলি দাঁড়িয়েই থাকল। শেষপর্যন্ত কোফি যখন এসে পৌঁছল ততক্ষণে ও বড় খাবি খেতে-খেতে রীতিমতো হাঁপাচ্ছে।

এমিলি উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে তোমার কোফি? শরীর খারাপ?"

কোফি খাবি খেতে-খেতে বলল, "না মালকিন। বয়স আমাকে থাবা মারছে। চলুন। মালিকের ঘোড়া এগিয়ে আসছে।"

"আঃ! কোফি। কতবার তোমাকে বলেছি, আমাকে আর মালকিন বলবে না। এখন তোমরা স্বাধীন। শুধু আমার বাবার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আছ।"

কোফি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "স্বাধীনতা আমি কি বুঝি না মালকিন। একটা দেশে জন্মেছিলাম আমি। লোকে বলে সে দেশটার নাম আফ্রিকা। সে দেশটা কেমন আমার মনে নেই মালকিন। শুধু মনে আছে খুব ছোট ছিলাম তখন আমি। আমার বন্ধুদের সঙ্গে জঙ্গলে খেলছিলাম। হঠাৎ একদল জোয়ান লোক কোথা থেকে এসে আমাকে মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে দিল। যখন জ্ঞান ফিরল তখন বুঝতে পারলাম আমার চারদিকে পাটাতন। নড়তে-চড়তে পারছি না। দিনের পর দিন অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে একদিন আমাদের ডাঙায় নামিয়ে পায়ে লোহার বেড়ি পরানো হলো। সেদিন থেকে আমি..."

এমিলি হাত তুলে কোফিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "চুপ কর কোফি। তুমি জানো এই গল্প আমি সহ্য করতে পারি না। তুমি আর দাস নও।"

কোফি ম্লান হাসল, "আমার ছেলেমেয়েরা, যারা মেরুন কলোনিতে থাকে, গানবাজনা করে, রাতভোর ফুর্তি করে, ওরা আর দাস নয়। ওরা স্বাধীন।"

কোফি কোনদিন এভাবে কথা বলে না। এমিলি একটু চিন্তিত হয়ে বলল, "কী হয়েছে তোমার কোফি, সত্যি করে বলো তো?"

কোফি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "আমি কয়েকদিন ধরে খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখছি।"

"খারাপ স্বপ্ন? কী খারাপ স্বপ্ন?"

"সেই আমার ছেলেবেলা। বন্ধুদের সঙ্গে জঙ্গলে খেলছি।"

এমিলি হেসে উঠল, "ওমা, এটাকে খারাপ স্বপ্ন বলছ কেন?"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কোফি বলল, "সবাই বলে, ছেলেবেলার স্বপ্ন দেখলে বেশিদিন বাঁচে না। আমিও আর বেশিদিন বাঁচব না মালকিন। একটাই শুধু ইচ্ছে যে জঙ্গলটা থেকে আমাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেই জঙ্গলটায় গিয়ে যদি মরতে পারতাম। কিন্তু জানি না তো আমার সেই দেশটা কোথায়, কতদূর, কীভাবে যাওয়া যায় সেখানে।"

কোফির গলায় এরকম কথা কখনও শোনেনি এমিলি। মনটা ভারী হয়ে গেল। বলল, "আমি মার্কাসকে জিজ্ঞেস করব। ওর কাছে অনেক খবর থাকে।"

"চলুন মালকিন। উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।"

এমিলি পৌঁছে গেল মার্কাসের কাছে। তারপর পাশাপাশি দুটো সাদা ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে এমিলি আর মার্কাস। ঘোড়া দুটো চলছে দুলকি চালে। খুব সুন্দর একটা গোলাপী গাউন পরা এমিলিকে আজ খুব মনমরা দেখছে মার্কাস। মার্কাস সহানুভূতির গলায় জিগ্যেস করল, "তোমার রূপসী মুখটা আজও এত দুঃখী দেখাচ্ছে কেন?"

"আমি আর নিতে পারছি না মার্কাস। তুমি কিছু একটা ব্যবস্থা করো।"

"বুঝতে পারছি। আমাদের হয়তো এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু বাবা মায়ের যে কাজটা করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি সেটাকে গুছিয়ে নিতে না পারলে আমার শান্তি নেই। ভারতীয় কুলিদের আরও জাহাজ আসছে কলকাতা বন্দর থেকে। কিন্তু তাদের থাকার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এখনও করা নেই। কিন্তু আমাকে সময় দিতে হবে। কাজটা আমি শুরু করে দিয়েছি। তুমি কিচ্ছু ভেবো না। শিগগিরি আমি একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।"

মার্কাসের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে মনটা ক্রমশ ভাল হতে শুরু করল এমিলির। কথায়-কথায় জানতে চাইল, "আচ্ছা, ওই কুলি মেয়েটা কেমন আছে?"

"কে ফুলমতী?" মার্কাস এমিলির মন আরও ভালো করে দিতে বলল, "দেখবে ওকে? ওদের ভাষায় দারুণ গান গাইতে পারে। গানের কথার মানে বুঝতে পারবে না কিন্তু সুর শুনলে তোমার মন ভালো হয়ে যাবে। যাবে ওর গান শুনতে?"

"কিন্তু ও তো থাকে তোমাদের প্ল্যানটেশনে। ওখানে আমি কীভাবে যাব? জানাজানি হয়ে গেলে?"

"ও এইসময়টা একাই থাকে। পুরুষ কুলিগুলো সবাই তো এখন খেতে আছে। দূরে। কাকাও আজ পারামারিবো গিয়েছে। সন্ধের আগে ফিরবে না। চলো..."

খানিকটা জোর করেই মার্কাস এমিলিকে নিজেদের প্ল্যানটেশনের দিকে নিয়ে গেল। তার একটা উদ্দেশ্য যদি ফুলমতীর গান শুনিয়ে মন ভালো করানো হয়, আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় কুলিদের কল্যাণের জন্য ও যে কাজটা সত্যিই কতটা করছে সেটা দেখানো। ইতিমধ্যেই বুগার্ডের কুলিদের থাকার ব্যবস্থার চেয়ে ভ্যান ডার বার্গ-দের ব্যবস্থা অনেক ভালো করে ফেলেছে।

একটু দুরুদুরু বুকেই মার্কাসের সঙ্গে ভ্যান ডার বার্গ কুলিদের বস্তিতে এল এমিলি। ঘোড়া দুটো কোফির জিম্মায় রেখে বস্তির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দেখল সব ঘরের দরজা বন্ধ। রামাশীষের ঘরের দরজাও বন্ধ পেল মার্কাস। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল, "ফুলমতী।"

ভিতরে থেকে কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না। দরজাটাও খুলল না। মার্কাস আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করে কোনও উত্তর না পেয়ে বলল, "ওরা একটা ছোট মন্দির করেছে এখানে। হয়তো ওখানে আছে। খুব পুজো করতে ভালোবাসে মেয়েটা। ওদের পুজোর গানকে কী বলে, শব্দটা আমি শিখেছি। ভজন। বলছিল কিছুদিন পরে ওদের একটা বড় পুজো আছে। ছট পুজো। দাঁড়াও ওখানে যাওয়ার আগে তোমাকে দেখাই নতুন যে কুলিরা আসছে তাদের থাকার কীরকম ব্যবস্থা করেছি আমি। জানো বাবার একটা ডায়েরি পেয়েছি। বাবা নিজের হাতে এঁকে আফ্রিকানদের যেমন থাকার ব্যবস্থা ভেবেছিলেন, যেরকম কলোনি ভেবেছিলেন, ঠিক সেরকমই আমি করেছি।"

পুরনো বস্তিটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে নতুন ভারতীয় কুলিদের বস্তি। মার্কাসের স্বপ্নের কলোনি। সেই কলোনি অপেক্ষায় আছে কলকাতা থেকে পরের জাহাজ আসার। সেই কলোনির একটা সদ্য নির্মিত ঘরে ঢুকে মার্কাস এমিলিকে ডাকল, "ভিতরে এসে দ্যাখো, আমরা ঘরগুলো কেমন তৈরি করেছি।"

মাটির থেকে খানিকটা উঁচুতে মাচা করে একচালার সার সার ঘর। সেরকমই একটা নিঝুম ঘরে ঢুকে এমিলি দেখল ভিতরে কোনও আসবাব নেই। বুগার্ড বাংলোর সবচেয়ে ছোট ঘরটার বৈভবের সঙ্গেও তুলনা করা যায় না এই ঘরটা। তবু কেন যেন এমিলির ভালো লেগে গেল ঘরটা। ঠান্ডা অথচ অদ্ভুত একটা উষ্ণতা ছড়িয়ে আছে ঘরটার মধ্যে। বলল, "ইস! আমাদেরও যদি এরকম একটা নিজেদের ঘর থাকত। শুধু তুমি আর আমি থাকতাম মার্কাস।"

মার্কাস পিছন থেকে এমিলির কোমরটা জড়িয়ে ধরে গ্রীবায় নাক ডুবিয়ে ফিসফিস করে বলল, "হবে। আমাদেরও খুব সুন্দর ছবির মত একটা বাংলো হবে।"

দুই যুবক যুবতীর নিশ্বাস গরম হয়ে ঘন হতে থাকল। তার অবধারিত পরিণতিতে মার্কাস মাটিতে এমিলিকে শুইয়ে দিয়ে ওর শরীরটাকে আদর করতে করতে পাগল হয়ে উঠল। নিজের হাতে টেনে খুলে ফেলল এমিলির গোলাপি গাউন। দুটো শরীর মিশে গিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠে তৃষ্ণা মিটিয়ে নিজেদের জড়িয়ে শুয়ে চোখে অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করল এমিলি আর মার্কাস।

এমন সময়ে বাইরে শোনা গেল দুটো গুলির আওয়াজ আর ঘোড়াদের চি চি করে তীব্র চিৎকার।

নিজের নগ্ন শরীরটার ওপর থেকে মার্কাসকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল এমিলি। কিছু মুহূর্ত লাগল ওদের নিজেদের পোশাকগুলো পরে ফেলতে। তারপর ছিটকে বেরিয়ে এসে দৌড়তে থাকল ঘোড়াগুলো যেখানে আছে সেই দিকে।

কাছাকাছি এসেই স্থাণু হয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল এমিলি। সামনেই পড়ে রয়েছে কোফির রক্তে ভেসে যাওয়া নিথর দেহ। আর একটু দূরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে ফুলমতী।

মার্কাস মাথা ঠান্ডা রেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করল। গুলির শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যাবে। কুলিরা দল বেঁধে এখুনি দৌড়ে আসবে। মেরুন কলোনি থেকেও আওয়াজ শোনা যাবে। নিগাররাও চলে আসবে। সবার আগে দরকার এমিলিকে এখান থেকে বের করে দেওয়ার। মার্কাস এমিলির কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকল, "এমিলি, এমিলি শক্ত হও। মাথা ঠান্ডা করো। তুমি এখনই এই জায়গাটা থেকে বেরিয়ে যাও। বাকি আমি সামলাচ্ছি।"

কোনরকমে জোর করে এমিলিকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে রওনা করিয়ে মার্কাস খেয়াল করল ফুলমতী একইরকম স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। ফুলমতীকে আপ্রাণ বোঝানোর চেষ্টা করে জিগ্যেস করল, "গুলিটা কে করেছে তুমি দেখেছ?"

ফুলমতী যন্ত্রের মত হাতটা একদিকে তুলল। ওইদিকে একটা খাল। তার পিছনেই জঙ্গল।

বুগার্ড বাংলোতে কাজ করা একজন খাস আফ্রিকান চাকর ভ্যান ডার বার্গ কুলি বস্তিতে গুলি খেয়ে মারা গেল। ব্যাপারটা যথেষ্ট শোরগোল ফেলে দেওয়ার মত। হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে পরিস্থিতির সামাল দিলেন। মুখে কিছু না বললেও মার্কাস বুঝতে পারছিল কাকার কাছে জবাবদিহি দেওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

তারপর এসে গেল সেই জবাবদিহি দেওয়ার সন্ধেও।

হেনড্রিক নিজের বাংলোর সোফায় পানীয় নিয়ে বসে রয়েছেন। উলটোদিকের সোফায় মার্কাস।

"তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল কাকা।"

"বলো।"

"আলডার্ট বুগার্ডের চাকরের খুন নিয়ে।"

"হুম। ব্যাপারটা থিতিয়েছে। আরও অনেক শোরগোল হতে পারত। কিন্তু আলডার্ট বুগার্ড সেটা করেনি। ব্যাপারটা আমার বেশ আশ্চর্যই লাগছে। বুগার্ডের খাস নিগার ছিল লোকটা। লোকটা কেন এসেছিল আমাদের এলাকায়?"

"আমার প্রশ্ন গুলিটা কে করেছিল?"

"সেটা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ? তুমি বলেছিলে তুমি কাছাকাছি প্ল্যানটেশনের মধ্যেই ছিলে। গুলির শব্দ শুনে তুমিই সবার আগে পৌঁছিয়ে গিয়েছিলে। আর ছিল সেই কুলি মেয়েটা।"

"ফুলমতী কিছুই বলতে পারেনি। কোনদিক থেকে গুলিটা এসেছিল সেই দিকটাই শুধু দেখিয়েছিল।"

"আমার প্রশ্ন নিগারটা বুগার্ড বাংলো ছেড়ে আমাদের কুলির কলোনিতে কেন এসেছিল আর মেয়েটাই বা নিগারটার কাছে গিয়েছিল কেন? লন্ডনে পড়াশোনা করে এসে তোমার যুক্তি তো খুব প্রখর হয়ে গিয়েছে মার্কাস। এই ঘটনায় তোমার যুক্তি কী বলছে?"

মার্কাস ছটফট করে উঠে বলল, "মেয়েটা নাবালিকা।"

"নাবালিকা! ক্যালকাটা থেকে যে রেজিস্টার এসেছে সেই রেকর্ডে লেখা আছে মেয়েটা বিধবা। সেটাই ভাবাচ্ছে। নিগাররা কি এবার ভারতীয় কুলিদের শরীরের স্বাদ পেতে চাইছে? তাহলে তো মেয়েটা ওখানে নিরাপদ নয়। তোমাকে আগেই বলেছিলাম ওকে বাড়িতে নিয়ে এসে রাখো।"

"না, বাড়িতে নয়। ও ওখানেই নিরাপদে থাকবে যদি জানা যায় গুলিটা কে করেছিল।"

পানীয়র গ্লাসে চুমুক দিয়ে ধীরেসুস্থে একটা চুরুট ধরিয়ে হেনড্রিক বললেন, "আমার স্থির বিশ্বাস মেরুন কলোনির নিগার বা ভারতীয় কুলিদের কাজ এটা। পারামারিবো ক্লাবে অনেক আলোচনা হয়েছে এই নিয়ে। তুমি সবটা জানো না। আমি সামলেছি। বুগার্ড পর্যন্ত মেনে নিয়েছে কুলিদেরই কাজ এটা।"

মার্কাস প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকাল, "হতে পারে না। ওদের কারওর কাছে বন্দুক নেই।"

"তুমি এটা জান কীভাবে? চোরাই বন্দুক থাকতে পারে।"

মার্কাস রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়ল, "চোরাই, চোরাই। ছোটবেলা থেকে সেই এক কথা শুনে আসছি। বাবা আর মাকে মারল কে? নিগাররা। কী দিয়ে? বুগার্ডদের চোরাই ছুরি দিয়ে। আমি তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি কাকা, তুমি আমার কাছে অনেক কিছু লুকিয়েছ।"

হেনড্রিক শিরদাঁড়া সোজা করে উঠলেন। লম্বা চুমুকে পানীয়টা শেষ করে ঠোঁটের দুপাশটা বুড়ো আঙুল দিয়ে মুছে বললেন, "এই প্রশ্ন করার অধিকার পাওয়ার আগে তুমি আমাকে বলো, ইদানীংকালে তুমি আমার কাছ থেকে ঠিক কী কী গোপন রাখছ?"

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে চতুর্দশ কিস্তি

আরামের সঙ্গে স্মৃতিমেদুর হয়ে যাওয়ার কি কোনও সম্পর্ক আছে প্রিয়তমা? এক সপ্তাহ পর কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট করে জাম্বো ফ্লাইটের সিটে গা'টা এলিয়ে মনটা কেমন স্মৃতিমেদুর হয়ে যাচ্ছে। তোমার কাছে কিচ্ছু গোপন করব না। এই মুহূর্তে আমার রোজ়ির কথা খুব মনে পড়ছে। আজকে ওর ব্রেকফাস্ট হয়েছে কি?

রোজ়ির সঙ্গে একটা কথোপকথন খুব মনে পড়ছে। এটা বোধহয় এই গল্পের কোনও সূত্র নয়, গার্বেজ কোডিং। কিন্তু কথোপকথনটা তোমাকে বলতে খুব ইচ্ছে করছে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে তিনজনে কুটিঘাট বলে একটা ঘাটের দিকে এগোচ্ছি। একটা সময়ে শচীবাবু একটা দোকানে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলেন। আমি আর রোজ়ি ওঁর ফিরে আসার অপেক্ষা করছি। এমনসময় রোজ়ি একটা প্রশ্ন করল, "তোমাদের দেশটা আমদের দেশের চেয়ে অনেক সুন্দর, তাই না?"

"তা কেন মনে হচ্ছে তোমার? সবার কাছে তার দেশটাই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশ।"

"তোমাদের দেশে এরকম গঙ্গার মতো নদী আছে?"

"অ্যামস্টেলকে বলতে পারো। আমদের দেশে বেশিরভাগই নদী, ক্যানাল।"

"আর..."

"আর কি শুনবে বলো? পুরনো দিনের চার্চ, বড় বড় প্রাসাদ, প্রচুর ফুল, অনেক মিউজ়িয়ম। রিকস মিউজ়িয়ম, ভ্যান গঘ মিউজ়িয়ম। মিউজ়িয়মের কাছে ড্যাম স্কোয়ার।"

"আর রেড লাইট এরিয়া?"

"রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট," একটু চুপ করে থেকে বললাম, "আছে। তোমাকে কাল রাতে বোধহয় বলেছিলাম।"

"ওখানকার মেয়েদের রেট কত?"

আমি চুপ করে থাকা ছাড়া কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

"কাল রাতে বলছিলে বড় কাচের জানলা। ভিতরে লাল আলো। সেই আলো মেখেই দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েরা। খুব কষ্ট ওদের। আমি তো শুনেছি তোমাদের দেশে প্রস্টিটিউশন লিগ্যাল। দালাল নেই, গুণ্ডা নেই।"

আমি কোনও মন্তব্য করছিলাম না। রোজ়ি নিজের মনে বলেই যাচ্ছিল, "কাল রাতে তোমাকে মনে হচ্ছিল তোমার যাতায়াত আছে ওখানে। কিন্তু যত দেখছি তোমাকে, আমার হিসেব মিলছে না।"

শেষ পর্যন্ত এই অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন শচীবাবু। দোকান থেকে ফিরে এসে বললেন, "চলুন এগনো যাক।"

গার্বেজ কোডিং এর পরে এই এগিয়ে যাওয়াটাই আসলে গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সূত্র প্রিয়তমা।

॥ ১৪ ॥

শচীকান্ত, আবেল আর মিতালি কুঠিঘাটে এসে দাঁড়াল। অদ্ভুত শান্ত নির্জন জায়গাটা। একটা ফেরিঘাট আছে, তবে এখন কোনও লঞ্চ নেই বলে লোকজনও নেই। ঘাটের একদিকে কয়েকটা খালি নৌকা। নৌকাগুলো বোধহয় মাছ ধরার নৌকা। একপাশে স্তূপাকৃত হয়ে থাকা বাঁশের সঙ্গে মাছ ধরার জালগুলোও শুকচ্ছে। গঙ্গার উল্টোদিকে বেলুড় মঠ পরিবেশটা আরও শান্ত করে দিয়েছে।

শচীকান্ত বললেন, "এইখানে ডাচ সাহেবদের কুঠি ছিল। অনেকটা জায়গাতেই এখন নতুন ঘরবাড়ি ফ্ল্যাটবাড়ি হয়ে গিয়েছে। তবে কিছু ধ্বংসস্তূপ এখনও আছে। আমরা যাওয়ার সময় দেখব। আর ওই যে স্কুল বাড়িটা দেখছেন, ওটা কলকাতার একটা খুব পুরনো স্কুল, ভিক্টোরিয়া স্কুল। তবে এখন বোধহয় স্কুলটা আর..."

আবেল মুগ্ধ হয়ে নিজের মনে হারিয়ে গিয়ে বলতে থাকল, "কে বলতে পারে এই ঘাটেই হয়তো ফুলমতীমাঈ একদিন এসেছিলেন। অথবা দয়ারামের মত আড়কাঠিদের সঙ্গে ওলন্দাজদের কথাবার্তা হয়তো এখানেই হত।"

মিতালি বা শচীকান্ত কাররও কাছেই আবেলের কথা বোধগম্য হলো না। আবেল ট্যাবে ছবি তুলতে থাকল। মিতালি নিজের মোবাইল বাড়িয়ে নরম গলায় বলল, "পিছনে ওই গঙ্গা আর বেলুড় মঠকে রেখে আমার একটা ছবি তুলে দেবে? সেলফিতে আসছে না।"

আবেল হাসি মুখে ফোন নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মিতালির কয়েকটা ছবি তুলে দেখতে-দেখতে বলল, "বাঃ! তোমার মুখ তো খুব ফোটোজিনিক! আমি আমার ট্যাবে তোমার একটা ছবি তুলতে পারি?"

"তোমাকে কাল রাতেই বলেছিলাম।"

আবেল ছবি তুলে সেটা দেখিয়ে বলল, "এটা দ্যাখো, এটা আরও সুন্দর হয়েছে।"

দূর থেকে দিলীপ শচীকান্তকে ডাকল, "ও কাকু শুনছেন?"

শচীকান্ত বিরক্ত হলেন, "এই ছেলেটার বড্ড তাড়া। চলুন দেখি আবার কী বলছে?"

আবেলও শচীকান্তর পিছনে পা বাড়াতেই আবেলের একটা হাত মৃদু টেনে ধরল মিতালি।

"বলো।"

"তোমাকে অনেক মিথ্যে কথা বলেছি। আমার সত্যিকারের নামও বলিনি। আমার নাম মিতালি।"

"বাঃ! খুব সুন্দর নাম। তবে রোজি নামটাও সুন্দর।"

"এবার সত্যি একটা কথা বলব? তোমাকে যে মেয়েটা ফোন করেছিল, তার সঙ্গে তোমাকে লাঞ্চ খেতে যেতেই হবে?"

"কে ঐশী?" আবেল অবাক হয়ে বলল, "কেন বলো তো?"

একটু চুপ করে মিতালি একটা ছোট্ট চাপা শ্বাস ফেলে বলল, "না এমনি। সকালে পুজো দিয়ে মন ভালো হয়ে গিয়েছে। তোমার কাছে সকালে যে টাকাটা অ্যাডভ্যান্স বলে নিয়েছিলাম, সেটাও ফেরত নিয়ে নাও।"

মিতালি পকেটে হাত ঢোকাতেই আবেল হাত চেপে ধরে বলল, "না, থাক।"

"কেন?"

"বন্ধুরা বন্ধুদের সাহায্য করতেই পারে। কোনদিন তুমিও হয়তো আমাকে সাহায্য করবে। চলো দেখি শচীবাবু আর ড্রাইভারটার মধ্যে কী হলো?"

আবেল আর মিতালি শচীকান্তর দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে দেখতে পেল শচীকান্তর সঙ্গে দিলীপের কিছু একটা নিয়ে তর্ক চলছে। মিতালিকে দেখে দিলীপ বলল, "এই মাইরি কাকুকে আপনি একটু বোঝান না দিদি। কাকু কলকাতায় থাকে না চাঁদে থাকে বুঝতে পারছি না! প্রথম থেকে বলছি দুটোর মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে, ব্রিগেডে মিটিং আছে, রাস্তায় মিছিল আছে, এখন ঘাট দেখার কী ফর্দ দিচ্ছে শুনুন?"

শচীকান্ত বিরক্ত গলাতে বললেন, "আমি তো বেশি বলিনি। চারটে মাত্র ঘাটের কথা বলেছি। বাগবাজার, আউট্রাম, বাবুঘাট, প্রিন্সেপ।"

"সবটা বলুন। তারপর আপনাদের খিদিরপুরে ছেড়ে দিতে হবে। ক'টা বাজে দেখেছেন? রাস্তা বন্ধ, ওয়ান ওয়ে আর জ্যামের চক্করগুলো জানা নেই আপনার? একটা করে ঘাটে যাচ্ছেন আর আধ ঘন্টা করে বেফালতু সময় মাড়াচ্ছেন।"

মিতালি আবেলকে দেখিয়ে বলল, "এটা তো তুমি অন্যায় কথা বলছো ভাই। উনি বিদেশ থেকে এই ঘাটগুলো দেখতেই এসেছেন, একটু সময় নিয়ে দেখবেন না?"

"তাহলে আপনাদের পুরো দিনের জন্য গাড়ি ভাড়া করা উচিত ছিল। আমাকে ফাঁসাচ্ছেন কেন?"

বাংলায় এই তর্কাতর্কির কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না আবেলের। শচীকান্ত আর মিতালি বুঝিয়ে দিল। আবেল সমস্যাটা বুঝল। গাড়ি কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পাওয়া এটা নিয়ে জোর খাটানো যায় না। মনের বাসনা চেপে রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তাহলে ওর যাতে অসুবিধে না হয়, সেইটুকুই দেখি। তারপর খুব খরচ না হলে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেব।"

মিতালি বলল, "তোমারও তো দুপুরে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ আছে।"

"হুম! সেটাই ভাবছি। সবকিছু কীভাবে ম্যানেজ করা যায়।"

শচীকান্ত একটু চিন্তিত গলায় বললেন, "ট্যাক্সি সব জায়গায় পাওয়া যাবে? ও আবার মিটিং মিছিলের কথা বলছে।"

দিলীপ বলল, "ঠান্ডা মাথায় আমার একটা ভালো কথা শুনবেন কাকু? চলুন আপনাদের শ্যামবাজারে নামিয়ে দিচ্ছি। ওখান থেকে মেট্রো ধরে নিন।"

মিতালি বলে উঠল, "তুমি ভাই একটু চুপ করো তো। বলছি ঘাট দেখব, তুলে দিচ্ছ মেট্রোয়। ঘাড় থেকে কম্বল ঝেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচবে দেখছি।"

"তা হলে যা ভালো বোঝেন করুন। আমার কথা আমি বলে দিলাম।" দিলীপ হনহন করে গাড়ির দিকে হাঁটতে-হাঁটতে গুটখার প্যাকেট খুলে মুখে পুড়ে একদলা লাল পিক ফেলল মাটিতে। দেখে আবেলের মুখটা কুঁচকে উঠল।

শচীকান্ত অনেক ভেবে কোনও উপায়ন্তর না ভেবে বললেন, "আমি বলছিলাম কি, চলুন আমরা বাগবাজার ঘাটে চলে যাই। তারপর ওখান থেকে লঞ্চে ঘুরি।"

আবেলের লঞ্চে ঘোরাটা ঠিক পছন্দ নয়। লঞ্চে গেলে নদীর বুক থেকে হয়তো ঘাটগুলোই শুধু দেখা যাবে, কিন্তু ঘাটে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা যাবে না, গঙ্গার জলে আঙুল ডুবিয়ে অনুভূতি নেওয়া যাবে না।

গাড়িতে উঠে এসে শচীকান্ত বাগবাজারে যাওয়ার কথাই বললেন। অর্জুন সান্যালকে একটু জানিয়ে রাখতে হবে ব্যাপারটা। উনিও বলেছিলেন লঞ্চে নয়, ঘাটে নিয়ে গিয়েই ঘোরাতে হবে। আর সুযোগ পেলে মৃদু গলায় ড্রাইভারের নামে একটা অভিযোগ করতে হবে। ছেলেটার ব্যবহার খুব খারাপ। গাড়ির ভিতর গুটখার গন্ধে ভর্তি। তারপরেই নিজেকে সংযত করে নিলেন। অর্জুন সান্যাল যদি রেগে যান? বলেন, কে বলেছিল আপনাকে কাশীপুর বরাহনগরে নিয়ে যেতে?

ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পিছন দিকে তাকালেন শচীকান্ত। দেখলেন মেয়েটা আবেলের হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আছে। আর আবেল সেই একইরকম ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। এতক্ষণ ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছে, সকালে ওকে যেমন নারীসঙ্গ লোলুপ মনে হচ্ছিল, ছেলেটা হয়তো সেরকম নয়। খুব ভদ্র, বিনয়ী। আবেলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গলা খাঁকরিয়ে শচীকান্ত বললেন,

"আপনি কয়েকটা জিনিস কিনবেন বলছিলেন। সেগুলো কি আগে কিনে নেবেন? তাহলে শ্যামবাজারে গিয়ে কিনে নিয়ে বাগবাজার ঘাটে যেতে পারি।"

"কী জিনিস?" মিতালি আগ্রহী গলায় জিজ্ঞেস করল।

উত্তর দিলীপই দিয়ে দিল, "ধুতি, শাড়ি, কম্বল, গাড়ু।"

"গাড়ু! এসব নিয়ে তুমি কী করবে?" মিতালি ভুরু কপালে তুলল।

"গাড়ু আমি বলিনি তো! গাড়ু কি জিনিস?"

মিতালি হেসে উঠল, "তাহলে কী কিনতে চেয়েছ?"

আবেল ট্যাব বের করে নোট করে রাখা জিনিষগুলো পড়তে শুরু করল, "একটা লোটা, একটা কম্বল, একটা ধুতি, একটা লাঠি, একটা সুতির শাড়ি, কয়েকটা রেশমি চুড়ি।"

মিতালির হাসি থামল না, "এসব কার জন্য নিয়ে যাবে?"

"ফুলমতীমাঈয়ের দেশের স্মারক। তোমরা একটু সাহায্য করে দিও।"

"তা দেব। তবে তোমার গার্লফ্রেন্ডের ছবি একটু দেখিও। তাহলে বুঝব, কেমন রেশমি চুড়ি ওর পছন্দ হবে।"

আবেল কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

দিলীপ বলল, "তাহলে আপনাদের পাঁচ মাথার মোড়েই নামিয়ে দিই।"

মিতালি ঝাঁঝিয়ে উঠল, "তুমি ভাই এখানেই গাড়ি সাইড করে নামিয়ে দাও। চিজ় তুমি একখানা।"

"বাজে কথা বলবেন না। আমি আপনার ডিউটি করছি না। সকালেই সব বোঝা হয়ে গিয়েছে আমার। সব ফোকটের মেয়েছেলে।"

মিতালি মুহূর্তে মেজাজ হারিয়ে চিৎকার করে উঠল, "কী বললি তুই? ফোকটের মেয়েছেলে? শালা ফোকটের মেয়েছেলেরা কেমন হয় জানিস? এখুনি চেঁচিয়ে পুলিশ ডেকে বলব, তুই আমার বুকে হাত দিয়ে শ্লীলতাহানি করেছিস। শালা..."

শচীকান্তর কানে হিয়ারিং এডে গমগম করছে জীবনে না শোনা অত্যন্ত অশ্লীল সব গালিগালাজ। শব্দগুলো শুনে শরীর কীরকম অস্থির লাগছে! ইচ্ছে করছে কান থেকে হিয়ারিং এড খুলে ফেলতে। ভীষণ অসহায় লাগছে। ভেবে পাচ্ছেন না কীভাবে পরিস্থিতি সামলাবেন!

ঝগড়ায় একটা শব্দও মানে বুঝতে পারছে না আবেল। তবে ড্রাইভারটার কোনও কথায় রোজ়ি যে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছে বুঝতে পারছে। মিতালির কাঁধ ধরে আবেল বলতে থাকল, "রোজ়ি, রোজ়ি... মিতালি শান্ত হও।"

আবেলের কাঁধে মাথা গুঁজে ডুকরে উঠল মিতালি, "আমি তোমার সঙ্গে মিতালি হয়েই থাকতে চাই। কিন্তু সবাই বারবার আমার মধ্যে থেকে রোজ়িকে টেনে বের করে।"

আবেল মিতালির মাথাটা সরিয়ে দিল না। আলতো করে কাঁধে সহানুভূতির হাত বোলাতে থাকল। দিলীপও মিতালির অশ্রাব্য গালিগালাজ শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিল। মনে একটা ভয় হচ্ছে। এরা সাংঘাতিক মেয়েছেলে। যা বলছে তা করে দেখিয়ে দিতে পারে। পুলিশের সঙ্গে এদের সেটিং থাকে। মেয়েছেলের গায়ে হাত কেস দিলে জেল অবধারিত।

গাড়ির মধ্যে আর একটাও শব্দ নেই। দিলীপ যতটা তাড়াতাড়ি পারে পাঁচ মাথার মোড় থেকে ভূপেন বোস অ্যাভিনিউয়ের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দাঁড় করাল। ডিউটি স্লিপ বের করে শচীকান্তর হাতে দিয়ে বলল, "কাকু, একটু সই করিয়ে দিন।"

আবেল কাগজে সই করে ফেরত দিতে-দিতে বলল, "শচীবাবু ওকে একটু বলবেন, ছোট-ছোট প্যাকেট থেকে যে জিনিসটা ও খায়, সেটা স্বাস্থ্যের জন্য যেমন ভালো নয় তেমনই, এই শহরটা তো ওর নিজের, সেটা নোংরা করাও উচিত নয়?"

শচীকান্ত হাসলেন, "বলতে পারি। কিন্তু বলে কোনও লাভ হবে না। চলুন নামা যাক।"

আবেল পকেট থেকে নোটের বাণ্ডিল বের করে তার থেকে একটা দশ টাকার নোট বেছে দিলীপের হাতে দিয়ে মিষ্টি হেসে মোলায়েম গলায় বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

দশ টাকার নোট হাতে পেয়ে দিলীপ একটু থতমত খেয়ে শচীকান্তকে জিজ্ঞেস করল, "কাকু দশ টাকা দিচ্ছে কেন? নিউ মার্কেটে পার্কিং লাগেনি।"

মিতালি গাড়ি থেকে নামতে-নামতে শেষ ঝালটা ঝাড়ল, "তোকে গুটখা খাওয়ার জন্য দিচ্ছে রে শালা হারামি।"

গাড়ির থেকে নেমে লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে মিতালি বলল, "এই ভাল হলো কাকু। এবার আমরা নিশ্চিন্তে নিজেদের মতো সময় নিয়ে ঘুরব।"

শচীকান্ত বললেন, "বেশ। চলুন তবে আগে জিনিসগুলো কিনে নেওয়া যাক।"

দোকানের দিকে তিনজনে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ মিতালির চোখ দুটো চকচক করে বলে উঠল, "আমরা তো এখান থেকে বাগবাজার ঘাটে যাব, তাই না কাকু?"

"হ্যাঁ, সেরকমই তো আমরা ঠিক করলাম।"

"তাহলে আমরা চক্ররেলের কথা ভাবছি না কেন? আউট্রাম ঘাটে যখন যাই তখন মাঝে-মাঝে লাইন পেরনোর সময় দেখি ট্রেন আসছে। গঙ্গার পাড় ধরেই তো চক্ররেল যায়। যেখানে আবেলের নামতে ইচ্ছে হবে সেই স্টেশনে আমরা নেমে পড়ব।"

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে পঞ্চদশ কিস্তি

বুঝতেই পারছো প্রিয়তমা, প্রেম এই জট পাকানো গল্পে একটা ভূমিকা নিয়ে ফেলেছে। অবশ্য প্রেম কবে তোয়াক্কা করেছে কোথায় কে কী জট পাকিয়ে ফেলল! প্রেম কখনও পিছনে ফিরে তাকায় না। শুধু অজানা সামনে দেখে চিরকাল অদ্ভুত খেলা খেলতেই পছন্দ করে। আমাদের গল্পেই জড়িয়ে আছেন ফুলমতীমাঈ। এই গল্পটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ভ্যান ডার বার্গ পরিবারের ঈশ্বরী আর রূপকথার পরী হয়ে উঠতে তাকে আরও কিছুটা পথ হাঁটতে হবে।

আগের লাইনগুলো লিখে ফেলে আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখছি খাওয়া-দাওয়া শেষে সবাই কেমন নিশ্চিন্ত। অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কেউ-কেউ খুব আরাম করে বই পড়ছে বা এলসিডি স্ক্রিনে সিনেমা দেখছেন। একমাত্র আমার সামনের এলসিডি স্ক্রিনেই শুধু বোধহয় ন্যাভিগেশনের স্ক্রিন খোলা আছে। খেয়াল রাখছি আর কতক্ষণ পরে গন্তব্যে পৌঁছে যাব। আর নিজের মনে যুদ্ধ করে চলেছি স্কিফলে পৌঁছনোর আগে কীভাবে তোমার জন্য সব সূত্রগুলো লেখা শেষ করে উঠতে পারব।

এমিলি কোফির খুনের সেই ঘটনার পর বাড়ি থেকে আর বেরোয় না। মার্কাস যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য, কিন্তু কিছুতেই সফল হতে পারছে না। ওদিকে কোফির খুনের ব্যাপার নিয়ে তর্কবিতর্কে বাড়িতে মার্কাসের সঙ্গে হেনড্রিকের সম্পর্ক একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। থেকে থেকে বিরোধ বাধছে ব্যবসা পরিচালনা নিয়ে।

যদিও হেনড্রিক অকৃতদার, হেনড্রিকের পর ভ্যান ডার বার্গ প্ল্যানটেশনের একছত্র মালিক হবে মার্কাস, তবুও এই গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার খাতিরে ভ্যান ডার বার্গদের ব্যবসার বাবার পঞ্চাশ শতাংশ মালিকানা চেয়ে আদালতে মামলা করে বসল মার্কাস।

হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ যেন অনুমান করেই রেখেছিলেন এরকম একটা দিন আসতে চলেছে। তাই তার সিদ্ধান্তও নেওয়া ছিল। ভ্যান ডার বার্গ বাংলোর মালিকানার কাগজ দেখিয়ে সেই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে দিলেন মার্কাসকে।

মার্কাসের তখন কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না। বহু কষ্টে একটা ছোটবাড়ি খুঁজে পেলেন। বাড়িটা ছিল গিলবার্ট ডি জং এর। মার্কাসের কাছে কোনও অর্থও ছিল না। কিন্তু অনেক ভেবে গিলবার্ট

ডি জং একটা বাজি ধরলেন। উনি জানতেন আদালতের ফল যাই হোক না কেন মার্কাস একদিন না একদিন ভ্যান ডার বার্গদের পুরো ব্যবসার মালিক হবে। তাই ঋণের মোটা চুক্তিপত্রে সই করিয়ে মার্কাসকে বাড়িতে থাকতে দিলেন।

মার্কাসের এমিলিকে পাওয়ার পথে তখন একজন শুধু বাধা। আলডার্ট বুগার্ড। আর বাকি আছে ফুলমতীমাঈয়ের কথা। প্রিয়তমা, তাহলে পরের কিস্তির সূত্রে থাক ওই তিনজনের কথা।

॥ ১৫ ॥

গিলবার্ট ডি জং এর ভাড়া বাড়িতে মার্কাস উঠে এলেও তার লক্ষ্য থেকে সরল না। বাবা মা, বেঞ্জামিন ও সোফি ভ্যান ডার বার্গের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় কুলিদের কল্যাণ ও অধিকার রক্ষার কাজ করতে-করতে কয়েক মাসের মধ্যেই সরকারের নজরে পড়ে গেল। ফলে প্রভাবশালী প্ল্যানটেশন মালিকদের কাছে তার গুরুত্ব বাড়তে থাকল। বিশেষ করে বহু উদারপন্থী প্ল্যানটেশন মালিকদের কাছে প্রিয় পাত্র হয়ে উঠতে থাকল মার্কাস। এই ঘটনায় দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকল হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গের।

মার্কাস যতই নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ুক, মার্কাসের একটা চিন্তা রয়েই গিয়েছিল ফুলমতীকে নিয়ে। কাকার কুলিদের কলোনিতে ফুলমতীকে রেখে মোটেই নিশ্চিন্তে ছিল না মার্কাস। তাছাড়া মার্কাসের মনে হয়েছিল ফুলমতীকে যদি কিছুটা লেখাপড়া করিয়ে শিক্ষিত করে তুলতে পারে, তাহলে আগামীদিনে কুলিদের সঙ্গে যে মেয়েরা আসবে তাদের পড়াশোনা করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে।

অনেক ভেবেচিন্তে মার্কাস একদিন গিলবার্ট ডি জং-এর মাধ্যমে হেনড্রিকের কাছে আবেদন পাঠাল ফুলমতীকে ডি জং কুলি কলোনিতে নিয়ে আসার জন্য। নিয়মানুযায়ী এক প্ল্যানটেশনে মালিকের কাছ থেকে অন্য প্ল্যানটেশন মালিকের কাছে আনতে গেলে লিখিত অনুমতি লাগে। তাছাড়া অভিবাবক হিসাবে রামাশীষেরও অনুমতি লাগবে। মার্কাসের সন্দেহ ছিল এই দুটো অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা। কিন্তু মার্কাসকে অবাক করে হেনড্রিক এই দুটোই অনুমতি পত্র পাঠিয়ে দিলেন।

মার্কাসের যদিও ইচ্ছে ছিল ফুলমতীকে নিজের বাড়িতে এনে রাখে কিন্তু সেটা শোভন নয় বলে ফুলমতীকে ডি জং কুলি বস্তিতে একটা পরিবারের সঙ্গে রাখার ব্যবস্থা করল। এর কিছুদিন পরেই অভাবিত একটা ঘটনা ঘটল।

মার্কাস বাড়িতে একাই ছিল। দুপুরবেলা। সদর দরজার গম্ভীর ঘন্টি বেজে উঠল। মার্কাস উঠে গিয়ে দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে এমিলি। মার্কাস যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। কিন্তু একই সঙ্গে এমিলির মুখ দেখে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। একি চেহারা হয়েছে এমিলির! হাসিখুশি মুখটায় যন্ত্রণার ছাপ। চোখের তলায় কালি।

মার্কাস এমিলির হাত ধরে চুম্বন করে বলল, "কী হয়েছে তোমার? এসো, এসো ভিতরে এসো।"

ভিতরে এসেই এমিলি মার্কাসের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। কী হয়েছে জানার জন্য মার্কাস পীড়াপীড়ি করল না। নিজেকে গুছিয়ে নিতে এমিলিকে সময় দিল। কিছুটা সামলে উঠে এমিলি মার্কাসের বুকে কিল মারতে-মারতে অভিমানী গলায় কৈফিয়ত চাইল, "তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসোনি কেন?"

"বিশ্বাস করো, আমি প্রতিদিন পথ খুঁজেছি বুগার্ড বাংলোতে পৌঁছতে। কিন্তু কিছুতেই সেই পথ খুঁজে পাইনি। বিশেষ করে কোফির খুন হয়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি ভীষণ জটিল হয়ে আছে। শুধু তোমার বাবা নন, তোমাদের বাড়িতে কোফির বউ থাকে, আলমা।"

"আলমা থাকত। ওই আজ ওঁর ছেলেদের কাছে বরাবরের জন্য যাওয়ার আগে আমাকে লুকিয়ে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল।"

ব্যাপারটা স্পষ্ট হল না মার্কাসের কাছে। বিস্মিত গলায় বলল, "কোফির বউ তোমাকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল? অনেকেরই তো ধারণা কোফির মৃত্যুর পিছনে আমার হাত আছে। ও তাহলে বিশ্বাস করে না?"

"ওকে আমি বলেছিলাম। তুমি নির্দোষ। সেদিন তোমার আমার মধ্যে কী সম্পর্ক হয়েছিল।"

মার্কাস যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, "তুমি সব বলেছ?"

"বলেছি। কারণ আমার মনে হয়েছে একমাত্র আলমাকেই আমি নিজের মনের কথা বলতে পারি।"

বলতে-বলতে আবার ডুকরে কেঁদে উঠল এমিলি, "বিশ্বাস করো এই তিন মাসে আমি বুঝতে পেরেছি, ক্রীতদাসদের জীবন কী! কত যন্ত্রণা তাদের সহ্য করতে হয়েছে। আমাকে ক্রীতদাসের মতোই বাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। বাবা একটাও কথা বলেনি।"

"মানে?" মার্কাসের সব কীরকম গুলিয়ে যাচ্ছে।

"আমাকে দিয়ে জুলিয়েনের সব কাজ আগেই করানো হত। আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আমি আর পারছিলাম না..."

"জানি, তুমি বলেছিলে..."

"কিছুই জানো না তুমি। তারপর আমার বিরুদ্ধে লিজার হাত আরও শক্ত হয়ে গেল," এমিলি কাঁদতে-কাঁদতে কোনরকমে বলতে থাকল, "আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল, খেতে দিত না..." এমিলি কথা শেষ করতে পারল না। কেঁদেই চলল।

নিজের প্রিয়তমা স্বপ্নের নারীর এই অবস্থা মার্কাসকে অসহায় করে তুলল। মার্কাস ভেবেই উঠতে পারছেন না, কী সান্ত্বনা দেবে তার প্রিয়তমাকে। এমিলির এই দুর্দশা শুনে নিজের বুকের ভিতর ফেটে যাচ্ছে। নিজের ভালোবাসার সবটুকু উষ্ণতা এমিলির মনে আর শরীরে ছড়িয়ে দিতে এমিলিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বোলাতেই এমিলি যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল।

মার্কাস ঘাবড়ে গিয়ে এমিলিকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "কী হলো?"

এমিলি দেওয়ালের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর খুলে ফেলল নিজের পোশাক। এমিলির পিঠ দেখেই মার্কাস চোখ যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল। যে মাখন পিঠে একদিন দেখেছিল কামের স্বেদবিন্দু, সেখানে ফুটে রয়েছে দগদগে চাবুকের দাগ। আফ্রিকার মানুষগুলোর পিঠে এরকম চাবুকের দাগ দেখা যায়।

মার্কাসের অসহায় স্নায়ুগুলো একটু-একটু করে সতেজ হয়ে মস্তিষ্কে একটা সংকেত পাঠাল। চোয়াল শক্ত করে মার্কাস বলে উঠল, "কে করেছে তোমার এই অবস্থা? আলডার্ট বুগার্ড?"

"না।"

"তাহলে ওর বউ?"

এমিলি কোনও উত্তর না দিয়ে আবার ফোঁপাতে থাকল। মার্কাস উত্তর পেয়ে গিয়ে এমিলির দুটো কাঁধ ধরে সোফায় বসিয়ে বলল, "তুমি থাকো এখানে। আমি আসছি।"

মার্কাস দ্রুত ভিতরে গেল এবং ফিরে এল হাতে একটা বন্দুক নিয়ে। মার্কাসের হাতে বন্দুক দেখে এমিলি চমকে উঠে ভয় পেয়ে বলে উঠল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ মার্কাস?"

"বুগার্ড বাংলো। কথা দিচ্ছি তোমার সব যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসব।"

এমিলি বন্দুকের নল ধরে বলল, "না মার্কাস। আলডার্ট বুগার্ড আমার বাবা। তাঁর স্ত্রী আমার মা। তোমাকে এটা মানায় না মার্কাস। তুমি এরকম নও।"

এমিলির হাত থেকে বন্দুক ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে-করতে মার্কাস বলতে থাকল, "এটা আমার বাবার বন্দুক। ভ্যান ডার বার্গ বাংলোতে শেষ যে ক'দিন ছিলাম, রোজ ইচ্ছে করতো কাকার দিকে তাক করে বন্দুকের ট্রিগার টেনে দিই। কিন্তু সবসময় আমি নিজেকে বুঝিয়েছি, ! ওই লোকটা তোমার কাকা। লোকটা তোমাকে মানুষ করেছে। লন্ডনে পাঠিয়ে তোমাকে শিক্ষিত করে এনেছে।' পারিনি আমি। কিন্তু আজ আমার হাত কাঁপবে না।"

"সত্যি বলছি, তোমাকে এটা মানায় না মার্কাস। তুমি এরকম নও।"

"এমিলি বোঝার চেষ্টা করো। এই ওলন্দাজ গায়ানায় অত্যাচারের একটা শেষ হওয়ার দরকার। চাবুক হাতে ধরার আগে সবার একটা জিনিস মনে করার দরকার। পরিণতি কি হতে পারে? কিসের সম্পর্কের কথা ভাবছ তুমি? কোফির ধমনীতে যেমন বুগার্ডের রক্ত ছিল না, তেমনই তোমার ধমনীতেও বুগার্ডের রক্ত নেই। কিসের তোমাদের এত আনুগাত্য?"

"সম্পর্কের মার্কাস। সম্পর্ক। যে সম্পর্কের কথা ভেবেই তুমি শেষ পর্যন্ত হেনড্রিকের দিকে তাক করে ট্রিগারের ওপর আঙুলটা টানতে পারনি।"

মার্কাস বন্দুকটা নামিয়ে রেখে ধপ্ করে সোফার ওপর বসে পড়ল। এমিলি মার্কাসের হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, "সব সহ্য করেও আমি বুগার্ড বাংলোতে ছিলাম। মনকে বোঝাতাম ক্রীতদাসরা যদি মানুষ হয়ে এসব সহ্য করতে পারে তবে আমিও পারব না কেন? আলমা আমার সঙ্গে ছিল। ওরা জানে চাবুকের ঘায়ের ওপর গাছগাছড়ার কী মলম লাগালে যন্ত্রণা কমে যায়..."

মার্কাস হাত তুলে এমিলিকে থামিয়ে বলল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও। কী বললে? গাছগাছড়ার থেকে মলম? কে যেন সেদিন বলছিল..."

এমিলি একটা কষ্টের হাসি হেসে বলল, "যেই বলুক। আজ থেকে আর বুগার্ড বাংলোতে গিয়ে আমার পিঠে মলম লাগিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। আলমা আমাকে তোমার এখানে পৌঁছে দিয়ে মেরুন কলোনিতে চিরদিনের মত ওর ছেলেদের কাছে চলে গিয়েছে। ওরা সবাই আফ্রিকা ফিরে যাচ্ছে। সামনের সপ্তাহে পারামারিবো বন্দরে ওদের জাহাজ আসছে।"

"আর তুমিও আবার ফিরে যাবে ভাবছ বুগার্ড বাংলোয়?"

"তাছাড়া আমার আর উপায় কি? জানি ওরা যখন জানতে পারবে আমি লুকিয়ে এখানে এসেছিলাম তখন আমার ওপর অত্যাচার আরও বাড়বে।"

মার্কাস তেরচা হাসল, "আলমা ফিরে যাচ্ছে আফ্রিকায়, আর তুমি ফিরে যাবে বুগার্ড বাংলোয়। তফাত কি জানো? আলমার পিঠে আর কোনদিন চাবুক পড়বে না।"

"সব অত্যাচার আমি সহ্য করতে শিখে গিয়েছি। আমার পিঠে চাবুকের যে দগদগে ঘাগুলো তুমি দেখে এত উত্তেজিত হচ্ছ, তাতে তো তোমারও দায় আছে মার্কাস।"

ইঙ্গিতের মানে বুঝতে না পেরে মার্কাস বলল, "আমি বুঝতে পারলাম না এমিলি!"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এমিলি বলল, "আমি তোমার সন্তানের মা হতে চলেছি মার্কাস। সেটা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই..."

মার্কাসের কানে আর কোনও শব্দ ঢুকছে না। এমিলির গর্ভে নিজের সন্তানকে নিয়ে আসতে পেরেছে! এত আনন্দ শেষ কবে পেয়েছে? এমিলিকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে-চুম্বনে অস্থির করে দিয়ে মার্কাস বলল, "আমি আর কোনও কিছুর পরোয়া করি না। আমি চার্চ জানি না, আমি সমাজ পরোয়া করি না। তুমি যাকে আনছ, তার জন্য আমার বাড়িতে গোলাপের পাপড়ির বিছানা পাতা আছে।"

"কিন্তু..."

"কোনও কিন্তু নয়। আজ থেকে তুমি এখানেই থাকবে।"

মার্কাস এমিলিকে আর বুগার্ড বাংলোয় ফিরে যেতে দেয়নি। প্ল্যানটেশন মালিকদের মুখরোচক গল্পের সূত্র দিয়ে দু'জনে একসঙ্গে থাকতে শুরু করল। হেনড্রিক বা বুগার্ড এই নিয়ে কোথাও একটা শব্দ বললেন না। তবে দু'জনের প্রতিক্রিয়া হল দু'রকম। বুগার্ড নিজের প্ল্যানটেশন থেকে বেরনোই বন্ধ করে দিলেন এবং হেনড্রিক সামাজিক মেলামেশা আরও বাড়িয়ে দিলেন। এমন ভাব করতে থাকলেন যেন মার্কাস বলে কাউকে কোনদিন চিনতেন না এবং এমিলি একজন বেশ্যা।

মার্কাসের এবার ফুলমতীকে নিজের কাছে আনতে কোনও অসুবিধেই হল না। মার্কাস ভেবেছিল বাড়িতে এনে ফুলমতীকে যেমন পড়াশোনা করাতে পারবে তেমনই এমিলি একটা সঙ্গ পাবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মার্কাস অবাক হয়ে লক্ষ করল ফুলমতী শুধু এমিলিকে সঙ্গই দিচ্ছে না, গর্ভবতী এমিলির সবরকম পরিচর্যা করছে। মার্কস জানত না, আট বছর বয়সে ফুলমতী যখন বিধবা হয়ে দোপোহারি গ্রামে ফিরে এসেছিল তখন ফুলমতীর মাও এরকম গর্ভবতী ছিল। ফুলমতী তাঁর পরিচর্যা করত। মার্কস জানত না, ধারের সুদ না মেটানোর অপরাধে বাবার পিঠে জমিদারের চাবুকের ঘা শোকানোর জড়িবুটির মলম কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটাও ফুলমতী আট বছর বয়সেই শিখে ফেলেছিল।

এমিলি আর ফুলমতীর মধ্যে যদি কিছু অন্তরায় থেকে থাকে, তাহলে সেটা একটাই জিনিস। ভাষা। এভাবে আকারে প্রকারে, ইঙ্গিতে-ইঙ্গিতেই দু'জনে-দু'জনের ভাষার শব্দ শিখতে থাকল। আড়াল থেকে মার্কাস তার নমুনা দেখে খুব উপভোগ করত।

তেমনই একদিন আড়াল থেকে মার্কাস দেখল, এমিলি ফুলমতীর হাত নিয়ে ওর স্ফীত পেটের ওপর রেখে বলল, "বল তো ফুলমতী? এখানে কে আছে? ছেলে না মেয়ে? লড়কা না লড়কি?"

ফুলমতী আস্তে-আস্তে খুব সাবধানে এমিলির পেটের ওপর কান রেখে চোখ বন্ধ করল কিছুক্ষণ। তারপর মুখে একটা স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়ে বলল, "লহু।"

"লহু! লহু মানে আবার কী রে?"

"রক্ত! রক্ত!"

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে ষোড়শ কিস্তি

রক্ত! প্রিয়তমা এই গল্প পুরোটাই রক্তের গল্প। রক্তের সম্পর্কের গল্প। রক্তপাতের গল্প। রক্ত দিয়ে সম্পর্ক ভাঙাগড়ার গল্প। যাক, গল্পের এই মোড়ে এসে আশাকরি তুমি একটু নিশ্চিন্ত। অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে মার্কাস আর এমিলি একসঙ্গে থাকছেন। আগামী কোনও এক রবিবারে চার্চে গিয়ে তারা বিয়ে করে ফেলবেন। ফুলমতীমাঈও অবশেষে একটা ভালো থাকার জায়গা পেলেন। সবাই সবাইকে দেখছে। সবাই খুশি। আমার পূর্বপুরুষ বেঞ্জামিন জুনিয়র ভ্যান ডার বার্গ মায়ের গর্ভে পৃথিবীর আলো দেখতে পাওয়ার দিন গুনছে। সবকিছু কেমন একটা হ্যাপি এন্ডিংয়ের দিকে এগোচ্ছে, তাই না প্রিয়তমা? এবার কি তাহলে তোমার কোল থেকে মাথা তুলে নেওয়ার আগে সময় এসেছে বলার যে, 'অ্যান্ড দে হ্যাপিলি লিভ্ড এভার আফটার।'

না প্রিয়তমা। জট পাকানো গল্পের এখনও কিছু বাকি আছে। বরং ইতিহাসের পাতায় গল্পটাকে আরেকবার কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে দিয়ে গত পরশুর দুপুরে একটু ফিরে যাই।

ঐশীর বাবার পাঠানো ড্রাইভার ছেলেটা ছটফটে হলেও একটা জিনিস বোধহয় ঠিক বলেছিল। অত অল্প সময়ে অতগুলো ঘাট দেখা সম্ভব নয়। তারপর শহর জুড়ে মিছিল ছিল। আমার জিনিসপত্র কিনে বাগবাজার ঘাটে আসতেও বেশ খানিকটা সময় চলে গিয়েছিল। তাছাড়া রোজ্‌জি আর শচীবাবু দু'জনেই আমাকে সময় দিচ্ছিলেন। যদিও রোজ্‌জি নিজের থেকেই পুরো সময় দিতে চেয়েছে, শচীবাবু তো নন। আমি জানতাম যে উনি পেশাদার গাইড। একবেলা মাত্র সময় দিয়েছিলেন। এর পরেও ওঁকে আমি আটকে রাখলে অন্যায় হত।

আসলে কী জানো তো প্রিয়তমা, ইউটিউবে আপলোড করে রাখা অগুন্তি ভিডিয়ো দেখে একটা শহরের চরিত্র বোঝা যায় না। আমি তো ভেবেছিলাম একটা সাইকেল ভাড়া করে গঙ্গার পাড় দিয়ে এই শহরে ঘুরব। কিন্তু যখন বুঝতে পরলাম সেটা সম্ভব নয় তখন শচীবাবুর ওপর আমার নির্ভরতা বেড়ে গিয়েছিল। একদিকে ওঁকে পেশাদার মনে হলেও, মনে-মনে আমি চাইছিলাম, উনি থাকুন।

তাই রোজ্‌জি আর শচীবাবুকে বলতেই হল ফুলমতীমাঈয়ের কথা। বাগবাজার চক্ররেলের স্টেশনে দাঁড়িয়ে শচীবাবুকে ট্যাবে গুগল



ম্যাপ খুলে দেখলাম সেই ঘাট। ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ এ যে ঘাট থেকে লাল্লা রুখ ভোঁ বাজিয়ে ফুলমতীমাঈকে নিয়ে ভারতবর্ষ ছেড়েছিল। শচীবাবু কলকাতার ঘাট নিয়ে এত পড়াশোনা করলেও এই ঘাট যেকোনও কারণেই হোক ওঁর অজানা ছিল। উনি ভাবলেন ওটা মেটিয়াবুরুজের বিচালি ঘাট।

ট্রেনের আওয়াজ। আর তারপরে যা হল তা একমাত্র বোধহয় ফুলমতীমাঈয়ের দেশেই সম্ভব।

॥ ১৬ ॥

বাগবাজার ঘাট দেখে চক্ররেলে উঠে কামরা ফাঁকাই পেলেন শচীকান্ত। জানলার ধারে মুখোমুখি বসেছে মিতালি আর আবেল। আবেলের পাশে একটু দূরত্ব রেখে শচীকান্ত। মাঝে শ্যামবাজার থেকে কেনা আবেলের জিনিসপত্রর প্যাকেট।

ট্রেন স্টেশন ছেড়ে স্পিড তুলেছে। আবেল বাইরের গঙ্গার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। মিতালি জিজ্ঞেস করল, "কী ভাবছো?"

"ভাবছি, ঠাকুরমা এই দেশে এলে কত খুশি হতেন! আর ভাবছি ঠাকুরমা এই দেশটা কোনদিন নিজের চোখে না দেখে, এমনকী ইন্টারনেটে এই দেশের একটাও ছবি না দেখে কী নিঁখুত বর্ণনা দিতেন। কল্পনা যে বাস্তবের সঙ্গে এভাবে মিলে যায়, এখানে না এলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।"

"তা, তোমার ঠাকুরমাকে একবার নিয়ে এলেই পার। আমরা সবাই মিলে তোমার ঠাকুরমাকে হই-হই করে আমদের দেশ দেখাব। কী কাকু, আপনি থাকবেন তো?"

মিতালির প্রশ্নে শচীকান্ত স্মিত হেসে বললেন, "নিশ্চয়ই।"

মিতালি চোখমুখ ঝলমলিয়ে বলে উঠল, "ব্যস। প্রবলেম সল্‌ভ হয়ে গেল। তুমি তোমার ঠাকুরমাকে নিয়ে আসছো। এবার আমরা তাড়াহুড়ো করে নয়, নিজেরা একটা গাড়ি ভাড়া করে সময় নিয়ে ঘুরব। সব গঙ্গার ঘাট দেখব। সঙ্গে কাকুর মত গ্রেট গাইড থাকবেন।"

আবেল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "সেটা আর সম্ভব নয়। ঠাকুরমা চলে গিয়েছেন চিরঘুমের দেশে।"

আবহ ভারাক্রান্ত হল। ট্রেন এগিয়ে চলেছে। একটা সময় শচীকান্ত কাঁধের শান্তিনিকেতনী ব্যাগ থেকে নিজের পুরনো ডায়েরি বের করে পাতা ওলটাতে থাকলেন। মিতালিও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শচীকান্তকে বলল, "কাকু, আপনাকে একটা কথা বলব? আপনি গুরুজন। বাবার বয়সী। গাড়িতে মাথা ঠিক রাখতে না পেরে আপনার সামনে খুব খারাপ-খারাপ গালাগাল দিয়েছি। কী করব কাকু? বুঝতেই তো পারছেন, খুব খারাপ মেয়ে আমি। কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। ক্ষমা করে দেবেন।"

আবেল বলল, "মিতালি, তুমি মাঝে-মাঝে ভুলে যাচ্ছ যে আমি তোমাদের ভাষা বুঝি না। নাকি তুমি শচীবাবুকে এমন কিছু বলছ, যেটা আমাকে বলতে চাও না।"

মিতালি হেসে উঠল, "ঠিক ধরেছ। সব কথা তোমার জানার দরকার নেই। আচ্ছা কাকু, আমরা তাহলে এবার কোন স্টেশনে নামব?"

শচীকান্ত হাঁপ ছেড়ে বললেন, "ভাবছি বড়বাজারে নামলে কেমন হয়?"

"ওরে বাবা বড়বাজার সেখানে তো সাংঘাতিক ভিড়।"

"না, আমরা আর বাজারের দিকে যাব না। ওখানে নেমে যদি আমরা ঘণ্টাখানেক সময় দিতে পারি তাহলে তিনটে ঘাট দেখা হয়ে যেতে পারে। জগন্নাথ ঘাট, মল্লিক ঘাট, আর্মেনিয়ান ঘাট। তারপর না হয় একটা ট্যাক্সি ধরে আমরা চাঁদপাল ঘাট থেকে আবার আরম্ভ করব।"

আবেল ঘড়ি দেখে বলল, "শচীবাবু সরি। আপনি পেশাদার গাইড। একবেলা আপনার থাকার কথা। সারাদিন আপনার কত পারিশ্রমিক আমার জানা নেই। আমার কাছে বেশি টাকাও নেই। আর মেটিয়াবুরুজের ঘাটটায় আমাকে যেতেই হবে।"

মিতালি বলল, "টাকার জন্য আপনি চিন্তা করবেন না কাকু।" তারপর পকেট থেকে সকালে আবেলের দেওয়া পাঁচশ টাকার নোট বের করে বলল, "এতে হবে?"

এমন সময় আবেলের ট্যাবটা বেজে উঠল। ঐশী। আবেল ফোন

ধরতেই ঐশী উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "তুমি কোথায়?"

"ট্রেনে?"

"ট্রেনে! কোথায় যাচ্ছ?"

"কয়েকটা ঘাট দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন শচীবাবু। আজকে শহরে কি একটা মিছিল আছে না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। চারদিক থেকে মিছিল বেরিয়ে ব্রিগেডের দিকে যাচ্ছে। যাকগে, শোনও। দারুণ একটা খবর আছে। আজ কলেজের নোটিশ বোর্ডে স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে কারা-কারা আমস্টারডাম যাবে নাম বেরিয়েছে। সেখানে আমার নাম আছে। বিশ্বাস করতে পারছ, আমার নাম আছে।"

আবেল হাসল, "অনেক অভিনন্দন। তোমার নাম থাকবে আমি জানতামই। আমার সব বন্ধুরা তোমাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। আমদের দেশে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কবে আসছ তোমরা?"

"বলছি, সব বলছি। কখন তোমার ঘাট দেখা শেষ হবে? তোমাকে বলেছিলাম আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করব। একটা কাজ কর, পরের ঘাট দেখে কাছাকাছি একটা মেট্রো ধরে নাও। তারপর পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে নামো। আমি তোমাকে রেস্তোঁরার নাম বলে দেব।"

ঐশী পীড়াপীড়ি করতে থাকল। বাধ্য হয়ে আবেল 'দেখছি' বলে ফোন ছেড়ে দেখল মিতালি হাতের মুঠোয় পাঁচশ টাকার নোট পাকিয়ে ধরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

মিতালি জানতে চাইল, "কার ফোন?"

"ঐশীর। আমস্টারডামে যাওয়ার স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে ওর নাম বেরিয়েছে। ভীষণ খুশি। পার্ক স্ট্রিটে লাঞ্চ খাওয়াতে চায়।"

"নাম বেরোনোর আগেও তোমাকে লাঞ্চ খাওয়াতে চেয়েছিল। সকাল থেকেই বলছে লাঞ্চের কথা। তুমি কী ঠিক করলে?"

"ঠিক করে উঠতে পারছি না। ওর ওপর আমার একটা কৃতজ্ঞতা আছে। এমনভাবে সকাল থেকে বলছে।"

মিতালি কাতর গলায় বলল, "অনুরোধ ও যখন আমস্টারডামে যাবে তখনও রাখতে পার। আজকের দিনটা আমাকে দাও না।"

"মানে?"

মিতালি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "আসলে কী জানো তো? সারাক্ষণ শুধু দৌড়ে বেড়াই অচেনা খদ্দেরদের বিছানায় যাওয়ার জন্য। নিজেকে কখনও ছুটি দিইনি তো। আজ মনে হচ্ছে নিজের ছুটি। মনটা ভীষণ হালকা লাগছে। আজ থাকো না আমার সঙ্গে, প্লিজ। বিশ্বাস করো, মা গঙ্গার দিব্যি দিয়ে বলছি। আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নেই। তোমার কাছে কোনও টাকা চাইব না।"

আবেল মিতালির হাতের ওপর আলতো করে হাতটা রেখে বলল, "বেশ।"

তারপর ট্যাব থেকে আবার ফোন করল ঐশীকে, "ঐশী, তুমি যদি কিছু মনে না করো, সন্ধেয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি। আসলে ঈশ্বর আজকে আমাকে যে সুযোগটা দিয়েছেন সেটা আমি হয়তো আর পাব না।"

ফোনটা ছাড়ার পর আবেলের হাত ধরে মিতালি আবেগ জড়ানো গলায় বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

তারপর শচীকান্তর দিকে আবার পাঁচশ টাকার নোটটা বাড়াল, "কাকু এই নিন। একেবারে খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত দেখে আসব আমরা।"

শচীকান্ত নিজেকে গুটিয়ে নিলেন, "না, না।"

"ইতস্তত করবেন না কাকু। আপনার ফিজ় আপনি নিন। এটা তো আমার টাকা নয়। আবেলেরই টাকা। আমার কাছে কিছুক্ষণ ছিল এই যা।"

একটু দম নিয়ে শচীকান্ত বললেন, "তোমাকে একটা কথা বলব মা? তুমি যত অকপটে তোমার পেশা বলতে পেরেছ, আমি সেই সাহসটা দেখাতে পারিনি। আমি কোনও পেশাদার গাইড নই। একটা বেসরকারি কারখানায় সামান্য একজন কেরানির কাজ করতাম। রোজ গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতায় চাকরি করতে আসতাম। সেই সূত্রেই গঙ্গার দূষণ নিয়ে একটা বই লিখে খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। বিপদের ভয় আমাকে ভিতরে-ভিতরে এতটাই গ্রাস করে নিয়েছিল যে, আমি দু'চোখ মেলে গঙ্গাকে দেখতেও ভয় পেতাম। গঙ্গা আমার কাছে একটা আতঙ্ক হয়ে উঠেছিল। কলকাতার গঙ্গার ঘাটগুলো সংস্কার করে এত সুন্দর হয়ে উঠেছে জানতাম না। যাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম পাঁচশো টাকার একটা কাজ নিয়ে তার ঘাটগুলোতে দাঁড়িয়ে মুক্তি খুঁজে পাচ্ছি। আরও একটা পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে আমার পাপের বোঝা বাড়িও না।"

শচীকান্ত দম নিতে থামলেন। সকাল থেকে আবেল শচীকান্তকে চিনেছে অল্প কথার মানুষ হিসাবে। বাংলায় মিতালিকে বলা শচীকান্তর কথাগুলো আবার বুঝতে না পেরে বলল, "কোনও সমস্যা হয়েছে কি?"

মিতালি এক গাল হেসে উঠে বলল, "কোনও সমস্যা নয়। আমরা দু'জন আমাদের পেশার বাইরে বেরিয়ে এসেছি। বড়বাজার স্টেশন এলে আমরা নামব। আচ্ছা কাকু, হাওড়া ব্রিজের তলায় কোন ঘাটে ফুলের বাজার বসে?"

"মল্লিক ঘাটের কথা বলছো বোধহয়। তবে ফুলের বাজার দেখতে গেলে ভোরে আসতে হয়।"

"তা হোক। কিছু তো থাকবে। তাই আবেলকে দেখাব, শুধু ওদের দেশটাই ফুলের দেশ নয়, আমাদের দেশেও কত সুন্দর-সুন্দর ফুল ফোটে। কিন্তু কাকু, খিদে পেয়ে গিয়েছে। ঘাট দেখার আগে খেয়ে নেব। আজ কিন্তু আপনাদের দু'জনকে আমি খাওয়াব। আবেলের টাকায় নয়। আমার টাকায়। আপনারা কিন্তু আর একদম 'না' বলবেন না। বললেও আমি শুনব না।"

আবেল বলল, "তুমি খাওয়াবে। আর ফিরতি খাওয়া আমি খাওয়াব তুমি যখন আমস্টারডামে আসবে।"

"ঠাট্টা করছ?"

"মোটেই না। আমিও কোনও বড়লোক নই। দেখতেই পাচ্ছ, কতটুকু পয়সা জমিয়ে আমি এখানে এসেছি। তবে হ্যাঁ, কলেজের প্রোগ্রামে আসার জন্য যাতায়াতের টিকিটের টাকা লাগেনি।"

"আমি কলেজেও পড়ি না আর তোমার বান্ধবীর মতো পার্ক স্ট্রিটের দামী হোটেলে খাওয়াতে পারব না কিন্তু।"

"পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে কী পাওয়া যায় জানি না। কিন্তু সাধারণ ভারতীয়রা প্রতিদিন যে খাবার খায় সেই খাবার কেমন জানার ইচ্ছে আছে।"

"তুমি জানো কোনও খাবারের নাম?"

"জানি তো। ভাত, ডাল, ফুলোরি, লিট্টি, চাটনি, ছাতু।"

মিতালি খিলখিল করে হেসে উঠল, "উফ! কী কম্বিনেশন! ভাত ডালের সঙ্গে ফুলুরি, লিট্টি, ছাতু। শোনও আমরা বাঙালিরা ওরকম খাই না। ভাত ডালের সঙ্গে তরকারি, মাছ খাই।"

গল্প করতে-করতে চলে এল বড়বাজার স্টেশন।

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে সপ্তদশ কিস্তি

তোমাকে কী বলেছিলাম প্রিয়তমা, এরকম একমাত্র বোধহয় ফুলমতীমাঈয়ের দেশেই সম্ভব। ঠাকুরমা আমাকে গঙ্গার কথা এভাবেই বলত। বলত সেখানে ম্যাজিক হয়। কী ম্যাজিক বুঝতে পারতাম না। ঠাকুরমার কাছে জানতে চাইতাম। ঠাকুরমা বলত গঙ্গার জল না ছুঁলে সেটা বোঝা যায় না। ফুলমতীমাঈ গঙ্গার জল ছুঁয়ে সেই ম্যাজিক আমদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আমি চিরকাল অগমেন্টেড রিয়্যালিটিতে ফুলমতীমাঈকে পেতে চেয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, সকালবেলায় গঙ্গার ঘাটে জল ছুঁয়ে যখন আমার ঠাকুরমার বলা গল্পের এক-একটা শব্দ স্পর্শ করেছি, তখন আমার মনে হয়েছে অগমেন্টেড রিয়্যালিটি থেকে বেরিয়ে এসে এবার আমি সত্যি ফুলমতীমাঈকে খুঁজে পাব। মিতালি আর শচীবাবু যখন তাদের পেশার খোলস ছেড়ে মুক্তির পোশাকগুলো পরে

নিলেন, আমার মনে হল আমি সেই সত্যির আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছি। আমার শেষ গন্তব্য মেটিয়াবুরুজের ঘাটে পৌঁছনোর আগে সেই লক্ষ্যে পৌঁছে যাব।

মিতালির একদিনের 'মিতালি' হয়ে থাকার ছুটি আর শচীবাবুর মিথ্যার খোলস ছেড়ে ফেলার মুক্তি আমদের তিনজনকে যেন একটা পরিবার করে দিল। মিতালি আমাদের লাঞ্চ খাওয়াতে চেয়েছিল। রোজ়ির কষ্ট করে উপার্জিত টাকায় লাঞ্চ। আমি 'না' বলিনি।

মিতালি অবশ্য যে জায়গায় খাওয়াতে নিয়ে গেল, শচীবাবুর সন্দেহ ছিল সেই জায়গায় আমি খেতে পারব কিনা। কলকাতায় এগুলোকে 'পাইস হোটেল' বলে। কেতাদুরস্ত তো নয়ই, বরং বেশ অপরিচ্ছন্ন। তবে অসংখ্য মানুষ খাচ্ছেন। আমার একটা কৌতূহল ছিলই, ফুলমতীমাঈয়ের দেশের সাধারণ লোকেরা কী খায় দেখব? মিতালিকে বলেওছিলাম সে কথা। কারণ কলেজের প্রোগ্রামে বা হোটেলে তো সেই খাবার খেতে পারিনি।

খাবার নিশ্চয় খুব সুস্বাদু ছিল। সবাই খাচ্ছিলেনও। আমি অবশ্য খেতে পারিনি আমার খাদ্যাভাসের জন্য। ভাত-ডাল খেয়েছিলাম। আর খানিকটা মাছ। মিতালি নিজের হাতে কাঁটা বেছে দিয়েছিল। শুধু আমাকেই নয়, শচীবাবু কী খাবেন, তারও খুব যত্ন নিচ্ছিল। আমার সবচেয়ে ভালো লাগছিল ওর তৃপ্তি মাখা মুখটা দেখতে।

আসলে মিতালির কাছে আমি প্রতি মুহূর্তে শিখছিলাম। একটা মানুষের মধ্যে থেকে কীভাবে আরেকটা মানুষকে বের করে নিয়ে আসতে হয়, সেটাই শিখছিলাম। এই শেখা তো আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয়, তাই না প্রিয়তমা?

আর বুঝছিলাম, এই একটা মানুষের মধ্যে থেকে আরও মানুষকে বের করে আনতে হলে একটাই জিনিসের দরকার, সাহস। ফুলমতীমাঈয়ের যে সাহসের গল্প রূপকথার মোড়কে মুড়ে ঠাকুরমা আমাকে শুনিয়ে ছোটবেলায় ঘুম পাড়াতেন। সেইভাবে তো ফুলমতীমাঈ আমার কাছে একজন ভার্চুয়াল ঈশ্বরী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেই ভার্চুয়াল ঈশ্বরীর রিয়েল লাইফেও তো সাহস কিছু কম ছিল না।

ফ্লাইট কিছুক্ষণ পরে দুবাইয়ে নামবে। ওখানে ঘন্টা-দুয়েক কাটানোর পর নতুন আরেক উড়ানে আমস্টারডামে। সময় শেষ হয়ে আসছে। তাই যতটা পারি দুবাইয়ে ল্যান্ড করার আগে সূত্র লিখে রাখি। তোমাকে ইতিহাসের গল্পের সেই পাতাটায় নিয়ে যাই, একটা হ্যাপি এন্ডিং পাওয়ার অপেক্ষায় গল্পটা যেখানে থমকে আছে।

॥ ১৭ ॥

হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ নিজের আর বুগার্ডের খেতের সীমানায় ঘোড়ার পিঠে বসে নিয়মিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে খেয়াল করেন আলডার্টকে কোথাও দেখা যাচ্ছে কিনা। যখন এই আখ খেতগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল তখন বরং আলডার্টকে চিন্তিত মুখে ঘোড়ার পিঠে প্রাত্যহিক ভ্রমণ করতে দেখা যেত। এখন ভারতীয় কুলিরা আখ চাষে আবার সেই পুরনো দিন ফিরিয়ে আনছে কিন্তু বুগার্ডকে দেখা যায় না। হেনড্রিক মনে-মনে হাসলেন। মেয়ে পালিয়ে গিয়ে মুখ পুড়েছে বুড়োর। অথচ ভাব দেখায়, বাড়িতে সুন্দরী যুবতী বউ আর বৃদ্ধ বয়সের ছেলেকে নিয়ে খুব সুখে আছে।

এই নিয়ে যে বিস্তর মুখরোচক কথা হয় অন্য প্ল্যানটেশন মালিকদের মধ্যে সেটা হেনড্রিকের কানেও আসে। মুখরোচক পরচর্চায় মার্কাস আর এমিলি দু'জনেই আছে যে। তবে হেনড্রিক সুযোগ পেলেই বলে দেন, মার্কাস আর এমিলি কখনওই এক নয়। মার্কাসকে উনি বাড়ি থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছেন আর এমিলি বাপের মুখে চুনকালি দিয়ে বেশ্যা হওয়ার জন্য বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।

হেনড্রিক জানেন ক্ষমতাশালী থাকার অন্যতম শর্ত হচ্ছে গোপন খবর রাখার। ক্ষুরধার বুদ্ধিতে তার একটা সুচারু ব্যবস্থা করেছেন। মার্কাস যেই গিলবার্ট ডি জং এর মাধ্যমে কুলির মেয়েটাকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল, রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ হেনড্রিক জানতেন মেয়েটা বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসবেই। আর সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসবে খবর। রামাশীষের মত মূর্খ বোকাসোকা লোকের কাছ থেকে সেই খবর বের করে নিতে কোনও অসুবিধা হবে না।

সেরকমই বেশ কিছু খবর জোগাড় হয়ে গিয়েছে। এবার নির্বুদ্ধি আলডার্টের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার সময় হয়েছে। আর সেটা কখনই বুগার্ড বাংলোয় নয়। এই কথা বলার জন্য নিভৃত প্রান্তর দরকার। নিজের আর বুগার্ডের খেতের সীমানা ছাড়া সেরকম নিভৃত প্রান্তর আর কোথায় আছে? হেনড্রিক তাই রোজ খেয়াল রাখেন কবে আলডার্ট বুগার্ডকে দেখা যায়।

অবশেষে আজ এল সেই দিন। আলডার্ট বুগার্ডকে দেখা গেল মাথা ঝুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে দুলকি চালে চলেছেন। ঘোড়ার পেটের কাছে হোলস্টারে বেঁধে ঝুলছে আলডার্টের বন্দুকটা। বন্দুক দেখে এক মুহূর্ত ভেবে হেনড্রিকও ঘোড়াটা নিয়ে গেলেন ওই দিকে। ঘোড়াদুটো কাছাকাছি আসতেই হেনড্রিক হাত তুলে বললেন, "গুড মর্নিং মিস্টার বুগার্ড।"

আলডার্ট অন্যমনস্ক ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, "ও তুমি! গুড মর্নিং।"

"আপনার আখের খেত তো দেখছি পুরো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।"

"তোমারও তো তাই।"

"জুলিয়েন কত বড় হলো?"

"হামাগুড়ি দিতে শিখেছে।"

"খুব ভাল, খুব ভাল। তবে খবর রেখেছেন কী, জুলিয়েন হাঁটতে শেখার আগে আপনি দাদু হয়ে যাবেন?"

আলডার্ট ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, "তাতে তোমার কী অসুবিধে হবে?"

হেনড্রিক মনে-মনে হেসে বললেন, "আমার শুধু একটাই চিন্তা মিস্টার বুগার্ড। আমার কুলাঙ্গার ভাইপো কুলিদের জন্য যা মাতামাতি করছে আর তাতে অন্য প্ল্যানটেশন মালিকরা দিনে-দিনে যেরকম সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছে, জুলিয়েন যেদিন ঘোড়ায় চড়া শিখবে সেদিন কোথায় সে ঘোড়া ছোটাবে?"

"কী বলতে চাইছ তুমি?"

"মার্কাস এখন কী করছেন জানেন? আমাদের চিনির বাজার দর পড়ে গেলে আমরা যে চুক্তির পারিশ্রমিক কমিয়ে দিই, সেটা যাতে না হয় তার জন্য কুলিদের খেপাচ্ছে। কাজভিত্তিক যে সাপ্তাহিক লক্ষ্যমাত্রা আমার ঠিক করে দিই সেটা যথেষ্ট মানবিক নয় বোঝাচ্ছে ওদের। এমনকী কেউ শাস্তি পেয়ে জেলে গেলে, জেলে কাটানোর দিনগুলো যে পাঁচ বছরের অতিরিক্ত গুণতে হবে চুক্তির এই ধারাতেও ও আপত্তি জানিয়েছে।"

আলডার্ট তির্যক হাসলেন, "কী বলতে চাইছ তুমি, ভারতীয় কুলিরা সবে এল। এসেই বিদ্রোহ করবে?"

"অসম্ভব নয় যদি তাদের সেই রাস্তা আমরা দেখাই।"

আলডার্ট মাথা নাড়লেন, "না হেনড্রিক। ওদের চেহারা নিগারদের মতো নয়।"

"আপনি খবর রাখেন না মিস্টার বুগার্ড। ওরা সাংঘাতিক। কিছু বছর আগে ভারতবর্ষে সিপাহি বিদ্রোহ করে ব্রিটিশদের টলিয়ে দিয়েছিল।"

আলডার্ট এবার চিন্তিত হলেন, "তাহলে উপায়?"

"অঙ্কুরে বিনাশ।"

"মানে?"

"মিস্টার বুগার্ড, স্বীকার করে নিচ্ছি আপনাদের পরিবারের সঙ্গে আমদের পরিবারের শত্রুতা অনেক পুরনো। কিন্তু যখন-যখন এই দেশে সংকট এসেছে, আমরা এক হয়েছি। ক্রীতদাসদের যখন বেঞ্জামিন আর সোফিয়া খেপিয়ে তুলতে গিয়েছিল তখন দেশের স্বার্থে আপনি আর আমি এক হয়েছিলাম।"

"তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল হেনড্রিক, এই প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোনদিন আলোচনা করব না।"

"কথা হয়েছিল মিস্টার বুগার্ড। সেই কথা আমি এতদিন রেখেছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আবার বদলাচ্ছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আসুন। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমরা একটু আলোচনা করি। জানেন তো, ক্যালক্যাটা থেকে আরও জাহাজ-জাহাজ ভর্তি কুলি আসছে। আমার আমাদের জমিতে কী চাই? বিদ্রোহের আগুন না হীরের মতো চিনির দানা?"

হেনড্রিকের আহ্বান ফেলতে পারলেন না আলডার্ট বুগার্ড। হেনড্রিক যেটা বলছে সেটা ভাববার মতোই। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এলেন আলডার্ট। হেনড্রিক মনে-মনে মুচকি হেসে বলতে শুরু করলেন, "ধন্যবাদ মিস্টার বুগার্ড। দেখুন কিছুদিন ধরেই আমি একটা কথা ভাবছি। নিজের রক্তের সম্পর্ক যখন শত্রু হয়ে আমারই বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করছে তখন আর আপনার সঙ্গে শত্রুতা রেখে কী লাভ? জানেন তো আমার আর কেউ নেই। মরার আগে এই ভ্যান ডার বার্গ আর বুগার্ডের খেতের সীমানা আমি মুছে দিয়ে যেতে চাই।"

আলডার্ট কিছু বুঝে উঠতে না পেরে বললেন, "মানে?"

"মানে আমার মৃত্যুর পরে আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি জুলিয়েনকে দিয়ে যেতে চাই।"

"তুমি কি মসকরা করার জন্য এসব বলছো? জুলিয়েনকে তুমি সব সম্পত্তি দিয়ে যাবে কেন?"

"কারণ, সেটাই হবে মার্কাসকে দেওয়া উচিত শিক্ষা। যে জানে তার বাবা-মাকে যে পরিবার মেরে দিয়েছিল, ভ্যান ডার বার্গ পরিবারের সব খেত খামার চিনির ব্যবসা সেই পরিবারের হাতে চলে গিয়েছে। কুলাঙ্গারটা অসহায় হয়ে শুধু দেখবে, কিচ্ছু করতে পারবে না। সেদিন কবরে শুয়ে আমার আত্মা শান্তি পাবে।"

"কিন্তু মার্কাস তো তোমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে, যদি মামলায় জিতে যায়?"

হো হো করে হেসে উঠলেন হেনড্রিক, "পেটে খিল ধরিয়ে দিলেন মিস্টার বুগার্ড। আরে বাবা মার্কাসের যদি অত ক্ষমতা থাকত, তাহলে ভ্যান ডার বার্গ বাংলোর অর্ধেক অংশে আপনার মেয়ের সঙ্গে সুখের সংসার করত। আমার নামে পুরো সম্পত্তির দলিল আছে। কোনদিন তো আসেননি ভ্যান ডার বার্গ বাংলোয়। আসুন না কাল সন্ধেতে। উৎকৃষ্ট পানীয় ভ্যান ডার বার্গ বাংলোতেও আছে।"

কথার জাদুতে আলডার্টকে মোহাচ্ছন্ন করে রাজি করিয়ে ফেললেন হেনড্রিক। আলডার্ট বুগার্ড একটা নতুন স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ঘোড়ায় উঠে বললেন, "ঠিক আছে চলি। কাল সন্ধেয় তাহলে তোমার বাংলোয় যাচ্ছি।"

"আমার সৌভাগ্য মিস্টার বুগার্ড। তবে আপনাকে একটা কথা বলি। এসব কথা আর কাউকে বলবেন না। একদম একা আসবেন। শুনেছি সুন্দরী স্ত্রীদের একটা দুর্বলতা থাকে। স্বামীর মুখে কোনও কথা শুনলে সেটা আর পেটে ধরে রাখতে পারে না।"

আলডার্ট বুগার্ড পৃথিবীর সেরা বোকা হাসি হেসে বললেন, "নিশ্চিন্ত থাকো হেনড্রিক।"

পরেরদিন সন্ধেয় যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করে সবার অলক্ষ্যে আলডার্ট বুগার্ড ভ্যান ডার বার্গ বাংলোতে এসে পৌঁছলেন। হেনড্রিক উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন, "আসুন, আসুন।"

হেনড্রিক নিজে হাতে বুগার্ডকে পানীয় পরিবেশন করে নানা গল্প করতে থাকলেন। মদের বোতল খালি হতে থাকল। নেশাটা বেশ গাঢ় হওয়ার পর আলডার্ট জড়ানো গলায় বললেন, "কই, তুমি দলিলগুলো দেখাবে বলছিলে।"

হেনড্রিক বোতলটা উপুড় করে আলডার্টের পাত্রে আরও পানীয় ঢালতে-ঢালতে বললেন, "তাড়া কী মিস্টার বুগার্ড। বেশি রাত্রি হয়নি। রাতের খাবার খেয়ে যান।"

"নাঃ! ডিনার আর করব না। বেশ কড়া পানীয় খাইয়েছ তুমি। এবার দলিলগুলো দেখাও।"

"আপনার বোধহয় নেশা হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় কী আপনি খুঁটিয়ে দলিলগুলো দেখতে পারবেন? তা ছাড়া আপনার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনাও আছে। আমি না হয় দলিলগুলো নিয়ে কাল আপনার বাংলোয় যাব।"

নেশার ঘোরেও আলডার্টের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল, "কিন্তু তুমি তো বলেছিলে ব্যাপারটা গোপনীয় রাখতে। সুন্দরী স্ত্রীদের প্রধান দুর্বলতা স্বামীর মুখে কোনও কথা শুনলে সেটা আর পেটে ধরে রাখতে পারে না।"

হেনড্রিক হাসলেন, "আমি চিরকুমার। স্ত্রী চরিত্র আর কী বুঝি? কাল কী বলতে কী বলে ফেলেছিলাম। গোটা রাত পড়ে আছে মিস্টার বুগার্ড। আপনার পৌরুষত্ব দিয়ে নিশ্চয়ই আপনার সুন্দরী স্ত্রীকে সব বোঝাতে পারবেন আর রাত করবেন না। কাল সকালে আমি পৌঁছে যাব।"

আলডার্ট টলত- টলতে উঠে দাঁড়ালেন। হেনড্রিক চিন্তিত গলায় বললেন, "দাঁড়ান এই অবস্থায় একা যাবেন না। আমি লোক দিচ্ছি।"

"জন্তু জানোয়ারের ভয় দেখাচ্ছ? আমার কাছে বন্দুক আছে। আমার নিশানা অব্যর্থ, তুমি দেখেছ।"

"ঠিক-ঠিক। তবু আপনার সঙ্গে লোক থাকুক।"

হেনড্রিক গলা ছেড়ে ডাকলেন, "রামাশীষ।"

ভিতর থেকে রামাশীষ বেরিয়ে আসতেই হেনড্রিক নির্দেশ দিলেন আলডার্টের ঘোড়ার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে আলডার্টকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে। আলডার্ট টলমল করে ঘোড়ায় ওঠার সময় খেয়াল করলেন ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা চামড়ার হোলস্টারের মধ্যে বন্দুক নেই।

"আমার বন্দুক কোথায় গেল হেনড্রিক?"

ঘোড়ার পায়ের ওপর দুটো থাপ্পড় মেরে হেনড্রিক বললেন, "চিন্তা করবেন না। কুলি আছে আপনার সঙ্গে।"

হেনড্রিক রামাশীষেকে দেখালেন। তার কোমরে পেঁচিয়ে যে লাল কাপড় বাঁধা আছে সেখানে চকচক করছে আখ কাটার কাস্তে।

পানীয়র নেশা আর হেনড্রিকের দেখানো স্বপ্নের বিভোরে আলডার্ট ফুরফুরে মাথায় এগিয়ে চললেন নিজের বাংলোর দিকে। রাতে জ্যোৎস্নায় অনেকদিন পরে এভাবে আখের খেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। লম্বা-লম্বা আখ গাছগুলোকে মনে হচ্ছে রুপোর লাঠি। ভাবতে থাকলেন এটা এখন কার খেতের ওপর দিয়ে যাচ্ছেন? হেনড্রিকের না নিজের? দূরে ওই কুলির বস্তিটা কার? হেনড্রিকের না নিজের? তারপরে নিজের মনেই হেসে উঠলেন। এসব ভেবে আর কী হবে? ক'দিন পরে এসবই তো হবে জুলিয়েনের।

এমনসময় আখ খেতের ভিতর থেকে একটা বন্দুকের নল বেরিয়ে এসে গর্জে উঠল, গুড়ুম...গুড়ুম...

চমকে উঠে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন আলডার্ট। অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠল শরীরটা। কোমর ভেঙে গেল বোধহয়। আর উঠতে পারছেন না। সেই অবস্থাতে দেখলেন যে কুলিটা সঙ্গে-সঙ্গে আসছিল, সে লুটিয়ে পড়ে আছে। মাথার কাছ থেকে ফিনকি দিয়ে বেরচ্ছে রক্ত। এমন সময় এগিয়ে এল বুট পরা দুটো পা।

আলডার্ট কোনরকমে মুখ তুলে লোকটাকে চিনে ফেলে বললেন, "হেনড্রিক। তোলো আমাকে।"

হেনড্রিক যেন শুনতেই পেলেন না আলডার্টের গলা। লাথি মেরে সোজা করলেন রামাশীষকে। তারপর নিচু হয়ে রামাশীষের কোমর থেকে কাস্তেটা বের করে এগিয়ে আসতে থাকলেন আলডার্টের দিকে।

গুলি চলার আওয়াজ শোনা গেল কুলি কলোনি থেকেও। লালন, মোতি, সুদামার মতো যারা মৌতাত করছিল তারা নেশা ছুটিয়ে মশাল জ্বালিয়ে দৌড়ে এল। তারপর হতভম্ব হয়ে দেখল আখের খেতের একদিকের আলে পড়ে রয়েছে বুগার্ড সাহেব আর রামাশীষের রক্তাক্ত নিথর দেহ। আর একটু দূরে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে ফুলুয়া।

একটু পরে সেখানে চলে এল আরও দু'জন। হেনড্রিক আর

মার্কাস। অনেকদিন পরে কাকা ভাইপো আবার মুখোমুখি।

মার্কাস সরাসরি কাকার কাছে কৈফিয়ত চাইল, "কে খুন করেছে?"

বুগার্ডকে খুন করার রক্তলাগা জামাকাপড় হেনড্রিক দ্রুত পালটে এসেছেন। দু'দুটো মানুষ খুন করার পরও ব্যবহারে কোনও বিকার নেই। শান্ত গলায় উত্তর দিলেন, "আশ্চর্য আমার কাছে কৈফিয়ত চাইছ কেন? খুনের অস্ত্রগুলো তো পড়েই আছে। ওগুলো দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে। বন্দুকের বাঁটে লেখা আছে বুগার্ডের নাম আর বুগার্ডের গলায় কাস্তের কোপ।"

"অসম্ভব, অসম্ভব। দু'জন দু'জনকে খুন করতে পারে না। আর বুগার্ড রামাশীষকে খুন করলেও, রামাশীষ কখনও খুন করতে পারে না। ভীষণ নিরীহ মানুষ রামাশীষ।"

"তাহলে রামাশীষ নয়। এদের মধ্যে কেউ..." হেনড্রিক আঙুলগুলো লালন, মোতিদের দিকে ঘোরাতে-ঘোরাতে ফুলমতীকে দেখিয়ে বললেন, "এমনকী এও হতে পারে।"

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে অষ্টাদশ কিস্তি

দুবাই এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে আছি। চারদিকে শুধু বৈভব আর বৈভব। আর আমি চুপ করে ট্যাবটা নিয়ে বসে আছি। এত বৈভবের মধ্যে আমার গল্পটা বেশ বেমানান, তাই না প্রিয়তমা? এখানে চারদিকে সবাইকে দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে দুঃখ, কষ্ট, অভাব বলে কিছু নেই। সোনা হচ্ছে এমন একটা ধাতু, যা দোকানে হাত বাড়িয়ে চাইলেই যত খুশি পাওয়া যায়। ঘন্টা খানেক পরে আমার ফ্লাইট ছাড়বে। এবার বেশ লম্বা সময়। সাড়ে সাত ঘন্টা। তাই এবার আর কোনও সংশয়ই হচ্ছে না, ফ্লাইটে উঠে একবার ধরে ফেলতে পারলে অবশিষ্ট আর কয়েকটা মাত্র সূত্র ঠিক লিখে ফেলতে পারব।

এতগুলো সূত্র লিখে ফেলার পর চুপ করে ট্যাব কোলে নিয়ে একটাই কথা ভাবছিলাম। টেসেল আইল্যান্ডে নিভৃত সমুদ্রের ধারে তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে তোমাকে আগের সূত্র ধরে গল্প বলা যখন শেষ করব, তখন তোমার চোখের কয়েক ফোঁটা জল চিবুক বয়ে আমার মুখের ওপর ঝরে পড়বেই। ফুলুয়ার ভিনদেশে অনাথ হয়ে যাওয়ার গল্প যে শোনালাম আমি। কিন্তু তোমার চোখের জল মাখার জন্য আমি এই গল্পের অবতারণা করিনি। কলকাতা এয়ারপোর্টে বসে প্রথম সূত্র যখন লিখেছিলাম, তখন মনের মধ্যে একটা গভীর সংশয় ছিল, আমার পারিবারিক জটিল ইতিহাসে এত চক্রান্ত, খুন, হিংসা, অত্যাচার আছে যে সেগুলো গুছিয়ে তোমাকে কীভাবে বলব? মার্কাস আর এমিলির নিটোল প্রেমের গল্পের মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা অবাঞ্ছিত কোডিংয়ের মত হিংসাগুলো তো বাদ দেওয়া যাবে না। টেসেল দ্বীপের নির্জনতম জায়গায় আমি তো তোমাকে একটা রূপকথার মতো প্রেমের গল্প শোনাতে চাই। আমার মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে ইতিহাসের পাতায় না লেখা সেই গল্প যখন চোখ বন্ধ করে শুনবে, তোমার চোখের পাতার পিছনে অগমেন্টেড রিয়্যালিটির মত সেটা স্পষ্ট দেখতে পাবে। কোনও চোখের জল পড়বে না।

সূত্রগুলো লিখতে-লিখতে তোমাকে আমি বারবার অগমেন্টেড রিয়্যালিটির কথা বলে ফেলছি। এতটা পৌঁছে তোমার কাছে একটা কথা স্বীকার করে নিই। সেই অগমেন্টেড রিয়্যালিটির বিশাল ক্যানভাসে যখন আমি আমার ভার্চুয়াল ঈশ্বরীকে দেখতে পাই, তখন আমিও সেই ক্যানভাসে একটা স্থবির চরিত্র হয়ে উঠি। অনেকটা ঠিক স্বপ্নের মত। যেখানে আমি প্রবলভাবে উপস্থিত আবার উপস্থিত নই। অস্তিত্বের সেই সঙ্কটে আমি দেখতে পাই, আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক পাথরমূর্তি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে স্বজনের মৃত্যু মিছিল দেখতেই তার জন্ম। ঈশ্বর তাকে সহ্য করার সর্বোত্তম শক্তি দিয়েছেন। তবে ঈশ্বরও পারফেক্ট মেকানিক নন, পারফেক্ট কোডার নন। চোখের জল, মুখের হাসি, শরীরের মধ্যে এইসব কলকবজা ঈশ্বর ফুলমতীমাঈকে দিতে পারেননি। অনাথ হওয়ার পরে ঈশ্বর অনেক চেষ্টা করেও ফুলমতীমাঈয়ের চোখ থেকে এক ফোঁটা জল ফেলাতে পারেননি।

স্বপ্ন অথবা অগমেন্টেড রিয়্যালিটির এই ক্যানভাসে আমার নিজেরও ভার্চুয়াল হয়ে ফুলমতীমাঈকে জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে করে, "তুমি অনাথ নও মাঈ। এই দ্যাখো, আমি তো আছি তোমার সঙ্গে।"

ঠিক এভাবেই সেদিন ফুলমতীমাঈয়ের পাথর শরীরের কাঁধে হাত রেখেছিল মার্কাস। সেই গল্পও তোমাকে শোনাব কিন্তু তার আগে অন্য গল্পর সূত্রটা এগিয়ে নিয়ে যাই। মন এখন একটু ভারী হয়ে আছে। এই বৈভবের দুনিয়া ছেড়ে ফ্লাইটে উঠে সেই গল্প শুরু করব।

॥ ১৮ ॥

জগন্নাথ ঘাট, মল্লিক ঘাট, আর্মেনিয়ান ঘাট দেখে একটা ট্যাক্সি ধরে চাঁদপাল ঘাটে যখন এসে পৌঁছল আবেল, মিতালি আর শচীকান্ত তখন বেলা প্রায় পৌনে তিনটে।

মিতালি আবেলকে বলল, "এই এতগুলো ঘাট যে দেখলে নামগুলো মনে থাকবে?"

আবেল হাসল, "মনে রাখার কী দরকার? মনে রাখার জন্য গুগল ম্যাপই তো আছে।"

"কিন্তু একটা জিনিস বলো, আমি খেয়াল করে দেখেছি এক-একটা ঘাটে নিয়ে গিয়ে কাকু যখন ডায়েরি খুলে ঘাটের ইতিহাস বলতে চাইছেন, তখন তুমি মন দিয়ে শুনছ না।"

"ইতিহাসও তো গুগল খোঁজ করলেই পাওয়া যায়।"

মিতালি ইয়ার্কি করে বলে উঠল, "দেখেছেন তো কাকু, আপনার ডায়েরি কোনও কাজে দিচ্ছে না।"

শচীকান্তর মুখ একটু ছোট হল। এই কথাটা কাল রাতেও মনে হয়েছিল। আজকাল ইন্টারনেটে তো সবই পাওয়া যায়। আবেলের যে ঘাটের নাম ছাড়া ইতিহাস শোনায় কোনও আগ্রহ নেই, সেটাও অনেকক্ষণ আগে খেয়াল করেছেন। ছেলেটা ওর ট্যাবে ছবি তুলতে ভালোবাসে। আর ঘাটগুলোতে গিয়ে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ গঙ্গাজলে হাত ডুবিয়ে মগ্ন হয়ে যায়।

মিতালির কথা শুনে শচীকান্তর মুখটা যে ছোট হয়ে গিয়েছে সেটা আবেল খেয়াল করে বলল, "তবে শচীবাবু না থাকলে কিন্তু এত সুন্দর করে ঘাটগুলো দেখা হত না। শুধু ঘাট দেখানো নয়, উনি সমানে আমার যত্ন নিয়ে যাচ্ছেন। পিচ্ছিল ঘাটে যাতে আমি পড়ে না যাই।"

প্রশংসা শুনে ঈষৎ লজ্জা পেলেন শচীকান্ত। কথা ঘোরানোর জন্য বললেন, "এটা চাঁদপাল ঘাট। একটু এগোলে আউট্রাম ঘাট তারপর প্রিন্সেপ ঘাট।"

"প্রিন্সেপ ঘাট আমি দেখেছি। কলেজের সিটি টুরে এসেছিলাম।"

"সে তো, এসেছিলে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে। এবার আমার সঙ্গে দেখবে। আমি দেখাব," মিতালি বলতে থাকল, "এখান থেকেও আমরা হেঁটে যাব। তুমি আগে যেমন ভিড়ভাট্টা রাস্তা দেখলে, এখানে তেমন ভিড় নেই। খুব সুন্দর রাস্তা। ইচ্ছে করলে আমরা মিলিনিয়ম পার্কে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েও যেতে পারি।"

আবেল ঘড়ি দেখে বলল, "সব দেখতে কতক্ষণ লাগবে?"

"ঘন্টা খানেক ধরে নাও। তুমি ইচ্ছে করলে আরও বেশিক্ষণও থাকতে পার।"

আবেল একটু উশখুশ করে উঠে ঘড়ি দেখে বলল, "কিন্তু মেটিয়াবুরুজ যেতে পারব তো?"

শচীকান্ত কিছু বলার আগেই মিতালি বলে উঠল, "কেন পারবে না? প্রিন্সেপ ঘাট থেকে আবার আমরা ট্যাক্সি নিয়ে নেব।"

শচীকান্ত চুপ করে থাকলেন। আবেল বলল, "আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে মেটিয়াবুরুজের ঘাটে যাওয়া। এই যে সকাল

থেকে বিভিন্ন ঘাটে গঙ্গার জলে যে শব্দগুলো ধরেছি, সেগুলো দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে আসা।”

মিতালি চোখ ছোট করে বলল, “তুমি মাঝে-মাঝে এমন কথা বলো না, কিছু মানে বুঝতে পারি না। চলো চলো, চট করে আউট্রাম ঘাট দেখে হাঁটতে-হাঁটতে প্রিন্সেপ ঘাটে চলে যাই। আমাকে বিশ্বাস করো, প্রিন্সেপ ঘাট দেখলে তোমার আর কোনও ঘাট দেখার দরকার হবে না।”

“না, মিতালি। আমাকে মেটিয়াবুরুজের একটা ঘাটে যেতেই হবে।”

শচীকান্ত বুঝতে পারছিলেন তিনি ক্রমশ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছেন। মিতালি আবেলের সঙ্গে একান্তে সময় কাটাতে চাইছে। অথচ প্রথম থেকে বুঝেছেন মেটিয়াবুরুজের কোনও একটা ঘাট দেখতে আবেল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যেটুকু বুঝেছেন সেটা হচ্ছে বিচালি ঘাট। বিচালি ঘাটে অবশ্য কখনও যাননি শচীকান্ত। কিন্তু বিচালি ঘাট ছেলেটা দেখার জন্য এত মরিয়া কেন জানার একটা চাপা কৌতুহল তৈরি হয়েছে। শেষমেস একটা সমাধানসূত্র মাথায় আসাতে আমতা-আমতা করে মিতালিকে বললেন, “আমি বলি কী মা, আমরা বরং আগে মেটিয়াবুরুজ ঘুরে আসি। তারপর ফিরতি পথে নাহয় তোমরা প্রিন্সেপ ঘাটে নেমে যেও।”

প্রস্তাবে আবেল তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। অগত্যা মিতালিকেও নিমরাজি হতে হল। মিতালি পকেট থেকে মোবাইল বের করে বলল, “দাঁড়াও। আজকে আরাম করে যাব। অ্যাপ ক্যাব ডাকি। এসি থাকবে। আচ্ছা, লোকেশন কী দেব?”

“আমাকে দাও,” মিতালির হাত থেকে মোবাইল নিয়ে আবেল অ্যাপের ম্যাপে লোকেশন দিল।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মিতালি বলল, “আশ্চর্য! ওদিকে যাওয়ার জন্য একটা ক্যাবও পাচ্ছি না।”

শচীকান্ত বললেন, “তাহলে কী ব্রিগেডে মিটিংয়ের জন্য?”

“হতে পারে,” মিতালি মোবাইলের স্ক্রিনের ওপর থেকে মুখ তুলে বলল, “এরা মওকা বুঝলে কিছুক্ষণ ট্রিপ নেয় না। তারপর ভাড়া বাড়িয়ে দেয়। কাকু, ওইদিকে হলুদ ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, ওদের ধরুন।”

রাস্তার উল্টোদিকে সার দিয়ে দাঁড়ানো হলুদ ট্যাক্সিগুলোকে দেখলেন শচীকান্ত। তারপর কথা বলতে গেলেন। মিতালি হঠাৎ নিজের মনে হেসে উঠল। আবেল ভুরু তুলে বলল, “কী হলো?”

“নাঃ! মাঝে-মাঝে নিজেকেই আজ চিনতে পারছি না। একটা কথা তোমাকে অনেকক্ষণ বলব-বলব ভাবছি। কিন্তু কাকুর সামনে কিছুতেই বলতে পাচ্ছি না।”

“কী কথা?”

“আজকে রাতটা তোমার সঙ্গে থাকতে দেবে? কথা দিচ্ছি, কাল যা করেছি তা করব না।”

“তোমাকেও একটা কথা বলি মিতালি। যে পেশা তুমি বেছে নিয়েছ, সেটা ছেড়ে দিতে পার না?”

মিতালি ম্লান হাসল, “ওই তুমি যেমন সবাইকে সিগারেট, গুটখা, মদ খাওয়া ছেড়ে দিতে বলো? তোমার কী ধারণা শরীর বিক্রির পেশায় কোনও মেয়ে নিজের ইচ্ছেয় আসে? চাকরি কি আমি খুঁজিনি আবেল? একটা নার্সারি স্কুলে ফুলের মতো বাচ্চাদের পড়াতাম। কিন্তু যা মাইনে পেতাম তার সঙ্গে আর আমার বাবার যজমানির টাকায় সংসার চলত না। তারপর অনেক খুঁজেছি, অনেক খুঁজেছি। খুঁজতে-খুঁজতেই আবিষ্কার করলাম এই শহরটার এক আজব গোলকধাঁধার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছি। আমাকে ঘিরে রয়েছে একটা চক্র। সেই চক্র ভেদ করে গোলকধাঁধার বাইরে কীভাবে বেরোতে হবে জানি না।”

মিতালির চোখ ছলছল করে উঠল। একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলল। এমন সময় চিন্তিত মুখে শচীকান্ত ফিরে এসে বললেন, “নাঃ! আজ বোধহয় আর কিছুতেই মেটিয়াবুরুজ যাওয়া সম্ভব নয়।”

“কেন?” একসঙ্গে বলে উঠল মিতালি আর আবেল।

শচীকান্ত বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন, “গার্ডেন রিচ মেটিয়াবুরুজ যেতে হলে এখান থেকে সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড ধরে বাসকিউল ব্রিজ ধরে যেতে হবে...”

“বাসকিউল ব্রিজ কোনটা কাকু?”

“ওই যে ব্রিজটা খিদিরপুর ডকে জাহাজ যাওয়ার জন্য মাঝ থেকে খুলে জাহাজ পার করিয়ে আবার জুড়ে যায়। সেটা আজ দুপুরে খুলে কোনও যান্ত্রিক সমস্যার জন্য আর বন্ধ হচ্ছে না। ফলে ওই রাস্তা বন্ধ। আরও একটা ব্রিজ যেটা বিএনআরের দিকে ছিল সেটাও অনেক দিন ধরে বন্ধ।”

অসহায় গলায় আবেল বলল, “তাহলে অন্য কোনও উপায় নেই শচীবাবু?”

“আছে। অনেক ঘুরে। কিন্তু কোনও ট্যাক্সিওয়ালা রাজি না। ওদিকে তারাতলার ফ্লাইওভারও ভাঙা। আজকেই ব্রিগেডে সমাবেশ। অনেক রাস্তা এখন বন্ধ। খুব ভুল দিনে আমরা বেরিয়েছি।”

আবেল চোখ বন্ধ করে দুটো বুড়ো আঙুল দিয়ে নাকের ওপরটা চিপে বিড়বিড় করে কাতর গলায় বলে উঠল, “এতদূর নিয়ে এসেও তুমি আমাকে পৌঁছতে দিলে না, ফুলমতীমাঈ?”

মিতালি আলতো করে আবেলের পিঠে হাত রেখে বলল, “তোমার ফুলমতীমাঈ কোন দেবতা আমি জানি না। কিন্তু মায়ের যদি ইচ্ছে হয়, তিনি ঠিক ডেকে নেবেন।”

শচীকান্ত এইখান থেকে বিদায় নিলেন। ইউরোপীয় দস্তুর অনুযায়ী আবেল ওঁকে গাইডের বকশিস দিতে চেয়েছিল। কিন্তু উনি কিছুতেই রাজি হননি। এরপর শুধু আবেল আর মিতালি। মিতালির মুখ খুশিতে ভরে উঠল। নাম না জানা বাসকিউল ব্রিজটা যে খুলে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে সেই খুশিতে মনে-মনে অচেনা ফুলমতীমাঈকে প্রণাম জানাল মিতালি।

শেষ কবে এরকম একটা দিন কাটিয়েছে সে? যেখানে কামুক পুরুষের সঙ্গে দর কষাকষি নেই, যেখানে গঙ্গার ধারে পেট ভরে ফুচকা খেয়ে ফাউ দুটো শুকনো ফুচকা খাওয়ার জন্য ছেলেমানুষের মতো বায়না আছে। মিতালি ভেসে যাচ্ছিল আর গঙ্গা পেরিয়ে শহরটাকে গোধূলি আলোয় সাজিয়ে সূর্যটা ক্রমশ পশ্চিমে ঢলে পড়ছিল।

শহরটা ঝলমল করে উঠছে। প্রিন্সেপ ঘাটে মিতালি আবেলকে বলল, “চলো, এবার তোমাকে নৌকোয় চাপাবো। ঘাট থেকে গঙ্গা অনেক দেখেছ, এবার গঙ্গা থেকে ঘাট দেখবে।”

ঘাটের একদিকে বাঁধা আছে কয়েকটা নৌকা। তার একজন মিতালির চেনা। মিতালির সঙ্গে আবেলকে দেখে মাঝি ছোপ ধরা দাঁতে একটা বিচ্ছিরি হেসে বলল, “সাহেব ধরেছিস? আধ ঘন্টা কিন্তু।”

নৌকো মাঝগঙ্গায় নিয়ে এসে মাঝি ছইয়ের ওপর পর্দা ফেলতে যেতেই মিতালি বলল, “দরকার নেই।”

মাঝ গঙ্গায় বাকরুদ্ধ হয়ে বসে রয়েছে আবেল। মিতালি অনেক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে আবেলের মন ভালো করার। কিন্তু সে মন যে কিছুতেই ভালো হচ্ছে না। এতদিনের ইচ্ছে, এত প্রস্তুতি নিয়েও শেষপর্যন্ত মেটিয়াবুরুজে সেই ঘাটটা দেখা হলো না, শুধুমাত্র একটা মিটিং আর একটা ব্রিজের জন্য? কিছুতেই যেন সেটা মেনে নিতে পারছে না আবেল।

“আবেল,” নরম গলায় ডাকল মিতালি।

“হুম।”

“তোমাকে সকালে বলেছিলাম না, রাতের কলকাতা দেখাব। এই দ্যাখো রাতের কলকাতা।”

“হুম, খুব সুন্দর।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিতালি বলল, “তুমি আমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শোবে আবেল?”

আচমকা কথাটা শুনে আবেলের মন কোথায় যেন হারিয়ে গেল। টেসেল আইল্যান্ডে গিয়ে সমুদ্রের ধারে একটা নিভৃত জায়গায় প্রিয়তমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে তাকে গল্প শোনানোর জন্য

অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করে রয়েছে সে। একটা ঘোরের মধ্যে মিতালির কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে বলল, "একটা গল্প শুনবে সোনা?"

আবেলের চুলে বিলি কাটতে-কাটতে মিতালি বলল, "তুমি কাল রাতেও গল্প শোনাতে চেয়েছিলে। মিথ্যে গল্প অনেক শুনেছি, বলেছি। প্লিজ, একটা সত্যি গল্প শোনাও।"

"সত্যি-মিথ্যে জানি না। তবে আমার গল্প, রূপকথার গল্প। সেই গল্পে ইয়া বড়-বড় দুটো দৈত্য একদিন আমদের বাগানে ঢুকে পড়ল। তারপর দুটো বড় বড় মোটা লাঠি দিয়ে বাগানের সব গাছগুলো ভাঙতে-ভাঙতে আমদের বাড়ির দরজার দিকে এগোতে থাকল। এগোতে থাকল।"

"তারপর?"

"দৈত্যদের হাতে ইয়া বড় একটা খাঁচা। সেটায় আমাকে পুরে ধরে নিয়ে যাবে।"

মিতালি নিঃশ্বাস ঘন করে বলল, "তারপর?"

"তারপর যেই না বাড়ির দরজা ভেঙেছে দৈত্যগুলো দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছে..."

মিতালি মুখটা নামিয়ে এনে আবেলের ঠোঁটে চুমু দিয়ে ওকে থামিয়ে বলল, "আজকের রাতটা তোমার সঙ্গে থাকতে দেবে? কথা দিচ্ছি, কাল রাতে যা করেছি তা করব না। তোমার পুরো রূপকথার গল্প অনেক্ষণ ধরে শুনব।"

নৌকো দুলে উঠল। মাঝি ছইয়ের ভিতর উঁকি দিয়ে ছোপ পরা দাঁতগুলো দেখিয়ে বলল, "পাড়ে চলে এসেছে।"

নিউ মোনালিসা হোটেলে মিতালিকে নিয়ে ফিরে এসে রিসেপশনে চাবিটা নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোতেই রিসেপশনের রোগা ছেলেটা মিতালিকে বলল, "এই যে রোজি, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"আজ থাকব এখানে।"

"না, স্যার বারণ করে দিয়েছেন।"

"কেন?"

"কাল রাতের পেমেন্ট ক্লিয়ার করনি এখনও।"

"তোমাকে বলেছি কাল রাতের কথা।"

"আমাকে বলে কিছু হবে না। স্যারকে বোঝাও।"

আবেল ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে বলল, "আপনি কোনও সমস্যার কথা বলছেন কি?"

"হ্যাঁ। আমদের হোটেল পলিসি অনুযায়ী আমরা দালাল, সেলসম্যান, গাইড, রাস্তার মেয়েছেলে কাউকে হোটেলের মধ্যে অ্যালাউ করি না।"

"রাস্তার মেয়েছেলে! আপনি একজন মহিলা সম্পর্কে এরকম অপমানসূচক মন্তব্য করতে পারেন না।"

"আমি শুধু সত্যি আর আমাদের হোটেল পলিসি বলছি স্যার।"

"উনি আমার বন্ধু।"

মিতালি দু'হাত তুলে আবেলকে থামিয়ে বলল, "দাঁড়াও। যে ভাষা ও বোঝে আমাকে সেই ভাষাতেই কথা বলতে দাও।"

মিতালি তারপর পকেট থেকে একটা চুইংগাম বের করে মুখে পুরে শার্টের ওপরের দুটো বোতাম খুলে একটু ঝুঁকে বিভাজিকাটা বিপজ্জনক ভাবে স্পষ্ট করে চুইংগাম একটু বেশি করে চিবোতে-চিবোতে বলল, "হাই! তোমার সমস্যা ঠিক কী হচ্ছে বলো তো?"

রিসেপশনের ছেলেটা চোখ তুলে সোজা বুকের দিকে তাকিয়ে টাইয়ের নট এপাশ-ওপাশ করতে করতে বলল, "স্যার বারণ করে দিয়েছেন। সিকিয়োরিটি। সিকিয়োরিটি।"

"আবেল!"

নিজের নাম শুনে আবেল মুখ ঘুরিয়ে দেখল বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে আছে ঐশী। পাশে কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়।

ঐশী বলার চেষ্টা করল, "ড্যাডি আর আমি তোমাকে ডিনারে..."

মেয়েকে চুপ করিয়ে দিলেন কৌস্তভ। আবেল দু'হাত জড়ো করে মাথা অল্প ঝুঁকিয়ে বলল, "নমস্তে বাপুজি।"

কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় কঠিন মুখে বললেন, "তোমাকে কাল বলেছিলাম আমরা ভারতীয়রা মহাত্মা গাঁধীকে 'বাপুজি' বলি। কারণ যাকে আমরা সবচেয়ে বেশি সম্মান দিই, তাকেই বাপুজি বলি। চল ঐশী।"

গুঁফো কুতকুতে চোখের সিকিয়োরিটির লোকটাও এগিয়ে এল। প্যান্টের ভিতর পুরুষাঙ্গ ক্রমশ শক্ত হচ্ছে। আজ অবশেষে রোজি নামের মেয়েটার গায়ে হাত দিয়ে হোটেলের বাইরে বের করে দেওয়ার অধিকার পেয়েছে।

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে উনবিংশ কিস্তি

গল্প এখানে এভাবে শেষ হয়ে যেতে পারত প্রিয়তমা। কিন্তু ঝুলন্ত সুতোগুলোর মাথায় একটা গিঁট যে রয়ে গিয়েছে। সেটুকু না ছাড়িয়ে শেষ সূত্রটা বের করতে না পারলে যে আমার ভার্চুয়াল ঈশ্বরীর গল্প তোমার কাছে স্পষ্ট হবে না। তাই তোমাকে আরেকবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছেই অগ্রন্থিত ইতিহাসের পাতায়, অনাথ ফুলুয়ার পাশে।

তোমাকে শেষ সূত্রে যেমন জানিয়েছিলাম, সেদিন ফুলমতীমাঈয়ের পাথর শরীরের কাঁধে হাত রেখেছিলেন মার্কাস। মার্কাসের সেই হাতের তালুতে অভিভাবকের উষ্ণতা যতটা ছিল, নিরাপত্তার আশ্বাস ততটা মজবুত ছিল না। কারণ মার্কাস হেনড্রিককে জানতেন। নিজের স্বার্থে দরকার হলে হেনড্রিক ফুলুয়াকে পর্যন্ত খুন করতে কখনও দু'বার ভাববেন না।

পরিস্থিতিটা তখন বেশ অন্যরকম। একজন বিদেশি চুক্তিবদ্ধ কুলি আর একজন ভুমিপুত্র জমিদার, দু'জন একসঙ্গে খুন হয়েছে। যথেষ্ট আলোড়ন হয়েছিল ঘটনায়। রামাশীষের জন্য ভারতীয় কুলিদের বিলাপ, ক্ষোভ, উষ্মা ছিল। কিন্তু আলডার্টের খুন অন্য প্ল্যানটেশন মালিকদের যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন হেনড্রিক। পারস্পরিক দোষারোপের আবহটা জিইয়ে রেখেছিলেন। অবিশ্বাসের আরেকটা বাতাবরণ তৈরি হতে শুরু করেছিল।

এই অবস্থায় হেনড্রিকের সঙ্গে মামলায় মার্কাসের জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। মার্কাসের নিজের কোনও উপার্জন ছিল না। সবটাই ছিল গিলবার্ট ডি জং এর ধারের টাকা। গিলবার্ট ডি জং মার্কাসকে একটা হিসেব করেই ঋণ দিতেন। কোনও না কোনও দিন মার্কাস ভ্যান ডার বার্গ প্ল্যানটেশনের মালিক হবে। তখন যদি ঋণ শোধ করতে না পারে, ভ্যান ডার বার্গ প্ল্যানটেশন শুদ্ধু পুরো চিনির ব্যবসা আস্তে-আস্তে গ্রাস করে নেবেন গিলবার্ট ডি জং। কিন্তু একটার পর একটা মামলায় মার্কাস হারতে থাকায় গিলবার্ট ডি জং মার্কাসের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করলেন।

ফুলমতী আর অন্তঃসত্ত্বা এমিলিকে নিয়ে তখন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ কাটাচ্ছে মার্কাস।

॥ ১৯ ॥

মার্কাস বাড়ি ফিরতে এমিলি চমকে উঠল। মার্কাসের মুখ একদম শুকনো। এমিলি ভীষণ বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

ফুলমতী হাতে জলের গ্লাস নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মার্কাস ঢকঢক করে জল খেয়ে হতাশ হয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "শেষ মামলাতেও হেরে গেলাম।"

"তুমি যে বলেছিলে এই মামলায় অন্তত হারবে না।"

"বলেছিলাম। কিন্তু জানতাম না, চিনির খামারটা পর্যন্ত কাকা নিজের নামে করে রেখেছে। খুব হতাশ লাগছে জানো। বাবা মায়ের আরও একটা স্বপ্ন ছিল, বিদেশ থেকে আসা মানুষগুলো এদেশে একদিন নিজেদের চাষের জমি কেনার অধিকার পাবে। আমি আমার জমি দিয়েই সেই কাজটা শুরু করতে চেয়েছিলাম।"

শুকনো গলায় এমিলি বলল, "এবার কী হবে তাহলে?"

"জানি না। গিলবার্ট ডি জং আজকেই আমাকে নোটিস দিয়ে

দিয়েছে এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার জন্য।"

"কোথায় যাব আমরা? বুগার্ড বাংলোর একটা চাকরের ঘরেও তো আমার জায়গা নেই।"

মার্কাস দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে বলল, "ভাবতে দাও। ভেবে ঠিক কিছু একটা বের করব। এই ওলন্দাজ গায়ানায় সবাই কাকার মতো নয়। অনেক ভালো মনের, উদার মনের প্ল্যানটেশন মালিকেরা আছেন। তারা আমাকে পছন্দ করেন। আমি কুলিদের জন্য যে কাজটা করি পছন্দ করেন। কেউ না কেউ আমাকে ঠিক একটা ম্যানেজারের কাজ দেবেন। সরকারও আমার প্রস্তাবের কথা ভাবছে এখানে আমি কুলিদের বাচ্চাদের জন্য যে স্কুল করার প্রস্তাব দিয়েছি।"

এমিলির উদ্বেগ কিন্তু কাটল না, "কিন্তু কবে মার্কাস?"

"সময় লাগবে।"

"কিন্তু এখন আর শুধু আমাদের দু'জনের কথা ভাবলে চলবে না। যে আসতে চলেছে তার কথাও তো ভাবতে হবে।"

"আমি জানি, জানি... এমিলি," মার্কাস ছটফট করে উঠে এমিলির পেটের ওপর হাত দিয়ে বলল, "ভেবো না আমি পুরো হেরে গিয়েছি। আমি আমস্টারডাম যাব। ন্যায়ের মামলা করব।"

"তাহলে আমরা এখনই যাচ্ছি না কেন?"

"কারণ আমার কাগজপত্র গোছাতে একটু সময় লাগবে। তাছাড়া তুমি এই অবস্থায় জাহাজে করে আমস্টারডাম কীভাবে যাবে?"

"কতদিন লাগবে আমস্টারডামে যেতে?"

"ধরে নাও দু'মাস।"

এমিলির চোখ চকচক করে উঠল, "তাহলে আর দেরি কোরো না। তিন মাস সময় আছে। আমি যে দেশে জন্মেছিলাম সেই দেশেই জন্মাবে আমাদের সন্তান। ওখানের চার্চে আমরা বিয়ে করব। ওখানে মামলায় জিতে আমরা মাথা উঁচু করে ফিরে আসব।"

"কিন্তু তুমি বোঝার চেষ্টা করো এমিলি আমস্টারডামে গিয়েও কিন্তু আমাকে চাকরি খুঁজতে হবে। ততদিন আমরা থাকব কোথায়?"

এমিলি অবুঝ হয়ে বলতে থাকল, "ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুমি আজই খোঁজ করো, আমস্টারডাম যাওয়ার জাহাজ পারামারিবো বন্দরে কবে আসছে।"

"কিন্তু, কিন্তু..." কথা আটকে গেল মার্কাসের। দূরে দরজার পাশে চুপ করে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফুলমতী। মার্কাস আর এমিলির ভাষা বুঝতে পারছে না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যে কিছু নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন বুঝতে পারছে।

মার্কাস বলল, "কিন্তু ফুলমতীর কী হবে?"

"ওকে ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা যেখানেই যাব, আমাদের সবার টিকিট কাটবে তুমি।" এমিলি জোরের সঙ্গে বলল।

"তা নিয়ে আমার মনেও কোনও সংশয় নেই। কিন্তু বিরাট একটা সমস্যা আছে।"

"কিসের সমস্যা?"

মার্কাস উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে-করতে বলল, "ফুলমতীর ব্যাপারটা ভয়ানক জটিল। ফুলমতী ভারত থেকে এসেছে ওর বাবার পরিবারের অংশ হয়ে। ওর বাবা মারা গিয়েছে। ওর বাবার চুক্তি ছিল কাকার সঙ্গে। আমি বলাতে, গিলবার্ট ডি জং বিশেষ অনুমতির ব্যবস্থা করে ওকে এখানে থাকার ব্যবস্থা করেছে। এই অবস্থায় ওকে নিয়ে যেতে গেলে অনেক অনুমতি লাগবে। তারমধ্যে সরকারি অনুমতিও আছে। আর গিলবার্ট ডি জং-এর কোনও সাহায্য এখন আর পাব না।"

"তার মানে, আমরা এখন থেকে চলে গেলে ওকে ফেলেই চলে যেতে হবে?"

মার্কাস অসহায় গলায় বলতে থাকল, "সে ইচ্ছে তো আমার একটুও নেই। তুমি যে একা এই বিষয়টা নিয়ে ভাবছ, তা তো নয়। আমিও অনেক ভেবেছি। কিন্তু কোনও উপায়ই ভেবে পাচ্ছি না। শুধু একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। সেটা যদি ব্যবস্থা করা যায়।"

"কী?"

"ফুলমতী অনাথ। ওর বয়স মাত্র এগারো। ভারতে ওর গ্রামেও কেউ নেই যে ওকে ফেরত পাঠানো যায়। তাই ভাবছিলাম সরকারি দফতরে কথা বলে কোনও কুলি পরিবারকে যদি পাওয়া যায়, যারা তাদের তত্ত্বাবধানে ওকে রাখবে যতদিন না ও সাবালিকা হয়।"

এমিলির মুখ ছোট হল, "তুমি জানো ও আমার কতটা যত্ন নেয়! শুধু আমার নয়, আমার পেটের মধ্যে যে বেড়ে উঠছে তারও। ফুলমতী ওর নাম দিয়েছে, লহু। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, এইটুকু বয়সে গর্ভবতী মায়েদের কীভাবে দেখাশোনা করতে হয়, যত্ন নিতে হয়, ও শিখল কী করে? আমার মাঝে-মাঝে মনে হয় আমার এই অবস্থায় আলমার মতো বয়স্কা যে যত্নটা নিতে পারত, সেই যত্নটা নেওয়ার জন্য ফুলমতীকেই ঈশ্বর পাঠিয়েছেন।"

মার্কাসের আবার চোখ পড়ল ফুলমতীর দিকে। মেয়েটা একইরকমভাবে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। মার্কাস হাতছানি দিয়ে ফুলমতীকে কাছে ডাকল। মার্কাসের আজ প্রথম মনে হল, কিশোরী মেয়েটা নারী হয়ে উঠছে। আলতো করে ফুলমতীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "তোর ব্যবস্থা না করে আমরা কোথাও যাব না রে ফুলুয়া।"

মার্কাসের ভাষা বুঝতে পারল না ফুলমতী। কিন্তু পাথরের মত মেয়েটার চোখগুলো চিকচিক করে উঠল।

এমিলি মার্কাসকে বলল, "শোনও, আমার হঠাৎ করে একটা কথা মনে হলো। বুগার্ড বাংলোয় শেষ ক'টা দিন আমার মনে হয়েছিল আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার সামনে আর কোনও উপায় নেই। কিন্তু আমাকে সাহস জুগিয়েছিল, আলমা। উপায় দেখিয়েছিল।"

"কী উপায়?"

"পালিয়ে যাওয়ার।"

মার্কাস থতমত খেয়ে উঠে বলল, "মানে?"

"আলমা আমাকে যেভাবে তোমার কাছে নিয়ে এসেছিল, সেভাবেই আমরা ফুলমতীকে নিয়ে যাব, লুকিয়ে।"

"না, এমিলি। সেটা বেআইনি। যথেষ্ট ঝুঁকি আছে।"

"কোন আইনের সুবিচার মেয়েটা পেয়েছে, বলতে পার?"

এমিলির কথাটা প্রথমে অবাস্তব মনে হলেও, আস্তে-আস্তে মার্কাসকে ব্যাপারটা ভাবাতে থাকল। আর কোনও উপায়ই ছিল না। এমিলির গর্ভ, গিলবার্ট ডি জং এর তাড়া, নিজের উপার্জনহীনতা মার্কাসকেও ভিতরে-ভিতরে বাধ্য করে তুলল বেপরোয়া হতে। নিজের উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে দ্রুত গুছিয়ে নিতে শুরু করল অ্যামস্টারডামে গিয়ে হেনড্রিকের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা করার কাগজ। নিজের সঞ্চয়ের শেষটুকু উজাড় করে পেয়ে গেল আমস্টারডামগামী এক জাহাজের টিকিট। কাপ্টেন অবশ্য একটাই শর্ত দিল, জাহাজে সে ফুলমতীকে তুলবে, তবে পারামারিবো বন্দর থেকে নয়, বন্দর থেকে খানিকটা দূরে কোথাও এবং অত্যন্ত গোপনে। এবং সেই জায়গায় পৌঁছনোর ব্যবস্থা মার্কাসকে করতে হবে।

সেই ব্যবস্থাটাও মার্কাস করে ফেলল। এক আফ্রিকান রাজি হল ডিঙি নৌকো করে ওদের জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। জায়গা ঠিক হল সেই নির্জন পরিত্যক্ত জেটি, যেখানে মার্কাস আর এমিলির প্রেমের প্রথম সূচনা হয়েছিল।

নতুন জীবনের দিশা দেখতে পেয়ে এমিলি উৎফুল্ল হয়ে উঠে নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু করল। ফুলমতী বুঝতে পারল অজানার উদ্দেশে আরেকবার পাড়ি দিতে হবে। এটাই বোধহয় তার জীবনের ভবিতব্য। সেই কোন ছ'বছর বয়সে মাথায় সিঁদুর লাগিয়ে জন্মভিটে থেকে একটা লোকের হাত ধরে অজানার উদ্দেশে হেঁটেছিল। বাপুর সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে সেই স্বপ্ন চোখে নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে দশ বছর বয়সে এক অজানা শহরের বন্দরে এসেছিল। তারপর জাহাজে চেপে রাশি-রাশি নীল জল পার করে চার মাস ধরে অপেক্ষা করেছিল কবে এক অজানা দেশে নামবে। বছর ঘুরতেই সেই দেশ থেকে আবার এক অজানার উদ্দেশে যেতে

হচ্ছে তাকে।

ফুলমতীর জিনিসপত্র যৎসামান্য। কয়েকটা শাড়ি, চাদর, চিরুনি, রান্না করার হাঁড়ি, খুন্তি, বেলনা-চাকি, তার সঙ্গে আছে বাপুর কয়েকটা স্মৃতিবিজড়িত জিনিস। বাপুর ধুতি, লোটা, কম্বল, আখ কাটার কাস্তে, গামছা। সবকিছু একটা মাত্র পুঁটুলির মধ্যেই ভরে নিতে পারল ফুলমতী।

তারপর এল সেই রাত। মার্কাস ফুলমতীর পিঠে হাত রেখে বলল, "চল।"

দুটো ঘোড়া। একটা ঘোড়ার পিঠে এমিলি। অন্য ঘোড়ার পিঠে ফুলমতীকে সামনে নিয়ে মার্কাস। নিঝুম রাত্রে ওরা এগোতে থাকল সেই নির্জন পরিত্যক্ত জেটির দিকে।

ভোরের আলো সবে ফুটছে। জেটিতে পৌঁছে মার্কাস দেখল ডিঙি নৌকো বাঁধা রয়েছে। আফ্রিকান মানুষটা কথা রেখেছে। নৌকার ওপর অপেক্ষা করছে ওদের গোপনে জাহাজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। পারিশ্রমিক হিসাবে মার্কাস তাকে দিয়ে যাবে ঘোড়াদুটো। মার্কাস ঘোড়া থেকে নেমে ফুলমতী আর এমিলিকে হাত ধরে নামল।

অনেকদিন পরে এই জায়গায় এল এমিলি। ভীষণ প্রিয় একটা জায়গা। কোফি চিনিয়েছিল এই জায়গা। মার্কাসকে প্রথম চুম্বন করেছিল এই জায়গায়। ভোরের কমলা আলোয় মাখা জায়গাটা দেখতে-দেখতে ভিতরটা কীরকম হুহু করে উঠল। যে দেশে থাকাটাই ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল, সেই দেশটা যে এত অদৃশ্য সব শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে কোনওদিন বুঝতে পারেনি। মার্কাসের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল এমিলি।

মার্কাস এমিলির মাথায় পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে সান্ত্বনা দিতে লাগল, "মন খারাপ কোরো না সোনা। আমরা সেই দেশে যাচ্ছি যে দেশে তোমার জন্ম। ওখানে চার্চে আমরা বিয়ে করব। আমাদের সন্তান হবে।"

"না মার্কাস। এই ওলন্দাজ গায়ানাই আমার দেশ। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এই দেশটাই আমি দেখেছি।"

"ঠিক আছে সোনা। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা সবাই আবার একদিন ফিরে আসব এই দেশে।"

"তোমরা কোথাও যাচ্ছ না, কোথাও ফিরে আসছো না।" একটা পরিচিত গলায় হুংকারের আওয়াজ শুনে চমকে উঠে মার্কাস আর এমিলি দেখল কোন এক সময়ে নিঃশব্দে হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ ঘোড়ার পিঠে এসে হাজির হয়েছেন। তার হাতে বন্দুক। সোজা তাক করা আছে ওদের দিকে।

"কাকা...কাকা... দয়া করে শোনও...," মার্কাস বলার চেষ্টা করল।

"কোনও কিছু শোনার দরকার নেই আমার। অকৃতজ্ঞ, বেইমান তুমি। এইজন্য তোমাকে আমি লন্ডনে শিক্ষিত হতে পাঠিয়েছিলাম? যাতে একদিন সুটকেশ ভর্তি কাগজ আমস্টারডামে নিয়ে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে খুন, ষড়যন্ত্র আর সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনতে পারো? কী ভেবেছিলে? এইভাবে কাপুরুষের মতো লুকিয়ে পালিয়ে যাবে আর আমি কিছু জানতে পারব না? এই গায়ানার প্রত্যেকটা গাছের পাতা নড়ারও খবর থাকে আমার কাছে। সঙ্গে আবার আমার একটা কুলির মেয়েকেও বেআইনি ভাবে নিয়ে যাচ্ছ, যাতে ও ওর বাবার খুনের সাক্ষী দিতে পারে? অ্যাই মেয়ে এদিকে আয়। ওই পিছনে গিয়ে দাঁড়া।"

হেনড্রিক বন্দুকের নল ঘুরিয়ে ফুলমতীর দিকে ইশারা করে পিছিয়ে আসতে বললেন। ফুলমতীর ভিতরে একটা কাঁপুনি এল। নিজের চোখে দেখেছে এই লোকটা গুলি করে কোফি বলে লোকটাকে মেরেছিল, এই লোকটা গুলি করে বাপুকে মেরেছিল। এবার ও ভগবানের মতো সাহিব, মেমসাহিবকেও মেরে দেবে। মাথার ওপর থেকে পুঁটলি নামিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে হেনড্রিকের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে আসতে থাকল ফুলমতী।

ঘোড়ার থেকে নেমে বন্দুকটা মার্কাস আর এমিলির দিকে তাক করে জেটির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে হেনড্রিক বলতে থাকলেন, "নৌকোয় তোমার বিশ্বস্ত যে নিগারটা রয়েছে, তাকে নেমে গিয়ে আমার কাজ আর একটু সোজা করে দিতে বল মার্কাস।"

মার্কাস সেটা বলার আগেই বিপদ বুঝে আফ্রিকান মানুষটি নৌকো থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে পালিয়ে গেল। হেনড্রিক এগিয়ে এসে বললেন, "তোমার কাগজ ভরা সুটকেস নামিয়ে রেখে বাধ্য ছেলের মতো তোমার পোষা বেশ্যাকে নিয়ে নৌকোয় উঠে বসো।"

"কাকা... কাকা..."

হেনড্রিকের স্বর আরও কঠিন হল, "নৌকোয় গিয়ে বসো। আমি আর দ্বিতীয়বার বলব না।"

অগত্যা এমিলিকে নিয়ে নৌকোয় উঠতে বাধ্য হল মার্কাস।

পুঁটুলি বুকে নিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে ফুলমতীর হাতে হঠাৎ শক্ত জিনিস ঠেকল। শক্ত করে ধরল জিনিসটা, বাপুর কাস্তে। কাঁপুনি কমতে শুরু করল। মনের মধ্যে জমাট বাঁধা সমস্ত ভয়কে জয় করে বের করে আনল কাস্তেটা। হেনড্রিক বুঝতেও পারলেন না পিছন থেকে কাস্তে হাতে এগিয়ে আসছে ফুলমতী।

বন্দুক দেখিয়ে মার্কাস আর এমিলিকে নৌকোয় উঠতে বাধ্য করে হেনড্রিক আরও এগিয়ে গিয়ে বললেন, "এবার নৌকোর দড়ি খুলে ভাসিয়ে দাও। তারপর আমার বন্দুকের দুটো গুলি তোমাদের পৌঁছে দেবে নরকের ঘাটে..."

পিছন থেকে হেনড্রিকের ঘাড়টা লক্ষ্য করে কাস্তে হাতে লাফিয়ে উঠল ফুলমতী। কিন্তু অপটু হাতে কাস্তের কোপটা ঠিকমতো বসাতে পারল না হেনড্রিকের গলায়। পিছন থেকে আচম্বিত আক্রমণে হেনড্রিক পড়ে গেলেন। এমিলি চিৎকার করে উঠল, "ফুলমতী।"

ফুলমতী হেনড্রিকের শরীরের ওপরে লাফিয়ে উঠে এলোপাথারি কাস্তে চালাতে-চালাতে গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করতে থাকল, "মাঈ ভাগ... মাঈ ভাগ... বাপু ভাগ... বাপু ভাগ... লহু ভাগ... লহু ভাগ..."

একটা কোপ পড়ল হেনড্রিকের গলার পাশে। মুখ রক্তে ভরে উঠল। এত রক্ত এমিলি সহ্য করতে না পেরে চোখ কুঁচকে বন্ধ করে মার্কাসের বুকে মুখ গুঁজল। নৌকোর দাঁড় দিয়ে পাড় ঠেলে নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে দাঁড় টানতে থাকল মার্কাস।

ফুলমতীর শক্তি ক্রমশ কমে আসছে। অসহ্য যন্ত্রণায় হেনড্রিক ছটফট করতে-করতে পেয়ে গেলেন হাত থেকে ছিটকে পড়ে যাওয়া বন্দুকটা। কুলি মেয়েটার হাত থেকেও অস্ত্র পড়ে গিয়েছে। সারা শাড়িতে রক্তের দাগ মেখে মেয়েটা চোখে আগুন নিয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে খাবি খাচ্ছে। কোনরকমে নিজেকে একটু উঠিয়ে বন্দুকটা মেয়েটার দিকে তাক করলেন হেনড্রিক। তারপর ট্রিগারের ওপর আঙুল ভাঁজ করলেন।

'গুডুম! গুডুম!'

গাছের পাখিগুলো ঝটপট করে উড়ে পালাতে থাকল। ঘোড়াগুলো ডেকে উঠে উদভ্রান্তর মতো দৌড়তে থাকল। মার্কাস এমিলির কাঁধে মুখ লুকিয়ে ডুকরে উঠল।

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে বিংশ কিস্তি

প্রিয়তমা, শেষ সূত্রটা লেখার পর অনেক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। আমি চোখ বন্ধ করলেই শুনতে পাই ফুলমতীমাঈয়ের গলা, ভাগ... ভাগ... ভাগ...। হেনড্রিকের বন্দুকের আওয়াজ গুডুম, গুডুম। বারুদের গন্ধ। রক্তের গন্ধ। পাখির ঝটপটানি। ঘোড়ার আওয়াজ।

এই শব্দ, গন্ধ কোনটাই ইতিহাসের পাতায় গ্রন্থিত নেই প্রিয়তমা। চরিত্রগুলোকে বন্ধ চোখের পিছনে যা দেখি সবটাই অগমেন্টেড রিয়্যালিটি। টেসেল আইল্যান্ডে সমুদ্রের ধারে নিভৃত সেই জায়গাটায় তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে এই অগমেন্টেড রিয়্যালিটির গল্পটা যখন এখানে শেষ করে আনব, তুমি তারপর আমাকে কী বলবে প্রিয়তমা? চলো, লাইট হাউসের আলো জ্বলে উঠেছে। শেষ জাহাজ ফিরে যাবে। নাকি জিজ্ঞেস করবে, ফুলমতীমাঈ কি তোমাদের

পরিবারে কোনও মিথ? না রিয়্যালিটিতে তিনি সত্যিই ছিলেন?

রিয়্যালিটি তো আছে প্রিয়তমা। আমাদের রটারডামের ছোট্ট বাড়িটার বসার ঘরে ফায়ার প্লেসের ওপর বড় অয়েল পেন্টিংটা এক সুপুরুষ যুবকের। বেঞ্জামিন জুনিয়র ভ্যান ডার বার্গ-এর। আমার ঠাকুরমার দাদু। ঠাকুরমা বলতেন আমি নাকি বড় হয়ে ঠিক ওঁর মতো দেখতে হব। অয়েল পেন্টিংয়ের নীচে ওঁর জন্ম লেখা আছে ১৭ই এপ্রিল ১৮৭৬। বাবা-মায়ের নাম মার্কাস ভ্যান ডার বার্গ আর এমিলি ভ্যান ডার বার্গ। তাঁর রক্তই বইছে আমার শরীরে। জানি না, মার্কাস আর এমিলি কোনওদিন আমার ঠাকুরমার দাদুকে লহু বলে ডেকেছেন কিনা।

ফুলমতীমাঈ কি সত্যিই ছিলেন? আর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কিফল এয়ারপোর্টে ফ্লাইট নামবে। তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি হয়তো তার আগেই দিতে পারব। তার ভূমিকায় ভারতের মাটিতে আমার শেষ সকাল কাটানো নিয়ে কয়েকটা কথা বলে নিই।

॥ ২০ ॥

গভীর রাতে মিতালি বাথরুম থেকে শাড়ি পরে বেরিয়ে এসে হাতে নতুন কাচের রেশমি চুড়িগুলো বাজিয়ে- বাজিয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে-দেখাতে আবেলকে জিজ্ঞেস করল, "দ্যাখো, আমাকে কীরকম দেখতে লাগছে?"

আবেল মিতালিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে বলল, "অপূর্ব।"

"সত্যি বলছ?"

আবেল হাসল, "আমি মন রাখার জন্য কখনও মিথ্যে বলিনি রোজ়ি।"

"আঃ! মিতালি বলো, মিতালি।"

"সরি। সরি। মিতালি।"

মিতালি আবেলের সামনে এগিয়ে এসে বলল, "জীবনে কেউ প্রথমবার ভালোবেসে আমাকে একটা উপহার দিল। বিশ্বাস করো, ছোটবেলা থেকে একটা লজেন্সও কেউ কোনদিন আমাকে উপহার দেয়নি। আমি তোমার কাছে একটা রাত উপহার চেয়েছিলাম। তুমি আমার শেষ একটা আবদার পূর্ণ করে দেবে? আর তো কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।"

"কেন হবে না? তুমি আমস্টারডামে আসবে না? তোমাকে বলেছি না, সাইকেলে তোমাকে বসিয়ে গোটা শহর ঘুরিয়ে দেখাব। কত মিউজিয়ম, কত ছবি, কত ফুল, কত রোম্যান্টিক জায়গা।"

মিতালি ম্লান হাসল, "নাঃ! সে সৌভাগ্য আমার হবে না। তারচেয়ে প্লিজ আমার আবদার পূর্ণ করে দাও।"

"আচ্ছা, কী বলো?"

"তুমি নিজে হাতে আমার এই শাড়ি খুলে আমাকে একটু আদর করে দাও।"

আবেল থমকে গিয়ে বলল, "মানে?"

"এই হোটেলের বাইরে ল্যাম্পপোস্টের আলোর বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি রোজ শিকার খুঁজি। ছায়াছায়া মানুষগুলো যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, আমি তাদের মুখও দেখতে পাই না। শুরু হয় দর কষাকষি। কোনওদিন তারা জেতে, কোনওদিন আমি। তারপর গন্তব্য হয় একটাই ঠিকানা, বিছানা। তারপর ওরা আমার জামা, প্যান্টস, ব্রা, প্যান্টি পাগলের মত টেনে খুলে ছুঁড়ে ফেলতে চায়। কেউ পরোয়া করে না আমার কালো জামাটার বোতাম পটপট করে ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে। কেউ পরোয়া করে না পরেরদিন সেই বোতামগুলো আবার সেলাই করে না লাগিয়ে নিলে ল্যাম্পপোস্টের আলোর বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি আরেকজন ছায়াছায়া পুরুষমানুষের সঙ্গে দর কষতে পারব না।"

আবেল হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বলল, "আমি সত্যি দুঃখিত রোজ়ি... মিতালি।"

"প্লিজ় আবেল। তোমার কাছে শেষ একটা আবদার করছি। প্লিজ় আবেল তুমি এই শাড়িটা নিজের হাতে খুলে দাও। আবেল, যখন কোনও পুরুষ আমার পোশাকগুলো টেনে হিঁচড়ে খুলে ফেলে আমাকে নগ্ন করেছে, আমি কোনদিন লজ্জা পাইনি। আজ আমি একদিন দেখতে চাই লজ্জা জিনিসটা কেমন? প্লিজ় আবেল। তোমার ফুলমতীমাঈয়ের দিব্যি..."

একটা ঠেলায় ঘুম ভেঙে স্বপ্নটা চুরমার হয়ে গেল মিতালির। রোমশ গায়ে আগুন চোখে চেয়ে আছে খসটে আন্ডারপ্যান্ট পরা নিউ মোনালিসা হোটেলের টাক মাথা ভুঁড়িওয়ালা ম্যানেজার। মিতালি চোখ খুলতেই লোকটা ফেটে পড়ল, "কোথায় গেল তোর শুয়োরের বাচ্চা সাহেবটা?"

দরজার বাইরে ভিতু-ভিতু মুখে দাঁড়িয়ে আছে রিসেপশনের ক্যাবলা কার্তিক।

আচমকা ঘুম ভেঙে প্রশ্ন শুনে আর দরজার মুখে ছেলেটাকে দেখে থতমত খেয়ে গেল মিতালি। আবেলের কথা বলছে কি? একটু-একটু করে মনে করার চেষ্টা করল গতরাতের কথা। কালরাত আবেলের সঙ্গে কাটাবে ভেবেছিল। আবেল রাজিও হয়েছিল। তারপর ওই ক্যাবলা কার্তিক ছেলেটা গুঁফো কুতকুতে চোখের সিকিউয়োরিটির লোকটাকে ডেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিল তাকে। মিতালি সেই চেনা ল্যাম্পপোস্টের আলোর বাইরে অন্ধকারে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়েছিল। ভেবেছিল বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু পা বাড়ানোর আগেই আবার সিকিউয়োরিটির লোকটা ফিরে এসে বলেছিল, ম্যানেজার ডাকছে।

তারপর আগের রাতে আবেলের ঘরে থাকার হিস্যা দেওয়া নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক। যে রাতে আবেলের সঙ্গে মিতালি হয়ে থাকতে চেয়েছিল, সেই রাতে বাড়িতে 'আজও শুক্লার বাড়িতে থাকতে হচ্ছে' জানিয়ে ম্যানেজারের খাটে রোজ়ি হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিল।

জিন্স আর কালো জামা পরতে-পরতে মিতালি বলল, "আমি কী করে জানব?"

ম্যানেজার মিতালির কাঁধে জোরে এক ঠেলা দিয়ে বলল, "জানি না মানে?"

টালমাটাল হয়ে নিজেকে সামলে উঠে আবার বলল, "আচ্ছা মুশকিল, আমি কী করে জানব?"

"তুই জানবি না তো কে জানবে? হারামি সিকিউয়োরিটি সবসময় ঘুমচ্ছে। ভোর সাড়ে চারটের সময় গিটারের বাক্স নিয়ে ছেলেটা বেরিয়ে গিয়েছে আর এই হারামি এখন আমাকে সিসিটিভি দেখে জানাচ্ছে।" ম্যানেজারের পুরো রাগটা গিয়ে পড়ল রিসেপশনের ছেলেটার ওপর, "পালাল ছেলেটা। অ্যাডভান্স নিসনি। এবার টাকাটা কে দেবে, তোর বাপ? ক্রেডিট কার্ডে সিকিয়োরিটি নিসনি কেন?"

ছেলেটো আমতা-আমতা করে বলার চেষ্টা করতে থাকল, "স্যার, ক্রেডিট কার্ড ছিল না। ডলার নেব কিনা..."

"এসব আমাকে এখন বলছিস অপদার্থ? আগে বলিসনি কেন? পুরো টাকা তোর মাইনে থেকে কাটব। চল, ওর ঘরে দেখি।"

মিতালির এসব কিছুই কানে ঢুকছিল না। আবেল ভোর সাড়ে চারটের সময় গিটারের বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে এটা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। ছেলেটার সঙ্গে পরশু রাতে, কাল গোটা দিন কাটিয়েছে। ছেলেটা যে গান গায় একবারও গুনগুন করতে শোনেনি। ম্যানেজার আবেলের ঘর দেখতে যেতে পিছন-পিছন মিতালিও গেল। শিউচরণ এগিয়ে এসে মাস্টার কী-দিয়ে ঘর খুলল। ভিতরে আবেলের রুকস্যাক ছাড়া আর কিছু নেই।

ম্যানেজার বলল, "দ্যাখ, দ্যাখ ব্যাগের মধ্যে কি আছে?"

দশ টাকা বকশিস পাওয়ার রাগ শিউচরণ ভোলেনি। টেনে-টেনে বের করতে খাটের ওপর ছুড়ে ফেলতে থাকল আবেলের জিনিস। কয়েকটা জামা, জিনসের প্যান্ট, অন্তর্বাস, কিছু কাগজপত্র, চকোলেট আর চিজ়ের কিউব, শ্যামবাজার থেকে কেনা সস্তা ধুতি, সুতির শাড়ি, কম্বল, লোটা, কাচের চুড়ি।



ধুতি-শাড়িগুলো দেখতে-দেখতে ম্যানেজার বলতে থাকল, "দ্যাখ, দ্যাখ কী বলেছিলাম! সস্তার সব ভুসি মাল। ডলার, পাসপোর্ট, প্লেনের টিকিট, দামি জিনিস কিচ্ছু নেই। সব গিটারের বাক্স ভরে নিয়ে পালিয়েছে..."

শাড়ি, কাচের চুড়িগুলো দেখে মিতালির চোখ ক্রমশ ঝাপসা হতে থাকল। স্বপ্নে নিজেকে এই শাড়ি আর চুড়ি পরতে দেখেছিল কি? মিতালি হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এল। সবে সকাল ফুটছে কলকাতায়। এত সকালে আবেল কোথায় গেল? বলেছিল এয়ারপোর্ট যাওয়ার আগে একটা জাহাজের মিউজিয়মে যাবে। কিন্তু সেটাও তো সকাল দশটায় খোলে। হঠাৎ মাথায় একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। গতকাল বলেছিল মেটিয়াবুরুজের একটা ঘাটে যাবে। কোথায় জায়গা জানা নেই। কিন্তু কাল ওর মোবাইলে অ্যাপ ক্যাব ধরার জন্য লোকেশন দিয়েছিল।

মোবাইলটা বের করে অ্যাপ ক্যাবের আইকনে চাপ দিতেই মেমারিতে স্টোর হয়ে থাকা লোকেশন খুঁজে পেল মিতালি। আর দশ মিনিটের মধ্যে ওর সামনে এসে দাঁড়াল অ্যাপ ক্যাবটা।

একদিকে লম্বা পাঁচিল। তার পাশ দিয়ে একটা ছমছমে নির্জন পথ। মিতালি দম বন্ধ করে পায়ে হাঁটা রাস্তা পেরিয়ে একটা অপূর্ব খোলা প্রান্তরে এসে পড়ল। সকালের শান্ত গঙ্গার ঘাট। নির্জন, কেউ নেই। কী সুন্দর সাজানো ঘাট! ঠান্ডা হাওয়া বইছে। একটা লাল বাঁধানো চত্বরের ওপর সুন্দর একটা ছাউনি দেওয়া বেদি। বেদির ওপর এক জোড়া নারী-পুরুষের মূর্তি। কিন্তু মূর্তিদুটো দেখে চিনে উঠতে পারল না মিতালি। এ কাদের মূর্তি? পুরুষের পরনে খাটো করে পরা ধুতি, মাথায় গামছা বাঁধা। নারীর পরনে আটপৌরে করে পরা মাথায় ঘোমটা দেওয়া শাড়ি।

মূর্তির তলায় ফলক পড়তে থাকল মিতালি। হিন্দিতে লেখা, 'যৌবনকালে বহু ব্যক্তি এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মোকাবিলা করতে, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হয়ে সুরিনামে কাজ করতে যাওয়ার জন্য ভারতের এই ঘাট থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন...'

সুরিনাম ঘাট! কালকে অ্যাপ ক্যাবে এই লোকেশনটাই দিয়েছিল আবেল। শচীবাবু বারবার এটাকে বিচালি ঘাট ভাবছিলেন।

"বাবা-মাঈয়ের মূর্তি," পিছন থেকে কাঁধে একটা হালকা হাতের ছোঁয়া আর পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল মিতালি। না, মিতালির ঘুরে তাকিয়ে দেখার দরকার পড়ল না গলার স্বরটা কার! অস্ফুট গলায় বলল, "সুরিনাম কোন দেশ?"

"আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর পূর্বে ডাচ গায়ানা বলে নেদারল্যান্ডের যে উপনিবেশ ছিল, ১৯৭৫সালে সেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। নাম, সুরিনাম।"

মিতালি ফলক পড়তে থাকল, 'হম উস্‌কে সাহস, দৃঢ় সঙ্কল্প অওর সহনশীলতা কী ভাবনা কা সম্মান অউর অভিনন্দন করতে হ্যায়। জয় হিন্দ!'

আবেলের হাতের ওপর হাত রেখে মিতালি বলল, "তুমি বাবা-মাঈ এর মূর্তি বললে। উনিই কি তাহলে তোমার ফুলমতীমাঈ?"

আবেল আবেগ জড়ানো গলায় বলল, "ফুলমতীমাঈ কেমন দেখতে ছিলেন আমি জানি না। শুধু জানি, এই 'বাবা-মাঈ'-এর মূর্তির মধ্যে কোনও একজন রামাশীষ বা ফুলমতীমাঈ নেই। অনেক-অনেক রামাশীষ, লালন, মোতি, লখন, সুদামা, ফুলমতীমাঈরা রয়েছেন। তারা প্রত্যেকে তাদের লোটা কম্বলের সঙ্গে শুধু অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর সাহসই নিয়ে যাননি, নিয়ে গিয়েছিলেন একটা করে রূপকথার গল্পও। এই ঘাটে তাদের পায়ের পূণ্য পদচিহ্ন আজও আছে।"

"বুঝতে পারলাম না আবেল।"

"কলকাতা থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পাঠানো ৬৩টা জাহাজ

চুক্তি করে শ্রমিকদের নিয়ে গিয়েছিল সুরিনামে। প্রায় ৩৭০০০ শ্রমিক গিয়েছিলেন সুরিনামে। তাদের কেউই প্রায় ফিরে আসেননি। ১৯১৬ সালে মহাত্মা গাঁধী আন্দোলন করে বন্ধ করে দিয়েছিলেন দাসত্বের অন্য নাম দিয়ে এই শ্রমিক রফাতানি। কিন্তু যারা গিয়েছিলেন? অজানা দেশটাকে কেউ-কেউ মানিয়ে নিতে পারেননি। আবার অনেকেই আপন করে নিয়েছিলেন। তারা যে পরিশ্রম করেছিলেন তার ফলে তাদের বংশধররা আজ বর্ধিষ্ণু হয়েছেন। ১৭ লক্ষ সেরকম মানুষ আজ সুরিনামে আছেন যাদের ভাষা ভোজপুরী, কলকাতা যাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক শহর।"

আবেলের কথা শুনে কিছুটা বুঝে, কিছুটা না বুঝে, শ্রদ্ধায় দু'হাত জড়ো করে যুগলমূর্তিকে প্রণাম জানাল মিতালি। তারপর আবেলের দিকে ফিরে বলল, "কিন্তু তুমি ভোরবেলায় গিটার নিয়ে এখানে চলে এলে কেন?"

আবেল হাসল, "একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল জানো। স্বপ্নে দেখলাম ফুলমতীমাঈ কৃষ্ণের ভজন শুনতে আমাকে ডাকছেন। তারপর আমি আর স্থির থাকতে পারিনি। একটা অ্যাপ ক্যাব ধরে সোজা এখানে চলে এসেছি। তখন সবে আলো ফুটছে।"

"আমিও কাল রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি।"

"কী?"

"কিছু না," কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে মিতালি বলল, "খুব খিদে পেয়েছে কিন্তু। চলো আজ ফুলোরি আর চাটনি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করব। তোমার হোটেলের কাছেই একটা জায়গায় ভোরবেলায় গরম-গরম ফুলোরি ভাজে।"

আবেল মিতালির হাত ধরে বলল, "তুমি অ্যামস্টারডামে কবে আসবে?"

"কবে আসব জানি না। তবে আজকে তোমাকে এয়ারপোর্টে সি-অফ করতে যেতে পারি। তারপর ফেরার পথে একটা পয়সা জমানোর মাটির ভাঁড় কিনব। প্রতিদিন একটু-একটু করে পয়সা জমাব। যেদিন ভাঁড় ভরে উঠবে, তোমাকে জানাব।"

আবেল পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে হিসেব করল। হোটেলের খরচ বাদ দিলে কতটুকুই বা আর লাগবে? সকালে মেরিটাইম মিউজিয়মটা দেখা, এয়ারপোর্টে যাওয়ার ট্যাক্সির ভাড়া আর টুকটাক। হিসেব করে সেইটুকু টাকা রেখে দিয়ে বাকি সবটুকু টাকা মিতালির হাতে দিয়ে দিল।

"আরে-আরে আমাকে টাকা দিচ্ছ কেন?"

"তুমি আজ যে পয়সা জমানোর ভাঁড় কিনবে, সেখানে এইটুকুও রেখো।"

আবেল ভ্যান ডার বার্গ-এর ই-ফাইল থেকে শেষ কিস্তি

প্রিয়তমা, তোমার কি মনে আছে তোমাকে প্রথমেই বলেছিলাম, আমার জীবনে তিনটে মাত্র স্বপ্ন। কলকাতার মেটিয়াবুরুজে সুরিনাম ঘাটের মাটিতে চুমু খেয়ে ফুলমতীমাঈয়ের পায়ের ঘ্রাণ পেয়ে, গঙ্গার জলে আঙুল ডুবিয়ে আমার প্রথম স্বপ্নটা পূর্ণ হয়েছে। আর দ্বিতীয় স্বপ্নটা পূর্ণ করতে ভারত থেকে ফিরে আজই আমি টেসেল আইল্যান্ডে সমুদ্রের ধারে সেই নিভৃত জায়গা খুঁজে নিয়েছি যেখানে তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে তোমাকে ফুলমতীমাঈয়ের পুরো গল্প ট্যাবে লিখে আনা সূত্রগুলো ধরে-ধরে শোনাব।

আমার সামনে ছড়িয়ে রেখেছি ফুলমতীমাঈয়ের দেশ থেকে আনা তোমার জন্য শাড়ি আর রেশমি চুড়ি। এনেছি গিটারও। ফুলমতীমাঈয়ের প্রিয় ভজনও তুমি শুনতে চাইলে, শোনাতে পারি। বিশ্বাস করো প্রিয়তমা এইখানে আমি একা আসতে চাইনি। আমি তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। তাই শিফল এয়ারপোর্টে নেমে আমি সোজা গিয়েছিলাম রেড লাইট ডিস্ট্রিক্টে। আমি একটুও ভুল করিনি প্রিয়তমা। অসংখ্য টুরিস্টের ভিড়ে আমি ঠিক চিনে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেই লাল আলো জ্বলা কাচের ঘরটার সামনে। পরদা টানা ছিল তখন। আমি অপেক্ষা করছিলাম। তারপর একসময় পরদা খুলে গেল। দেখলাম ঠিক তোমার মতোই শরীর দুলিয়ে যাচ্ছে অন্য একটা মেয়ে। সেই মেয়েটাকে আমি চিনি না। তার চুল সোনালি। তার চোখে তোমার মায়াবী বিষণ্ণতা নেই। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম ওই কাচের দেওয়ালের সামনে। মেয়েটা আমাকে অনেকবার হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। কিন্তু ও জানে না, ভালোবাসার যে হাতছানি দিয়ে তুমি বহুবার আমাকে ডেকেছ, আমি কোনওদিন তোমার সে ডাকে দরজাটা ঠেলে ঢুকতে পারিনি।

তবুও আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। একটা সময় কে যেন আমার পেছন থেকে কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'বসনিয়ার যে মেয়েটাকে খুঁজছ, সে এখানে আর নেই। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না।'

তোমার যে ঠিকানায় তোমাকে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম, সেখানে তুমি আর নেই আমি ভাবতেই পারছিলাম না। কিন্তু আমি জানি রূপকথা আর না রূপকথার গল্পগুলো শোনার জন্য টেসেল আইল্যান্ডে সমুদ্রের ধারে নিভৃত জায়গাটায় আমার মাথাটা তোমার কোলে তুলে নিতে তুমি আসবেই, আসবে। তাই আমি রেড লাইট ডিসট্রিক্ট থেকে সোজা চলে এসেছিলাম টেসেল আইল্যান্ডে আসার জাহাজ ধরার বন্দরে। অসংখ্য মানুষের ভিড়ের মধ্যে মনেপ্রাণে ডেকেছিলাম আমার ভার্চুয়াল ঈশ্বরী ফুলমতীমাঈকে, যাতে তোমাকে ওখানে ঠিক খুঁজে পাই।

ফুলমতীমাঈ কে? আমাদের পরিবারে কোনও মিথ? না তিনি সত্যিই ছিলেন? এই উত্তরটুকু তোমাকে দেওয়া বাকি আছে প্রিয়তমা। আমাদের পারিবারিক ইতিহাসে হেনড্রিক ভ্যান ডার বার্গ সত্যি। এমিলির আর মার্কাস ভ্যান ডার বার্গ সত্যি। আর তোমাকে আগেই বলেছি, বেঞ্জামিন জুনিয়র ভ্যান ডার বার্গের অয়েল পেন্টিংটা তো আরও বড় সত্যি হয়ে দখল করে রয়েছে আমাদের বাড়ির ফায়ার প্লেসের ওপর। এই সত্যিগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও একটা সত্যি গল্প। দেড়শো বছর আগে মার্কাস আর গর্ভবতী এমিলি ওলন্দাজ গায়ানা থেকে একটা ডিঙি নৌকো করে আমস্টারডাম যাওয়ার জাহাজ ধরতে পেরেছিলেন এগারো বছরের এক অমিতবিক্রম কলকাত্তাইয়া কিশোরী কুলির জন্য। যে কিশোরী তার ফুলের মত প্রাণ দিয়ে সেই ডিঙি নৌকোয় ভ্যান ডার বার্গ বংশের ভবিষ্যৎকালকে জাহাজটার দিকে এগোতে দিয়েছিল।

সেই কিশোরীর নাম কী ছিল? সে কেমন দেখতে ছিল? যতটা গুরুত্ব দিয়ে মার্কাস আর এমিলির প্রেম কাহিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভ্যান ডার বার্গ পরিবারের উত্তরপুরুষের কাছে বয়ে এসেছে, প্রথম কয়েকটা প্রজন্মে ততটা গুরুত্ব দিয়ে সেই কিশোরীর নাম বয়নি। তাই কালের স্রোতে সে নাম হারিয়ে গিয়েছিল। নতুন করে তাকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন আমার ঠাকুরমা। আমার বাবা অনেক চেষ্টা করেছিলেন বিভিন্ন মহাফেজখানার রেকর্ড থেকে তার নাম আর ছবি যদি খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু নামে কি এসে যায় প্রিয়তমা, নামে কি সত্যিই কিছু এসে যায়? ছবিতেও কিছু এসে যায় না। আমার ঠাকুরমা সেই নাম হারিয়ে যাওয়া ফুলের মতো কিশোরীর মিষ্টি একটা নাম দিয়েই দিয়েছিলেন, 'ফুলমতীমাঈ'। আর তার ছবিটা আমি মনের মধ্যে এঁকে নিয়েছিলাম।

সেই ফুলমতীমাঈ, ছোটবেলা থেকে ঠাকুরমার মুখে যার রূপকথার গল্প শুনে-শুনে বড় হয়েছি। এই যে আমার অস্তিত্ব, এই যে বেঞ্জামিন ভ্যান ডার বার্গের রক্ত বইছে আমার ধমনীতে, এটা ফুলমতীমাঈ না থাকলে হতই না। ঠাকুরমা আমার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ফুললমতীমাঈ একজন ঈশ্বরী। উনি আমার অস্তিত্বের হেতু। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে যা চাওয়া যায়, তাই নাকি পাওয়া যায়। আমিও তাই বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি, শিশুবেলায় ইয়া বড় দৈত্য যখন এক হাতে লাঠি আর অন্য হাতে খাঁচা নিয়ে আমাকে ধরতে আসত, তখন ফুলমতীমাঈ রুখে দাঁড়াতেন। ছোটবেলায় ক্লাস ফাইভের অঙ্ক পরীক্ষায় যখন আমি ফুলমতীমাঈয়ের কাছে

প্রার্থনা করে একশতে বিরাশি চাওয়ার পর অষ্টআশি পেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ওই অতিরিক্ত চার নম্বর ফুলমতীমাঈ আমাকে একটু বেশি আদর করে দিয়েছেন। তারপর আরও বড় হয়ে যখন একটু -একটু করে জানতে পারলাম তার রূপকথার জীবন, তিনি হয়ে উঠলেন আমার ভার্চুয়াল ঈশ্বরী।

আজও সেরকম মনে হচ্ছে, আমার ভার্চুয়াল ঈশ্বরী আমার প্রার্থনা শুনবেনই। তুমি আসবে। ওই যে দূরে দেখছি ভেড়ার পাল যাচ্ছে, তাদের মধ্যে থেকে তোমাকে সাইকেলে চড়ে আসতে দেখাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

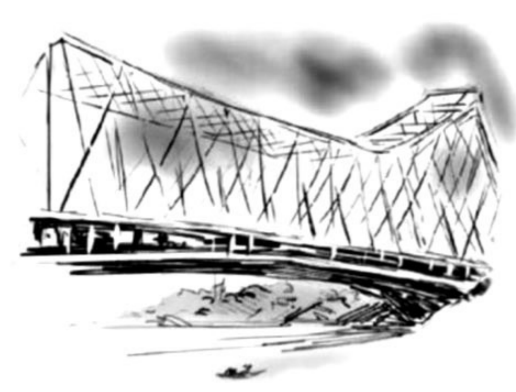
আর সবশেষে আমি আমার তৃতীয় স্বপ্নটা বলি। তৃতীয় স্বপ্ন যা ছিল, ভারতবর্ষ ঘুরে এসে সেই স্বপ্ন পালটে গিয়েছে। আমার তৃতীয় স্বপ্ন ছিল, অসংখ্য ডেটা সংগ্রহ করে আমি ফুলমতীমাঈয়ের একটা ডিজিটাল টুইন বানাব। তিনি থাকবেন আমার অগমেন্টেড রিয়্যালিটির জগতে। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটি ছেড়ে আমার প্লেনটা টেক-অফ করতেই শেষ স্বপ্ন বদলে এক নতুন স্বপ্নের জন্ম দিয়েছে। ক্লাউডে অসংখ্য ডেটা জমিয়ে ফুলমতীমাঈয়ের ডিজিটাল টুইন না বানিয়ে তাঁকে অগমেন্টেড রিয়্যালিটির অলীক দুনিয়ায় বন্দি না করে আমিও মিতালির মতো পিগি ব্যাঙ্কে একটু-একটু করে পয়সা জমাব। তারপর সেই পয়সায় একবার সুরিনামে যাওয়া। আমার পূর্বপুরুষদের দেশটায় গিয়ে পারামারিবো বন্দরের কাছে সুরিনাম নদীর খাঁড়িতে সেই পরিত্যক্ত জেটি খুঁজে বের করে ফুলমতীমাঈয়ের জন্য তার দেশ থেকে নিয়ে আসা গঙ্গাজল আর গঙ্গামাটি রেখে তাঁকে প্রণাম করে আসাই আমার এখন একমাত্র অপূর্ণ স্বপ্ন।

প্রিয়তমা আমি জানি আমার মাথাটা তোমার কোলে নিয়ে এই রূপকথা আর না রূপকথার অগমেন্টেড রিয়্যালিটির গল্পগুলো শুনতে তুমি আসবেই! অপেক্ষায় রয়েছি আমি।

* * *

২৬ শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ এ মেটিয়াবুরুজের সুরিনাম ঘাট থেকে যে ভারতীয়রা লাল্লা রুখ জাহাজে চেপে সুরিনামে পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উপন্যাসে উল্লিখিত ফুলমতী ও অন্যান্য চরিত্ররা এবং ডাচ গায়ানায় উল্লিখিত ওলন্দাজ পরিবারগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

শিল্পী: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য



অনলাইন যোগাযোগের যুগান্তকারী পরিবর্তনে বইয়ের প্রসার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পাঠযজ্ঞে বাংলা বই যেন ব্রাত্য। একদল বাংলা বইপ্রেমী অনলাইন বাংলা বই পঠন-পাঠনে বিপ্লব সাধন করেছে। ২০১২ সালে 'বইয়ের হাট'-এর যাত্রা শুরু। আজ সারা বিশ্বে ১২০,০০০ বইপ্রেমী এর সদস্য। ৬০,০০০-এর বেশি বই অনলাইনে। সেই চমকপ্রদ গল্প শুনুন অন্যতম পরিচালক **এমরান হোসেন রাসেল**-এর কাছে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও

বইয়ের হাট

আমরা বলি 'বই পড়লেই মানুষ মননশীল হয়।' বলা উচিৎ 'মননশীল বই পড়লে মানুষ মননশীল হতে পারে'। বইয়ের হাট হলো এমনই মননশীল বইয়ের আধার। শুধুমাত্র বাংলায় মননশীল বইয়ের আধার।

আজ মানুষ কংক্রিটময় পৃথিবীতে যান্ত্রিকতা, হিংসা, ঈর্ষায়, স্বার্থপরতায় কাতর, জীবন-দর্শন এখন স্বার্থ আর ধর্ষণের প্রবৃত্তির কাছে পর্যুদস্ত, সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রীয় আঙিনা পেরিয়ে গ্রাম্য কুটিরে, ধর্মগুলো আত্মোন্নয়নের খোলস ছেড়ে অপরাধের বর্ম। এমন দুঃসময়ে মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচতে হলে মননশীল হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই।

যখন রাষ্ট্রনায়কের হীন স্বার্থে ফরমায়েশি অছিয়তনামা হয় ইতিহাস, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে বলা হয় উন্নয়ন, কোমলমতি শিশু-কিশোরদের কলহাস্যমুখর কৈশোর ধর্মীয় উন্মাদনায় বা টিকে থাকার অসম প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হয়, প্রকৃতির উদার উপহার সবুজ বনানি কেটে তৈরী হয় পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ঘরের বাইরে বের হলে ঘরে-ফেরা অনিশ্চিত– তখন মানুষকে মানবিক হতে হলে মননশীল হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই।

সাহিত্য মানুষকে ভেতর থেকে গড়ে তোলে, এটাই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য; মানব মনের ভেতরে প্রণোদনার সৃষ্টি করে। 'সবকিছুর পরেও যে জীবন অমূল্য জিনিস'– এই বোধ জন্মাতে, জন্মানো বোধে শান দিতেই সাহিত্য।



এমরান হোসেন (রাসেল) -এর সম্পাদনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভালোবাসা, প্রেম নয়', বেলাল চৌধুরীর 'নিরুদ্দেশ হাওয়ায় হাওয়ায়' বৈদ্যুতিন সংস্করণ ও ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারের আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে।

জগতের ছড়িয়ে থাকা ইন্টারনেট-সেবী বাঙালি আর ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা বাংলা বইয়ের মেলবন্ধন বইয়ের হাট। সাহিত্য নিয়েই বইয়ের হাট-এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড; নির্দিষ্ট করে বললে ভিন্ন-ভাষার সাহিত্য বাংলায় অনূদিত এবং বাংলা-সাহিত্যের আধারই বইয়ের হাট। সাহিত্য বুঝতে হলে বিজ্ঞান, অংক, দর্শন, সংগীত, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, পুরাণ, মিথের উপযোগিতা অপরিহার্য, বইয়ের হাট-এ এসব বিষয়ভিত্তিক বইয়ের চর্চা হলেও সাহিত্যই প্রধান। মূলত বই দেওয়া-নেওয়া দিয়ে শুরু হলেও, বইয়ের হাট এখন সাহিত্য-নির্ভর আরও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত।

ফেসবুকে বাংলা-ভাষী সাহিত্যপ্রেমীদের গ্রুপরূপে বইয়ের হাট-এর পথ চলা শুরু। ২০১২ সালের ২৮সেপ্টেম্বর রিটন খানের হাতে বইয়ের হাট ফেসবুক গ্রুপটির সৃষ্টি। গ্রুপ তৈরি হলো বটে কিন্তু তেমন একটা সক্রিয় হলোনা। ২০১৫ সালের জানুয়ারির দিকে আমার সাধারণ সদস্য হিসেবে বইয়ের হাটে যুক্ত হওয়া। তখন মাত্র ১,০০০ কি ১,২০০ সদস্য নিয়ে গ্রুপ, পরিচালকদের মধ্যে রিটন খান ছাড়া তেমন কেউ সক্রিয় ছিলেন বলে মনে করতে পারি না। সম্ভবত ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের দিকে রিটন খান ছাড়া আগের সব পরিচালক পরিবর্তন হয়ে পল্লব সরকার (ফেসবুকে 'শিশির শুভ্র' নামে পরিচিত)-কে নিয়ে নব কলেবরে পরিচালনা পর্ষদ গঠন হয়। শিশিরকে প্রচুর পরিশ্রম করতে দেখেছি। তার কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়েছে ছেলেটির সারাদিনের একমাত্র কাজ গ্রুপ চালানো, এর বাইরে অন্য কোন কাজ

নেই। গ্রুপে সদস্য ক্রমে বাড়তে লাগল। ব্যক্তিগতভাবে ফেসবুক পছন্দ না, কিন্তু এই বইয়ের হাটের নেশায় প্রথম প্রথম দিনে দশ-পনের মিনিটের জন্য এক-আধবার, পরে দিনে দু'তিন ঘন্টা কেটে যেতে লাগল। নতুন নতুন বন্ধু হলো। বইয়ের আদান-প্রদানের সাথে সাথে, বিচিত্র অথচ মনোগ্রাহী সব তথ্যের কারণে অবসর পাওয়া মাত্রই বইয়ের হাট-এ চলে আসি। অনেক নতুন লেখকের লেখার সাথে পরিচিত হতে থাকি; অল্প-সল্প পড়া অনেক লেখককে বিস্তারিত জানতে, তাঁদের লেখা পড়তে বইয়ের হাট সুযোগ করে দিতে থাকে। যেখানে ২০১৫ সনের জানুয়ারীতে প্রতি পোস্টে সদস্যদের সক্রিয়তা অতি নগণ্য, সেখানে ২০১৫ সনের মাঝামাঝি গিয়ে সক্রিয়তা বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেখা গেল।

সম্ভবত ২০১৫ সনের আগস্ট মাসে কোন একদিন– তখন গ্রুপে সদস্য সংখ্যা বড়জোর দু'হাজার কি দু'হাজার দু-একশ'; সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ফেসবুক মেসেঞ্জারে রিটন খানের নোটিফিকেশন: 'আপনাকে বইয়ের হাট গ্রুপে এ্যাডমিন করতে চাই, আপত্তি থাকলে জানান' এবং এর পরের নোটিফিকেশনটাই এ্যাডমিন হয়ে যাওয়ার । ততদিন গ্রুপটাকে বেশ ভালোবেসে ফেলেছি, গ্রুপের বহু বন্ধু-বান্ধবের (ফেসবুক-বন্ধু) সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি–সবই বই সম্পর্কিত নানান বিষয়ে। গ্রুপে ঢুকে দেখলাম আমার মত আরো দু'জন নতুন পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। একজন মলয় দেবনাথ, অন্যজন মালিহা নাজরানা। কীভাবে গ্রুপ চালাতে হয়, সদস্য নির্বাচন কীভাবে করতে হয়, পোস্টগুলো অনুমোদন দেওয়ার ভিত্তিই বা কি – কিছুই জানি না। তখনই যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। সে রাতেই সবার সাথে মেসেঞ্জারে পরিচয় ও আলাপ হলো– ধীরে ধীরে সবকিছুই জানা হয়ে গেল, বলা যায় বইয়ের হাটের আসক্ত হয়ে গেলাম।

অল্পকিছু দিন হলো চার নতুন মুখ বইয়ের হাটের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন: সুমন বিশ্বাস, নায়লা নাজনীন, মধুমন্তী সাহা আর দিব্যজ্যোতি চক্রবর্তী। আচ্ছা, একটি কথা বলতে ভুলেই গেছি – গ্রুপের সব কর্মকাণ্ডই বাংলা-সাহিত্যকে ভালোবেসে আর স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। গ্রুপ আজ এক লক্ষ বাইশ/তেইশ হাজার বাঙালির প্রাণের স্থান, যেখানে প্রতিদিন গড়ে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বাঙালি পদচিহ্ন রাখেন; কোন কোন দিন আরো বেশি। এই কর্মযজ্ঞে প্রত্যেক পরিচালক তাঁর দৈনন্দিন জীবন থেকে সময় বের করে হাসিমুখে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে গ্রুপকে সচল রাখতে সহায়তা করে যাচ্ছেন। এই মহতী কর্মকাণ্ডে আরেক জন নিরলস, হাসিমুখ আর প্রাণবন্ত মানুষ আছেন, যিনি পরিচালকমণ্ডলীর বাইরে থেকেও গ্রুপকে সন্তানের মত ভালোবাসেন, তিনি আশফাক স্বপন। তাঁর স্বেচ্ছাশ্রম আর বৌদ্ধিক ভাবনা গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করেছে।

২০১৬ সাল – গ্রুপে তখনও প্রতিদিন বই আদান-প্রদানই প্রধান আর একমাত্র কাজ। সাধারণ সদস্য থাকা অবস্থায় অনেককেই রোমান হরফে বাংলায় মন্তব্য করতে, পোস্ট করতে দেখেছি। অথচ বইয়ের হাট বাংলা বইপ্রেমী একটি গ্রুপ, যেখানে সবার বাংলা বই নিয়েই যত সব কার্যক্রম সেখানের অবস্থাটি এমন– কেমন যেন খাপছাড়া মনে হয়। সদস্যদের বাংলা বর্ণে লেখার অনুরোধ করা শুরু করলাম; এই কাজে অনেকেই সহমত হলেন, তাঁদের মধ্যে একজন সদস্য– 'বন্দন কুমার বড়ুয়া' অন্য সবার চেয়ে সক্রিয় হয়ে এগিয়ে এলেন। কীভাবে কম্পিউটারে/ মোবাইলে বাংলা লিখতে হয় তিনি এমন একটি ডক তৈরি করলেন। শুধু তাই না। তিনি প্রায় পোস্টে গিয়ে বেহায়ার মতো যাঁরাই রোমান হরফে বাংলায় পোস্ট বা মন্তব্য করেন তাদের বাংলা বর্ণে ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা শুরু করে দিলেন, এতে অনেকেই কম্পিউটারে/ মোবাইলে বাংলা বর্ণ লেখায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। কাজ হলো বটে– সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায়; বাংলা টাইপ করা তো শুরু হলো কিন্তু অনেকেই যুক্তবর্ণের ব্যবহার জানেন না বা ভুলে গেছেন। হায়াৎ মামুদ মহাশয়ের বহুল চর্চিত 'বাংলা লেখার নিয়মকানুন' বইটি থেকে যুক্তবর্ণের ব্যবহার, কোন কোন বর্ণ মিলে কোন যুক্তবর্ণ হয় ইত্যাদি গ্রুপে প্রতিদিন একটি করে পোস্ট দিয়ে গেলে অনেকেরই বাংলা টাইপে স্বচ্ছন্দ ও অভ্যস্ত হয়ে পড়েন । একটা সময় এমন দাঁড়াল যে, গ্রুপের সদস্যরা বাংলা ভিন্ন















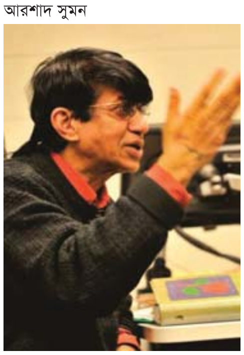
(ওপরে) কথাসাহিত্যিক ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে বইয়ের হাটের পরিচালক রিটন খান। বইয়ের হাটের অন্যান্য পরিচালক (বাঁয়ে, বাঁ থেকে) দিব্যজ্যোতি চক্রবর্তী, সুমন বিশ্বাস; (নিচে, বাঁ থেকে) মধুমন্তী সাহা, এমরান হোসেন রাসেল, পল্লব সরকার ও নায়লা নাজনীন।



আরশাদ সুমন

জর্জিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বইয়ের হাটের সাহিত্য-বিষয়ক ওয়ার্কশপে আলোচনারত ডঃ আজফার হোসেন ও অংশগ্রহণকারীরা। জর্জিয়া টেক-এর বাংলাদেশি ছাত্র সমিতি ওয়ার্কশপ আয়োজনে সহায়তা করে।

আরশাদ সুমন



আরশাদ সুমন





আরশাদ সুমন

(ওপরে, বাঁয়ে) কাজী নজরুল ইসলাম-এর ওপর বইয়ের হাটের সাহিত্য ওয়ার্কশপ-এ বক্তৃতারত অধ্যাপক আজফার হোসেন। (ওপরে, ডানে) ওয়ার্কশপে আলোচনারত অংশগ্রহণকারী (বাঁ থেকে:) খালেদ হায়দার, নিশি জাফর, নাহিদ হায়দার ও সৈয়দ নাসিম জাফর। (নিচে) সারাদিনব্যাপী ওয়ার্কশপে মধ্যাহ্ন বিরতির সময় অংশগ্রহণকারীদের সাথে বইয়ের হাটের পরিচালক রিটন খানে (সর্বডানে) এবং অধ্যাপক আজফার হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়)।

অন্য বর্ণ বা হরফে মন্তব্য করা ছেড়ে দিলেন। এত কথা বলার উদ্দেশ্য হলো বইয়ের হাট শুধুমাত্র বাংলা বই আদান-প্রদানের ছাড়াও ভিন্ন কিছু করার প্রয়াস পায়।

এতক্ষণ নিজের সম্পৃক্ততার কথাই বললাম; এখন বইয়ের হাটের কিছু কর্মকাণ্ডের কথা বলি। তখনও গ্রুপে বই দেওয়া-নেওয়াই প্রধান কাজ। ২০১৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে একুশে বইমেলায় বইয়ের হাটের কিছু সদস্য নিয়ে পরিচালকদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে একত্র হওয়ার চেষ্টা করি। অনেকেই আসবেন জানালেও, শেষে আগ্রহীদের উপস্থিতির সংখ্যা নগণ্য। তবে যে কয়জন বন্ধু এসেছিলেন প্রাণ খুলে মত বিনিময় হয়েছে; প্রত্যেকের চোখ-মুখে বইয়ের হাটের ভালোবাসার উচ্ছ্বাস ঠিকরে পড়ছিল। মিলনটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঘাসে বসে সামান্য কফি পানে উদ্‌যাপিত হলেও, একটি বার্তা নিয়ে এলো– এখন আমাদের ইন্টারনেটের বায়বীয় জগৎ থেকে বেরিয়ে বাস্তব জগতে কিছু করতে হবে।

এই ভাবনাটি বাস্তবায়ন করতে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ নিতেই প্রায় দেড়-দু'বছর অপেক্ষা করতে হয়। মাঝে আমরা একটি সাহিত্য-মনোভাবাপন্ন সংগঠনের সাথে মিলে কাজ করতে গিয়ে সেখানে সময় ব্যয় করে ফেলি। তবে সেই সময়ে কিছুই যে হয়নি এমন নয়– লেখক স্বত্ব নেই এমন প্রচুর বইয়ের ই-পাব করা হয়েছে; শিশু-কিশোরদের কথা ভেবে 'শিশু-কিশোর ডট অরগ' নামে একটি ওয়েবসাইট করা হয়েছে, সেখানে প্রচুর বাংলা শিশু-সাহিত্যের সাথে ভিন্ন ভাষার শিশু-সাহিত্যের বঙ্গানুবাদও আছে; 'ই-বাংলাসাহিত্য ডট কম' নামে ক্লাসিক বাংলা-সাহিত্যের ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের সুপণ্ডিত অধ্যাপক ড. আজফার হোসেনের বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার বইয়ের হাট-এর ব্যানারে নেওয়া হয়েছে। ২০১৬ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে সাংবাদিক, প্রবন্ধকার ও কবি জ্যোতির্ময় দত্ত এক বৈঠকী-আলাপে বইয়ের হাটকে ভালোবেসে বলেন – 'কিচ্ছু না জেনে কম্পিউটারে দু'চারটি বোতাম টিপলেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাচলী; রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী; কত অখ্যাত লোকের লেখা; যেসব বই শুধু দূরে থেকে বাঁশি শুনেছি, নাম জেনেছি; তারা এখন আমার ইঙ্গিতে শরীর পাচ্ছেন। এই যুগের সূচনায় আমি যে আছি তাতে সৌভাগ্যবান মনে করি। ...' আমাদের সফলতার মুকুটে এটি একটি মূল্যবান পালক বলে বইয়ের হাট সশ্রদ্ধচিত্তে মনে করে।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা বইমেলা – বইয়ের হাটের জন্য একটি পয়মন্ত

কাল। ওয়েবজিন 'গল্পপাঠ' সহযোগী 'গুরুচন্ডা৯'-কে নিয়ে নির্বাচিত গল্পসংকলন ১ম ও ২য় খণ্ড বের করে। গল্পসংকলনের ২য় খণ্ডটি বইয়ের হাটের পরিচালকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। অনলাইনে বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার মতো কাজে অবদান রাখায় বইয়ের হাটকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয় এবং মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বইয়ের হাটকে আমন্ত্রণ জানান হয়। বইয়ের হাটের পক্ষ থেকে রিটন খান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সাহিত্যিক পরিবার থেকেও বইয়ের হাট সম্মানিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় কবি ও কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় বইয়ের হাটের কর্মকাণ্ড এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসায় মুগ্ধ হন এবং বইয়ের হাটকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশ ব্যতিত অন্যান্য কিছু বইয়ের বৈদ্যুতিন সংস্করণের অনুমতি প্রদান করেন।

২০১৮ সালের ৭ই জানুয়ারি বুদ্ধদেব বসুর কন্যা মিনাক্ষী দত্ত বইয়ের হাটকে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সারির দৈনিক 'আজকাল'-এর মাধ্যমে অভিনন্দন জানান। তিনি বইয়ের হাটের জন্মপূর্ব ইতিহাস সবিস্তারে প্রকাশ করেন, বইয়ের হাটের সংগ্রহকে বিশ্ববিখ্যাত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাথে তুলনা করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতা বিশ্ববাসীর জন্য মূল্যবান ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে উন্মুক্ত করার কাজে নিয়োজিত 'মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ'-এর সাথে প্রথম থেকেই বইয়ের হাট যুক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক বইয়ের সরবরাহ, স্ক্যান করার মতো কঠিন কাজগুলো করে গেছে। তাঁদের বিভিন্ন লেখা, সাক্ষাৎকার এবং মুক্তিযুদ্ধের বইগুলো বইয়ের হাটের সদস্যদের সাথে ভাগাভাগি করে বইয়ের হাট মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে।

এভাবে বইয়ের হাট তার নিজের ছন্দে চলতে থাকল, একসময় দেখলাম অনেক স্বনামধন্য লেখক/কবি/নাট্যকার/প্রাবন্ধিক/অন-লাইন ব্লগার/চলচ্চিত্র পরিচালক/বিভিন্ন সাহিত্য-সংগঠক/ প্রকাশক/প্রচ্ছদ শিল্পীর পদচারণা; এদের অনেকেই গ্রুপে সক্রিয়, অনেকে আবার নিষ্ক্রিয়। সক্রিয়রা মাঝে মাঝে তাঁদের পোস্ট, মতামত দিয়ে আমাদের প্রভূত সমৃদ্ধ করেছেন, আমাদের ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়েছেন এবং মানুষের হৃদদ্বারে বাংলা সাহিত্যকে পৌঁছানোর সহজ-সঠিক পথটি বাৎলে দিয়েছেন।

বইয়ের হাট ২০১৮ সালের ২৪শে মার্চে আটলান্টার জর্জিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মের ওপর 'কাজী নজরুল ইসলামের শিল্পসৃষ্টি: বৈচিত্র্য ও আন্তর্জাতিকতা' শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠান করে, সহযোগিতায় ছিল জর্জিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন। সমস্ত দিন প্রাণচঞ্চল কর্মশালার প্রাণপুরুষ ছিলেন মিশিগান লিবারেল স্টাডিজ ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজের অধ্যাপক ড. আজফার হোসেন। সকাল-বিকেল দু'ভাগে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালাটির উৎকর্ষ-ঠিক রাখতে মোট দশজনের অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। আমেরিকার বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকায় কর্মশালার খবরটি প্রচারিত হয়। সেই বিবেচনায় একে একে কর্মশালার ভিডিও, পাঠ্য-প্রবন্ধ সবার জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে ।

চলছে বইয়ের হাট, দিনরাত ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭ দিন। মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত এই স্থানটি বহু মানুষের বাঁচার প্রেরণা, নিজেকে জানা -বোঝার পীঠস্থান, জ্ঞানার্জনের পাঠশালা, মুক্তালোচনার আনন্দ-নিকেতন।

২০১৮ সনের মার্চ মাসেই পশ্চিমবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র আতিথেয়তা গ্রহণ করে বইয়ের হাটকে সম্মানিত করেন। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে তিনি সাহিত্য, ভারত-বিভাজন, দু'বাংলার সাহিত্যিক সম্পর্ক, নিজের লেখা এবং পাঠক সম্পর্কে অনেক কথাই আলোচনা করেন। বইয়ের হাটের লেখক যশোপ্রার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন: '...উপদেশ দেওয়ার অধিকার তো আমার কিছু নেই, আমার যেটা মনে হয় যে, লেখাটা একটা সাধনার জায়গা। একজন লেখককে নিজেকে তৈরী করতে হয়, প্রচুর পড়তে হয়, বারবার লিখতে হয়। আগে যখন আমরা প্রথম বয়সে একটা লেখা কতবার করে লিখেছি, লিখে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, লেখা ফেরত এসেছে, আবার লিখেছি দাঁতে দাঁত চেপে। এই সমস্ত করেই লেখক হয়।'

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বৌঠান কাদম্বরী দেবীর সম্পর্ক নিয়ে বাঙালি সমাজ এবং বাঙালি লেখক সমাজে আগ্রহ সবসময়ই ছিল; এ বিষয়ে বাদ-বিবাদের কোন রকম কমতি ছিল না, এখনও নেই। বইয়ের হাট আলোচ্য বিষয়ে সুমিত্রা দত্তের লেখা পাঠকপ্রিয় বই 'নতুন বৌঠান, রবীন্দ্রজীবন ও মননে' নিয়ে আলোচনার আয়োজন করে। বৈঠকে বইটির লেখক সুমিত্রা দত্তের মেয়ে শুভশ্রী নন্দী (রাই)– রবীন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী, উভয়ের সম্পর্ক, এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের মনোভাব এবং তাঁর মা অর্থাৎ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের এমন গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় বইয়ের হাট সবসময় এগিয়ে আসতে আগ্রহী । আমাদের এসব আলোচনা আমরা ইন্টারনেটে তুলে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছি, আর অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক সাড়া পাচ্ছি।

বাংলা বইয়ের এই আধারের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রায় ৬০,০০০ (ষাট হাজার)-এর মতো বই আছে, গ্রুপের সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসে আজ বইয়ের সংগ্রহ এই পরিমাণ। বেশির ভাগ বইয়ের লেখকস্বত্ব বা কপিরাইট আজ আর নেই, সংগ্রহের বিশাল একটি অংশ digital library of india থেকে পাওয়া। গ্রুপের সদস্য এমন অনেক লেখক তাঁর লেখা বই স্বপ্রণোদিত হয়েই গ্রুপে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, এমনও ঘটনা আছে যে, লেখক বাবা/মার বই তাঁর ছেলে-মেয়ে গ্রুপে বিনামূ সবার জন্য পাঠোপযোগী করেছেন। ইন্টারনেটে সহজলভ্য বিভিন্ন জায়গা থেকে বাকি বইগুলোর সংস্থান হয়েছে।

এ নিয়েই চলছে বইয়ের হাট, দিনরাত ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭ দিন। মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত এই স্থানটি বহু মানুষের বাঁচার প্রেরণা, নিজেকে জানা -বোঝার পীঠস্থান, জ্ঞানার্জনের পাঠশালা, মুক্তালোচনার আনন্দ-নিকেতন। মননশীল বই যে মানুষকে মানবিক করে তোলে, তার লক্ষণীয় উদাহরণ আজ বইয়ের হাট। বাঙালির ইতিহাসে এমন মননশীল ক্ষেত্র আরো বহু আগেই প্রয়োজন ছিল, যা বহু দেরিতে হলেও শুরু হয়েছে, শুরু হয়ে এখনও সুস্থ-স্বাভাবিক-ছন্দময় গতিতেই বেগবান রয়েছে। বইয়ের হাটের শুরুটা ইন্টারনেটের বায়বীয় জগতে হলেও, এখন বায়বীয় ও কঠিন বাস্তব উভয়ক্ষেত্রেই সমান গতিতে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। এ সবই সম্ভব হয়েছে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাংলা-সাহিত্যপ্রেমী বাঙালির ভালোবাসায় আর তাঁদের আস্থায়। আমাদের এমন ক্ষুদ্র প্রয়াস একদিন প্রতিটি বাঙালিকে মননশীলরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবার আগে উচ্চারিত হবে কিনা, সেই উত্তর ভাবীকালের গহ্বরেই থাকল। ■

খোক্কসরাজ

শঙ্খ ঘোষ

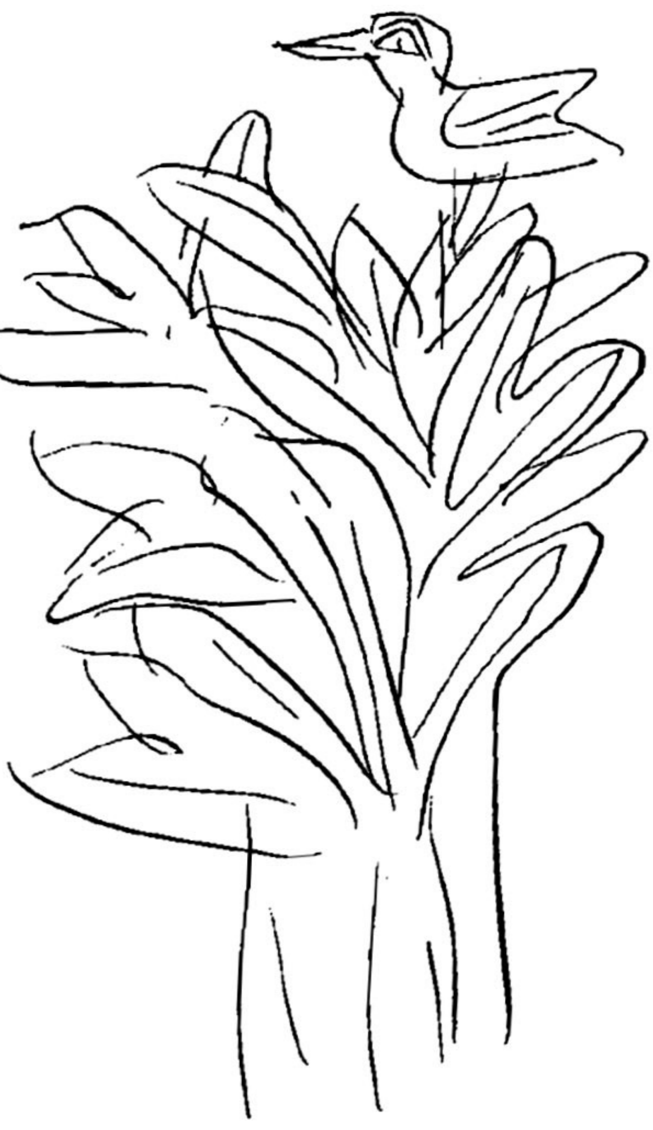
১। থানাখে আইলি বাপ? কী বুল্ল উয়ারা?
২। কী আর বুলবে কও। এমনকী এফ আই আর-ও নিল না একখান।
১। কী নিল না?
২। এফ আই আর। কিছু যে ঘটসে তার নালিশ তো লেখানো চাই।
১। নালিশ নিল না?
২। না। কইল যে ঘটে নাই কিছু। সোমত্ত ডাগর মাইয়া দেখো গিয়া পলাইসে নাগরের লগে।
১। নাগরের লগে পলাইসে? অমন সোনারটুকরা মাইয়া, জ়লপানি পাওয়া মাইয়া, পাড়ার চুখের মণি মাইয়া, কত সাধ কইরা সেদিন কইল আইস্যা: 'শহরের কলেজ়ে পড়ুম—শহরের সবচাইয়্যা উঁচা কলেজ়ে' –নাগরের লগে পলাইসে সে? দিনদুপুরে হগলের চুখের সামনে দিয়া টাইন্যাহিঁচড়্যা লইয়া গ্যালো খোক্কসগুলান, চেনাজ়ানা মুখ। সে নাকি পলাইছে নাগরের লগে?
২। চেনাজ়ানা মুখ বইলাই তো মুশকিল মা গ'—রোজ়ই তো ঘটসে এমন এইখানে ওইখানে। নেতাদের ভাইগ্না ভাতিজ়া সব—উয়াদের ধরতে পারে কেউ?
১। শুইনা চুপচাপ চইলা আলি? কিছু কইলি না?
২। কইসি মা, কইসি। চিক্কের দিয়া কইসি। কইথে কইথে গলা চিরা গ্যাসে। কিন্তু ব্যাটা কয়: 'দুই পাতা ইঞ্জিরি পইড়্যা বড়ো দেখি ত্যাজ় হইসে তোর? বেশি ট্যাফুঁ করলে এমন ধারায় জ়েলে ঠুসে দিব—জ়ীবন ভইরা পচবি গরাদে। যা এখন বাড়ি যা। অন্যের ভাবনা না ভাইবা নিজ়ের আখের গোছা, যা—
১। শহরের বাবুদের কাছে গেছিলি কি?
২। গিয়া কুনো লাভ নাই। বাবুরা একদিন হয়তো শহরের রাজ়পথ ভইরা দিবে মিছিলে মিছিলে। গরম গরম ধ্বনি দিবে। তারপরে দায় সারা হইল ভাইবা দিবানিদ্রা দিবে তারা। সামনে কুনো পথ নাই আর। অজ়াত-কুজ়াত আমরা, জ়ঙ্গুলি মানুষ আমরা, অচ্ছুৎ দলিত্—এককাট্টা হইয়া আমাদের কথা আজ় আমাদেরই কইতে হইবে মা। এককাট্টা হইয়া লড়াই করন ছাড়া আর কুনো পথ নাই আজ়।



দেখাচ্ছ? বারতা পেলে নাকি?

জয় গোস্বামী

দেখাচ্ছ? বারতা পেলে নাকি?
শ্রেয় এক শ্রেয় দুই শ্রেয়তর তিন
তিনরাত জেগে আমি শ্রেয়োতম চতুর্থ রজনী
পোহাই ক্যানভাসে ঢুকে হাতে আঁকা গ্রামদৃশ্য হয়ে
গ্রামে যে-বিকেল নামে তার গান ওড়া পাখিঝাঁক
এক ভাগ্য দুই ভাগ্য তিন ভাগ্যফল
হাতে আসে বিনা চেষ্টা বিনা পরিশ্রমে
পারিতোষিকের বিকিরণ
ধাঁধা করে সকলের চোখ
প্রথম পৃষ্ঠায় আমি উপস্থিত— আবার? আর-একবার?
এতটা ভাবিনি।
কাহিনি সংশয় আনে কোথা তার কী ঘটে কখন!
কী হয় কী হয় তার সারাক্ষণ, ফুল ফোটে নিশাদেহে শ্রেয়
শ্রেয় এক শ্রেয় দুই শ্রেয়তর তিন
তিনরাত জেগে আমি পহলবানের ছক্কা চাই
অশ্রু পোহায়েছি কত সাধু ক্রিয়াপদে পদে বাধা কান্না ছাই
ভস্মের ক্রন্দন শত চিতাফুলকিরূপে ধাবমান
শুনেছি গগনভেদী ডাক
শক্তির 'অবনী, বাড়ি আছো'
তারকা চিহ্নিত অংশ বিশেষ দ্রষ্টব্য বলে পড়ি
পড়িমরি গান পড়ে যে-বাগানে ওড়ে পাখিঝাঁক
দেখাচ্ছ? বারতা পেলে নাকি?
গান কি দেখানো যায়? আমি তো মাত্রই
স্বর্ণরৌপ্য গান শুনে থাকি
শ্যাম অঙ্গ তিলকে লাগলে তিলকশ্যাম হয়
জানে ক্যাসে সপনোমে খো গয়ি আঁখিয়া
ম্যায় তো হুঁ জাগি মোরি শো গয়ি আঁখিয়া
ওই শ্যাম কল্যাণ অঙ্গে লাগে যদি শ্যামকল্যাণের সাঁঝবেলা
নীল রং আকাশবর্ণ আরোহণের তীব্র মধ্যমে
ক্রমে রাত বড় হলে ভারী ভারী রাগিণী আসেন
পীন পয়োধরা কাকে বলে আমি বড় দুঃখে জানি সে-সংবাদ
মাথার ওপরকার ফাঁকা জায়গাটিতে
চাদর টাঙালে হয় চাঁদোয়া বা ছাদ
শ্রীছাঁদ তাকেই বলে যার পুণ্যরেণু মাখা কেশে
বড় চুল তাঁরও ছিল যাঁর নাম ফণীশ্বর নাথ
নাথ হে প্রেমের পথে সব
বাধাবিঘ্ন ভেঙে দিয়ে মাঝে কিছু রেখো না, রাখোনি
বড় স্তম্ভে পূজা দিই ছোট স্তম্ভে রাখি স্পর্শমণি
সোনায় রূপান্তরিত পলকে স্তম্ভটি
নাওয়াই ধোয়াই তাকে একশত একঘটি জলে
পরিষ্কার, ঝকঝকে-আলো পড়লে বিদ্যুৎ চমকায়
আমি সেই বিদ্যুতের প্রায়
চমকে উঠি, গ্রামদৃশ্যে ঢুকে পড়ি ভ্রমে
পাখিগণ ক্রমে
আমার নিকট আসে, দানা দিই, ছোলা,
পাখিদের বান্ধব ক'জন
জানা নেই, শুধু জানি তারাই তো আকাশ-স্বজন
পথ দেখিয়ে দেয় পথভোলা
আমি বলি: দেখাচ্ছ? বারতা পেলে বুঝি?
সে বলে: কেবলই আজ দিক-নির্দেশক চিহ্ন খুঁজি
কোনখানে পরের পঙ্‌ক্তি পাব?
পরবর্তী স্তবকটি কী দিয়ে আরম্ভ হবে? ভাবি।
স্তবকই তো নেই এ লেখায়!
পঙ্‌ক্তি-চোর স্তবক-ডাকাত
কে আমাকে দীক্ষা দেবে? কার হাতে বহুমূল্য চাবি
শব্দসিন্দুকের?
সে থামে, সে চুপ করে। স্তব্ধ হয়। আমি তার হাত।
সে আমার মন।
যা আমার অর্ধরাত্রি তা-ই তার উষা-সন্ধিক্ষণ
কীভাবে দু'জনে মিলবে তার-ই তো সন্ধানে
আমি যাত্রা করেছি সুদূরে...
দূর থেকে আসে ভাগ্য,
পাখিরূপে বসে
আমার সম্মানলাভে জাগরিত রৌদ্রবৃক্ষচূড়ে...



কানু

সুবোধ সরকার

আমি মহাভারতের কৃষ্ণ নই, বাঁশি বাজাতে আসিনি।
আমি ভাগনাদিহি গ্রামের সাঁওতাল। কানু মুর্মু।

আমি ব্রিটিশকে ব করে ছেড়ে দিয়েছিলাম
শুধু তির আর ধনুক আর শালপাতা দিয়ে
আমরা চার ভাই আর দুই বোন। ভারতে আর কোনও
ছয় ভাইবোন ভারতের জন্য মহাভারতের জন্য
শালপাতার জন্য জীবন দেয়নি।
ওই সুন্দরী শালপাতাই তো আমাদের মানচিত্র।

কলাগাছে তির মারো আর লাঠি মেরে হাঁড়ি ভাঙো
আজ এ দুটোই এখন খেলা
কিন্তু সেদিন কলাগাছ ছিল ইংরেজ
আর হাঁড়ি ছিল কলকাতার ঘোষ বোস গুহ গাঙ্গুলি।

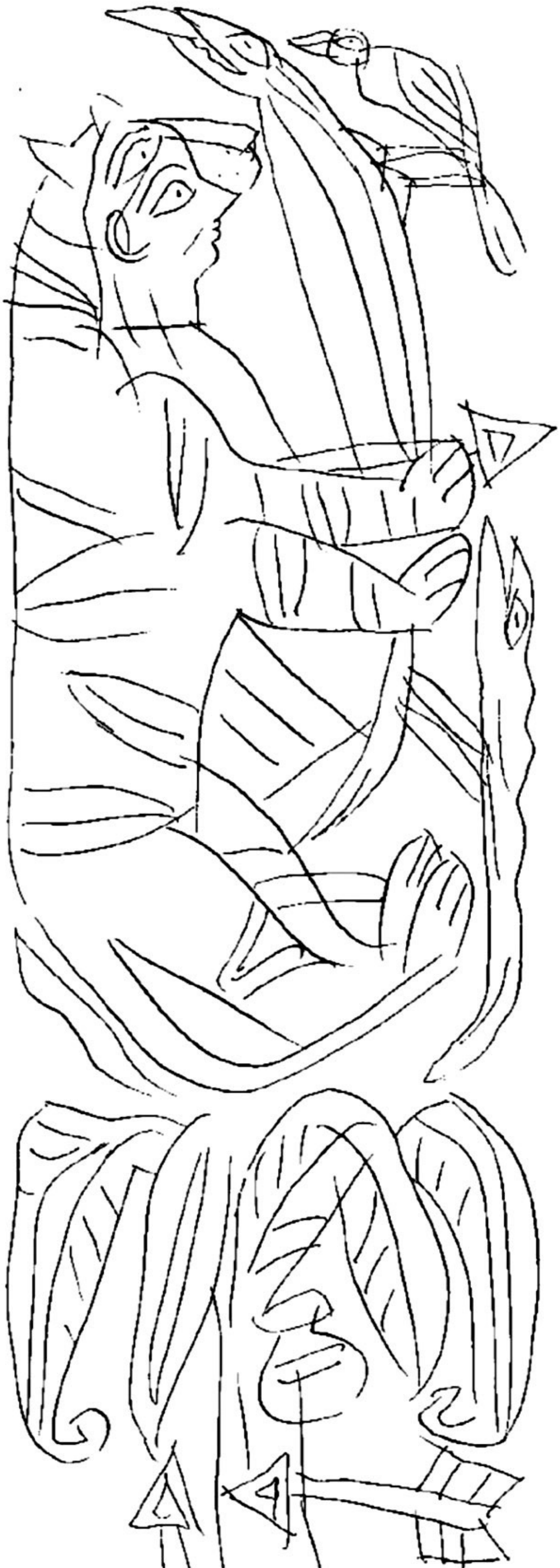
আমি ব্রিটিশকে ব করে ছেড়ে দিয়েছিলাম সেদিন
ইঁদুরের মতো গোসাপের মতো নেউলের মতো লড়েছিলাম
আমার দুটো বোন লাউডগার মতো লড়েছিল।
কিন্তু আমি ওদের বাঁচাতে পারিনি, ও বোন বোনরে
তোরাই প্রথম নারীশহিদ, তোরা দুই সাঁওতাল নারী
তোদের জন্য আজ বাবুদের মেয়েরা
বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করছে।

আমার গ্রামটাই ছিল প্রথম ভারত
আমরা মহিষ-টানা লাঙল আট আনায় আর
বলদ-টানা লাঙল চার আনায় দেব
দোকোদের আমরা মানি না।
আমরা ওদের থানায় যাইনি, ওদের খাজনা দিইনি।

আজ আর ইংরেজ নেই
জমি আমার, গাছ আমার, জল আমার
কেন একটা কালো টি-শার্ট পরা ছেলেকে রাঁচির ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে
আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে পিটিয়ে মারবে?
ওই ছেলেটা তো আমি। ওর নাম সিধু, কানুর ভাই সিধু।

সেদিন শালপাতা পাঠিয়ে ৫০ হাজার সাঁওতাল এনে
ব্রিটিশকে ফুটো করে দিয়েছিলাম
আজ আবার শালপাতা পাঠানোর দিন
কলাগাছে তির মারার দিন, লাঠি মেরে হাঁড়ি ভাঙার দিন।
আমি মহাভারতের কৃষ্ণ নই। বাঁশি বাজাতে আসিনি।

আমি কানু।



পাহাড়ের বনবাংলোয়

সনৎ সেন

চাপা নিশ্বাসের মতো এক প্রগাঢ়
নিস্তব্ধতা আর পাহাড়ের শীর্ষ ছুঁয়ে
এবড়ো-খেবড়ো পথে পায়ে হেঁটে
নেমে আসা পাদদেশে
মাথার ওপর এত কাছে এমন নীল
উর্ধ্ববাহুতে হাতের আঙুলে মনে হয়
ছুঁয়ে আসি নিঃসীম বিস্তার
এখানে সময় যেন এক সুদীর্ঘ শতাব্দীর
ইতিহাস অনিঃশেষ পরিচ্ছেদের
প্রলম্বিত প্রহর যার বিবর্ণ পাতায়
খুদে অক্ষরে হাতি ঘোড়া আর হাজার
পদাতিক মানুষ বর্শা বল্লম হাতে
আচ্ছাদন বর্মের— শুধু জয়-পরাজয়
আর কিছু নয়— রাত ঘনায় ঝিঁঝির
ডাকের একটানা শব্দে, কালিঝুলি মাখা
লণ্ঠনের আলোয় আমরা এর-ওর মুখের
পানে তাকাই পানপেয়ালার পাশে
রাজা-মহারাজা আর কখনও-বা অত্যন্ত
নিরীহ পালিত প্রজাটি হয়ে উঠি
দূরে কোথাও খরস্রোতা পাহাড়ি নদীটি
তখনও নির্ঘুম চোখে কালের স্রোতে
নীচে গড়িয়ে নামাচ্ছে পাথর আর
মৃত গাছের গুঁড়ি।



দৃষ্টিভ্রম

অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়



কেউ ডাকেনি নাম ধরে, কেউ বলেনি, তুমি এসো
বাতাসে মেশোনি বাষ্প, সুখে ঢাকা প্রেমের আকুতি
ছুঁয়ে গেছে মনোভূমি—তোমাদের সাজগোজ, বেশ-ও
তবে কি অচ্ছুৎ করে রেখে দিলে, হারালে সম্প্রীতি?

ডানায় লেগেছে জল, পাতায় বসেছে 'পলু' কীট
বৃষ্টিহীন মিষ্টিদিন বুঝি-বা বিরল হল দেশে
সংকটে এসেছ কাছে—চলে গেছ যখন প্রাবৃট
তোমাদের সর্বনামে মেঘগুলি জমা দিলে হেসে।

কৃপণ ভিক্ষার মতো আলগোছে মুদ্রার অঞ্জলি
মুখ তুলে দেখনিকো সে যে হয় সম্পর্কে আপন
রাতের প্রকৃতি মেনে অমা-তে জ্বেলেছ 'দীপাবলি'
ভেবেছ কি অন্ধকারে রয়ে গেছে 'একা' একজন?

বৃষ্টিতে ভিজল মাটি, সৃষ্টিতে লাগল কালি, ছায়া
প্রদীপ্ত বাসনাদীপ ঢেকে গেল গহন আঁধারে
যেখানে খুঁড়বে বালি, সেখানেই জলভরা 'মায়া'
আর কী দেখবে চোখে, মেঘ ঢাকা মনের অম্বরে?

বিপ্রতীপ মুখ

সেখ রমজান

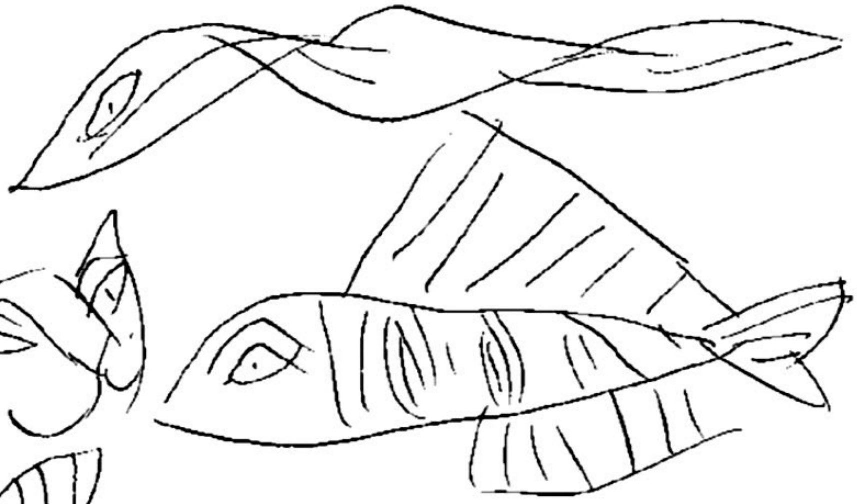
রাত গম্ভীর দূরের পাড়ি মধ্যে হাওয়াব্রিজ
হিম-স্মৃতি ঝাপট ডানা মেঘলা অহর্নিশ।
ন্যাড়া মাঠ পিছল নদী আঁধার উদাসীন
বোবা মেঘ ঠোঁটের পাশে ভরাট বুক ঋণ।
ম্লান চিহ্ন সিঁথি পরাগ জানলামুখ আঁকা
নেভা ঘ্রাণ মুঠোজীবন হলুদ রোদ মাখা।

দৃশ্য ফোটে জন্ম হাঁটে দু'পাশে পুতুল-বেলা
দেয়ালছায়া স্বপ্নভাঙা পাঁচিল তোলা খেলা।
অবোধ আড়াল পুঞ্জআঁখি গতি চতুর্দিক
বিজোড়-জোড় কিশোরী ভাঁজ তৃষ্ণা প্রাত্যহিক।
আকাশগাঙ ডুবসাঁতার কুঞ্জ মেঘ ধোয়া
আঁচল ওড়ে গভীর রাত মগ্নকথা ছোঁয়া।

দিঘিপাড় পদ্ম কোথায়? কুহক এলোচুল
ভাঙনপ্রিয় ঊর্ধ্বপদ গণিত খাতা ভুল।

হয়তো ভুল আলগা সুতো নিরন্তর দুখ
পাথরভাঙা অবুঝ পথ বিপ্রতীপ মুখ।







যেখানে শেষ সেখানে শুরু

রূপক চক্রবর্তী

সাংবাদিক-এর 'ক' যেখানে শেষ
কবি-র তখন শুরু
তবুও দেখি সাংবাদিকের গেরামভারী ভাব
খানিক যেন রাজ্যপাটও আছে।
এবং বোঝে ফন্দিফিকির কোন ধানে চাল কত
তুলনাহীন ফেরেব্বাজির ছলাকলাও জানে
প্রপার্টি আর ব্যাঙ্কে টাকার চেহারা বেশ ভাল।
কবি কিন্তু হ্যাংলাগোবা আহাম্মকের ছানা
শাক দিয়ে মাছ ঢেকেই দেখে মাছ নিয়েছে বিড়াল
বোঝার ওপর শাকের আঁটি— ছন্দে কাঁচা। হুঁঃ।
যতই কাঁচা যতই কেঁচো হোক না কবির এলেম
শেষ কথাটা ভাল করে সাংবাদিকও বোঝেন—
যখন গিয়ে লেখালেখির 'ক'-তেই তাহার শেষ
কবি-র তখন শুরু

প্রবন্ধসার

ঋত্বিক ত্রিপাঠী

ঝড়ের প্রাণকেন্দ্রে অগোচরে চিত্রিত হচ্ছে ধ্বনি ও সৌষম্য
এক নয় দৃশ্যমান, প্রতিবিম্ব। এক নয় ভাববস্তু, সমার্থবাচক।

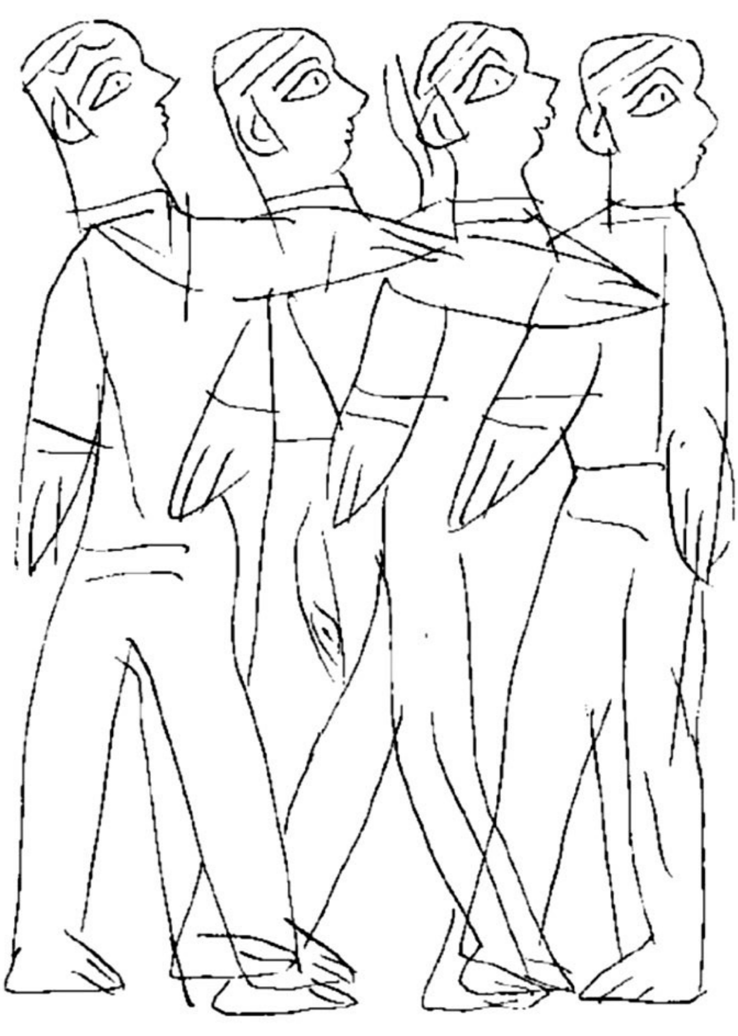
সংহতিমায়ায় অনূদিত, সনির্বন্ধ লেখক পাঠক আমরা
বর্ণময় জ্যোৎস্নায় পায়ে ঠেলছি দেববাণী, নিয়ামক সূত্র

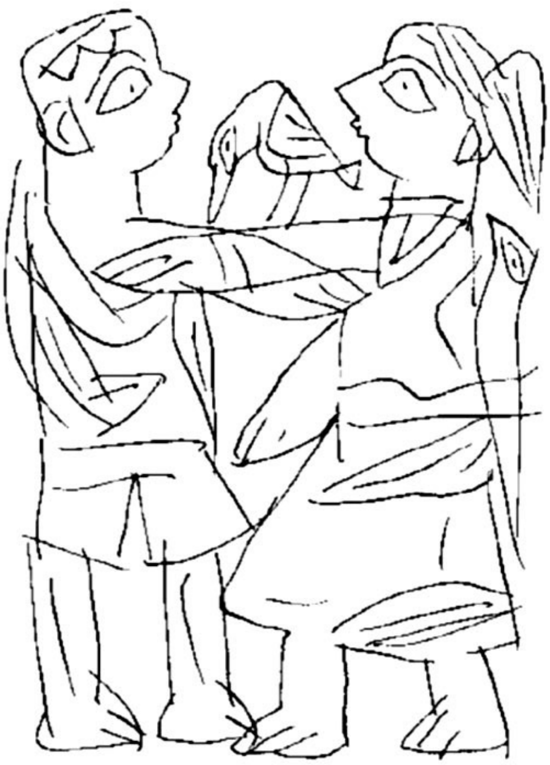
সান্ধ্যত্রিভুজমায়ায় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে প্রামাণ্য ভরকেন্দ্র
তিনভাগের একভাগ শ্লোক, অখণ্ড মিলন অনুরাগ

তোলপাড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আমরা বলছি এক, বলছি দ্বিত্ব
অভিলাষ সমুচিত বিস্তার, পিছুটানলোভী ইতিবৃত্ত

স্পর্শযোগ্য, নিয়মবদ্ধ জলসেচ সেরে বাদ্যযোগে প্রতিস্পর্ধী
স্বগত শব্দসমবায়, পরগত বাক্যবন্ধে দেশকালাতীত
অনুশীলন তত্ত্বের সান্দ্রছায়ায় প্রবন্ধ, পূর্ণতার লক্ষ্যে সমাকুল

ধর্মরাজ্য এড়িয়ে আমরা খুঁজে চলেছি নিরন্তর
জ্ঞানশূন্য নিরীক্ষা, নিরস্ত্র সৈন্য, কৃষ্ণমেঘের উৎস...





শ্রদ্ধা

তৈমুর আলি খান

শ্রদ্ধা কোথায় থাকে?
তার ঠিকানা হারিয়েছি বহুদিন
মুখটি শুধু মনে পড়ে
ঠোঁট দু'টি অদ্ভুত রঙিন!

অনেক অনেক বাল্যকালে
সে অনেক গল্পের ভিতর
ঢুকে গেলে খুঁজতাম তাকে—
আমি কখনও পুলিশ হতাম, সে হত চোর।

ব্যাকরণ না মেনেই শব্দ আর বাক্যের ভিতর
তার মিহি আঙুলের ছোঁয়া
কত যে উন্মনা করে দিত...
মনে হত আমাদের ভবিষ্যৎ ধোঁয়া।

তবুও গড়াত বিকেল
তবুও অব্যয় ক্রিয়া নিজ নিজ কাজে
বানাত শয়নঘর, বিস্মিত দালানকোঠা
সে এসে নির্জন রাতে উঁকি দিত মাঝে-মাঝে।

স্বপ্নে রোজ তাকেই ধরতাম আমি—
কত যে মুঠো মুঠো আমার ভাললাগা...
হৃদয়ে শুধুই তার বাণী
চোখে চোখে ঘুরত রাতজাগা।



কবিয়াল

শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী

শূন্য ঘরের মুখোমুখি আমি অপেক্ষা করি
ধাতব ফটকঘেরা বর্শাফলক
উপরতলায় বাজছে সেতার আর পিয়ানোযুগল
শূন্য দাওয়াতঘর। একলা দেয়ালঘড়ি

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীল উপত্যকা
এখানে শব্দ নেই, নীরব নিস্তব্ধ উদাসীন
অজানা ঝড়ের মতো নামহীন মুহূর্তগুলো
ইস্টারমূর্তি হয়ে থাকা।

আমাকে স্পর্শ করো শূন্য ফটক
আরও কতবার ফিরে যাব আমি হতবাক হয়ে
প্রসূতির মতো নাভিশ্বাস আসে দিনান্ত রাত
আমিও রসিকা হব, তোমার কথক।



একটি দৃশ্যের কাছে

শ্যামলজিৎ সাহা

কবে যে এসেছি ফিরে নিজঘরে, ঠাঁই পেতে, সে অনেকদিন।
তবু মনে পড়ে ভোর-ভোর উঠে জলের ছলাৎছল শব্দের
কাছে বেজে ওঠা, খাল-পাড়টুকু ছিন্ন হত বক উড়ে গেলে।
সে তুমি ও তোমরা তখন জলে নেমে সারা শরীর জড়িয়ে
শাড়ি ও সোহাগ, হাতে জাল, ছোট ছোট মাছ ও শ্যাওলা
একাকার, আমি চুপ স্তব্ধ গরিমায়, স্তব্ধ জলবায়ু, চোখ বুভুক্ষায়—
শরীর ছড়ানো আছে জলে লিপ্ত হয়ে, সকালের শুরু:
মনোনিবেশ সেখানেই যাবে যেখানে অমৃত উঠে আসে, চক্ষু
লোলুপ মথিত হয় আমাকে জাগায়, ভেতর অস্থির;
তুমি ও তোমরা যেন মাছ-ধরা ছেড়ে হাস্যরসে খেয়ে ফেলো
সম্যক উল্লাস! জাল আরও টেনে ধরো কী এক উদ্ভাসে!

এই অবধি

সুস্মেলী দত্ত

তারপর এক ব্রহ্মদত্যি রাত
ব্যাঙ্গমা, পরি, লালকুমারের তির
ফুড়ুৎ জানলা উঠোনে হাসনুহানা
ইকিরমিকির আধখানা জমে ক্ষীর

ওর'ম এর'ম চকোলেট বানভাসি
গোপন কুঠুরি চাবিকাঠি নেই! ধুর
এ-ছাদ ও-ছাদ নিঝুম শব্দহীন
মাতাল গপ্পে অলীক রাজার পুর

মোম জাফরানি আদর সোনার খেতে
সবুজ সোঁদায় ফল-ফুল টুপটাপ
কোটাল মন্ত্রী ফুট জোনাকির বাড়ি
ঢেঁকি–ভাঙা–ঘরে নিরীহ বাস্তুসাপ

সুখ মহাসুখ হারিয়েছে বুককেস
বামাখ্যাপা মেঘ বিসর্গ আরপার
চাঁদ চন্দনে জটাজুট সন্ন্যাসী
ধ্রুবতারা চোখ শুদ্ধ সংস্কার

আঁতিপাঁতি মন ঝকমারি সারা দিন
স্বপ্নবালিকা অর্কুট বোবা হাবা
বাবিন তোমায় খুঁজেছে হাজার বার
বাবা, বাবা কই? কোথায় আমার বাবা?

শোননি সে ডাক কিছু ফিরে শুধু, যাই
নিভে গেছে রোদ হসন্ত রোশনাই

মৃত্যুনদীর এপারে আমার দেশ
যাপন পর্ব আধখানা নিঃশেষ।





বিজ্ঞাপনী কথার আড়ালে

তন্ময় চক্রবর্তী

জরুরি অবস্থায় কোনও রাস্তাই সোজা নয়
ভুল করলে তুমি নিশ্চিত অন্ধগলিতে...
ভাঙতে হলে ঢুকে পড়ো সরু যে-কোনও ফাটলে
তারপর সময়মতো বিজ্ঞাপনী কথার আড়ালে
গুঁজে দেবে বাজেয়াপ্ত খবর, গুপ্তচরের থলিতে

মৃত্যুর কোনও নিজস্ব সন্তান নেই
ওর কারবার, কেবল অন্যের সন্তান নিয়ে চলে
ক্যামেরার লেন্স, কারসাজি খানাতল্লাশি
অথচ আয়না চুপচাপ। সব সময় সত্যি কথা বলে

সন্ত্রস্ত মানুষের বাড়ির দেওয়ালে সন্ত্রাসের সাইনবোর্ড
নিখোঁজ হওয়া বন্ধুর লাশ, ঘাতক ছুরি, কালো গাড়ি
ওদিকে শীতের সন্ধে, প্রেমিকের উষ্ণ আলিঙ্গন, আনাড়ি।

হয় ভেঙে বেরোও নয়তো ভয় পাও
কবির সত্যসন্ধানী কলম, এমনই লিখেছে অন্ধকারে
অসমাপ্ত চিত্রনাট্য, সন্দেহজনক গ্রেপ্তার, তদন্ত
ছদ্মবেশ খুলে যায়, আততায়ী ধরা পড়ে

অনেকদিন তো গেল, সভ্যতার এইসব মধু অপেক্ষায়
নির্বাসিত গুহামানব ফিরে এসো স্বমহিমায়।

দেখি নাই ফিরে

(উৎসর্গ- সমরেশ বসু)

জয়ন্ত সরকার

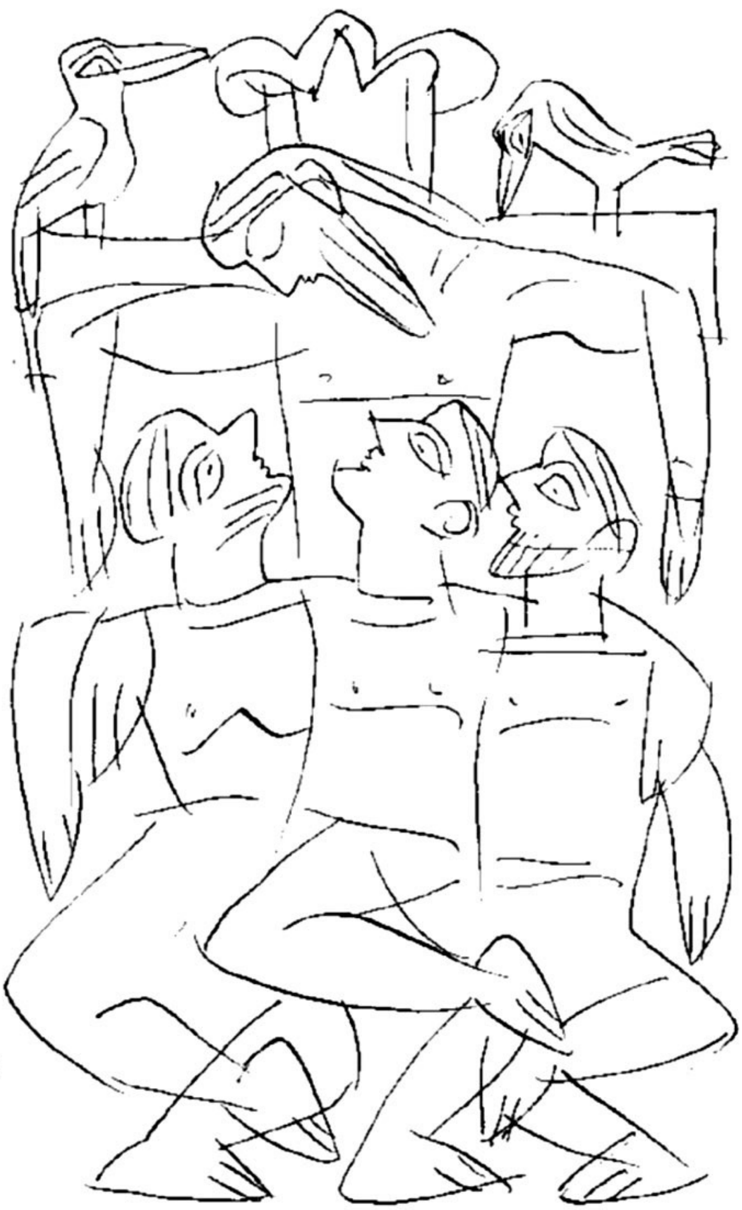
তবু যদি পথের ভাস্কর্যে লেখা থাকত নাম অথবা কলাভবন
ওই সোনাঝুরি-বন, ওই তিন-পাহাড়, ওই অনর্থগামিতা
তোমাকে কী দিত কিঙ্কর

খড়ি-আঁকা দেয়াল, না-ফোটা তারার কুঁড়িরা শালের ফাঁকে-
সবুজ মদের ভাঁড়ে বাঁধা-পড়া চাঁদ...আর...আর
চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালানো পাথরের ভেতর... এইসব

তোমার ছোট্ট মাটির কুটিরে হরিণেরা আসত জল খেতে
সাঁওতাল গ্রামের পাশ দিয়ে যাবার সময়
বেরিয়ে আসত একপাল কুকুর
বৃদ্ধ হাঁড়িয়াখোর মাঠ ভেঙে ছুটে ছুটে
মিশে যেত জোনাকির দেহে
আর আকাঁড়া চালের গন্ধ রাতকে নিঃস্ব করে দিত কৃপণতায়

তবু এত আলো, এত আলোর ঝলক
কেন এত নক্ষত্রের ভিড়, ভূগর্ভস্থ পাষাণে নেমে
শিল্পের আর-এক নাম রেখেছিলে দৃশ্যায়ন
পলাতক কল্পনার শ্বাসরোধ করে
দেখতে অনির্বচনীয় কিছু পড়ে আছে কি না
দ্রুত গেঁথে দিতে তাকে রূপ-রূপম-রূপাধারে
ফিরে স্বপ্নে, অর্থহীন শোকে
মুহূর্তে ঘোরাতে ছায়াপথ

স্মৃতিফলকের মতো পড়ে আছে প্রস্তরের রূপ
মেধার বিজন ঘিরে অনেক হয়েছে দেখা, প্রতিদিনের সাধনা
নিশ্চুপ মুদ্রায় ছেয়ে কত অশ্বত্থের শিকড়-পেছনে অর্ধবৃত্তে
ঘেরা আজও কালকূটের পৃথিবী...





ক্রুশবিদ্ধ

মেঘ বসু

যিশুকে নির্মমভাবে ক্রুশবিদ্ধ করা হল!
এই দৃশ্য যাঁরা দেখলেন
তাঁদের সম্পূর্ণ ভুল হল!

ক্রুশে যিশু ছিলেন না!
মৃত্যু ও মিথ্যেকে ক্রুশে রেখে
যিশু নেমে এলেন মাটিতে

চোখে মোটা পরদা বাঁধা থাকলে
সমস্ত কিছুই অন্ধকার মনে হয়
স্বভাবতই সবার সামনে দিয়ে
যিশু চলে গেলেন মেরির কাছে

মিথ্যে, শঠতাকে ক্রুশবিদ্ধ করে
অন্ধ ও মূর্খের দল হো হো করে
হাসতে লাগল!

ফলনের আগে ও পরে

পায়েল সেনগুপ্ত



নিভৃত সন্ধের আড়ালে
কেমন যেন বেঁচে থাকা পালটে যায়
বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎ নিয়ে মেঘ
চুপ করে বসে থাকে নিয়তির মতো
যেন এই ধ্রুব সত্য
আবহাওয়া দপ্তরও জানবে না কোনওদিন
কার আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে
কোথায় নয়ছয় হবে ফলনের ইতিহাস
জীবন জুড়ে ফসলের গল্প
না-জন্মানো বীজেরই তো সেই নাম অন্ধকার
তবুও লক্ষ্মীমন্ত ধানের শিষ
স্বপ্ন নিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয় আকাশে
বিশ্বাসঘাতক আকাশ জানে শুধু
রক্ত নয়, পট পরিবর্তন আসলে রঙের খেলাই
গোধুলি যতই ধুয়ে দিক
সুন্দরী আলো সেই সন্ধ্যাই ডেকে আনে।



বিসর্জনের দিন

মানসকুমার চিনি

বিষাদ আর মৃত্যুর মধ্যে
যে খেলা কর সে তো অনন্ত ঈশ্বর
তবু অন্ধকার-তিরিশ বছর পূর্বে
সে যে শহরে ছিল
ট্রেনের শব্দে বেঁচে থাকার জীবন
চাঁদকে নিয়ে খেলা করত
এক সংসারে
হঠাৎ একদিন পড়ন্ত গোধুলির আলোয়
সে চলে গেল সংসার বিসর্জন দিয়ে
পড়ে থাকল কাটা মুখ, ভাঙা শরীর
বড় নিঃসঙ্গ যেন বিসর্জনের মূর্তি
যেভাবে গঙ্গার ঘাটে ভেসে থাকে।

মৃত্যুসংবাদ

সুমন মহান্তি



মৃত্যু এক খবর
পরমুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে দূরভাষে, মুখে মুখে, বাতাসের ফিসফাসে
মৃত্যু এক খবর
দায়িত্ব নিয়ে জানাতে হয় ব্রেকিং নিউজ়ের দ্রুততায়
খবরের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ও-প্রান্তে শোনা যায়:
“কখন বডি নিয়ে যাওয়া হবে শ্মশানে? ক’টায়?”
সেই খবরে ফুলের দোকানে বুকে তৈরি হয়
কখনও এক মিনিট নীরবতা পালন
পাড়া-প্রতিবেশী যারা চৌকাঠ মাড়ায়নি বহুকাল
দরজা পেরিয়ে ঢোকে, সামাজিক সৌজন্যে একবার দেখা
বডি কখন যাবে শ্মশানে, মৃত মানুষের বেশিক্ষণ নেই
জীবিত সমাজে অধিকার: কে এখনও আসেনি, আর কত দেরি হবে?
আত্মীয়রা একে একে পাশে, শববাহী গাড়ি দুয়ারে দাঁড়িয়ে
তাড়া ঘনঘন, কান্নারও নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে
মৃত্যু এক খবর
অজান্তে উদ্‌যাপন, স্থিতির মাঝে আলোড়ন, বলার মতো ঘটনা

মৃত্যু শুধুই খবর, গুঞ্জনে, হাওয়ার বেগে, দূরভাষে
অলিখিত দায়িত্ব নিয়ে সবাই সবাইকে জানায়
মৃত্যু শেষমেশ একান্ত স্বজনের শোক
পারলৌকিক কাজের পরে ফাঁকা ঘরে হাহাকার
চলে গেছে একজন, সমস্ত খবরের সীমানা পেরিয়ে, অনন্ত শূন্যে।

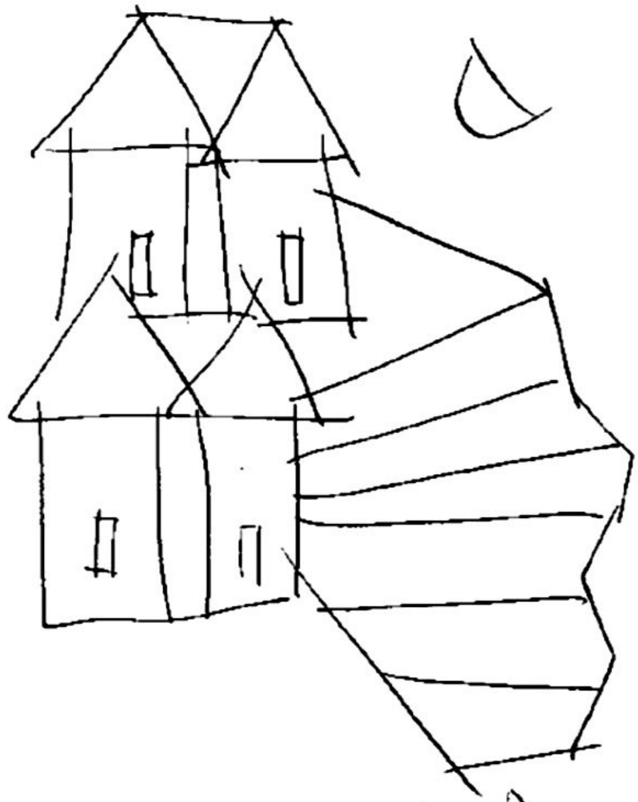


দিগন্ত

দেবাশিস তেওয়ারী

বাতাস খুব দ্রুত ছুটছে
গাছে গাছে শাখায় শাখায়
মেঘ কালো করে এলে একতারা বৈষ্ণবী
আকাশে এলোচুল উড়িয়ে দেয়।
চুল উড়তে উড়তে যখন দিগন্তকে করে
আচ্ছাদিত। হঠাৎ শব্দ শোনা যায় শোঁ শোঁ।
বাতাসের আগে ছুটতে ছুটতে সেই বৈষ্ণবী
হাঁপিয়ে পড়ে আমার দোরগোড়ায়।

দিগন্তকে এত কাছে এর আগে কখনও পাইনি।



ত্রিবেণী

অগ্নি রায়

এক
প্রাচীন দেওয়াল সিঁড়িতে পুরনো কথা
বসে নেই কেউ, পাহারা দিচ্ছে স্মৃতি,
বাতিল পাতার আড়মোড়া ভাঙা শ্বাসে
বদলে যাচ্ছে চাতালের রীতিনীতি।

দুই
মেঘের সঙ্গে খেলতে নামা এতই সহজ
তাক লেগে যায় মধ্যদুপুর, মনপাহাড়ে
প্যানোরামিক তুমি ওগো শিখর আমার
সমস্ত সুখ-অসুখ ভেজাও ধূসর জ্বরে।

তিন
অর্ধেক মুখচ্ছবি তার, বাকিটা আকাশ
অধর উপচে পড়ে, ওষ্ঠ বন্যা-কবলিত,
টিপের অংশটুকু লেগে চাঁদের গভীরে,
কাজল-কার্ফু চোখ জানে না অতশত!



মাটির গোলাপ

কৌষিকী দাশগুপ্ত

আলেয়া আর ধানের খেতে
ওই যে দূরে সাঁকো
হিজলবনে ঝড় উঠেছে
ওকেই না-হয় ডাকো।

বুকের ভেতর উঠোন আঁকা
চোখের তারায় বাড়ি
এমন একটা রাস্তা পেলে
ছিনিয়ে নিতে পারি।

তাকেই তুমি বোঝাবে সুর
চুম্বনে আর ঠোঁটে
মাটির গোলাপ অনাদরেই ফোটে।

ওখানে দেশ ঘুমিয়ে আছে
শিশিরকণায় মুক্তোদানায়
আঙুল যেমন ছোঁয়
মায়ের নাড়ি ছেঁড়ার আগে
বিষাদ বিস্ময়।

এই তরঙ্গে ভাসিয়ে দিলাম
সকল চেনা সকল জানা
জঠর নদীর নাও,
টানো আমায় তোমার কাছে
এবার ফিরতে দাও।

পত্রালাপ

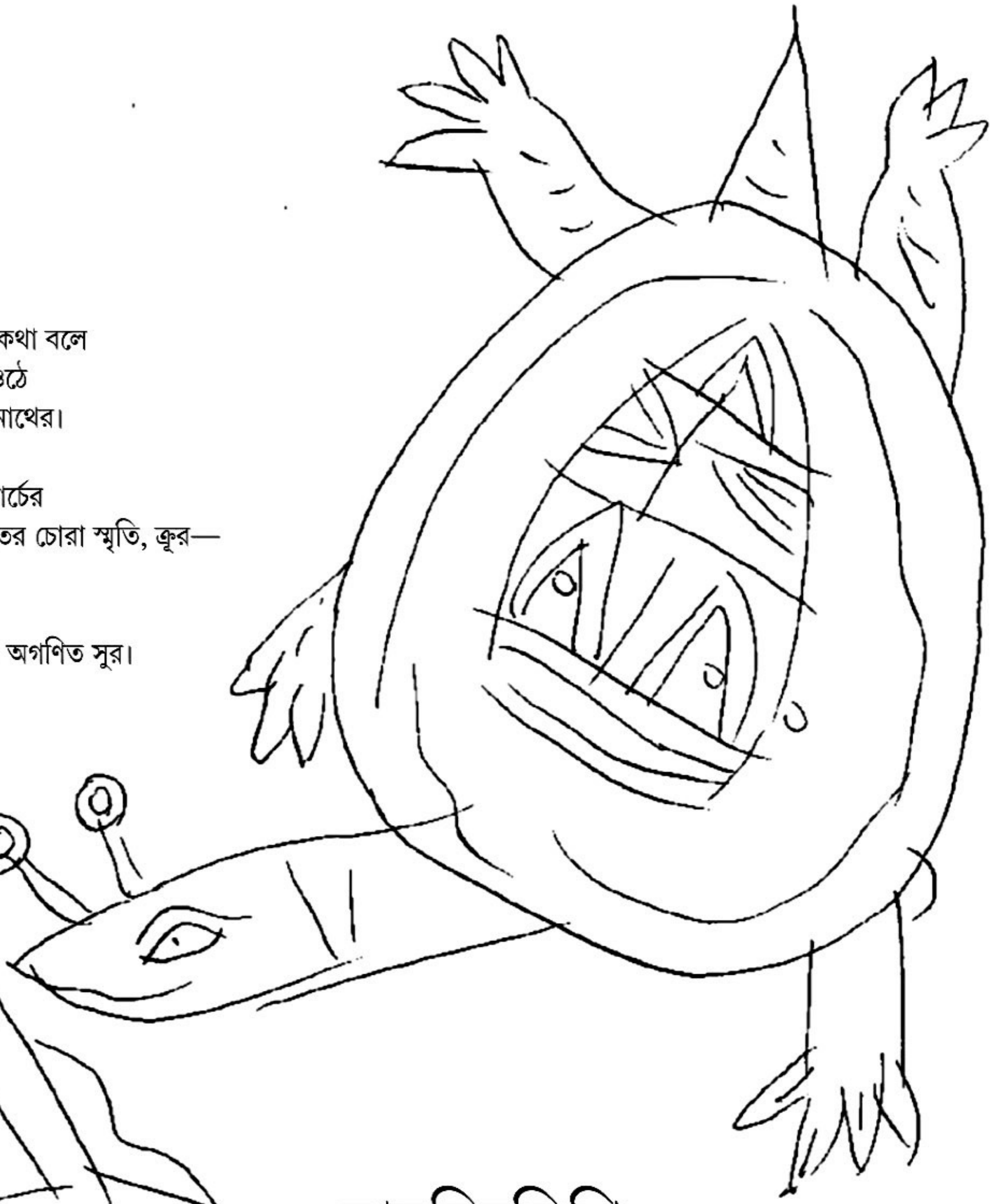
শুভদীপ দত্ত চৌধুরী

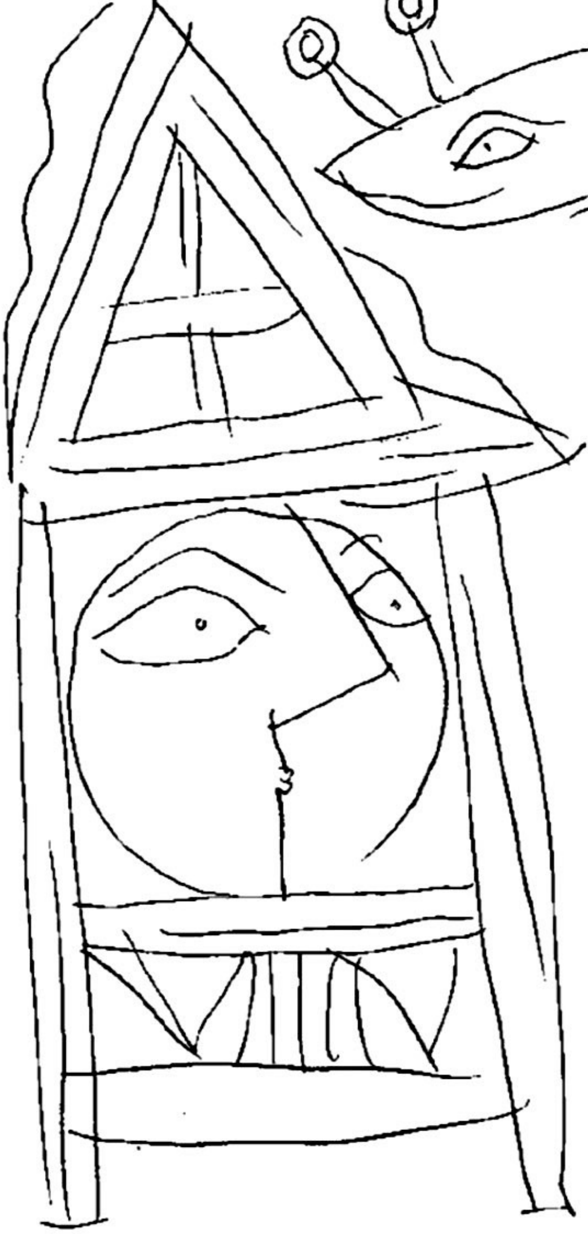
এই পত্র তোমাকে লিখেছি।

দিনান্তের রক্তলাভাজলে
এই পত্র ছটফট করে, দুঃখের কথা বলে
চুপ থাকে, কখনও-বা গেয়ে ওঠে
দু'কলি প্রেমের গান— রবীন্দ্রনাথের।

ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় প্রাচীন চার্চের
হাওয়া মেখে ছুটে আসে বিগতের চোরা স্মৃতি, ক্রূর—

এই পত্র আমি নই, তুমি নও,
এই পত্র আমাদের মাঝে থাকা অগণিত সুর।





মানচিত্রলিপি

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

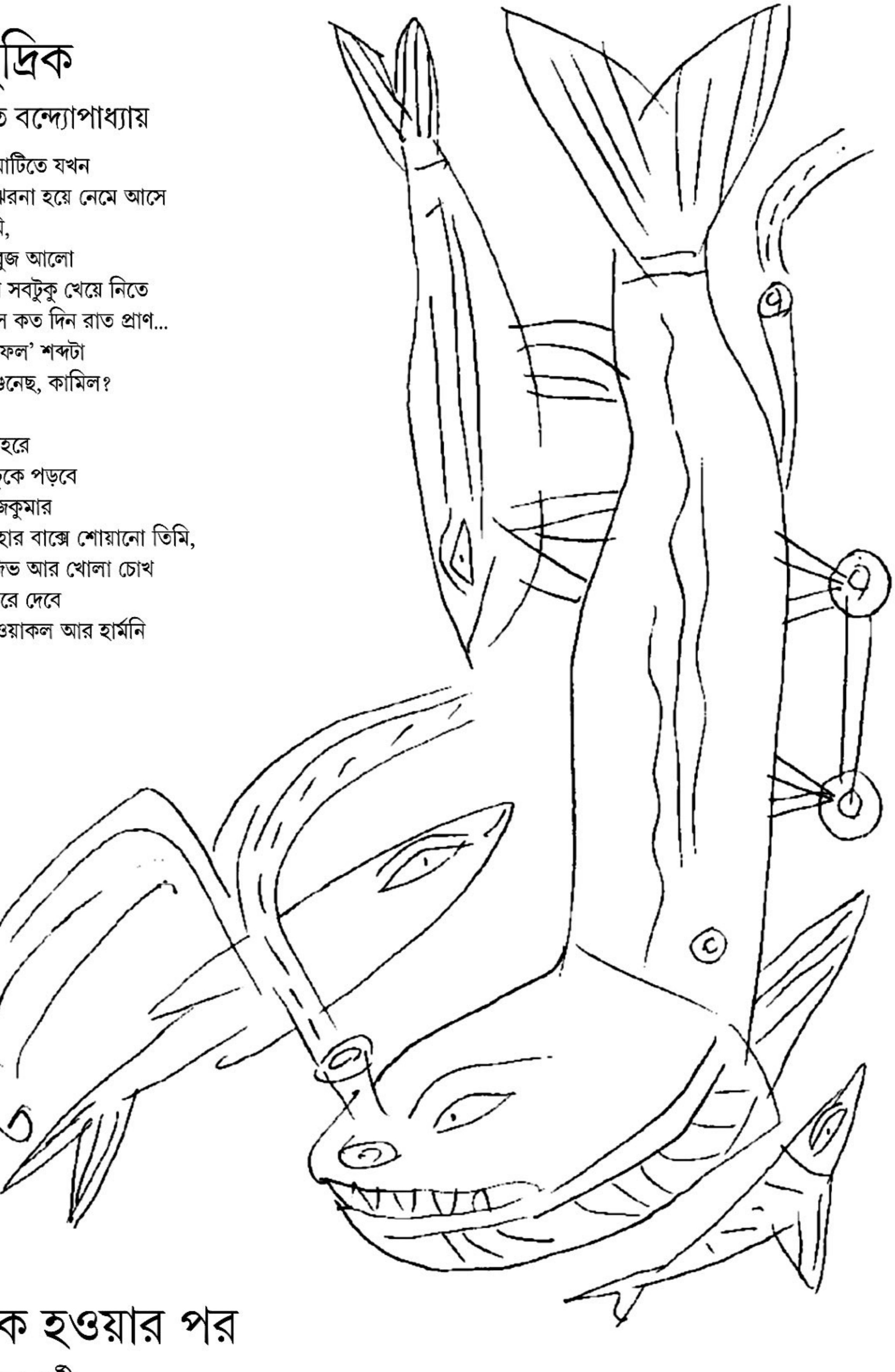
দীর্ঘ ছায়ারা পাশে এলে নত হয়ে আসি।
প্রতিটি পাতার ভাঁজে আঙুল ছুঁইয়ে মেঘ এঁকে
মানচিত্র খুঁজি, তোমার মুখের মতো প্রিয় খুব—
সে ভূমির কাছাকাছি অজস্র ঝুরি নেমে
পুরনো দিনের মায়াঘোর ডেকে নেয়! একদিন
কুয়াশায় যাব বলে আগুন জমাই— আলোঘর
গোপনে সাজাই। আচমকা হাত থেকে পড়ে গেলে
কুড়নো সময়— দু'হাত ছড়িয়ে তার ঘড়ি-রূপ
বসে থাকা দু'খানি কাঁটায়। এইসব মিলেমিশে
অনন্ত দ্রাঘিমার কাছে রঙিন নিশান— হাতছানি
থেকে একে একে খিদে ও ঘুমের মতো
আবছায়া খুলে দেয়। অশরীরী ছায়ার ভিতর
পাশ ফিরে শুয়ে থাকে স্বদেশ স্বজন আর
চিহ্নহীন পরিচয়হীন কাঠামো প্রাচীন।
বুড়ো কাছিমের মতো অচল পিণ্ড থেকে
ক্রমে ক্রমে নড়ে ওঠে অ্যান্টেনা, মহাজাগতিক।
সারিবদ্ধ গাছদেহ ছায়াগুলো খুলে রেখে হেঁটে চলে যায়।

সামুদ্রিক

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সমুদ্রের মাটিতে যখন
শব্দহীন ঝরনা হয়ে নেমে আসে
নীল তিমি,
মৃত্যুর সবুজ আলো
একেবারে সবটুকু খেয়ে নিতে
ছুটে আসে কত দিন রাত প্রাণ...
‘হোয়েল ফল’ শব্দটা
কখনও শুনেছ, কামিল?

প্রতিটি শহরে
একদিন ঢুকে পড়বে
বামন রাজকুমার
আর লোহার বাক্সে শোয়ানো তিমি,
তাদের জিভ আর খোলা চোখ
তছনছ করে দেবে
সমস্ত হাওয়াকল আর হার্মনি



নায়ক হওয়ার পর

সুদীপ চক্রবর্তী

আমরা যখন সিনেমা দেখতে যেতাম ছোটবেলায়, এই লোকটিই টর্চ দেখাত। স্কুলের হেডস্যারের মতো সম্ভ্রম পেত সে। ব্যালকনি বা কোনার দিকের সিটগুলি ওকে দেখলে নড়েচড়ে বসত। শান্ত-রোগা লোকটি টর্চ জ্বেলে দেখিয়ে দিত আমাদের ভবিষ্যৎ, তারপর পুরোটাই তো সিনেমা। উত্থান-পতন-ঝাড়পিট বা রোমান্স সবেতেই একইরকম থাকত লোকটা। আজ বহুদিন বাদে দেখা হল সামনাসামনি, সিনেমা হল উঠে গেছে অনেকদিন। এখন আমি নিজেই ক্যারেকটর, দুঃখী-দুঃখী মুখ, বেওয়াফা সনম। লোকটির হাতে আজ আর টর্চ নেই। চারিপাশে এত অন্ধকার, আমরা দু’জনেই সিট খুঁজে পাচ্ছি না।

কাঠগাড়ি

দুলালেন্দু সরকার

স্যাটল ট্রেন। কাঠগাড়ি। আসছে শ্যাডোল থেকে
যাবে কাটনি পর্যন্ত। আমরা উঠি উমারিয়া থেকে

দু'দিকের জানলায় বাঁধা কাঠের বোঝা
ভেতরে যাত্রীদের সাথে কাঠুরিয়া নারী-পুরুষ
আছে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরাও
সকলে নির্বিকার মুখে চলেছে গন্তব্যের দিকে

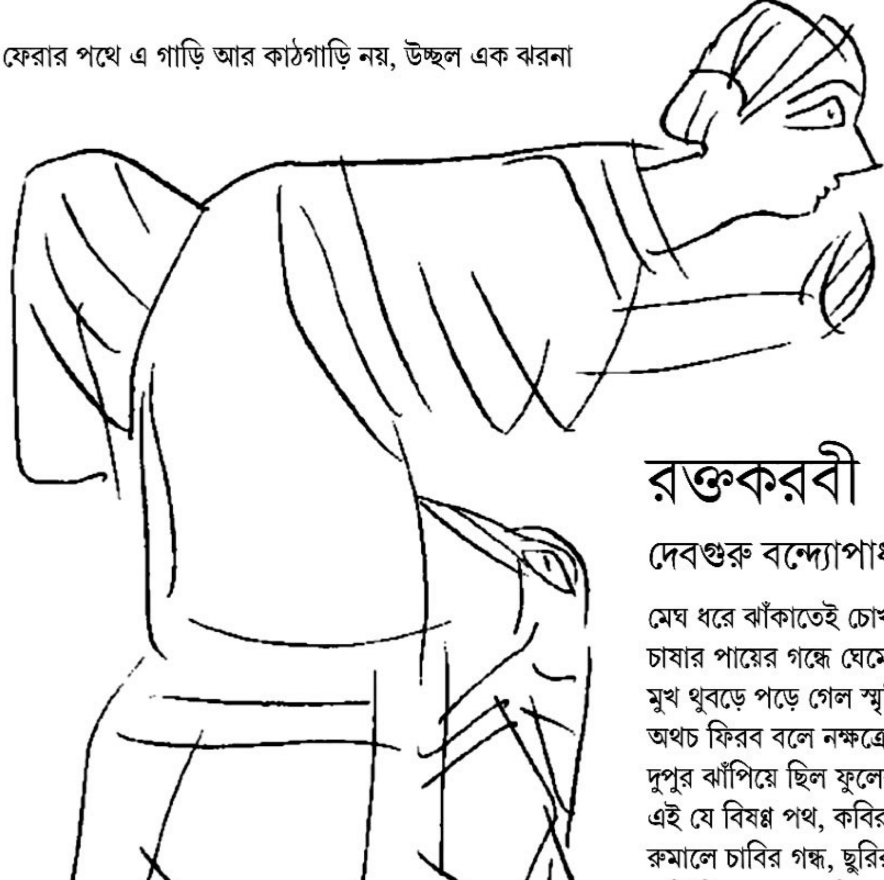
দু'দিকে সবুজ প্রকৃতি। কাছে-দূরে পাহাড়সারি
মাঝে-মাঝে নিচু-নিচু স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায়
আরও কাঠের বোঝা আরও মানুষ উঠে আসে
হেলতে-দুলতে এ গাড়ি একসময় পৌঁছে যায় কাটনি স্টেশনে

আমরা যখন সুরম্য পার্কে ঘুরে বেড়াই
পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে ফোটো তুলি
ওরা তখন চায়ের দোকান, ভাজির দোকান, মিষ্টির দোকানের সামনে
হাঁক পেড়ে বলে, 'লকড়ি চাহিয়ে বাবুজি...'

ফেরার পথে এ গাড়ি আর কাঠগাড়ি নয়
মেয়েরা কেউ কিনেছে চুড়ি, কেউ লিপস্টিক, কেউ আবার গোপন ওষুধ
ছেলেরা তাদের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফাস কথা বলছে
চুলে গুঁজে দিচ্ছে বুনোফুলের মালা

ফেরার পথে এ গাড়ি আর কাঠগাড়ি নয়, উচ্ছল এক ঝরনা





রক্তকরবী

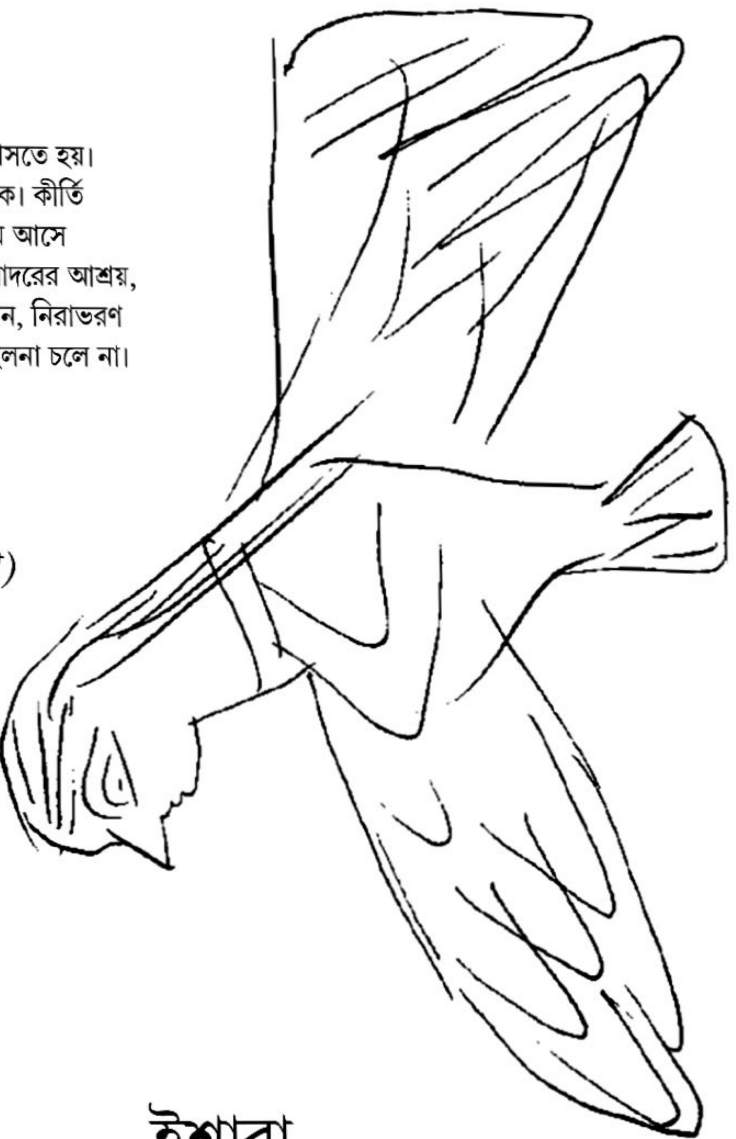
দেবগুরু বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘ ধরে ঝাঁকাতেই চোখ নামল ভুঁয়ে
চাষার পায়ের গন্ধে ঘেমে উঠল মাটি
মুখ থুবড়ে পড়ে গেল স্মৃতির নামাল...
অথচ ফিরব বলে নক্ষত্রের ঘুমে
দুপুর ঝাঁপিয়ে ছিল ফুলের চাবুকে!
এই যে বিষণ্ণ পথ, কবির পোশাক
রুমালে চাবির গন্ধ, ছুরির পাহাড়
তুমি কি হালকা শাড়ি, ঘরের বাতাস?
করবীর রক্ত দিয়ে আমাদের চাষ!

নিভৃতচারিণী

যশোবন্ত্‌ বসু

তোমার কাছে এলে সব দর্প ও অহংকার খুলে রেখে আসতে হয়। দিনান্তে সন্ধেডানা পাখিটির উন্মুখ উড়ান বেঁধে রাখি বুকে। কীর্তি ও অপরাভব ঢেকে যায় দিগন্তের লালে। সব কর্তৃত্ব নুয়ে আসে ঝরাপাতায় নিষ্প্রাণ। নিভৃত মর্মর বুনে রাখে অনুপুঙ্খ আদরের আশ্রয়, সমর্পণের মর্মকথা। সজীবে সংগোপনে এমনই বাসনাটান, নিরাভরণ না-হয়ে উপায় নেই। চিরহরিৎ, তোমার সঙ্গে কোনও ছলনা চলে না।



একাকী

(ঋণ ও উৎসর্গ— এডগার অ্যালান পো)

দেবায়ুধ চট্টোপাধ্যায়

শৈশবের শুরু থেকে থাকিনি কখনও
যেভাবে সবাই থাকে— আঁকিনি কখনও
যেভাবে সবাই আঁকে— অবগত আমি
আমার সমস্ত স্তোত্র ভিন্নপথগামী
বিষাদগুলোও ভিন্ন— আমার যা কিছু
আনন্দ উল্লাস আর দুঃখ উঁচু-নীচু
অন্য কারও মতো নয়, আগলে আগলে রাখি
যা কিছু বেসেছি ভাল, বেসেছি একাকী
এবং শৈশব, সে তো বিপর্যস্ত ভোর
ক্রমশ ঘনিয়ে এল বিপন্নতা ঘোর
নিঃস্বের তাণ্ডবে ধৃত— জীবনের যত হাসিখেলা
কী ছিল রহস্য তাতে, এ-বেলা ও-বেলা
তরঙ্গ উচ্ছল নৃত্যে জেগে ওঠা নদী ও প্রপাত
পর্বতের শৃঙ্গে গাঁথা রক্তমাখা অন্ধকার রাত
হত্যা হল সূর্যোদয়ে— আমার চারপাশে
হেমন্তের অবক্ষয়ে ছিন্নপত্র ভাসে
আকাশের বুক চিরে ধেয়ে আসা বিদ্যুতের রাগে
যা কিছু পশ্চাদপদ চলল আগেভাগে—
বজ্র থেকে, ঝড় থেকে কুক্ষিগত বাঁচার মরসুম
সফেদ মেঘের ভেলা দিবারাত্রি আকাশকুসুম
(তোমরা ভেবেছ যাকে দৈবলীলা, স্বর্গের সমান)
সে যেন আমার চোখে মূর্তিমান কোনও শয়তান •



ইশারা

আকাশলীনা

শরীরে মেলে রেখেছি কঠিন ব্যাধি,
গায়ে তার জাফরি-কাটা দাগ,
সেখানে বদল হচ্ছে অকম্প পোর্ট্রেট।
ব্যাধি হাঁটে একা, কখনও দু'জনের মাঝে।
সে রক্তচোখে ভয় প্রত্যাখ্যান করে তর্জনী থেকে স্বপ্ন ছুড়ে।
মাঝে-মাঝে আমি তাকে ছদ্মনামে প্রেম বলে ডাকি,
প্রতিদিন ধর্ষণ হওয়ার আগে,
শরীর জুড়ে উলকিতে আঁকি নক্ষত্রের আগুন।
আগুনে জ্বলে ধানখেত,
বুকে জমে থাকা হেমন্তের ঝরাপাতা,
কালচে জলে রাধিকার স্নানদৃশ্য।
তবু নিশ্বাসে বেঁধে রাখি প্রেম।
টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাধি,
তাতে থমকে আছে একজোড়া নরম উচ্চারণ।
উলকির ক্ষত থেকে গড়িয়ে আসছে তীব্র গোধূলি!
ডুবে থাকা সুচে কী ছিল, নশ্বর বিষাদ
নাকি বিন্দুবিন্দু জাফরি কাটা ক্ষরণের
কারু-ইশারা!



রাখাল

অর্পণ গুপ্ত

ঠিক কতগুলো মেওয়া সবুরে ফলেছে জানা নেই
অথচ বারুদ শেষ হবার মুখে...

অনাথ প্যাকাটি আঁকড়ে ধরছে আঙুল।

মাঝে বাকি পড়ে আছে কিছু ঢেউ
তারা সারা রাত ওঠানামা করে শরীর বরাবর

সুর আসে
জানলা খুলে রাখি

অঘ্রানের রোদ,
নিবে যাওয়ার আগে একবার রাখাল হতে দাও...



রেজ়লিউশন

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

এসেছ উদ্যম, টেনেছি গাঁজাদম, মুখে ববমবম জয়োল্লাস...
বৃথা অহংকার, সবই তো কংকাল— পেঁচিয়ে শঙ্কার অক্টোপাস...
কোথায় নামযশ, আসে না কামজ্বর, আসলে আনপড় কর্মনাশ...
এবার ছাড় ভয়— ছুটেছে কনভয়...উধাও সংশয়...বর্ষ-মাস...
শুধু কোয়ান্টাম মাথায় রাখতাম; মুঠোয় মাখতাম ফসফরাস...
হাওয়ায় ওড়ে কথা, হারানো সভ্যতা...স্তব্ধতায় মিশে হ্রস্বশ্বাস...
ওই যে দড়ি চল, সামলে মনোবল, দু'পায়ে টলমল...সর্বনাশ...
ভাবনা মাড়িয়েছি— যত্ন লাগিয়েছি; পতিত জমি কাছে ব্যর্থ চাষ...
হব না চুরমার এভাবে বারবার, মুছেছি নাম্বার, বদভ্যাস...
বাইরে উদ্দাম— ভেতরে দরদাম; আদৌ শুনতাম? অঝোরভাষ...
হয়নি আর দেখা, শয্যা আজও ফাঁকা, ভূতের ভয়ে একা ধড়ফড়াস!...
বছর ছুটে চলে জড়াই বল্কলে...উঠেছে অঞ্চলে অমলতাস...
জানি না কদ্দূর ছড়িয়ে রোদ্দুর— গলায় দোল-দোল মরণফাঁস...
পালাব দূরদেশ সবার উর্ধ্বেই— এই শতাব্দীর কলশ্বাস

ভালবাসা, লিখে রেখো

অদিতি বসুরায়

উপত্যকায় হিম নেমে এল বলে, আমরা ভেবেছি ফেরার শকট এল
এমন সময়, বুলেট আগুন দু'য়ে— গর্জে উঠল। কনভয় উড়ে গেল

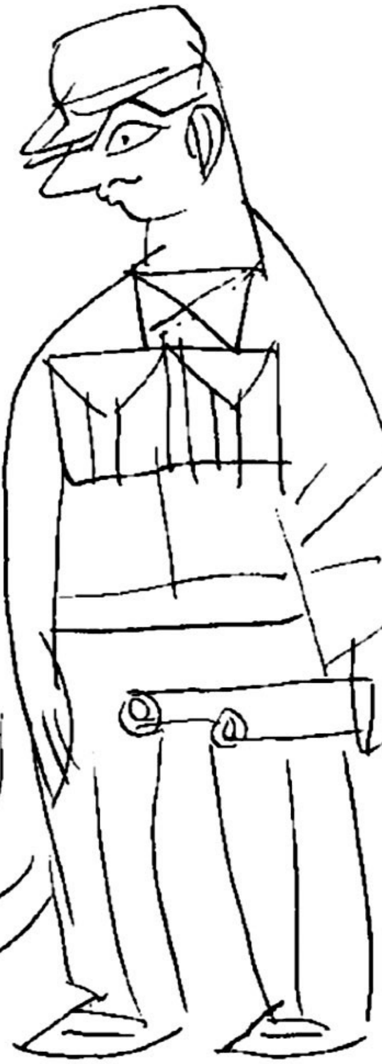
বুলেট এখন ইচ্ছেমতোই ছোটে— বুলেটকে তাই ভয় পাব? ভেবেছিলে?
টিউলিপ যদি উড়েপুড়ে যায় ঝড়ে, আমরাই পারি ফুল দিতে মরাডালে

সীমান্তগ্রামে রাত থাকে সারা দিন! সীমান্তগ্রামে একতারা থেমে গেছে
এদিকে আমরা অসহায় জেগে থাকি, আমাদের শুধু নিউজ় চ্যানেল আছে

খবরে দেখায় নিভন্ত জনপদ। সীমান্তে সেনা ঘুমায় না কোনও রাতে
ওদের জন্য আমাদের মাঠে ফুল— ওরা আছে বলে, আচমন বাড়া ভাতে

সুতরাং সব শেষ করা, এত সোজা? দুইটি দেশই আদি থেকে প্রতিবেশী
এদেশ-ওদেশ চলাচল করে পাখি, ওড়বার নেই সীমান্ত, রেষারেষি

আবার আকাশে মেঘ ঘন হয়ে এল! রাতের হাতটি দীর্ঘতর আবারও
বন্দুক নয়, ভালবাসা, লিখে রাখো। আগামী সকাল টেনে আনো। যদি পার...





মিসক্যারেজ

সায়ন্তনী নাগ

এবার ওঠেনি ধান, নবান্ন উৎসব হল মিছে,
আদিগন্ত পড়ে আছে ফুটিফাটা কার অভিমান
ও ফসল, এই বুকে জন্মজল দুধ হয়ে জমে
একটু ছোঁয়াও ঠোঁট, শুষে নাও আমার আঘ্রাণ!

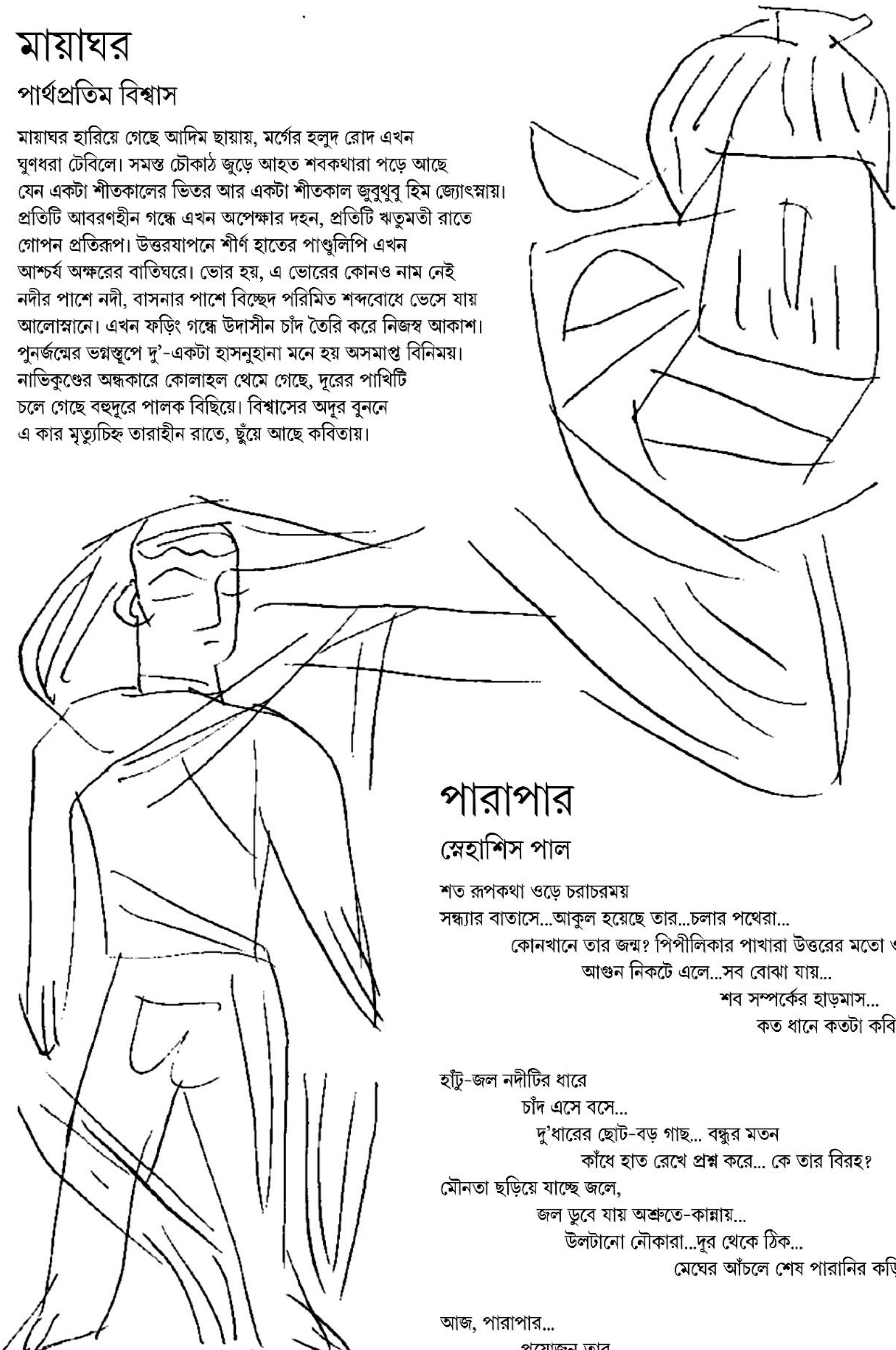
ঘরকন্নার ছলে ছুঁয়ে দেখি কচি চারাগাছ
এমনই সবুজ ছিল, সেও জানি মাটির গভীরে
আঁচলে আড়াল রাখি তলপেটে শিকড়ের দাগ
বলে যায় বন্ধ্যা জমি শুখা শুয়ে, নাভিটুকু ছিঁড়ে-

চলে গেছে, এখন দাঁড়াই শূন্য গোলা, অজন্মার দিন
কুয়াশার রং ধরে পোড়া খেত, অসমাপ্ত চাষ
আমাকে দাগিয়ে দেয় লবণাক্ত ঊষর যৌবন
ও অজাত হৃদ্‌ঘাত, তোকে দিই সব দীর্ঘশ্বাস!

মায়াঘর

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মায়াঘর হারিয়ে গেছে আদিম ছায়ায়, মর্গের হলুদ রোদ এখন
ঘুণধরা টেবিলে। সমস্ত চৌকাঠ জুড়ে আহত শবকথারা পড়ে আছে
যেন একটা শীতকালের ভিতর আর একটা শীতকাল জুবুথুবু হিম জ্যোৎস্নায়।
প্রতিটি আবরণহীন গন্ধে এখন অপেক্ষার দহন, প্রতিটি ঋতুমতী রাতে
গোপন প্রতিরূপ। উত্তরযাপনে শীর্ণ হাতের পাণ্ডুলিপি এখন
আশ্চর্য অক্ষরের বাতিঘরে। ভোর হয়, এ ভোরের কোনও নাম নেই
নদীর পাশে নদী, বাসনার পাশে বিচ্ছেদ পরিমিত শব্দবোধে ভেসে যায়
আলোস্নানে। এখন ফড়িং গন্ধে উদাসীন চাঁদ তৈরি করে নিজস্ব আকাশ।
পুনর্জন্মের ভগ্নস্তূপে দু'-একটা হাসনুহানা মনে হয় অসমাপ্ত বিনিময়।
নাভিকুণ্ডের অন্ধকারে কোলাহল থেমে গেছে, দূরের পাখিটি
চলে গেছে বহুদূরে পালক বিছিয়ে। বিশ্বাসের অদূর বুননে
এ কার মৃত্যুচিহ্ন তারাহীন রাতে, ছুঁয়ে আছে কবিতায়।



পারাপার

স্নেহাশিস পাল

শত রূপকথা ওড়ে চরাচরময়
সন্ধ্যার বাতাসে...আকুল হয়েছে তার...চলার পথেরা...
কোনখানে তার জন্ম? পিপীলিকার পাখারা উত্তরের মতো ওড়ে:
আগুন নিকটে এলে...সব বোঝা যায়...
শব সম্পর্কের হাড়মাস...
কত ধানে কতটা কবিতা?

হাঁটু-জল নদীটির ধারে
চাঁদ এসে বসে...
দু'ধারের ছোট-বড় গাছ... বন্ধুর মতন
কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করে... কে তার বিরহ?
মৌনতা ছড়িয়ে যাচ্ছে জলে,
জল ডুবে যায় অশ্রুতে-কান্নায়...
উলটানো নৌকারা...দূর থেকে ঠিক...
মেঘের আঁচলে শেষ পারানির কড়ি...

আজ, পারাপার...
প্রয়োজন তার...

মুরলীকথা

এস মনিরউদ্দিন

কলস ভেসেছে জলে সংগোপন স্পর্শ পাবে বলে...

কোনও সাবধানবাণী বাতাসে ছিল না।
কোনও রামধনু রং আকাশ মথিত করেছিল—
উদাসী ঝরোকা ঠিক এমন বার্তা পায়নি তো।
নূপুরের ধ্বনি খুব সুদূরে চকিত অনুভবী
সেইমতো কেকাকথা সমূহ বিলাপ ঝরিয়েছে।

তবু, কিছু ঘেরাটোপ থেকে যায় বলে
কিছু পিছুটান, কিছু চাতুরি ও ছল—
আসঙ্গ বিলাসী কিছু শরীরী বিভঙ্গজুড়ে গান
ভেসে যায়। কলস ভেসেছে জলে সংগোপনে।
বসন্তের কলরব গাছের পাতায়, নভোনীলে
সম্যক যমুনা যেন বসনের রঙে রঙে নীল
হয়ে গেছে। অপিচ মুরলী খুব বিষাদিত
উদাসীন জটিল কুটিল।





মনখারাপ

অভিজিৎ রায়

মনখারাপ, তোমায় যদি ঘুম পাড়াতে বলি!
হাসতে বলি সামনে বসে না-থেমে একবারও!
শর্তহীন স্পর্শ চাই তোমার বিছানায়!
হাত ছুঁইয়ে বুকের ব্যথা কমিয়ে দিতে পার?

মনখারাপ, তোমায় যদি বন্ধু হতে বলি!
পারবে তুমি মুছিয়ে দিতে চোখের জল আজও?
কাছের তুমি, পাশের তুমি একাকিত্বে সুখী
অবসাদের শোকের সুরে নিজের মতো বাজো।

মনখারাপ, তোমায় যদি তাড়িয়ে দিই আমি!
তবুও তুমি আমার ঘরে অবসরের প্রিয়।
জানলা দিয়ে কুয়াশা ঢোকে, বিছানা ভেজে জলে;
অন্ধকারে আগুন জ্বেলে আমায় খুঁজে নিও।

মনখারাপ, অন্ধকারে জাপটে ধরি যদি!
লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যাবে বারান্দার কোণে?
মনখারাপ, কোথাও তুমি নেই অথচ আছো;
বাতাস হয়ে শ্বাসের সাথে বিষাদ মাখা মনে।

ঘুম

পাপড়ি গঙ্গোপাধ্যায়

চাঁদ তখন গাঢ়—
পুকুরের বুকে তার ধীর চুম্বন
জল ছাড়া ঘুম ভাঙায়নি কারুর।

খুঁজছিল ছোটবেলায় হারিয়ে ফেলা দুল।
ডুবসাঁতারের পারদর্শিতা ভুলতে চেয়ে
গলায় বেঁধে নিয়েছিল পাথর।
অথচ পাথর বলতে সে একসময় বুঝত
রঙিন মালা আর পাহাড়-পথের ভুল।

শূন্যে ভেসে থাকা মার্বেল সংসার ছেড়ে
দু'দিনের গ্রাম সফরের পালাগান।
জলের বিছানায় ঘুমোতে গেল কেন তার নিভৃত মৃদু প্রাণ!

সকলের গভীর স্বপ্নের অগোচর
পুকুরের নরম বুকে তার ঘুম,
কেঁপে উঠল জল আর চাঁদের ছায়া—
বাকি সব নিঃঝুম।



তার আর পর নেই...

পার্থজিৎ চন্দ

শান্ত পাহাড়ে বেড়াতে এসেছিলে কবে, আজ হিংস্র ঝোরার ডাক শোনো

এক জন্মের ভেতর বিষ-নীল কুয়াশার আদিম ইশারা। কোনও
জেসুইট পাদরির গম্ভীর ও দীর্ঘ ছায়া পাকদণ্ডী বেয়ে নেমে যায়
ক্ষতবিক্ষত ডানায় পাখি সেই ঘরে বসে, যার বারান্দায়
পাহাড়ি ফুলের ছোট টব। অর্কিডের লাল
নিজেকে ফোটায় প্রতিদিন মহামন্ত্রে, বুদ্ধস্তবে, সকাল বিকাল
কমলালেবুর গ্রাম মাথায় চাপিয়ে ছোট ছোট মানুষেরা আসে
একটি চুম্বনের স্মৃতি সেই কবে থেকে ঢেকে রাখা ছিল ঘাসে
সেই দস্যুতার গায়ে কত বরফ পড়েছে কত শীতের প্রহর
তবু তার থেকে আজও উঠে আসে জ্বরে পোড়া শরীরের ঘোর
মনখারাপের গানে ছায়া পড়ে কার? কোন আর্তনাদ
সব তছনছ করে খুঁজে নিয়েছিল নিয়তিতাড়িত খাদ

জীবনের মহা-শিল্প ধরে রাখে সব ... কিন্নরীর অন্ধচক্ষুমণি

তারপর? তারপর? তারপর?

তোমার মতোই একা, প্রায় ভূমিকাবিহীন, ঘুমিয়ে পড়েছে চাঁদ উসমানি

ইয়া দেবি সর্বভূতেষু

রত্নদীপা দে ঘোষ

পূর্বকল্প অবসানের পরে তৈরি হল প্রলয়কাল। পৃথিবী পরিণত হল কারণসমুদ্রে।
বিষ্ণুর যোগনিদ্রা অবসানকালে তাঁর নাভিপদ্মে জেগে উঠলেন সৃষ্টিবিধাতা ব্রহ্মা।

বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে উৎপন্ন মধুকৈটভ, ব্রহ্মাকে হত্যার জন্যে উদ্যত হলে
হে ভগবতী, স্বয়ং অন্তরীক্ষই তোমাকে আহ্বান জানালেন মর্ত্যের স্বর্গবীথিতে।

অমৃতজ্যোতির আগমনে শারদ সংহিতা, দিকে দিকে প্রভাতের কণ্ঠবীণা।
সনাতনী তুমি। ত্রিগুণাতীত নাট্যসংগীতা। তমোগুণে শিবের পত্নী পার্বতী।
তুমি ধাত্রীবিদ্যা। মায়াছন্দের লয়কারিতে পালন করছ আমাদের।

নিজদেহ সম্ভূত অজস্র উষা। তুমি অপাপবিদ্ধা। চিরন্তনী কাত্যায়নী।
আদি নেই। অন্তও নেই তোমার। বিশাখায় তুমি আগমসিদ্ধা।

মৃন্ময়ী, এই চরাচর তোমারই মোহনরূপ। অজস্রবতী চিন্ময়বিদ্যায় ভরপুর।

তুমি মেধা। মেধাশ্রী। সৃষ্টিকে রক্ষার জন্যে প্রলয়স্থলে হলে আবির্ভূত।
শঙ্খনিনাদ তোমার। ধ্বনিত হল সর্বকূলে, পর্বতপ্রমাণ নীল রৌদ্রপুঞ্জ।

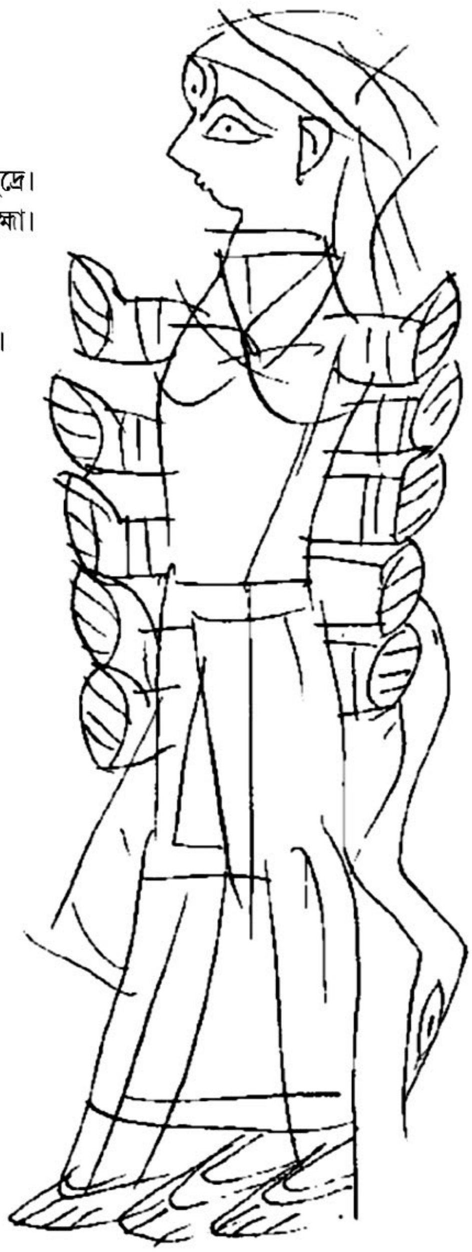
ভুবনমোহন তেজোরাশি দিয়ে গড়া তোমার মহাশিখরের চূড়া।
তুমি স্বাহা। পিতাগণের তৃপ্তি-সমিধ। ইন্দ্রিয় দমনকারিণী মহাশক্তি।
মানবের কল্যাণে সর্বমঙ্গলা নারায়ণী, সেনাও তুমি।

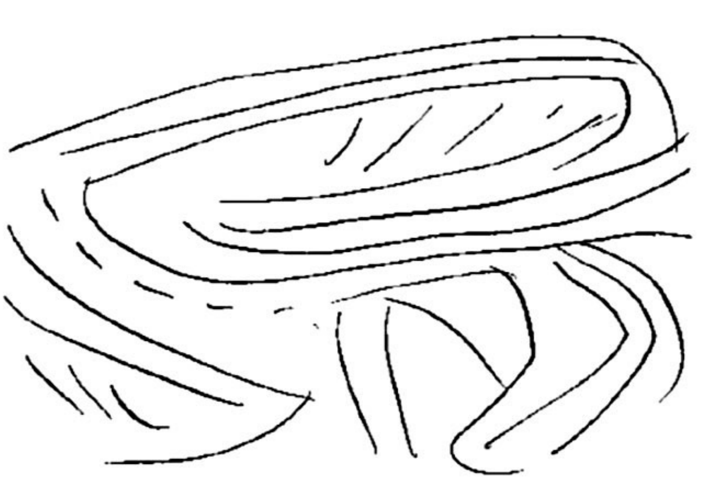
দংষ্ট্রাকরালিনী। কখনও আবার দশভুজা আদ্যাশক্তি।
উদয়কালীন পরমবিদ্যাই তোমার ভ্রুকুটি চরম। শ্মশানরূপিণী
চক্র সুদর্শনা, বজ্ররূপে শত্রু দমন করলে নিজস্ব তাণ্ডবে।

তোমার কাছে অশেষ ঋণে ঋণী, হে দুঃখনাশিনী দেবীদুর্গা!

তোমার ত্রিশূলে ভূমানন্দের ঋকমন্ত্র। চিররুদ্রের শঙ্খিনী, বসুধা।
চতুর্বর্গ দান করো হে বিশ্বনিখিল, হরিনেত্র নিবাসিনী অপরূপা।

দেবী প্রপন্নার্তিহরে, প্রসীদ। প্রসীদ মা।





কৈফিয়ত

সঙ্ঘমিত্রা হালদার

অনন্তের ইশারা কোথাও নেই আর
সব অনন্তের মাথা ঠেকে গেছে আমাদের নিচু ছাদে
আমাদের ওষুধে শুশ্রূষা নেই
সব নিরাময় চুরি গেছে কাকেদের সভামাঝে
সব বনপথ ঢেকে গেছে সহিংস আলাপে

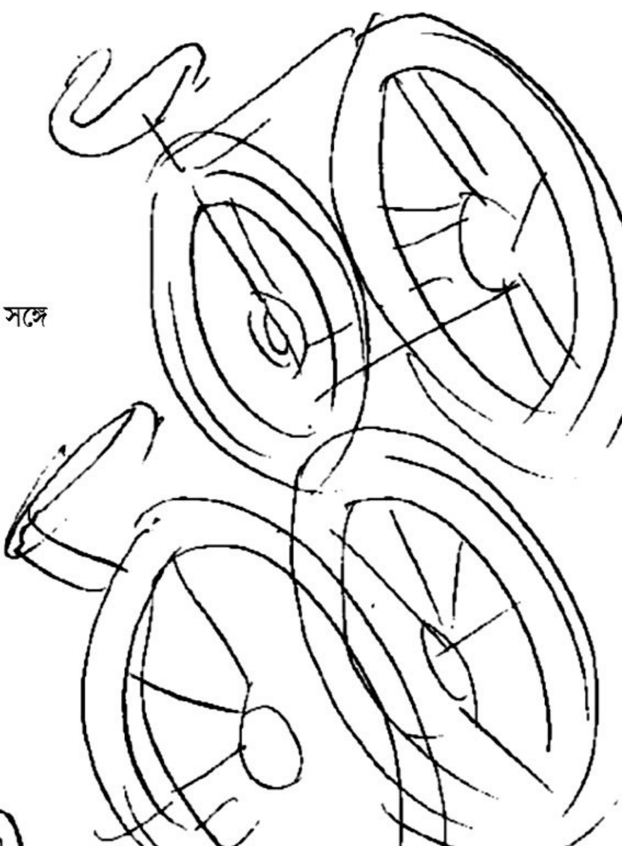
বহুকাল হল সূর্যরশ্মি হারিয়েছি
নিজেই এখন এক দমবন্ধ ঘর
জানলা নেই জানলার বিহনে দরজা নেই

তোমার কৈফিয়ত আমাকে পাথর পাথর করেছে
উঠে চলে যাওয়ার স্পর্ধা নেই
শুধু এক গোলকধাঁধা ঢুকে পড়ে বাঁচিয়ে দিয়েছে

সবসময়, সঙ্গে সঙ্গে

স্বাগতা দাশগুপ্ত

যার ভালবাসা সবসময় সঙ্গে সঙ্গে থাকে
বাস থেকে নামার সময়, খেয়ে উঠে হাত ধুতে গিয়ে
আমার সমস্ত কাজের জায়গা থেকে বেরিয়েই
দেখতে পাই তার উপস্থিতি
যত রাতই হোক বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায় যার ভালবাসা, সবসময়, সঙ্গে সঙ্গে
যেমন থাকে স্মৃতি
ছোট্টবেলার আনাচ-কানাচ থেকে বেরিয়ে আসা
খানিক বড়বেলারও
ওরা যে এতদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, আঁচ পাইনি তার
কত সামান্য তাকিয়ে থাকা, এক মুহূর্তের কষ্ট পাওয়া মুখ
চোখের কোণের দু'-এক ফোঁটা গড়িয়ে আসা স্রোত
দুটো চারটে চোখরাঙানি, চেঁচিয়ে ওঠা
জিনিস ছুড়ে ফেলা
আর ওই যে, বাস থেকে দুদ্দাড় করে নামতে গিয়ে ওর ভালবাসা
আমায় কি কোনওদিন ছেড়ে যাবে না?





অতিক্রান্ত

অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়

(উৎসর্গ: 'মধুমালতী' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)

দরজায় টোকা পড়ে একবার... দু'-বার তিনবার...
অন্ধ গলি গন্ধে পেল ভারী নিশিম্লান,
সাজশেষে বাতাসে ভাসানো
হিমতাজ তেল...
একজোড়া দ্বিচক্রযান দোর খুলে
বের করে রাখো

যে প্রণয়ে বিবাহ হল না,
অপূর্ণ সে-ছায়াসংসার
রাত্তিরের সেতু ধরে সুদূরের নক্ষত্রে
আজ উড়ে যাবে...

আমাদের ঘুমের ভেতর
ফিরে আসবে রাতভোরে, ঘন কুয়াশায়
চলমান দু'টি সাইকেল

পাশাপাশি, আরোহীবিহীন...

সাগর

শঙ্খশুভ্র পাত্র

দৃষ্টি যেন ভেঙে-ভেঙে ফিরে আসে সমুদ্রের তটে।
বৃষ্টিরঙে ভরপুর আদিগন্ত নীল পটভূমি,
অমুদ্রিত রচনার ভাগ্যে প্রেম যাহা তাহা ঘটে—
অটুট বাঁধন ছিঁড়ে সেই যে হারিয়ে গেলে তুমি।

অতঃপর ভাঙনের, লেখা-খেলা, উঁচু-নিচু ঢেউ
শিশুর খেলনা হয়ে অহরহ বেজে ওঠে মনে,
সমুদ্র নেয় না কিছু— শব্দভেদী ফেনার দেউল
কী কথাটি বলে যায় বিন্দু-বিন্দু বালুকার সনে!

কে জানে বিরহ, দোল, স্বপ্নাতুর, কুসুমের মাস
স্পর্শে যদি একবার ফিরে আসে— নিশীথ, করুণ...
দু'চোখে অধীর হোক হু হু এই তীব্র জলোচ্ছ্বাস
আদ্যন্ত শরীরে আজ মেখে নেব সমুদ্রের নুন।

প্রত্যাশিত ভালবাসা, আলো পেলে— দু'চোখ ডাগর
হা-ঘরে বুকের মাঝে জেগে ওঠে অথই সাগর।





অকালবিহু

শর্মিষ্ঠা

লাল রং কে দিল তোমার ডালে,
কাজিরাঙা?
যেন ব্লাউজ়ের ফুলহাতায়
বিহু নাচিয়ের ঘোর লাগা ঘন ঢাক

লাল রং কে দিল তোমার ডালে?

বনমোরগটি! যে কিনা এইমাত্র
ক্ষিপ্র দিল ঝাঁপ আর
ডানার পালকের উপচে ওঠা লালে
সাজিয়ে দিল তোমার বাড়িয়ে রাখা হাত!

দল বেঁধে নাচের মরসুম সরে গেলে দূরে
এখানে তখনও উৎসব থামে না
অকারণ রঙে চলকে পড়ে অকালবিহু।



আগুনবটের চারা

ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়

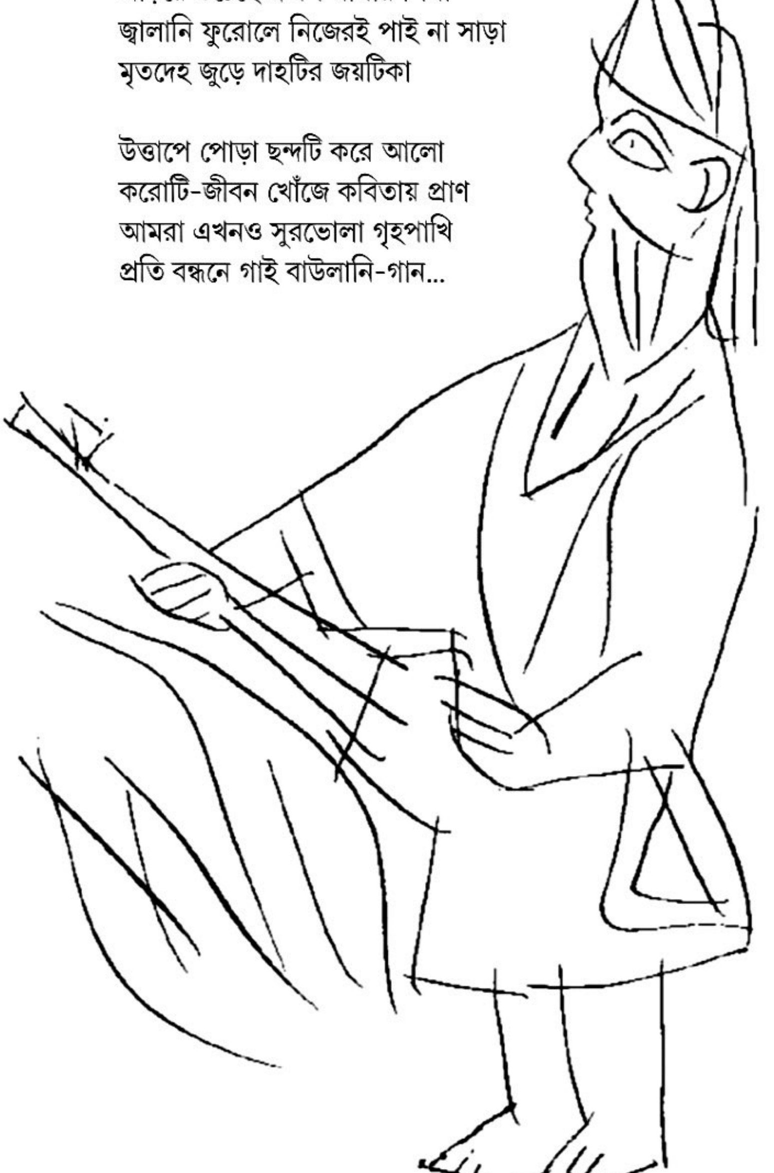
সুর ভুলে যাওয়া বাউলের একতারা
অগোছালো এক দিনের আড়ালে হাঁটে
হারানো সুরের ব্যথা লেগে জ্বলে তারা
পাওয়া না-পাওয়ার পথ থেমে আছে মাঠে

সে-সব দহনে ধিকি-ধিকি বেঁচে থাকা
গুছিয়ে রেখেছে চেনা করোটির মালা
মানে-অপমানে মৃত আগ্নেয়বোধে
চাপা পড়ে গেছে বাউলের আটচালা

ভাবনা তবুও চলেছে দূরের পথে
হেঁটে হেঁটে খোঁজে নিভৃতির কোনও দেশ
জ্বলন্ত সেই একাকীর সন্ধানে
বন্ধুর হাত হয়েছে কি নিঃশেষ?

দেহ-মন জুড়ে আগুন-বটের চারা
জড়িয়ে উঠেছে ক্রমশ মাথায় শিখা
জ্বালানি ফুরোলে নিজেরই পাই না সাড়া
মৃতদেহ জুড়ে দাহটির জয়টিকা

উত্তাপে পোড়া ছন্দটি করে আলো
করোটি-জীবন খোঁজে কবিতায় প্রাণ
আমরা এখনও সুরভোলা গৃহপাখি
প্রতি বন্ধনে গাই বাউলানি-গান...



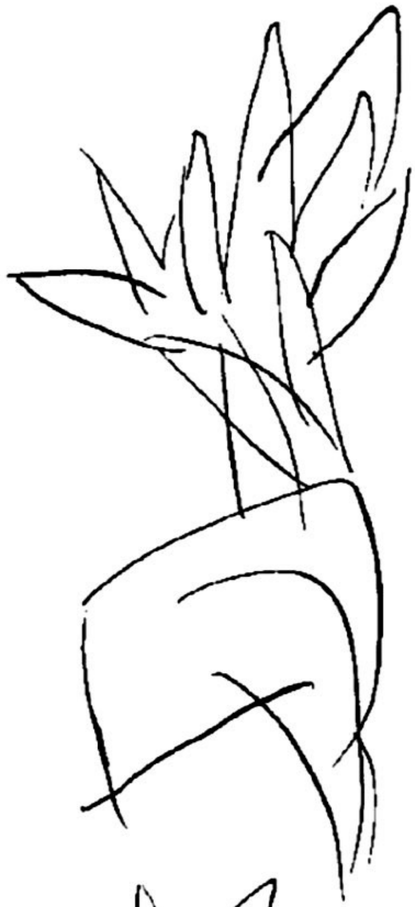
নদীজন্মের আগে

শ্যামশ্রী রায় কর্মকার

শিংশপা গাছের নীচে পাশ ফিরে শুল মধ্যদিন
স্বেদবিন্দু আলো হয়ে জ্বলে আছে ভ্রূসংযোগে
টিলার ওপারে হ্রদ, স্রোতে বেজে উঠছে ভৈরব
স্নানরত প্রেমিকার শরীরের সেতারে আঙুল
দু'ঠোঁটে শিসের দাগ, অপাপবিদ্ধ জানু দু'টি
স্পর্শ করেছে কেউ, জল যার খবর রাখে না
মেয়েটি তৃতীয় স্বরে ডেকে নিল নিজস্ব ঘোটকী
আসন্নপ্রসবা, তাই তার গতি অতি ধীর
তীরস্থ নিধুবন, অপেক্ষায় হাজার স্তাবক
সুবর্ণ বৈভব নিয়ে বসে আছে ঠায়
টিলার ওপরে চাঁদ, তার নীচে চন্দনের ঘর
মৃত্তিকাচর্চিত হাতে যুবক প্রেমিক
প্রেমিকার নাম ভেবে কখনও সে গড়ছে উন্মন
কখনও সংরাগ রীতি, কখনও দহন লোভাতুর
অসহ প্রণয়কালে দেখা হয়ে গেল দু'জনের
চোখে চোখ, হাতে হাত, গভীরে প্রেমের শব্দ বাজে
মিলন হবার নয়, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ঘুমে
নষ্ট নক্ষত্রের মতো অভিশপ্ত নারী ও পুরুষ
তাদের সমাধি দিল সদ্যোজাত ঘোটকের দল
উপকথা লিখে গেল নিরুচ্চার দু'টি বালিহাঁস
চুম্বনে অনন্ত মেখে শুয়ে থাকা যুগলমিলন
যথার্থ ডুবেছে বলে আজ তারা নদী হয়ে গেছে

সাঁকো

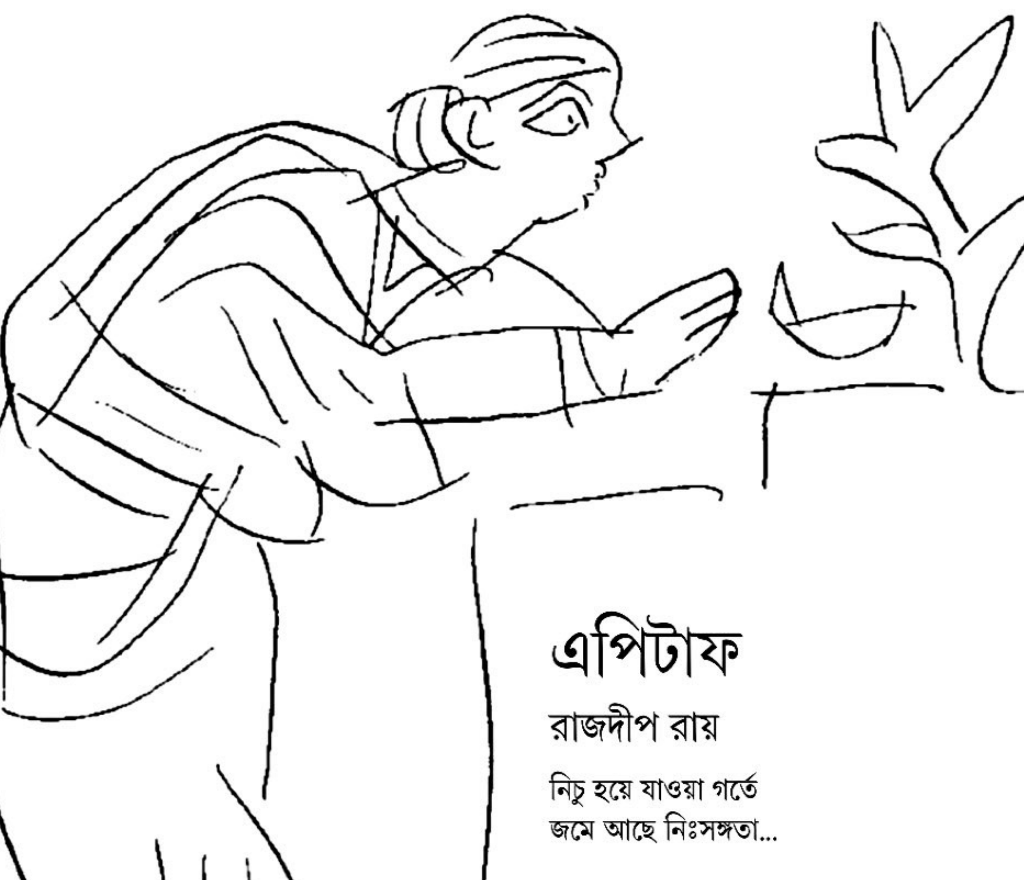
কমলেশ কুমার



সময়ের সুড়ঙ্গ খুঁড়ছি আজ,
অনেক গভীরে গিয়ে দেখি একটি স্বপ্ন-রঙের জমানো রোদ্দুর সেখানে,
দূরে দূরে ঝাপসা পাহাড়, জঙ্গলফেরতা ঝিঁঝি পোকার ডাক,
কখনও রাত গভীর হলে
মনখারাপের মতো ঘনীভূত হয় আমাদের অভিমানী শৈশব,
হারিকেনের আলোয় জেগে থাকে ঠাকুমার ভালবাসার ওম,
তুলসীবেদিতে মা যেন জ্বেলে দিচ্ছে মাটির প্রদীপ,
শান্ত বৈভবহীন সকালে মৃদুমন্দ হাওয়া খেলে যায় প্রতিবেশী লেবুগাছে,
দূর মাঠে বেড়ে ওঠে আদিগন্ত ঘাস, মায়াবী হ্রদের মতো জেগে থাকা
নীরবতা মিশে যায় গাছেদের ভিড়ে,

আমার আস্তিনের মানচিত্র সরিয়ে চোখে পড়ে
একটি নড়বড়ে সাঁকো,
যেখানে দাঁড়িয়ে একদিন বিসর্জন দিয়ে এসেছি অতীত দিনের যত অস্থিভস্ম ছাই,

মৃত্যুশোকের মতো নিঃসঙ্গতায় আমি পেরোতে পারছি না আর
পাপ ও পবিত্রতার
এই দুর্লঙ্ঘ্য সীমানাহীন সাঁকো...



এপিটাফ

রাজদীপ রায়

নিচু হয়ে যাওয়া গর্তে
জমে আছে নিঃসঙ্গতা...

নিচু হয়ে পেরোতে পেরোতে
তোমার গোড়ালি তাকে স্পর্শ করে যায়...

তুমি শুধু ছায়া—একথা জেনেও
মরচে পড়া জল বারবার কেঁপে ওঠে...



এক শক্তিমান পুরুষ

মলয় ঘোষ

এখানে খর রোদে জ্বলছে শরতের আকাশ
মেঘ গেছে উড়ে-পুড়েই
পাথর ছড়ানো, ধুলো ওড়ানো, গরম বাতাস
লুকনো আগুন পুরুষের বুকের ভিতরে

সেই মহিষ রাজার বংশ, তার সন্তান-সন্ততি
টাঁড় ভূমি থেকে দূরের মহল্লায়
মালবাজারের চা-বাগান
কিংবা কয়লা খাদান
দেড়শো বছর ধরে এখনও আদিম জনজাতি

ওদের রুক্ষ চুল, তৈলহীন খোঁপা
ওদের মাটির দেওয়াল, গোবর দিয়ে লেপা
ওদের খালি গা, খাটো ধুতি
ওদের ময়লা শাড়ি, সস্তা সুতি

ওরা কি আর লিখতে জানে, পুরাণ আমাদের
আমরা দেখেছি দেবী দুর্গার ত্রিশূল
ফুঁড়েছে মহিষ রাজার বুক
হৃদয়ে গভীর ক্ষত
সেই রক্তের দাগ আজও মোছেনি তো

হে শরতের আকাশ, তোমার ডানা ভাঙা
হে শারদীয় বাতাস, কোথায় হারিয়ে গেলে
হে নদী তোমার প্রবল স্রোতে এখন ভাটা
মহিষ রাজার মুগ্ধ দু'চোখ দেবীর পদতলে
হে দেবী প্রচণ্ড যুদ্ধে তুমিই জয়ী হলে

এক শক্তিমান পুরুষ মাথায় পড়ে কাঁটা।

আঁচ

অরুণাভ রাহারায়

বহুদিন পরে দেখা হল শেষমেশ
সামান্য দূরত্ব তবু ভাল ছিল বেশ

ভাল ছিল একতারা রাত
স্লেটের আকাশ জুড়ে লেগেছে দোয়াত

আকাশ-অক্ষরগুলি চুয়ে চুয়ে পড়ে
আগুনের আঁচ লাগে ওষ্ঠ ও অধরে

রাতেও সূর্য ওঠে বইমেলা-মাঠে
বেশ কিছুদিন খুব একা-একা কাটে

কেটে যায় মাস আর বছরসমূহ
তোমার ভূমিকা এতে বড়ই দুরূহ

গান জানে বেঁচে থাকা, দুরূহর মানে
দিঘিতে চাঁদের আলো আমাদের টানে

ওই জলে ভেলা নিয়ে লখিন্দর ভাসে
বেহুলা বাংলা থেকে হাওয়া খেতে আসে

এভাবে ধাক্কা দিলে কত কী যে হয়
ছায়ারা আগুনে নেভে, কবিতার জয়

তোমার দাঁড়ানো দেখে ভয় পাই খুব
হৃদয়ে প্রচুর কথা তবু থাকি চুপ!



শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী



নদীবিজ্ঞান

শেখর মুখোপাধ্যায়

রবিবার। ১৮ অগস্ট, ২০০৮। সুনবালিয়ায় সন্ধে নামছে। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কুশি নদী। বর্ষার সময় নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলি বন্যাপ্লাবিত হয়। সুনবালিয়ায় কুশির পাড়ে উঁচু বাঁধ গড়া আছে এই কারণেই। প্রবল বর্ষা না হলে বাঁধ ছাপিয়ে সুনবালিয়ায় নদীর জল ঢোকে না। নেপাল এবং উত্তর-বিহার জুড়ে তরাই অঞ্চলে কুশির অববাহিকা 'ব্রেড বাস্কেট' বলে পরিচিত। বহু বছরের নদীবাহিত পলি জমে ভূমি অত্যন্ত উর্বর।

অনন্তলালকে চিন্তিত দেখায়। বিকেল থেকে কুশির জল বাড়ছে। বৃষ্টি যেটুকু হচ্ছে, তাতে নদীর জল এতটা বাড়ার কথা নয়। সে খেতে বসে স্ত্রীকে বলে, "রাতটা সজাগ থাকতে হবে।"

দময়ন্তী স্বামীর পাতে ধোঁয়া ওঠা রুটি রেখে বলে, "গতবছর এর চেয়ে ভারী বর্ষা হয়েছে। জল গ্রামে ঢোকেনি। সামান্য বৃষ্টিতে কী হবে!"

দময়ন্তী ভুল বলেনি। অনন্তলাল স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে, "লাজো ফোন করেছিল?"

"করেছিল। কিছু টাকা পাঠাতে বলেছে, হোস্টেলের ফিজ় ভরতে হবে।"

"পাঠিয়ে দেব।"

অনন্তলাল উচ্চবিত্ত চাষি। অনন্তলাল ও দময়ন্তীর দু'টি সন্তান। বড় ছেলে উদয়রাজের বয়স বাইশ। পড়াশোনা তেমন করেনি। না করুক, পৈতৃক সূত্রে সে অনেক জমির মালিক হবে। মেয়ে লাজবন্তী ছোট। অনন্তলালের ইচ্ছে, লাজবন্তী লেখাপড়া শিখে বড় অফিসার হোক। পরিবারে একজন সরকারি অফিসার থাকলে এলাকায় মান বাড়ে। অনন্তলাল মেয়েকে সহর্ষ শহরের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। লাজবন্তী এখন ক্লাস টেনের ছাত্রী।

ভোজন সেরে অনন্তলাল বেরোল। দূর থেকেই নদীর গর্জন শুনতে পেল। হল কী! এ যে সমুদ্রগর্জনের মতো শোনাচ্ছে। যত নদীর দিকে এগোয়, তত নদীর গর্জনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আরও অনেকে দাঁড়িয়ে আছে নদীর বাঁধে। অনন্তলালও বাঁধে ওঠে। জল বিপদসীমার অনেক উপর দিয়ে বইছে। অনন্তলাল অন্যদের বলে, গ্রামে ফিরে সবাইকে সতর্ক করা দরকার। হঠাৎ প্রবল হুংকার ওঠে। ভীষণ আওয়াজটা সমুদ্রগর্জনের মতোই শোনায় বটে, কিন্তু যেন একটা নয়, একশো সমুদ্রের অসংখ্য ঢেউয়ের গর্জন। আবছা কালোমতো ওটা কী! সমুদ্র তো নয়। যেন নেপালের কোনও পাহাড় ছুটে আসছে মনে হচ্ছে। বিভ্রান্ত মানুষের দল বাঁধ থেকে নেমে ছুটতে আরম্ভ করে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাহাড় গর্জন করে আছড়ে পড়ে সুনবালিয়ায়। না, পাহাড় নয়। পাহাড়প্রমাণ জলপ্রবাহ। ভাসিয়ে নিয়ে যায় অনন্তলালকে। ভাসিয়ে দেয় সুনবালিয়া। যেন, যে টেথিস সাগর থেকে একদিন মাথা তুলেছিল হিমালয়, সেই টেথিস আবার উঠে এসেছে পাতাল থেকে। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল।

সহর্ষ শহরের পশ্চিমে বয়ে চলেছে কুশি। কুশির কারণেই একসময় এই শহর গড়ে উঠেছিল। কুশিরই কারণে আজ সেই শহর বিপন্ন। শুধু এই শহর নয়, কুশির দীর্ঘ গতিপথের দু'পাশে সমস্ত অঞ্চল— গ্রাম, গঞ্জ, চাষের জমি, বাসস্থান, জীবিকা— সবই বিনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ভয় শুধু বন্যার নয়, জমির গুণমান, ভূগর্ভস্থ জল, নদীনির্ভর মানুষের জীবিকা, মনুষ্যেতর প্রাণীদের জীবন, সমস্তই বিপন্ন। এর প্রতিকার চাই। যেমন হয়— দাবি ওঠে সর্বপ্রথম এলাকার মানুষের তরফে। মরিয়া জনতার চাপে তৎপর হন জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক দপ্তর। বন্যার রাজনীতি শুরু হয়। চটজলদি কর্মসূচি গৃহীত হয়। সাময়িক এই সমাধান প্রায়শই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। নদী কখনও প্লাবিত করে জনপদ, কখনও মরুভূমি করে তোলে উর্বর কৃষিজমিকে। তখন ডাক পড়ে সুজিতের মতো নদীবিজ্ঞানীদের।

সুজিত মধ্য-তিরিশের যুবক। খ্যাতিমান নদীবিজ্ঞানী। আমেরিকার গবেষণাসংস্থায় কর্মরত। গবেষণাসূত্রে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে। সেই সূত্রেই এবার স্বদেশে আগমন। তার কাজের ব্যয় বহন করে কয়েকটি বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা। এমনও হয়, যে বহুজাতিক সংস্থা বৃহৎ নদীপ্রকল্পের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত, সেই সংস্থাই আবার সুজিতের গবেষণায় অর্থ সরবরাহ করে!

বিখ্যাত নদীবিজ্ঞানীকে কাছে পেয়ে এলাকার প্রশাসন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তাকে বক্তৃতা দিতে ডাকে। এভাবেই সুজিত বিহারের সহর্ষে আসার আগে উত্তরবঙ্গের প্রধান নদীগুলির বিষয়ে তথ্য ও নমুনা সংগ্রহের পাশাপাশি সেখানকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গুটিকয় বক্তৃতা দিয়ে এসেছে।

সহর্ষ শহরের একটি কলেজে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মতোই, সহর্ষেও সুজিতের সঙ্গেই এলাকার বিধায়ক, শাসকদলের স্থানীয় কর্ণধার, জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, কলেজের অধ্যক্ষ, ছাত্রসংসদের নেতা প্রমুখকে ফুলের তোড়া এবং স্মারক উপহার দিয়ে বরণ করা হয়। ওই ব্যক্তিত্বরা একে একে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। একে অপরের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। সবশেষে, সুজিতকে আহ্বান করা হয় নদী বিষয়ে তার বিদগ্ধ মতামত রাখতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জরুরি কাজে প্রস্থান করেন।

সুজিত উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের বোঝায়, প্রাকৃতিক কারণেই নদী স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু তার সঙ্গে পালটা স্বেচ্ছাচারিতা করার অর্থ আত্মঘাতী হওয়া। নদীর সঙ্গে বাঁচতে গেলে নদীকে বাঁচতে দিতে হবে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই নদীর উপরে একের পর এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। যথেচ্ছাচার করা চলছে নদীর সঙ্গে। আজ তারই মাশুল দিচ্ছে মানুষ।

সুজিত ২০০৮-এর ১৮ অগস্ট নেপালে কুশির উপরে নির্মিত কুশাহা জলাধার ভেঙে পড়া এবং তার ফলে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বিপর্যয়ের উদাহরণ দেয়। আপাতদৃষ্টিতে কুশি বরাবরই এক খামখেয়ালি নদী। কিন্তু এই খেয়ালেরও এক ধরন আছে। গত কয়েক শতকে কুশি লাগাতার পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরছে। গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে গত ২০০ বছরে কুশি প্রায় ১৫০ কিলোমিটার পশ্চিমে সরে এসেছে। সে শ্রোতাদের প্রশ্ন করে, "তা হলে নবম শতক থেকে যদি আমরা দেখি, গত বারোশো বছরে কুশি কতটা সরেছে?"

এক ছাত্র জবাব দেয়, "প্রায় ন'শো কিলোমিটার।"

সুজিত হেসে বলে, "আমরা একটু কমসম করেই ভাবি— ধরো, পাঁচশো কিলোমিটার, তাতেও কিন্তু অনেক কিছু নজরে পড়ে।"

"কীরকম, স্যার?"

"যে কুশি আজ তোমাদের শহরের পশ্চিমে বইছে, আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে সেই কুশিই বইত তোমাদের শহরের তো বটেই, উত্তরবঙ্গের শহরগুলিরও পূর্ব দিকে," সুজিত ব্যাখ্যা করে, "প্রাচীনকালে এই নদীগুলো ছিল এক-একটা অঞ্চলের সীমানা। তখন নদীর এক-এক পারে বাস করত এক-এক জাতির মানুষ। তাদের মধ্যে কিছু মিল থাকলেও, অমিলও ছিল অনেক। স্বাভাবিক কারণেই। শুরুতে তো যাযাবর জীবন ছিল। ধরো, পশ্চিম থেকে আসা মানুষেরা থিতু হল কুশি নদীর পশ্চিম পারে। পূর্ব থেকে আসা মানুষ নদীর পূর্ব পারে। নদী যত পশ্চিমে সরে গেল, পশ্চিম আর পূর্বের মানুষ পাশাপাশি এসে পড়ল। তখন তো আর আজকের মতো রাষ্ট্রের ধারণা ছিল না। মাঝে কাঁটাতার ছিল না।"

এক ছাত্রী সোৎসাহ উত্তেজনায় বলে ওঠে, "এই কারণেই কি তা হলে তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলে এতরকম মানুষের বাস? মৈথিলী, বাঙালি, ভোজপুরি, নেপালি, মধেশি, কোচ, মেচ, রাজবংশী, রাভা, টোটো, বড়ো?"

সুজিত হাসে। এইটুকুই তার প্রাপ্তি। সে জবাব দেয়, "ঠিক। কিন্তু, কী জানো, নদী যেমন অনেক ধরনের মানুষকে পাশাপাশি এনে ফেলে, তেমনই আবার অনেক সময় একই গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে দেয়।"

"বুঝেছি স্যার। যেমন ইছামতী, যেমন পদ্মা। এ-পারে ভারতবর্ষ, ও-পারে বাংলাদেশ।"

সুজিতকে চিন্তিত দেখায়। আলোচনা আবার জটিল রাজনৈতিক রং না নেয়! সে বলে, "না, ইছামতী বা পদ্মা হয়তো এক্ষেত্রে স্যুটেবল এগজ়াম্পল নয়।"

"কেন নয় স্যার?" এক ছাত্র বলে, "ধরুন পদ্মা। গঙ্গা নদীরই তো শাখা। পদ্মার তুলনায় ভাগীরথীতে জল কত কম, তবু তাকে গঙ্গা বলে সবাই। গঙ্গার জল পবিত্র মনে করে। কিন্তু পদ্মার জলের সেই মাহাত্ম্য তো কেউ মানে না।"

সুজিত কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নানা কোড-অফ-কনডাক্ট মেনে চলার অভ্যাস তার হয়তো হয়েছে, কিন্তু এই বাচ্চাগুলোর তো হয়নি! সে বলে, "বরং তোমরা বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্রের কথা ভাব। ব্রহ্মপুত্র আগে আরও পূর্বে বইত। তারপর একসময় বেশির ভাগ জল নিয়ে সে সরে এল পশ্চিমে। নতুন সেই ধারার নাম হল যমুনা। এবার ভাবো, যমুনা যখন ছিল না, তখন যেসব মানুষ পাশাপাশি থাকত, তারা যমুনার জন্মের পর এই নদীর দু'পারে বাস করতে বাধ্য হল। একই জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে এসে গেল এক নদী।"

সুজিত ফিরে যায় কুশির প্রসঙ্গে।

''অনেক আগেই এক বিজ্ঞানী বলেছিলেন, কুশি ক্রমাগত পশ্চিমে সরার পর একসময় প্রাকৃতিক কারণেই কিছুটা পূর্বে ফিরতে চাইবে। কিন্তু, গবেষণাকে তাচ্ছিল্য করে কুশাহাতে ব্যারেজ তৈরি করা হল। ২০০৮-এর ১৮ অগস্ট বাঁধের কোথায় ফাটল ধরল? না, পূর্ব দিকে। এতবড় ফাটল এবং তা দিয়ে এমন গতিতে এত জল বেরিয়ে এল যে, নদীটার গতিপথ এক ধাক্কায় ১২০ কিলোমিটার পূর্বে সরে এল। এর ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানো?''

''না, স্যার।''

''আড়াই লাখ একর চাষজমি ধ্বংস হয়ে গেল। আটচল্লিশ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হল। চাষবাস, ঘরবাড়ি, গৃহপালিত পশু এসব তো গেলই, প্রাণও গেল বহু মানুষের।''

''স্যার, কুশি তো বিহারের দুঃখ!''

''হ্যাঁ,'' সুজিত কাঁধ ঝাঁকায়, ''দামোদর পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ। ব্রহ্মপুত্র অসমের। মহানদী ওড়িশার। হোয়াংহো চিনের দুঃখ। কিন্তু কী জানো, কুশির মতো বিধ্বংসী নদীও আগে কখনও এমন কাণ্ড ঘটায়নি। ২০০৮-এ যা ঘটল তার জন্যে নদী দায়ী নয়। দায়ী মানুষ। কুশির জলে বন্যা হয় বলে তাকে তুমি বলবে বিহারের দুঃখ! তখন মনেও রাখবে না যে, বছরের অন্য সময় এই নদীর জলেই তোমাদের চাষবাস, তোমাদের জীবনধারণ।''

''মানুষের দোষ কী, স্যার?''

''মানুষেরই তো দোষ। নদীর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বদলে সে আশা করে নদী মানুষের সঙ্গে মানিয়ে নেবে,'' সুজিত মাথা নাড়ে, ''নদী মানুষ নয়। পৃথিবীর ভৌগোলিক এবং ভূতাত্ত্বিক নিয়ম তাকে চালনা করে। আসলে, নদী স্বেচ্ছাচারী নয়।''

''কিন্তু স্যার, মানুষই-বা কী করবে? নদীর গতিপথ অনুসরণ করে বারবার তো বাসস্থান বদলাতে পারে না। আর, বদলাবেই-বা কোথায়? পৃথিবীতে আজ বসবাসের যোগ্য ফাঁকা জমি কোথায় আছে?''

সুজিত বহুবার এই প্রশ্ন শুনেছে। সে বলে, ''হাতেগরম সমাধান কিছু নেই। আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। তবে সামান্য যেটুকু আমরা করতে পারি, তা হল বিবেচনা। সেই বিবেচনায় শুধু আমার জমি, আমার বাড়ি, আমার পাশের নদী আর তার বাঁধ থাকলে চলবে না। ভূগোল, ভূতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব সব খতিয়ে দেখে একটা সার্বিক সমাধানের দিকে এগোতে হবে। সাময়িক নয়, প্রয়োজন দীর্ঘকালীন সুসংহত নদীনীতি।''

আমেরিকায় ফেরার আগে কলকাতাতেও একটা বক্তৃতা দিতে হবে। দুটো রাত কাটবে হোটেলে। সন্ধেয় কলকাতা পৌঁছে হোটেলের স্যুইট বড় নির্জন ঠেকল। যেন পৃথিবী নদীহীন হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে নদীনির্ভর বসতি। স্নান সেরে কিছুক্ষণ উসখুস করে সে ইন্টারকমে ধরল রিসেপশনিস্টকে, ''একজন এসকর্ট অ্যারেঞ্জ করতে পারেন রাতের জন্য?''

রিসেপশনিস্ট বলে, ''স্যার, আমরা তো ওই সার্ভিসটা দিই না। তবে আমি একজনকে পাঠাচ্ছি, ওর সঙ্গে কথা বলে নিন।''

রবি গোমস্। বয়স বছর পঞ্চান্ন। সোজা কাজের কথায় আসে, ''আপনার প্রেফারেন্সটা ঠিক কী, স্যার?''

''প্রেফারেন্স!''

''মানে, কী ধরনের লেডি আপনি চান?''

''লেডি!''

''অফ কোর্স, স্যার! আমার এজেন্সিতে সব স্মার্ট, এডুকেটেড, ইন্টেলিজেন্ট, আপমার্কেট গার্ল্‌স। বাট, এক-এক জনের নেচার এক-একরকম। আপনার কী ধরনের ডিমান্ড?''

সুজিত চিন্তায় পড়ে। রবি গোমস্ বলে, ''লেট মি হেল্প ইউ, স্যার। যদি মোস্টলি ফিজিক্যাল প্লেজ়ার চান, তা হলে একরকম। যদি তার সঙ্গে একটু নাচ, গান... তা হলে অন্যরকম। যদি একটু ইন্টেলেকচুয়াল মানে, ফিল্ম, লিটারেচার ডিসকাস করতে চান, তা হলে আবার আরও অন্যরকম। যদি একটু ম্যাসাজ-ট্যাসাজ, তা হলে...''

''বুঝেছি,'' সুজিত বলে, ''মিস্টার গোমস্, নাচ-গান দরকার নেই। ফিল্ম, লিটারেচার, ম্যাসাজও নয়। ফিজিক্যাল ব্যাপার তো থাকেই। কিন্তু সে কামশাস্ত্রে এক্সপার্ট মেয়ে না হলেও চলবে। আপনি এমন কাউকে পাঠান, যে আমারই মতো লোনলি।''

রবি গোমস্ কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে সুজিতের দিকে। সুজিত বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। রবি গোমস্ বলে ওঠে, ''আই গট ইট, স্যার। বাট ইট উইল বি আ বিট এক্সপেনসিভ অ্যান্ড পেয়েবল ইন অ্যাডভান্স। পুরোটাই।''

সুজিত পার্স বের করে, ''কত?''

রবি গোমস্ এসকর্ট সার্ভিসের দাম বলে। সুজিত টাকা গুনে দেয় রবি গোমসের হাতে। ''হুম। একটু নয়, আপনার এসকর্টের সার্ভিস বেশ এক্সপেনসিভ!''

''স্যার, আপনি যা চাইছেন, এটা একজন এসকর্টের রেগুলার জব নয়। শরীর, নাচ, গান, ফিল্ম কি লিটারেচার ডিসকাশন, ম্যাসাজ, এসবে মন থাকে না। থাকে শুধু ট্রেড এক্সপার্টিজ়, কর্মদক্ষতা। বাট ইউ আস্ক ফর হার মাইন্ড। আপনি মন চাইছেন।''

সুজিত অট্টহাস্য করে, ''মনও একটা রাতের জন্য কেনা যায় তা হলে? আমার ধারণা ছিল নদীকে যেমন শেষপর্যন্ত বাঁধা যায় না, মনও কেনা যায় না।''

রবি গোমস্‌কে বিষণ্ণ দেখায়, ''যায় স্যার। নদীর জলের মতোই বাজারে তারও যে ডিমান্ড আছে।''

বাজারে মনের ডিমান্ড আছে! মনও কেনা যায়! সুজিত মনে-মনে উত্তেজনা বোধ করে। নদীকে বাঁধলে, নদী শুকিয়ে যায়। মন কিনলে মনের কী হয়! সুজিত প্রতীক্ষা করে।

বছর চব্বিশ-পঁচিশের যুবতী। সাধারণ সাজসজ্জা। লক্ষ্মীয়, মাথায় খোঁপা, যা আজকাল দেখাই যায় না। মেকআপ নেই। যুবতী ঘরে ঢুকে চারদিক দেখে। দরজা বন্ধ করে সুজিত সোফায় বসে। হাসির চেষ্টা করে বলে, ''বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?''

যুবতী উলটো দিকের সোফায় বসে। অনাড়ষ্ট দৃষ্টিতে দেখে একরাতের খরিদ্দারকে। ''আমার নাম মিলিতা।''

সুজিত মাথা দোলায়। সে জানে এ আসল নাম নয়। এই পেশায় কেউ নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে না। কিন্তু সুজিত বোঝে। সারা রাতের ব্যাপার। একটা কিছু বলে ডাকতে তো হবে। ওগো, হ্যাঁগো তো আর করা যায় না। সে বলে, ''আমি সুজিত।''

''ও।''

কয়েক মুহূর্ত কাটে নিঃশব্দে। মিলিতা একদৃষ্টে দেখছে তাকে। সুজিত অস্বস্তিতে পড়ে। এর চেয়ে সোজা বিছানায় শুয়ে পড়লেই ভাল হত। কিন্তু এর যা হাবভাব, চট করে জাপটে ধরে বিছানায় নিয়ে ফেলার ছবিটা কল্পনাতেই আসছে না। এ এই কারবার চালায় কীভাবে!

সুজিত অস্থির হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে। কিছুক্ষণ পায়চারি করে। মিলিতা ভ্রু কুঁচকে তাকে দেখে, ''ড্রিংক বানিয়ে দেব?''

''না। আমি মদ খাই না,'' সুজিত মিলিতার দিকে ঘুরে বলে, ''আপনি কি বোর হচ্ছেন?''

''না! কই, না তো!''

''তা হলে কথা বলছেন না কেন?''

মিলিতা হাসে, ''আমার বলার কিছু নেই বলে।''

''ও!'' সুজিতকে চিন্তিত দেখায়, ''আমারই-বা কী বলার আছে!''

মিলিতার কপালে ভাঁজ পড়ে। সে প্রশ্ন করে, ''আপনি কী করেন?''

সুজিত আবার সোফায় বসে। ''আমেরিকায় একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সিনিয়র সায়েন্টিস্ট।''

''কোন বিষয়ে?''

''রিভার সায়েন্স।''

''রিভার সায়েন্স! আপনি নদী ভালবাসেন?''

''বাসি মনে হয়।''

মিলিতা জিজ্ঞেস করে, ''নদী নিয়ে গবেষণায় কী বোঝা যায়?''

সুজিত তার গবেষণার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। মিলিতা আরও

গোটা দুই প্রশ্ন করল তাকে। তারপর আর মিলিতাকে মুখ খুলতে হয়নি। ততক্ষণে নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে। সুজিত সোৎসাহে তাকে বলতে থাকল, ''বুঝলে মিলিতা, নদীকে অবিবেচকের মতো বাঁধার চেষ্টা যে কত বড় অপরাধ...'' অজান্তেই সে কখন মিলিতাকে তুমি সম্বোধন করতে শুরু করেছে! অস্বাভাবিক নয়। সুজিত মিলিতার চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড়।

অনেক কথা বলে একসময় থমকায় সুজিত, ''সরি, নদী নিয়ে বলতে থাকলে জ্ঞান থাকে না। বুঝতে পারি না সামনে শ্রোতারা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।''

''ক্লান্ত! হতেই পারে না,'' মিলিতা প্রতিবাদ করে।

সুজিত কাঁধ ঝাঁকায়, ''কতবার হয়েছে। আমি বলে চলেছি, খেয়ালই হয়নি ঘর ফাঁকা হয়ে আসছে। আজকাল তাই মেপেজুপে বলি। আজ একটু গোলমাল হয়ে গেল।''

''কিচ্ছু গোলমাল হয়নি। আপনি বলুন।''

''না,'' সুজিত হাসে, ''এবার তুমি কিছু বলো।''

''আমি! আমার পেশা নিয়ে বলার তো কিছু নেই।''

''মানুষের তো নেশাও থাকে কিছু।''

''আমার নেশাও নেই। বরং, আমিও নদীর কথাই বলি। একটাই নদী আমি চিনি। কুশি নদী।''

''কুশি!'' সুজিত চমকে তাকায় মিলিতার দিকে।

মিলিতা হাসে, ''কুশির জন্যই আমি মিলিতা। নইলে, ছিলাম আর কেউ।''

সুজিত নির্বাক চেয়ে থাকে মিলিতার দিকে।

''বিহারের গ্রামে ছিল আমাদের বাড়ি। ধরুন, গ্রামের নাম সুনবালিয়া। বাবা ছিলেন গ্রামের জোতদার।''

''তুমি বাঙালি নও? কথা শুনে তো বোঝার উপায় নেই।''

''দশ বছর কলকাতায় আছি। তা ছাড়া, আমাদের ভাষা মৈথিলী। বাংলার কাছাকাছি।''

''বিহার থেকে বাংলায়? এই পেশায়? মানে, বাবা যখন ধনী জোতদার...''

''বাবার ইচ্ছে ছিল আমাকে লেখাপড়া শেখাবে। ভর্তি করে দিয়েছিল শহরের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। ছুটিছাটায় বাড়ি আসতাম। বন্ধুদের সঙ্গে ঝাঁপাই পিটিতাম কুশির জলে। তারপর একদিন কুশি শত্রুতা করল। ২০০৮ এর ১৮ অগস্ট কুশি সুনবালিয়া নিশ্চিহ্ন করে দিল। খবরটা আমি পেলাম পরদিন। সোমবার। মুহূর্তে স্বজনহীন, আশ্রয়হীন অনাথ হয়ে গেলাম।''

''তারপর?''

''সহর্ষ থেকে রওনা হলাম গ্রামে যাব বলে। এক ত্রাণশিবিরে আটকে গেলাম। সামনে শুধু জল আর জল। উপায় নেই গ্রামে যাওয়ার। সরকারি ব্যবস্থাপনায় নৌকো শুধু ডুবে যাওয়া গ্রামগুলো থেকে বানভাসি মানুষদের উদ্ধার করে আনছে। ক'টা দিন ওই ত্রাণশিবিরেই কাটালাম। ওখানেই দেখা হল সীতাপ্রসাদের সঙ্গে। সীতাপ্রসাদ আমাদের গ্রামের ছেলে। কলকাতায় ট্যাক্সি চালায়। বন্যার খবর শুনে পরিবারের খোঁজে এসেছে। একদিন আমার গ্রামের জনাদশেক মানুষ, যারা বন্যায় মারা যায়নি, তাদের নিয়ে একটা সরকারি নৌকো এল ত্রাণশিবিরে। ওদের মধ্যে কয়েকজন পরিচিত মানুষ দেখে আমি আর সীতাপ্রসাদ ছুটে গেলাম। ওরা যত কাঁদল, আমরাও তত কাঁদলাম। ওরা বলল, আমাদের পরিবারের কেউ বেঁচে নেই। আমি বললাম, তা হলে আমি যাব কোথায়? কী উত্তর দেবে ওরা! ওদের নিজেদেরও তো যাওয়ার কোনও জায়গা নেই। সীতাপ্রসাদ বলল, চাইলে আমরা ওর সঙ্গে কলকাতা যেতে পারি। কলকাতায় কিছু কাজ ও আমাদের জুটিয়ে দেবে। সীতাপ্রসাদ অনাত্মীয় জোয়ান ছেলে। কিন্তু আমার তখন উপায় নেই। আমি ওর সঙ্গে কলকাতায় এলাম। সীতাপ্রসাদ কলকাতায় সবার কাছে আমার পরিচয় দিল ওর বোন বলে। একটা কাজ ঠিক করে দিল— যে মালিকের গাড়ি ও চালায় তাঁর পরিচিত একটি বাঙালি পরিবারে। স্বামী-স্ত্রী আর মাস কয়েকের একটা বাচ্চা। বাচ্চা দেখাশোনা, বাসন মাজা, ঘর মোছা, কাপড় কাচা। চব্বিশ ঘণ্টার কাজ। দু'বেলা খেতে দেবে, ন'মাসে-ছ'মাসে জামাকাপড় দেবে, মাস গেলে কিছু মাইনেও।''

''তারপর?''

''মাস ছয় পরের কথা। দুপুরবেলা। বউদি বাচ্চাকে নিয়ে কোথাও গেছেন। হঠাৎ দাদাবাবু আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার বুক খামচাতে শুরু করলেন। টেনে নিয়ে গেলেন ওঁদের বেডরুমে ...'' মিলিতা থমকে জানলার দিকে তাকায়।

''হুম,'' সুজিত মন্তব্য করে, ''নিঃসন্দেহে বাঙালি ভদ্রলোক! ছ'-ছ'টা মাস তো লেগেছে আশ্রিতার গায়ে হাত দিতে। তারপর?''

''তারপর যা হয়। খুব ব্যথা পেয়েছিলাম। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছিলাম। দাদাবাবু শাসাল, বউদি কিংবা আর কাউকে জানালে ভাল হবে না। তারপর থেকে বাড়িতে আমাকে একলা পেলেই দাদাবাবু ওই করত। ভয়ে কাউকে বলতে পারতাম না।''

''হুম। তারপর?''

''প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়লাম। দাদাবাবু একটা ক্লিনিকে নিয়ে গেল। অ্যাবরশন। বউদি সন্দেহ করতে শুরু করেছিল। আমাকে গালমন্দ করত। কিন্তু দাদাবাবুকে কিছু বলত না। দাদাবাবুর স্বভাবও গেল না। আবার শুরু হল ওই সব। আবার প্রেগন্যান্ট। আবার ক্লিনিক। অ্যাবরশন। এবার যখন ক্লিনিক থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসছি, একটা লোক এসে দাদাবাবুকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গেল। আমি ক্লিনিকের বাইরে বেঞ্চিতে বসে কেঁদেই চলেছি। মিনিট কুড়ি পরে দাদাবাবু আর সেই লোকটা ফিরে এল। দাদাবাবু বলল, লাজো, তুই একটু বোস, আমি একটা কাজ সেরে তোকে নিয়ে যাব...''

''লাজো!'' সুজিত সবিস্ময় প্রশ্ন করে, ''লাজো কে?''

''কেউ না,'' মিলিতা বলে চলে, ''আমি কিছু বলার আগেই দাদাবাবু যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল। অন্য লোকটা আমার সামনে বসল। বলল, নাম রবি গোম্স। তারপর বলল, 'আমাকে ভয় পেও না। তোমার দাদাবাবু ফিরে আসবেন না। চাইলে, তুমি ওঁর কাছে ফিরে যেতে পার। কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা শোনো। আমি তোমাকে কাজের সুযোগ দিতে চাই। তোমার দাদাবাবু তোমার সঙ্গে যা করেছেন, আমি কোনওদিন তা করব না। কিন্তু তুমি তোমার দাদাবাবুর সঙ্গে যা করেছ, তা যদি অন্যদের সঙ্গে করতে রাজি থাকো, তা হলে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে।' আমি যত ভয় পেলাম তত অবাকও হলাম। বললাম, প্রস্টিটিউট হব! রবি গোম্স বলল, 'এখন তুমি কী? ওই একই। তফাত হল, পরিবর্তে পেটভাতার বেশি কিছু পাও না। আমার কাছে কাজ করলে কাজের দাম পাবে। স্বাধীন, স্বনির্ভর হবে।' রবি গোম্স অনেক কথা বোঝাল। রাজি হলাম।''

''রাজি হলে?''

''হ্যাঁ। রবি গোম্স তো ঠিকই বলেছিল। দাদাবাবু আমাকে রেপ করার পরও আমি মুখ খুলিনি কেন? বাঁচতে চেয়েছিলাম বলে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কী ছিল? দাদাবাবুর কাছে ফিরে গেলে বারবার আসতে হত ক্লিনিকে। রবি গোমসের আশ্রয়ে গত আট বছরে ক্লিনিকে গেছি মাত্র একবার। সে-ও নিজের ভুলে।''

সুজিতের ভোম্বলদাস মুখের দিকে চেয়ে হাসে মিলিতা, ''রবি গোম্স আমাদের অভিভাবকের মতো। ও জাস্ট পিম্প নয়। ওর নির্দেশে নতুন করে লেখাপড়া শিখেছি। হাই সোসাইটির আদবকায়দা শিখেছি। ইংরেজি তো জানিই। অন্যান্য বিদেশি ভাষাও কাজচালানো শিখলাম। বিদেশি বহু ট্যুরিস্ট এসকর্টের খোঁজ করে। আমাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা দেখতে বের হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখাই, কারেন্সি বিল্ডিং, মার্বেল প্যালেস, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, দক্ষিণেশ্বর... রোজগার মন্দ নয়। হ্যাঁ, রবি একটা পারসেন্টেজ নেয়, খুব রিজ়নেব্‌ল।

ও আমার পিছনে অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছে। আর, আমারও তো একজন এজেন্ট চাই।"

"অদ্ভুত কাহিনি!" সুজিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "কুশিরই মতো। একদিনের একধাক্কায় কুশিরই মতো তুমিও চলে এলে পশ্চিম থেকে পূর্বে।"

"কিন্তু কুশি তো পণ্যাঙ্গনা নয়। সে আপন মরজির মালিক।"

"না। আজ আর নয়," সুজিত কাঁধ ঝাঁকায়, "আর-পাঁচটা নদীর মতোই, মানুষের মনের মতোই, কুশির ধারাও বাঁধা পড়ছে।"

"তাই আপনি মন কিনতে চান?"

"কী!" সুজিতকে অবাক দেখায়। পরমুহূর্তে হেসে ফেলে বলে, "মিস্টার গোম্‌স তোমাকে বলেছেন?"

মিলিতা নীরবে হাসে। সুজিত বলে, "আসলে, আমি চেয়েছিলাম আমারই মতো নিঃসঙ্গ কাউকে।"

"পেলেন?"

"মনে হয়। ঘরপরিবার-স্বজনহারা মানুষ যদি নিঃসঙ্গ না হয়, দুনিয়ায় নিঃসঙ্গ কে!"

"আপনি নিঃসঙ্গ কেন? আপনার কেউ নেই?"

"নাহ্‌।"

"বিয়ে করেননি?"

"করেছিলাম। ভেঙে গেছে।"

"কেন?"

"বোধ হয় দু'জনে দু'জনকে বড্ড আঁকড়ে ধরেছিলাম। অত বাঁধাবাঁধি শেষপর্যন্ত সইল না। পথ আলাদা হয়ে গেল।"

"গঙ্গার মতো?" মিলিতা বলে, "ভাগীরথী আর পদ্মা যেমন আলাদা বয়ে গিয়েছে?"

"বলতে পার। দেবপ্রয়াগ থেকে ভাগীরথী আর অলকানন্দার মিলিত ধারা গঙ্গা। মিলিতা," সুজিত মুচকি হাসে, "কিছুটা পথ একসঙ্গে চলার পর গিরিয়ার কাছে আলাদা হয়ে গেল দুটো ধারা, হুগলি আর পদ্মা।"

"ও," মিলিতা বলে, "তাই মনও চলে গেল শরীরের সঙ্গে?"

"আগে তো মনই যায়। মন চলে যায় বলেই শরীরকেও যেতে হয়। নদীর খাত হল তার শরীর আর নদীর জল তার মন। জল বারংবার অন্য পথে যেতে চেয়ে ধাক্কা দেয় বলেই নতুন নদীখাত সৃষ্টি হয়।"

"হুম," মিলিতা আনমনে বলে, "শরীরে শরীর মেলার আগে তা হলে মন পেতে হয়। ওহ্‌! এই জন্যই শরীর কেনার আগে কিনতে হয় মন?"

"মন কি কেনা যায়?"

"কে জানে!" মিলিতা বলে, "জল তো লোকে কেনে।"

"তুমি আমারই মতো, মিলিতা। তাই রবি গোম্‌স তোমাকেই পাঠাল।"

"তাই? যদি জানতেন, কত পরিচয়ে কতরকম মানুষের সঙ্গে রাত কাটিয়েছি!"

ভোর হয়ে আসছে। পরদাঢাকা জানলার বাইরে দিনের আলোর আভাস। মিলিতা সুজিতের দিকে চেয়ে হাসে। ঘড়ি দেখে। ঘড়ি খুলে রাখে। দু'হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে খোঁপার বাঁধন আলগা করে চুল এলিয়ে দেয়। "গতকাল রাত আটটায় এসেছি। আজ সকাল আটটায় শিফট শেষ। হাতে সময় বেশি নেই।"

"জানি।"

"জানেন! তা হলে দেরি কেন? টেক মি। ইউ হ্যাভ পেড ইন অ্যাডভান্স..."

"ইট ক্যান ওয়েট। মিলিতা!"

"বলুন।"

"তোমাকে আজও আমার চাই। সারা দিন, সারা রাত।"

"কিন্তু," মিলিতা হাসে, "আমার মরজির সবটার মালিক আমি নই। রবি যদি আর কারও সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করে না থাকে..."

মিলিতা রবিকে ফোন করে। ফোনে কিছুক্ষণ কথা বলে সুজিতকে জানায়, "ঠিক আছে। কিন্তু রবি বলছে, দিন আর রাত, দুই শিফটের টাকাটা অ্যাডভান্স দিতে হবে।"

"দেব।"

সুজিত বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় বক্তৃতা দিতে। মিলিতা হোটেলের ঘরে অঘোরে ঘুমোয়। সুজিত দুপুর দুটো নাগাদ ফেরে। মিলিতাকে বলে, সে কলকাতা ঘুরতে চায়।

"সারা রাত ঘুমোননি। ক্লান্ত লাগছে না?"

"সময় তো শুধু আজ দিনের বাকিটুকু আর রাতটা। অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে রেখেছি। এখন ক্লান্ত হলে ঠকতে হবে।"

"খুব হুঁশিয়ার খদ্দের!"

"বিদেশি গেস্টদের যেভাবে শহর দেখাও," সুজিত দাবি করে, "আমিও দেখব।"

মিলিতা খিলখিলিয়ে হাসে, "আপনি কলকাতা চেনেন না?"

"চিনি।"

"তা হলে?"

"তোমার চোখ দিয়ে দেখব।"

আধবেলায় যতটা সম্ভব শহর ঘুরে সন্ধেয় দু'জনে হোটেলে ফেরে। মিলিতা স্নান সেরে আসতে, সুজিত ঢোকে বাথরুমে। বাথটাব ভর্তি করে এলিয়ে পড়ে তাতে। হঠাৎ কী খেয়াল হয়, বাথটাব থেকে উঠে বাথরুমের দরজা খুলে ডাকে, "মিলিতা, একটু এদিকে আসবে, প্লিজ়?"

"আসছি।"

মিলিতা বাথরুমের দরজার সামনে উপস্থিত হয়। চমকে দেখে সুজিতের গায়ে সুতোটি পর্যন্ত নেই, সর্বাঙ্গ থেকে টপটপিয়ে জল ঝরছে। সুজিত হাত বাড়িয়ে মিলিতাকে কাছে টানে। জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে চুমু খায়। মিলিতা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সুজিতের চোখে। সুজিত ফিসফিসিয়ে বলে, "মিলিতা, আই ওয়ান্ট ইউ নাউ।"

"এখন? এখানে? ওখানে অতবড় খাট থাকতে এই বাথরুমে!"

"নদীবিজ্ঞানী নদীতে নামবে। হোটেলে বাথটাব ছাড়া নদীখাত কোথায়!" সুজিত মিলিতাকে পাঁজাকোলা করে বাথটাবে ভাসায়। নিজে ভেসে পড়ে তার উপর।

রাত আজও কাটে বিনিদ্র। সুজিত পাকা খদ্দেরের মতো পাইপয়সার হিসাব বুঝে নেয়, নাকি মিলিতা সৎ দোকানদারের মতো তার পণ্য দাঁড়িপাল্লায় সবটুকু মেপে দেয়, বলা শক্ত।

সকাল ছ'টায় সুজিতের ফ্লাইট। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা নিদ্রাহীন সুজিতকে ক্লান্ত দেখায়। দু'চোখ রক্তাভ। সে টলতে টলতে পোশাক পরে। বলে, "আমার সঙ্গে এয়ারপোর্ট অবধি যাবে?"

"যাব। সকাল আটটা অবধি আমি তোমার কেনা।"

"প্লিজ়, মিলিতা..."

মিলিতা হেসে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তাকেও ক্লান্ত দেখায়।

রাত আড়াইটেয় হোটেলের গাড়িতে এয়ারপোর্ট রওনা হয় তারা। এই গাড়িই ফিরতি পথে মিলিতাকে তার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবে। ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালে গাড়ি থেকে নেমে এক-এয়ারপোর্ট লোকের সামনে মিলিতাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায় সুজিত। মিলিতা চোখ বোজে। ছাড়া পেয়ে বলে, "পাবলিকলি এসব করা আমাদের বারণ।"

সুজিত হাসে, "এক্সট্রা চার্জ?"

মিলিতা জবাব দেয় না।

"মিলিতা!"

"উঁ?"

"তোমার জীবনকাহিনি যা বললে— সত্যি?"

মিলিতা হাসতে গিয়েও থমকায়, "তুমি কিছু কিনতে চেয়েছিলে। পেয়েছ?"

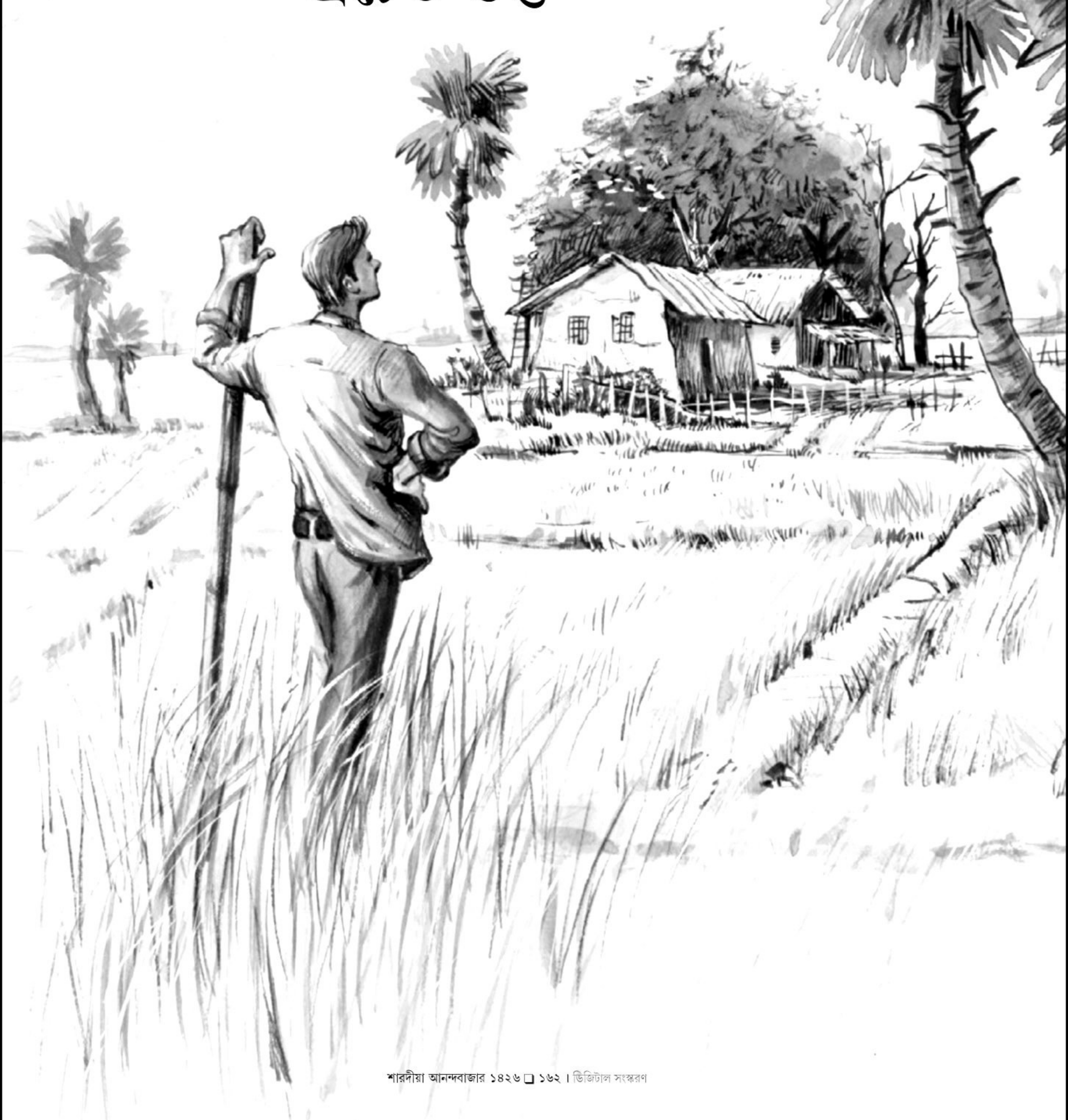
মন! সুজিত স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে মিলিতার দিকে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে ব্যাগ হাতে এলোমেলো পায়ে এয়ারপোর্টে ঢুকে যায়। মিলিতা গাড়িতে ওঠে। জানলার কাচ তুলে দেয়। অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস পড়ে। নিজেই চমকে রিয়ার ভিউ মিররে তাকায়। সেখানে ড্রাইভারের কৌতূহলী মুখ। মিলিতা ব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে চোখে দেয়। চশমার রং শেষরাতের মতোই অন্ধকার। অন্ধকারে নদী হারিয়ে যায়। নদীবিজ্ঞানীর মতোই ড্রাইভারও সংবিৎ ফিরে পায়। গাড়ি চলতে শুরু করে।

শিল্পী: সৌমেন দাস

উপন্যাস

মাটির দেওয়াল

প্রচেত গুপ্ত





'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী। / তুমি থাক সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী।।'

পুরুষ কণ্ঠে গান হচ্ছে। তবে কেউ গাইছে না, মোবাইল বাজছে। বেজেই চলেছে। যেহেতু ফোন আধখানা চাপা পড়ে আছে বালিশের নীচে, গান তেমনভাবে শোনা যাচ্ছে না। আবছা ভেসে আসছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে। খাটে আধশোয়া হয়ে সোমদত্তা ম্যাগাজ়িনের পাতা উলটোচ্ছে। ওই উলটোচ্ছেই, পড়ছে না। একটা সময়ে খুব পড়ত। বই, ম্যাগাজ়িন হাতের কাছে যা পেত, তাই পড়ত। অনেকদিন হল সেসব বন্ধ হয়েছে। অফিস, সংসার, মেয়ে সামলে বইপত্র পড়ার সময় পায় না সোমদত্তা। যদিও দোতারা মায়ের এই কথা মানতে পারে না।

"বই পড়ার সময় নেই বলে কিছু হয় না। বই পড়তে চাইলে সে নিজেই তোমার থেকে সময় বের করে নেবে।"

সোমদত্তা বলেছে, "এত কাজে ব্যস্ত থাকলে বই পড়ব কখন?"

দোতারা বলে, "তোমার চেয়ে হাজার ব্যস্ত মানুষও বই পড়ে। আর তুমি কি এমন কাজে ব্যস্ত মা? অফিসে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছ ঠিকই, কিন্তু বাড়িতে? বাড়িতে তিনজন কাজের লোক। রান্না, ঘর ঝাড়পোঁছ, কাপড় কাচা সবই তো তারা করে।"

সোমদত্তা রেগে গিয়ে বলে, "আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকি! তোকে দেখতে হয় না? তোর বাবাকে?"

দোতারা হেসে ফেলে বলে, "এই দেখতে ধারণাটাই ভুল মা। আমি নিজেই পড়াশোনা করি। আজ পর্যন্ত কখনও আমাকে পড়তে বস বা পরীক্ষার রেজ়াল্ট ভাল কর বলতে হয়নি। তারপরেও তুমি অকারণে টেনশন করো। ভবিষ্যতে কী করব, তাই নিয়ে ফালতু মাথা ঘামাও। আর বাবাকে দেখা মানে তো বাবার কেরিয়ারের উপর নজর রাখা। ঠিক মতো স্টেপ ফেলছে কিনা। নিজেরটাও দেখো। বাড়ি ফিরে মোবাইলে অফিস পলিটিক্স শুরু হয়ে যায়।"

সোমদত্তা মেয়েকে ধমকে ওঠে, "বেশি পাকা-পাকা কথা বলিস না! কলেজে গিয়ে তুই বেশি কথা শিখেছিস। সবাই তোকে ডেঁপো মেয়ে বলে জানিস?"

দোতারা হেসে বলে, "পড়তে গেলাম ইলেকট্রনিক্স, শিখলাম কথা। অবশ্যই আমি একজন ডেঁপো মেয়ে। ন্যাকা মেয়ের বদলে ডেঁপো মেয়ে বেটার। ন্যাকারা মুখে মিনমিন করে আড়ালে গালি দেয়। আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আড়াল।"

সোমদত্তা চোখ পাকিয়ে বলল, "তুই চুপ করবি তারা?"

দোতারা বলে, "আমি তো চুপ করেইছিলাম। তুমি সময়ের ঘাড়ে দোষ চাপালে তাই বলছি। আসলে কী জান মা, যতদিন যাচ্ছে, তুমি কেরিয়ার, পার্টি, স্টেটাসে বেশি সময় দিচ্ছ। আমার লেখাপড়ার চেয়ে তোমার কলিগের ছেলেমেয়েরা যেন টপকে না যায় সেদিকে তোমার মন।"

সোমদত্তা বলল, "কেরিয়ারের দিকে তাকাব না বলছিস?"

দোতারা বলল, "তাকাবে না বলিনি তো। মন দেবে কিনা সেটা তোমার বিষয়। যদি মন দাও তাহলে আর সময়ের অভাবে বই পড়তে পারছি না কথাটা চলে না। বাবাও তো কর্পোরেটের উঁচু পোস্টে। তারপরেও তো কবিতার বই পড়া, ছবি আঁকা, থিয়েটার দেখা সব

চালায়।”

সোমদত্তা বলেছিল, “তোর বাবা বিরাট প্রতিভাবান। সব পারে। আমি সাধারণ। একসময়ে অনেক পড়াশোনা করেছি, আর বই পড়া শেখাস না। সময় হলে পড়ব।”

সময় হয়েছে এখন। পঁয়তাল্লিশ বছর বছর বয়স। মেয়ের দু’বছর ইলেকট্রনিক্স নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়ে যাওয়ার পর, কসবা থেকে সল্টলেকে মায়ের কাছে চলে এসে। অফিস থেকে ফিরে বেশিরভাগ সময়ে কোনও কাজ থাকে না। মায়ের সঙ্গে আর কত বসে থাকা যায়? মেয়ে আসে খুব কম। এলেও দিদিমার কাছে গিয়ে বসে। বাধ্য হয়েই খানিকটা টিভিতে হাবিজাবি দেখে, ম্যাগাজ়িন উলটোয়। বেশি বয়সে সংসার থেকে বেরিয়ে আসা খুব সমস্যার। এখন আর কলিগদের সঙ্গে অফিস পলিটিক্স নিয়ে কথা বলা যায় না। দুটো কথার পরই শিরীষের প্রসঙ্গ টেনে আনবে। একমাত্র দেবমিতার সঙ্গেই যা কথা হয়। বয়সে ছোট হলেও সে নানা ধরনের পরামর্শ দেয়। লক্ষ্য আলাদা হলেও, একই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সেও গিয়েছে। দেবমিতা চেয়েছিল, বরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে, সোমদত্তা চায় চাপ দিয়ে বরকে ফিরিয়ে আনতে।

‘আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী...’

সোমদত্তার মোবাইলে গান বেজে চলেছে। এবার আবছা হলেও শুনতে পেল সে। তার ভুরু কুঁচকে গেল। কোথা থেকে ফোন? অফিস? শনিবার অফিস বন্ধ। তবে নিশ্চয়ই মেয়ে। এই রিং টোন পুরোনো। ঝট করে সোমদত্তার মনে পড়ে গেল, শিরীষ ইদানীং বলত, “গান যাই বলুক, তোমাকে চিনতে পারি না সোমদত্তা। নাকি তুমি আমায় চিনতে পারো না বলে অচেনা ঠেকে?”

বালিশের তলা থেকে মোবাইল টেনে হাতে নিল সোমদত্তা। মেয়ে নয়, শিরীষ। কেটে দিয়ে ফোন ফেলে দিল পাশে। শরীর, মন কোনওটাই ভাল নেই। দু’দিন আগেই শিরীষকে ডিভোর্সের নোটিস পাঠানো হয়েছে, মন ভাল থাকার কথা নয়। যতই চাপ বাড়াতে নোটিস পাঠানো হোক, বিষয়টা তো ডিভোর্স। বাইশ বছরের দাম্পত্য জীবন নিয়ে টানাটানি। না, পুরো বাইশ নয়, আট মাস কম। সাড়ে আট মাস হল সোমদত্তা সল্টলেকে তার মায়ের কাছে চলে এসেছে। শিরীষকে সে বলেওছিল।

“সত্যি যদি এমন কাজ করো, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।”

শিরীষ ঠান্ডা গলায় বলেছিল, “সত্যি মিথ্যের কিছু নেই সোম। আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তোমার সঙ্গে তো গত তিনমাস ধরে আমি এই বিষয়ে অনেক কথা বলে আসছি। তুমি আমাকে বোঝানোর কম চেষ্টা করোনি। মেয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেছে, তোমার মাও বসেছিলেন। আমার বন্ধু, অফিস–কলিগদেরও বলেছে। সবাই আটকাতে চেষ্টা করেছে। আমার কাছে খবর আছে, তুমি ডাক্তারের কাছেও গিয়েছিলে। সাইকিয়াট্রিস্ট। তোমার ধারনা, আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।”

সোমদত্তা রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বলেছিল, “তোমার কী মনে হয় শিরীষ? মাথা খারাপ হয়নি? মাথা খারাপ না হলে কেউ একাজ করে?”

শিরীষ তখন সোফায় বসে বই পড়ছিল। বইয়ের নাম ‘ধানের পোকা হইতে পরিত্রাণ পাইবার সহজ উপায়।’

শিরীষ একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। আইআইটি থেকে পাশ করেছে। তারপর ম্যানেজমেন্ট করছে। সেখানে তার স্পেশ্যাল পেপার ছিল, হাউ টু ট্যাকল রিশেসন ইন মাল্টিন্যাশনাল বিজ়নেস— বহুজাতিক সংস্থায় মন্দা পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়। সে ধানের পোকা নিয়ে কেন বই পড়বে?

শিরীষ শান্ত গলায় বলল, “সোমদত্তা, মানুষ সবসময়ে একরকম থাকে না। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সে বদলাতে থাকে। সেই জন্যই সে মানুষ। একটা সময় শুধু জীবন যা চায় সেই অনুযায়ী বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। নিজের শখ, স্বপ্নের কাছে পৌঁছোতে হয়।”

সোমদত্তা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, “এটা তোমার স্বপ্ন? কই আগে জানতাম না তো! বাইশ বছর তোমার সঙ্গে ঘর করলাম। একটা স্বপ্ন চিনতে বাইশ বছর লেগে যাওয়াটা কি একটু বেশি নয় শিরীষ? আর তুমিই বা কীরকম? আটচল্লিশ বছর বয়সে এসে স্বপ্নের কথা মনে পড়ল! আমাকে ছেলেমানুষ ভাবছ?”

শিরীষ সামান্য হাসল। বলল, “মনের গভীরে কোথাও নিশ্চয় বাস করছিল। জল বাতাস পেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। তবে বেশি বয়সে স্বপ্ন দেখতে পাওয়া তো একটা ভাল লক্ষণ। ওসব বাদ দাও, এরকম একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম, ছাড়তে চাইল না মন।”

“এই সব তুমি কবিতায় লিখবে শিরীষ, আমাকে বোঝাতে আসবে না।”

শিরীষ মলিন হেসে বলেছিল, “কতদিন কবিতা লিখি না!”

সোমদত্তা স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, “এই পাগলামির জন্য তুমি এত ভাল একটা চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ!”

শিরীষ বলল, “কতজনই তো নতুন অ্যাডভেঞ্চারে যায়। যায় না?”

সোমদত্তার চোখমুখ লাল হয়ে যাচ্ছিল। কান্না পাচ্ছিল তার। পাওয়ার কথাই। শিরীষ শুধু চাকরি ছাড়ছে না, কেরিয়ারের খুব বড় একটা সুযোগ সে নষ্ট করতে চলেছে। কোম্পানি তাকে আমেরিকায় পাঠাতে চায়। সেখানে নতুন ডিভিশন খোলা হচ্ছে। ফিলাডেলফিয়ায় অফিস হবে। সোমদত্তা শুনে লাফিয়ে উঠেছিল। ঠিক করে ফেলেছিল, সেও যাবে। অফিসে লিয়েন চাইবে। নইলে কাজ ছেড়ে দেবে। ওদেশে গেলে ঠিক একটা না একটা কোনও কাজ পাওয়া যায়। মেয়ে বড় হয়ে গিয়েছে। কসবায় নিজের ফ্ল্যাট থাকা সত্ত্বেও হস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে। অসম্ভব জেদি আর স্বাধীনচেতা হয়েছে। বলে, বাড়িতে থাকলে নাকি তার সাবজেক্ট পড়া যাবে না। প্যাটার্নই আলাদা। সংসারের মধ্যে এই প্যার্টান খাপ খায় না। ফলে তাকে নিয়েও ভাবনার কিছু নেই। দোতারাও ক’টা বছর বাদে চাকরি পেয়ে যাবে। তার বাবা আমেরিকায় থাকলে, ইচ্ছে করলে সেখানেও আরও লেখাপড়ার জন্য যেতে পারবে। অনেকদূর পর্যন্ত ভেবে রেখেছিল সোমদত্তা।

তার মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়েছে।

শিরীষ বলল, “কোম্পানি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে বলেই তো এবার পালাতে চাইছি। তুমিও আমার সঙ্গে থাকো সোমদত্তা। চলো আমার সঙ্গে, দেখবে কত ভাল লাগবে।”

কসবার ফ্ল্যাটটা বড় এবং অতি সাজানো। ফ্ল্যাট কেনার পর সোমদত্তা ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনারকে দিয়ে কাজ করিয়েছে। শিরীষ বলেছিল, “আমরা নিজেরাই পারব। তুমি, আমি দু’জনে মিলে করে ফেলব।”

সোমদত্তা বলেছিল, “না, পারব না। সব কাজে এক্সপার্ট লাগে। আমার এই ফ্ল্যাটে এসে যেন সবার চোখ টেরিয়ে যায়। অফিসের লোকজনকে ডাকব। আমি আর তুমি কী ধরনের লাইফস্টাইল মেনটেন করি দেখবে।”

শিরীষ অবাক হয়ে বলল, “অন্যকে দেখানোর জন্য ঘর সাজাবে!”

সোমদত্তা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, “সমস্যা কী? অন্যকে দেখানোর জন্য যদি নিজে সাজতে পারি, ঘর সাজাতে অসুবিধে কোথায়? ওদের আমি আসতে বলেছি। ছেলেমেয়ে দলবেঁধে কাজ করে। ভাবনাচিন্তা ইনোভেটিভ। এরা আমাদের অফিসেও কাজ করেছে।”

শিরীষ বলেছিল, “অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে যাবে। তবে তোমার যখন ইচ্ছে, করো।”

দু’জন অল্পবয়সি ছেলে আর একটা মেয়ে এসেছিল। খরচ হলেও কাজ করেছে ভাল। প্রথমে আপত্তি থাকলেও কাজ শুরু হতে শিরীষও উৎসাহ পেল। ক্যাবিনেট, ফার্নিচার, পরদা— সব ওরা ডিজ়াইন করেছে। এমনকী ব্যালকনি দুটোও ওদের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছিল। কোথায় কীরকম গাছ থাকবে, দোলনা থাকবে কোথায়, বেতের চেয়ার-টেবিল কীভাবে বসবে, কার্পেটের নকশা কেমন হবে, সব ভেবেছে। মাস্টার বেডরুম তো বটেই, মেয়ের বেডরুম কাম স্টাডিও

সাজিয়েছে চমৎকার। ফ্ল্যাটের বিভিন্ন দেওয়ালে ছবি আর নানাধরনের ওয়াল হ্যাঙ্গিং ভেবেচিন্তে লাগানো। পছন্দ করবার সময় শিরীষ দোকানে গিয়েছিল। পেনটিংসের ব্যাপারে ওর খুব উৎসাহ। সবচেয়ে মন দিয়ে সাজানো হয়েছে বসার জায়গা। ছিমছাম অথচ অভিনব। তিনরকমের বসার ব্যবস্থা। সোফা, বেতের চেয়ার আর ডিভান। সোমদত্তা একটা ইনডোর ফোয়ারা চাইল। শিরীয় একেবারে হাঁই-হাঁই করে উঠেছিল।

"ইস, কী খারাপ যে হবে! মনে হবে হোটেলের লবি।"

ইন্টিরিয়রের একটি ছেলে হঠাৎই মোবাইল বের করে বলল, "দেখুন তো স্যার, এটা কেমন লাগছে?"

মোবাইলে ফোটো দেখে শিরীষ মুগ্ধ হল। বলল, "বাঃ, এটা সত্যিকারের নাকি?"

"না, স্কালপচার স্যার। ইনস্টলেশন বলাই ভাল। তবে মাটি দিয়েই বানানো হয়েছে। তার ওপর রং।"

শিরীষ উজ্জ্বল চোখে বলল, "আমি এরকম জিনিস আগে কখন দেখিনি। অবশ্যই রাজি!"

সেই 'জিনিস' বসার জায়গায় রাখা হয়েছে। শিরীষ তো উচ্ছ্বসিত বটেই, সোমদত্তারও খুব পছন্দ। অতি সাধারণ ভাবনা, অথচ কী অসাধারণ! 'জিনিস' কিছুই নয়, একটুকরো দেওয়াল। মাটির দেওয়াল। লম্বায় সাড়ে চার ফুট, চওড়ায় ফুট ছয়ের সামান্য বেশি। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, গ্রামের কোনও মাটির বাড়ি থেকে খুলে আনা হয়েছে। ইঁট রঙা লাল দেওয়ালের গায়ে মাটি লেপার আঙুলের দাগ। এক কোনায় সাদা চুন রঙে খানিকটা আলপনা। যেন কাজ শুরু করে কেউ ছেড়ে চলে গিয়েছে। দেয়ালটা রাখা হল সোফার পিছনে। যেন বসলে মনে হয়, দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসা হয়েছে। গেস্ট যারাই দেখেছে চমকে গিয়েছে।

একদিন রাতে শিরীষের সঙ্গে ঝগড়ার সময় সোমদত্তা ধাক্কা দিয়ে ওই দেওয়াল ফেলে দেয়। দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে পড়ে এবং ভেঙে টুকরো হয়। মাটি ছড়িয়ে পড়ে মেঝেতে, কার্পেটে, সোফা ও সেন্টার টেবিলের কাচে। সেদিন আবার দোতারা বাড়িতে ছিল। আওয়াজ শুনে সে নিজের ঘর থেকে ছুটে আসে। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়ায়। ফিরে গিয়ে আবার ঘরে দরজা লাগায়। দেওয়ালটা তারও খুব পছন্দের ছিল।

তবে এই ফ্ল্যাটে মাটির দেওয়াল ভেঙে গিয়েও থেকে গেল। থেকে গেল অদৃশ্য হয়ে। সোমদত্তা এবং শিরীষ ক্রমশ দু'জনে সেই অদৃশ্য দেয়ালের দু'দিকে চলে যেতে লাগল।

শিরীষ চাকরি ছাড়ার পরদিনই, সোমদত্তা কসবার সাজানো ফ্ল্যাট ছেড়ে সল্টলেকে মায়ের কাছে চলে এসেছে আর এরও মাস তিনেক পরে সে ত্রপা নামে মেয়েটির খবর পায়।

'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী...।'

মোবাইল আবার বাজছে। এবার ফোন কানে নিল সোমদত্তা।

"কী হয়েছে?"

উলটোদিকে শিরীষ চিৎকার করে উঠল, "কী হয়েছে মানে! এটা কী পাঠিয়েছ!"

সোমদত্তা ঠান্ডা গলায় বলল, "আমি পাঠাইনি। আমার লইয়ার পাঠিয়েছে।"

শিরীষ আরও জোরে চিৎকার করে ওঠ, "এটা কী!"

সোমদত্তা নিচু গলায় বলল, "চেঁচাচ্ছ কেন? ইংরেজি পড়তে পারছ না? ডিভোর্সের নোটিস।"

শিরীষ এবার শান্ত গলায় বলল, "তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?"

সোমদত্তা চাপা গলায় বলল, "হ্যাঁ হয়েছি। তুমি একটা হাঁটুর বয়সি মেয়ের জন্য পাগল হলে আমি ডিভোর্স নেওয়ার জন্য পাগল কেন হব না শিরীষ? ডিভোর্স দিয়ে ওই হাঁটুকন্যাকে নিয়ে সুখে থাকো। সরি, হাঁটুর বয়সি মেয়েকে এর থেকে বেশি ভাল নামে ডাকতে পারলাম না।"

শিরীষ বলল, "তুমি নোটিস তুলে নাও সোম।"

সোমদত্তা এবার দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ওই বিচটার নামে থানায় ডায়েরি করে ফিরে এসো, আমিও নোটিস তুলে নেব।"

শিরীষ অবাক গলায় বলল, "সোমদত্তা, তুমি কার কথা বলছো! ত্রপা? তার নামে কী কমপ্লেন করব?"

সোমদত্তা রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে বলল, "বলবে, ওই মেয়ে তোমাকে ফাঁসিয়েছে। শি ইজ় আ চিট, আ হোর। ক্রিমিনাল একটা। সে তোমার সম্পত্তি, টাকাপয়সা হাতানোর মতলব করেছিল। এই কমপ্লেন করে তুমি ফিরে এসো। আমি সব ভুলে যাব।"

শিরীষ বলল, "সোমদত্তা, এসব তুমি কী বলছো! ত্রপা একটি অতি ভাল মেয়ে। ওর মতো মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি। তা ছাড়া আমি তো ফিরব না। আসবে তুমি? এই উইকেন্ডেই এসো।"

সোমদত্তা ফোন কেটে দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ওই মেয়েটা খুব ভাল! শিরীষ এটা কী বলল! সোমদত্তা কাঁদতে-কাঁদতেই মোবাইলের রিং টোন বদলাতে লাগল।

॥ ২ ॥

এই মেঘের আলাদা কোনও নাম নেই। থাকলে সম্ভবত হত 'বৃষ্টি ফুরোনো মেঘ'।

এই মেঘ ভাদ্র মাসের শেষদিকে আকাশে ঘুরে বেড়ায়। ক'মাস ধরে একটানা বৃষ্টি ঝরিয়ে ক্লান্ত, সম্ভবত তার একঘেয়েও লাগছে। তেজ, দাপট সবই কমে এসেছে। এবার বিদায়, গুডবাই। যাওয়ার সময় 'বৃষ্টি ফুরোনো মেঘ' কখনও ধীর স্থির, দুলকি চালে ঘোরে ফেরে, কখনও থাকে তাড়াহুড়োয়। ফাঁকে-ফাঁকে মুচকি হাসির মতো দেখা দেয় নীল আকাশ। এই রোদ, এই ছায়া। এসব দিনে ছাতা, রেনকোটের প্রয়োজন হয় না বললেই চলে। নিশ্চিন্তে বাড়ি থেকে বের হওয়া যায়। বৃষ্টি 'হব হব' একটা গুমোট ভাব থাকে বটে, তবে বৃষ্টি হয় না।

আজ সকাল থেকে আকাশে জমেছে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছোটাছুটিও করছিল। ভাবটা এমন যেন চলে যাওয়ার সময় এঘর-ওঘর ঘুরে দেখে নিচ্ছে, কিছু পড়ে রইল না তো? কিন্তু দুপুরে তাদের মেজাজ গেল বদলে! সেই মেঘ কলকাতার মাথায় থমকে দাঁড়াল খুব অল্পক্ষণের জন্য। অতি দ্রুত অন্ধকার হয়ে এল চারপাশ, তারপর সবাইকে থতমত খাইয়ে, হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামিয়ে দিল। একেবারে ঘোর আষাঢ় মাসের বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি শুধু নামল না, তার জোর এতটাই বেশি হল যে কিছু বোঝার আগেই রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, মানুষজন সব ভিজে একাকার কাণ্ড। পথের পাশের হকাররা ছুটোপাটি করে প্লাস্টিক টেনেও জিনিস বাঁচাতে পারল না। একেই বোধহয় বলে, 'ঝটিকা আক্রমণ'।

সোমদত্তা তখন উকিলের অফিস থেকে সবে বেরিয়েছে। সে ভাবতেও পারেনি এভাবে বিনা নোটিসে বৃষ্টি এসে পড়বে। মুশকিল হল। উকিলের অফিস থেকে বেরিয়ে মাথা বাঁচানোর উপায় নেই।

উকিলের নাম সন্তোষ খাস্তগির। সবাই ডাকে 'সন্তোষ উকিল'। ভদ্রলোকের দুটো অফিস। একটা অফিস পাড়ায়, আর-একটা বেহালায়। অফিস পাড়ার পার্টিশান দেওয়া ঘরে উনি কোর্টের দিনগুলোতে বসেন। যার মামলার ডেট থাকে শুধু তার সঙ্গে কথা বলেন। নইলে আসতে হয়, বেহালার বাড়িতে। বড় রাস্তা ছেড়ে সরু গলির মধ্যে। গলিতে গাড়ি ঢোকে না। রিকশাও ঢুকতে চায় না। উলটো দিক থেকে আর একটা রিকশা চলে এলে মুশকিল। তাই গাড়ি বাইরে রেখে হেঁটে ঢোকা ছাড়া উপায় নেই। 'সন্তোষ উকিল' বেহালার অফিসটাও আদ্যিকালের পুরোনো একটা তিনতলা বাড়ির একতলায়। ঘর অতি ছোট। আইনের বই আর কাগজপত্র ঘরটাকে আরও ছোট করে দিয়েছে। তার উপর আবার অন্ধকার। দিনে রাতে সর্বক্ষণ আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এমন পসারওয়ালা একজন লইয়ার কেন যে একটা ঘুপচি অফিস বানিয়ে রেখেছে, সোমদত্তা বুঝতে পারে না। তার উপর মাঝেরহাটের ব্রিজ ভাঙার পর থেকে বেহালা যাতায়াতে একেবারে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে!

সোমদত্তা আজ বেরিয়েছে হাতে কাগজপত্র নিয়ে। সঙ্গে ক'টা বইও রয়েছে। তার মনে হয়েছে, বইগুলোতে এমন কিছু আছে যা

মামলার কাজে লাগবে। তার পক্ষে যাবে। একটি বই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্চয়িতা'। একটি চটি রান্নার বই, নাম, 'নিজের খাবার নিজে বানাও'। ট্রেনে এই ধরনের বই বিক্রি হয়। তৃতীয়টি গাবদা অভিধান। ইংলিশ টু বেঙ্গলি। সন্তোষ উকিল বইগুলো উলটেপালটে দেখলেন। হলুদ কাগজের মার্কার দিয়ে আলাদা করা পাতায় গেলেন। সেখানকার লেখাগুলোতে চোখ বুলিয়ে বললেন, "ভাই, এগুলো কোনও কাজে লাগবে না। আদালতে জমা দিলে, আদালত ছুড়ে ফেলে দেবে।"

সোমদত্তা বলল, "কেন? কাজে লাগবে না কেন?"

সন্তোষ উকিল বললেন, "এগুলো অর্থহীন বলে। অর্থহীন কিছু আদালত গ্রাহ্য করে না।"

সন্তোষ উকিলের বয়স বাষট্টি হতে পারে আবার চৌষট্টিও হতে পারে। মাথার চুল সবটাই পাকা। শুধু জুলপিদুটো কালো। হয়তো রং করেন। দাড়ি-গোঁফহীন মুখে বয়সের ক্লান্তি নেই, অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। দেখলে মনে হয়, মানুষটা খিটখিটে প্রকৃতির। যদিও ঘটনা তা নয়। ঠান্ডা মাথার মানুষ। চাঁছাছোলা কথাও বলেন ঠান্ডা মাথায়। একটা অদ্ভুত স্বভাবও রয়েছে। মক্কেলদের মাঝেমধ্যে 'ভাই' ডাকেন। এই ডাকে ছোট, বড়, নারী, পুরুষ ভেদাভেদ নেই। কেউ-কেউ মনে করে, এই অভ্যেস ভাল নয়। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি থাকে। অপমান করা হয়। তারপরেও মক্কেলরা মুখ ফুটে কিছু বলে না। বলে না তার কারণ, পাকা চুলের এই মানুষ ডিভোর্স মামলার উকিল হিসেবে মারাত্মক। এতই মারাত্মক যে, উকিলমহলে তাকে বলা হয় 'ডিভোর্স সন্তোষ'। তাকে নিয়ে কোর্ট চত্বরে নানারকম কথা চালু রয়েছে। অনেকটা মিথের মতো। ভদ্রলোক শুধু আইনের প্যাঁচ জানেন এমন নয়, সেই প্যাঁচে গিঁট মারতেও জানেন। এমনই গিঁট যে, উলটোদিকের লইয়ার ঘেমে-নেয়ে একসা হবে। সেই গিঁট পাজামার দড়ির মতো। খুলতে গেলে আরও জটিল হয়ে পড়ে। সন্তোষ উকিলের নাকি নিজস্ব চরবাহিনী আছে। তারা কেসের সপক্ষে এবং বিপক্ষে প্রমাণ জোগাড় করে বেড়ায়। দরকারে অনেক সময় প্রমাণ তৈরিও করে। এই বিষয়ে সন্তোষউকিলের নিজস্ব মত রয়েছে।

"ভাই, প্রমাণ কখনও সত্যি বা মিথ্যে হয় না। আইনের চোখে তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলাটাই আসল। অনেক সময়ে অভিযুক্ত দোষী প্রমাণিত হয়েও গোলমাল বাঁধে। পরে দেখা যায়, সেই প্রমাণ মিথ্যে। অভিযুক্ত বেকসুর খালাস পায়।"

লোকে বলে, ডিভোর্সের পর মেয়েকে খোরপোশ পাইয়ে দেওয়া সন্তোষ উকিলের কাছে অতি সামান্য বিষয়। উনি এসব 'সামান্য বিষয়' নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁর চিন্তা থাকে খোরপোশের পরিমাণ নিয়ে।

"ধর্মাবতার, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ মানে শরীরে আলাদা থাকা নয়, বিচ্ছেদের আসল অর্থ নিহিত থাকে মনের দূরত্বে। শরীরকে অস্বীকার করা যায়, সে মেনেও নেয়, কিন্তু মন মানে না। ধর্মাবতার, আপনি মনোমালিন্যের সময়ে থেকেই খোরপোশের আদেশ দেবেন বলে আমার মক্কেলের প্রার্থনা। যেদিন প্রথববারের জন্য আমার মক্কেল তাঁর স্বামীর সঙ্গে তিনদিন কথা বন্ধ রাখতে বাধ্য হন, আইনত সেদিন থেকেই তার মানসিক বিচ্ছেদের সূত্রপাত এবং খোরপোশ পাওনা। এই বিষয়ে সেই কথা বন্ধের তারিখ, সাক্ষীসহ যাবতীয় প্রমাণাদি আমি আগেই আদালতে পেশ করেছি। এতে অর্থের পরিমান বেড়ে অনেকটাই বেশি হবে, তবে তা আমার মক্কেলের মানসিক নিগ্রহের কাছে কিছুই নয়। এই টাকা কতগুলি কিস্তিতে আমার মক্কেল পাবেন সে বিষয়ে মহামান্য আদালত যা রায় দেবেন আমরা মাথা পেতে মেনে নেব। আদালতই শেষ কথা। আমার মক্কেল আপনার সুবিচারের অপেক্ষায় রইল ধর্মাবতার।"

শুধু মেয়েপক্ষ নয়, ছেলেপক্ষের হয়েও প্যাঁচে সন্তোষ উকিল ওস্তাদ। মামলার শেষদিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। নিশ্চিত পরাজয় জেনেও হাল ছাড়েন না। শেষ সময়তেও সাজার মেয়াদ বা খোরপোশে পরিমাণ যতটা পারেন কমাতে চেষ্টা করেন।

"ধর্মাবতার, অনুগ্রহ করে এই ফোটোগ্রাফটি দেখুন। আমার মক্কেল তিন বছর ধরে তাঁর স্ত্রীর বেডরুম একই ভাবে রেখে দিয়েছে। তিনবছর আগে চুলের কাঁটা,পাউডারের কৌটো, চিরুনি, সিঁদুর কৌটো ঠিক যেখানে যেমনভাবে ছড়িয়ে ছিল, আজও ঠিক তেমন ভাবেই রয়েছে। কোনও নড়চড় হয়নি। এমনকী বাথরুমে যাওয়ার স্লিপারটি পর্যন্ত খেয়াল করুন ধর্মাবতার, তারা জায়গা পাল্টায়নি। তিনবছর আগের মতই খাটের নীচে রয়ে গিয়েছে। একটি সোজা, একটি উলটো হয়ে। এর কারণ কী? এর কারণ হল, আমার মক্কেল বিশ্বাস করে, তার স্ত্রী যেমন হুট করে একদিন তাকে ছেড়ে, সাজানো ঘরসংসার ছড়িয়ে ফেলে চলে গিয়েছিলেন, ভুল বুঝতে পেরে একইরকম হুট করে যে-কোনওদিন ফিরেও আসবেন। এসে এই ঘর গোছাবেন। স্ত্রীর প্রতি যদি অপার ভালবাসা না থাকত, কারও পক্ষে অবিকল একইভাবে ঘর রেখে দেওয়া সম্ভব হয় না। আমি মহামান্য আদালতের কাছে ফোটোগ্রাফগুলি পেশ করলাম। আশা করি, ধর্মাবতার রায়দানের আগে, বিষয়টি ভেবে দেখবেন। যদি তিনি চান, আমার মক্কেলের বাড়ি ঘুরে দেখতে আদালত থেকে কোনও অফিসার নিয়োগ করতে পারেন। তিনি দেখে এসে আদালতের কাছে রিপোর্ট জমা দিন, ঘটনা সত্য না বানানো। ধর্মাবতার, আমি জানি, বিষয়টি আইনের কোনও ধারা উপধারার মধ্যে ফেলা যাবে না, কিন্তু আইনকে সে সমর্থন করবে, পোক্ত করবে। আইন কোনও অনড় অটল বিশ্বাস নয় ধর্মাবতার, সে তথ্যে প্রমাণে নিজেকে বারবার পালটে নেয়।"

সেই সন্তোষ উকিল বইগুলো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সরিয়ে দেওয়াতে সোমদত্তা খানিকটা বিরক্ত হল। সে খানিকটা গলা তুলেই বলল, "কেন অর্থহীন বলছেন? 'সঞ্চয়িতা'টা খুলুন, আমি পেজ মার্ক করে এনেছি, খুলে দেখুন প্রথম পাতায় কী লেখা আছে। লেখা আছে, 'কবিতায় তোমাকে খুঁজে পাই।' হাতের লেখা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এই লেখা অবশ্যই কোনও মেয়ের। আমি জানি মেয়ের এবং সেটা ওই শয়তান মেয়েটার। এটা কি প্রমাণ করে না ওই মেয়ে শিরীষের সঙ্গে প্রেম করে? একটা মেয়ে কোনও ছেলেকে কবিতায় কখন খুঁজে পায়? প্রেমে পড়লেই পায়। রান্নার বইটাও দেখুন। অতি রদ্দি একটা জিনিস। ভুলে ভরা। ডালের রেসিপি পর্যন্ত ঠিক করে লিখতে পারেনি। ফোড়নে গোলমাল করেছে। সেই বইতেও কী লেখা দেখুন, 'খুব ইচ্ছে করে, আমি তোমাকে রেঁধে খাওয়াই। কিন্তু হায় রে! আমি রান্না জানি না।' প্রেম না হলে কোনও মেয়ে এমন কথা লেখে? আদালত এটা দেখবে না? এটা তো স্ট্রেট অ্যাডালটরি। অবৈধ সহবাস। এবার ডিকশনরিটায় আসুন। এতে কিছু লেখা নেই, কিন্তু ভিতরে একটা শুকিয়ে যাওয়া গাছের পাতা রয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস, ওই মেয়ে পাতাটা শিরীষকে দিয়েছিল। শিরীষ আহ্লাদ করে সেই পাতা বইতে ঢুকিয়েছে। এর থেকে কী প্রমাণ হয় না, শিরীষ ওই কচি খুকিটির প্রেমে পাগল? তার সঙ্গে থাকে?"

আজকাল নস্যি নেওয়ার চল কমে গিয়েছে। খুব কমজনকেই ডিবে বের করতে দেখা যায়। সন্তোষ উকিল নস্যি নেন। নেওয়ার আগে দু'আঙুলের টিপে বেশ খানিকক্ষণ নস্যি গুঁড়ো ধরেও রাখেন। এই ধরে রাখাটাও একধরনের আমেজের মধ্যে পড়ে। তারপর নাকের কাছে হাত নিয়ে লম্বা টান দেন। প্রথমে বাঁ, তারপর ডান। টানা পর্ব শেষ হলে, রুমাল বের করার জন্য সন্তোষ উকিল দু'পকেট হাতড়াতে লাগলেন। এই কাজ তাকে সর্বদাই করতে হয়। বারবার নস্যির ডিবে এবং রুমাল বের করেন আর ঢোকান, তারপরেও ভুলে যান, কোনটা কোন পকেটে রেখেছেন। তখন দু'পকেট হাতড়ানো ছাড়া উপায় থাকে না। ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে নাক মুছলেন ধীর স্থির ভঙ্গিতে। কিছু ভাবলেন যেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, "আমি এগুলো সবই দেখে নিয়েছি। তারপরেও আবার আপনি পড়লেন। আবার বলছি, না, এতে প্রমাণ হয় না। বইয়ের উপর কে কী লিখল তাই দিয়ে অবৈধ প্রেম প্রমাণিত হয় না। এটা কোনও চিঠি নয়। নীচে নামও নেই। আপনি যে ছোট খুকির কথা বলছেন, সে নাও লিখতে পারে। অন্য কোনও মেয়ে লিখতে পারে, আবার কোন ছেলেও লিখতে পারে। আপনার হাজ়ব্যান্ড একজন সাকসেসফুল ম্যান। বড় পোস্টে চাকরি করছেন। গান-বাজনা পছন্দ করেন। একসময়ে কলেজে নাটক করেছেন, কবিতা

লিখতেন। আপনার কাছ থেকেই এই সব তথ্য আমি পেয়েছি। তার ফোটো আমি দেখেছি। এই বয়সেও যথেষ্ট সুন্দর দেখতে। দেখলে মনে হয় না, তার অত বড় একটি কন্যা রয়েছে। থাকলেও কিছু এসে যায় না। প্রেমে বয়স কোনও ফ্যাক্টর নয়। যাই হোক, আপনার স্বামীর মহিলা ফ্যান থাকা আশ্চর্যের নয়। তার থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তিনি অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত। একজনকে নির্দিষ্ট করব কী করে? এখানে তো কোনও নাম নেই।"

সোমদত্তা গলা নামিয়ে বলল, "নাম বসিয়ে নেওয়া যায় না? আমি তো নাম জানি।"

সন্তোষ উকিল সহজভাবে বললেন, "যাবে না কেন? অবশ্যই যাবে। তবে সেই সঙ্গে প্রতারণা করার দায়ে জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আদালতকে প্রতারণার দায়ে মিনিমাম কতদিন জেলে থাকতে হয় আপনার জানা আছে মিসেস মুখার্জি?"

সোমদত্তা একটু থমকে গিয়ে বলল, "সইটা যে জাল হয়েছে কী করে বোঝা যাবে?"

সন্তোষ উকিল একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, "ভাই, আদালতে একপক্ষের উকিল থাকে, এমন ধারণা আপনার কেন হল বুঝতে পারছি না। উকিল দু'পক্ষেই থাকে। আপনি যা এভিডেন্স দেবেন তাকে ডিফেন্ড করতে বা মিথ্যে প্রমাণের চেষ্টা হবে। যখনই বইগুলো কোর্টে প্লেস করব, অপর পক্ষের লইয়ার বলবে, এই সই যে করেছে তাকে কোর্টে আনা হোক, নয়তো সই জাল বলে ধরা হবে। আমরা ওই মেয়েটিকে সমন করব। সে যদি আসেও, ধরে নেওয়া যাক সে আসবে, তার হাতের লেখার সঙ্গে এগুলো মিলবে না।"

সোমদত্তা বলল, "কেন মিলবে না?"

সন্তোষ উকিল একটু চুপ করে থেকে বললেন, "কেন মিলবে না আপনার জানা আছে ভাই। জানা নেই?"

সোমদত্তা খানিকটা ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল, "আপনি কী বলতে চাইছেন?"

সন্তোষ উকিল বললেন, "কী বলতে চাইছি তাও আপনি জানেন। আপনি একজন উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমতী মহিলা, উচ্চপদে চাকরি করেন। তারপরেও নারীর স্বভাবজাত ক্রোধ, প্রতিহিংসা, ঈর্ষা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। আমি দোষ দিই না, এটা পারা সম্ভবও নয়। এখানে শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র সবাই সমান। ক্রোধে যুক্তি বুদ্ধি লোপ পায়। ভাই, এই লেখা আপনি লেখেননি কিন্তু অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন। একজন নয়, লিখেছেন দু'জন। একটু দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, 'সঞ্চয়িতা' আর রান্নার বইয়ের হাতের লেখা এক নয়। এই ধরনের ছেলেমানুষি এবং সস্তার জালিয়াতি ধরতে বিশেষ সময় লাগে না। কোর্ট ফরেনসিকে পাঠালেই দুটো কালির পার্থক্য, তাদের সময়ের পার্থক্য সবই জানা যাবে। লেখা একসময়ে, নাম একসময়ে বুঝতে সময় লাগবে না। তখন হাজত কে খাটবে ভাই? আমি তো পারব না, বাইরে আমার প্র্যাকটিস রয়েছে। সে সব ফেলে ভিতরে গিয়ে বসে থাকতে পারব না। আপনি যদি রাজি থাকেন, দেখতে পারেন।"

ধরা পড়ে যাওয়ায় সোমদত্তার নিজের ওপরই রাগ হল। কাজটা বোকামিই হয়েছে। সেই রাগ গোপন করে সে বিরক্তি দেখাল।

"তাহলে কি এভাবেই চলতে থাকবে? আমি মাসের পর মাস ঘুরতে থাকব, কিছু হবে না! শিরীষ ড্যাং ড্যাং করে ওই মেয়েটাকে নিয়ে ঘর সংসার করবে? মাঝখান থেকে আমার গাদাখানেক টাকা খরচ হবে?"

সন্তোষ উকিল আবার জহর কোর্টের পকেট দুটো হাতড়াতে লাগলেন। প্রথমে পেলেন নস্যির ডিবে। সেটাকে টেবিলে রেখে, আবার পকেটে হাতড়াতে লাগলেন। একসময় রুমালটাও পেলেন। সোমদত্তা নস্যি জিনিসটা দু'চক্ষে দেখতে পারে না। গা ঘিনঘিন করে। এখনও করছে।

"ভাই, বিচ্ছেদ আর উচ্ছেদের মামলায় উকিলদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ হামেশাই ওঠে। বলা হয়, উকিলবাবুরা মামলা ধরে রেখে মক্কেলকে ঘোরাচ্ছে। শুধু ঘোরাচ্ছে না, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। মামলা চালাতে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। রাগ হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত। তবে কী জানেন, দুনিয়ার যাবতীয় রাগের অন্যতম কারণ হল, নিজের দোষ দেখতে না পাওয়া। নিজের অক্ষমতা যদি মানুষ বুঝতে পারত, তাহলে রাগ নামক অনুভূতিটিই অনেক কমে যেত। এক্ষেত্রেও ঘটনা তাই। ডিভোর্স মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে যেসব প্রমাণের প্রয়োজন, মক্কেল তা হাজির করতে পারে না। উকিলদের শূন্য থেকে হাতড়ে জোগাড় করতে হয়। সময় লাগে।"

সোমদত্তা একটু ঘাবড়াল। সন্তোষ খাস্তগিরকে ধরতে হয়েছে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। চলাফেরা, কথাবার্তায় ধীর স্থির হলেও, এই মানুষ পেশায় অতি দক্ষ এবং ব্যস্ত। ছ'মাসের আগে নতুন মামলা নেন না। নেওয়ার আগে মেরিট বুঝে নেন। সহজ, সরল মামলা হলে মুখের ওপর 'না' বলে দেন। মামলায় ঘোরপ্যাঁচ থাকতে হবে। জটিলতা চাই। একসময়ে অনেকেই তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করত।

"সহজ মামলা নেন না কেন? বিনা আয়েশে জিতে যেতেন। পরিশ্রম কম, নামও বেশি হত। উপার্জনও বাড়ত।"

সন্তোষ খাস্তগির বলতেন, "সহজ মামলা জিতলে পরিশ্রম কম হয় ঠিকই, কিন্তু মজা হয় না। পেশায় মজা না থাকাটা দুর্ভাগ্যজনক। নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে কাজ করি। এই সম্পর্ক হল সুতোর গোলার মতো। একদিকে ছাড়াবে তো আর একদিকে জড়াবে। গোলা যত জড়াবে, ছাড়াতে তত মজা। সহজ মামলা নিয়ে নাম করবার মানুষ সন্তোষ উকিল নয়। বুদ্ধির খেলা, কখনও সুতোয় টান মারে, কখনও ছাড়ে। একসময়ে হয় জেতে, নয় হারে। লড়াই করে জেতায় মজাই আলাদা বাপু।"

অনেক ঝামেলা করে এই মানুষটাকে ধরা গিয়েছে। দেবমিতা প্রথম খোঁজ দেয়। সে সোমদত্তার অফিসে একই ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে। তিন বছর হল ডিভোর্স নিয়েছে। দু'বছরের একটা মেয়েকে নিয়ে সাড়ে চার বছরের বিবাহিত জীবন শেষ করেছে। উচ্চশিক্ষিতার শাশুড়ির নানাবিধ নিগ্রহ এবং সেই বিষয়ে স্বামীর চুপ করে থাকা সহ্য হয়নি। এখন একা সুখে আছে। সোমদত্তার ঘটনা শুনে বলল, "তুমি অ্যাকাউন্টসের অনুসূয়া মজুমদারের সঙ্গে কথা বলে দেখ। শুনেছি ওর এক দাদা না ভাই ডিভোর্স মামলায় খুব এক্সপার্ট। আমার কেসটা যখন চলছিল, কোর্টে ওর কথা শুনতাম। তবে এত ব্যস্ত যে নতুন কেস নিতে চান না। পরে শুনলাম অনুসূয়া মজুমদারের রিলেটিভ। দেখ, যদি কথা বলিয়ে দেয়। অনুসূয়াকে চেনো তো?"

সোমদত্তা একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল, "চিনি। তবে এড়িয়ে চলি। শুনেছি, মহিলা গসিপ পছন্দ করে। আমার এই ঘটনাটা নিয়েও করবে হয়তো।"

দেবমিতা জোরের সঙ্গে বলল, "এতে গসিপের কী আছে? তোমার লুকোনোরই বা কী হয়েছে? যে যা খুশী বলুক। ওই ভদ্রলোককে পেলে কাজটা হবে। তুমি চেষ্টা কর।"

বলা ঠিক হবে কিনা ভাবতে ভাবতেই সোমদত্তা অনুসূয়া মজুমদারকে ধরল।

"অনসূয়াদি, যে করেই হোক, আমাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করে দিন।"

অনুসূয়া ভুরু কুঁচকে বলেছিল, "কার জন্য?"

সোমদত্তা মাথা নামিয়ে বলল, "আমার জন্য।"

অনুসূয়া নিজেকে সামলাতে পারল না। অবাক গলায় বলল, "সে কী! এই তো সেদিন বিয়ে হল! কবে যেন?"

সোমদত্তা বুঝতে পারল, মহিলা গসিপের সাজসরঞ্জাম জোগাড় করতে শুরু করে দিয়েছে। তার মোটেই 'এই তো সেদিন বিয়ে' হয়নি। উনি একটা ঢিল ছুড়লেন মাত্র। কিছু করার নেই। সন্তোষ খাস্তগিরের ডেট চাই।

"এই তো সেদিন নয়, বিয়ের বয়স তেইশ বছর হয়ে গিয়েছে। আমার বয়সও তো কম হল না।"

অনুসূয়া মুখে চুকচুক আওয়াজ করে বলল, 'আহা! এতদিন ঘর করার পর ছাড়াছাড়ি! ইস্‌, আজকাল যে কী হচ্ছে, কোনও রিলেশন

টিকছে না। এই তো গতমাসে আমার এক ননদ বিয়ের একত্রিশ বছর পর সেপারেশনে গেল। ওরা অবশ্য থাকে ফ্লোরিডায়। সম্পর্ক অনেকদিনই খারাপ ছিল। কোনও ইস্যু ছিল না। ওসব দেশে ডিভোর্স আকছার হয়। আবার সত্তর বছর বয়সেও বিয়ে করে। তোমাদেরও কি একই প্রবলেম? বাচ্চাকাচ্চা না হলে অনেকসময় এরকম হয়।"

সোমদত্তার শরীর রাগে চিড়বিড় করে উঠল। নিজেকে সামলে বলল, "আমাদের একটি মেয়ে আছে। তার প্রায় কুড়ি বছর বয়স হতে চলল। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে।"

অনুসূয়া মজুমদার চোখ বড় করে বললেন, "বল কী! অত বড় মেয়ে!"

সোমদত্তা প্রসঙ্গ পালটে বলল, "আপনি একটু সন্তোষবাবুকে ফোন করবেন? শুধু ফোন করলেই হবে না, যে করেই হোক এই সপ্তাহে আমাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বের করে দিতে হবে। ফিজ্ যতই লাগুক সমস্যা নেই।"

অনসূয়া লম্বা করে শ্বাস টেনে বলল, "সে তো করবই। কলিগ বলে কথা। এক অফিসে কাজ করি। একে অপরকে না দেখলে কে দেখবে? কিন্তু দাদাকে বলব কী? এত বছর ধরে শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার? দাদা আবার ঘটনা না শুনে কেস নেয় না। কোনও রিকোয়েস্ট শোনে না। কেসের মেরিট নিয়ে খুঁতখুতানি খুব, নাম তো আর এমনি করেনি। সেই জন্যই জিজ্ঞেস করছি। অন্য উদ্দেশ্য নেই।"

সোমদত্তা একটু চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে বলল, "না, শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার নয়। বলবেন, অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না।"

অনসূয়া মজুমজার ভুরু কোঁচাকালো। বোঝাই গেল, কথা বিশ্বাস হয়নি। তবে তেরোদিনের মাথায় দূরসম্পর্কের 'উকিলদাদা'র অ্যাপয়েন্টমেন্ট এনে দিল।

সন্তোষ উকিলের অফিসঘরের বাইরে একচিলতে প্যাসেজে বসার জায়গা। কেউ যাতায়াত করলে উঠে দাঁড়াতে হয়। নইলে হাঁটুতে ধাক্কা দিয়ে যাবে। এসব দেখলে ভক্তিশ্রদ্ধা হয় না। সোমদত্তা ডাক পেল ঠিক সাড়ে এগারোটাতেই। প্রথমেই ভদ্রলোক ঠান্ডা গলায় কথা শুনিয়ে দিলেন,

"প্রথমেই বলে রাখি, আপনি আমার বোনের রেফারেন্সে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু তার মানে ধরে নেবেন না, আমি আপনার ব্রিফ নেব না। প্রফেশনে চেনা-পরিচিত আমি পছন্দ করি না, তারপরেও মেনে নিতে হয়। সমাজে থাকতে গেলে, নানা ধরনের অপছন্দের কাজ করতে হয়ে। তবে অবশ্যই সেটা একটা স্তর পর্যন্ত। আমি আগে আপনার ঘটনা শুনব, তারপর সিদ্ধান্ত নেব এই মামলা নেব কি নেব না। তবে আপনার মামলা নিই বা না নিই, আজকের জন্য পুরো ফি আপনাকে দিতে হবে এবং সেটা কথা শুরুর আগেই দিতে হবে।"

খুবই ঠ্যাটা ধরনের কথা। কাউকে এই ধরনের কথা বলতে গেলে দশবার ভাবতে হয়। মনে রাখতে হয়, সে অপমানিত হতে পারে। এই লোক ভাবনাচিন্তার ধার ধারেন না। সোমদত্তা ব্যাগ খুলে টাকা বের করল। টাকা গুনতে-গুনতে সন্তোষ খাস্তগির বললেন, "আপনি শুরু করুন। চেষ্টা করবেন মিথ্যে না বলতে এবং তেমন কিছু গোপন না করতে।"

সোমদত্তা বলল, "মানে!"

"যা বললাম সেটাই মানে মিসেস মুখার্জি। মিথ্যে বললে এবং জরুরি কথা গোপন করলে লইয়ারকে বিভ্রান্ত করা হয়। নিন, শুরু করুন। স্বামীর চরিত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করবেন, তবে শুধু সেটাই করবেন না, সঙ্গে তার ভাল স্বভাবও বলবেন। কী ভালবাসে, কী ভালবাসে না, এই সব। ফোটো আছে? কথা শেষ হলে দেখাবেন।"

সোমদত্তা অবাক হয়ে বলল, "এসব তো ডাক্তারের লাগে।"

সন্তোষ উকিল মুচকি হেসে বললেন, "আমিও ডাক্তার। একটাই তফাত, অসুখ সারানোর বদলে অসুখ বাড়াই।"

সোমদত্তার কথা শেষ হলে সন্তোষ উকিল খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। পকেট হাতড়ে নস্যির ডিবে বের করলেন, আবার ঢুকিয়েও রাখলেন। তারপর নিচু গলায় বলতে শুরু করলেন।

"ভাই, দু'টি কথা বলি। প্রথম কথা হল, আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে আপনার সময় বাছাই আমার ভাল লেগেছে। একজন মহিলা হয়েও রাত সাড়ে এগারোটোয় দেখা করতে আসাটা শুধু সাহসের পরিচয় নয়, বুদ্ধির পরিচয়ও বটে। এই সময়ে বিরক্ত করার লোক বিশেষ থাকে না। আর এতে প্রমাণ হল, আপনার আমাকেই দরকার বলে আপনি মনে করছেন। মনে হয়, আপনি ধৈর্য ধরতে পারবেন। দু'নম্বর বিষয়টি হল, আপনার মামলাটি ইন্টারেস্টিং। কারণ এটি জটিল। আসলে এটি কোনও মামলাই নয়, সেই জন্যই জটিল। কোর্টের প্রসেসের মধ্যে এটি আদৌ পড়ে বলে আমার মনে হচ্ছে না। কাউন্সেলিং স্তরেই ডিল করা উচিত ছিল।"

সোমদত্তা বলল, "আমি তো চেষ্টা করেছি। বারবার ওর সঙ্গে বসেছি। আমার মেয়ে, আমার মা, তাঁরাও কথা বলেছেন। সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গেও কথা বলেছি। একসময়ে মনে হয়েছিল, মাথা খারাপ হয়ে হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার সব শুনে বললেন, আপনার অ্যাডজাস্টমেন্ট না হলে আপনি কোর্টে যান।"

সন্তোষ উকিল ডিবে খুলে দুই আঙুলের টিপে নস্যি নিলেন।

"ইন্টারেস্টিং বিষয় হল, আপনি একটা সাধারণ ব্যাপারকে মামলা বানিয়ে ছাড়তে চাইছেন। সেখানে আপনি বিচার চাইছেন। আপনার হাজ়ব্যান্ড যাতে অপরাধী প্রমাণিত হন, তার চেষ্টা করছেন।"

সোমদত্তা তাড়াতাড়ি বলল, "আমার হাজ়ব্যান্ড নয়, ওই মেয়েটাকে আমি জেলে ঢোকাতে চাইছি। হাঁটুর বয়সি একটা মেয়ে যে এরকম শয়তান হতে পারে...ও-ই আমার হাজ়ব্যান্ডকে এইসব দুর্বুদ্ধি দিয়েছে...আমার সংসার ভেঙেছে... উকিলবাবু আমি এমন মামলা করতে চাই যাতে ওই বিচটাকে জেলে পাঠানো যায়।"

সন্তোষ উকিল এবার নস্যি নিলেন। নাক টেনে বললেন, "হাঁটু ধরতে গেলে আগে মাথা ধরতে হবে।"

সোমদত্তা অবাক হয়ে বলল, "মানে!"

সন্তোষ উকিল বলল, "আগে আপনার স্বামীকে দোষী প্রমাণ করতে হবে, তারপর তো ওই হাঁটুর বয়সি মেয়েকে ধরার প্রশ্ন উঠবে। অ্যাডলটরি এখন আলাদা করে অপরাধই। সবার আগে তো এটা অ্যাডালটরি প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, যে মেয়েটার কথা আপনি বলছেন, তার সঙ্গে আপনার হাজ়ব্যান্ডের সম্পর্ক আছে। মনের এবং শরীরের। তাই না? কী যেন নাম মেয়েটির?"

সোমদত্তা নাক সিঁটকিয়ে বলল, "ত্রপা।"

সন্তোষ উকিল ভুরু কুঁচকে বললেন, "ত্রপা! বাঃ, আনকমন নাম তো! ত্রপা মানে কী?"

সোমদত্তা রাগ-রাগ গলায় বলল, "জানি না। মনে হয় মন্দ মেয়ে।"

সন্তোষ উকিল অন্যমনস্কভাবে নিজের মনে বিড়বিড় করলেন, "ত্রপা...ত্রপা... কেমন বয়স বললেন যেন?"

সোমদত্তা মুখটাকে ভেঙেচুরে বলল, "বলতে ঘেন্না হয়, খুব বেশি হলে পঁচিশ-ছাব্বিশ।"

"আর আপনার স্বামীর?"

সোমদত্তা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ফর্টিসেভেন শেষ করে সবে ফর্টিএইটে পা দিয়েছে। সে একজন ছাব্বিশ বছরের মেয়ের সঙ্গে...ছিছি..."

সন্তোষ উকিল অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, "ছিছি! কেন ছিছি কেন? ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়স কোনও ছিছি-র বয়স? বয়স তো খুবই ভাল। এই বয়সে মানুষ কত কী করতে পারে! কত এনার্জি থাকে, সাহস থাকে।"

সোমদত্তা মাথা নামিয়ে বলল, "মেয়ের বয়সি..."

সন্তোষ উকিল বললেন, "বড় কোনও মহিলা হলে সুবিধে হত বলছেন? মিসেস মুখার্জি, জীবন খুব রহস্যময়। যাই হোক, আপনার কেস আমার পছন্দ হয়েছে। যা খুব স্পষ্ট করে আইনের পেরিফেরির মধ্যে পড়ছে না, তাকে আইনে জড়িয়ে ফেলার মধ্যে মজা আছে। কোর্টকে বোঝাতে হবে। আমার ভাল লেগেছে। আমাকে ভাবতে দিন। পরের ডেটের সময় আপনার পছন্দমতো দেওয়া হবে। সাধারণত এটা

আমি করি না, কিন্তু আপনার জন্য করব।"

সোমদত্তা বলেছিল, "ধন্যবাদ। সময় কি বেশি লাগবে?"

সন্তোষ উকিল টেবিলের কাগজপত্র গোছাতে-গোছাতে বলল, "হ্যাঁ লাগবে। তার কারণ, আমি বুঝতে পারছি, আপনাকে আমি যে পথগুলো বলব, আপনি সে পথগুলো নেবেন না। আপনি আর পাঁচজন মক্কেলের মতো নন। তখন আমাকে নতুন পথ ভাবতে হবে। আইনে খুব বেশি এদিক ওদিক করার অপশন থাকে না। ফলে পথটা জটিল হবে। সেই পথ সাকসেসফুল হবে কিনা জানি না। মনে হচ্ছে না হবে।"

সোমদত্তা বলল, "আপনি কী পথ বলবেন?"

সন্তোষ উকিল মুখ তুলে মুচকি হেসে বললেন. "ভাই, সবে তো আজ শুনলাম। এবার খুঁজে দেখি। গোলকধাঁধায় ঢুকেছি। পথ বের করতে সময় লাগবে। সোমদত্তাদেবী, আবার কথাটা মনে করিয়ে দিই, ডাক্তার আর উকিলকে কোনও কিছু লুকোতে নেই। তাহলে কাজ করতে সমস্যা হয়। আমাদের সমস্যা কি জানেন? আমরা পুলিশের মতো জেরা করে, চাপ দিয়ে পেটের কথা বের করতে পারি না। আমাদের মক্কেলের উপর নির্ভর করতে হয়। বুঝতে পারি কথা লুকোচ্ছে বা মিথ্যে বলছে। কিছু বলতে পারিনা। ঠিক কিনা?"

সোমদত্তা একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অস্ফুটে বলল, "ঠিকই তো।"

সন্তোষ উকিল গম্ভীর হয়ে বললেন, "তারপরেও আমার মন বলছে, আপনি কিছু জিনিস লুকিয়েছেন। মিথ্যেও বলেছেন। প্রমাণ হাতে নেই বলে বলতে পারছি না মিথ্যে ক'টা এবং কয়প্রকার। আশাকরি পরেরবার করবেন না।"

সোমদত্তা কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। বুঝতে পারল, বলে লাভ নেই। সন্তোষ উকিল বললেন, "কিছু মনে করবেন না, ভাই বলে ফেলাটা আমার একধরনের মুদ্রাদোষ। দোষটা কাটানোর চেষ্টা করেছি, পারিনি। যাক, অনেক রাত হয়ে গেল, কীভাবে বাড়ি যাবেন?"

রাগ এবং পছন্দ। সোমদত্তার দুটোই হচ্ছিল। তবে বুঝতে পারছিল, ঠিক লোকের কাছেই এসেছে। এর আগে যে-দু'জনের কাছে গিয়েছিল, সে দু'জনেই বলেছিল, "মামলা অতি সহজ। জিতে যাব।" তখনই সোমদত্তা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ওদের কাছে নয়। সে আইন নিয়ে লেখাপড়া করেনি, তবে যেটুকু যা করেছে তাতে এইটুকু বোঝা যায়, ডিভোর্স চাওয়ার মতো যুক্তি তার হাতে কমই আছে।

সন্তোষ উকিল আবার বললেন, "কী হল, কীসে যাবেন? ক্যাব ডেকে নেবেন?"

সোমদত্তা বলল, "গাড়ি আছে।"

সন্তোষ উকিল অন্য একটা ফাইল টেনে নিতে-নিতে বলল, "ভাল। তাহলে এবার আসুন।"

গত আটমাসে মোট সাতবার সোমদত্তা বসেছে সন্তোষ উকিলের সঙ্গে। এছাড়া কোর্টে দেখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সোমদত্তাকে মোট তিনটে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনটেই সোমদত্তা নাকচ করেছে। তা নিয়ে যে সন্তোষ উকিল চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এমন নয়। একদিন বললেন, "আপনি যে এগুলো মানবেন না, আমি জানতাম। তারপরেও বলেছি। পরে বলতে পারবেন না, আমি আপনাকে পরামর্শ দিইনি। তবে এগুলো সবই রুটিন পরামর্শ। আহামরি কিছু নয়। আমি আপনার স্বামীকে পাঠানোর জন্য ডিভোর্সের নোটিস তৈরি করেছি, আপনি দেখে সই করে দিন। তবে মনে রাখবেন, এখন পর্যন্ত যেসব প্রমাণ আমরা পাচ্ছি তাতে কনটেস্ট খুব ইজ়ি হবে না।"

সোমদত্তা জিজ্ঞেস করেছিল, "আহামরি কিছু কবে পাওয়া যাবে?"

সন্তোষ উকিল বলেছিলেন, "আপনি ঠিকঠাক কিছু প্রমাণ আনুন। আমি আদালতে দাখিল করি। তখন দেখবেন আহামরি কিছু পেয়ে গিয়েছেন।"

আজ সেই প্রমাণ হিসেবে বই তিনটে এনেছিল সোমদত্তা। তাও তো বাতিল হয়ে গেল। এতে সোমদত্তা বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলেছে, টাকার কথাও তুলেছে। সে নিচু গলায় বলল, "সরি, আমি ওভাবে বলতে চাইনি। কিছু মনে করবেন না। আসলে আপনি আমার মেন্টাল কন্ডিশনটা বুঝতে পারছেন।"

বেশিদিন একসঙ্গে চলার কারণে এবং বহু ব্যক্তিগত কথা, অনুভূতি জানিয়ে দেওয়ায়, ডাক্তার-উকিলদের সঙ্গে একধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়। সেই সম্পর্ক ভাল-মন্দ দুটোই হতে পারে। তবে এই ঠোঁট-কাটা মানুষের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক হওয়াই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। উকিলবাবু বললেন, "এতে সরি বলার কিছু নেই। ভাই, আপনি মনে করবেন না আমাকে ক'টা কড়া কথা শোনালেন বলে, আমি বলব, যান আর আপনার ব্রিফিং নেব না। এরকম আনপ্রফেশনাল আমি নই। কেস যখন একবার নিয়ে নিয়েছি, যতক্ষণ ফিজ় ঠিকমতো পাব, ততক্ষণ ফাইল ছাড়ব না। অবশ্য আপনি নিজে থেকে যদি চলে না যান।"

সোমদত্তা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, "টাকার কথাটা ওভাবে বলা ঠিক হয়নি আমার।"

"মিসেস মুখার্জি, আপনি আমাকে আরও কথা শোনাবেন। আমি তার জন্য প্রস্তুত। আজ আমাকে এক্সট্রা পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যাবেন। সঙ্গে না থাকলে, কালকের মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন।"

সোমদত্তা বলতে যাচ্ছিল, "এক্সট্রা টাকা কীসের জন্য?" কথাটা গিলে ফেলে ব্যাগ খুলল। সন্তোষ উকিল কাগজপত্র ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বললেন, "টাকা কীসের জন্য, এখন জানতে চাইবেন না। স্টেশনারি লিখে বিল দিয়ে দেব।"

সোমদত্তা কতগুলো পাঁচশো টাকার নোট গুনতে-গুনতে বলল, "আমার বিল লাগবে না।"

সন্তোষ উকিল বললেন, "আমার লাগবে। আমি হিসেব ক্লিয়ার রাখি।"

অফিস থেকে বেরোনোর পরপরই হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। গাড়ি পার্ক করতে হয়েছে বেশ দূরে। বড় রাস্তা পার হয়ে আর একটা গলির ভিতর। আজকাল কলকাতা শহরে গাড়ির সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছে যে, গাড়ি নিয়ে বেরোনোই সমস্যা। ঠেলাঠেলি করে চলতে হয়। প্রয়োজনমতো রাখাও যায় না। কোথাও পৌঁছতে হলে গাড়ি দূরে রেখে হাঁটতে হয়। এই হাঁটতে যাওয়ার সময়েই বৃষ্টি এল। হাতের কাগজ, বই রয়েছে সেগুলোকে যে মাথায় ছাতার মতো করে ধরবে সোমদত্তা সে উপায় নেই। সেগুলো ভিজে যাবে। তাই একরকম ছুটতেই হল। শাড়ি পরে, এই বয়সে রাস্তা দিয়ে ছোটা কোনও সহজ কথা নয়।

গাড়ির কাছে যখন পৌঁছোল তখন সোমদত্তা অনেকটাই ভিজে গেছে। গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে প্রথমেই ব্যাগ থেকে ছোট তোয়ালে বের করে মাথা মুছতে লাগল। বৃষ্টিতে ভিজলে তার সমস্যা হয়।

শিরীষ যে ফোন করে নোটিস তুলে নিতে বলেছে, সেটা উকিলবাবুকে জানানো উচিত ছিল? সে রাগের মাথায় শিরীষকে কী শর্ত দিয়েছে, সেটাও তো বলা উচিত। মনে হচ্ছে বলা উচিত। ফোন করে বলবে? ভয়-ভয় করছে। ওয়াইপার চালাল সোমদত্তা। খুব বৃষ্টি পড়ছে।

সত্যি তো সন্তোষ খাস্তগিরের তিনটে পরামর্শ সে শোনেনি। উনি শিরীষ মুর্খাজির বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরি করতে বলেছিলেন। ফোর নাইনটি এইট-এ। মারধরের অভিযোগ। সঙ্গে-সঙ্গে 'না' বলে দিয়েছিল সোমদত্তা। সন্তোষ খাস্তগির তখন বলেছিলেন, "তাহলে এক কাজ করুন। স্বামীর কাছে চলে যান। সেখানে গোলমাল পাকান। জিনিসপত্র ভাঙচুর করুন, কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলুন। ত্রপা মেয়েটিকে ফিজ়িক্যালি হেকল করুন। হয় এতে মেয়েটি পালাবে, নয়তো রেজ়িস্ট করবে। দুটোতেই আপনার লাভ। পালালে তো মিটে গেল। আর রেজ়িস্ট করলে আপনি সোজা থানায় গিয়ে কমপ্লেন করবে। গুন্ডা দিয়ে মেরেছে। ওরা কমপ্লেন করবে। বাকিটা আমি দেখে নেব। বিষয়টা খবরের কাগজ, টিভি পর্যন্ত নিয়ে যাব। প্রেশার ক্রিয়েট করব।"

সোমদত্তা বলেছিল, "সরি, এ ধরনের গুন্ডামি আমি করতে পারব না। আমরা সোশাল প্রেস্টিজ আছে। আমার স্বামীরও আছে। একটা খারাপ মেয়ের জন্য সেই প্রেস্টিজ নষ্ট করতে পারব না।"

সন্তোষ উকিল মুচকি হাসলেন, "তাহলে আমার তৃতীয় পরামর্শ হল, আপনি শিরীষবাবুকে নিয়ে ক'দিনের জন্য কোথাও বেড়াতে যান। গিয়ে ওর মাথা থেকে চাষবাসের পাগলামি উড়িয়ে দিন। বলুন, এই দুনিয়ায় এক একজনের জন্য এক একরকম কাজ নির্দিষ্ট করা আছে। এর অন্যথা হলে দুনিয়ার ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যায়। যেমন ওর কাজ ক্ষেতের কাদায় নয়, নির্দিষ্ট করা আছে আমেরিকার চকচকে অফিসে। মাথা ঠান্ডা করে বোঝান। দেখবেন দুনিয়ার ব্যালেন্স ঠিক হয়ে গেলে, ওই সব মেয়ে টেয়েও থাকবে না। আপনাকে একটু নরম হতে হবে এই যা।"

সোমদত্তা বলেছিল, "ইমপসিবল!"

॥ ৩ ॥

নাওডুবি নামটা শুনতে অদ্ভুত। ভাল লাগে আবার একই সঙ্গে গা ছমছম করে। নাম শুনে শিরীষ অবাক হয়ে বলেছিল, "গ্রামের নাম নাওডুবি! মানে কী?"

বড়মামা বললেন, "জানি না। গাঁয়ের নামের যে সবসময় কোনও মানে থাকে, এমনটা তো নয়। লোকের মুখে-মুখে হয়ে যায়। আমি একটা গ্রামের নাম জানতাম হাতিমারি। কস্মিনকালেও সেখানে হাতি আসেনি, মারার প্রশ্নই ওঠে না। তারপরেও নাম হয়েছে হাতিমারি!"

শিরীষ তাও বলেছিল, "নিশ্চয়ই মানে আছে কিছু। নিয়ারেস্ট রেলস্টেশন কী? সেও কি নাওডুবি?"

বড়মামা বললেন, "রেলস্টেশন ধারেকাছে নেই। অনেকটা ঘুরে যেতে হয়। সেই সাঁইথিয়া। তবে কলকাতা থেকে বাসেও যাওয়া যাবে। হাওড়া থেকে দিনে একটা বাস ছাড়ে। সেও তোমার ওই সবেরগঞ্জ পর্যন্ত। ওখানেই তোমার ব্লক অফিস। তারপরে হয় ট্যাক্ট্রর ধরো, নয় ইঞ্জিন লাগানো ভ্যান রিকশা। ফটফট করতে-করতে আর লাফাতে-লাফাতে রওনা হও। এখন অবশ্য একটা দুটো করে ফোর হুইলার ঢুকছে, তবে সেও ওই চারপাশ ঢাকা ভ্যান। তাতে মানুষও যাচ্ছে, ছাগল-ভেড়া-মুরগিও যাচ্ছে, আবার সবজিও যাচ্ছে। নিজের গাড়ি থাকলে টানা যাওয়া যায়, যদিও রাস্তা অতি খারাপ।"

শিরীষ জ্বলজ্বলে চোখে বলল, "বাঃ, সুন্দর তো! একেবারে ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড।"

বড়মামা হেসে বললেন, "শুনতে ভাল লাগে। গেলে বোঝা যায় ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড কতখানি ঝামেলা। অজ পাড়াগাঁ বলতে যা বোঝা যায়, অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। পাড়াগাঁ-ই বা কোথায়? আমি যে জায়গার কথা বলছি, সেখানে শুধু জমির পর জমি পড়ে আছে। লোকজন ঘরবাড়ি কিছু নেই। কিছু জমিতে চাষবাস হয়, কিছু পড়ে রয়েছে। মূল গ্রামটা বেশ খানিকটা দূরে।"

শিরীষ বলল, "চাষবাস হয় না কেন?"

"হয় মালিকানার ঝামেলায় পড়ে রয়েছে, নয়তো চাষের অযোগ্য। ওখানকার জমি রুক্ষ, মাটিতে রস কম, কোনও-কোনও জায়গায় একটু পাথরও আছে। বেদখল করেও লাভ হয় না। চাষের মতো করে তুলতে খরচ আছে। সেই খরচের পর কত আর লাভ হবে? সার, জল, মজুরের খরচ বেড়েছে। জমি বাতাতেই প্রথমদিকে বিঘে প্রতি ন'-দশ হাজার টাকা ঢালতে হয়। চাষবাস ঠিকমতো হলে মাসে টেনেটুনে তিন হাজার টাকার মতো বাড়তি থাকে। ওটাই আয়। তাও সব সময় থাকে না। ধানে পোকা, সবজিতে মড়ক, ঝড়-জল হলে তো গেল।"

শিরীষ অবাক গলায় বলেছিল, "বাপ রে! বড়মামা, চাষ নিয়ে তুমি এত জানো!"

বড়মামা হেসে বললেন, "এটাও একটা ইঞ্জিনিয়ারিং। তোরটা কম্পিউটারের, এটা চাষবাসের।"

সোমদত্তা বসেছিল উলটোদিকের সোফায়। সে চোখ বড় করে বলল, "জমি বাতানোটা কী?"

বড়মামা বললেন, "জমিকে চাষের উপযুক্ত করতে গেলে ঠিকঠাক করতে হবে না? ওকেই বাতানো বলে। ভাল করে জল ঢেলে, ট্র্যাক্টর দিয়ে, লাঙল দিয়ে কুপিয়ে ওলটপালট করতে হয় বারবার। একে বলে ফাল চাষ। ট্র্যাক্টরে একধরনের ফাল থাকে। আর এইসব রুক্ষ জমিতে তো অনেক কোপানো লাগে। এর জন্য লোক পাওয়া যায়। জমির আশপাশের নদী, পুকুর থেকে জল আনার ব্যবস্থা করতে হয়।"

সোমদত্তা বলল, "এরকম একটা জায়গায় দাদুর জমি ছিল!"

শিরীষও অবাক হওয়া গলায় বলল, "কই আমি তো কিছু জানতাম না। মাও কখনও বলেনি কিছু। তুমি কোথা থেকে জানলে বড়মামা?"

বড়মামা হেসে বললেন, "আমিও কি জানতাম? কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে পেলাম। দাগ, খতিয়ান সব দিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসের পাকা দলিল। বাবা যে কেন এরকম একটা প্রপার্টি করেছিলেন বুঝতে সময় লেগেছিল। জামশেদপুরের বাড়ির সেই দৈত্যের মতো আলমারিটার কথা মনে আছে? বাবার স্টাডিতে ছিল। একেবারে একটা দেওয়াল জুড়ে।"

পুরনোদিনের কথা শুনতে ভাল লাগে। বিশেষ করে বয়স বাড়লে। শিরীষ উৎসাহ নিয়ে বলল, "সেগুন কাঠের ছিল না? কালো বার্নিশ করা? একেবারে ঘরের সিলিং পর্যন্ত উঁচু। বাড়ির যাবতীয় দরকারি অদরকারি কাগজপত্র তাকে রাখা থাকত। মনে আছে আলমারির দরজার বাইরে গোল কাঠের ছিটকিনি ছিল। আমি সেই ছিটকিনি নিয়ে খেলতাম। মা বকত, দাদু আসকারা দিত। আলমারিটা আছে এখনও? বড়মামিমা মারা যেতে গিয়েছিলাম শেষবার। খেয়াল করিনি।"

বড়মামা বললেন, "আলমারিটা থেকেই কাগজ পেলাম। নাওডুবির দশ বিঘে জমি নিয়ে বাবার হাতে লেখা উইল। সঙ্গে ইচ্ছাপত্র।"

সোমদত্তা বলল, "উইল! কী লেখা আছে? ইচ্ছাপত্রই বা কী?"

সোমদত্তার প্রশ্নের জবাবে বড়মামা হেসে বললেন, "বাবার উইলে কী রয়েছে সেটা জানার জন্যই তো শিরীষবাবাজিকে খুঁজে বের করেছি।"

শিরীষ ভুরু কোঁচকালো। অস্ফুটে বলল, "আমাকে খুঁজে পেয়েছ!"

বড়মামা এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, "জায়গাটা দুর্গম, তবে গিয়ে পড়লে ভাল লাগবে। অন্তত আমার তো লেগেছে।"

শিরীষ বলল, "তুমি গিয়েছিলে নাকি?"

বড়মামা বললেন, "গিয়েছিলাম বইকী। বাবার কাণ্ড দেখতে গিয়েছিলাম। একটা ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, চিরকাল মেশিন আর লোহা লক্কড় নিয়ে থেকেছে, সে একটা দুর্গম জায়গায় সত্যি জমি কিনেছে কিনা দেখতে যাব না? এই বয়সে এসে বুঝেছি, কাগজপত্রের সত্যির সঙ্গে জীবনের সত্যির ফারাক থাকে।"

শিরীষ বলল, "কী দেখলে? ফারাক পেলে?"

"না, বরং বাবা কম লিখেছে।"

বড়মামার সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবছর হয়ে গেল? নাকি একটু কম হবে? একটু কমই হবে। একদিন অফিসের অপারেটর ফোন তুলে বলল, "স্যার, সাম মহীতোষ চ্যাটার্জি ওয়ান্টস টু টক..."

শিরীষ একটু থমকে গিয়ে বলেছিল, "মহীতোষ চ্যাটার্জি!"

ওই মুহূর্তখানেকই লেগেছিল। বড়মামাকে মনে পড়ে গেল। এতদিন পরে! কত বছর পর? মনে পড়ছে না। তিন? চার? নাকি আর একটু বেশি? সব পরিবারেই আত্মীয়দের মধ্যে কেউ না কেউ থাকে যে হারিয়ে যায়। সবসময় যে শরীরে হারিয়ে যায় এমন নয়, মন থেকেও হারিয়ে যায়। শিরীষের বেলায় গোটা মামাবাড়িটাই হারিয়ে গেছে যেন।

শিরীষ ফোন চেপে ধরে প্রায় চিৎকার করে বলে ফেলল, "বড়মামা, কোথা থেকে ? জামশেদপুর?"

অফিসে এরকম উচ্ছ্বসিত গলায় শিরীষ কথা বলে না। বড় চাকরির কতগুলো নিয়ম আছে। বড় হওয়ারও নিয়ম থাকে। সেখানে আবেগের কোনও জায়গা নেই। মনে করতে হবে, আবেগ হল মানবশরীরের

অ্যাপেন্ডিক্সের মতো। অহেতুক, অর্থহীন একটি লুকিয়ে থাকা লেজ মাত্র। মানুষ সভ্য হয়েছে, তার আর লেজের দরকার নেই। ঘাপটি মেরে থাকলে থাকুক। জ্বালালে বাদ দিয়ে দাও। তারপরেও অবশিষ্ট যদি কিছু থেকে থাকে, তাকে লুকিয়ে রাখতে হয়। এত বছর পর বড়মামার ফোন পেয়ে শিরীষ আবেগকে লুকোতে পারেনি।

বড়মামা বললেন, "কলকাতায় এসেছি।"

শিরীষ উত্তেজনা সামলে বলল, "এতদিন কোথায় ছিলে? একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছ যে। তোমার মোবাইল নম্বর জানি না। কয়েকবার জামশেদপুরের বাড়ির ল্যান্ডলাইনে ফোন করেছিলাম। বেজে গেল। সেও তো অনেকদিন হয়ে গিয়েছে।"

বড়মামা হেসে বললেন, "মোবাইলে তো পাবি না। মোবাইল ফোন একবার হারিয়ে যাওয়ার পর আর কিনিনি। ওই জিনিস আমার দরকার হয় না। কার সঙ্গেই বা কথা বলব? বারো বছর আগে তোর মামিমা মারা যাওয়ার পর তো কথা বলার লোকই চলে গেল। তোর মা গিয়েছে আরও আগে। আর তোর ছোটমামা সেই যে লেখাপড়ার সময় দেশ ছেড়েছে আর যোগাযোগ রাখেনি। তোর মামাবাড়ি বলে তো আর কিছু নেই শিরীষ। জামশেদপুরের বাড়িতে তালাচাবি দিয়ে দেশ দেখে বেড়াই। ঘরে মন টেকে না, একা লাগে। বাতের ব্যথা, চোখের ছানি, সুগার-প্রেশার ভুলে থাকতে বেড়ানোর মতো ওষুধ নেই।"

শিরীষ খানিকটা গলার স্বর নামিয়ে বলল, "আমরা তো রয়েছি বড়মামা। তোমাকে পাই না।"

বড়মামা আবার হাসলেন, "তোরা কতটা আছিস জানি না, তবে আমি আর নেই। তোর সঙ্গে তিনবছর পর কথা হচ্ছে। ফোন নম্বর হারিয়ে ফেলেছিলাম। বলেছিলি বাড়িও বদলেছিস। সে ঠিকানাও আর নেওয়া হয়নি। এই বুড়ো বয়সেও যে হেঁটে চলে ঘুরতে পারছি এই যথেষ্ট। মিরাকল বলতে পারিস। কতদিন পারব জানি না," বলে আবার টেলিফোনে একচোট হাসলেন মহীতোষ চ্যাটার্জি। বললেন, "তোর ফোন নম্বর মনে না থাকলেও, তোর অফিসের নামটা মনে ছিল। সেই সূত্র ধরে অনেক কষ্টে নম্বর জোগাড় করেছি। তোর সঙ্গে জরুরি দরকার শিরীষ। খুব জরুরি।"

শিরীষ অবাক হয়েছিল, বড়মামার কী দরকার! এই মানুষ কোনওদিন দরকারে যোগাযোগ করেনি। মায়ের মতো স্বভাব। কিছু লাগলেও চাইবেন না। বলবেন "ও ঠিক হয়ে যাবে।" অসুখ করলেও জানাননি কখনও। হাসপাতালে ভর্তি হলেও নয়। মামিমা মারা যাওয়ার পর নিজেকে সবকিছু থেকে সরিয়েও নিয়েছেন। অথচ জামশেদপুরে মামাবাড়িতে একটা সময় খুব যাতায়াত ছিল শিরীষের। দাদুকে পেয়েছিল দশ-এগারো বছর পর্যন্ত। দিদিমাকে দেখেনি। মায়ের বিয়ের আগেই মারা যায়। আড়াই মিনিটের হার্ট অ্যাটাক। সেই সময় ছোটমামা লেখাপড়া করতে বাইরে চলে যায়, আর ফেরেনি। দাদু মারা যাওয়ার সময় এসেছিল একবার। সেই শেষ। তারপর আর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। মা মারা যাওয়ার খবরও দেওয়া যায়নি। শিরীষ আবছা শুনেছিল, ছোটমামা লেখাপড়ায় ভাল ছাত্র হলেও, এখানে কোনও একটা বড় অন্যায় করেছিল। সেই কারণেই পালিয়েছে। দেশে ফেরে না। অন্যায়টা কী, বিস্তারিত জানে না শিরীষ। শুধু জানে, মেয়েঘটিত কোনও ব্যাপার। মেয়েটি কে, তাও জানে না। জানতে ইচ্ছেও করেনি।

বড়মামা এসেছিলেন দু'দিনের জন্য। উঠেছিলেন হাওড়া স্টেশনের কাছে এক হোটেলে। জামশেদপুরের বাড়িটা বিক্রি করে দিচ্ছেন। একজনের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছে। বাঙালি ব্যবসায়ী। কাপড়ের ব্যবসা করে। জামশেদপুরে বড় আউটলেট আছে। সেটাকে কেন্দ্র করে আশপাশে আরও কয়েকটা আউটলেট খুলতে চান। জামশেদপুরে পাকাপাকিভাবে থাকতে হবে। সেই কারণেই বাড়ি নেওয়া। বড়মামার সঙ্গে একটাই শর্ত হয়েছে, বাড়ির পিছনের নিম গাছটা কাটা চলবে না। দাদুর হাতে লাগানো। যে বাড়ি কিনছে, সে নাকি শর্ত মেনে নিয়েছে। বাড়ি বিক্রির কাজ সেরে শিরীষকে ফোন করেছিলেন। হাতে সময় নেই। পরদিনই উত্তর ভারত ভ্রমণে চলে যাবেন। হোটেলে গাড়ি পাঠিয়ে বড়মামাকে বাড়িতে নিয়ে এল। সোমদত্তা যত্ন করল। বয়স বেশি হলে কী হবে, মহীতোষ চ্যাটার্জির শরীর এখনও শক্তপোক্ত। মজার কথা হল, এখনও রঙিন জামা পরেন। ডিনারে একবাটি দুধে ফেলে ছ'টা রুটি খেয়ে ফেললেন অনায়াসে। খাওয়া-দাওয়ার পর ড্রইংরুমে সোফায় বসে কথা শুরু হয়।

"বড়মামা, বাড়ি বেচে দিচ্ছ কেন?"

বড়মামা হেসে বললেন, "পথে পথেই তো থাকি, বাড়ি রেখে কী হবে? এবার পাকাপাকিভাবে পথেই থাকব।"

সোমদত্তা খুব বেশিবার যে এই মানুষটাকে দেখেছে এমন নয়। এক-আধবার। তবে স্বামীর কাছে গল্প শুনেছে। সে অবাক হয়ে বলল, "সেকী! পথে থাকবেন কেন? কলকাতায় একটা ছোটখাটো ফ্ল্যাট নিয়ে নিন। আমাদের কাছে থাকবেন। আমরা আপনাকে দেখব।"

বড়মামা চোখ নাচিয়ে বললেন, "খেপেছ? একবার সংসারের মায়া ত্যাগ করেছি, আর ওই জেলখানায় ফিরি? আসলে কী জানো ভাগ্নেবউ, দেশ ঘুরতে তো টাকা লাগে। বাড়ি বিক্রির কিছু টাকা রেখে দেব হাসপাতালে, চিকিৎসা যাতে হয়। কিছু টাকা থাকবে শ্মশানে, মরে গেলে শরীরটার তো একটা সুরাহা করতে হবে। ছেলেপুলে নেই, কী হবে বাড়ি রেখে?"

শিরীষ বলল, "ছিছি, এসব কী বলছ? তবে সত্যি যদি বাড়িতে মন না থাকে, বাড়ি বিক্রি করে দেওয়াই ভাল। ফেলে রেখে কী হবে? বোঝা ছাড়া কিছু নয়। তবে তুমি চাইলে আমার এখানে এসে উঠতে পার।"

বড়মামা বললেন, "এক বাড়ি ছেড়ে আর এক বাড়িতে! মোটেই নয় বাপু। রাখো আমার কথা, তোদের ছোটমামার একটা খোঁজ পেয়েছিলাম।"

শিরীষ উত্তেজিত হয়ে বলল, "তাই নাকি! ছোটমামা কেমন আছে?"

বড়মামা বললেন, "খুব ভাল আছে। সে এখন ইটালিতে মানারোলা নামের এক শহরে থাকে। এই শহরের নাম শুনেছিস নিশ্চয়ই।"

শিরীষ বলল, "সমুদ্রের ধারের চমৎকার একটা শহর। ছবির মতো। বলা হয়, পৃথিবীর সেরা সুন্দর শহরের একটা। রঙিন সব বাড়ি। শুনেছি, শহরের ভিতর গাড়ি চলা নিষিদ্ধ। নো হর্ন, নো পলিউশন। শাটল বাস আছে। নয়তো পায়ে হাঁটো। জানি না, এখন কী নিয়ম। তবে শহরটা ওয়াইনের জন্যও বিখ্যাত।"

বড়মামা বললেন, "ওই ওয়াইনের কোম্পানিতে কাজ করছে পরিতোষ। ওদেশেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। ওর সঙ্গে কথা হয়নি, ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে। তিনি দয়া করে এক লাইনে উত্তর পাঠিয়েছেন, বাড়ি বা দেশে ফেরার ব্যাপারে তার কোনও উৎসাহ নেই। আমার যা খুশি করতে পারি। গুণধর ভাই আমার।"

সোমদত্তা ঝলমলে মুখে করে বলল, "ইস্, আমার ওইসব দেশে থাকতে খুব ইচ্ছে করে।"

বড়মামা বললেন, "যাও না। সমস্যা কোথায়?"

সোমদত্তা রাগ-রাগ মুখ করে বলল, "বড়মামা, আপনার ভাগ্নেকে একটু বুঝিয়ে বলে যান তো। ওকে অফিস থেকে কতবার যে ফরেনে যাওয়ার অফার দিয়েছে...ও রাজি হয় না...সামনে তো একটা খুব বড় চান্স আসছে। এদেশে থেকে কী হবে? কী আছে এখানে?"

বড়মামা কিছু বলতে গিয়ে একটু থমকে গিয়েছিলেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, "কী আছে দেখার জন্যই তো এই বুড়ো বয়সে লোটাকম্বল বেঁধেছি। যেদিন গাড়ির অ্যাক্সেল ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ব সেদিন সোজা ওল্ডএজ হোম। লছমনঝুলার কাছে একটা চমৎকার হোম রয়েছে, সেখানে কথাবার্তা বলে রেখেছি। বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে কিছুটা টাকা দিয়ে রাখব।"

বড়মামা চিরকালই হাসিখুশি ধরনের মানুষ। জীবনে নানারকম ঝড় গিয়েছে, তারপরেও মুখ থেকে হাসি মোছেনি। কিছু মানুষ এরকমই হয়। বয়সও অনেক হল। এই বয়সে গড়পড়তা বাঙালি

অসুখবিসুখে কাবু হয়ে মৃত্যুর কথা চিন্তা করে। বড়মামা নতুন করে জীবন শুরু করেছেন।

সেদিন বড়মামা 'জরুরি' কথাটা বলেছিলেন, আর-একটু রাতের দিকে।

"বাড়িটা বিক্রি করে দেব বলে কাগজপত্র গোছগাছ করছিলাম। আর তখনই দৈত্যাকৃতি সেই আলমারির একেবারে উপরের তাকে পোকায় কাটা একটা ফাইল মিলল। দড়ি দিয়ে বাঁধা। দড়ির অবস্থাও অতি শোচনীয়। আবর্জনা ভেবে ফাইলটা ধরে ফেলে দিতেই যাচ্ছিলাম। ওপরে দেখি বাবার হাতে লেখা, 'নাওডুবি'। থমকে গেলাম, কেমন যেন লাগল। নাওডুবি আবার কী! কোনও নাটক-টাটক নাকি? বাবা কি নাটকও লিখতেন! কৌতূহলে ফাইল খুলতে একটা জমির দলিল পেলাম। সবেরগঞ্জের কাছে, নাওডুবি গ্রামে ন'-বিঘে ছ'-ছটাক জমি কেনা হয়েছে। তারিখ যা দেওয়া রয়েছে তা থেকেই বুঝতে পারলাম, বাবার মৃত্যুর বছর দু'য়েক আগের ব্যাপার। জমি রেজিস্ট্রি শিবতোষ চ্যাটার্জি, মানে তোমার দাদুর নামে। কিন্তু তোমাকেও জড়ানো আছে শিরীষ।"

বড়মামা দম নিতে থামলে শিরীষ বিস্ফারিত চোখে বলল, "কী বলছ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। দাদু জমি কিনে আমাকে জড়িয়ে দিয়েছেন?"

বড়মামা হাত তুলে বললেন, "দাঁড়াও, আগে গল্পটা শেষ করি। তোমার জানা নেই, জানার কথাও নয়, তোমার দাদু মানুষটি একজন গোছানো মানুষ ছিলেন। ওই জীর্ণ ফাইলের নীচে একটা কাগজ পেয়ে গেলাম। বাবারই হাতে লেখা। একটা নোটের মতো। সেখানে লেখা— 'খুব ইচ্ছে করে এই শহুরে বানানো জীবন ছেড়ে, দৌড়ঝাঁপের জীবন শেষ করে কোনও শান্ত জায়গায় গিয়ে থাকি। বড় মেশিন, বয়লারের আগুন নিয়ে অনেক তো ছোটাছুটি হল, এবার মাটির কাছে যাই। এই ভাবনা একেবারেই বোকার ভাবনা, আজগুবি ভাবনা। তারপরেও একটা বোকার কান্ড করেছি। খবর পেলাম সস্তায় জমি পাওয়া যাচ্ছে। ভার্জিন ল্যান্ড। জায়গাটার নাম বড় অদ্ভুত, নাওডুবি। লোভ সামালাতে পারলাম না। লোভ না ইচ্ছে জানি না। হুট করে খানিকটা জমি কিনে ফেলেছি। ইচ্ছে, বাকি জীবনটা চাষ করে কাটাব।'"

আবার থামলেন বড়মামা। এবার পাশে রাখা চামড়ার সুটকেস ধরনের ব্যাগ খুলে একটা ফাইল বের করলেন। শিরীষ আর সোমদত্তার মনে হল, তারা সিনেমা দেখছে।

সোমদত্তা বলল, "কী আছে ওতে?"

বড়মামা নির্বিকার ভঙ্গিতে ফাইলের ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া দড়ি খুলতে খুলতে বললেন, "সব আছে। ওই জমির কাগজপত্র, বাবার নোট।"

সোমদত্তা বলল, "আরও নোট।"

বড়মামা বললেন, "হ্যাঁ, আরও নোট।"

বড়মামা সেদিন খোলা ফাইল হাতে লাল হয়ে যাওয়া একটা কাগজ বের করল। এটা আগের মতো সাধারণ কাগজ নয়, কোর্টের স্ট্যাম্প পেপার। নীচে দু'জন সাক্ষীর সইও রয়েছে। শিরীষের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নে পড়।"

সোমদত্তা বলল, "বড়মামা, আপনি পড়ুন। আমিও শুনব।"

শিরীষ বলল, "তাই ভাল। তবে কাগজটা একটু দিন। দাদুর হাতের লেখাটা দেখি।"

ছোট লেখা। মাত্র গুটিকতক লাইন। কিন্তু মারাত্মক— 'সংসার আর শরীরের কারণে নাওডুবি গিয়ে থাকা হল না। জমিটাকে চাষের উপযোগী করতে পরিশ্রম আর অর্থ, দুটোই লাগবে। এই বয়সে সেই চ্যালেঞ্জ নিতে পারলাম না। পরাজিত হলাম। তবে স্বপ্নটা রয়ে গেল। মানুষ স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখে তার উত্তরাধিকারের মধ্যে। আমিও রাখলাম। স্বপ্ন আমি রেখে গেলাম আমার নাতি শিরীষের কাছে। এইটুকু বয়সেই তাকে দেখে আমার মনে হয়েছে, এই ছেলে স্বপ্ন দেখতে জানে। সে আর পাঁচজনের মতো নয়। দুষ্টুমি করার চেয়েও সে রূপকথার গল্প শুনতে ভালবাসে, ছড়া ভালবাসে, বসে আঁকতে চায়। আশা করব, বড় হয়ে সে স্বপ্ন দেখা ভুলে যাবে না। এটাই আমার উইল হিসেবে ধরা হোক। আমার নাওডুবির জমি নাতিকে দিয়ে গেলাম।'

বড়মামা ফাইল বন্ধ করলেন। মন দিয়ে ফাইলের দড়ি বাঁধলেন। তারপর ফাইলটা রাখলেন টেবিলের উপর। শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, "নাও, নিজের সম্পত্তি নিজের কাছে রাখো।"

শিরীষ সোফায় হেলান দিয়ে থতমত ধরনের হেসে বলল, "খেপেছ বড়মামা? আমার সম্পত্তি কীসের? ওসবে আমি নেই।"

বড়মামা বললেন, "তুমি থাকলে কী না থাকলে আমার তাতে কিছু যায় আসে না বাপু। তোমার জিনিস তোমাকে দিয়ে গেলাম। দায়িত্ব পালন করলাম। বাবা কাউকে কিছু বলেননি কেন, সেটাই অদ্ভুত। যাক, কী করেননি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কী করেছেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা। আমার ছেলেপুলে নেই, তোমার ছোটমামার ফ্যামিলি কেমন জানি না। ফলে তার নাতি বলতে একমাত্র তুমি আছ। জামশেদপুরের বাড়ি বিক্রির কথা যদি না ভাবতাম, আলমারি কাগজপত্রও ঘাঁটতাম না, এইসব কাগজপত্রও পেতাম না। জমির কথাও জানতে পারতাম না।"

শিরীষ বলল, "দাদুর কেন মনে হয়েছিল, আমি সব ছেড়েছুড়ে গ্রামে গিয়ে চাষবাস করব? এগারো বছরের কাউকে দেখে এসব বোঝা যায়?"

বড়মামা বললেন, "না বোঝা যায় না। বোঝাই যাচ্ছে, তোর দাদু ইমোশনাল হয়ে এসব লিখেছিল। বয়স হয়ে গেলে মানুষ যুক্তি হারায়। আমিও হারিয়েছি। শিরীষ, এই নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আমার ডিউটি তোমাদের জানানো, সেই ডিউটি করলাম। করার আগে একবার স্পটে গিয়েছি। বিএলআরও অফিসে গিয়ে দেখে এসেছি, বাবা সত্যি এরকম জমি কিনেছিল কিনা, এখন তার স্ট্যাটাস কী, জমি আছে না বেহাত হয়ে গিয়েছে। তোকে বলার আগে তো সবটা জেনে বলতে হবে। বাবা কিনেছেন কতদিন হয়ে গেল। এতদিন পড়ে থাকলে জমি বেদখল হয়ে যায়। দেখলাম সব ঠিক আছে।"

সোমদত্তা গদগদ গলায় বলল, "বড়মামা, ওই প্রপার্টির এখন দাম কেমন হয়েছে?"

বড়মামা বললেন, "জমি খুব ভাল নয়, তবে দাম কম হবে না। বিঘে প্রতি লাখ খানেক হয়ে যেতে পারে। আর খানিকটা যদি রেডি করে দেওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই। আমি গিয়ে সব খবরটবর নিলাম।"

শিরীষ বিরক্ত গলায় বলল, "উফ্! সোম, চুপ করো তো। বিক্রিবাটার প্রশ্ন আসছে কেন? বড়মামা, শুনে রাখো, এসব ঝামেলার মধ্যে আমি নেই। ও জমির ব্যাপারে আমাকে জড়িও না।"

বড়মামা হাই তুলে বললেন, "জড়ানো না জড়ানোর ব্যাপারে আমি কে? আমি তোমাকে জমি দিইনি। তোমার দাদু একটা প্রপার্টি তোমাকে দান করে গিয়েছেন। অনেকের দাদুই নাতি নাতনিকে সম্পত্তি দিয়ে যান। এবার আমি ঘুমোতে যাব। কাল সকালে গুডবাই।"

শিরীষ এবার কঠিন গলায় বলল, "এই ফাইল তুমি নিয়ে যাও বড়মামা।"

বড়মামা চোখে বড় করে বললেন, "কী যে বলিস, আমি বাড়ি বেচে পালাচ্ছি, আর তুই বলছিস কাঁধে করে একটা জমি নিয়ে যাব?"

শিরীষ রাগ করা গলায় বলল, "তুমি বেচে দিয়ে যাও। আমার ঘাড়ে ফেলো না।"

বড়মামা বললেন, "তোদের সম্পত্তি আমি বেচার কে?"

সোমদত্তা নিচু গলায় বলল, "বড়মামা তো ঠিকই বলছেন। ওর ঘাড়ে কেন দায়িত্ব চাপাচ্ছ? যদি কিছু করতেই হয়, তুমি করবে।"

স্ত্রীর এই লোভে অবাক হতেও ভুলে গিয়েছিল শিরীষ। সে হতচকিত অবস্থায় বসে রইল। বড়মামা উঠে দাঁড়ালেন। সোমদত্তা আহ্লাদী গলায় বলল, "চলুন, গেস্টরুমে আপনার বিছানা রেডি করা আছে। ইস্, ক'টাদিন থেকে গেলে খুব ভাল হত।"

বড়মামা একথার উত্তর না দিয়ে বললেন, "তোমাদের ফ্ল্যাটটা খুব সুন্দর করে সাজানো সোমদত্তা।"

সোমদত্তা হেসে বলল, "আপনার ভাগ্নের শখ। গাদাখানেক খরচ

করেছে। কে থাকবে বলুন তো? মেয়ে তো হস্টেলে থাকে। বাড়িতে থাকলে তার নাকি লেখাপড়া হয় না। আজও তো নেই। বলেছে, পাশ করলেই বাইরে পালাবে। আপনার ভাগ্নেরও একটা ভাল সুযোগ আসছে। কোম্পানি ওকে আমেরিকা পাঠাতে চায়। আমিও চলে যাব ভেবেছি। তখন তো এই ফ্ল্যাট পড়ে থাকবে।"

বড়মামা সামনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, "ওই দেওয়ালটা কোথায় পেলে! মাটির মনে হচ্ছে।"

সোমদত্তা খুশি মুখে বলল, "হ্যাঁ, মাটির। যারা এই ফ্ল্যাটের ইন্টিরিয়র করেছে, তারা আর্টিস্টকে দিয়ে করিয়ে এনেছে। একেবারে আসলের মতো না?"

সেদিন বড়মামা ঘুমোতে গেলেও অনেক রাত পর্যন্ত থম মেরে বসেছিল শিরীষ। বড়মামার সঙ্গে ওই তার শেষ কথা। যোগাযোগ হয়নি আর। আবার হারিয়ে গিয়েছেন।

॥ ৪ ॥

নাওডুবিতে আসার পর থেকেই নামের কারণ খুঁজেছে শিরীষ। নিশ্চিতভাবে কিছু জানতে পারেনি। গ্রামের লোকের মুখে গল্পকথা কিছু শুনেছে। তার সঙ্গে যারা কাজ করছে তারাও বলেছে। এই গল্প মুখে-মুখে ঘোরে।

একসময়ে গ্রামের পাশ দিয়ে একটা নদী গিয়েছিল। সেই নদী যে লম্বা চওড়ায় খুব বড় ছিল এমন নয়, তবে দামাল ছিল বেজায়। স্রোত ছিল প্রবল। সবাই অবাক হত, ছোট নদীতে এত দাপট কীভাবে হল? নদী কি এখানে এসে ক্রুদ্ধ হয়ে যায়? অভিশাপ লাগে? এক সময়ে নাকি নদীকে শান্ত করতে গ্রামের মানুষ পুজো-আচ্চা করত। কেউই বিজ্ঞানের দিকটা ভেবে দেখেনি। পরে জানা গিয়েছিল, নদী এই গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ কোনও ঢাল পেয়েছিল। তাতেই লাফানিঝাপানি বেড়ে যেত। গ্রামের কাছে এসে বাঁক নিয়েছিল। যাকে বলে 'শার্প বেন্ট'। রাতেরবেলা নৌকোর মাঝিমাল্লারা এই বাঁক বুঝতে পারত না। তারওপর ঢাল। নৌকো টাল খেয়ে উলটে পড়ত। ফলে প্রায়ই নৌকোডুবির ঘটনা ঘটত। অন্যত্র যে নামই থাক, এখানে এসে নদীর নাম হয়েছে নাওডুবি নদী। আর তার পাশের গ্রাম হল নাওডুবি গাঁ। এই গল্প উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। সত্যি হওয়ার সম্ভবনাই বেশি। একটা বিজ্ঞানও রয়েছে। তবে পুরোপুরি মেনে নেওয়াও যায় না। কারণ ওরকম কোনও নদীর খোঁজ শিরীষ এখনও পায়নি।

সোমদত্তাই শিরীষকে ঠেলে সেই নাওডুবিতে পাঠিয়েছিল।

"যাও না, জমিটা দেখে এসো। দাম কত হতে পারে খোঁজ নাও। বেচে দেব। মেয়েটার লেখাপড়ার তো খরচ অনেক।"

খুব বিরক্ত হয়েছিল শিরীষ। বলেছিল, "তুমি কি পাগল হয়ে গেছ সোম? দোতারার লেখাপড়ার জন্য দাদুর জমি বিক্রি করতে হবে? তাছাড়া ও তো আমার-তোমার পয়সায় পড়াশোনা করে না। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে টপারদের একজন হয়ে ফুল স্কলারশিপে লেখাপড়া করছে।"

সোমদত্তা বলেছিল, "আরে, আজ না লাগুক, কাল বাদে পরশু তো লাগতে পারে। মেয়ে বাইরে গিয়ে লেখাপড়া করবে। এত রাগারাগির কী হয়েছে? এমনভাবে বলছ যেন কেউ কখনও মামাবাড়ির সম্পত্তি পায় না, তুমি এই প্রথম পেলে! জামশেদপুরের বাড়ি বিক্রির টাকার ভাগও তো তোমার প্রাপ্য। প্রাপ্য নয়?"

শিরীষ এবার আরও রেগে যায়। বলে, "না জেনে বাজে কথা বলো না। মা বেঁচে থাকতেই ওই বাড়ির অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন। তোমার এত কীসের চাহিদা সোমদত্তা? জীবনে কম তো পাওনি। নিজেও অর্জন করেছ।"

"থামো দেখি, অনেক লেকচার হয়েছে! আমি তোমার সঙ্গে জমিটা দেখতে যাব।" শিরীষ বলল, "আচ্ছা, যাব। তবে ওই একবারই যাব। আমি আর কিছুতে থাকব না। এরপর থেকে তুমি যা বুঝবে করবে।"

সোমদত্তা বলেছিল, "আচ্ছা তাই বুঝব। যা করার আমি করব। এই শনিবারই চল।"

শুক্রবার সোমদত্তার পা মচকাল, শিরীষ প্রোগ্রাম পিছোতে চেয়েছিল। সোমদত্তা ঠেলে পাঠাল।

"পরেরবার আমি যাব। তুমি কালই দেখে এসো। ওখানকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে আসবে। জমি কেনাবেচার জন্য গ্রামে দালাল থাকে। অফিসে সবাই বলছিল।"

শিরীষ অবাক হয়ে বলল, "এর মধ্যেই তুমি অফিসে জমির গল্প করে ফেলেছ!"

সোমদত্তা বলল, "বাঃ করব না? আমরা চুরি করেছি না কাউকে ঠকিয়েছি? যে শুনেছে সে-ই কনগ্র্যাচুলেট করেছে। তবে বলেছে যত তাড়াতাড়ি পারো বেচে দাও। এতদিনে যে বেদখল হয়ে যায়নি তাই রক্ষে। তুমি আগে গিয়ে সবটা বুঝে এসো। বড়মামা বুড়ো হয়েছেন, কী বুঝতে কী বুঝেছে ঠিক আছে?"

"আচ্ছা সোম, তুমি জমিটা পাওয়া জন্য কত কী ভাবছ! আচ্ছা, একবার ভাবলে না তো, দাদু কেন জমিটা কিনেছিলেন? হঠাৎ কী মনে হল, সেই জামশেদপুর থেকে এসে, একটা অজানা অজ গাঁয়ে খানিকটা জমি কিনে নিলেন! ওঁর স্বপ্নটা একবার ভেবে দেখো। কী আশ্চর্য!"

সোমদত্তা বলল, "এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আগেকার দিনের মানুষরা সস্তায় পেলে জমিজমা কিনে রাখতেন। ইনভেস্টমেন্ট। পরে দাম বাড়লে বিক্রি করে দিতেন। কোথায় কিনলেন ভাবতেন না। জমি তো সব জায়গাতেই সোনা।"

শিরীষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, "তুমি হিসেবি চিরকালই, কিন্তু এতটা কোনদিনও ছিলে না। তুমি এখন শুধু হিসেব বোঝো, স্বপ্ন বোঝো না।"

সোমদত্তা বলল, "ভাগ্যিস বুঝি না। তাহলে আর উন্নতি করতে হত না।"

শিরীষ কথা বাড়ায়নি। শনিবার সকালে রওনা হয়েছিল।

পথে গাড়ি খারাপ হওয়ায় নাওডুবিতে পৌঁছোল বিকেলে। বড়মামা বলে দিয়েছিলেন, পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে বলতে, 'জামশেদপুরের মহীতোষ চ্যাটার্জির কাছ থেকে এসেছি।' একজন গিয়ে জমিটা দেখিয়ে দেবে। শিরীষ জানত, অবধারিতভাবে পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ হয়ে যাবে। গিয়ে লাভ হবে না। ফিরে আসতে হবে। কেউ চিনিয়ে না দিলে চেনা মুশকিল। তারপরেও খুঁজে-খুঁজে পঞ্চায়েত অফিস গেল। গিয়ে দেখল, যা ভেবেছিল তাই। অফিসের দরজায় তালা। বাইরের রোয়াকে একজন মাঝবয়সি লোক বসে খবরে কাগজ পড়ছিল। শিরীষ গাড়ি থেকে নেমে এদিক ওদিকে দেখতে লাগল।

"কাউকে খুঁজছেন?"

শিরীষ আমতা-আমতা করে বলল, "কাউকে ঠিক খুঁজছি না... পঞ্চায়েত অফিসের সবাই চলে গিয়েছেন না?"

"কী চাই?"

শিরীষ বলল, "আসলে কলকাতা থেকে আসছি, জামশেদপুরের..."

এই পর্যন্ত বলতেই সেই লোক বলল, "জমির ব্যাপারে? মহীতোষবাবু পাঠিয়েছেন?"

শিরীষ বুঝতে পারল, বরাত জোরে ঠিক লোককে পেয়ে গিয়েছে। উৎসাহ নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমি ওর ভাগ্নে।"

"এত বেলা করে এসেছেন কেন?"

শিরীষ কাচুমাচু হয়ে বলল, "বেরিয়েছি সেই সকালে, পথে আটকে গিয়েছিলাম।"

মাঝবয়সি আড়মোড়া ভেঙে বলল, "জমি দেখতে হলে সকালে আসতে হয়।"

শিরীষ অনুরোধের ঢঙে বলল, "এখন একটু ব্যবস্থা করা যায় না দাদা? আবার কবে আসতে পারব..."

"এই অন্ধকারে জমি কী বুঝবেন?"

শিরীষ বলল, "অন্ধকার হতে দেরি আছে।"

মাঝবয়সি বলল, "আরে বাবা, জমি তো এখানে নয়, যেতে-যেতে অন্ধকার হয়ে যাবে।"

শিরীষ বলল, "তা হোক, যেটুকু বুঝব তাই যথেষ্ট। একটু কষ্ট করে যদি গাড়িতে ওঠেন।"

মাঝবয়সি এবার ঝট করে উঠে পড়লেন। বলল, "চলুন। আপনার মামাকে কথা দেওয়া আছে। উনি লোকটা ভাল। দিন তিনেক গ্রামেই থেকে গিয়েছিলেন।"

শিরীষ ভাঙা রাস্তার ওপর গাড়ি চালাতে লাগল সাবধানে। এখানে গাড়ি ভাঙলে কেলেঙ্কারি। সত্যি বড়মামা মানুষটা অতি ভাল। নইলে এত ব্যবস্থা করে যায়। টাকা পয়সাও দিয়ে গিয়েছে হয়তো। জামশেদপুরের বাড়ির উপর থেকে মায়ের দাবি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভুলতে পারেননি নিশ্চয়ই। অন্যদিক থেকে পুষিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে একেবার আঁকড়ে ধরেছেন।

"এই তো এখানে দাঁড়ান। বাঁদিকে রাস্তা থেকে নেমে খানিকটা হেঁটে গেলেই আপনার মামার জমি। যান।"

গাড়ি থেকে নেমে খানিকটা হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল শিরীষ।

সেই প্রথম দাদুর স্বপ্নের জমি দেখল শিরীষ। অস্ত যাওয়া সূর্যের আলোয় দু'চোখ ভরে দেখল।

গভীর রাতে বাড়ি ফিরল শিরীষ। গরম জলে স্নান সেরে বেডরুমে এল। সোমদত্তা ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, "ফোন ধরছিলে না কেন?"

"ওখানে টাওয়ার নেই।"

"পরে তো রিপ্লাই করতে পারতে।"

"হাইওয়েতে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। ফোন ধরা যায় না।"

"খাবার গরম করে দিচ্ছি।"

শিরীষ বলল, "খাব না। পথে ধাবায় খেয়েছি।"

সোমদত্তা বলল, "জমি দেখলে?"

শিরীষ বলল, "দেখলাম।"

সোমদত্তা বলল, "কেমন দেখলে? দাম কেমন পাওয়া যাবে?"

শিরীষ একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি ওই জমি বেচব না সোম।"

সোমদত্তা এবার ধড়ফড় করে উঠে বসল। বলল, "মানে! বেচবে না তো কী করবে?"

শিরীষ ততক্ষণে কাবার্ড থেকে বোতল এবং গ্লাস বের করে ফেলেছে। বোতল থেকে হুইস্কি ঢালতে-ঢালতে বলল, "সোম, আমি ওই জমিতে চাষ করব। দাদু কেন অমন স্বপ্ন দেখেছিল আমি জানতে চাই। শুধুই কি শহুরে জীবনে ক্লান্তি? নাকি রিটার্ন টু রুটস্? শিকড়ের সন্ধানে? তুমি এখন ঘুমোও। বাকি কথা কাল হবে। গুড নাইট।"

বুঝিয়ে, কান্নাকাটি করে, তুমুল ঝগড়া করে, আত্মহত্যার হুমকি দিয়েও সোমদত্তার কোনও লাভ হল না। শিরীষ সত্যি লোকজন জোগাড় করে নাওডুবির জমিতে কাজ শুরু করে ফেলল। সে বড় ম্যানেজার। ম্যানেজমেন্ট পড়ার সময় তাকে শেখানো হয়েছে, বাধা বিপত্তি কীভাবে জয় করতে হয়। কিন্তু এখানে এসে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হল সেসব টপকানোর শিক্ষা তার ছিল না। নিজের বুদ্ধি দিয়ে একটা-একটা করে কাঁটা সরাতে লাগল। বাইরে থেকে হুট করে গিয়ে চাষবাস করতে দেখলে, গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করবে কেন? টাকাও যেমন খরচ করতে হল, তেমন মানুষের বিশ্বাসও অর্জন করতে হয়েছে।

একদিন ল্যাপটপে দোতারাকে চিঠি লিখে ফেলল— 'তারা, তোর সঙ্গে আমার সপ্তাহে একদিন দেখা হয়, তারপরেও তোকে এই চিঠি লিখতে বসেছি। কারণ, কিছু কথা মুখে বলার চেয়ে, লিখে বলতে ভাল লাগে।

তারা, এমন একটা কঠিন আর সুন্দর কাজের মধ্যে এসে পড়ব ভাবতেও পারিনি। যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে চলেছি তাতে কখনও কান্না পাচ্ছে, কখনও আবার আনন্দে মন ভরে যাচ্ছে। নিজের হাতে ফসল ফলাব আমি, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। এতকাল একধরনের জীবন যাপন করেছি, এখন আর এক জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়ছি। জানি, এই জীবন শুধু আনন্দের নয়, খুব কষ্টেরও। শুধু ফসল ফলানোর শারীরিক কষ্ট নয়, প্রাপ্য মূল্য, মর্যাদা, ঋণের বোঝা মেটাতে না পারার কষ্টও রয়েছে। জানি, ক্ষেতের ধান বড় হতে যেমন দেখব, তেমন যে ধান ফলায় তার কষ্টকেও দেখব খুব কাছ থেকে। তারা, মানুষের কষ্ট বুঝতে পারাটাও জীবনের একটা অংশ। যতদিন যাচ্ছে, মনে হচ্ছে, সব মানুষেরই এই দু'ধরনের জীবনের মধ্যে দিয়ে একবার না একবার চলা দরকার। একটা জীবন শুধু দৌড়োয় আর দৌড়োয়, অন্য একটা জীবন চুপ করে বসে থাকে শান্ত দিঘির পাড়ে। সেখানে হাঁস সাঁতার কেটে বেড়ায়, পানকৌড়ি ডুব দিয়ে যায়, মাছে ঘাই দেয়। কথাটা বললাম বটে, তা বলে ভাবিস না, আমি এখানে এসে দিঘির পাড়ে বসে থাকি। একদিনও চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। মনটাকে শান্ত দিঘির পাড়ে বসিয়ে নিজে সদা অশান্ত হয়ে রয়েছি। চাষবাসের কিছুই জানতাম না। একটু-একটু করে জানছি। খুব ইন্টারেস্টিং। তোর ইলেকট্রনিক্সের চেয়ে কম কিছু নয়।

রুক্ষ জমির জন্য জল আনার ব্যবস্থা করতে হয়েছে অনেকটা দূর থেকে। এরপর ট্র্যাক্টর দিয়ে জমি ওলটপালট হবে। আমি জেনেছি, ধান হয় বছরে দু'বার। খরালি আর বর্ষালি। তুই জানতিস? ঘেঁচু জানতিস। আমার জমিতে হবে বর্ষালি। ধানের বীজ থেকে একমাসে তৈরি হবে বিছান। আচ্ছা, বিছান কী বল দেখি? বীজ থেকে চারা তৈরিকে বলে বিছান। বিছানের জন্য বীজ বাছতে হয় যত্ন করে। পাতান না থেকে যায়। পাতান শব্দটা শুনে নিশ্চয় আমার টপার হওয়া মেয়ে চমকে যাচ্ছে। পাতান হল হালকা, ভাঙা বীজ। কাজে লাগে না। তোর মায়ের কাছে আমি এখন ওই পাতানের মতো। সে যাই হোক, আষাঢ় মাসে বিছান তৈরি, অগ্রহায়ণ শ্রাবণে যদি রোপণ করা যায়, অগ্রহায়ণ মাসে ধান পেকে উঠবে। আমি নবান্ন উৎসব করব। তোরা সবাই আসবি। তারা, ঠিক করেছি, প্রথমবার দু'ধরনের ধান লাগাব। একটা চালু। যাতে ভাল ফসল হবে। আমনের মধ্যে বেশি ফলন কে দেয় জানিস? সেই ধানের নাম স্বর্ণ। ভারি সুন্দর নাম না? আর একটা করব যার চালটা ভাল, নিজেরা খাব। বাঁকুড়া বীরভূমে এখন চলছে, নাম হাই লিং খাস। তোর বাবা এখন ড্রাইভ পেজও জানে, সেট আপ ইউলিটিও জানে, কম্পোনেন্টওয়্যারও জানে, আবার ধানের নামও জানে।

তারা, আর একটা ঘটনা ঘটেছে। একটা ভারি সুন্দর মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তোর চেয়ে একটু বয়স বেশি। নাম ত্রপা। ত্রপা মানে জানিস? ত্রপা মানে লজ্জা। এই সুন্দর মেয়েটার সঙ্গে কীভাবে তোর বাবার আলাপ হল জানিস? বলব না। তোরা হিংসে করবি। একদিন হয়েছিল কী...'

এই চিঠি দোতারাকে পাঠায়নি শিরীষ। ডিলিট করে দিয়েছিল। কারণ পারিবারিক পরিস্থিতি জটিল হতে লাগল।

॥ ৫ ॥

শিরীষ মেয়েকে ফোন করল।

"তারা, বাড়িতে কবে আসছিস?"

দোতরা বলল, "দিন দশেকের আগে নয় বাবা। খুব চাপে আছি। মনে হচ্ছে, সামনের সেমেস্টারে ফেল করব। মনে হচ্ছে বলা ভুল, করবই। ফেল করলে খুবই সমস্যা হবে। প্রথমেই স্কলারশিপ ঘ্যাচাং হবে। তোমার কাছে হাত পাততে হবে।"

শিরীষ হাসল। দোতারা এই কথা ছোটবেলা থেকে বলে আসছে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আগের দিন গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিল। সোমদত্তা অধীর হয়ে বলল, "কী রে, তোর না কাল ফিজিক্স পরীক্ষা? এখনও ঘুমোচ্ছিস!"

ঘুম জড়ানো গলায় দোতারা বলেছিল, "ফেল নিশ্চিত, তাই পড়ে সময় নষ্ট করব না মা। আমাকে ঘুমোতে দাও। খুব টেনশন হলে তুমি আমার বইগুলো নিয়ে রিভাইজ় করো।"

মেয়ের কথা শুনে সোমদত্তার তো মাথার চুল ছেঁড়ার মতো অবস্থা। মেয়ে এসব কী বলছে! তখনই শিরীষকে ফোন করে বসে। শিরীষ ছিল অফিসে।

"সোম, আমি একটা মিটিংয়ে ঢুকব। কঠিন কোনও সমস্যা না হলে

পরে কথা বলি?"

সোমদত্তা চাপা গলায় ধমক দিয়ে ওঠে, "রাখো তোমার মিটিং। মেয়ে বলছে সে নাকি ফিজিক্সে ফেল করবে। ফিজিক্সে গোলমাল করার অর্থ বুঝতে পারছ? গোটা কেরিয়ারটা নষ্ট।"

শিরীষ অবাক হয়ে বলেছিল, "ফিজিক্সে কম নম্বর হলে জীবন নষ্ট এমন কথা তোমায় কে বলেছে সোম! পৃথিবীতে এমন বহু মানুষ আছে যারা ফিজিক্স পড়েনি। তারা এক একজন মনীষী।"

সোমদত্তা দাঁত কিড়মিড় করে বলে, "তোমার মেয়ে কোনও মনীষী নয়, সে একজন অতি সাধারণ ছাত্রী। স্কুলের হাবিজাবি পরীক্ষায় ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়া কোনও ঘটনা নয়। এমন বহু ছেলেমেয়ের খবর আমি জানি, যারা পরে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়। ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়া মার্কশিট চিবিয়ে খায়। আসল হল হায়ার সেকেন্ডারি। সেখানে না পারলে অতীতের সব রেজাল্টে চোনা পড়ে যাবে। তুমি জানো না?"

শিরীষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "মনে হয় জানি না। অত বড় বাপ পরীক্ষা তো আমি দিইনি।"

সোমদত্তা হিসহিসিয়ে বলে, "রসিকতা বন্ধ করো। এটা তোমার কবিতা লেখা বা ছবি আঁকা নয়। তারা বলছে, সে নাকি ফেল করবে।"

শিরীষ সহজভাবে বলে, "একথা তো দোতারা ছোটবেলা থেকে বলে। এত টেনশনের করছ কেন!"

সোমদত্তা অবাক গলায় বলে, "সেই বলা আর এখন বলা এক হল! তোমার কি মাথা পুরো গিয়েছে? মেয়ে চাদরমুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। বলছে, পড়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, তার চেয়ে ঘুমোই!"

শিরীষ নিশ্চিন্ত গলায় বলল, "ভেরি গুড। পরীক্ষার আগে যদি কেউ না ঘুমিয়ে টেনশন করে তাহলে সেটা চিন্তার। আমি তো পরীক্ষার আগেরদিন নাইট শোতে সিনেমা দেখতে যেতাম।"

সোমদত্তা আবার চাপা ধমকে বলল, "বাজে কথা থামাও। আমি ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে আছি, টেনশনে পাগল-পাগল অবস্থা, আর যার পরীক্ষা সে ঘুমোবে?"

শিরীষ বলল, "সোম, মেয়েকে নিয়ে আমার কোনও চিন্তা নেই। সে পরীক্ষায় ভাল করবেই, তুমি আজই অফিসে জয়েন করো। নইলে তোমাকে নিয়ে চিন্তায় পড়তে হবে দেখছি।"

সেই পরীক্ষায় দোতারা ফিজিক্সে ফুল মার্কসের চেয়ে মাত্র তিন নম্বর কম পেয়েছিল। তাই সেদিন যখন 'সেমেস্টারে ফেল করব' বলল, শিরীষ হেসে ফেলল। এত বড় হয়েও অভ্যেস যায়নি।

দোতারা বলল, "হাসছ কেন?"

শিরীষ বলল, "ফেল করলে ভালই হবে, ফেল কাকে বলে বুঝতে পারবি। জীবনে ফেল বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। তোর সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে। জরুরি এবং ইন্টারেস্টিং।"

দোতরা বলল, "জরুরি হলে নেই, ইন্টারেস্টিং হলে আছি। তোমার কাছ থেকে বহুদিন ইন্টারেস্টিং কিছু শোনা হয় না। তুমি কি আমাকে বাড়ি যেতে বলছ? ডিনারে কথা হবে? ইন্টারেস্টিং টক উইথ ওয়াইন?"

শিরীষ একটু চুপ করে থেকে বলল, "না, বাড়িতে আসতে বারণ করছি।"

দোতারা অবাক গলায় বলল, "বাড়িতে যেতে বারণ করছ! তাহলে মনে হচ্ছে কথা খুবই ইন্টারেস্টিং।"

শিরীষ বলল, "তোর মায়ের সামনে বলা যাবে না। বাইরে কোথাও বসব। কোনও রেস্টুরেন্টে বা কফিশপে। ক্লাবেও যেতে পারি... না, ক্লাব বাদ। হাজারটা চেনা লোককে হ্যালো হাই করতে-করতে সময় কেটে যাবে।"

দোতারা উচ্ছ্বসিত গলায় বলেছিল, "ফ্যান্টাস্টিক। পিতা-পুত্রীর গোপন বৈঠক। তবে বাবা, লাঞ্চেই যাই। অনেকদিন ভাল-মন্দ খাইনি।"

ফাইভস্টার হোটেলের এক রেস্টুরেন্টে বসেছিল দু'জনে। খাবার নেওয়ার পর শিরীষ মেয়েকে ঘটনা সব বলল। হঠাৎ করে বড়মামার টেলিফোন থেকে নাওডুবিতে গিয়ে জমি দেখে আসা পর্যন্ত সবটাই। ভাল ছাত্রের মতোই দোতারার গুণ হল, কথার মধ্যে সে কিছু বলে না। মন দিয়ে শোনে। এখনও তাই হল। শিরীষ থামলে বলল, "আমি মায়ের মুখে হালকা শুনেছি, কী একটা জমিটমি ...কানে গিয়েছে, মনে নিইনি। জমি, বাড়ি, গাড়ি, চাকরি, বিদেশ নিয়ে মা আজকাল বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এসবের বাইরে বেরোতে পারে না। চায়ও না। অফিসের প্রোমোশন নিয়েও আমার কাছে পর্যন্ত গজগজ করে, যেন মায়ের অফিসের বস আমার মেজোকাকা, আমি বলে দিলেই টক করে মাকে একটা লিফট দিয়ে দেবে। সেই কারণেই মায়ের মুখে জমি-কাহিনি শুনতে আগ্রহ বোধ করিনি। পরে দেখলাম, তুমি যাতায়াত করছ। গিয়ে থাকতেও শুরু করেছ। মায়ের ফোঁসফোঁসানি শুনছি, গালাগালি শুনছি। সল্টলেকে দিদিমার কাছে চলে যাওয়াও দেখছি। মাথা ঘামাইনি। এখন দেখছি ঘটনা গল্পের মতো। ছপ্পড় ফুঁড়ে এতটা প্রপার্টি পেয়ে গেলে!"

শিরীষ বলল, "ঘটনা গল্পের মতো হলেও, আমি আর সেটাকে গল্প রাখতে চাই না দোতারা। বাস্তবে এনে ফেলতে চাই। ইতিমধ্যে অনেকটা এনে ফেলেছি। যাকে বলে, হার্ড রিয়েলিটি।"

দোতারা খেতে ভালবাসে। তার বন্ধুরা খাওয়ার বিষয়ে এই বয়স থেকেই হিসেবনিকেশে চলে গিয়েছে। কোনটা খাব, কতটা খাব, খেলে কতটা চর্বি জমবে, সেই সব হিসেব। রেস্টুরেন্টে গেলে মেনু কার্ড নিয়ে যোগবিয়োগ করে। ফ্যাট, কোলেস্টরলের যোগবিয়োগ। দোতারা বলে, "তোরা খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামা, আমার কোনও চাপ নেই। আমি একজনকে অ্যাস্ট্রলজারকে হাত দেখিয়েছি। তিনি বলেছেন, চিন্তা নেই, তোমার মিস ইন্ডিয়া হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। মিস ইউনিভার্সও হয়ে যেতে পারবে। আমি বললাম তার জন্য কি আমাকে কম খেতে হবে? ভোরে উঠে জিমে ছুটতে হবে? তাহলে ছেড়ে দিন। সুন্দরী স্কিম থেকে সরে অন্য কোনও স্কিমে কেরিয়ার করা যায় কিনা দেখুন। খাওয়াদাওয়া, ঘুমে আমি কোনওরকম স্যাক্রিফাইস করতে পারব না। জ্যোতিষী বললেন, বলছি তো চিন্তা নেই। কোনও কষ্ট করতে হবে না। তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে। একটা মাদুলি দিয়ে দিচ্ছি। সেটা পরতেও হবে না, বাড়িতে আলমারিতে রেখে দিলেই হবে। মাদুলীর নাম সুন্দরীধ্রষ্টা মাদুলি। এতেই যা হওয়ার হবে। আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, সুন্দরীধ্রষ্টা মাদুলি! সে আবার কী? উনি বললেন, সুন্দর থাকাকে ধরে রাখতে জানে বলে মাদুলির নাম সুন্দরীধ্রষ্টা। সুন্দরীধ্রষ্টা কাছে থাকলে ছিপছিপে ফিগার, টিকোলো নাক, ফর্সা চোখ কোনও ব্যাপার নয়। আমি মাদুলি কালেক্ট করেছি। সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস্, তোরা খাস না খাস, আমি পেট এবং মন ভরে খাব।"

বাবার সঙ্গে বসেও দোতারার প্লেট ভরিয়ে খাবার নিতে অসুবিধে হল না।

"গল্পকে হার্ড রিয়েলিটি করবে! সেটা কীরকম?"

শিরীষ খাবার মুখে নিয়ে বলল, "আমি ওই জমি বেচব না ঠিক করেছি। চাষবাস করব। দাদু যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকে সত্যি করব। কাজ শুরু হয়েছে।"

দোতারা খাওয়া থামিয়ে চোখ বড়-বড় করে বলল, "ওয়ান্ডারফুল! এই না হলে দোতারা চ্যাটার্জির বাবা? সাধে কি আমি তোমার প্রেমে পাগল ডার্লিং! গালটা বাড়াও, একটা চুমু খাই।

শিরীষ খুশি হল। মেয়ে তার প্রজেক্ট সমর্থন করবে সেটা জানত। কিন্তু কতটা করবে সেটা বুঝতে পারছিল না। নিস্পৃহভাবে? নাকি উচ্ছ্বাস নিয়ে? যদিও এখনও কিছু কঠিন সিদ্ধান্তের কথা বলা বাকি রয়েছে।

দোতারা ছেলেমানুষের মতো আবদার করে বলল, "বাবা, আমি ওই জমি দেখতে যাব...আজই যাব..."

শিরীষ হেসে বলল, "এখন খাও। তোমার মা যদি জানে তোমাকে নাওডুবি নিয়ে গিয়েছি তাহলে আর দেখতে হবে না।"

দোতারা হাত নেড়ে বলল, "মা জানবে না। প্লিজ় বাবা, প্লিজ়। আমার বেশ থ্রিলিং লাগছে।"

শিরীষ শান্ত গলা বলল, "আচ্ছা নিয়ে যাব। কিন্তু এটা থ্রিলড হওয়ার কোনও বিষয় নয় দোতারা। আমি বিষয়টাকে কোনও

অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে দেখছি না, দেখছি সিরিয়াস কাজ হিসেবে। তুই বড় হয়েছিস, তোকে বলতে কোনও অসুবিধে নেই। অনেকদিন কেরিয়ারের র‍্যাট রেসে দৌড়লাম। অনেক দূর উঠেছিও। বিদেশে চলে গেলে আরও টাকা পয়সা, প্রতিপত্তি হবে। কোম্পানি আমাকে ফিলাডেলফিয়ায় পাঠাবে বলে ভেবেছে। সেখানকার অফিসে বসাবে। দু'-একমাস পরে আমাকে মুম্বই ডেকে ফাইনাল করবার কথা। কিন্তু আমার এ জীবন আর ভাল লাগছে না। দমবন্ধ লাগছে, হাঁপিয়ে পড়ছি। মনে হচ্ছে, এবার এমন কিছু করব যা নিজের ভাল লাগে। এরপর আর পারব না। বয়স বেড়ে যাবে। কী জানি অসুখ বিসুখ চেপে ধরবে কিনা। সংসারের জন্য, নিজের বাড়ি-গাড়ির জন্য অনেক তো হল। তুই আমার একমাত্র সন্তান, সেই সন্তান এখনই নিজের পায়ে অনেকটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিস। তারপরেও ব্যাকআপ থাকবে। তোর নামে ফিক্সড রেখে দিচ্ছি। তোর মাও চাকরি করছে। আমার উপর তোরা আর পুরো ডিপেন্ডেন্ট নোস। কিছু সেভিংসও তো রয়েছে। তিরিশটা বছর তো এভাবে কাটালাম। এই জমি আমাকে একটা অদ্ভুত সিচুয়েশনের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। একদিকে চ্যালেঞ্জ, নতুন ভাবে জীবনের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ, আর একদিকে সরু মই বেয়ে কেরিয়ারের মাথায় উঠতে থাকা। যে মইয়ের শেষ নেই, যে মই টলমল, ক্লান্তিকর।"

বাবার জন্য মন খারাপ হল দোতারার। সে অস্ফুটে বলল, "তোমার যা খুশি, তাই করো বাবা।"

শিরীষ নিজেকে সামলে হেসে বলল, "যা খুশি করা কি অত সহজ? তোমার মা আমাকে কতটা বোঝে জানি না, তবে এটা আর পারছে না। সে বিদ্রোহ করেছে। সে আমার ভিতরের এই অংশটাকে চেনে না। কখনও একটু আধটু চিনলেও পাত্তা দেয়নি। আমিও কি জানতাম, এরকম একটা অনিশ্চিত জীবন আমাকে এভাবে টানবে? চাষবাস করব এমন কথা কখনও ভাবিনি। কেনই বা ভাবব? কোনও কারণ ছিল না। আমি তো আমার দাদুর মতো রিটার্ন টু রুটস্-এর স্বপ্ন দেখিনি। হয়তো প্রাচীনকালে আমার পূর্বপুরুষরা চাষবাস করতেন। সেই শিকড় জিনের কোথাও রয়ে গিয়েছে। এতদিন সে ছিল চুপ করে, ডরম্যান্ট হয়ে, এখন মাথা চাড়া দিয়েছে। তোমার মা কী করে এসব মেনে নেবে? সে একজন চাষির বউ হতে রাজি নয়। খুব অশান্তি শুরু করেছে।"

দোতরা অবাক হয়ে বলল, "কেন! মায়ের কী সমস্যা? কত বড়-বড় মানুষের তো ফার্মহাউস থাকে। সারা পৃথিবীতেই তো আছে। এটা তো নতুন কিছু নয়। উইকেন্ডে গিয়ে ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। এটাই তো ফ্যাশন। মাও সবাইকে বলতে পারবে। তুমি বছরে একবার দু'বার আমেরিকা থেকে এসে নিজের ফার্মহাউসে দু'দিন থেকে আসবে। আমি পিকনিকে যাব। এতে মায়ের রাগ করার কী হল?"

শিরীষ কাঁটা-চামচ রেখে প্লেট সরিয়ে দিল। তার লাঞ্চের পরিমাণ সমসময়ই কম। অনেকদিনই শুধু ফল খেয়ে থাকে। সেদিন মেয়ের জন্যই নিয়েছিল।

"দোতারা, সমস্যা এখানেই। এটা কোনও ফার্মহাউস হচ্ছে না। উইকেন্ডে গিয়ে পিকনিক করার জায়গা নয়। আমি সিরিয়াসলি চাষের কথা ভেবে প্রজেক্ট করেছি। নাওডুবি প্রজেক্ট। ফসল, সবজি, বাজারে পাঠিয়ে বিক্রি করা হবে। খরচাপাতি বাদ দিয়ে বাকি টাকা হবে আমার উপার্জন। যেভাবে আর পাঁচজন চাষি চাষবাস করে বেঁচে থাকে, আমি সেভাবে থাকতে চাই। ছেলেখেলা নয়। প্রকৃতি নিয়ে রোমান্টিসিজ়ম নয়। কলকাতার পলিউশন ভাল লাগছে না বলে, গ্রামে গিয়ে থাকার ন্যাকামি নয় এটা। আমি নিয়মিত গিয়ে থাকছি। হই হই করে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তুই কি ভাবতে পারিস তোর বাবা এখন, ধানগাছের বীজতলা কীভাবে করতে হয় তাও জেনে গিয়েছে?"

দোতারা অস্ফুটে বলল, "বীজতলা কী!"

শিরীষ হেসে বলল, "দেখ দেখি, রোজ ভাত খাস কিন্তু বীজতলা কী জানিস না। আমিও জানতাম না। সবাইকে সব জানতে হবে এমনও নয়, তবে কারও তো জানতে ইচ্ছে করতেও পারে। পারে না? যেমন আমার করেছে। শুধু বই পড়ে নয়, একেবারে হাতে কলমে কাজ করে জানতে চাই।"

দোতারা চোখ সরু করে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী জানলে?"

শিরীষ উৎসাহ নিয়ে বলল, "আমাদের জমিতে এখনও বীজতলার সময় আসেনি, তবে আসবে। প্রথমে সার ছড়াতে হবে। অর্গ্যানিক সার। এই ধর, বর্গমিটার পিছু দু'কেজির মতো। তারপর ভাল করে জল দাও। দুই থেকে তিনবার মই চাষ চাই। মই চাষ কী জানিস? জানিস না তো? লাঙলে ফালার জায়গায়, সত্যিকারের মই লাগিয়ে দেওয়া হয়। ল্যাডার। অসমান জমি সমান হয়। সেই মইয়ের উপর লোক দাঁড়িয়েও পড়ে। আমি ভেবেছি, আমাদের জমিতে যখন মই চাষ হবে, আমি মইয়ের উপর দাঁড়াব। মজা হবে না?"

দোতারা মুখে খাবার নিয়ে বলল, "বুঝতে পারছি না এখনও। আরও একটু বল।"

শিরীষ দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে শুরু করল

"মই চাষের পর জমিতে দশ বারো দিনের মতো জল দাও আটকে। একসময়ে তোর ওই খড়, আগাছা সব যাবে পচে। আবার মই চাষ। জমি হয়ে যাবে থকথকে কাদা। ব্যস, তোর বীজতলা তৈরি। শুধু ইলেকট্রনিক্স জানলে হবে? বীজতলাও জানতে হবে।"

কথা শেষ করে জোরে হেসে উঠল শিরীষ। দোতারা চোখ আর সরু হয়ে গেল। বাবাকে দেখে মনে হচ্ছে, জমিতে কাদা তৈরি করতে পেরে ভীষণ খুশি হয়েছে! এর মানে কী?

দোতারা অবাক হয়ে বলল, "তোমার ওই নাওডুবি গ্রামে গিয়ে পড়ে থাকার বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করা যাবে?"

শিরীষ একটু চুপ করে থেকে বলল, "করা যাবে। আমি ভেবেছি, উইকেন্ডে যাব না, বরং উইকেন্ডে কলকাতায় আসব। ক্লিয়ার?"

"মানে! তুমি গ্রামে গিয়ে থাকবে?"

শিরীষ হেসে বলল, "গ্রামে নয়, জমিতে মাটির ঘর বেঁধে থাকব। খড়ের চাল, মাটির দেয়াল। আমাদের জমি থেকে প্রপার গ্রামটা বেশ দূরে। যেমন ফাঁকা, তেমন নির্জন, তেমন সুন্দর। দিগন্ত পর্যন্ত দেখা যায়। ট্রেনে যেতে-যেতে মাঝেমধ্যে এরকম দৃশ্য দেখা যায়। যতদূর চোখ যায় ক্ষেত আর ক্ষেত। জায়গাটা ঠিক তেমন। দিনে পাখা নেই, রাতে হ্যারিকেন। জল পড়লে এক হাঁটু কাদা। সাপখোপ খুব। শিয়ালও আছে। মাঠে গর্ত করে থাকে। হেলথসেন্টার সেই সবেরগঞ্জে। ঘণ্টাখানেকের মামলা। ডাক্তার বদ্যির ব্যাপার নেই। ঠিক করেছি, তোর সঙ্গে কোনও ডাক্তারের বিয়ে দেব। দরকার হলে সে-ই ছুটে গিয়ে শ্বশুরমশাইয়ের চিকিৎসা করে আসবে।"

একটু থামল শিরীষ। মেয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "কী ম্যাডাম, এবার তো আর মুখ দিয়ে 'ওয়ান্ডারফুল' বেরোচ্ছে না। ঘাবড়ে গেলি?"

দোতারা সত্যি থমকে গিয়েছিল। খাবার মুখে দিয়ে স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল। বলল, "সবই ওয়ান্ডারফুল বাবা। তুমি তোমার দাদুর রিটার্ন টু রুটস-এর স্বপ্ন নিজেও দেখতে শুরু করেছ। ভেরি গুড। কিন্তু হেলথ নিয়ে একটা ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে নাকি? যারা গ্রামে জন্মেছে, বড় হয়েছে, তারা অনেক ধরনের অডস্ মানিয়ে নিতে পারে। তাঁদের শরীর এবং মন অনেক অসুবিধের সঙ্গে কমপ্রোমাইজ় করে নেয়, বাধ্য হয়। তারা নিজেদের সেভাবে প্রতিনিয়ত অ্যাডাপ্ট করেন। সাপের কামড় খেয়েও লড়তে হয়। গ্রামের কত ইনটেলিজেন্ট, স্টুডিয়াস মেয়েরা মাইলের পর মাইল দূরের স্কুল কলেজে পড়তে যায়। কেউ সাইক্লিং করে, কেউ হাঁটে। আমাকে বললে পারব? পারব না। আমার অভ্যেস, শরীর রিফিউজ় করবে। তুমি এই আরবান লাইফস্টাইল ছেড়ে ওখানে মানাতে চেষ্টা করলেও কি তোমার শরীর তা মানবে?"

শিরীষ বলল, "না, মানবে না। তারপরেও আমি চেষ্টা চালাচ্ছি। স্বপ্নের মধ্যে অনেক দুঃস্বপ্নও থাকে। সেসবও ফেস করতে হয়। দাদু তার উইলে তো লিখেই গেছেন, শরীরের কারণে তিনি প্রজেক্ট থেকে

পিছিয়ে গিয়েছিলেন। তেমন অসুবিধে হলে আমিও ফিরে আসব। শুরু তো করে ফেলেছি। সমস্যা নিয়েই করেছি। একটা একটা করে সলভও করছি। তুইও তো বাড়ির সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে হস্টেলে গিয়ে থাকছিস, থাকছিস না?"

দোতারার খাওয়া শেষ হয়েছে। কথায়-কথায় বেশি খাওয়া হয়ে গেল। মুখ মুছতে-মুছতে শান্তভাবে বলল, "আমার থাকা আর এই বয়সে তোমার জনমানবশূন্য কোথাও গিয়ে থাকাটা কি এক হল? দশ-বারো বছর আগে হলে একটা কথা ছিল।"

শিরীষ হাতের ইশারায় বিল চায়। তারপর বলল, "দেখ তারা, আরও দশ বারো বছর আগে এই জমি যদি পেতাম, কিছুতেই যেতাম না। আমি শিওর। তখন এই কর্মজীবন সম্পর্কে আমার মোহভঙ্গ হয়নি। ক্লান্তি আসেনি। স্বাধীনভাবে, মনের মতো কিছু করব এই ভাবনাটা যেমন খুব কম বয়সে আসে, তেমন বেশি বয়সেও আসে। কম বয়সে বড় চাকরিবাকরি ছেড়েছুড়ে অনেকে নানা ধরনের কাজ করছেন। বিজ়নেসই বলও আর ক্রিয়েটিভ কাজই বল। লিস্টে সব বড়-বড়, খ্যতিমান মানুষরা আছেন। কিন্তু বেশি বয়সে 'নতুন কিছু করব' ভেবে কোনও লাভ হয় না। শুধু ভাবনাটুকুই হয়। বাকি জীবন আফসোস করে কাটাতে হয়। আমি এটা বদলাতে চাই। দেখি না পারি কিনা দেখি। আমি তো বড় বিজ়নেস বা ক্রিয়েটিভ কিছু করতে চাই না। শান্ত, স্নিগ্ধ, ভেজালহীন একটা জীবন চাইছি। অন্যের চাষ করা ফসলে খেতে পারলে নিজে চাষ করে খেতে সমস্যা কোথায়?"

দোতারা বলল, "না সমস্যা কিছু নেই। তবে তুমি কি ওখানে পাকাপাকি থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ?"

শিরীষ বিল মিটিয়ে কার্ড ওয়ালেটে রেখে বলল, "কাজ শুরু হওয়ার পর কিছুদিন তো থাকতে হচ্ছেই। খুব ইন্টারেস্টিং। চাষবাস, জমিজমা, ফসল নিয়ে কত কী জানতে পারছি! তোকে একদিন চিঠি লিখে ফেলেছিলাম পর্যন্ত। দেখা যাক, এরপর কী হয়।"

দোতারা একটু চুপ করে থেকে বলল, "বাবা, শহর ছেড়ে, শহরের ভাল চাকরি ছেড়ে, অপরচুনিটি ছেড়ে, গ্রামে চলে যাওয়ার গল্প কম নেই। সারা পৃথিবীর গল্প উপন্যাসে ঘাঁটলে এরকম অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে। সিনেমা, থিয়েটারও রয়েছে। শহরের ব্রাইট ছেলেমেয়ে গ্রামে চাষ করতে চলে যাচ্ছে, ফার্মহাউস করতে চলে যাচ্ছে, ডাক্তারি করতে যাচ্ছে, পড়াতে যাচ্ছে, রাজনীতি করতে যাচ্ছে। তবে এগুলো গল্প উপন্যাস, সিনেমাতেই কি ভাল নয়? নিজের জীবনের সঙ্গে কি খাপ খাবে?"

শিরীষ একটু চুপ করে থেকে বলল, "তোকে তো আগেই বলেছি, গল্প উপন্যাস বা সিনেমার রোমান্টিসিজ়মের সঙ্গে আমার ভাবনার পার্থক্য রয়েছে। আমি একটা বিরাট নতুন কিছু করতে চাই, এমনও ক্লেম করিনি। আমি যেমন চাষ করার আনন্দ পেতে চাইছি, স্ট্রাগলটাও দেখতে চাইছি।"

দোতারা চুপ করে রইল। সে বাবার যুক্তির মধ্যে অনেকগুলো ফাঁক দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু সেই ফাঁক এখন মানুষটাকে দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। মানুষটা একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ঘোরে যুক্তি কাজ করে না, সময় দিতে হবে। ঘোর কাটতে শুরু করুক। বাবা যে জীবনযাপনের কথা ভাবছে, সেটা পারবে না। সিস্টেম পারতে দেবে না। মোহভঙ্গ হবে। তবে বড় কোম্পানির চাকরিবাকরি ছেড়ে গাঁয়ে গিয়ে চাষ করার ভাবনাটিকে স্যালুট জানাতে হয়। শুধু শিকড়ে ফেরার রোমান্টিসিজ়ম নয়, বুকের পাটা থাকলে এই কাজ করা সম্ভব। সে বাকি গোটা জীবনটার জন্যই হোক আর একদিনের জন্য হোক। দোতারা বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক, বাবা। চলো, আমাকে হস্টেলে নামিয়ে দেবে।"

এই কথার কিছুদিন পরে সোমদত্তা দেখতে পেল, তার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, এমবিএ করা, নামী কোম্পানির উঁচুপদে চাকরি করা স্বামী শুধু আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখান করল তাই নয়, একদিন দুম করে চাকরিটাই ছেড়ে দিয়ে বসল। পরদিন সোমদত্তা ব্যাগ গুছিয়ে সল্টলেকে তার মায়ের কাছে চলে যায়। যাওয়ার সময় মেয়েকে বলে গেল, "দোতারা, তুমি বড় হয়েছ, তুমি ঠিক করো কোথায় থাকবে। আমার সঙ্গে না তোমার বাবার সঙ্গে। তোমার সিদ্ধান্ত যাই হোক, আমি তোমার বাবার সঙ্গে থাকতে পারব না। চাষবাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বইতে লেখা হয়, কৃষক সমাজের বন্ধু। আমিও তাই মনে করি। কিন্তু সরি, আমি একজন চাষির বউ হয়ে বেঁচে থাকতে পারব না। হয় তোমার বাবার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, নয়তো ঘটনা অন্য কিছু।"

দোতারা বলল, "কী অন্য কিছু?"

সোমদত্তা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "দোতরা, তোমার বাবার ব্যাপারে কিছু-কিছু কথা আমার কানে আসতে শুরু করছে। কথাগুলো যদি সত্যি হয়, ওই সব চাষবাস, দাদুর স্বপ্ন, গ্রামের স্নিগ্ধ, সরল জীবনের কথা গল্প মাত্র। তোমার বাবার নাওডুবিতে ঘর বানিয়ে থাকার কারণ সম্পূর্ণ অন্য। সে কারণ খুবই লজ্জার। আমি আর কিছুদিন অপেক্ষা করব, তারপর কোর্টে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হবে।"

॥ ৬ ॥

দোতারা একটা বেতের মোড়ায় বসে চুল মুছছে।

এই বাড়িটা দোতারার নয়, কিন্তু এই মোড়াটা তার। মোড়ার গায়ে সুতো দিয়ে বাঁধা একটা বোর্ড। তাতে ইংরেজিতে লেখা 'রিজ়ার্ভড'। এর অর্থ, মোড়ায় অন্য কেউ বসা চলবে না। কিছু রাখাও যাবে না।

এটা বিহানের স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট। মাপে ছোটখাটো। একটা ঘরের মধ্যেই সব। দোতারা এখানে মোড়া কিনে এনে রেখে গিয়েছে। কারণ, এই অ্যাপার্টমেন্টে আর যেসব বসার জায়গা আছে সেগুলো হয় লণ্ডভণ্ড, নয়তো ধুলো জমেছে অথবা জামা কাপড় পড়ে থাকে। একবার দোতারা এসে দেখেছিল, চেয়ারে একপাটি জুতো। আর সহ্য করতে পারেনি দোতরা, একদিন ঘাড়ে করে মোড়াটা এনেছে। শুধু আনেনি, একটা কাগজের বাক্স ছিঁড়ে বোর্ড বানিয়ে 'রিজ়ার্ভড' লিখে গিয়েছে। বিহানকে বলে গিয়েছে, "এই নোটিস লাগানো রইল। তারপরেও কেউ বসলে, হারামজাদার পাছায় এমন লাথি মারব যে দু'দিন বসতে হবে না।"

বিহান গম্ভীর হয়ে বলেছিল, "এখনই গালাগালি দিচ্ছিস কেন? কেউ তো এখনও বসেনি।"

দোতারা বলল, "বসে গেলে আর গাল দিয়ে কী হবে? অ্যাডভান্স দিয়ে রাখলাম। যদি বলিস নোটিসে লিখেও দিতে পারি? দেব?"

বিহান বলল, "থাক, ওটা আমি মুখে বলে দেব।"

এত কড়া হুমকির পরেও বিহানের বন্ধুরা এই 'নোটিস' মানে না। তারা এখানে এলে আগে মোড়ায় বসবে। তবে কান সজাগ রাখে। ডোরবেল কি বাজল? যদি বাজে, লাফ দিয়ে নেমে পড়তে হবে। দোতারা এসে গেলে কেলেঙ্কারি। সে ডেনজারাস মেয়ে। যদি কাউকে তার মোড়ায় বসতে দেখে তাহলে তুমুল ঝামেলা বাঁধাবে। এমনকী সত্যি-সত্যি পা চালিয়ে দিতে পারে। ও যা খুশি করতে পারে। একবার বিহানের বন্ধু চন্দন বলেছিল, "আজ তোকে খুব সেক্সি দেখাচ্ছে।"

দোতারা মোড়ায় বসে বই পড়ছিল। মুখ না তুলেই সহজভাবে বলেছিল, "তাই নাকি! থ্যাঙ্ক ইউ।"

চন্দন স্মার্ট হয়ে বলল, "অবশ্যই তাই। ইচ্ছে করছে কোলে নিয়ে ঘুরি।"

দোতারা মুখ তুলে বলল, "পারবি? অসুবিধে হবে না?"

চন্দন দু'পাশে হাত ছড়িয়ে হেসে বলল, "তুই যদি অ্যালাউ করিস আমার অসুবিধে কী? বিহান রাগ করবে না তো?"

দোতারা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "তোর কোল, আমি চড়ব, এতে বিহান রাগ করার কে?"

চন্দন মজা পেল। উৎসাহ দেখিয়ে বলল, "দেন ফাইন।"

চন্দন বাবু হয়ে বসেছিন মেঝেতে। দোতার মোড়া থেকে উঠে গিয়ে ধপাস করে তার কোলে গিয়ে বসল। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল চন্দন। সেদিকে পাত্তা না দিয়ে হাতের বইটা খুলে তাতে মন দিল দোতারা।

ঘরের বাকিরা হাসতে শুরু করল বটে, চন্দনের মনে হল, হাঁটু দুটো ভেঙে যাবে। দোতারা ডান-বাঁয়ে অল্প দুলতেও লাগল।

"ওরে ওঠ! পা ভেঙে যাচ্ছে!"

দোতারা চন্দনের আর্তনাদে কান না দিয়ে বইতে আরও মন দিল।

"এবার কিন্তু সত্যি মরে যাব দোতারা, প্লিজ় উঠে পড়।"

দোতারা চাপ বাড়ল। চন্দন কঁকিয়ে উঠল।

"তোর পায়ে পড়ছি দোতারা, কোল থেকে উঠে পড়।"

দোতারা অবাক গলায় বলল, 'সে কীরে! এই যে বললি, কোলে নিয়ে ঘুরবি! ঘোর আগে, তারপর তো উঠব।"

চন্দন প্রায়ে কেঁদে ফেলল, "আর ঘুরব না। অনেক হয়েছে।"

সবাই বলতে লাগল, "উঠবি না দোতারা। কিছুতেই উঠবি না। কোলে তোলা কাকে বলে হাড়ে হাড়ে টের পাক।"

চন্দন বলল, "পায়ে পড়ছি মাইরি, উঠে পড়।"

দোতারা বলল, "তুই পায়ে পড়বি কেন! আমি তো তোর কোলে পড়েছি। এবার চেয়ারে মতো করে তোর গায়ে হেলান দেব। হেলান দিয়ে বই পড়ব। সেক্সি মেয়ে কোলে বসে গায়ে হেলান দিলে কেমন লাগে দেখ।"

সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। চন্দন চিৎকার করে উঠল, "ওরে বাবারে গেলাম রে! পাঁজরের হাড় সব ভাঙল।"

দোতারা হাতের বই বন্ধ করে বলল, "ঠিক আছে, এবার তবে কান ধরে বল আর কখনও বউ বা গার্লফ্রেন্ড ছাড়া কাউকে কোলে তুলতে চাইবি না। জোরে-জোরে বলবি সবাই যেন শুনতে পায়। একবার নয়, পাঁচবার বলবি। নইলে কিন্তু এবার কাঁধে উঠে বসব। দুটো পা ঝুলিয়ে দেব।"

চন্দন সত্যি-সত্যি কান ধরে ছাড়া পেল। এই মেয়েকে বিহানের বন্ধুরা চট করে ঘাঁটায় না। তার রেখে যাওয়া মোড়াতেও বসে সাবধানে।

মোড়ায় বসে দোতারা চুল মুছছে। চুল বৃষ্টিতে ভিজেছে। মুছছে কোনও তোয়ালে দিয়ে নয়, টি-শার্ট দিয়ে। তার চুল বড়। আগে সে চুল বড় হতে দিত না। কিছুদিন হল দিচ্ছে। দিচ্ছে না বলে বলা উচিত দিতে খানিকটা বাধ্য হয়েছে। যদিও সে প্রায়ই সিদ্ধান্ত নেয়, আর নয়, অনেক হয়েছে। এবার চুল একেবারে ছোট করে কেটে ফেলা হবে। সবচেয়ে ভাল হয় একদম নেড়া হলে। আজকাল মেয়েরা ফ্যাশন করতে নেড়া হচ্ছে। তাদের কলেজেও আছে। দোতারা অবশ্য ফ্যাশন করতে নয়, ঝামেলামুক্ত হতে নেড়া হতে চায়। বিশেষ করে স্নানের পর প্রতিবারই তার একথা মনে হয়। ভেজা চুল অনেকটা সময় ধরে তোয়ালে বা ড্রায়ার দিয়ে শুকনো করা তার কাছে অতি পরিশ্রম এবং সময়ের অপচয়। অসহ্য লাগে। আগে মেয়েদের হাতে ছিল দেদার সময়। বারান্দা, ছাদে, উঠোনে দাঁড়িয়ে চুল শুকোনো ছিল এক কর্মযজ্ঞ। এই দৃশ্য দেখে আশপাশের বাড়ির হাঁদা ধরনের ছেলেরা প্রেমেও পড়ত। কেশবতীরাও ছাড়ত না, সেই হাঁদা-প্রেম নিয়ে খেলা করত। মুচকি হাসি, তেরচা চাহনি এবং গামছা দিয়ে ঝেড়ে ভেজা চুল থেকে জলকণা উড়িয়ে সেই প্রেম দিত উসকে। দোতারার বিশ্বাস, প্রেমের রকমফের নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা হলে, এই প্রেম অবশ্যই সেখানে জায়গা পেত। নাম হত 'চুল শুকোনো প্রেম'। যদিও অবধারিত ভাবে এই ধরনের প্রেম টিকত না। জলকণার মতোই অচিরেই শুকিয়ে যেত। আবার ফিরে আসত বীরদর্পে, বিয়ের সম্বন্ধে। আর হাসিঠাট্টা নয়, এবার 'সে' অতি গুরুতর। পাত্রপক্ষ যেসব পয়েন্টে কাগজে লিখে সম্ভাব্য পাত্রীদের বাড়িতে ঘুরে-ঘুরে রসগোল্লা, সিঙ্গারা খেয়ে বেড়াত, তার মধ্যে একটা পয়েন্ট অবশ্যই থাকত, 'পাত্রীর মাথার চুল'। খাট-আলমারি, রেডিও, সাইকেলের মতোই জরুরি। মেয়ে যেন একঢাল চুল নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে ঢেকে। সম্বন্ধ পরীক্ষায় পাশ করতে হলে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান, ডালে ফোড়ন এবং পিঠ ছাপিয়ে চুল রাখা ছিল বাধ্যতামূলক। এই তিন সাবজেক্টের যে কোনও একটায় ফেল মারায় কত বিয়ে যে ভেঙেছে! সেই যুগ আর নেই। কন্যার পিঠে আলুলায়িত চুল এখন বিড়ম্বনা। তাকে যত্নআত্তি করবার সময় কোথায়? যদিও বন্ধুরা দোতারাকে বলেছে, নেড়া হওয়ার পাশাপাশি চুল বড় রাখার ফ্যাশনও নাকি ফিরে আসছে। এতে দোতারার কিছু এসে যায় না। সে এমনিতেই সুন্দরী, স্মার্ট, বুদ্ধিমতী। ছেলেরা তার সঙ্গে প্রেম করার জন্য ছোঁক-ছোঁক করে। আলাদা করে সাজগোজের প্রয়োজন নেই। তারপরেও চুলের বিড়ম্বনা নিয়ে তাকে থাকতে হচ্ছে। সে বিরক্ত।

দোতারা চেহারায় তার বাবার ধাত পেয়েছে। শিরীষকে দেখলে বয়স বোঝা যায় না। বরং বেশ খানিকটা কমই মনে হয়। চল্লিশ পেরোলে বাঙালির ভুড়ি হবেই। শিরীষের হয়নি। বয়সের তুলনায় চেহারা হালকা। অথচ মানুষটা কোনওরকম শরীরচর্চায় নেই। কর্পোরেটে চাকরি মানেই এখন নানাধরনের লাইফস্টাইল সমস্যা। শিরীষকে সেই সমস্যা ছুঁতে পারেনি। পরিশ্রম, পরিমিত খাওয়া-দাওয়া, মাপা মদ্যপান তাকে সুস্থ রেখেছে। সুস্থ না থাকলে কেউ এই বয়সে নতুন করে কাঁধে লাঙল নিয়ে ক্ষেতে চাষ করতে নামে?

দোতারা বাবার ফ্যান। নিজের রূপ নিয়ে মাথা ব্যথা না থাকলেও, বাবার রূপ নিয়ে তার প্রচ্ছন্ন গর্ব রয়েছে। অনেক সময়েই সে বলেছে, "তোমার পাশে হাঁটলে তোমাকে আমার বাবা বলে মনে হয় না, মনে হয় বয়ফ্রেন্ড।"

সোমদত্তা মেয়ের এই কথায় খেপে যায়। ধমক দেয়।

"এ কী অসভ্যের মতো কথা! এই ধরনের কথা আর কখনই তুমি বলবে না।"

দোতারা লেখাপড়ায় অতিরিক্ত ভাল হলেও শান্তশিষ্ট বা চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। আড়ালে অনেকেই তাকে বলে 'অতি পাকা মেয়ে'। কেউ বলে, 'এই কারণে মেয়েদের বেশি বুদ্ধি ভাল নয়।' কেউ বলে, 'পরীক্ষায় ফার্স্ট হলেই মানুষ হয় না। টিয়াপাখি হয়। ট্যাঁক-ট্যাঁক করে কথা বলতে শেখে।' দোতারা এইসব আড়ালের কথা জানে এবং খুশি হয়। সে গালমন্দ পছন্দ করে। মাঝেমধ্যে এমন সব আচরণ করে যাতে লোকে রেগে যায়। এক সময়ে ফেসবুক স্ট্যাটাসে নিজের পরিচয় দিত, 'আই অ্যাম আ ব্যাড গার্ল, আই ক্যান পাঞ্চ এনিহোয়্যার অন ইওর বডি।' এতে অন্যদের রাগ হবে না? বলা নেই কওয়া নেই, তুমি আমায় মারবে কেন! শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই মারকুটে কথা দোতারা বাদ দিয়েছে। মোদ্দা কথা, চুপ করে যাওয়ার মেয়ে সে নয়। সেদিন মায়ের ধমকের জবাব দিয়েছিল।

"তুমি আসলে হিংসে করছ মা। তুমি চাও না, বাবা আর কারও বয়ফ্রেন্ড হোক। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট আমলের বাংলা সিনেমার মতো শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে থাকুক। আর তুমি গান করবে, আমি আপন করিয়া চাহিনি, তবু তুমি তো আপন হয়েছ..."

সোমদত্তা বলেছিল, "এবার কিন্তু তুমি মার খাবে দোতারা।"

সেদিন মার খায়নি, কিন্তু বাবার প্রেম প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কিছুদিন আগে সত্যি সে মায়ের চড় খেয়েছে। যে মেয়ে ছোটবেলায় হাতে গোনা কয়েকবার মাত্র মায়ের কাছে হালকা পলকা মারধর খেয়েছে, তার এই ধেড়ে বয়সে চড় খাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দোতারা রাগ করেনি। সে থমকে গিয়েছিল। বুঝেছিল, তার ভুল হয়েছে। বাড়াবাড়ি করেছে সে। এই মহিলা বাবার সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকেছে। এবার একা হয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনার জন্য কার দায় বেশি, সে হিসেব যা-ই হোক না কেন, বিচ্ছেদের ঘটনা সত্যি। এবং সেই ঘটনা সুখের নয়। এই মানুষটাকে কিছু বলার আগে ভেবে বলা উচিত ছিল। সে যা বলেছে, তাতে একটা চড় কোনও ঘটনাই নয়, আরও বেশি হতে পারত।

সোমদত্তা অবশ্য দোতারার চুল ছোট করে ফেলার সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছে।

"এ আবার তোমার নতুন কায়দা হয়েছে! অবশ্যই চুল কেটে ফেলবে। কলেজ যাওয়ার সময় তো কোনওদিনই ঠিকমতো মাথা মোছ না। মাথায় জল বসানো কোনও কাজের কথা নয়।"

দোতারা বলেছে, "আজই ফেরার সময় পার্লার হয়ে ফিরব।"



সোমদত্তা বিরক্ত হয়ে বলেছে, "একথা তো তুমি রোজই বলছ। যাচ্ছ কই? মাথায় জল বসিয়ে একদিন জ্বর বাঁধালে ঠিক হবে। সামনে না তোমার পরীক্ষা? তার কী হবে?"

দোতারা বলে, "আজ ফাইনাল বললাম।"

তারপরেও চুল কাটা হয়নি। এর কারণ বিহান। বিহান তার বান্ধবীর যেমন 'গুণমুগ্ধ', তেমন 'চুলমুগ্ধ'-ও বটে। ইদানীং তাকে ফোটো তোলার নেশায় পেয়েছে। দোতারার চুলকে 'সাবজেক্ট' করে অনেক কায়দা মার্কা ফোটো সে তুলেছে এবং ক্রমাগত তুলে চলেছে। তার মতে, মাথার চুল মেয়েদের 'রহস্যময়ী' করে। একরাশ ঘন চুল হল মেঘের মতো, কুয়াশার মতো। আজ বলে নয়, যুগযুগান্ত ধরে নাকি এই 'রহস্য' চলছে। ক্যামেরা দিয়ে বিহান এই 'রহস্য' ধরতে চায়। তার মডেল দোতারা। কখনও ঘাড়ের উপর চুল ফেলে, কখনও মুখের উপর ছড়িয়ে, কখনও কাঁধের পাশ থেকে, কখনও পিছন থেকে সে ফোটো তুলছে। দোতারা সহ্য করতে পারছে না। প্রতিবার ফোটোশুটের আগে প্রচুর গাল দিচ্ছে।

"এখনও তুই ঠিকমতো ফোটো নিতে পারলি না!"

বিহান একগাল হেসে বলে, "আগেরদিন মনে হল, পেরেছি। যে ছবি খুঁজছিলাম, লেন্সে ধরে ফেলেছি। পরে ফোটো ল্যাপটপে ফেলে বুঝতে পারলাম পারিনি। তোকে দেখাচ্ছে পেত্নির মতো। রহস্যময়ীর বদলে পেত্নিময়ী।"

দোতারা সহজ ভাবে বলল, "তুই একটা বালের ফোটোগ্রাফার!"

বিহান এই গালি গায়ে না মেখে হেসে বলল, "ঠিকই বলেছিস তারা, আমি একজন কেশ বিশেষজ্ঞ চিত্রগ্রাহক। শ্যাম্পু, তেলের কোম্পানিরা যদি আমাকে চিনত, সোনার সিংহাসনে বসিয়ে নিয়ে যেত। ওদের বিজ্ঞাপনের যদি ফোটো তুলতে-তুলতে আমি..."

দোতারা হাত দেখিয়ে বিহানকে থামিয়ে কড়া গলায় বলল, "তোর এই পাগলামি অনেক সহ্য করেছি বিহান। তুমি শালা, গত একবছর ধরে আমার ফোটো তুলে চলেছ। তুলছ আর ডিলিট করছ...তুলছ আর ডিলিট করছ। অনেক হয়েছে, নো মোর। এবার আমি আমার এই চুলের হ্যাপা ডিলিট করব।"

বিহান কাকুতি মিনতি করবার ঢঙে বলল, "প্লিজ় দো, আর ক'টাদিন অপেক্ষা কর। নেক্সট ইয়ার ফ্রান্সের নাইসে একটা ফোটো কম্পিটিশন আছে। বিষয়, মিস্টিরিয়াস উইমেন। ঠিক করেছি এন্ট্রি পাঠাব এবং তোর ছবি দিয়েই পাঠাব। একবছর ধরে সেই চেষ্টাই চালাচ্ছি। তোকে এতদিন বলিনি, যদি রাগ করিস, আজ বলে ফেললাম।"

দোতারা অবাক হয়ে বলল, "তুই আবার কবে থেকে কম্পিটিশনে নাম দিচ্ছিস!"

বিহান গদগদভাবে বলল, "আগে দিইনি, এবার দেব ভেবেছি। তোর ফোটো দিয়ে শুরু। শুভযাত্রা বলতে পারিস।"

দোতারা ফোঁস করে একটা বানানো নিশ্বাস ফেলল। বলল, "তার চেয়ে বরং নিজের পশ্চাৎদেশ দিয়ে শুরু কর। সেদিন ফেসবুকে দেখলাম, ভেনিজুয়েলা না কোথায় যেন ফোটোগ্রাফি কম্পিটিশন হচ্ছে। সাবজেক্ট হল, বিউটি অব ইওর ওন বাটক। সেলফি তুলে পাঠিয়ে দে। ভাল রেজ়াল্ট করবি।"

বিহান বলল, "উফ, তারা, আজকাল তুই বড্ড স্ল্যাং ইউজ় করছিস!"

দোতারা নির্বিকারভাবে বলল, "ভাবছি ইলেকট্রনিক্স ছেড়ে স্ল্যাং-ট্রনিক্স নিয়ে পড়াশোনা করব। যাক, মনে রাখবি, আর মাত্র দু'দিন, ওনলি টু ডেজ়। তারপর তোর বেয়াড়া আবদার খতম। পার্লারে ঢুকে চুল ঘ্যাচাং। একেবারে নেড়া হয়ে যাব। মনে থাকে যেন।"

দোতারা আজ বৃষ্টিতে ভিজেছে। ভিজত না। ক'দিন বৃষ্টি হচ্ছে না দেখে ছাতা রেনকোট না নিয়েই বেরিয়েছে। দুম করে আকাশে মেঘ করে এমন ঝেঁপে বৃষ্টি নামবে কে জানত? ভেজা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প ছিল না। নিউটাউনের এদিকটা শুনশান। রাস্তায় দোকানবাজার

নেই যে ঢুকে পড়বে। দোতারা এসেছে বিহানের অ্যাপার্টমেন্টে। আজ তার ফোটো সেশনের দু'দিনের কোটা শেষ হতে চলেছে। তিন বছর হতে চলল নিউটাউনের এই স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে বিহান রয়েছে। সে ডাক্তারি পড়ে। বাড়ি বর্ধমান। কলকাতার এক মেডিকেল কলেজে পড়ছে। শুরুতে হস্টেলে থাকতে শুরু করেছিল। একদিন বিহানের মা এসে হস্টেলের অবস্থা দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যান আর কী! ছেলে এ কোথায় গিয়ে পড়েছে! তিনতলার ঘর অগোছালো, জানলায় শিক পর্যন্ত নেই।

বিহানের বাবা তাকে বোঝালেন, ছেলেমেয়েরা এইভাবেই ডাক্তারি পড়ে। ছাত্রাবস্থায় কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া বড় ডাক্তার হওয়া যায় না। এসব নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। বিহানের নরম স্বভাবের মা মানতে রাজি হননি। ছেলের চিন্তায় তিনি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেন। এমনকী, রাতের ঘুম পর্যন্ত উধাও হয়। চোখ বুজলেই নাকি চোখে হস্টেলের অগোছালো ঘর আর শিকহীন জানলা ভেসে উঠতে থাকে। বিহানের বাবা বাধ্য হয়ে এই ফ্ল্যাট কেনেন। তবে শর্ত হয়েছে, ডাক্তারি পড়া শেষ হলে এই ফ্ল্যাটের টাকা ছেলেকে দিতে হবে। বিহানের ডাক্তার হতে আর আড়াই বছর বাকি। তবে বিহান খুব দ্রুত এই অ্যাপার্টমেন্টটিকে হস্টেলের চেহারা দিতে পেরেছে। কমবেশি রোজই তার বন্ধুরা কেউ না কেউ এসে থাকছে। অনেক সময় দু'-তিনজনও চলে আসে। একসঙ্গে পড়াশোনা এবং অল্পবিস্তর নেশাটেশা করার পর মাটিতে লম্বা বিছানা হয়। ঘরের অগোছালো অবস্থা হস্টেলকে অনেক পিছনে ফেলতে পেরেছে। কোনটা বিছানা,কোনটা পড়ার টেবিল, আলাদা করা কঠিন। রান্নার হাঁড়ি থাকে খাটের উপর, বালিশের নীচে থাকে খুন্তি। জানলার গ্রিল থেকে প্লাস্টিকের কঙ্কাল ঝোলে। ফুলদানিতে নরমুণ্ড। বিহানের বাবা নিজে এসে দুরবস্থা দেখে গিয়েছেন। স্ত্রীকে কলকাতা-মুখো হতে দেন না। দেবেন কী করে? ছেলের ঘরের অবস্থা দেখলে তো জ্ঞান হারাবেন।

দোতারা যেদিন আসে, সেদিন বিহান সবাইকে বারণ করে। বন্ধুরা কেউ থাকলে বের করে দেয়। তারপরেও দু'-একজন থেকে যায়। বলে, "তোর সমস্যা কী? দোতারা তো আমাদেরও বন্ধু।"

বিহান বলে, "হতে পারে, কিন্তু এখন কেটে পড়।"

"এ কেমন অত্যাচার বিহান? এ তোর কেমন নিষ্ঠুরতা! এই মাঝদুপুরে কোথায় যাব?"

বিহান বলে, "যেখানে খুশি। কলকাতায় ঘুরে বেড়ানোর জায়গার অভাব নেই।"

"একটা কাজ করি না!"

বিহান বলে, "কী কাজ?"

"আমার চোখ একটা ফেট্টি দিয়ে বেঁধে দে। আমি ধৃতরাষ্ট্রের মতো হয়ে যাই। কোনও পাপ, কোনও অন্যায় দেখি না। তারপর তুই আর দোতরা যা খুশি কর। মাইরি বলছি ফেট্টির ফাঁক দিয়ে দেখব না।"

এরপর বিহান বন্ধুকে দরজা খুলে ঘাড় ধাক্কা দেয়। আজ অবশ্য কেউ আসেনি। দোতারা যে আসবে ঠিকই ছিল। ফোটো তোলার শেষদিন বলে কথা। ক'দিন পরে পরীক্ষা বলে বিহান কলেজ যাচ্ছে না। সকাল থেকে পড়াশোনা করে ক্লান্ত। মানব শরীরের হাড় যে কঠিন বস্তু, তা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছিল। দোতারা এল ভিজে একসা হয়ে। দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল বিহান। দোতারা এসেছে বলে নয়, অবাক হল ভিজে এসেছে বলে।

"তুই ভিজে!"

দোতারা বিহানকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। বলল, "কলেজে প্র্যাকটিকাল করছিলাম। অ্যান্টেনা এন্ড ওয়েব প্রোপাগেশন। জানলা দিয়ে দেখলাম, আকাশে মেঘ। সব সরিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম যেতেই যখন হবে, বৃষ্টি নামার আগেই যাই। অনেকটা করে এনেছিলাম, বাস থেকে নেমে ভিজে গেলাম। তোদের এখানে তো শালা কোনও শেল্টার নেই। তাড়াতাড়ি তোয়ালে দে। কাচা দিবি। পড়ার জামা প্যান্ট দিবি।"

বলতে-বলতে বাথরুমে ঢুকল দোতারা। বিহান পরিষ্কার তোয়ালে দিতে পারেনি। তার দুটো তোয়ালের অবস্থাই সঙ্গীন। একটায় মাংসের ঝোল লেগেছে, একটায় মাথার তেল। নিজের দুটো কাচা টি-শার্ট বের করে দিয়েছে। দোতারা সেগুলোই ব্যবহার করছে। বাথরুমে গিয়ে সে নিজের জামা খুলেছে। মোজা, রুমাল, ব্রা, প্যান্টি পর্যন্ত। সব শুকোতে দিয়েছে ঘরের ফ্যানের নীচে। সামান্য বৃষ্টি ভেজা কাপড়ও সে গায়ে রাখতে পারে না। হাঁচি শুরু হয়ে যায়। মায়ের ধাত পেয়েছে। বৃষ্টির জলে সমস্যা আছে। অন্য কোনও জলে নেই। এমনকী সুইমিং পুলেও দিব্যি থাকে। যত গোলমাল বৃষ্টিতে। ছোটবেলায় বাবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু বললেন, "এই মেয়ের রেন ইনটলারেন্স রয়েছে, বৃষ্টির জলে অ্যালার্জি। সব চলবে, বৃষ্টিতে ভেজা চলবে না।" অথচ দোতারা পাগলের মতো বৃষ্টি ভালবাসে। স্কুল বয়সে বন্ধুরা মজা করে ভিজত, সে পারত না। চোখ ছলছল করে দূর থেকে দেখত। মনে হত, বৃষ্টিতে ভিজতে না পারলে জীবনটাই বৃথা। সে একটা 'বৃথা জীবন' বয়ে বেড়াচ্ছে। একবার কলেজ থেকে দলবেঁধে ম্যাসানজোরে যাওয়া হয়েছিল। একেবারে ড্যামের পাশে গেস্টহাউস। ঢোকার পরপরই ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। হুটোপাটি করে মেয়েরা ছুটল ছাদে। বৃষ্টিতে ড্যাম দেখতে হবে। ছাদেই শুরু হল তুমুল নাচ। রেন ডান্স। অনেকে জামা খুলে ফেলল। প্রকৃতির কাছে প্রকৃতির বেশে। অসুবিধে কিছু ছিল না, পুরো গেস্টহাউসটাই তো মেয়েরা নিয়েছিল। দোতারার খুব ইচ্ছে করছিল যোগ দিতে। পারল না। সবাই খুব ডাকাডাকি করল, তাও পারল না। তবে এখন ঠান্ডা লাগার বদভ্যাসটা কমেছে, তবে জামা টামা একটু ভিজে গেলেই সর্তক থাকতে হয়। সেই কারণেই ভিজে কাপড় খুলে শুকোতে দিয়েছে।

বিহানকে দোতারা চেনে দেড় বছর। না, তার চেয়ে মাসখানেক বেশিই হবে। কিন্তু এরমধ্যেই তাকে খানিকটা বুঝতে পেরেছে। ছেলেটা অন্যরকম। কাউকে 'অন্যরকম' বলার জন্য অনেক কারণ লাগে না, একটা-দুটোই যথেষ্ট হয়। বিহানের বেলাতেও তাই। ছেলে যাতে একা আরামে থাকতে পারে, তার জন্য বাবা-মা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে দিল, অথচ বিহান বন্ধুদের সঙ্গে সেই ঘর ভাগ করে নিয়েছে। এমনও হয়েছে, অসুস্থ বন্ধুকে খাটে শুইয়ে সে বিছানা করেছে মেঝেতে। মেল শভিনিজমে একদম ভোগে না। ছেলেমেয়ের অধিকার, ক্ষমতায় ভেদাভেদ নেই। দোতারার উপর কোনও জোরজবরদস্তি নেই, আবার আছেও। তবে সেই জোর খাটাতে কখনও তার স্বাধীনতায় হাত দেয় না। মজার কথা হল, দোতারা জেনেছে, এই ছেলের কেবলামি যেমন আছে, দুষ্টুমিও রয়েছে। মাঝেমধ্যে নিজেকেই জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি বিহানের প্রেমে পড়েছি?' তারপরেই ভাবে, পড়লে পড়েছে। প্রেম নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তাকে ইনসিডেন্টের মতো ভাবাই ঠিক। যখন যেমনভাবে আসবে, সেইভাবে মুখোমুখি হতে হবে। যদি মন দিয়ে হয় মন দিয়ে, যদি শরীর কাছে যেতে চায়, শরীরকে ছেড়ে দিতে হবে। এসব নিয়ে ইনহিবিশনের প্রশ্ন নেই। শরীর এমন কোনও কাচের পলকা কাপ নয় যে নাড়াচাড়া করলেই ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকবে। 'চরিত্র' একটি প্যাঁচালো ধারণা। সমাজ বেশিরভাগ সময়েই ভুল ব্যাখ্যা করে। তাকে মিথ্যে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করেছে। চরিত্র সেই বাঁধনে পড়ে আরও ছটফট করে। খালি ভাবে, কখন দড়ি ছিঁড়ব। কেউ ছিঁড়ে ফেলে, কেউ ছিঁড়তে গিয়ে ফাঁসে জড়িয়ে পড়ে। কেউ আবার ছিঁড়তে সাহস না পেয়ে ভাবে, 'আমার চরিত্রটি অতি পবিত্র।' দোতারা মনে মনে বলে,'কচুর মাথা পবিত্র।' সে ঠিক করে ফেলছে, আর যাই হোক, 'বিয়ে' নামক গোলমেলে সম্পর্কটির মধ্যে সে কোনওদিন যাবে না। যেদিন মন চাইবে না, 'টা টা' বলে উলটোদিকে হাঁটবে। মায়ের মতো কোর্টে ঘুরে জুতোর শুকতলা ছিঁড়তে সে রাজি নয়, আবার বাবার মতো 'কিছুতেই ডিভোর্স দেব না' ভেবে জেদ করে বসেও থাকবে না। এতে সময় নষ্ট।

বিহান উৎসাহ নিয়ে বলল, "তাহলে শুরু করা যাক? এরপরে লাইটের সমস্যা হবে।"

দোতারা অন্যদিকে মুখে ফিরিয়ে বলল, "ফোটো তুলবি না। কম জামাকাপড় পরে আছি।"

সত্যি দোতারার গায়ে জামাকাপড় কম। বিহানের শর্টসের ওপর টী শার্ট। বিহান ক্যামেরা বের করে ফেলেছে।

"জামা কাপড় দিয়ে কী হবে? আমি তো জামা কাপড়ের ছবি তুলছি না। তারা, ভেজা চুলে তোকে যা লাগছে না মাইরি! ফোটো দেখলে নিজেই নিজের প্রেমে পড়ে যাবি।"

দোতারা নাক দিয়ে ফুঃ ধরনের অবজ্ঞার আওয়াজ করে বলল, "আমি আমার প্রেমেই থাকি। চারপাশে তো প্রেমে পড়ার মতো আর কাউকে দেখি না।"

বিহান লেন্স ঠিক করতে-করতে বলল, "তুই না পড়িস, অনেক ছেলেই কিন্তু মনের ভিতর দোতারা বাজিয়ে গান করে প্রেমসাগরে ডুব দিয়েছে..."

দোতারা সামনে ফেলে দেওয়া চুল বিহানের টি শার্ট দিয়ে মুছতে-মুছতে বলল, "নামগুলো বলিস তো। ওদের দোতারার তার কীভাবে ছিঁড়তে হয় দেখব। কানের গোড়ায় এমন মারব না যে প্রেম সাগর থেকে আর উঠতে হবে না। হাবুডুবু খাবে।"

"সে তুই পারিস তারা, তুই যা গুন্ডা। অ্যাই, এই দিকে ফের। ফোকাসটা করে নিই। মুখের সামনে থেকে চুল সরা। ভুতের মতো লাগছে।"

দোতারা চুল সরাতে-সরাতে বলল, "আমাকে যদি ভুতের মতো লাগে তোমার ক্যামেরার কপালে দুঃখ আছে। ওকে এমন পেটাব যে কপালে সাতটা স্টিচ দিতে হবে।"

বিহান চুপ করে ফোটো তুলতে থাকে। নিঃস্তব্ধ ঘরে শাটারের আওয়াজ হতে থাকে চাপা স্বরে। মনে হয় সে কথা বলছে। প্রেমের কথা? প্রেম বিষয়ে দোতারা যতই কঠিন এবং উদাসীন ধ্যানধারণা নিয়ে থাকুক না কেন, বিহানকে পছন্দ। খানিকটা বেশিই পছন্দ। ছেলেটার নানাধরনের শখ এবং জীবনবোধ তার ভাল লাগে। ফোটো তোলা, গান গাওয়া, পাহাড়ে, জঙ্গলে ট্রেক করা তো আছেই। তার সঙ্গে মানুষদের জন্য কাজ করতেও সে ভালবাসে। ডাক্তারি পড়া খুবই চাপের। যত উপরের দিকে যায়, চাপ বাড়ে। এর মধ্যেই বিহান সপ্তাহে একদিন করে শিয়ালদার কাছে নাইট স্কুলে পড়াতে যায়। বড়দের লেখাপড়া শেখায়। গরীব মানুষরা সব পড়তে আসে। অক্ষর চেনা, অঙ্ক শেখানো। হাজার কাজ থাকলেও এই দিনটা মিস করে না বিহান। সে নিজের পরীক্ষাই থাকুক, আর পার্টিই থাকুক। বাবা বলত, "যে মানুষের শখ আহ্লাদ নেই, আবেগ নেই, পাগলামি নেই সে মানুষই নয়।"

একথা শুনলে সোমদত্তা রেগে যেত খুব। সে একজন প্র্যাকটিকাল মহিলা। একটা সময় মেয়েকে নিয়ে চরম বাড়াবাড়ি করত সে। খাওয়া-পরা-ঘুমোনো-জাগা— সবের উপর নজর রাখত। এমনকী কার সঙ্গে মিশবে, কী কথা বলবে, তাও। পারলে মেয়ের ভাবনার ভিতরে ঢুকে বসে থাকত। দোতারা অতিষ্ঠ হয়ে যেত। মায়ের ছুটি থাকলেই আতঙ্ক। এখনও স্বভাব বদলায়নি। তবে মেয়ে বড় হয়েছে বলে জোর খাটাতে পারে না।

বাড়ির কোনও বিষয়ে দোতারা সহজে নাক গলায় না। ছোটবেলা থেকেই নিজের লেখাপড়ার জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। চারপাশে কী ঘটছে, তাই নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না। জ্ঞান হওয়া থেকে দেখছে, বাবা-মা দু'জনেই চাকরি করছে। ফলে তাদের সবসময় কাছে পায়নি। অসুবিধে হয়নি। একা থাকার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। নিজেকে সেভাবে তৈরি করে নিয়েছে। গোড়া থেকেই লেখাপড়া করতে তার ভাল লাগত। মা পরীক্ষার রেজ়াল্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। ফার্স্ট হলেই হল। বাবা কিন্তু শুধু ফার্স্টে খুশি ছিল না। মার্কশিট নেড়েচেড়ে ফিরিয়ে দিত।

"পরীক্ষার রেজ়াল্ট তো হল, বাইরে কী হল সেটা বল।"

প্রথম-প্রথম এই কথার মানে বুঝতে পারত না দোতারা।

"পরীক্ষার বাইরে আবার কী হবে?"

শিরীষ হেসে বলত, "বাঃ! পরীক্ষার বাইরেই তো আসল পরীক্ষা। সেখানে সিলেবাসও নেই, বইও নেই, টিচারও নেই। এমনকী পরীক্ষার খাতা দেখারও কেউ নেই। সব নিজেকে করতে হবে।"

দোতারার কাছে এসব কথা ধাঁধার মতো লাগত। বলত, "কী বলছ বাবা! বুঝতে পারছি না।"

শিরীষ বলত, "লেখাপড়া, নিজের কেরিয়ারের পাশাপাশি জীবনে আরও অনেক কিছু করার আছে দোতারা। শখ আছে, স্বপ্ন আছে, অন্যের দুঃখ কষ্ট নিয়ে ভাবা আছে। জীবনের দুঃখ এবং আনন্দ— এই দুই সেখানেও থাকে।"

পুরোটা না বুঝলেও দোতারার এই কথা ভাল লাগত। সোমদত্তা এসব একেবারে পছন্দ করত না। বলত, "মেয়েকে এসব কী হাবিজাবি শেখাচ্ছ! লেখাপড়া ছাড়া ওর কোনও দিকে মন দেওয়ার নেই। আমি তো নাচ গানও শিখতে দিইনি। লেখাপড়ায় ডিস্টার্বেন্স হবে।"

শিরীষ বলত, "ভুল করছ সোম। আমিও তো লেখাপড়া শিখেছি। খারাপ শিখিনি। স্কুল বয়স থেকেই খেলাধুলো, ছবি আঁকা, নাটক, গান-বাজনা সবই করেছি। কলেজে ঢুকে হুল্লোড় আরও বাড়িয়েছি। কবিতা লিখেছি, লিটল ম্যাগাজ়িন করেছি। পাশাপাশি একটা এনজিওতে যুক্ত হয়েছিলাম। নাম ছিল 'মেন্টাল স্ট্রেংথ'। দরিদ্র, সহায় সম্বলহীন মানসিক রোগীদের জন্য মেডিকেল ক্যাম্প করা হত। খুব ঝক্কির কাজ। খবর পেয়ে নানা জায়গা থেকে পাগল ধরে আনতাম। জোর করে তাদের চিকিৎসার জন্য ক্লিনিকে রাখা হত। এসব করে ক্ষতি তো হয়নি।"

সোমদত্তা রেগে গিয়ে বলত, "লেকচার দিও না। কী চাও তুমি? দোতারা লেখাপড়া ছেড়ে তোমার মতো হুজুগে মাতুক? আমি অ্যালাউ করব না। আর কে বলেছে ক্ষতি হয়নি তোমার? কবিতা, ছবি, থিয়েটার নিয়ে না থাকলে হয়তো আরও উন্নতি করতে!"

শিরীষ থমকে গিয়ে বলত, "যা ভাল বোঝো করবে।"

সোমদত্তা বলত, "তাই করব। এই দুনিয়াটা শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবনার দুনিয়া। যে নিজেকে নিয়ে ভাবে না, সে আউট। দয়া করে তুমি মেয়েকে কুশিক্ষা দেবে না।"

মা যাই বলুক, দোতারার বাবার কথা ভাল লাগত। সে আসলে মানুষটাকেই ভালবাসে। এখনও বাসে। মায়ের মতো মানুষের সঙ্গে এতদিন কীভাবে চলেছে ভেবে অবাক লাগে। সে যে এই বইপত্র গুছিয়ে বাড়ি হস্টেলে পালিয়ে গিয়েছে, তার পিছনের একটা কারণ শ্রীমতী সোমদত্তা চ্যাটার্জি। কাছে থাকলেই ঘ্যানঘ্যান। এখন থেকেই বিদেশে পাঠানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আরে বাবা, গোড়াটা তো এখানে শিখে যেতে হবে। তারপর তো হায়ার স্টাডি। ওই মহিলাকে কে বোঝাবে? গান শুনলে, সিনেমা দেখলে পর্যন্ত টেনশন করে।

"সিনেমা দেখবি তো, লেখাপড়ার জন্য এরকম এক কঠিন সাবজেক্ট না বেছে, সহজ কিছু একটা বাছলে পারতিস।"

দোতারা রেগে বলে, "মনে হচ্ছে, তাই বাছা উচিত ছিল। তাহলে হয়তো আমাকে নিয়ে তুমি এত কনসার্ন হতে না।"

সোমদত্তা রেগে গিয়ে বলেছে, "এত আন্ডারএস্টিমেট করছিস কেন? লেখাপড়া তো আমরাও করেছি। খুব খারাপ কিছু করিনি।"

দোতার হাতজোড় করে বলে, "না মা, তোমাকে আন্ডারএস্টিমেট করছি না, ওভারএস্টিমেট করছি। যা নিয়েই লেখাপড়া করো, ইলেকট্রনিক্সেও তুমি সমান পারদর্শী। আমি সাহিত্য বা কর্মাস নিয়ে পড়লেও একই কথা বলতাম। এবার দয়া করে ঘর থেকে যাও। আমাকে একা থাকতে দাও। কেরিয়ার নিয়ে ভাবতে না পারলে নিজের লেখাপড়া সম্পর্কে আমি কতটা সচেতন তুমি ভালই জানো। রেজ়াল্টও দেখছ।"

সোমদত্তা বলে, "সেই জন্যই তো বেশি ভয়। পা ফসকাতে কতক্ষণ..."

দোতারা বলে, "চিন্তা কোরো না। পা ফসকে তোমার ঘাড়ে পড়ব না।"

নাওড়ুবির ঘটনায় বাবাকে সমর্থনই করে দোতারা। সে মনে করে, বাবা তো না বলে কিছু করেনি। মাকে বলেছিল, তাকেও বলেছে। মা আটকাতে পারেনি। সেও মানুষটার ঘোরের কাছে হেরে গিয়েছিল। এটা বাবারই জয়।

বিহান ঘরের দেয়ালে, পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। ফোটো সেশন চলছে। তবে প্রতিটা শটের জন্য সময় লাগছে। সময় না লেগে উপায় নেই। ফোটোতে টি-শার্ট চলে এলে! রহস্যময়ী সুন্দরীর হাতে টি শার্ট! কম্পিটিশনে ঢুকতেই দেবে না। দোতারা টি শার্ট ধরা হাত সরালে তবে শাটার টিপতে হচ্ছে। ধৈর্যের কাজ। এত ধৈর্যের পরেও বিহান খুশি। এই ভঙ্গিতে দোতারার ফোটো তোলার সুযোগ সে আগে পায়নি। মনে হয় না আর কখনও পাবে। আর কবে সে ভিজে আসবে ঠিক নেই। গোটা বর্ষাকালটা রেনকোট আর বড় ছাতা নিয়ে ঘুরেছে। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়তে দেয়নি। সেই মেয়ের মাথার চুল ভিজবে কী করে? একটাই পথ ছিল, দোতারাকে যদি কখনও স্নানের পর পাওয়া যেত। কথাটা মাথায় আসেনি। এলেই বা কী হত? এই মেয়ে থোড়াই রাজি হত। উলটে একথা বললে নির্ঘাত হাত চালাত। গুন্ডা প্রকৃতির মেয়ে। আলাপও হয়েছিল গুন্ডামির মধ্যে দিয়ে।

দেড়বছর আগের কথা। যাদবপুর থেকে অটোতে উঠেছিল। খানিকদূর গিয়ে অটোচালক বলল, "আর যাব না, নেমে যান। অন্য অটো ধরুন।"

পিছনে বসা এক তরুণী বলল, "কেন যাবেন না?"

অটোচালক একজন কমবয়সি ছেলে। সে অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "ভাল লাগছে না। ভাড়া দিয়ে নেমে যান।"

"এ কী কথা! মাঝপথে নামিয়ে দিচ্ছ কেন ভাই?"

অটোচালক তরুণটি বলল, "বললাম তো, এই পর্যন্ত। এরপর অন্য গাড়িতে উঠতে হবে। যান ওখানে গিয়ে লাইন দিন। খুচরোতে ভাড়া দেবেন।"

সবাই গজগজ করতে করতে ভাড়া বের করতে লাগল। বিহানেরও ঝগড়া করবার সময় ছিল না। পিছনে বসা তরুণীটি শান্ত গলায় বলল, "ভাড়া দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, আপনাকে পুরো রুটটাই যেতে হবে। কারণ, রুট ভাঙার কথাটা আপনার আগে বলা উচিত ছিল।"

অটোচালক চোখ নাচিয়ে বলল, "এ তো বিরাট মাস্তান দেখছি, উচিত শেখায়! মেয়ে মাস্তান?"

তরুণীটি আরও শান্তভাবে বলল, "হ্যাঁ ভাই, মেয়ে মাস্তান। নিন, দেরি করবেন না, গাড়ি স্টার্ট করুন।"

অটোচালক এবার ঘুরে বসল। বলল, "আরিব্বাস! এমনভাবে বলছে যেন মারবে!"

তরুণী বলল, "হ্যাঁ, প্রয়োজনে মারব। আপনাদের কয়েকজনের গুন্ডামি বড্ড বেড়েছে। ভালদেরও নাম খারাপ হচ্ছে। একটু মারধরের প্রয়োজন।"

অটোচালক আঙুল তুলে বলল, "অ্যাই মাগী, মুখ সামলে কথা বল! জিভ টেনে ছিঁড়ে দেব!"

তরুণী ঝুঁকে পড়ে হাঁ করে বলে, "নিন, জিভ ছিঁড়ে নিন।"

বিহান এতক্ষণ চুপ করে ছিল এবার আর পারে না। এগিয়ে গিয়ে উদ্ধত ছেলেটিকে বলে, "আপনি এসব কী বলছেন!"

অটোচালক বলল, "বেশ করছি। শালি আমাকে চমকায়..."

তরুণী এবার কষিয়ে একটি চড় মারে। চালক ছেলেটি ছিটকে পড়ে। তরুণী শান্তভাবে সিটে হেলান দিয়ে বলে, "আর একটা চড় খেতে না চাইলে গাড়ি চালান।"

ছোকরা চালক অটো ছেড়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে অটো থেকে নেমে বিহানের সঙ্গে তরুণীর কথা হয়। আলাপও হয়।

এই মেয়ে যে গুন্ডা প্রকৃতির তা তো বোঝাই যাচ্ছে। বিহান জানে, মুখে যতই তাচ্ছিল্য করুক, ধমক দিক, এই মেয়ে তার নানাবিধ খেপামিকে প্রশ্রয় দেয়। তারই একটা হল এই ফোটো তোলা।

দোতরা মনে-মনে অশান্ত। শিকড়ের সন্ধান করতে গিয়ে বাবা সংসারের ডালপালা অনেকটাই ছেঁটে ফেলেছে। মা এবার গাছটা পুরো কেটে ফেলতে চাইছে। বাড়ি ছেড়েছে। বাবাকে ডিভোর্সের নোটিস পাঠিয়েছে। বাড়ি ছাড়ার পরও মাঝেমধ্যে এসেছে। তবে বাবা বাড়ি না থাকলে। এখন আর আসছে না। দোতারা তিন জায়গায় ভাগ করে থাকে। হস্টেল, কসবার ফ্ল্যাটে এবং সল্টলেকে মা আর দিদার কাছে। বেশি সময়টাই অবশ্য হস্টেলেই কাটায়। দিদিমার বয়স হয়েছে। তিনি মেয়ে-জামাইয়ের ঘটনায় ভেঙে পড়েছেন। নাতনিকে মধ্যস্থতা করতে বলেন। বিষয়টা আদালত পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছে। তবে তার পিছনে শুধু নাওড়ুবিতে গিয়ে চাষ করা নয়, অন্য ঘটনাও আছে। ত্রপা নামে একটি মেয়ে মঞ্চে উদয় হয়েছে। বাবার 'নায়িকা', মায়ের 'খলনায়িকা'। বাবা ফসল ফলাতে গিয়ে হাঁটুর বয়সি একটা মেয়ের প্রেম পড়ে গেল! নাকি খবরে কোনও গোলমাল আছে? এই কথাটা বলতেই সেদিন সোমদত্তা রেগে আগুন হয়ে গেল।

"তুই কী বলতে চাস?"

দোতারা বলল, "বলতে চাই, ঘটনা সত্যি তো?"

সোমদত্তা মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই কি বলছিস? তোর বাবার নামে বানিয়ে বানিয়ে এত বড় একটা অ্যালিগেশন আনছি?"

দোতারা বলল, "তুমি নিজে থেকে আনছ না, তোমার লইয়ার হয়তো মামলার সুবিধের জন্য আনতে বলেছেন।"

সোমদত্তা বলল, "চুপ কর। বাবার হয়ে আর ওকালতি করতে হবে না। জেনে রাখ, ওই সব চাষবাস, সহজ জীবন, এসব তোর বাবার মিথ্যে কথা ছিল। মেয়ের বয়সি একটা মেয়ের সঙ্গে থাকবে বলে সংসার ছেড়ে পালিয়েছে।"

দোতারা বলল, "কেন? বাবা, তোমাকেও তো যেতে বলেছিল।"

সোমদত্ত ফোঁস করে ওঠে, "মানে! আমি তোর বাবার সঙ্গে থেকে চাষ করব? লেখাপড়া শিখেছি মাঠে গিয়ে এক হাঁটু জল কাদায় দাঁড়িয়ে ধানের চারা পুঁতব বলে? গরুর দুধ দুইব? তোর বাবা তো একটা গরু আর দুটো ছাগল পুষেছে শুনলাম।"

দোতরা বলল, "কেন ক্ষতি কী? এখন লেখাপড়া অনেকেই করে মা। শিক্ষিত মানুষও চাষবাস করে।"

সোমদত্তা লম্বা করে শ্বাস টেনে বলে, "আমার সঙ্গে রসিকতা করবি না দোতারা। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল, তোর বাবা চাকরিবাকরি ছেড়ে চলে যেতে চাইছে কেন! ভেবেছিলাম, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে মত বদলাবে। বউ-মেয়ের চেয়ে ধানক্ষেতের টান নিশ্চয় বেশি নয়। তাতেও দেখলাম কিছু হল না। তখন বুঝতে পারিনি, এখন পারছি, ওই মেয়েটাই আসল কালপ্রিট। ওই আমার সর্বনাশ করেছে।" একটু থেমে দম নিয়ে থমথমে গলায় আবার বলতে শুরু করল, "ওই মেয়ে তোর বাবার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। বেশি বয়েসে অমন একটা ছুকরি হাতে পেয়ে নিজের স্ত্রী মেয়েকে ভুলে গিয়েছে... এরা আসলে কলগার্ল, প্রস্টিটিউট...শাঁসালো কাউকে পেলে ভদ্রলোক সেজে চেপে ধরে... আমার উকিল বলেছিল, তোর বাবার নামে ফোরনাইনটি এইট-এ কমপ্লেন করতে। আমি রাজি হইনি। তোর বাবা ফেঁসে গিয়েছে, আমি চাই বেশ্যাটাকে জেলে পুরতে। শি ইজ় দ্য কালপ্রিট। সে তোর বাবাকে হানিট্র্যাপে ফেলেছে, এরপর চিট করবে। নইলে হঠাৎ তোর বাবা জঙ্গলে গিয়ে থাকবে কেন? তার তো মাথা খারাপ হয়ে যায়নি!"

কথা শেষ করে সোমদত্তা হাঁপাতে লাগল।

দোতারা ঠান্ডা গলায় বলল, "মা, তুমি রেগে আছ। তার জন্য বাবাকে যা বলছ বল, সে রাইট তোমার আছে। ভদ্রলোক তোমার স্বামী। কিন্তু একজন অচেনা মেয়ে সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলা তোমার উচিত নয়। যেটুকু শুনছি, তুমিও বলেছ ওই মেয়ে তোমার মেয়ের বয়সের কাছাকাছি বয়সের। হয়তো ইমফর্মেশনে ভুল রয়েছে। ইভেন ইফ শি ইজ় আ কল গার্ল, তাহলেও তুমি এই অপমান তাকে

করতে পার না। কলগার্লকেও কল করতে হয় মা। কেউ তাকে ডেকেছে।"

সোমদত্তা চিৎকার করে বলে, "তুই আমাকে জ্ঞান দিস না। একশোবার বলব, হাজারবার বলব। শি ইজ় আ হোর, আ হোর, আ হোর..."

দোতারা সামান্য হাসল। বলল, "মা, তুমি চিৎকার করতে পার, কিন্তু এই শিক্ষা তুমি তো আমাকে দাওনি। মেয়েটি সম্পর্কে তো তুমি কিছুই জানো না মা, শুধু জানো, সে বাবার পরিচিত। তার নামে এই নোংরা কথাগুলো বলা কি ঠিক হচ্ছে? হচ্ছে না। মেয়েটাকে যেমন অপমান করা হচ্ছে, তেমন প্রস্টিটিউশন করতে যারা বাধ্য হয় তাদেরও অপমান করা হচ্ছে।"

সোমদত্তা খেপে উঠে বলল, "অপমান কী দেখলি, ওই বেশ্যাটাকে হাতের কাছে পেলে খুন করব।"

দোতারা বলল, "মা, বলতে খারাপ লাগছে, তারপরেও না বলে পারছি না। সামান্য এক বেশ্যা কিন্তু অতি সহজে তোমার কাছ থেকে বাবাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছে। তুমি আটকাতে পারলে না? এত তো চেহারা, রূপ, কেরিয়ার, স্টেটাস নিয়ে কনসার্ন ছিলে, তাতেও লাভ হল না? মাটির দেওয়ালের মতো এক ধাক্কায় ভেঙে গেল! শুধু বাইরেটাই দেখেছ এতদিন, নিজের ভিতরটা একবার তাকিয়ে দেখলে না? ওই মেয়েটি প্রস্টিটিউট হলেও তার গর্ব করা উচিত। শিরীষ চ্যাটার্জির মতো মানুষকে জয় করেছে।"

এরপরই সোমদত্তা সোফা ছেড়ে উঠে এসে দোতারার গালে একটা চড় কষায়।

চুপ করে যায় দোতারা। এই ধাক্কায় নিজের ভুল বুঝতে পারে। কথাটা বেশি কড়া কথা হয়ে গিয়েছে। অস্ফুটে বলে, "সরি মা।"

দোতারা নিজের মনে ঝাড়া দিল। এসব মাথায় রাখলে চলবে না। স্বাভাবিক হতে হবে।

"অ্যাই বিহান, তোর কাছে আর কাচা জামাটামা কিছু আছে?"

বিহান ক্যামেরা নামিয়ে বলল, "কেন?"

দোতারা বলল, "গা মুছব। এটা ভিজে গিয়েছে।"

বিহান বলল, "তোকে তো কাচা দুটো জামাই ওয়ার্ডরোব থেকে বের করে দিলাম। একটা তো পরেছিস, আর একটা গামছা বানিয়ে মাথা মুছছিস। ক'টা জামাকাপড় রাখব? মাসখানেক লন্ড্রি যায়নি এমন কিছু দিলে চলবে?"

দোতারা একটু চুপ করে থেকে বলল, "আজই শালা চুল কেটে ফেলব। তোর ফোটোতে ইয়ে। আমার যদি হাঁচি হয় না দেখবে তোমার কী করি। ওই প্লাস্টিকের কঙ্কাল আর লাগবে না। তোকে মেরে কঙ্কাল বানিয়ে ঝুলিয়ে দেব।"

বিহান গদগদ গলায় বলল, "দো, মনে হয় না, আর তোকে চুল বড় রাখতে হবে। আজই ফোটো পেয়ে যাব। কে জানে এতক্ষণে হয়তো পেয়ে গিয়েছি। একটা বেডকভার দেব? মাথা মুছবি?"

দোতরা কড়া চোখে বিহানের দিকে তাকাল। বিড়বিড় করে বলল, "দাঁড়া, তোর ফোটো তোলা বের করছি।" বলতে-বলতে ফট করে গায়ের টি-শার্টটা খুলে ফেলল দোতারা। একবারে খালি গা। তারপর হাতের টি-শার্ট দিয়ে গা মুছতে শুরু করল এমন একটা ভঙ্গিতে যেন কিছুই ঘটেনি। বিহান থমকে গেল। সত্যি, ক্যামেরা তুলে নেওয়ার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। সে ডাক্তারি পড়ছে। মানুষের নগ্ন শরীর দেখার অভিজ্ঞতা তার অনেকদিনই হয়েছে। কিন্তু নগ্নতা এমন সুন্দর হয় জানা ছিল না। এত অপূর্ব শরীর সে আগে কখনও দেখেনি। কল্পনাও করতে পারে না। নাকি শরীর তার পছন্দের মানুষের বলে এমন মনে হচ্ছে? হতে পারে। যা খুশি হোক। দোতারার গলায়, স্তনে, পেটে, নাভিতে সে বিহ্বল হয়ে গেল।

দোতারা হাতের বই সরিয়ে মুখ তুলে তাকাল। গাঢ় স্বরে বলল, "কাছে আয় বিহান। মনটা খুব অস্থির লাগছে। আমাকে একটু বুকে নে।"

বিহান ক্যামেরা সরিয়ে হামা দিয়ে এগিয়ে এল। দোতারা চোখ নামাল। খুব যত্ন করে দোতারার প্যান্ট খুলতে লাগল বিহান। নিজেরই তো প্যান্ট, কোথায় ইলাস্টিক, কোথায় বোতাম, জানা আছে সবই, তবু হাতড়াতে লাগল।

এক সময়ে নগ্ন বিহানকে নিজের শরীরে নিতে-নিতে দোতারা বলল, "আমাকে শান্ত করে দে... প্লিজ় আমাকে শান্ত করে দে..."

ক্লান্তি আর তৃপ্তি নিয়ে দু'জনে শুয়েছিল পাশাপাশি। বিহানের বুকে হাত রেখে দোতারা বলল, "আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যাবি?"

দোতারাকে আরও কাছে টেনে বিহান তার গালে নাক ঘষতে-ঘষতে আদুরে গলায় বলল, "যাব যাব...তুই যেখানে বলবি যাব...মরতে বললে মরব..."

দোতারা চুলের মুঠি ধরে বিহানের মুখ তার নগ্ন, উদ্ভাসিত স্তনের ওপর নিতে-নিতে বলল, "তাহলে চল তোকে আবার মেরে ফেলি।"

॥ ৭ ॥

সরু আলপথের শেষে একটা বাঁশের সাঁকো।

ঠিক যেন কেউ ছবি এঁকে রেখে গিয়েছে। শিরীষ থমকে দাঁড়াল। নয় নয় করেও আট মাসের বেশি এখানে থাকা হয়ে গেল, কই এই সেতু তো আগে নজরে পড়েনি! এটাও কি নাওডুবি গ্রামের মধ্যে? নাকি হাঁটতে-হাঁটতে অন্য কোথাও চলে এসেছে? অন্য কোনও গ্রামে?

শিরীষের বেশ অবাকই লাগছে। এদিকটায় কি সে কখনও আসেনি? তা কী করে হবে? নিশ্চয়ই এসেছে, এত মন দিয়ে খেয়াল করেনি। অনেক সময় এরকম হয়। একই জায়গা অন্যরকম লাগে। মানুষের বেলাতেও তাই। চেনা মানুষকে মনে হয় বদলে গিয়েছে। আসলে সব কিছুর ভিতরেই খানিকটা অদেখা থেকে যায়। সে প্রকৃতিই হোক আর মানুষই হোক। শিরীষ লম্বা করে শ্বাস টানে। সোমদত্তার এমনটাই হয়েছে। সে এতদিন ঘর করবার পরও, স্বামীর পুরোটা দেখেনি। তাই এই ঘটনায় বড় ধাক্কা খেয়েছে। মেনে নিতে পারছে না। শিরীষও কি নিজেকে এভাবে জানত? এতদিন ধরে তিলতিল করে গড়ে তোলা সিস্টেম এভাবে ভেঙে দেবে জানত সে? মনে হয় না। চেনা মানুষের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা অচেনা মানুষটা কখন জেগে উঠবে কেউ আগাম জানতে পারে না।

সাঁকোটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পলকা একটা সেতু। বাতাসে একটু একটু দুলছে। পাশাপাশি দু'জনও যেতে পারবে কিনা সন্দেহ। উলটো দিক থেকে আর একজন চলে এলে চেপে দাঁড়াতে হবে। তাতেও কি পারবে? ফিরে যেতে হতে পারে। জীবনের মতো। কোনও কোনও সেতু একা পার হতে হয়।

ছবির মতো সাঁকোর ওপাশের আকাশ কালো মেঘে ভরা। খানিক আগেও এই মেঘ ছিল না। আকাশ ছিল নীল। আলো ঝলমলে। শরতের আলো। হঠাৎ কোথা থেকে যে এত ঘন কালো মেঘ এসে পড়ল কে জানে! যদিও সময়টা 'এই রোদ এই মেঘ'-এর সময়। বৃষ্টি কখনও হয়, কখনও হয় না। হলেও বেশি হয় না। এক পশলা, দু' পশলায় ক্ষান্ত দেয়। এখন মনে হচ্ছে, জোরে নামবে। নামলে কি সমস্যা হবে? শিরীষ ছাতা নিয়ে বেরোয়নি। ক'টা বাজে? শিরীষ কবজি উলটে ঘড়ি দেখতে গেল। ঘড়িও পরা হয়নি। হিসেব মতো দুপুর তিনটে –সাড়ে তিনটে হওয়ার কথা। আর একটু বেশি হতে পারে। মনে হচ্ছে, সন্ধে নেমে এসেছে। গ্রামে এমনিতেই তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে নামে। এখন তো মেঘে সব আলো ঢেকেছে। ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। ঝড় উঠবে নাকি? শিরীষ আরও এগিয়ে গেল।

নাওডুবি আসার পর বেশ কয়েকবার ঝড়জল দেখা হয়ে গেল শিরীষের। প্রথমবারের ঝড় ভংয়কর ছিল। তখন জমির ঘরটায় ছাউনি ছিল খানিকটা টিনের, খানিকটা বাঁশ খড়ের, দেয়াল মাটির। রাতে হাওয়ার দাপটে সেই ছাউনির আধখানা ভেঙে, দুমড়ে মুচড়ে গেল উড়ে। শিরীষ বেরিয়ে যে অন্য কোনও বাড়িতে আশ্রয় নেবে,

সে উপায় ছিল না। বড়মামা ঠিকই বলেছিলেন, এই জমির ধারেকাছে ঘরবাড়ি নেই। যে একটা দুটো কাঁচা ঘর রয়েছে, সেগুলোও সব জমির মধ্যে। সেখানে মানুষজন থাকে না। জলের পাম্প, চাষবাস সরঞ্জাম রাখা হয়। অধিকাংশ সময় তাও থাকে না। খালিই পড়ে থাকে। জায়গাটা নাওডুবির গ্রামের মধ্যে পড়লে কী হবে, ঘরবাড়ির দেখা মেলে অনেকটা যাওয়ার পর। ফলে সেদিনের ঝড়জলে কোথাও যাওয়ার ছিল না। ঘরের একদিকের চাল উড়ে গিয়েছে, যে কোনও মুহূর্তের বাঁশ, মাটির দেয়ালও ধসে পড়বে। বাইরে বেরোলেও বিপদ। খোলা মাঠে মাথায় বাজ পড়তে পারে। এইসব জায়গায় বাজ সবচেয়ে ভয়ের। বেরিয়ে গাড়ি পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব। গাড়ি কি আস্ত আছে? উপরে গাছ ভেঙে পড়েনি তো? নিকষ অন্ধকার। ঘরের হ্যারিকেন নিভে গিয়েছে। টর্চও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভরসা শুধু আকাশ চেরা বিদ্যুতের আলো। সেই আলোতে ভিজে যাওয়া তক্তপোষ খানিকটা টেনে সরিয়েছিল শিরীষ। তারপর চুপ করে বসে জলের ছাঁটে ভিজতে-ভিজতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মাথার উপর ঘরের বাকি চালটুকু যদি ভেঙে না পড়ে, কাল সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকে যদি, তবে এখানেই 'প্রজেক্ট নাওডুবি'র ইতি। ফাইল ক্লোজ়ড। ফিরে যাবে কলকাতায়। মালপত্র ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কিছু নেই। জামা-কাপড়, ব্যাগ জুতো যেটুকু যা আছে সবই ভিজে ঢোল। পড়ে থাকবে এখানে। পরে গ্রামের লোক যদি কেউ ঢোকে ঝড় জলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া এই ঘরে, জানবে, একটা লোক কিছুদিন পাগলামি করে বেসামাল হয়ে পালিয়েছে।

কিন্তু ঘটল অন্য ঘটনা।

ঝড়-জল থেমে গেল রাতেই। পরদিন ভোরের আলো ফুটতে ঘর থেকে বেরোল রাত জাগা শিরীষ। মেঘমুক্ত, ঝকঝকে নীল আকাশ। কে বলবে কাল সারারাত ভয়ংকর দুর্যোগ হয়েছে? পুব দিক থেকে সূর্য মুখ বাড়িয়েছে। সোনালি আলোতে রুক্ষ মাঠ ভেসে যাচ্ছে দিগন্ত পর্যন্ত। এই সময়ে এক ধরনের হ্যালুসিনেশন হল শিরীষের। মনে হল, পাকা ধানে তার ক্ষেত ভরে গিয়েছে। রাতের বৃষ্টিতে স্নান করে তারা ঝলমলে, খুশি। হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে হাসছে। ফিসফিস করে কথা বলছে— "কেমন আছেন শিরীষবাবু? রাতে ঘুম কেমন হল?"

মন ভরে গেল শিরীষের। সে স্বপ্নকে যেন চোখের সামনে দেখতে পেল। তার আর কলকাতায় ফেরা হল না। হাঁটু পর্যন্ত গামবুট পরে আলপথে ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগল সে। কাজ অনেক। ট্রাক্টরের মালিককে খবর দিতে হবে। মাটিতে জল পড়েছে। বাতানোর কাজ সহজ হবে। মাটিতে নাইট্রোজেন বাড়াতে ধনঞ্চা গাছের বীজ ছড়াতে হবে। হারান বলেছে, মাস খানেক, মাসদেড়েকে এই ঘাস হাতখানেক বড় হবে। তখন ওই গাছ সমেত জমিতে ফাল চাষ দিত হবে। ধনঞ্চা গাছের শিকড়বাকড়, পাতা জমির জন্য উপকারী। রুক্ষ পতিত জমিতে ফসল ফলানো কি সহজ কথা? অনেক ধৈর্য, অনেক পরিশ্রম লাগে। এরপর রোটার দিয়ে মাটিকে দলাই মলাই করা লাগবে। মাটি হবে ঝুরোঝুরো। এরপর জৈব সার আর জল। এই জল পেয়ে জমি হবে কাদা-কাদা। গ্রামের মানুষ বলে, 'ভেকসা কাদা'। কাজ কি কম হল? কাদায় মাখামাখি হয়ে গাড়ির কাছে যায় শিরীষ। জমির গায়ে একটা বুড়ো অশ্বথ গাছের নীচে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করেছিল সে। রাতের ঝড়ে গাড়ির উপর ডাল ভেঙে পড়েছে। তবে ক্ষতি কিছু হয়নি। ছোটখাটো ডাল। সেসব সরিয়ে শিরীষ গাড়ি স্টার্ট করেছিল সবেরগঞ্জের দিকে। এখনই ট্রাক্টর ভাড়া করতে হবে।

সাঁকোটা গিয়েছে একটা খালের ওপর দিয়ে। খালটা বাঁদিকে খানিকটা গিয়ে দুম করে মিলিয়ে গিয়েছে। আসলে বাঁক নিয়েছে। গোটা বর্ষাকাল কেটে যাওয়ার পরও খালে জল নেই তেমন। যেটুকু আছে আহামরি কিছু নয়। বাঁশের সাঁকোতেই যখন পারাপার চলে, খালের অবস্থা কতটা শোচনীয় বোঝা যায়। এমনটা হওয়ার কথা নয়। বর্ষার পর খাল বিল ভরে থাকে। এটাও একটা আশ্চর্য ঘটনা। দু'পাড়ে বড়-বড় ঘাসের জঙ্গল। একজন বুড়োমানুষ সাঁকোর কাছে বসে রয়েছেন উবু হয়ে। ধুতি ধরনের একটা কাপড় লুঙ্গির মতো করে পরা। গায়ে ফতুয়া গেঞ্জি। মানুষটা জলের দিকে তাকিয়ে আছেন। শিরীষ গুটিগুটি পায়ে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

"কর্তা, এই খালের নাম কী?"

বুড়োমানুষ মুখ ফেরালেন। এক মুখ দাড়ি। বিড়ি খাচ্ছেন। তার ঘাড় ফেরানোর ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, শিরীষের ডাকে বিরক্ত হয়েছেন। কোনও কিছু মন দিয়ে দেখছিলেন, তাতে ব্যাঘাত পড়ল।

শিরীষ আবার বলল, "খালের নাম কী?"

বুড়োমানুষ গম্ভীর মুখে বললেন, "এইডা খাল নয়, এইডা নদী।"

শিরীষ অবাক হয়ে বলল, "নদী! এইটুকু নদী!"

বুড়োমানুষ আরও বিরক্ত নিয়ে বললেন, "কেন? নদী এইটুকু হলে আপনার অসুবিধা আছে? নদী বড় হইলে, আপনি কী করতেন? জাহাজ চালাতেন?"

রাগের কথা শুনে শিরীষের বেশ মজা লাগল। এই ছ'মাসে সে জেনেছে, গ্রামের মানুষের রাগ, ভালবাসার, দুঃখের মধ্যে কোনও প্যাঁচ-পয়জার নেই। তাতে আবার অনেক সময় স্নেহের ধমকও থাকে। আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল শিরীষ। খানিকটা নিচু গলায় বলল, "কর্তা, আমি কি হেঁটে পার হতে পারব?"

বুড়োমানুষ মুখ ফিরিয়ে নিতে-নিতে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, "আপনার হাঁটা আপনি বোঝেন, আমি বলব কেন?"

"সাঁকো ভেঙে পড়বে না তো?"

বুড়োমানুষ এই কথার জবাব না দিয়ে একই ভাবে জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শিরীষের খুব ভাল লাগল। মনে হল, ছবি সাঁকোর পাশে একজন ছবি মানুষ বসে রয়েছেন। জীবন সম্পর্কে নির্মোহ একজন মানুষ।

কালো আকাশ নেমে এসে মাটিতে ঠোঁট ছুঁইয়েছে। এতক্ষণে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। কেন অপেক্ষা করছে কে জানে। বয়স্ক মানুষটি এবার শীর্ণ নদীর পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। শিরীষ বুঝতে পারছে, আবার কথা বলতে গেলে আরও রেগে যাবেন। তারপরেও সে বলল। রাগলে রাগুক।

"এই নদীর নাম কী?"

আশ্চর্যের বিষয় হল এবার আর মানুষটি রাগলেন না। মুখ নামিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "নাওডুবি।"

শিরীষ অস্ফুটে বলল, "নাওডুবি! গ্রামের নাম?"

মানুষটা একইরকম আনমনে বললেন, "হ্যাঁ, এই নদীর নামেই গ্রামের নাম, নাওডুবি। একসময়ে নদীর জোর ছিল। এখন মজে গিয়েছে। খালের মতো চেহারা হয়েছে। বৃষ্টির জলও ধরে রাখতে পারে না।"

কথা শেষ করে মানুষটা উঠে দাঁড়ান। শিরীষ এবার দেখতে পেল, সঙ্গে একটা ছাতাও রয়েছে। কাঠের হাতের লম্বা ছাতা।

"কর্তা, আপনি থাকেন কতদূর?"

ছাতা খুলতে-খুলতে বুড়োমানুষ আবার বিরক্ত গলায় বললেন, "আপনার দরকার কী? ঘাড়ে করে পৌঁছে দিবেন?"

শিরীষ একটু হেসে বলল, "না, বৃষ্টি নামবে তো..."

ছাতা খুলে মানুষটা মাঠ ধরে এগিয়ে গেল। শিরীষ সাঁকোর দিকে এগিয়ে গেল।

নাওডুবিতে এসে শিরীষ জানতে পেরেছিল, জমি রেজিস্ট্রি অফিসে, স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসে দেখা করে, কথা বলে সব পাকা করে গিয়েছেন। কী আশ্চর্য! মানুষ হারিয়ে যায়, ভালোবাসার চিহ্ন ফেলে ফেলে যেতে থাকে।

শিরীষ সাঁকোর উপরে উঠল। দেখে যতটা মনে হয়েছিল, উঠে বোঝা যাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি নড়বড়ে। নাকি বাতাসের জোর বেড়েছে বলে কাঁপছে? নদীর উপর সাঁকো! ভাবতেই অবাক লাগছে। কতটা হেঁটে এসেছে? একঘন্টা? নাকি আরও বেশি? এখনও গজ, ফুট, মিটারের ধারণা খুব স্পষ্ট হয়নি শিরীষের। হওয়া উচিত ছিল। ছ'মাস হয়ে গেল জমিতে কাজ করছে। মাপামাপির ধারণা থাকবে

না। যদিও সবটা হারান আর রতনকাকা দেখে। হারান থাকে নাওডুবি গ্রামে। রতনকাকা আসে সবেরগঞ্জ থেকে। হারাণের বয়স চল্লিশের কম। নফরকাকারও বয়স বেশি নয়, তারপরেও সবাই 'কাকা' ডাকে। দু'জনেই চাষবাসে এক্সপার্ট। তবে নিজের জমি নেই, অন্যের জমিতে কাজ করে। হারাণের পরামর্শ মতো জমির পাশে পাকা ঘর তোলা হয়েছে। দেড়খানা ঘর। বড়টায় শিরীষের, আর ছোটটা গেস্টরুমের মতো। আর কেউ যদি এসে থাকে। হারান, রতনকাকা তো কাজ করতে-করতে কোনওদিন আটকে যেতে পারে। ছোট ঘরটায় যেতে গেলে বাগান পেরিয়ে যেতে হয়। বাড়ির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পথ নেই। ইচ্ছে করেই রাখেনি শিরীষ, আর কেউ থাকলে, নিজের মতো আড়ালে থাকতে পারবে। এই দুই ঘরের ছাদটুকু যা ঢালাই করা, বাকি সব টিনের চালা। দুটো ঘরের সঙ্গে বাথরুম, ছোট একটা রান্নার জায়গা, একফালি বারান্দা। পিছনের উঠোনে শেডের নীচে চাষের জিনিসপত্র থাকে। কুয়ো খুঁড়তে হয়েছে, একটা টিউবওয়েলও বসাতে হয়েছে। এই দুটোতে সময়,খরচ দুই-ই বেশি হয়েছে। এখানে জল পেতে গেলে মাটির অনেকটা গভীরে যেতে হয়।

বাড়ির চারপাশে বেড়া দিয়ে, সামনে একটুখানি সবজির বাগান করে দিয়েছে রতনকাকা। শাক, লেবু, লঙ্কা। ছোট একটা মাচা করে কুমড়ো। বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে থাকা যায়। দিগন্ত পর্যন্ত ক্ষেত, মাঠ, আকাশ মিলেমিশে, জড়িয়ে মড়িয়ে থাকে। হারান আর রতনকাকা বেশিরভাগ সময়েই দিনে-দিনে কাজ করে চলে যায়। হারাণের সাইকেল আছে, রতনকাকা বড় রাস্তা পর্যন্ত চলে যায়, তারপর সবেরগঞ্জ যাওয়ার জন্য ভ্যান বা ট্রাক্টর ধরে। আর যদি রাতে থাকতেই হয়, ভাগাভাগি করে থাকে। শিরীষও কলকাতা থেকে এসে এখানেই ওঠে। প্রথমে থাকত উইকেন্ডে। তারপর সপ্তাহে তিনদিন। চাকরি ছাড়ার পর কখনও-কখনও টানা পনেরো-কুড়িদিন পর্যন্ত থেকে যায়।

এবার একমাস হতে চলল, ফেরা হয়নি। বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকে সামনের ক্ষেতের দিকে। এক একটা করে পর্ব দেখতে পায়। খুব আনন্দ হয়। মনে হয়, স্বপ্ন দেখছে। মাঝেমধ্যে অবাকও লাগে। দাদু তাকে কেন বেছে গেলেন? চোখ দেখে মনে হয়েছিল, বালকটি অন্যরকম? নাকি ভরসা করেছিলেন? যদি পারে, এ-ই পারবে। জিন তো রয়ে গিয়েছে। নাকি নিজের মনের মধ্যেই কোথাও এই ক্ষ্যাপামি লুকিয়ে ছিল? দাদুর স্বপ্ন তাকে খুঁচিয়ে দিল। এটাই বোধহয় সত্যি। অনেককিছু ভাল লাগছিল না। সেই কবে চাকরি শুরু করেছে! কেরিয়ারের দৌড় ক্লান্ত, অবসন্ন করে তুলছিল। স্কুলে পড়বার সময় ভাবত, শুধুই ছবি আঁকবে, আর্টিস্ট হবে। কলেজে উঠে কবিতা লিখতে শুরু করেছিল, বইমেলায় লিটল ম্যাগাজিন করল। ম্যাগাজিনের নাম ছিল, আঁখি। নাটকের দল করে অভিনয় করল। মাঝেমধ্যে হুটপাট করে বেড়িয়ে পড়ত একা। বাস থেকে নেমে পড়ত হাইওয়ের মাঝখানে। এই চাষবাসের জীবন কি সেই রোমান্টিক মননের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে ছিল?

বাঁশের সাঁকোর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল শিরীষ। ঝড় উঠেছে। এতক্ষণ থম মেরে থাকা কালো মেঘ ভেঙে টুকরো হয়ে ছুট লাগিয়েছে চারপাশে। সেই কলেজ জীবনে লেখা একটা কবিতার দুটো লাইন মাথায় ভেসে আসছে। আবার মিলিয়েও যাচ্ছে। শিরীষ বিড়বিড় করে বলে উঠল।

"তোমার সঙ্গে পণ রেখেছি ঝড়/ কে আগে বলবে, কে আগে..."

মনে পড়ছে না। বাকিটা মনে পড়ছে না। কতদিন পরে মাথায় কবিতা ফিরে এল!

বাতাস দিচ্ছে। ঝড় উঠবে নাকি? শিরীষ আরও এগিয়ে গেল।

বাতাস এবং বৃষ্টিতে বাঁশের সাঁকো দুলছে। শিরীষ ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল আর তখনই মনে পড়ে গেল কবিতার ভুলে যাওয়া লাইনগুলো। অস্ফুটে শিরীষ বলে উঠল, "তোমার সঙ্গে পণ রেখেছি ঝড়/ কে আগে বলবে, কে আগে ছিঁড়বে চরাচর।"

শিরীষের আনন্দ হচ্ছে, আবার দুঃখও হচ্ছে। আনন্দ হচ্ছে এই কারণে যে, কতদিন আগে ফেলে আসা কবিতা আবার তার কাছে ফিরে এসেছে। প্রয়াত দাদু, হারিয়ে যাওয়া বড়মামাকে মনে-মনে ধন্যবাদ জানাল শিরীষ। তাঁরা না থাকলে এই মুহূর্ত তো আসত না। তারপরেও দুঃখ হচ্ছে। প্রিয় মানুষরা এই কবিতা শোনার জন্য তার পাশে নেই। সোমদত্তা নেই, দোতারা নেই। এই সময়ে নারীকণ্ঠের চিৎকারে মুখ তুলল শিরীষ।

"স্যার, আপনি দাঁড়ান, আমি আপনার কাছে যাচ্ছি। আমি ছাতা এনেছি স্যার...আর এগোবেন না...পড়ে যাবেন স্যার...প্লিজ় স্যার..."

একটা ছাতা মাথায় সাঁকোর দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে অতিরিক্ত ছিপছিপে এক তরুণী। পারলে ছুটে আসছে। জিনস এবং শার্টের ওপর কোট মতো কিছু পরেছে। বৃষ্টি ও অন্ধকারে কোনওটার রংই চেনা যাচ্ছে, না। তবে মেয়েটিকে চেনা যাচ্ছে। মেয়েটির নাম ত্রপা। ত্রপা বসু। বাড়ি কলকাতায়, কৃষি নিয়ে লেখাপড়া করেছে কল্যাণীতে। এখন গবেষণার জন্য থাকে বোলপুরে। মাস্টার ডিগ্রি করে এখন গবেষণায় ব্যস্ত। সেই গবেষণার একটা অংশ হিসেবে সে শিরীষ মুখার্জির 'প্রজেক্ট নাওডুবি' নিয়েছে। এরকম ঘটনা বিদেশে ঘটলেও, এদেশে নাকি বিরল। শহরের বিলাসী, স্বচ্ছন্দ, নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে উচ্চশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত কেউ গ্রামে চাষবাস করতে চলে এসেছে, এমনটা কখনও শোনা যায়নি। তার গবেষণার গাইড একজন কৃষি বিজ্ঞানী। তিনি সব শুনে উত্তেজিত।

"ত্রপা, তুমি এই পাগল লোকটাকে ছাড়বে না। তার সঙ্গে লেগে থাকবে। কীভাবে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে যাচ্ছে এবং ব্যর্থ হচ্ছে, সেটা স্টাডি করবে। পারলে ওর মনের ভিতর ঢুকতে চেষ্টা করবে। এই প্রজেক্টের পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে কিনা জানার চেষ্টা করবে। অনেক সময় পলিটিক্যাল লোকেরা গ্রামে ঢোকার জন্য এই ধরনের আড়াল তৈরি করে। যদিও এই লোকের সাইটে গিয়ে যে প্রোফাইল দেখছি, তাতে সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না। যাই হোক, ত্রপা মনে রাখবে, তুমি একটা দারুণ সুযোগ পেয়েছ। ঠিকমতো ধরতে পারলে, ভবিষ্যতে খুব কাজে লাগবে। বলা যায় না, এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্সে একটা উদাহরণ হয়ে থেকে যেতে পারে। এই লোক কিন্তু বেশিদিন ক্ষেতে-মাঠে থাকতে পারবে না। নানারকম চাপ আসবে। ফ্যামিলির কথা জানবে। নেক্সট ফেজ়ে বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলবে। তারা এই ঘটনা কেমন ভাবে নিয়েছে জানতে হবে। এই লোক কিন্তু পালিয়ে যাবে। ফিল্ড ওয়র্ক হিসেবে সবটাই তোমাকে রিসার্চ পেপারে সেটাই তুলে ধরতে হবে।"

ত্রপার বয়স পঁচিশ। দু'-তিন মাস কম বেশি হতে পারে। সেই অর্থে সে দোতারার চেয়ে সামান্য কয়েকবছরের বড়। রোগা হলেও মেয়েটি বেশ সুন্দরী। গায়ের রং ফর্সা। চোখে একধরনের মায়াভাব। কথা শুনলে বোঝা যায়, নরম প্রকৃতির। হাসি ও কান্না দু'টিই সরল। ছোট করে কাটা চুলের এই মেয়েটির সঙ্গে শিরীষের আলাপ হয় এক কৃষিমেলায়। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির কৃষি বিভাগ থেকে ক্যাম্প করা হয়েছিল। ওরকমই একটা ক্যাম্পে ছিল ত্রপা। তখন শিরীষের নাওডুবি প্রজেক্ট একেবারে গোড়ার সময়। সে তখন এই ধরনের বিভিন্ন মেলা, সেমিনারে ঘুরে বেড়াত। জিনিসটা বুঝতে চেষ্টা করত। ত্রপা সেদিন মেলায় ধান চাষের পদ্ধতি নিয়ে কথা বলছিল। কেউই শুনছিল না। দু'-তিনজন ছিল, তারাও একসময়ে সরে যায়। শিরীষ গোটাটা মন দিয়ে শোনে। শেষে কথা বলে।

"আমি নিজে এই ধরনের একটা কাজ করতে চলেছি। আপনার সঙ্গে আরও একটু কথা বলতে পারি?"

শিরীষের পোশাক, কথা বলার ভঙ্গি দেখে থমকে যায় ত্রপা। আদ্যোপান্ত শহুরে এই মানুষটা কি তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে? তাই হবে। সে কড়া গলায় উত্তর দেয়।

"স্যার, আপনি ভুল করছেন। আমি কৃষি কাজের জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।"

শিরীষ বলল, "আমি জানি, সেই কারণেই আমি কথা বলতে চাই। আপনার যদি অসুবিধে হয় আপনি অন্য কাউকেও ডেকে দিতে পারেন। তার সঙ্গে কথা বলব।"

প্রেস্টিজে লাগে ত্রপার। শিরীষের ব্যক্তিত্বের কাছে থমকে যায়। সে বলে, "আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন স্যার।"

শিরীষ বলল, "আমি কি একটু বসতে পারি?"

"অবশ্যই।"

সেই শুরু আলাপের। শিরীষের নাওডুবি প্রজেক্টের কথা শুনে সে মুগ্ধ হয়। সে তার রিসার্চ গাউডকে বিস্তারিত জানায়। পঁচিশ বছরের এই তরুণী গবেষনার কাজ হিসেবে প্রায় পঞ্চাশ বছরের এই মানুষটির সান্নিধ্যে এলেও খুব অল্পদিনের মধ্যেই তার মনে হতে শুরু করছে, এই মানুষটি আলাদা। এর কাছে থাকলে তার মন ভাল লাগে। মানুষটি তাকে মাঝেমধ্যে বকুনি দেন। কেন সে বারবার আসে, এই কারণে। সেই বকুনি বেশ জোরেই দেন। চোখে জল চলে আসে। সে চলে যায়। কিন্তু দু'দিন পরে মন কেমন করে। নাওডুবিতে চলে আসে আবার। তখন মানুষটা আবার বকুনি দেন। কারণ সম্পূর্ণ উলটো, কেন এতদিন আসেনি!

সেতুর উপর থেকে ত্রপাকে দেখে শিরীষ খুশি হল আবার রাগও করল। এই দুর্যোগেও মেয়েটি কেন এসেছে? শিরীষ নিজেকে সামলাল। এখন এসব ভাবনার সময় নয়। এখন দুটো লাইন মাথার মধ্যে ঘুরুক—

"তোমার সঙ্গে পণ রেখেছি ঝড়/ কে আগে বলবে, কে আগে ছিঁড়বে চরাচর।"

॥ ৮ ॥

মৈত্রেয়র ফোন রেখে চুপ করে রইল সোমদত্তা।

মৈত্রেয় এ বাড়িতে আসতে চাইছে। সোমদত্তা বলেছে, "না না। মা আছেন। দোতারা আসতে পারে। যে মেয়েটা মাকে দেখাশোনা করে, সেও থাকে।"

মৈত্রেয় বলেছিল, "তাতে কী? এখনও আসতে পারি না!"

সোমদত্তা চুপ করে ছিল। বলল, "পরে বলব।"

মৈত্রেয় সহজভাবে বলেছিল, "বলার কী আছে? নেমন্তন্ন খেতে তো যাব না। তা ছাড়া একটা জরুরি কথা ছিল।"

"টেলিফোনে বলো।"

"এভাবে বলা যায় না। সামনে বসে বলতে হবে। তোমার দেওয়া দায়িত্ব খানিকটা পালন করতে পেরেছি মনে হচ্ছে।"

সোমদত্তা উৎসাহ নিয়ে বলল, "বলো।"

মৈত্রেয় বলল, "বললাম তো এভাবে হবে না।"

সোমদত্তা বলল, "বাইরে দেখা করছি। আজই।"

মৈত্রেয় বলল, "সে তোমার ইচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি কথা হয় তত মঙ্গল। অ্যাকশন নিতে সুবিধে হবে। নাওডুবির দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলেছি।"

সোমদত্তা বলল, "ভেরি গুড। কী বলল তারা?"

মৈত্রেয় বিরক্ত গলায় বলল, "বলছি তো টেলিফোনে বলব না। তোমার বাড়িতে যেতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এত বছর পর নিষেধাজ্ঞা উঠেছে। এখন দেখছি, ওঠেনি। শুধু কাজটুকুর জন্য আমাকে তোমার দরকার।"

সোমদত্তা নিচু গলায় বলল, "রাগ করছ কেন? বললাম তো, মাকে যে দেখাশোনা করে সে চলে আসতে পারে, দোতারা আসতে পারে..."

মৈত্রেয় বলল, "তাতে কী হত? তোমার মেয়ে এলেই বা কী এসে যায়? তুমি বা আমি কেউ চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগে পড়ে নেই। একসময়ে এ বাড়িতে আমি অনেকবার এসেছি। তোমার বিয়ের আগে পর্যন্ত।"

সোমদত্তা একটু চুপ করে বলল, "বলছি তো রাগ কোরো না।"

মৈত্রেয় একটু হেসে বলল, "এত বছর বাদে আর নতুন করে কী রাগ করব সোমদত্তা? রাগ, অপমান কি এতদিন ধরে অবশিষ্ট থাকে? মানুষ চিনতে ভুল করেছিলে। আজ তো বুঝতে পারছ, কত বড় ভুল তোমরা করেছিলে। সেদিন তোমার বাবা, আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি নাকি তোমার স্বামী হিসেবে মানানসই নই। তোমাকে বিয়ে করার যোগ্যতা আমার নাকি ছিল না। বলেছিলেন, ওরা কোনও ছোটখাটো ব্যবসায়ীর হাতে মেয়েকে তুলে দেবেন না। আমার কাজ খুবই নিচু মানের। জেনেছিলাম, শিক্ষিত মানুষরা কাজের উঁচু-নিচু বিচার করে না। ভুল জানতাম।"

সোমদত্তা বলল, 'আহ! এসব কথা এখন আবার টেনে আনছ কেন?"

মৈত্রেয় নিজেকে সামলাল। বলল, "আমি তো টানিনি, তুমি টানলে। তোমার বিপদে কোনও বন্ধু পাশে এসে দাঁড়াতে পারে না? আমি তো সব অপমান ভুলেই ছুটে এসেছি। কিছু পাওয়ার জন্য তো আসিনি।"

সোমদত্তা নরম গলায় বলল, "ঠিক আছে বাদ দাও ওসব।"

সত্যি এক সময়ে বেশিই বন্ধু ছিল দু'জনে। কলেজ জীবনের শেষদিকে। তবে তাকে 'প্রেম' বলে ভাবেনি সোমদত্তা, ঘনিষ্ঠ পরিচিতজন হিসেবেই দেখেছিল। এই পর্যায়টি চলে দীর্ঘ দিন। তখন বাড়িতেও এসেছে মৈত্রেয়। সোমদত্তা ইউনিভার্সিটি পাশ করে। আরও ডিগ্রি নিয়ে ভাল চাকরি পায়। মৈত্রেয়র লেখাপড়ায় মন ছিল না। যেটুকু না করলে নয়, সেটুকু। কলেজ পাশ করে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দেয়। তবে সোমদত্তাকে সাহায্য করত খুব। সে অর্ডার করলেই বই, নোটস, সাজেশন নিয়ে হাজির হত। তার একটা সেকেন্ডহ্যান্ড স্কুটার ছিল। ডাকলে বিরক্তি দেখাত, তবে দেরি করত না। সোমদত্তার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে পরীক্ষার ফর্মও জমা দিয়েছে। পরীক্ষার হলে নিয়ে গেছে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে। চাকরি খোঁজার সময়েও সোমদত্তা তাকে খুব খাটিয়েছে। এসবের পিছনে অতিরিক্ত কোনও সম্পর্ক তৈরি হচ্ছিল বলে কখনও মনে হয়নি তার। ভাবার সময়ও ছিল না। সে তখন নিজের কেরিয়ার তৈরিতে পুরো মন দিয়ে বসে রয়েছে। আর পাঁচজনের মতো সাধারণ মন নয়, বাড়াবাড়ি ধরনের মন। বড় চাকরি করব, বাড়ি-গাড়ি হবে। মৈত্রেয় মাঝেমধ্যে ঠাট্টা করত। একটা পর্যায়ের পর সোমদত্তা রেগে যেত।

"তোমার পিছনে এত সময় ইনভেস্ট করছি কেন জানো সোমদত্তা?"

সোমদত্তা সহজভাবে বলত, "তোমার কোনও কাজ নেই। বেকারদের কারও পিছনে সময় নষ্ট করতে হয়। তাও ভাল, তুমি একজন সুন্দরীর পিছনে সময় নষ্ট করছ।"

মৈত্রেয় হেসে বলত, "একবারেই নয়। ফিউচারে রিটার্ন পাব বলে।"

সোমদত্তা বলত, "কেমন রিটার্ন? টাকা পয়সা চাইবে নাকি? তাহলে বাপু মানে মানে কেটে পড়ো। দেখেছই তো আমার হাত দিয়ে সহজে টাকা পয়সা বেরতে চায় না।"

মৈত্রেয় বলত, "না টাকা পয়সা রিটার্ন নয়, সার্ভিসের বিনিময়ে সার্ভিস দিয়ে।'

সোমদত্তা ভুরু কুঁচকে বলত, "সেটা কেমন?"

মৈত্রেয় একটু ভেবে বলত, "এই ধরো বলব, চা করে দাও, ভাত করে দাও, স্নানের জল গরম করো..."

সোমদত্তা বলত, "মানে! হোয়াট ডু ইউ মিন মৈত্রেয়?"

মৈত্রেয় মুচকি হেসে বলত, "বাঃ! পতিসেবা বলে একটা কথা আছে না?"

সোমদত্তা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলত, "আমি কি পতির স্নানের জল গরম করবার জন্য লেখাপড়া শিখেছি! ভাল জবের চেষ্টা করছি!"

মৈত্রেয় সামলাতে গিয়ে বলত, "আহা, রাগছ কেন? ঠাট্টা করলাম।"

সোমদত্তা গম্ভীর হয়ে বলত, "এই ধরনের ঠাট্টা আমি পছন্দ করি

না মৈত্রেয়। দুটো বইপত্র ক্যারি করবার বদলে তুমি যদি মনে কর এই ধরনের চিপ ঠাট্টা করবে, আমি অ্যালাউ করব না। তাহলে তো ক্যুরিয়র সার্ভিসকে ঠাট্টা রসিকতার পারমিশন দিতে হয়।"

মৈত্রেয় বলত, "আচ্ছা আর করব না।"

পরে আবার করত। দুম করে হয়তো একদিন বলত, "সোমদত্তা, এই যে তোমার জন্য এত দৌড়াদৌড়ি করি, মনে রাখবে তো?"

সোমদত্তা ভুরু কুঁচকে বলত, "কেমন মনে রাখা চাও?"

মৈত্রেয় বলত, "ভেরি সিম্পল। তুমিও একদিন আমার জন্য দৌড়বে।"

"দৌড়তে পারব না। নিজের গাড়ি তো হবেই, তাতে লিফট দিতে পারব।"

একসময় মৈত্রেয় ব্যবসা শুরু করল। নানারকম ব্যবসা। সবই ছোটখাটো। তেমন জমল না। একসময় নামীদামি মেশিনের পার্টস বিক্রি করত। তাই নিয়ে ঝামেলাও হল। নকল জিনিসের কারবার করছে, এই অভিযোগে পুলিশের ঝামেলা। টাকাপয়সা দিয়ে কোনওক্রমে অ্যারেস্ট আটকাল। সোমদত্তার বাবা সেই সময় কিছুটা সাহায্য করেছিলেন। লালবাজারের ফ্রড সেকশনে তার এক বন্ধু কাজ করতেন। তাঁকে বলেছিলেন। তারপর থেকে সোমদত্তার সঙ্গে যোগাযোগ কমে যায়। ততদিনে সোমদত্তা চাকরিতে মন দিয়েছে। এমনকী, মুম্বইতে একটি কোম্পানিতে কিছুদিন কাজ করে এসেছে। কলকাতায় আসার পর আবার ফোন এল। মৈত্রেয়ই করল।

"কলকাতায় ফিরে এলে কেন?"

সোমদত্তা অবাক হল, "ফিরে এসেছি, সে খবর কোথা থেকে পেলে!"

মৈত্রেয় গলায় অভিমান নিয়ে বলল, "তুমি আমার খবর না রাখলেও আমি তোমার খবর রাখি।"

সোমদত্তা প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলল, "ভালই হল তুমি ফোন করেছ। বেটার অফার পেয়ে চলে এসেছি। তবে এখানে এসে আবার ঠিকানা বদলের ঝামেলায় পড়েছি। ভেবেছিলাম বাইরেই পাকাপাকি থাকব। সেই মতো কতগুলো ডকুমেন্ট বদলে নিয়েছিলাম। আবার পড়েছি ঝামেলায়। মৈত্রেয়, তুমি অবশ্যই একটু এসো। ছোটাছুটি করতে হবে। দেরি কোরো না, শনিবারই এসো।"

মৈত্রেয় শান্তভাবে বলল, "শনিবার তো আমি থাকব না।"

"তাহলে নেক্সট উইক করো। তার বেশি দেরি কোরো না। কাজটা আটতে যাবে।"

মৈত্রেয় ফোনেই ব্যঙ্গের হেসে বলল, "আমার জন্য তোমার কোন কাজটা আটকে আছে সোমদত্তা? সব হয়ে যাবে। এই যদি আমি ফোন না করতাম, তোমার ঝামেলা কি মিটত না?"

এবার সোমদত্তা হেসে বলল, "আচ্ছা বাপু, অনেক রাগ দেখানো হয়েছে। এবার বলো দেখি কবে আসছ? এই সব ঝামেলা না মিটলে মুশকিল। ক'দিন পর লন্ডন যাব। কোম্পানি তিনমাসের জন্য ট্রেনিংয়ে পাঠাচ্ছে। প্রপার ডকুমেনটেশন ছাড়া ভিসা পেতে অসুবিধে হবে বলেছে।"

মৈত্রেয় আবার হেসে বলল, "হাসিও না সোমদত্তা। এমন ভান করছ, আমি না থাকলে তোমার লন্ডন যাওয়া হবে না। এসব কাজ করার জন্য অনেক এজেন্ট আছে। তাদের বলো, সব স্মুদলি হয়ে যাবে।"

সোমদত্তা বলল, "তুমিই আমার এজেন্ট। বাবা! এতদিন বাদে ফোন করে, এত রাগ দেখাচ্ছ কেন?"

একটু চুপ থেকে মৈত্রেয় বলেছিল, "কোনও কারণ নেই। এমনি দেখাচ্ছি।"

সেদিন টেলিফোন ছাড়ার পর সোমদত্তার বুঝতে পারল, সে একটা অন্যায় করে ফেলেছে। নিজের কথা বলল, মৈত্রেয়র কথা কিছু জিজ্ঞেস করা হল না। সে কেমন আছে? কী করছে? ব্যবসার সমস্যা কি মিটেছে? ওর মা খুব অসুস্থ ছিলেন। তিনি ঠিকঠাক আছেন তো? সোমদত্তার নিজের উপর রাগ হয়েছিল। ছিঃ! এটা কী করল! নিজেকে নিয়ে, নিজের কেরিয়ার নিয়ে এত মেতে উঠেছে যে, সামান্য ভদ্রতাটুকুও ভুলতে বসেছে! একবার ভাবল, এখনই আবার ফোন করে। পরক্ষণেই মনে হল, সেটা আরও খারাপ হবে। যা ভুল করবার করে ফেলেছে। পরে 'সরি' বলে নিতে হবে। খানিকটা সময় গেলে, নিজের সপক্ষে মনে-মনে যুক্তি সাজিয়ে নিল সোমদত্তা। মৈত্রেয়র বোঝা উচিত, এরকম হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এখন তার কেরিয়ার গড়ার সময়। সবসময়েই চাপা টেনশন। একটা অফিস ছেড়ে অন্য অফিসে এসেছে। সেখানে নিজেকে মানানসই এবং গুরুত্বপূর্ণ করতে হবে। এই সময় সাধরণ ফর্মালিটিজ় মাথায় নাও থাকতে পারে। গোটা জীবন ধরেই, 'তুমি কেমন আছ? বাড়ির সবাই কেমন আছে?' ধরনের কথা বলা যায়, কিন্তু সারা জীবন ধরে কেরিয়ার তৈরি করা যায় না। মৈত্রেয় নিশ্চয়ই বুঝবে। এতে রাগ বা অপমানের কিছু নেই।

আসব না বলেও শনিবার মৈত্রেয় চলে এসেছিল। সঙ্গে সেই আগের স্কুটার। এতদিনে স্কুটারের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। ফাইল হাতে বেরিয়ে সোমদত্তা থমকে গেল। এরকম একটা লড়ঝড়ে গাড়িতে বসে যাওয়া ঠিক হবে না। তার চেয়ে বড় কথা, স্কুটারের পিছনে বসে একটা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কলকাতার পথে ঘোরার মতো অবস্থা তার আর নেই। ছেলে যতই তার পরিচিত হোক। সে এখন কলেজে পড়ে না। অফিসের কেউ যদি দেখে ফেলে, সেটা তার পক্ষে ভাল হবে না।

"মৈত্রেয়, ট্যাক্সিতে যাব। তোমার গাড়ি এখানে রেখে দাও। ফিরে নিয়ে যাবে।"

মৈত্রেয় হেসে বলল, "ভয় নেই, পথে ভেঙে পড়বে না।"

সোমদত্তা বলল, "তা নয়, কোমরে একটা ব্যথা হয়েছে। স্কুটারের ঝাঁকুনিতে সমস্যা হতে পারে।"

মৈত্রেয় বলল, "সাবধানে চালাব।"

সোমদত্তা হালকা বিরক্তি নিয়ে বলল, "তুমি সাবধানে থাকলে কী হবে, কলকাতার রাস্তা তো আর সাবধানে থাকবে না। একবার লেগে গেলে আমাকে বিছানা নিতে হবে।"

মৈত্রেয় কথা বাড়ায়নি। স্কুটার সোমদত্তাদের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর ট্যাক্সি ডেকে নেওয়া হয়েছিল। তখনও কলকাতায় মোবাইলে ক্যাব ডেকে নেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়নি। দোতলার বারান্দা থেতে গোটা ঘটনাটা সেদিন দেখেছিলেন সোমদত্তার বাবা সৌমেন্দু সেন। মৈত্রেয়কে দেখার পর থেকেই তাঁর ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। স্কুটার রেখে, ট্যাক্সিতে মেয়ের সঙ্গে মৈত্রেয় উঠে যাওয়ায় সেই কোঁচকানো ভুরু আরও গভীর হল।

কাজ শেষ হতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। মৈত্রেয় বলেছিল, "চল কফিহাউসে বসে কফি খাই।"

সোমদত্তা বলেছিল, "না কফিহাউস নয়, বড্ড চেঁচামেচি হয়। আজকাল এত হট্টগোল স্ট্যান্ড করতে পারি না। অন্য কোথাও চলো।"

গলির মধ্যে একটা রেস্তোরাঁয় বসেছিল দু'জনে। কোণের টেবিলে। সোমদত্তা বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি না। চিরকাল আমার কাগজপত্র ঠিকঠাক করে দিয়ে ব্যাড হ্যাবিট তৈরি করে দিয়েছ। মুম্বইতে খুব সমস্যায় পড়তাম।"

মৈত্রেয় একটু চুপ করে থেকে বলল, "তুমি বদলে গেছ সোমদত্তা।"

সোমদত্তা অস্বস্তি নিয়ে হেসে বলল, "সে আবার কী!"

মৈত্রেয় গম্ভীর হয়েই বলল, "তুমি নিজেও তা জানো।"

সোমদত্তা চায়ের কাপ টেনে নিয়ে সহজভাবে বলল, "মানুষ তো বদলায়। সেটাই তো স্বাভাবিক, তাই না? তুমিও কি বদলাওনি মৈত্রেয়? কলেজে তোমাকে যেমন দেখেছি, যেভাবে দেখেছি, তুমি কি তেমনই আছ?"

মৈত্রেয় চায়ের কাপে চামচ নাড়তে-নাড়তে অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "তা হয়তো হবে। তবে সে বদলানোর বেশিটাই বাইরের হয়। তোমার ভিতরটাও বদলেছে।"

সোমদত্তার পরিস্থিতি হালকা করার জন্য বলল, "ভিতরের বদলের নিকুচি করো, সে তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না! বাইরেটা বদলালে বিপদ। আমি আর আগের মতো সুন্দরী নই বলছ?"

মৈত্রেয় এবার একটা কাজ করে বসল। হাত বাড়িয়ে সোমদত্তার ডানহাতটা ধরল। সোমদত্তা এর জন্য তৈরি ছিল না। মৈত্রেয় এর আগেও তার হাত ধরেছে। সেও ধরেছে। হাত কেন কাঁধ, কোমরও ধরেছে। একসময়ে তার স্কুটারে যাতায়াত তো কম করেনি। গাড়ি টাল খেলেই জড়িয়ে ধরতে হয়েছে মৈত্রেয়কে। মৈত্রেয়ও হাত ধরে স্কুটার থেকে নামিয়েছে। কিন্তু এই স্পর্শ সেসবের থেকে আলাদা। বুকটা ধক করে উঠেছিল সোমদত্তার। মৈত্রেয় কি কিছু বলতে চায়? এর আগে তো এরকম আচরণ করেনি! সে কি প্রোপোজ় করছে চাইছে? এই জন্যই কি সে খবর রেখেছে এতদিন?

মৈত্রেয় খানিকটা গাঢ় স্বরে বলল, "আমার কাছে তুমি সবসময়েই সুন্দর সোমদত্তা।"

সোমদত্তা খুব ধীরে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, "তোমার ব্যবসা কেমন চলছে?"

মৈত্রেয় সোমদত্তার ইঙ্গিত বুঝতে পারল। সেও হাত সরিয়ে নিল। বলল, "ওই চলছে। নতুন অফিস তোমার কেমন চলছে?"

সোমদত্তা হেসে বলল, "ওই চলছে।"

বাকি সময়টুকু চুপচাপই চা খেল দু'জনে। বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরার সময় মৈত্রেয় বলল, "তুমি চলে যাও সোমদত্তা। আমি একটা কাজ সেরে যাচ্ছি। রাত হলেও সমস্যা নেই, আমি তোমার বাড়ি গিয়ে স্কুটার নিয়ে আসব।"

সোমদত্তা চাপা গলায় বলল, "ছেলেমানুষি কোরো না। ট্যাক্সিতে ওঠো।"

পথে যেতে-যেতে পাশে বসা মৈত্রেয়র হাত ধরেছিল সোমদত্তা। মৈত্রেয় হাত ছাড়িয়ে নিতে গেলে সোমদত্তা আরও শক্ত করে ধরে। তারপর হেসে বলে, "তুমি দেখছি, এই ক'বছরে অনেক বদলে গেছ মৈত্রেয়। খুব রাগ হয়েছে তোমার, কথায়-কথায় রাগ দেখাচ্ছ। কেন?"

মৈত্রেয় মলিন হেসে বলল, "আমি তোমাকে রাগ দেখানোর কে?"

"ওসব বাজে কথা ছাড়ো। কী হয়েছে তোমার? এত অভিমান কীসের?"

মৈত্রেয় হেসে পরিস্থিতি সহজ করতে চায়। বলে, "ধুর! কীসের আবার অভিমান?"

সোমদত্তা বোঝানোর ভঙ্গিতে বলে, "আরে বাবা, এখন আমাদের নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে ভাবনার সময়। এত দিন ধরে যে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখলাম সেটা তো কাজে লাগাতে হবে। হবে কিনা?"

মৈত্রেয় জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। অস্ফুটে বলল, "তোমার লেখাপড়া আছে, আমার তো নেই।"

সোমদত্তা হাতে চাপ দিয়ে বলল, "ছেলেটা বোকার মতো কথা বলে। তোমার যা আছে সেটাই তোমার লেখাপড়া। তুমি তো নিজের ইচ্ছেতেই ব্যবসা করছ।"

মৈত্রেয় হতাশভাবে বলল, "সেটাই বা দাঁড়াচ্ছে কই?"

সোমদত্তা বলল, "বিজ়নেসে আপস এন্ড ডাউনস থাকবেই।"

মৈত্রেয় বলল, "আমার সবই ডাউন সোমদত্তা। লেখাপড়া, ব্যবসা, জীবন সবই।"

তখন শহরে সন্ধে নামছিল। চারপাশে রং বদলাচ্ছে, বাতাস বদলাচ্ছে। সেই বাতাসে গন্ধ বদলাচ্ছে। প্রকৃতি এই সময়ে মানুষকে নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে। নিজের সঙ্গে মানুষকেও বদলাতে থাকে। কারও মুখে আলো ফেলে, কেউ চলে যায় অন্ধকারে। কাউকে জীবনের ছায়া করে কোমরে দড়ি বেঁধে দেয়। যেন আসামী। পালানোর পথ নেই। কাউকে প্রকৃতি মুক্তও করে। আগল ভেঙে দেয় তার। সেদিন সোমদত্তার তাই হল। আগল ভেঙে গেল যেন। যা সে কখনও করেনি, করার কথা ভাবেনি, সেদিন চলন্ত ট্যাক্সিতে তাই করল। মৈত্রেয়কে নিজের দিকে ফিরিয়ে জোর করে টেনে নিল, কিছু বোঝার আগেই



তার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল কয়েক মুহূর্তের জন্য। এটুকুতেই মৈত্রেয়র ঠোঁট ভিজিয়ে দিল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে স্বাভাবিকভাবে সোমদত্তা বলল, "স্কুটারটা বদলিও। ওই গাড়িতে চড়লে এবার পথে বিপদে পড়বে। টাকা লাগলে বলবে।"

মৈত্রেয় উজ্জ্বল গলায় বলল, "টাকা লাগবে না। দুটো বড় পেমেন্ট পেলেই হয়ে যাবে। এবার আর স্কুটার-টুটার নয়। চার চাকা নেব।"

সোমদত্তা গেট খুলে বাড়িতে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, "ব্যবসায় মন দাও। ওটাকে ভাল করে দাঁড় করাও। বাবাকে তো জানো, কড়া ধাঁচের মানুষ। আমি একমাত্র মেয়ে। অনেক দেখেশুনে বিয়ে দেবেন। যতই লেখাপড়া শিখি আর আধুনিক হই না কেন, বিয়েতে কিন্তু বাবাকে ইয়েস বলতে হবে। সো মেক ইওরসেলফ রেডি। আমি লন্ডন থেকে ফিরে আসি।"

সেসব কেটে গিয়েছে অনেকদিন। জীবনের উপর দিয়ে জল গড়িয়েছে বহু। দীর্ঘ ছাড়াছাড়ির পর আবার মৈত্রেয়-র সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে সোমদত্তার। এতদিনে তার যেমন বদল হয়েছে, বদল হয়েছে



মৈত্রেয়রও। সোমদত্তার থেকে সে সরে গিয়েছিল অস্থির, ব্যর্থ মনে। এমনকী সুইসাইড পর্যন্ত করবে ভেবেছিল। ধীরে-ধীরে মনকে শক্ত করে। কাজে মন দেয়। ধাপে-ধাপে উন্নতি করেছে অনেকটা। বড় কোম্পানির গাড়ির ডিলারশিপ পেয়েছে। মোটরবাইকও রাখছে। ইচ্ছে আছে, ছোট ভ্যান আর ট্রাক্টরের কাজও করবে। গ্রামে এখন এই দুটোর চাহিদা বেড়েছে। অনেকেই ট্রাক্টর কিনে ভাড়া দিচ্ছে। রাজারহাটে গাড়ির জন্য বড় শোরুম করছে। মধ্যমগ্রামে একটা ছোট বাড়ি কিনে ফেলেছে। বিয়ে 'করব করব' করেও করা হয়ে ওঠেনি। আসলে ঠেলা দেওয়ার কেউ ছিল না। আবার এমনটাও হতে পারে, সোমদত্তাকে ভুলতে পারছিল না। ব্যবসার সূত্রে এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে আলাপ হল। প্রেম নয়, প্রেম-প্রেম ভাব। সেই ভাব শরীর পর্যন্ত গড়ায়। তবে মহিলা শরীরে তেমন সাড়া দিতে পারত না। ভাল লাগত না মৈত্রেয়র। মহিলা স্বামীর বদলিতে পাটনা চলে গেল। মৈত্রেয় ভাবল, ভালই হল। ঝামেলা বিদায় হয়েছে। সোমদত্তার সঙ্গে এত বছর পর আবার যোগাযোগ হয়েছে। হয়েছে একেবারে আকস্মিকভাবে।

কোর্টে দেখা হয়ে গেল দু'জনের। মৈত্রেয় ব্যবসার কাজে কোর্টে গিয়েছিল। কোনও এক পার্টির সঙ্গে গাড়ি কেনাবেচা নিয়ে মামলা চলছে। সোমদত্তাই দেখতে পেয়ে ডেকে নিল। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চা খেল দু'জনে। যতটা পারা যায় সহজভাবে কথা বলেছে। কে কেমন আছে খবর নিয়েছে। যেমন অনেক বছর পর দেখা হলে নিতে হয়। মৈত্রেয়র ব্যবসা বড় হয়েছে, ভাঙা স্কুটার ছেড়ে বড় গাড়ি চড়ছে, বাড়ি কিনেছে শুনে সোমদত্তার চোখ বড় হয়ে গেল।

"কনগ্র্যাচুলেশনস! কাজে মন দিয়েছ তবে।"

মৈত্রেয় ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিয়ে হেসে বলল, "তুমিই তো বলেছিলে কাজে মন দিতে।"

সোমদত্তা বলল, "বিয়ে করোনি কেন?"

মৈত্রেয় হেসে বলল, "তুমি তো তেমন কিছু বলে যাওনি।"

বেশি বয়সেও লজ্জা পেল সোমদত্তা। বলল, "ধ্যাত, আমি কি তোমাকে বিয়ে করতে বারণ করেছিলাম? যতসব বাজে কথা। এখনও সময় আছে, বিয়ে করে ফেলো।"

মৈত্রেয় বলল, "পাত্রী খুঁজে দাও, করে ফেলছি। মনে রাখবে, এখন মৈত্রেয় আর সেই আগের ভিখিরি মৈত্রেয় নেই, বয়স বেশি হলে কী

হবে, বিয়ে করলে রাজপুত্র না পাক, মেয়ে টাকা, বাড়ি, গাড়ি সব পাবে। মেয়ের বাবা ঘাড় ধাক্কা দিতে পারবে না।"

সোমদত্তা বলল, "খোঁচা দিচ্ছ?"

মৈত্রেয় খালি ভাঁড় ফুটপাথে রাখা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে বলল, "সরি। চলো, তোমাকে নামিয়ে দিই।"

সোমদত্তা বলল, "আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।"

গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল মৈত্রেয়। গাড়িতে উঠতে-উঠতে ব্যাগ থেকে কার্ড বের করে এগিয়ে দিল সোমদত্তা। ভিজ়িটিং কার্ডটা নেড়েচেড়ে দেখে মৈত্রেয় বলল, "বাপরে! এ তো বিরাট চাকরি! তোমাদের অফিসে আমার একজন ক্লায়েন্ট আছে। আমার ওখান থেকে গাড়ি নিয়েছিলেন।"

সোমদত্তা বলল, "তাই নাকি! কী নাম?"

মৈত্রেয় ভুরু কুঁচকে নাম মনে করার চেষ্টা করল। বলল, "সাম মজুমদার... পুরোটা মনে পড়ছে না।"

সোমদত্তা গাড়ির দরজা খুলে নিচু গলায় বলল, "রাতে ফোন কোরো।"

একটু অবাক হয়ে মৈত্রেয় সোমদত্তার দিকে তাকায়। সোমদত্তা বলে, "আমি এখন সল্টলেকে থাকি। রাতে একাই থাকি। মাঝেমধ্যে মেয়ে আসে। এলেও আলাদা ঘরে শোয়।"

মৈত্রেয়কে হতবাক করে গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছিল সোমদত্তা।

সোমদত্তা কেন কোর্টে এসেছিল সেদিনই জেনে গেল মৈত্রেয়। মামলা অদ্ভুত হলে কোর্টে আলোচনা হয়। সেই আলোচনা থেকেই কানে এল। সোমদত্তা মুখার্জি নামে এক মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা দায়ের করেছে। স্বামী শিরীষ মুখার্জি বড় কোম্পানির বড় পদে চাকরি করত। হঠাৎই তার ইচ্ছে হয়েছে, সব ছেড়েছুড়ে গ্রামে গিয়ে চাষবাস করবে। চাকরি ছেড়েও দিয়েছে। অনেক বুঝিয়েও তাকে নাকি আটকানো যায়নি। স্ত্রী মনে করে তার স্বামী বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হয়েছে। তার সঙ্গে সে সংসার করতে পারবে না। কিন্তু কোর্টে এখনও যথেষ্ট প্রমাণ সাবুদ করতে পারেনি। তবে উকিল পেয়েছে ওস্তাদ।

মৈত্রেয় অবাক হল। এ আবার কেমন ঘটনা! সব ছেড়েছুড়ে গ্রামে গিয়ে ধান চাষ! লোকটার কি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?

শোরুমের সঙ্গে একটা ছোট অফিস করেছে মৈত্রেয়। সাজানো গোছানো অফিস। বাইরে যে-মেয়েটি বসে, সে-ই রিসেপশনিস্ট এবং পার্সোনাল সেক্রেটারি। এই সব ব্যবসায় বাইরের চাকচিক্য লাগে। নিজের ঘরের একদিকে একটা সোফা রেখেছে মৈত্রেয়। হাতল ধরে টানলে চমৎকার ডিভান বেরিয়ে আসে। কাজের চাপ থাকলে কোনও কোনও দিন রাতে এখানে থেকে যায়। ব্যবসা বাড়ছে। ঝামেলাও বাড়ছে। শুধু কলকাতা শহরে বসে গাড়ির ব্যবসা করলে চলবে না। গ্রামেও গাড়ির চাহিদা বাড়ছে। মোটরবাইক তো এখন ঘরে-ঘরে। এছাড়া ছোট ঢাকা ভ্যানের বেশ চাহিদা। তার ডিলারশিপও পেয়েছে। বারাসত, বর্ধমান, সিউড়িতে লোক রেখেছে। অর্ডার ধরে। কালকাতায় বসে একাজ হয় না, মাঝেমধ্যে বাইরে যেতে হয়। কাজ যেন এখন মৈত্রেয়র কাছে নেশার মতো। বিয়ে-থা করেনি। একা মানুষ। তার উপার্জনের টাকায় পরে কে খাবে, এই নিয়ে ভাবে না। কাজ করতে অনেক সময় রাত হয়ে যায়। সেদিন আর মধ্যমগ্রামে ফেরা হয় না মৈত্রেয়র।

অফিসে এসে কাজে মন দিতে পারছিল না মৈত্রেয়। সোমদত্তার অফিসের যে-মহিলা তার কাছ থেকে গাড়ি নিয়েছিলেন, তার পুরো নামটা কী? শুধু 'মজুমদার'-টুকু মনে পড়ছে। সোমদত্তার দেওয়া কার্ডটা বের করে কম্পিউটারে কোম্পানির ঠিকানা টাইপ করল মৈত্রেয়। নাম ফুটে উঠল। অনুসূয়া মজুমদার। একে ফোন করবে? সোমদত্তার খবর কিছু বলতে পারবে? কেন পারবে না? একই অফিসে তো কাজ করে। তার ওপর এখন মনে পড়ছে, মহিলা বেশি কথা বলে। স্ক্যান্ডাল, গসিপ পছন্দ করে। ওর চেনাজানারা গাড়ি নিয়ে কী করে, কোন রিসর্টে যায়, মদ খেয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করছে, সেসব বলছিল। সুযোগটা নেওয়া যেতে পারে। সমস্যা একটাই, সোমদত্তাকে বলে বসবে না তো?

সেদিন মোবাইলের দিকে হাত বাড়িয়েও থমকে গিয়েছিল মৈত্রেয়। রাত দশটায় ফোন করেছিল সোমদত্তাকে। দু'-চারটে এদিক ওদিক কথার পর সোমদত্তা সবটাই বলতে থাকে। নাওডুবির জমি থেকে ত্রপা নামের মেয়েটি পর্যন্ত।

"মৈত্রেয়, তোমাকে আমি খুঁজছিলাম। তোমার আগের টেলিফোন নম্বর খুঁজে বের করে আমি ফোন করেছি। বেজে গিয়েছে। একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে গাড়ি ঘুরিয়ে তোমার বাড়িতেও গিয়েছিলাম। দেখলাম নতুন ভাড়াটে।"

মৈত্রেয় শান্ত গলায় বলল, "আমি তো বহুবছর হল বাড়ি বদলেছি। তোমার বিয়ের আগেই কালকাতা থেকে একটু দূরে সরে গিয়েছি।"

সোমদত্তা বলল, "বহু দরকারে তুমি আমার পাশে থেকেছ, এবারও তোমাকে আমার দরকার। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?"

মৈত্রেয় আবেগ আপ্লুত গলায় বলল, "এসব কী বলছ সোমদত্তা! সাহায্য কী? তুমি বল কী করতে হবে? তোমার লইয়ারের নাম কী?"

সোমদত্তা বলল, "তুমি কাল দেখা করতে পারবে মৈত্রেয়? সব বলব।"

সেদিন রাতে ঘুম আসতে অনেক দেরি হয়েছিল মৈত্রেয়র। এপাশ ওপাশ করতে থাকে। তার বিশ্বাস হচ্ছে না। সোমদত্তা আবার ফিরে এসেছে! এটা কি সত্যি? নাকি স্বপ্ন দেখছে? ঘুম ভেঙে গেলে দেখবে কিছু হয়নি? যদিও ফোনে মৈত্রেয়র সঙ্গে কথা বলার পর সোমদত্তা ছিল শান্ত। অন্ধকার ঘরে শুয়ে ঠান্ডা মাথায় সে ভাবতে থাকে। শুধু কোর্ট দিয়ে হবে না। ডিভোর্স চাওয়ার পর ভেবেছিল শিরীষ সব ছেড়েছুড়ে ফিরে আসবে। এখনও হয়নি। বাইরে থেকে ধাক্কা লাগবে। কঠিন ধাক্কা। আর তার জন্য এমন একজনকে লাগবে যে হবে সাহসী, আবার গোপনীয়তাও বজায় রাখবে। এই মুহূর্তে মৈত্রেয়র চেয়ে ভাল আর কে আছে? সে গুলি খাওয়া বাঘ। পাশ ফিরে শুল সোমদত্তা।

পরদিন কফিশপে বসে কথা হল।

"তোমার হাজ়ব্যান্ড তোমাকে ডিভোর্স দিতে রাজি হয়েছে?"

"রাজি হয়নি বলেই তো কোর্টে ছোটাছুটি করছি। আমি চেয়েছিলাম মিউচ্যুয়ালি বিষয়টা মিটে যাক। ও শুনতে চাইছে না। এবার নোটিস পাঠানো হয়েছে।"

"তুমি আমার কাছ থেকে কী চাইছ সোমদত্তা?"

"ত্রপা নামের যে-মেয়েটির কথা বললাম, তার সম্পর্কে খবর চাই। সে যে শিরীষের সঙ্গে থাকে, তার প্রমাণ চাই। কোর্টকে জানাব।"

মৈত্রেয় একটু চুপ করে থেকে বলে, "আমি চেষ্টা করব। বিজ়নেসের কারণে আমার গ্রামের দিকে আজকাল একটু যোগাযোগ হচ্ছে। মোটরবাইক, ভ্যান কিনতে ব্যাঙ্ক লোন লাগে। ব্লক, পঞ্চায়েতের সার্টিফিকেট চাই। এজেন্ট এসব কাজ করে দেয়। সেই সূত্রে চেনা জানা হয়েছে। তুমি জায়গাটার ডিটেলস দাও সোমদত্তা। গ্রামটার কী একটা উদ্ভট নাম বললে যেন?"

এর মধ্যে আরও দু'দিন মৈত্রেয়-র সঙ্গে দেখা করেছে সোমদত্তা। ফোনে তো মাঝেমধ্যেই কথা হয়। সেই কথায় যেমন 'কাজ' থাকে, পুরনো প্রেমও থাকে। সোমদত্তা জানে 'প্রেম' না থাকলে মৈত্রেয় কাজে উৎসাহ পাবে না। মৈত্রেয়কে তার লাগবে। পুরুষমানুষ নারীর বিষয়ে আসলে মূলত বিভ্রান্ত। বোকাও বটে। একসময়ে যতই প্রত্যাখাত হোক, সে পুরনো প্রেমিকার কাছে সবসময়েই মহৎ হওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে। তার জন্য নতুন করে 'জীবন উৎসর্গ' যেন কোনও ব্যাপার নয়। মৈত্রেয়র বেলায় আর একটু বেশি কি? সোমদত্তা চায় 'বেশি' হোক। এরকম একটা বিষয়, যেখানে তার মেয়ে, মা, পরিচিতরা কেউ নেই, সবাই শুধু পরামর্শ দিচ্ছে, "মিটিয়ে নাও। শিরীষ পাগলামি করলেও কোনও অন্যায় করে না।" সেখান এমন একজন চাই যে চোখ বুজে তার পাশে থাকবে। মৈত্রেয় ছাড়া আর কে হতে পারে?

সেই মৈত্রেয় আজ 'খবর' নিয়ে একেবারে বাড়ি চলে আসতে

চাইছিল।

মৈত্রেয় বলল, "যাক, তোমার সময় হলে বোলো। তোমার জন্য তখনও অপেক্ষা করেছি, এখনও করব।"

মৈত্রেয় ফোন কেটে দেয়। সোমদত্তা ফোনের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে অস্ফুটে বলে, "তুমি রাগ করলে চলবে না। তোমাকে এখন আমার লাগবে। শিরীষকে ফিরিয়ে আনতে হবে।"

দোতলায় মাধুরীদেবী নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছেন, তাঁর বয়স আশি ছাড়িয়ে গিয়েছে। দুপুরের এই সময়টা তিনি ঘুমোন। তাঁর শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। ভাল যাওয়ার কথাও নয়। এই বয়সে মেয়ে-জামাইয়ের জটিল ঝামেলা মেনে নেওয়া কঠিন। প্রথম দিকে ভেবেছিলেন, মেয়ে ঝগড়া করে সুটকেস গুছিয়ে চলে এসেছে বটে, তবে দু'দিন পরে ফিরে যাবে। আগেও সোমদত্তা কয়েকবার এরকম করেছে। বাপেরবাড়ি থাকলে সব মেয়েরাই এরকম করে। পরে মিটেও যায়। বর এসে নিয়ে যায়। এবার সপ্তাহখানেক কেটে গেলেও মেয়ে ফেরার নাম করল না। শিরীষও আসেনি। নাতনি এলে তাকে চেপে ধরলেন বৃদ্ধা।

"তারা, তোর মায়ের কী হয়েছে?"

দোতারা সহজভাবে বলল, "দি, কেস নাওডুবি হয়েছে।"

দোতারা দিদিমাকে 'দি' ডাকে। শিশুকালের অভ্যেস।

মাধুরী বললেন, "এসব কী বলছিস! কেস নাওডুবি হয়েছে মানে কী?"

দোতারা চোখ বড় করে নাটকীয় ঢঙে বলল, "নাওডুবি নিয়ে গোলমাল হয়েছে, তাই তোমার মেয়ের সংসারে ভরাডুবি হয়েছে।"

"হেঁয়ালি করবি না তারা, ঠিক করে বল, তোর মা কসবায় যাচ্ছে না কেন? আজ শুনলাম, এখানে একজন গাড়ি ধোওয়ার লোক ঠিক করছে। রোজ সকালে এসে তোর মায়ের গাড়ি ধুয়ে দেবে। গাড়ি এখানে থাকবে?"

দোতারা হেসে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আর গাড়ি? দেখছ নৌকো ডুবেছে, তুমি সামান্য গাড়ি নিয়ে ভাবছ দি?"

দিদিমা নাতনিকে গলা থেকে ছাড়িয়ে হাত চেপে ধরে ধরলেন। দোতারা ঘটনা সংক্ষেপে বলল। যতটা বলা যায়। বিষয়টা মিটমাট হওয়া যে খুব সহজ নয়, সেটা চেপে গেল। এই বয়সে ওর পক্ষে এটা না শোনাই ভাল। বেশি বললে মা রেগে যেতে পারে।

"শোনো দি, আমি যে ঘটনা বলেছি, সেটা আর তোমার মেয়েকে বলতে যেও না। খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে আমার মাথা খেয়ে ফেলবে।"

পরদিন সোমদত্তাকে ধরতে সেও তার মাকে ঘটনা জানায়। জানায়, তার পক্ষে এখনই শিরীষের কাছে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। একটা না একটা সময়ে তো জানাতে হতই। সে এই বাড়িতে দিনের পর দিন রয়েছে। প্রতিবেশী, কাজের লোক, আত্মীয়স্বজন, সবার চোখে পড়ছে। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান হওয়ার কারণে এই দোতলা বাড়ি শেষপর্যন্ত যতই তার হোক না কেন, মা যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন পর্যন্ত তো এটা মায়ের বাড়ি। দিনের পর দিন চুপ করে থাকা তো যাবে না। ভালই হল, মা নিজের থেকে জানতে চাইলেন।

মাধুরী বললেন, "মিটিয়ে নে। ধেড়ে বয়েসে এইসব পাগলামির মানে হয় না।"

সোমদত্তা বলল, "মিটিয়ে আমি কী করে নেব মা? পাগলামি তো আমি করছি না, করছে তোমার জামাই। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চাষা সাজার শখ হয়েছে তার!"

মাধুরী বললেন, "আহা, মানুষের তো গাছগাছালির শখ আহ্লাদ থাকে। তোর বাবাও এই বাড়ির বাগানে কতরকম গাছ করেছে। বেল, জুঁই-এর কথা বাদ দে, আম, জামরুল, পেয়ারাগাছও তো করছিল একসময়ে। পরে বাগান রাখতে পারল না, সেটা অন্য কথা। কিছু গাছ তো আজও রয়ে গিয়েছে। বাগানে দেখতে পাস না?"

সোমদত্তা থমথমে গলায় বলেছিল, "শিরীষ যা করছে সেটা বাগান নয় মা। সে ধান ফলিয়ে খাবে, মাটির ঘরে থাকছে। তোমাকে এতদিন বলিনি, এবার বলছি, আমেরিকা যাওয়ার অফার শুধু ছাড়েনি, সে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার জন্য অফিসে অ্যাপ্লিকেশন জমা করেছে। মাথা খারাপ না হলে কেউ এ কাজ করে! আমি সাইকিয়াট্রিস্ট কনসাল্ট করেছিলাম। তিনি সব শুনে বললেন, আপনার হাজব্যান্ডের আর যাই হোক, মানসিক অসুখ হয়নি। প্রফেশন চেঞ্জ করতে চাওয়াটা নাকি পাগলামির মধ্যে পড়ে না। আমি বোঝাতে পারিনি। শিরীষকে বলেছিলাম, তুমি ডক্টরের কাছে চলো। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।"

মাধুরী একটু চুপ করে থেকে বললেন, "সোম, তুই শিরীষকে ফোনে ধরিয়ে দে, আমি কথা বলব।"

শিরীষ দু'দিন পরেই চলে এসেছিল। শাশুড়ির জন্য প্রতিবারের মতো চা পাতাও নিয়ে এসেছিল। বয়স যতই হোক, মাধুরী সকাল-বিকেল এক কাপ করে ভাল চা খেতে পছন্দ করেন। দোতলার বারান্দায় একা বসে খান। সল্টলেকের এই দিকটা এখনও নির্জন। পাখি ডাকে। শিরীষ বিকেল যখন এল মাধুরী বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসেছিলেন। গায়ে হালকা চাদর।

শিরীষ পাশে চেয়ার টেনে বসে বলেছিল, "কেমন আছেন? কোমরের ব্যথাটা কমেছে?"

মাধুরী শান্ত গলায় বললেন, "কমেছে, তবে সকাল-বিকেল জানান দেয়। বাকি ক'টাদিন ওই ব্যথা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। তাও তো এই বয়সে অনেকের চেয়ে ভাল আছি। সর্বক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে হয় না, তাই যথেষ্ট।"

শিরীষ বলল, "ওভাবে বলছেন কেন? কোমরের জন্য আরও ভাল ডাক্তার দেখাতে হবে।"

মাধুরী একথায় গা না করে বললেন, "শিরীষ, তুমি নাকি চাষবাস করবে ঠিক করছ?"

শিরীষ সুন্দর হেসে বলল, "নিজের হাতে এখনই পারব না, এখন যারা কাজটা জানে তারা করছে। পরে আমারও নামার ইচ্ছে আছে।"

মাধুরী বললেন, "এসব আমার জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল না। তোমরা বড় হয়েছ, নিজের ভাল নিজেই বুঝবে। এর মধ্যে নাক গলানোর আমি কে? তোমার শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকতেও তা করেননি। বলতেন, ভাল ছেলের সঙ্গে মেয়েকে জুড়ে দিয়েছি, বাকিটা ওরা বুঝবে। তার পরেও মনে হচ্ছে, কোথাও সমস্যা হচ্ছে। সংসারে এতদিন পর সমস্যা হবে কেন? সত্যি কি তুমি কলকাতা ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে চলে যাবে বলে ঠিক করেছ?"

শিরীষ বলল, "না, এমন কিছু ঠিক করিনি। করবই বা কেন? সোম আছে, আপনার নাতনি আছে, কলকাতায় তাদের লেখাপড়া, কাজ। কসবার ফ্ল্যাটে তারা থাকবে। তা ছাড়া আপনি একা থাকেন। আমার দায়িত্ব নেই? এত বছর ধরে আমায় দেখছেন, কখনও কি মনে হয়েছে, দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করি না?"

মাধুরী একটু ভেবে বললেন, "তাহলে তুমি কলকাতায় থাকবে?"

শিরীষ আবার হেসে বলল, "অবশ্যই থাকব। তবে সবসময় থাকব না, মাঝেমধ্যে এসে থাকব। জমিতে বেশি সময় দিতে হচ্ছে। অফিস যদি আমাকে কোথাও বদলি করত, নতুন একটা প্রজেক্টের দায়িত্ব দিত, কী করতাম? সেখানেও বেশি সময় দিতে হত, নয় কি?"

"তা হত। তবে আপিসের চাকরি আর ধান চাষ কি এক হল?"

শিরীষ বলল, "না এক হল না। স্বাধীনভাবে যে-কোনও কাজ করাতেই ঝুঁকি বেশি, তাই আনন্দও বেশি। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে ধান চাষ আমাকে বেশি আনন্দ দেবে। জীবনে আনন্দেরও একটা দাম আছে।"

মাধুরী জামাইয়ের কথা শুনে একটু চুপ করে রইলেন। বললেন, "তোমার বউ তো খুব রেগে গিয়েছে। বাড়ি ফিরবে না বলছে।"

শিরীষ বলল, "সেটা আমার দোষ। আমি ওকে প্রজেক্টটা ঠিক মতো বোঝাতে পারিনি। আশাকরি ভবিষ্যতে ও বুঝবে। সোম বাড়ি ফিরবে, আপনি চিন্তা করবেন না।"

মাধুরী বললেন, "তুমি নাকি বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলে?"

শিরীষ বলল, "হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। তবে এও তো একরকম যাওয়াই

হচ্ছে। দেশের মধ্যে যাওয়া। নাওডুবি খুব সুন্দর জায়গা। একটু গুছিয়ে নিই, আপনাকেও নিয়ে যাব। ক'দিন মেয়ে, নাতনিকে নিয়ে থাকবেন। খুব ভাল লাগবে। ক্ষেত থেকে তোলা ধানের চাল, সবজি খাবেন।"

মাধুরী চাদরের খুঁট থেকে সুতো ছিঁড়তে-ছিঁড়তে বললেন, "চাকরিটা না ছাড়লেই পারতে শিরীষ। আজকালকার দিনে... ভয় করে। শুনি, দেশে কাজকর্মের অবস্থা ভাল নয়।"

শিরীষ নরম গলায় বলল, "আপনি ভয় পাবেন না। চাষে ফেল করলে আবার অফিসে চাকরি নেব। আপনার জামাইয়ের যা বিদ্যেবুদ্ধি, তাতে চাকরি পেতে অসুবিধে হবে না।"

মাধুরী আবার খানিকটা চুপ করে থেকে বলেছিলেন, "বেশি করে জামাকাপড় সঙ্গে রাখবে। পাড়াগাঁয়ে গরমের সময়েও ঠান্ডা পড়ে। একবার তোমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম..."

রাতে সোমদত্তা তার মায়ের কাছে বসে মন দিয়ে এই আলোচনার রিপোর্ট শোনে।

"তুই কালই কসবা ফিরে যা সোম। শিরীষ ছেলেটা ভাল। তুই ভুল বুঝছিস। পুরুষমানুষের শখ আহ্লাদ তো থাকবেই। এ তো খারাপ কিছু নয়।"

সোমদত্তা হিসহিসিয়ে বলে, "কীসের শখ আহ্লাদ মা? বউ মেয়েকে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার শখ আহ্লাদ? বুঝেছি, তোমার মাথা খেয়ে গিয়েছে। তুমি ওর হয়ে একটা কথাও বলবে না। আর দু'দিন দেখব, তারপরই তোমার জামাই বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল। আমাকে পথে বসানো বের করে ছাড়ব। কত প্ল্যান করে রেখেছিলাম জানো?"

মাধুরী মেয়ের গায়ে হাত রেখে বললেন, "মাথা ঠান্ডা কর সোম। শিরীষের সঙ্গে কথা বল।"

এসব আগের ঘটনা। এখন সবই জানাজানি হয়ে গিয়েছে। গোড়াতে শুধু চাষবাসের বিষয়টা ছিল, পরে একটা মেয়ে ঘটনায় ঢুকে পড়েছে। তবে সেটা আর মাকে বলেনি সোমদত্তা। কে জানে একসময়ে হয়তো সেটাও বলতে হবে।

সোমদত্তা ঠিক করল সে মৈত্রেয়কে বাড়িতে ডাকবে। খুব তাড়াতাড়ি ডাকবে।

॥ ৯ ॥

"স্যার, আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে?"

শিরীষ বলল, "না, খারাপ লাগছে না। বরং ভাল লাগছে।"

"স্যার, ভোরে দেখেছি, গায়ে হালকা টেম্পারেচার ছিল। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন তাই বিরক্ত করিনি। আমি কি এখন একবার থার্মোমিটার দিয়ে দেখতে পারি?"

শিরীষ বলল, "তার কোনও প্রয়োজন নেই। জ্বর দুম করে আসে, কিন্তু নামে ধাপে-ধাপে। সেটাই ভাল। ওষুধ খেয়েছি, তুমিই তো দিয়েছ। তা ছাড়া এখন আর জ্বর নেই, ঝরঝরে লাগছে।"

"সত্যি!"

শিরীষ বলল, "তোমার কি আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"একটা কথা বললে রাগ করবেন না তো স্যার?"

শিরীষ সহজভাবে বলল, "করব। তারপরেও তুমি বলতে পারো।"

"আপনার নিজের ব্যাপারে আপনাকে আমি পুরোটা বিশ্বাস করি না। এই কয়েকমাসে আপনাকে খানিকটা চিনেছি মনে হয়।"

শিরীষ চোখে তুলে বলল, "একজন মানুষকে চেনার জন্য পাঁচ মাস কি খুবই কম সময় নয়?"

"সবসময় নয় স্যার। ভালমানুষকে চেনা যায় তাড়াতাড়ি। আর বেশি ভালমানুষকে বেশি তাড়াতাড়ি চেনা যায়। যেমন স্যার আপনি। আপনি একজন বেশি ভালমানুষ।"

শিরীষ একটু হেসে বলল, "এই মজার থিওরি তোমাকে কে শেখাল?"

"আমার মা স্যার। আমার মা লেখাপড়া তেমন কিছু করেননি। চাকরিবাকরিও করেন না, ঘর সামলান। আমাকে আর আমার দিদিকে মানুষ করেছেন। বিভিন্ন গুণের মধ্যে মায়ের একটা গুণ হল, চট করে মানুষ চিনতেন পারেন। সামনাসামনি দেখে পারেন, আবার গল্প শুনেও পারেন। আমি মাকে আপনার গল্প বলেছি, উনি বলেছেন, তুই ঠিকই বলেছিস, তোর স্যার মানুষ বেশি ভাল।"

শিরীষ আরও মজা পেয়ে বলল, "তুমি কী এমন বললে যাতে আমাকে ভাল মানুষ বলে মনে হল!"

"বেশি কিছু বলিনি, একটা ঘটনা বলেছি। খুব সামান্য একটা ঘটনা। তাতেই মা বুঝতে পেরেছে।"

শিরীষ এবার চোখ বড় করে বসল। বলল, "বলো কী! মাত্র একটা ঘটনায় আমাকে চিনে গেলেন? ঘটনাটা কী, জানতে পারি?"

ত্রপা মাথা নামিয়ে লাজুক গলায় বলল, "না স্যার, বলা যাবে না।"

শিরীশ বলল, "ঠিক আছে। বোলো না।"

বৃষ্টিতে ভিজে ধুম জ্বর হয়েছিল শিরীষের। দু'দিন বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। ত্রপা সেই যে এসেছে, আর বোলপুরে ফিরে যায়নি। এখানেই গেস্টরুমে রয়ে গিয়েছে। সেদিনই তার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। শিরীষের কাছে সে নিয়ম করে আসছে। ক্যামেরায় চাষের প্রতিটা পর্ব ধরে রাখছে। নোটস নিচ্ছে। শিরীষের ইন্টারভিউ নিচ্ছে। তার পেপার তৈরিতে যেমন-যেমন লাগবে। তবে রাতে কখনও থাকেনি। বিকেলের আগেই শিরীষ তাকে চলে যেতে বলে। প্রথমে ঠান্ডা গলায় বলে। তারপরে মাঝারি ধরনের ধমক দেয়।

"বেলা পড়ে গেল, এখনও আমার পিছনে ঘুরঘুর করছ কেন?"

ত্রপা বলল, "মাঠের কাজ শেষ করে আপনি কী করেন সেটা দেখছি। এখানে তো সময় কাটানোর জন্য শহুরে আয়োজন নেই।"

শিরীষ বিরক্ত হয়ে বলে, "এটাও তোমার গবেষণার মধ্যে পড়ে?"

ত্রপা মাথা চুলকে বলে, "বুঝতে পারছি না স্যার। আমার গাইড বলেছেন, আপনাকে যতটা পারা যায় ফলো করতে। এগ্রিকালচার ফিল্ডে আপনি একজন অভিনব মানুষ।"

শিরীষ দাঁত চেপে বলে, "আমি এখন ঘুমোব। তুমি এবার যাও।"

ত্রপা বলল, "স্যার, আর-একটু থাকি?"

শিরীষ বলল, "রাত হয়ে গেলে ফিরবে কী করে?"

ত্রপা বলে, "চিন্তা করবেন না। হারানদা বা রতনকাকার সঙ্গে এগিয়ে যাব।"

শিরীষ এবার খুব রেগে যায়। ধমক দিয়ে বলে, "এটা তোমার গবেষণাগার নয় যে, তোমার ইচ্ছে মতো চলবে। তুমি এখনই চলে যাবে এবং আর কোনওদিনই আসবে না। তুমি ধান গাছ নিয়ে গবেষণা করো, আমি ধান গাছ নই। আর কখনই আসবে না। এখনই বিদায় নাও!"

সেদিন বৃষ্টি সব গোলমাল করে দেয়। ত্রপার ছাতা কাজে লাগেনি। লাগার কথাও নয়। যদিও আকাশ যতটা সাজগোজ করেছিল, সেই তুলনায় বৃষ্টি তেমন হয়নি। তারপরেও ভিজে একসা হয়ে, কাদা মেখে দু'জনে ঘরে ফিরেছিল। আসলে নাওডুবি নদীর সাঁকো থেকে শিরীষের ঘর পর্যন্ত পথটা বেশি। হাঁটতে-হাঁটতে কখন যে অতটা পথ চলে গিয়েছিল, খেয়াল ছিল না। আজকাল মাঝেমধ্যে এরকম হয় শিরীষের। অন্যমনস্ক লাগে। এমনটা আগে ছিল না। এখানে এসে বদলটা হয়েছে। সবসময় সেই টানটান, সর্তক, টেনশনের মধ্যে থাকার ব্যাপারটা চলে গিয়েছে। শহর ছাড়তে শহুরে টেনশনটাও চলে গিয়েছে।

ত্রপার ছাতার নীচে দু'জনকে লম্বা পথ আসতে হয়েছিল সেদিন। তাও আস্ত ছাতা নয়, একদিক শিক ভেঙে কেতরে পড়া ছাতা। ছাতা কেতরে পড়ার আগেই ত্রপা বারবার ছাতার নীচ থেকে ছিটকে যাচ্ছিল। তাকে ধমক দিতে হয়।

'আরে তুমি কোথায় যাচ্ছ? ছাতার নীচে এসো।'

ত্রপা বলেছিল, "আপনি চলুন স্যার, আমার বৃষ্টিতে ভেজার অভ্যেস আছে।"

শিরীষ কড়া গলায় বলে, "অভ্যেস থাকলে থাকুক, তুমি আগে এসো।"

ত্রপা একটু এগিয়ে এল বটে, তবে ছাতার নীচে পুরোটা ঢুকল না। ভিজতে ভিজতেই চলল। সেই সঙ্গে চলছিল বকবকানি। শিরীষ গোড়া থেকেই দেখছে, এই মেয়ে কথা বলতে ভালবাসে। কথা বলার মধ্যে ভনিতা কিছু নেই। সবটাই মনে হয় খাঁটি, ভিতর থেকে বলছে। এই সময়ের অনেক ছেলেমেয়েদের মতো উপর চালাকি ভাব একেবারেই নেই। অথচ এমন নয় যে, ত্রপা গ্রামের মেয়ে, শহুরে জটিলতা, প্যাঁচপয়জার দেখেনি। সবই দেখেছে। শহরে জন্মেছে, শহরেই বড় হয়েছে। লেখাপড়া করেছে কল্যাণীতে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা শেষ করে এখন বিশ্বভারতীতে গবেষণার কাজ করছে। থাকে বোলপুরে, পেইং গেস্ট হিসেবে। তবে বেশিরভাগ সময়ই বাড়িতে থাকা হয় না। ফিল্ড ওয়র্ক করতে ব্লকে-ব্লকে ঘুরে বেড়াতে হয়। গ্রামে রাতও কাটায়। নাওড়ুবিতে বারবার শিরীষের কাছে যাতায়াত করা এবং ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকার কারণও সেই গবেষণা। এটা তার গবেষণারই একটা অংশ। ত্রপা সেদিন ভিজতে ভিজতেই বকবক করতে লাগল।

"স্যার, কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করি। কাদা-মাটি, জল বৃষ্টিতে অভ্যস্ত না হলে চলে? আমার একটা পেপার ছিল রেন হার্ভেস্টিং-এর ওপর। বৃষ্টিতে চাষ। থিওরির পর যেতে হবে প্র্যাকটিকালে। একবারে হাতে কলমে চাষ দেখতে হবে। আমি গেলাম আমোদপুরে। ইউনিভার্সিটি থেকে পাঠাল। সেখানে যাওয়ার সময়ে একটা বিরাট বোকমি করে ফেললাম। গামবুট নিয়ে যেতে ভুলে গেলাম। এদিকে আমাকে তো বৃষ্টির মধ্যে ক্ষেতে নেমে কাজ দেখতে হবে। তুমুল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আল ধরে তো বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলাম। খানিকটা যাওয়ার পরই হল বিপদ। পা হড়কে পড়লাম ক্ষেতে। ক্ষেতে তখন টইটুম্বুর জল। আমার প্রায় হাঁটু পর্যন্ত গেল ডুবে, পা গেল কাদায় গেঁথে... কিছুতেই আর টেনে তুলতে পারি না। পারব কী করে? জুতো তো আটকে গেছে!"

এই পর্যন্ত গল্প বলার পর ত্রপার ছাতার একটা দিকের শিক বৃষ্টির ঝাপটায় গেল উলটে। ত্রপা জিব কেটে বলল, "এই রে! আজও একটা ভুল করে ফেলছি। ভাঙা ছাতাটা নিয়ে চলে এসেছি। কেন যে বারবার এত ভুল হয়ে যায়!"

শিরীষ হেসে ফেলল। মনে হল, খানিক আগে ত্রপাকে দেখে যে রাগ হয়েছিল সেটা আর নেই। বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া এই সুন্দর মেয়েটাকে খুব ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, মেয়েটা আলাদা কেউ নয়, বৃষ্টির একটা অংশ।

বাড়ি ফিরতে ত্রপা তাড়াতাড়ি জল গরম করে দিল। স্নান করে জামা কাপড় বদলাল শিরীষ। ত্রপার তো সে উপায় নেই। সে সঙ্গে জামা কাপড় কিছু রাখে না।

"স্যার, আমার সমস্যা হবে না। খানিক বাদেই তো ফিরে যাব। জামা গায়েই শুকিয়ে যাবে।"

শিরীষ অবাক হয়ে বলল, "এক্ষুনি ফিরে যাবে কী করে? বাইরের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ না? বৃষ্টি কমলেও এখনই থামবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া এখন বোলপুর ফিরবে কী করে?"

কথাটা ঠিক। কোনও কোনওদিন গবেষণার কাজ বাবদ গাড়ি ভাড়া করে নেয়। ফিল্ডওয়ার্ক থাকলে গাড়ি ভাড়ার বিল জমা দিলে টাকা পাওয়া যায়। কোনও কোনওদিন গাড়ি না থাকলে ট্রেন-বাস ধরে চলে আসে। আজ গাড়ি পায়নি ত্রপা। আসার সময় ঝামেলা হয়নি। কিন্তু ফিরে যাওয়া কঠিন। সবেরগঞ্জ গিয়ে বাস ধরে রেল স্টেশন পর্যন্ত যেতে হবে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে বোলপুর পৌঁছনো একরকম অসম্ভব। তারওপর বৃষ্টি চলছে। ত্রপা তারপরেও বলল, "স্যার, চিন্তা করবেন না, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

এবার কড়া গলায় শিরীষ বলল, "বোকার মতো কথা বোলো না। দুম করে চলে আসার আগে ভাবা উচিত ছিল। মেঘ দেখার পরও যখন বেরিয়েছ, সঙ্গে আস্ত ছাতা, এক সেট জামাকাপড় নিয়ে বেরোনো উচিত নয় কি? মাঠেঘাটে ঘুরে কাজ করো, এটা খেয়াল থাকে না কেন?"

ত্রপা অপরাধীর মতো কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "বেরোনোর সময় আমি যে-মেঘ দেখেছিলাম স্যার, ওতে বৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। আর হলেও এতটা হয় না।"

শিরীষ খানিকটা অন্যমনস্ক হয়েই বলল, "সব কিছু কি কথা মতো হয়? এই যে আজ আমি পথ হারিয়ে নাওড়ুবি নদীটা খুঁজে পেলাম, তা কি কারও কথা মতো হয়েছে? এই যে দু'জনে মিলে বৃষ্টিতে ভিজলাম, সেও কি কারও কথা শুনে? এই যে তুমি আজ অন্ধকার মাঠঘাটের মধ্যে আটকে পড়লে সেটাও কি কথা ছিল? ছিল না। এমনই অনেক কিছুরই কথা থাকে না, হয়ে যায়। রোদ ওঠে, বৃষ্টি পড়ে।"

ভিজে কাপড়ে ত্রপার শীত করছে। হালকা কাঁপুনিও হচ্ছে। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে যেন। তারপরেও সে অস্ফুটে বলল, "স্যার, কী অপূর্ব বললেন!"

শিরীষ নিজের কাচা ইস্তিরি করা চুড়িদার পাজামা, গেঞ্জি, পাঞ্জাবি বের করে এনে বলল, "নাও, ধরো। এখনই গরম জলে স্নান করে এসো। গেস্টরুমটা খুলে দিচ্ছি। চাদর বালিশ সব আছে। রাতে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বে।"

ত্রপা কী করবে বুঝতে পারছিল না। শিরীষের দেওয়া পোশাক হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। তার লজ্জা করছে। খুবই লজ্জা করছে। স্যারের পোশাক সে গায়ে দেবে কীভাবে?

"কী হল, কথা কানে গেল না? যাও বলছি। কাঁপছ তো। এখনই চেঞ্জ না করলে জ্বর আসবে।"

ত্রপা বিড়বিড় করে বলল, "আমার অভ্যেস আছে। একবার হয়েছিল কী..."

শিরীষ ধমক দিয়ে বলল, "চুপ! আবার গল্প শুরু করে... এ তো আচ্ছা মেয়ে!"

ত্রপার শরীরে আবার কাঁপুনি এল। তবে এবার আর শীতে নয়, এল আনন্দে। সে বাথরুমের দিকে ছুট দিল।

ধান পাকতে শুরু করছে। খেতে খুব কাজ নেই। তাই হারান একাই এসেছিল সেদিন। যেটুকু যা কাজ ছিল করে দিয়েছে। বৃষ্টি শুরু হতে চিন্তায় পড়েছিল সে, বৃষ্টির সঙ্গে বাতাস বেশি হলে ধানের ক্ষতি হবে। আমন ধানে অসময়ের ঝড় বৃষ্টি ভাল নয়। এখানে আবার চাষ একটু দেরিতেই শুরু হয়েছে। জমি তৈরি করতে সময় লেগেছিল। তারপরে বিছন তৈরিতে সময় গিয়েছে। প্রায় মাসখানেক লেগে গিয়েছে। তারপর সময় গিয়েছে বীজতলা বানাতে। সবমিলিয়ে চারা পুঁততে সেই আষাঢ় মাসের মাঝখান পর্যন্ত গড়িয়েছে। পরেরবার থেকে আর এতটা সমস্যা হবে না। তখন তো মাটি তৈরিই থাকবে। ঝড়-জলের ঝামেলা না হলে এবার অগ্রহায়ণের মাঝেই ধান পুরোপুরি পেকে উঠবে। আগেও হতে পারে। শিরীষ আসতে হারান মাথায় ছাতা খুলে সাইকেলে বসল। তার বাড়ি যেতে অসুবিধে নেই। সে তো থাকে নাওড়ুবি গ্রামে।

ত্রপা বাথরুম থেকে বেরোল খানিকটা জড়সড় হয়ে। পাজামা এবং পাঞ্জাবি, দুটোই মাপে বড় হয়েছে। হওয়ারই কথা। তবে একটা অস্বস্তি থেকে বেঁচেছে। তার ব্রা, প্যান্টি সবই ভিজে গিয়েছে। সেসব খুলে শুকোতে দিতে হয়েছে। পোশাক বড় হওয়ায় অন্তর্বাস না থাকার অস্বস্তি কম হচ্ছে। স্যারের সঙ্গে কাল সকাল পর্যন্ত থাকতে পারবে, ভেবেই খুব আনন্দ হচ্ছে ত্রপার। অনেকটা কাজ করতে পারবে। এই আনন্দের জন্য সে সব জড়তা এবং অস্বস্তিকে তুচ্ছ করতে পারে। একটু ক্ষণের মধ্যে ত্রপাকে চমকে দিয়ে শিরীষ দুটো কাজ করল। এক নম্বর হল, চা বানিয়ে ত্রপাকে তার ঘর থেকে ডেকে পাঠাল। আর দু'নম্বর হল, একটা পাতলা গায়ের চাদর বের করে দিল।

"চাদরটা ভাল করে গায়ে দাও। ঠান্ডা লেগে যাবে। চলো, আমরা বারান্দায় বসে চা খাই।"

ত্রপা এতটাই মুগ্ধ হল যে কী বলবে, কী করবে বুঝতে পারল না। হাতের চায়ের মাগটা নিয়ে খানিকটা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল। অস্ফুটে বলল, "স্যার, আপনি চা বানিয়েছেন!"

শিরীষ বলল, "কেন, আমি পারি না ভেবেছ? একসময়ে হস্টেলে থেকেছি, সব আমার শেখা। খেয়ে দেখো, আগে চুমুক দাও।"

ত্রপা কাঁপা হাতে মাগ মুখে তুলে চুমুক দিল, "অপূর্ব!"

শিরীষ হেসে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ! তাহলে তুমি আজ রাতে আমাকে খিচুড়ি বানিয়ে খাওয়াবে।"

ত্রপা কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "স্যার, আমি তো খিচুড়ি বানাতে পারি না।"

শিরীষ হেসে বলল, "নো প্রবলেম। খিচুড়ি বানানো ভেরি ইজ়ি। আমি তোমাকে বলে দেব, তুমি শিখে নেবে। চলো, চা খাই।"

গ্রিল ঘেরা বারান্দা ছোট কিন্তু দু'জনে চমৎকার বসা যায়। বেতের চেয়ার রাখা হয়েছে। বাইরে যতদূর দেখা যায় শুধু অন্ধকার। ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়েই চলছে।

ত্রপা বলল, "স্যার, আমি কি আপনার ইন্টারভিউটা শেষ করতে পারি?"

শিরীষ বলল, "অনেক তো হয়েছে, আবার কী?"

ত্রপা বলল, "একটু বাকি আছে স্যার।"

শিরীষ বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু তিনটে প্রশ্নের বেশি নয়।"

ত্রপা মোবাইলের রেকর্ডার মোড চালু করে এগিয়ে আসে। ফোনটা শিরীষের মুখের সামনে ধরল।

"এইভাবে বড় চাকরি ছেড়ে চাষ করতে চলে আসায় আপনার মিসেস কী বললেন?"

শিরীষ একটু হেসে বলল, "এটা তুমি আমার গিন্নিকেই জিজ্ঞেস করো বরং। তবে এখন নয়, এখন খুব চটে আছে। আমি যদিও নিশ্চিত, একদিন তার রাগ কমবে। মাঠ যখন সোনালি ধান বাতাসে মাথা দোলায়, তখন এক অনির্বচনীয় দৃশ্য গন্ধ তৈরি হয়। তার উপর রাগ করে থাকতে পারে?"

ত্রপা গদগদ গলায় বলল, "অপূর্ব বললেন স্যার।"

শিরীষ বলল, "তুমি এত 'অপূর্ব' বলো যে, মনে হয় 'অপূর্ব' যদি শব্দ না হয়ে মানুষ হত, বেচারি লজ্জায় মরে যেত!"

ত্রপা বলল, "স্যার, শুধু তো ক্ষেত ভরা সোনালি ধান নয়, সেই ধান বিক্রি করা নিয়েও অনেক সমস্যা হয়। ঠিক মতো বাজার পাওয়া যায় না, দাম পাওয়া যায়। কৃষককে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে হয়..."

শিরীষ সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, "সেই কষ্টটাও জানব, অনুভব করব। এটাও আমার এখানে আসার পিছনে একটা কারণ। স্বপ্ন দেখব, স্বপ্নভঙ্গ কেন হয় সেটাও দেখব।"

ত্রপা একটু আমতা-আমতা করে বলল, "স্যার, যদি রাগ না করেন, একটা প্রশ্ন করি?"

শিরীষ বলল, "বলো, কিন্তু এটাই আজকে শেষ।"

"আপনি কি কোনও রাজনৈতিক কারণে..."

প্রশ্ন পুরো শেষ করতে হয়নি ত্রপার, শিরীষ বলল, "হ্যাঁ, রাজনৈতিক কারণ আছে। একটাই রাজনীতি। নিজেকে এক অন্য জীবন চেনাব। সবাই চাইলেও এই সুযোগ পাবে না। আমার টাকা-পয়সার একটা মোটামুটি চলে যাওয়ার মতো সঞ্চয় আছে। তাই আমি এই ঝুঁকি নিতে পারলাম। আমি সুযোগটা নিলাম। ব্যস, আর একটাও প্রশ্ন নয়। চলো, খিচুড়ি রান্না শেখাই।"

সত্যি খিচুড়ি রান্না হল। প্রেশারে চাল-ডালের মধ্যে বাগানের সবজি ফেলে দেওয়া হল। শিরীষের নির্দেশ শুনে-শুনে সবটাই করল ত্রপা। তার উত্তেজনা, ভাল লাগা দেখে শিরীষ দারুণ মজা পেল।

"আজ রাতে তোমাকে একটা প্রাইজ় দেব।"

"খিচুড়ি খারাপ হলেও দেবেন?"

"অবশ্যই দেব। তোমার এত আনন্দের জন্যই দেব।"

"দারুণ হবে স্যার। আনন্দ হচ্ছে বলে পুরস্কার! মা কি সাধে আপনাকে খুব ভালমানুষ বলেছেন? প্রাইজ়টা কী জানতে পারি?"

শিরীষ গলা নামিয়ে বলল, "রাতে জানতে পারবে।"

রাতে ডিমভাজা, আচার, দিয়ে গরম খিচুড়ি খাওয়ার পর শিরীষ নিজে গেল গেস্টরুম তদারকি করতে। ত্রপা অনেক বারণ করলেও শুনল না।

"যাকে রোজ তাড়িয়ে দিই, তাকে যখন কাছে থাকতে বলি, যত্ন করবার দায় আমার।"

রাতে শুতে যাওয়ার আগে ত্রপা বলল, "স্যার, আমার প্রাইজ়?"

তখন বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। শিরীষ ফিসফিস করে বলল, "এখানে নয়, চলো, জলকাদা বাঁচিয়ে ক্ষেতের ধারে দাঁড়াই। যাবে?"

ত্রপা বলল, "অবশ্যই যাব।"

তখন মেঘ ছিল না আর। তারায়-তারায় আকাশ ভরেছে। ক্ষেত থেকে ভেসে আসছে জলে ভেজা পাকা ধানের গন্ধ। নিকষ অন্ধকারে 'স্যার' যাতে পড়ে না যান ত্রপা তার কনুই ধরল। শিরীষ গলা খুলে বলতে শুরু করল—

"যদি মনে করো, এই ভাবে কেটে যাবে দিন/ তবে তুমি ভুল করো/ যদি মনে করো, এইভাবে কেটে যাবে রাত/ তবে তুমি ভুল করো/ দিনরাত সব কেটে যায় যে যার নিয়মে/ তুমি নিয়ম ভাঙা মানুষ/ বেঁচে থাক শুধু ভাল থাকার ভ্রমে।"

শিরীষ চুপ করলে, ত্রপা আকুল স্বরে বলেছিল, "কী অপূর্ব! এই কবিতা কার লেখা?"

শিরীষ বলল, "চলো, ভিতরে যাই। শীত করছে। প্রাইজ় কেমন হল? নিজের লেখা কবিতা, নিজের মুখে শুনিয়ে দিলাম। তাও আবার ধানক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে।"

ত্রপা চুপ করে ঘরে ঢুকল। বলল, "স্যার, আমি আপনাকে একটা প্রণাম করব।"

শিরীষ ত্রপাকে কাছে টেনে কপালে একটু চুমু খেল।

"ভাল থেকো। অনেক বড় হও।"

শিরীষের রাত জ্বর এল। প্রবল জ্বর। সকালে চলে যাওয়ার সময় ডাকতে এসে জানতে পারল। তারপর থেকে রয়ে গিয়েছে ত্রপা। দু'দিন ধরে সেবা করছে। ডাক্তারকে ফোন করছে। সাঁইথিয়া থেকে ওষুধ আনিয়েছে। তবে শিরীষের ভাল হয়ে যাওয়ার কথাটা পুরোটা বিশ্বাস করছে না।

শিরীষ অবাক হয়ে বলল, "আমি মিথ্যে বলি!"

"হ্যাঁ স্যার, বলেন। ক্ষিদে পেলেও বলেন, ক্ষিদে পায়নি। শরীর ভাল না হলেও বলেন, ভাল আছি। মন খারাপ হলেও বলেন, আজ মনটা খুব ভাল। আপনাকে বিশ্বাস করি না।"

শিরীষ 'হো হো' আওয়াজ করে হেসে ফেলল। হাত বাড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে তুমি এসে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখো জ্বর আছে কিনা।"

ত্রপা চিন্তিত মুখে এগিয়ে এসে শিরীষ বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরল। তার ভুরু কুঁচকে গেল। আরও একটু এগিয়ে শিরীষের কপালে হাত দিল, গলায় হাত দিল। তারপর হাসি-হাসি মুখে বলল, "না জ্বর নেই। এবার আপনি সত্যি বলেছেন।"

শিরীষ বলল, "বাপ রে! তুমি এমন ভাব করছ যেন আমি মস্ত কোনও রোগ থেকে সেরে উঠলাম। ঠান্ডা লেগে সামান্য জ্বর হয়েছিল মাত্র।"

ত্রপা একটু চুপ করে থেকে বলল, "ক'টাদিন বাড়ি থেকে ঘুরে আসুন। ভাল করে ডাক্তার দেখিয়ে, রেস্ট নিয়ে আসুন।"

শিরীষ বলল, "খেপেছ? আমার খেতে প্রথম ধান পাকছে। এই সময়ে আমি কলকাতায় গিয়ে বসে থাকব! একেবারে নয়। এই আনন্দের স্বাদ আমি একটু-একটু চুমুক দিয়ে নিতে চাই মাই ডটার। কোনও মুহূর্ত বাদ দেব না।"

এখন দেওয়াল ঘড়িতে সকাল সাতটা বেজে এগারো মিনিট। মিনিট কুড়ি আগে ঘুম ভাঙলেও শিরীষ ওঠেনি। এবার উঠে, থম মেরে বসে আছে। কোমর পর্যন্ত চাদর টানা। ঘরের জানলাগুলো খুলে দিয়েছে ত্রপা। ঝলমলে রোদে ঘর ভেসে যাচ্ছে। ঘরটা তৈরি করার সময় বেশি জানলা করতে বলেছিল শিরীষ।

ত্রপা বলল, "দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম। দু'দিন তো কিছু মুখে দেননি। চা দিই একটু?"

"খেতে ইচ্ছে করেনি। এখন একটু করছে। সুস্থ হয়ে ওঠার লক্ষণ। দাও, চা দাও।"

শিরীষ বিছানা থেকে নামতে গেলে মাথাটা হালকা টলমল করে উঠল। করাটাই স্বাভাবিক। দু'দিন শরীরের উপর দিয়ে যা গেল! মাথা ব্যথা, গা-হাত-পা ব্যথা, ধুম জ্বর। বৃষ্টিতে ভেজার ভোগান্তি। আহা রে, দোতারা বৃষ্টিতে ভিজতে পারে না। জীবনের একটা বড় আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত। বাথরুম থেকে বেরিয়ে শিরীষ ঠিক করল যে, দু'দিনের জন্য কলকাতায় যাবে। শরীরের জন্য নয়, মেয়ের জন্য মন কেমন করছে। সোমদত্তার সঙ্গেও কতদিন দেখা হয়নি। সে কি দেখা করবে? মনে হয় না। তাহলেও একবার ফোন করতে হবে।

ত্রপা গেস্টরুমে তৈরি হচ্ছে। তাকে এবার যেতে হবে। সে স্যারের জামা কাপড় কেচে শুকিয়ে দিয়েছে। সেগুলো ভাঁজ করতে লাগল। তার চোখ বারবার ভিজে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে স্যারের কাছে গিয়ে কাঁদি। স্যার জিজ্ঞেস করুক, "এ কী! তুমি কাঁদছ কেন ত্রপা? আমি তো তোমাকে বকিনি!"

ত্রপা বলবে, "আমি বলব না স্যার, কিছুতেই বলব না।"

॥ ১০ ॥

"তোর মায়ের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

শিরীষ দোতারার সঙ্গে কথা বলেছে। দীর্ঘ আলোচনা। খানিকটা তর্কও হয়েছে। মেয়ে যে তার মায়ের পক্ষ নিয়েছে এমন নয়, তবে শিরীষের হয়েও কথা বলেনি। বরং কিছু কড়া কথাই শুনিয়েছে। শিরীষও ছাড়েনি।

দোতারাও সহজভাবে বলল, 'অস্বাভাবিক কিছু নয়, স্টিল নাউ, তোমারই তো বউ। মাথা খারাপ হতেই পারে।"

শিরীষ বলল, "তুই জানিস, তোর মা আমাকে ডিভোর্সের নোটিস পাঠিয়েছে?"

দোতারার হাতে বই। বইয়ের নাম 'সাম রেন মাস্ট ফল'। লেখকের নাম কার্ল উভে কানাউসগার। গত এক সপ্তাহ ধরে দোতারা এই বইটা নিয়ে পড়ে আছে। ফাঁক পেলেই পাতা খুলে ফেলছে। ফাঁক না পেলেও খুলছে। তখন হয়তো পড়ছে না, কিন্তু বইটা সামনে রেখে তৃপ্তি পাচ্ছে। এটা ওর ছোটবেলার অভ্যেস। একবার কোনও বইয়ের মধ্যে ঢুকে গেলে সেটা ছাড়তে চায় না। পড়ুক না পড়ুক, খাওয়া, ঘুম, বাথরুম— সবসময়ে সেই বই সঙ্গে থাকে। বিহানের সঙ্গে দেখা করার সময়েও বেশ কয়েকবার বই নিয়ে গিয়েছে। কফি বা আইসক্রিম খেতে খেতে সে বই পড়েছে, বিহান উলটো দিকে বসে থেকেছে মুখ বেজার করে। একবার ফিল্ম ফেস্টিভালেও বই নিয়ে গিয়েছিল দোতারা। বন্ধুরা মারতে বাকি রেখেছিল। সত্যি কথা বলতে কী, দোতারার এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। কোনও বইয়ের মধ্যে ঢুকে গেলে সে চট করে বেরোতে পারে না। সেদিনও বাবার সঙ্গে কথা বলতে বসে হাত থেকে প্রথমে বই সরাতে পারেনি।

দোতারা বলল, "নোটিসের কথা জানতাম না, এই জানলাম। তবে আঁচ করছিলাম। লইয়ারের কাছে মা ছোটাছুটি করছিল।"

শিরীষ অবাক হয়ে বলেছিল, "সে কী! জেনেও তুই মাকে আটকাসনি?"

এবার বই থেকে মুখ তুল দোতারা বলল, "কেন আটকাব? আমি কি তোমাকে আটকেছি?"

শিরীষ বলল, "আমাকে আটকাবি কেন! আমি কি আটকানোর মতো কোনও পাগলামি করছি?"

দোতরা শান্ত গলায় বলল, "পাগলামি একটা রিলেটিভ ব্যাপার বাবা। তোমার কাছে যা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে, মায়ের কাছে তা নাও মনে হতে পারে। উলটো ক্ষেত্রেও একই কথা সত্যি। মায়ের এই রিঅ্যাকশনটা হয়তো তার দিক থেকে স্বাভাবিক। তুমি পাগলামি বলছ।"

শিরীষ একটু থমকে গিয়ে বলে, "তুই কি মাকে এব্যাপারে সাপোর্ট করছিস তারা?"

দোতারা বলল, "আমি কাউকে সাপোর্ট করিনি, কারও বিরোধীতাও করছি না। তার প্রধান কারণ, তোমরা কেউই আমাকে জিজ্ঞেস করে কিছু করোনি। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর জানিয়েছ। তুমি একদিন ডেকে বললে, মা তো তাও জানায়নি। তার বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে শুনতে হল।"

শিরীষ বলল, "তোর মা আমাকে বিরোধী বলে ধরে নিলেও, আমি তার বিরোধী পক্ষ নই। সেকথা থাক। তোকে না বলা হলেও তুই তো সবই দেখতে পেয়েছিস তারা। বড় হয়েছিস, সবই বুঝিস।"

দোতারা আবার বইয়ের পাতায় মুখ নামিয়ে বলল, "হ্যাঁ দেখেছি। দেখেছি, একদিন তোমরা দু'জনে মিলে একটা মাটির দেওয়াল ভেঙে ফেললে। একটা সহজ, সুন্দর জিনিস ভাঙতে তোমাদের সেদিন সমস্যা হয়নি। পাথরের হলে পারতে না। কারণ পাথর কঠিন। তার প্রাণ নেই। মাটির দেওয়ালকে আগলে রাখতে হয়। সে নরম, সেনসিটিভ।"

শিরীষ থমকে গিয়েছিল। মাটির দেওয়ালের প্রসঙ্গ তুলে দোতারা কি অন্য কোনও মানে করতে চাইছে? সে কি পারিবারের কথা বলছে? হতে পারে। শিরীষ বলল, "আমি ভাঙিনি, তোর মা ভেঙেছিল।"

"না বাবা, ধাক্কাটা মা দিলেও, তুমিও দায়ী।"

শিরীষ একটু চুপ করে থেকে নিচু গলায় বলল, "সব দেওয়াল রাখা যায় না তারা। আরও বড় হলে বুঝতে পারবি। যতই নিষ্প্রাণ, কঠিন হোক, পাথরেও চিড় ধরে।"

দোতারা আবার মুখ তুলে বলল, "জানি তো, তাহলে তুমি মায়ের ডিভোর্স চাওয়া নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন? মা আলাদা হতে চাইলে হোক না। তোমার যেমন জীবনের একটা মানে আছে, মায়েরও তো থাকতে পারে।"

শিরীষ অবাক গলায় বলল, "স্বামী একটা ভেঞ্চারে নেমেছে বলে স্ত্রী ডিভোর্স নেবে! এটা কি হাস্যকর হয়ে গেল না?"

দোতারা সামান্য হেসে বলল, "একজন সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের সফ্‌টওয়্যার ছেড়ে লাঙল ধরাটা কি হাস্যকর নয় বাবা?"

শিরীষ বলল, "তুই কি বলছিস, আমি ভুল করেছি? সভ্যতা থেকে পিছিয়ে যেতে চাইছি?"

দোতারা বলল, "ভুল না ঠিক, আমি বলার কে? আর এগিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই বা উঠছে কী করে? সমাজে একজন কৃষকের যেমন প্রয়োজন, একজন সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারেরও প্রয়োজন। দুটোর কোনও একটা না থাকলেই সিভিলাইজেশন, ডেভলপমেন্টের ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যায়। শুধু চাষ করার জমি থাকলেই হয় না, জলের ব্যবস্থা করতেও ইঞ্জিনিয়ার দরকার হয়। তিনি মাটির গভীর থেকে বা দূরের কোনও খাল-বিল থেকে জল আনার কায়দা বলে দেন। বাবা, এসব তুমি আমার চেয়ে অনেক ভাল জানো। তোমার কি মনে হচ্ছে না, এত এফর্ট দিয়ে লেখাপড়া শেখার পর হঠাৎ একদিন মাঠের ধারে সানসেট দেখে সব শিক্ষা ছুড়ে ফেলাটা একটা ইমোশনাল এক্সপ্রেশন ছাড়া কিছু নয়? মনে হচ্ছে না, তুমি আসলে একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছ? তুমি তো শুধু ইঞ্জিনিয়ার নও, ম্যানেজমেন্টও পড়েছ। ফ্যামিলির কথা না হয় বাদই দিচ্ছি, একটা বড় কোম্পানি তোমাকে ভরসা করে। হঠাৎ তাদের সঙ্গেও কি বিশ্বাসঘাতকতা করা হল না?"

এই বয়সে মেয়ের তর্ক করার কায়দা দেখে শিরীষ অবাক হল না। দোতারার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের মুখে এমন কথাই মানায়। সে আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। মেয়েরা এমনিতেই বয়সের তুলনায় একটু বেশি পরিণত হয়, দোতারা অনেকের চেয়ে বেশিই পরিণত। শিরীষ একটু ভেবে, মনে-মনে গুছিয়ে নিয়ে জবাব দিল।

"আমি তোর কথা অস্বীকার করছি না তারা। এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সবাই যে সাধারণ নিয়ম মেনে চলবে, এমন তো কোনও কারণ নেই। কত মানুষ যা পড়েছেন, যা শিখেছেন, তার বাইরে গিয়ে

পেশা বেছে নিয়েছেন। শিখেছেন ডাক্তারি, আর করেছেন অভিনয়, অর্থনীতি পড়ার পর ছবি এঁকেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, হিসাবশাস্ত্রে পাকা হয়েও মন দিয়েছেন ফুটবল খেলায়, আবার ফুটবল খেলোয়াড় উপন্যাস লিখেছেন। তারা সবাই ভুল করেছেন? না, করেননি। এরকম বহু মানুষ পৃথিবী বিখ্যাত। এটা মানুষের নিয়ম, সমাজের নিয়ম এখানে খাটে না। যা ভাল লাগে, মন যা চায়, সেদিকে মানুষ যেতে পারে। একমাত্র মানুষই পারে। নিশ্চিন্ত চাকরি ছেড়ে ব্যবসার ঝুঁকি নেওয়ার উদাহরণ আমরা সবসময়ই দেখছি। কেউ সাকসেসফুল হচ্ছে, কেউ ফেল করছে। তাতে রিস্ক নেওয়া কমছে? তাহলে আমি কেন নতুন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে পারব না? আমার ইচ্ছে করছে শহরের র‍্যাট রেস ছেড়ে গ্রামে গিয়ে থাকতে, চাষবাস করতে। তাই করব। আর ওই যে বললি, হঠাৎ দিগন্তে সূর্যাস্ত দেখে ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছি, কথাটা পুরো সত্যি নয়। চিরকালই আমি আউট অব দ্য বক্স। সবাই যেমনভাবে চলে, তেমনভাবে চলতে পারিনি। এখন মনে হয়, স্বভাবটা আমার মামাবাড়ির দিক থেকে এসেছে। দাদু ঘরসংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দুম করে খানিকটা জমি কিনেও ফেলেছিলেন। বড়মামা বাড়িঘর বেচে দেশ বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছেন। ছোটমামা তো কবে ঘর ছেড়েছিলেন। আমার ভিতরেও কোথাও একটা এই ইনস্টিংক্ট ঘুমিয়েছিল। সেদিন নাওডুবি গ্রামের সূর্যাস্ত হয়তো তাকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলেছে।"

এতটা বলে থেমেছিল শিরীষ। টেবিলে রাখা বোতল খুলে জল খেতে গিয়ে দেখল জল নেই। ফ্ল্যাটে আজকাল অনেক কিছুই গোছানো থাকে না। তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকে বলে ধুলো জমে যায়। সোমদত্তা তো একেবারেই আসে না। শুধু শিরীষ চাপ দিতে সে ঘরদোর ছেড়ে চলে যায়নি, তার উকিলও তাকে পরামর্শ দিয়েছে। ডিভোর্স পেতে গেলে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আলাদা থাকতে হবে। দোতারা মাঝেমধ্যে এসে থাকে। তখন নিজের যেটুকু দরকার পরিষ্কার করিয়ে নেয়। একমাত্র শিরীষ এলেই ভাল করে ঝাঁড়পোচ পড়ে। তবে তার ব্যবধান বেড়ে গিয়েছে। গতমাসে তো কুড়িদিন ফ্ল্যাট বন্ধ ছিল।

দোতার উঠে গিয়ে রান্নাঘর থেকে বোতলে জল ভরে আনল। শিরীষ জল খেয়ে নিচু গলায় বলল, "তারা, তুই এত কিছু জানিস, এত ম্যাচিওরিটি তোর, আর এটা জানিস না সব কাজেই ইমোশন দরকার হয়? শুধু কবিতা লেখা বা ছবি আঁকা নয়, শুধু রাজনীতির মিটিং-মিছিল নয়, একজন সায়েনটিস্টও ইমোশন থেকে কাজ করে। ঠিকভাবে নিজের দায়িত্ব পালনকে যতই আমরা পেশাদার বলে পাশ কাটানোর চেষ্টা করি না কেন, সেটা আবেগ ছাড়া কী? দায়িত্ব পালনের আবেগ। তাই ইমোশন আছে বলে আমি কখনও লজ্জা পাই না। নাওডুবি প্রজেক্ট আমি ইমোশন দিয়েই করে দেখাতে চাই।"

দোতারা এবার একটু থতমতই খেল। বাবার উত্তর এতটা জোরালো হবে তা বুঝতে পারেনি। বোঝা উচিত ছিল। এখন যাই পাগলামি করুক, তার বাবা একজন অতি বুদ্ধিমান মানুষ। যুক্তিতে তাকে পরাস্ত করা মুশকিল। ক'দিন আগে পর্যন্ত কোনও ডিবেট কম্পিটিশনে যেতে হলে বাবার কাছ থেকে পয়েন্ট জেনে নিয়েছে। সেই মানুষটার সঙ্গেই ডিবেট করতে হচ্ছে, কঠিন তো হবেই।

দোতারা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "বাবা, আমি কিন্তু বলিনি তুমি পারবে না। কঠিন কোনও প্রজেক্টকে উতরে দেওয়ার এফিশিয়েন্সি তোমার আছে। আমি বলতে চেয়েছি, যে যার ফিল্ডে নিজের শিক্ষা, গুণকে কাজে লাগানোটাই কি ঠিক নয়?"

শিরীষ মেয়ের প্রশংসা গায়ে না মেখে বলল, "গ্রামে কত ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখে বড় হয়। গ্রাম ছেড়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করে। তাদের মধ্যে আমার মতো অনেক সফট্‌ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। তার জন্য কি গ্রামে চাষবাস করবার লোক কমে গিয়েছে? ফসল কম ফলছে? মোটেই নয়। আমার বেলাতেই বা তা হবে কেন? কোম্পানি চালানোর জন্য লোক ঠিক চলে আসবে। তা ছাড়া, এতদিন তো যা শিখেছি, তাই নিয়ে নাড়াঘাঁটা করলাম। এবার একটু ছুটি নিই।"

দোতারা হাতের বই বন্ধ করে বলল, "সরি বাবা, আমি যদি তোমাকে হার্ট করে থাকি, দুঃখিত। প্রথম তুমি যখন চাষবাসের কথা বলেছিলে, তখন তুমি একধরনের ঘোরের মধ্যে ছিলে। ভেবেছিলাম, গ্রামের কঠিন পরিবেশে থাকতে গিয়ে হার্ড রিয়েলিটি তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি সেই ঘোর থেকে বের করে আনবে। আমি তখন যুক্তি নিয়ে তোমার মধ্যে ঢুকব। তুমি সারেন্ডার করবে।"

শিরীষ একটু হেসে বলল, "এখন কি দেখছিস, ঘোর কেটেছে?"

দোতারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "না, বেড়েছে। আরাম বিলাস ছেড়ে কঠিন জীবনে গিয়ে তুমি যেমন কালো হয়েছ, রোগা হয়েছ, তেমন চোখে এক ধরনের ব্রাইটনেসও এসেছে। ঝকঝক করছে। ঘোর লাগা চোখে যেমন হয়। সেই ঘোর থেকেই তুমি তোমার নড়বড়ে যুক্তিগুলো আরও শক্তপোক্ত করার চেষ্টা করেছ। নিজের সুবিধে মতো সাজিয়ে নিয়েছ। যাই হোক, তোমাকে কিন্তু হোলহার্টেডলি সাপোর্ট করতে পারলাম না। চাষবাস করার আরও অলটারনেটিভ মেথড তোমার কাছে ছিল। কলকাতা ছেড়ে পাকাপাকি চলে যাওয়ার দরকার ছিল না। টাকা না থাকলে তুমি যেমন নাওডুবি প্রজেক্টে নামতে পারতে না, তেমন টাকা দিয়ে ম্যানেজার রেখেও কাজ করাতে পারতে। সেখানে জলকাদা, সাপের মধ্যে ঘর বানিয়ে থাকতে হত না।"

শিরীষ বলল, "না পারতাম না। আমি গোমস্তা রেখে জমিদার হওয়ার জন্য এই প্রজেক্ট নিইনি। তা ছাড়া শহরের জীবন আমার আর ভাল লাগছে না, সেটা তো বলেছি।"

এরপর একটু চুপ করে ছিল দোতারা। তারপর গলা নামিয়ে বলেছিল, "বাবা, তুমি বরং মায়ের সঙ্গে বসে কথা বল। আমাকে যেভাবে বললে সেভাবে বলো। মা আমার মতো অত সহজে তোমার যুক্তির নড়বড়ে দিকগুলো বুঝতে পারবে না। আমিও থাকব।"

শিরীষ উৎসাহ নিয়ে বলল, "অবশ্যই বসব। আজই বসব। তুই এখনই ফোন কর। আচ্ছা, আমি করছি।"

দোতারা তাড়াতাড়ি বলল, "তোমাকে করতে হবে না। দাঁড়াও, আমি করছি। তোমার গলা শুনে আবার চটে না যায়।"

বই সরিয়ে দোতারা ফোনে নম্বর টিপল। একবার বাজতেই সোমদত্তা তুলেছিল।

"মা, তুমি কি অফিসে?"

সোমদত্তা বলল, "না, সল্টলেকে। তুই কোথায়? ফোনে পাওয়া যায় না কেন? সকাল থেকে কতবার ফোন করছি!"

দোতারা বলল, "ফোন সাইলেন্ট করে পড়াশোনা করছিলাম।"

সোমদত্তা বলল, "সল্টলেকে এসে কদিন থাকতে তো পারিস। মাও ডাকছিল, মায়ের শরীরটা ভাল নেই। সেই জন্য আজ কামাই করেছি। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে তারা।"

দোতারা বলল, "শনিবার যাব।"

সোমদত্তা বলল, "শনিবার কেন? আজই আয়। কসবায় যেতে বলেছিলাম না? গিয়েছিলি?"

দোতারা একটু ভেবে নিয়ে বলল, "এই তো আজ এসেছি। বইটই কিছু নেওয়ার আছে।"

সোমদত্তা বলল, "কাজ না থাকলেও যাবি। মাঝেমধ্যে গিয়ে রাতে থাকবি। মনে রাখবি ওই ফ্ল্যাট আমারও। ওখানে আসা যাওয়া না থাকলে ওই নোংরা মেয়েটা এসে ঢুকে পড়বে। দখল নেবে।"

দোতারা এবার বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি যে কী সব উদ্ভট কথা বলো! বাবা আছে না?"

সোমদত্তা ব্যঙ্গের হেসে বলল, "তোর বাবা কী করবে? এই সব মেয়েকে ঠেকাবার ক্ষমতা তোর বাবার নেই। সে তো এখন ওই হাঁটুকন্যাকে নিয়ে পাগল! তোর বাবার হাঁটুর বয়সি বলে হাঁটুকন্যা নাম দিয়েছি। নাম ভাল হয়েছে না? তবে জেনে রাখ তারা, অত সহজ হবে না। আমি ওই হারামজাদিকে কোর্টে টেনে এনে কলগার্ল প্রমাণ করে

ছাড়ব। তোমার বাবার প্রেম আমি বের করছি।”

দোতারা এবার বাবার সামনে থেকে উঠে অন্য ঘরে চলে গেল।

“মা, তুমি মাথা ঠান্ডা করো। তোমাকে বলেছি না, তোমার মুখে এসব কথা মানায় না?”

সোমদত্তা রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে বলল, “তোমার বাবা যে-কাণ্ডটি করছে, সেটা মানায়? ধেড়ে বয়েসে একটা কচি খুকির সঙ্গে...সব ফাঁস করে দেব...”

দোতারা শান্ত গলায় বলল, “আমার একটা কথা শোনো। তুমি আর বাবা একবার মুখোমুখি বসো। রাগারাগি, মারামারি করো। একটা পর্যায় পর্যন্ত আমিও থাকব। বাবার প্রজেক্টটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়, তবে আমি নিশ্চিন্ত বাবা ওই অজ গ্রামে বেশিদিন থাকতে পারবে না। তাকে ফিরতেই হবে। কোর্টকাছাড়ি করে সেই পথটা বন্ধ করে দিও না মা। মানুষের নানারকম ইমোশন থাকে। বাবার তো অনেক বেশি। ঠিক ঘোর কাটবে। প্লিজ় মা...”

সোমদত্তা একটু চুপ করে থেকে বলল, “বাবার ব্রিফ নিয়েছিস?”

দোতারা হেসে বলল, “মেয়ে হয়ে বাবার ব্রিফ নিলে ক্ষতি কী?”

সোমদত্তা আবার একটু থেমে থেকে বলল, “বেশ, বসব। কিন্তু তার আগে, তোর বাবাকে একটা শর্ত মানতে হবে। লোকাল থানায় গিয়ে ওই মেয়ের নামে ডায়েরি করতে হবে। বলতে হবে, মেয়েটি তাকে ফাঁসিয়েছিল। এবার জালিয়াতি করে টাকাপয়সা নিতে চাইছে। ডায়েরির কপি আমাকে পাঠিয়ে দিলেই আমি বসে পড়ব। একথা আমি তোর বাবাকেও বলে দিয়েছি। এবার তুই রাজি করা। ও যত তাড়াতাড়ি হয় তত মঙ্গল। ওই মেয়ে তোমার বাবার মাথা কম খেতে পারবে।”

মায়ের ফোন ছেড়ে শরবত বানাল দোতারা। বরফের কিউব দিল। গতবার এসে ডিপ ফ্রিজে জল পালটে রেখে গিয়েছিল। নিজেকে নিয়ে বেশ অবাকই লাগেছে দোতারার। অনেকটা বয়স বেড়ে গিয়েছে যেন। কত ছেলেমেয়েকে তার চেয়েও কম বয়স থেকে বাবা-মাকে দেখতে হয়। রোজগার করে খাওয়াতে হয়। সে বাবা-মায়ের দায়িত্ব পালন করছে একেবারে অন্যভাবে। দূরত্ব কমিয়ে যদি কাছাকাছি আনা যায়।

প্রসঙ্গটা কীভাবে তুলবে বুঝতে পারছে না সে। বাবাকে কোনও মেয়ের একথা বলা কি ঠিক? বাবার প্রেমিকা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করা যায়? মনে হয় না যায়। কিন্তু এখন এসব ভাবলে চলবে না। আর সে তো সাধারণ মেয়ে নয়। তার চিন্তা ভাবনা আধুনিক। সে সমাজের তৈরি করা ঠিক ভুল নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাবার সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধুর মতো। আর মাকে যদি ওই ত্রপা মেয়েটো নিয়ে বকুনি দিতে পারে, বাবাকে পারবে না কেন? মা যেমন মেয়েটি সম্পর্কে অন্যায় কথা বলছে, বাবাও তাকে কাছে রেখে ঠিক কাজ করছে না। এটাও বাবার জানা উচিত।

শিরীষ আগ্রহ নিয়ে বলল, “কী বলল তোর মা?”

দোতারা কাচের গ্লাসে গায়ে জমে ওঠা জলের বিন্দুতে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, “মায়ের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে না?”

“কথা তো অনেক হয়েছে। ডিভোর্সের নোটিস পেয়ে তোর মাকে আমি ফোন করেছিলাম। তুই কোন বিষয় বলছিস?”

দোতারা মুখ তুলে সরাসরি শিরীষের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, “ত্রপা নামের মেয়েটির কথা বলছি। মা ওকে মেনে নিতে পারছে না। সেটাই স্বাভাবিক।”

শিরীষ মাথা নামিয়ে বসে রইল। দোতারা নরম গলায় বলল, “শরবতটা খাও।”

শিরীষ গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, “তোকে কী বলেছে?”

দোতারা বলল, “বাবা, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। কোনও স্ত্রীর পক্ষে কি এটা মেনে নেওয়া সম্ভব?”

শিরীষ সোফায় হেলান দিয়ে বসল। শান্তভাবে বলল, “তুই কি ত্রপা সম্পর্কে কিছু জানিস? জানিস সে কে? কেন সে নাওডুবিতে আমার কাছে যাতায়াত করে?”

দোতারা হেসে বলল, “না জানি না বাবা। জানতে চাইও না।”

শিরীষ শান্ত বলল, “কেন চাস না? যার বিরুদ্ধে একতরফা অভিযোগ করছিস, তার সম্পর্কে জানাটাও তো একটা কর্তব্য। নয় কি?”

দোতারা বলল, “বাবা, তুমি খামোকা রাগ করছ। আমি কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করিনি। আমি যদি তোমার কাছে ওর সম্পর্কে একটা কথাও শুনি সেটা হবে তোমার কৈফিয়ৎ নেওয়া। সেটায় আমি কিছুতেই রাজি হব না। আমার একটাই বলা, সে যেই হোক, মা ওকে পছন্দ করছে না।”

শিরীষ এবার চিৎকার করে উঠল, “একদম বাজে কথা, একদম মিথ্যে! তোর মা ত্রপাকে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র। সে যখন আমাকে ছেড়ে, এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল তখন ত্রপা কোথায়? তোর মা একজন লোভী মহিলা। সে আমার কেরিয়ার, আমার টাকাপয়সা, আমার বিদেশে গিয়ে সেটল হওয়া নিয়ে ব্যস্ত। সেখানে হাত পড়তেই কেঁপে উঠেছে। নাওডুবির জমিটা বড়মামার কাছ থেকে একরকম জোর করেই ও নিয়ে নেয়। পাছে আমি আটকে দিই ...আমি তো নিতে চাইনি। আজ বলে নয়, কোনওদিনই সে আমাকে বুঝতে চায়নি। তুই জানিস না তারা? নিজের মাকে চিনিস না? কেরিয়ার নিয়ে তোর মা তোকে কম অতিষ্ঠ করেছে? শি ইজ় আ গ্রিডি উওম্যান। বাইরের চাকচিক্য ছাড়া কিছু চেনে না। এক একেকটা সময় আমার দমবন্ধ লাগত। মনে হত ভিতরের সব জানলাগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন কেউ যদি এসে এক একটা করে জানলাগুলো খুলে দিতে থাকে, তোর মায়ের হিংসে হচ্ছে কেন? সে ছেলে হোক, মেয়ে হোক, কী এসে যায়? মেয়ে বলে, কম বয়স বলে ত্রপা তো কোনও অন্যায় করেনি। তার মনে হচ্ছে, একটা বুড়ো মানুষের ক্ষ্যাপামির সঙ্গে থাকবে, সে আছে। ব্যস, মিটে গেল।”

শিরীষ থামলে দোতারা উঠে গিয়ে বাবার পাশে বসেছিল।

“শান্ত হও। এখন এসব ভেবে লাভ কী?”

শিরীষ একইরকম উত্তেজিত হয়ে বলল, “অবশ্যই লাভ আছে। এখনও নিজের মতো করে জীবনকে অনুভব করবার সময় আছে। সেই সুযোগ পেয়েছি আমি। তাকে কোনওভাবে হারাতে চাই না। দেবও না।’

দোতারা বলল, “বাবা, এটা কি বড্ড বেশি স্বার্থপরের মতো কথা হয়ে গেল না?”

শিরীষ বলল, “না, হল না। নিজেকে ভালবাসা কোনও স্বার্থপরতা নয়। নিজেকে ভাল না বাসলে অন্যকেই বা ভালবাসব কী করে! তারপরেও যদি মনে করিস স্বার্থপরতা, তো তাই। সব দায়িত্ব পালন করে এবার আমি না হয় স্বার্থপরই হলাম।”

দোতারা মাথা নামিয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর অস্ফুটে বলল, “আমার মনে হয় না, এই সমস্যার কোনও সমাধান আছে। অন্তত এখন তো নয়ই। তুমি বরং মায়ের ডিভোর্স নোটিসে রাজি হয়ে যাও। এই টানাপোড়েনের মধ্যে না থেকে একটা সেটলমেন্টে এসো।”

শিরীষ মেয়ের দিকে তাকিয়ে চোয়াল শক্ত করে বলল, “কখনও নয়। কোনওদিন নয়। আমি ডিভোর্স চাই না। আমি কোর্টে কনটেস্ট করব। দেখি, শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে চাষ করবার অপরাধে তোর মা কীভাবে ডিভোর্স আদায় করে।”

দোতারা এবার মলিন হেসে বলল, “বেশ, ভাল। তোমরা যুদ্ধ কর। আমি না হয় দূর থেকে দেখে হাততালি দেব।”

শিরীষ উঠে দাঁড়ায়। বলে, “তোকে শুধু একটা কথা বলব, যদি ইচ্ছে হয় শুনবি, না হলে শুনবি না। একবার নাওডুবিতে আয়। নিজের চোখে দেখে যা।”

দোতারা নিচু গলায় বলল, “বাবা, তুমি কি মাকে চিনতে ভুল করেছিলে?”

শিরীষও চুপ করে রইল। মেয়েকে কী বলবে সে? সোমদত্তা তাকে পুরোটা চিনতেই চাইল না। টাকা-পয়সা, ঘর সংসার, অফিস প্রোমোশনের বাইরেও যে মানুষের আর একটা পরিচয় থাকে, মন

থাকে, সেটা ও বুঝতে চায়নি কখনও। শুধু বাইরে থেকে গিয়েছে। মাঝেমধ্যে হাততালিও দিয়েছে। অথচ প্রথম ঘনিষ্ঠ হয়েছিল কবিতা শোনার পর। লন্ডনে, টেমস্ নদীর ধারে। ঝকঝকে ছেলে তো আরও ছিল, তারপরেও তার প্রেমে পড়েছিল সোমদত্তা। সে তো 'অন্যরকম' বলেই। নিজের বাবার সঙ্গে প্রথম আলাপেও তার ছবি আঁকা, অভিনয়, কবিতার কথা বলেছিল। অথচ সেই 'অন্যরকম'-কেই মেনে নিতে পারে না। এমন তো নয় যে, শিরীষ মুখার্জি দায়িত্বজ্ঞানহীন, এমন তো নয় সে গৃহত্যাগী হয়েছে। স্ত্রী এবং মেয়ের জন্য যতটা পেরেছে দায়িত্ব পালন করেছে এতদিন। এখন তো ওরা স্বাবলম্বী। পারিবারিক সূত্রে পাওয়া একটা বড় অঙ্কের টাকা দু'জনের জন্য সঞ্চয় করে দিয়েছে। বাকিটা রেখেছে নিজের নামে। এই টাকা বাবা রেখে গিয়েছেন। শিরীষ তখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করেছে। মা মারা গেলেন। বাবা বললেন, "কলকাতা আর আশপাশে আমাদের কিছু জমি-বাড়ি, গোডাউন রয়েছে। ঠাকুরদার আমলে প্রপার্টি। আমার মনে হয় না, এই সম্পত্তি রেখে দিয়ে লাভ আছে। শিরীষ, তোমাকে দেখে মনে হয় না, সম্পত্তি গুছিয়ে রাখার যোগ্যতা বা ইচ্ছে কোনওটাই তোমার আছে। আমি মরে গেলে সব বেহাত হয়ে যাবে। চারপাশে পরিস্থিতি ভাল নয়। অন্যের জিনিস নেওয়ার জন্য সবার জিব লকলক করছে। সভ্যতার চাকা মনে হয়, উলটো দিকে ঘুরতে শুরু করেছে। অন্যের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার অসভ্য যুগ ফিরে আসছে। তাই ঠিক করেছি, সব প্রপার্টি বিক্রি করে তোমার জন্য টাকা আমি গুছিয়ে দিয়ে যাব।"

সেই সময় বাবার গোছানো নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামায়নি শিরীষ। ফিরে তাকায়ওনি। ব্যাঙ্কে, পোস্ট-অফিসে আরও কিছু শেয়ার সার্টিফিকেট হয়ে পড়েছিল এতদিন। সোমদত্তাও এই টাকার খবর যে পুরোটা জানত, এমন নয়। এখন সেসব কাগজপত্র বের করছে শিরীষ। দোতারার লেখাপড়ার কোনও সমস্যাই হবে না। ইচ্ছে করলে, বাইরে গিয়ে পড়তে পারবে। তবে লেখাপড়ায় ওর যা মেধা, তাতে বাইরে যাওয়ার জন্য অন্যের টাকা লাগবে না। নিজেই স্কলারশিপ জোগাড় করতে পারবে। চাকরি ছাড়ার পর অফিস থেকেও টাকা পেয়েছে শিরীষ। তাও খুব কম নয়। তার একটা অংশ দিয়ে 'নাওডুবি প্রজেক্ট' শুরু করেছে। একে ইনভেস্টমেন্ট হিসেবেই দেখেছে। জমি থেকে ফসল উঠলে বিক্রি করবে আর পাঁচজনের মতোই। এ বিষয়ে শিরীষের পরিকল্পনাও হয়ে গিয়েছে। সে ম্যানেজমেন্টের ছাত্র। আগামী দিনের 'প্রজেকশন রিপোর্ট' হাতে নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্থ। 'নাওডুবি প্রজেক্ট' এর বেলাতেও তাই করেছে। চাষবাসের খরচ খরচটুকু বাদ দিয়ে বাকি টাকা নিজের খাওয়া-পরার জন্য রাখবে। এখনই হয়তো সব খরচ মিটবে না, তার জন্য তো ব্যাক আপ আছে। বাকি টাকা সোমদত্তা আর মেয়েকে পাঠিয়ে দেবে। তার পরিমাণও বেশি হবে না, কিন্তু সাধারণভাবে চলে যায়। এমন তো নয় তাদের ধান বিক্রির পয়সায় খেতে হবে। সোমদত্তার নিজের চাকরি আছে। সেখানে সে ভাল পোস্টে কাজ করে। বেতন যথেষ্ট ভাল। আর দোতারা? সে তার নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারবে।

শিরীষ সোমদত্তাকে বারবার করে এসব কথা বুঝিয়েছে, জমানো টাকা-পয়সার হিসেব দেখিয়েছে। সোমদত্তা শুনতে চাইল না। শিরীষের মনে হয়েছে, টাকা-পয়সা নয়, আসলে স্বামীর মনের কথাটাই শুনতে চায়নি।

"তোমাকে অন্যরকম থাকতে কে বারণ করেছে শিরীষ? আমি বারণ করেছি? বরং আই ফিল প্রাউড। আমার অফিস কলিগ, আত্মীয়স্বজন, পরিচিতি সবাই জানে, সোমদত্তার হাজ়ব্যান্ড আর পাঁচজনের মতো নয়। উইকেন্ডে পার্টি করার বদলে সে থিয়েটার দেখতে ভালবাসে, ছুটি পেলে টুরিস্ট স্পটের বদলে গ্রামে বেড়াতে যেতে চায়, শনিবার কবিতা নিয়ে থাকে, রবিবার ছবি আঁকে। শনি-রবি দুটো দিন কি তোমার অন্যরকম হওয়ার জন্য এনাফ নয়? তোমার রুচি, কালচার, তোমার যাবতীয় রোমান্টিসিজ়মের এক্সারসাইজ় কি এই দুদিনে সেরে নেওয়া যায় না? এতদিন তো তাই করেছ। তোমার জন্য আমাকে চাষির বউ হতে হবে?"

শিরীষ বলেছিল, "তোমাকে আমি বোঝাতে পারছি না সোম। তুমি কতগুলো ফিক্সড ধারণা নিয়ে বসে আছ। তুমি কর্পোরেটের বড় চাকুরের বউ নয়, আবার চাষির বউও নয়। এর কোনও পরিচয়টাই গর্বের নয়। তোমাকে বউ পরিচয়ে থাকতে হবে না। তুমি সোমদত্তা মুখার্জি, নিজের পরিচয়ই যথেষ্ট। তুমি আমার পাশে থাকো। তোমাকে ফিজ়িক্যালি নাওডুবিতে গিয়ে পড়ে থাকতে হবে না। কাদা-জলে নামতে হবে না, কিন্তু মানসিকভাবে এই প্রজেক্টটাকে সমর্থন করো। সবাই নিজের ভাবনা, কল্পনা, নতুন কিছু করার ইচ্ছে শনি-রবিবারের জন্য বাক্সে ঢুকিয়ে রাখতে পারে না সোম।"

সোমদত্তা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিল, "একই কথা বারাবার বলছ কেন? আমি কি তোমার মেয়ের মতো বোকা? না ছেলেমানুষ? যা বলবে তাই বুঝব? চাকরি-বাকরি, ঘর দোর ছেড়ে, কাঁধে লাঙল নিয়ে চাষ করতে যাওয়াটা কিছু করা হল?"

শিরীষ শান্তভাবে বলল, "কিছু করা হল কিনা তাই নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই সোম, এই মুহূর্তে ভাল লাগছে বলে আমি করব। চ্যালেঞ্জিং প্রজেক্ট, খুব কঠিন, টিকে থাকাটা প্রায় অসম্ভব, সেই জন্য এত ইন্টারেস্টিং। পড়ে থাকা একটা জমিতে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে ফসল ফলানোর আনন্দ আমি অনুভব করতে চাই। সরল জীবনের মধ্যে থেকে নিজেকে চিনতে চাই সোম। এরপর আর সুযোগ হবে না। দাদুর মতো অসুস্থ হয়ে পড়ব, চ্যালেঞ্জ নেওয়ার সাহস, ইচ্ছে— দুটোই ফুরিয়ে যাবে। ফেল করলে ফিরে আসব। আর যদি সাকসেসফুল হই, চাষবাসের কাজ আরও একটু বাড়াব। বছরের একেকটা সময়ে একেকরকম ফসল হবে। এক্সপেরিমেন্ট হবে। কত লোকে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করে, আমার এই চাষবাসটাও সেরকম ধরো না!'

সেদিন উঠে দাঁড়িয়ে শিরীষ মেয়েকে বলেছিল, "একটাই কথা বলব, রাখবি কিনা তোর ব্যাপার। একবার নাওডুবিতে আয়। নিজের চোখে দেখে যা।"

দোতারা ফিসফিস করে বলে, "যাব। অবশ্যই যাব। আমি আগেই ঠিক করেছি।"

শিরীষের মুখে হাসি ফোটে। বলে, "থ্যাঙ্ক ইউ, মাই চাইল্ড। আমাকে জানাতে হবে না। হুট করে চলে আয়।"

দোতারা চকিতে মুখ তুলে বাবাকে দেখে। তারপর এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে।

॥ ১১ ॥

সোমদত্তা সরে দাঁড়িয়ে মৈত্রেয়কে ঢোকার জায়গা করে দিল। দরজার লক আটকে পিছনে সিঁড়ির দিকে তাকাল এক ঝলক। ঘরের একপাশ দিয়ে দোতলা ওঠার সিঁড়ি চলে গিয়েছে পাক মেরে। না, সিঁড়িতে কেউ নেই।

থাকার কথাও নয়। মাধুরী ঘুমোচ্ছেন উপরে। মায়ের কাছে রাতদিনের যে মেয়েটা থাকে, সে গিয়েছে বাড়িতে। রাতে ফিরবে। না হলে কাল সকালে। না এলে ফোনে জানিয়ে দেবে। সোমদত্তা বারবার বলে দিয়েছে, আজ না এলেও কাল সকালে যেন অবশ্যই আসে। দোতারা সকালে ফোন করে জানিয়েছে, তাকে ল্যাবরেটরিতে থাকতে হবে রাত পর্যন্ত।

এরপরই সোমদত্তা মৈত্রেয়কে ফোন করে। তার সঙ্গে আজ দেখা করে নাওডুবি থেকে জোগাড় করা খবর শোনার কথা।

"বাড়িতে কেউ নেই, বেরোতে পারব না। দুপুরে এসো।"

মৈত্রেয় হালকা গলায়, "কেউ তোমাকে বকবে না!"

সোমদত্তা গাঢ় স্বরে বলল, "ঠাট্টা কোরো না। চলে এসো।"

মৈত্রেয় বলল, "সোমদত্তা, ঠাট্টা নয়। আমি সিরিয়াস, খবরটা বাইরেই বলব।"

সোমদত্তা একটু চুপ করে থেকে বলল, "এলে রাগ ভাঙিয়ে দেব।"

মৈত্রেয় বলল, "না, শোনো..."

সোমদত্তা ফোন কেটে দিল। সে নিশ্চিত মৈত্রেয় আসবে। এসেছেও।

সোমদত্তা তাকে বসার জায়গায় নিয়ে এল। সোফায় বসে মৈত্রেয় বলল, "কত বছর পর এই বাড়িতে এলাম?"

"অনেক।"

সোমদত্তা জানে, শরীর ভাল নেই বলে, মা আজ একটু বেশিই ঘুমোবে। না ঘুমোলেও কিছু নয়। একা নীচে নেমে আসার শক্তি তার নেই। পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পাওয়ার পর থেকে সিঁড়িতে একা ওঠা নামা করতে পারে না।

এই মুহূর্তে স্লিভলেস নাইটির উপর একটা হাউসকোট পরে আছে সে। এই পোশাক সে বেছে পরেছে। হাউসকোটে ফুলের ছবি। গোলাপি রঙের ফুল। দু'বছর আগে শীতে শিরীষের সঙ্গে সিঙ্গাপুর বেড়াতে গিয়ে কিনেছিল। সেবার দোতারাও ছিল। পোশাকের দোকানে ঢুকে দোতারা একটা হাউসকোট দেখিয়ে বলল, "মা, এটা নিয়ে নাও।" হাউসকোট ঘিরে মস্ত একটা ড্রাগন হাঁ করে আছে। মুখ থেকে আগুন বেরোচ্ছে। সেই আগুন একপাশের বুক টপকে কাঁধ পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

সোমদত্তা ভুরু কুঁচকে মেয়েকে বলেছিল, "এই জামা নেব কেন? আমি কি ড্রাগন?"

দোতারা মুচকি হেসে বলল, "পুরোটা না হলেও খানিকটা তো বটেই। তুমিও মুখ দিয়ে প্রায়ই আগুনের হলকা বের করো। আমরা ভয়ে মরি। এবার থেকে আর কষ্ট করে হলকা ছুড়তে হবে না। এই ছবি দেখেই আমরা ভয় পাব।"

সোমদত্তা মেয়ের রসিকতায় রেগে যাচ্ছে দেখে শিরীষ সামলেছিল। বলেছিল, "ড্রাগন হওয়া কি সহজ? সংসারে একজন ড্রাগন থাকা দরকার। নইলে তোর মতো বিচ্ছুদের শায়েস্তা করত কে?"

দোতারা গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমিও কম নও। মাকে মাঝেমধ্যে তোমার দিকেও ফায়ার বল ছুড়তে হয়।"

শেষপর্যন্ত শিরীষই একটা জামা বেছে দিয়েছিল। খুব সুন্দর। কোটটা জুড়ে যেন গোলাপি রঙের একটা বাগান। ড্রাগন বাতিল হয়ে গিয়েছে, ফুলও যাতে বাতিল না হয় তার জন্য কাউন্টারের মেয়েটি উৎসাহ দিল। এগুলো চিনা ফুল। নাম পেওনি। চিনা উচ্চারনে বলা হয় 'মিতাও'। ধনসম্পদ, উন্নতির প্রতীক। এসব তথ্য কতটা ঠিক, কতটা ভুল কে জানে, দোতারা এবারও লাফিয়ে পড়ল।

"মা, বাবা ঠিক জিনিস বেছেছে। জামায় টাকাপয়সা, কেরিয়ারের ব্যাপার আছে, তুমি নিয়ে নাও। কখন কাজে লেগে যাবে।"

জামাটা সুন্দর। সোমদত্তাকে দেখাচ্ছেও ভাল। এমনিতেই সে সুন্দরী। চেহারা, চোখমুখে একধরনের তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য রয়েছে। গায়ের রং খুব ফর্সা না হলেও উজ্জ্বল। কোমর, বুক একটু ভারির দিকে। তবে চেহারার সঙ্গে মানানসই। বড়-বড় চোখ, টিকোলো নাক-চিবুকে বুদ্ধির থেকে জেদের ছাপ বেশি। মেয়েদের চোখমুখে জেদের ছাপ পুরুষমানুষের জন্য আকর্ষক। সোমদত্তা লম্বা। গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদের তুলনায় বেশিই লম্বা। দেখলে বোঝা যায় না, চল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছে। বিয়ের আগে রূপ-সৌন্দর্য, ফিটনেস নিয়ে মাথা ঘামাত। নিয়মিত সাঁতার কাটত, জিমে যেত। খাওয়া-দাওয়া ভেবেচিন্তে করত। যাতে চর্বি না জমে। বিয়ের পরপরও কিছুদিন এসব মেনেছে। মেয়ে হওয়াতে ভাঁটা পড়েছিল। সময় কই? আবার মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ায় নিজের দিকে মন দিয়েছিল। নিয়ম করে বিউটি পার্লারেও যেত। তিনমাসে একদিন স্পায়ে ঢুকত। বাইরে বেরোনোর সময় সেজেগুজে, ফিট হয়েই বেরিয়েছে। অফিসের জন্য আলাদা শাড়ি-জামা। খুব ঝলমলে নয়, ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকতে হবে। পার্টির জন্য আবার অন্যরকম। নিজের বা শিরীষের অফিস পার্টিতে গেলে বোঝার উপায় নেই, মেয়ে বড় হয়ে গিয়েছে। তার স্লিভলেস বা অফ শোল্ডার পোশাকে এতটাই যৌন আবেদন থাকে যে পুরুষ সহকর্মীরা পাশে ঘুরঘুর না করে পারে না। শিরীষের কলিগরাও ফ্লার্ট করে নেয়।

দোতারা বলত, "মা তোমাকে দেখে হিংসে হয়। রূপের জন্য কত পরিশ্রমই না করতে পার!"

সোমদত্তা বলত, "এটা শুধু রূপ নয়, নিজেকে সুন্দর রাখতে পারাটা একটা এক্সারসাইজ়ও। এখন বুঝতে পারবি না, বয়স হলে পারবি।"

দোতারা বলত, "থাক, তাহলে আমার আর বয়স হয়ে লাভ নেই।"

শিরীষের ঘটনার পর সোমদত্তা শরীরচর্চা তো বন্ধ করেইছে, এমনকী যেটুকু সাজগোজ না করলে নয়, তাও বন্ধ করে দিয়েছিল। অফিসের শ্যামশ্রী একদিন ক্যান্টিনে চা খেতে গিয়ে বকুনি দিল।

"সোমদত্তাদি, এরকম রুক্ষ, এলোমেলো হয়ে থাকছ কেন? বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে মাথায় চিরুনি দিতে পর্যন্ত ভুলে যাচ্ছ! তোমাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, বড় সমস্যা হয়েছে। যে এতকাল টিপটপ হয়ে অফিসে আসত, তার এ কী হাল! সবাই আড়ালে আলোচনা করে। অন্যদের গসিপ করার বা সহানুভূতি দেখানোর সুযোগ দিচ্ছ কেন? যেমনভাবে আগে আসতে তেমনভাবে আসবে।"

দোতারাও বলেছে, "মা, ভিতর থেকে না পার, বাইরে থেকে নর্মাল হও। অন্তত বাইরের লোকজন যেন তোমাকে দেখে ঘরের সমস্যা বুঝতে না পারে। সেদিন ল্যান্সডাউনে ঋষিতা তোমাকে দেখেছে। বলল, হোয়াট হ্যাপেন্ড দো? আন্টির কী হয়েছে?"

সোমদত্তা বলল, "ঋষিতা কে?"

দোতারা বলল, "আমার স্কুলের বন্ধু। তোমাকে আগে বহুবার দেখেছে। এই বাড়িতেও এসেছে। এখন দিল্লিতে পড়ছে। বলল, "দো, আন্টি অসুস্থ? চোখমুখ বসে গিয়েছে। ট্রাফিকে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক ঝলক দেখেই কেমন লাগল। কী হয়েছে রে?" আমি বললাম, জ্বর হয়েছে। নিজেকে ঠিক করো প্লিজ়। আর সবসময় যেমন মাথা গরম করে আছ, এখন ক'টাদিন নিজে ড্রাইভ করাটা উচিত হবে না। সেন্টার থেকে ড্রাইভার ডেকে নাও।"

সোমদত্তা শ্যামশ্রী আর মেয়ে, দু'জনের কথা শুনেছে। আগের মতো না হলেও মোটামুটি টিপটপ হয়েই এখন বেরোচ্ছে। অফিসে তো শুধু কলিগরা নয়, বাইরের লোকজনও আসে। তার পোস্টটাও ভারিক্কি। সেই চেয়ারে এলোমেলোভাবে বসা যায় না। তবে গাড়ি নিয়ে দোতারা যা বলেছে সেটা শোনেনি। গাড়ি সে খুব ভাল চালায়। শিরীষের চেয়েও ভাল। গাড়ি চালাতে তার ভালও লাগে। ভাগ্যিস শিরীষের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও নিজে আলাদা গাড়ি কিনেছিল! কোম্পানি অফিসে এসে সহজ ইএমআই-তে দিতে চাইল। সেই টাকা শোধ হয়ে গিয়েছে। গাড়ি কেনার ব্যাপারে শিরীষ আপত্তি করেনি। বরং খুশি হয়েছিল। আলাদা কাজের জায়গা, আলাদা সময়, আলাদা বন্ধুবান্ধব হলে গাড়িও আলাদা হওয়া উচিত। নিজেই উদ্যোগ নিয়ে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দেয়। দোতারা বাড়ি থাকলে হয় বাবা, নয় মায়ের গাড়িতে দিব্যি কাটিয়ে দেয়। যদিও সে বেশিরভাগ সময়ে মেট্রো, অটো বা হেঁটেই যাতায়াত করে। খুব দরকারে মোবাইলে ক্যাব ডেকে নেয়। তার নিজের বাজেট আছে। স্কলারশিপের টাকার মধ্যে সব খরচ সামলায়। শুধু ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ নয়, দিল্লিতে একটা পরীক্ষা দিয়ে আরও একটা ছোটখাটো মেরিট স্কলারশিপ জোগাড় করে নিয়েছে। তাতে হস্টেলের খরচ উঠে আসে। এই বছরের প্রথম দিকে কানপুর আইআইটির একটা প্রজেক্টে কাজ করতে গিয়েছিল। ডিপার্টমেন্ট থেকে পাঠিয়েছিল। সেখান থেকেও টাকা পেয়েছে। তারপরেও খরচ করে বুঝেশুনে। বাবা-মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিতে চায় না। গত বছর থেকে শিরীষ তার জন্য মান্থলি ইনকাম স্কিম করিয়ে দিয়েছে। মাসে-মাসে তার অ্যাকাউন্টে টাকা চলে আসে। দোতারাকে না জানিয়েই করেছে। দোতারা সেই টাকা সহজে খরচ করে না।

মৈত্রেয়কে ডাকার পর স্নানে গেল সোমদত্তা। অনেকদিন পর আজ স্নান করতে গিয়ে বাথরুমের আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখল সোমদত্তা। ক'মাসের ঝড়ঝাপটায় শরীর ভেঙেছে। চোখের তলায় কালি পড়েছে। সেই টলটলে ভাবটা নেই। ছোটাছুটি তো আছেই, তারউপর মনের উপর চাপও লাবণ্য নষ্ট করেছে। প্রথমে হত দুশ্চিন্তা,

তারপর অভিমান, এখন হয় রাগ। সোমদত্তা বিড়বিড় করে বলল, এসব থেকে বেরোতে হবে। কার জন্য নিজের মন, নিজের শরীর এভাবে নষ্ট করছে? কেনই বা করবে? ওই মেয়েকে শায়েস্তা করতে পারলে শিরীষ সুরসুর করে ঘরে ফিরবে। নিজের নগ্ন দেহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল সোমদত্তা। এ বাড়ির বাথরুমের আয়না তত ভাল নয়। কসবার ফ্ল্যাটের দুটো বাথরুমই বড় করে বানানো। শিরীষ বেশ খরচ করেছিল। সব কিছুই দামী আর আধুনিক। মাঝেমধ্যে অবাক লাগে এত বড় একটা সাজানো বাড়ি ছেড়ে কীভাবে একটা মানুষ ছেড়ে চলে যেতে পারে!

কসবায় সোমদত্তা যে-বাথরুম ব্যবহার করে, তার একটা দেয়াল জোড়া আয়না। হাফ সার্কেল করা শাওয়ার ইউনিটটা থেকে বেরলেই সেই আয়নার মুখোমুখি হতে হয়। মনে হয়, দুটো নিরাবরণ মানুষ দু'জনকে দেখছে। কোনও আড়াল নেই, আবরণ নেই। একজন অন্যজনকে জরিপ করছে আপাদমস্তক। শিরীষ ব্যাখ্যা দিত।

"বাথরুম হল নিজের সঙ্গে নিজের দেখা হওয়ার, কথা বলার একমাত্র জায়গা।"

সোমদত্তা গালে লাল আভা ফেলে বলেছিল, "নিজেকে অতটা জামাকাপড় ছাড়া দেখতে যেন লজ্জা করে।"

শিরীষ ফিসফিস করে বলেছিল, "তুমি তো একা দেখবে না, আমিও তোমাকে দেখব।"

সোমদত্তা স্বামীর হাতে ঘুষি মেরে বলেছিল, "অসভ্য।"

'অসভ্য' সেও কম হয়নি। বিয়ের পর একসঙ্গে দু'জনে শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়েছে, সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিয়েছে একে অপরকে, চুমুতে-চুমুতে ভরিয়ে দিয়েছে। তারপর ভিজে থাকা নগ্ন স্ত্রীকে শিরীষ পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসেছে বেডরুমে। তখন অবশ্য আয়না এত বড় ছিল না।

দোতারা ওই বাথরুমে চট করে ঢোকে না। বলে, "অত বড় আয়নায় নিজেকে দেখলে ভয় করে। মনে হয় নিজেই নিজেকে কামড়াতে আসছি।" এ বাড়িতে আয়না মাঝারি। আগেরটা ছিল একেবারে ছোট। শুধু মুখটা দেখা যেত। বাবা দাড়ি কামাতেন। মায়ের ওসবে ঝোঁক ছিল না। দোতারা তার দিদিমার মতো হয়েছে। রূপচর্চায় মন নেই। বাবা মারা যাওয়ার পর সোমদত্তা সেই আয়না বদলেছে। আয়নায় ঝুঁকে নিজের গালে হাত বুলিয়ে সোমদত্তা মনে মনে ভাবল, ত্রপা মেয়েটার মধ্যে কী এমন আছে যে শিরীষ এতটা মজে গেল! সে কি সুন্দরী? যৌনক্রীড়ায় পারদর্শী খুব? নিশ্চয়ই তাই। এরা পুরুষমানুষকে ফাঁদে ফেলার ছলাকলা জানে। বেশি বয়সের যৌন আকাঙ্ক্ষা ভয়ংকর। রতিক্রিয়ায় এমন কিছু খেলা মনের অন্ধকার থেকে টেনে তুলে আনে যা লাগামহীন, দামাল। কিছু মেয়ে পুরুষমানুষের এই সংকটের কি সুযোগ নেয়? এতদিন সোমদত্তা এসব জানত না। সে জানত, সংসারে বাইরে পুরুষমানুষের একবারে অন্য নারী থাকবে না, তা হয় না। ভালও লাগে না। আগেকার দিনে বলা হত, স্বামীর শরীরে অন্য মেয়েমানুষের গন্ধ কামোত্তেজনা বাড়ায়। এই উত্তেজনার জন্ম হিংসে থেকে। শিরীষের তো তাও ছিল না। নাকি তলে-তলে ত্রপা মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল? ছিল হয়তো। গোপন রেখেছিল। শিরীষ যে বলে নাওডুবিতে চাষ করতে গিয়ে পরিচয় হয়েছে, মিথ্যে কথা বলে।

সোমদত্তা আয়নার নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বয়স বাড়ছে বলে তার শরীর কি আকর্ষণ হারিয়েছে? পুরুষকে কাছে টানার ক্ষমতা কমে গিয়েছে? নগ্ন বুক, পেট কোমর দেখল সোমদত্তা। উরু, পায়ের গোছও বাদ দিল না। মাথার ওপর হাত তুলে দেখল। কই, বুড়োটে, ক্ষয়াটে ভাব তো আসেনি! তবে কি চেনা শরীর একঘেয়ে লাগছিল শিরীষের? সেই জন্য মেয়ের বয়সী একজনকে বেছে নিয়েছে? শিরীষের সঙ্গে তার শেষ কবে শরীরের মিলন হয়েছিল? মনে করার চেষ্টা করল সোমদত্তা। তারিখ মনে পড়ছে না, তবে ঘটনাটা আবছা মনে পড়ছে। শনিবার ছিল একটা, নাকি রবিবার? শনিবারই হবে। দু'জনেরই ছুটি ছিল। দোতারা ফোন করে জানিয়েছিল, এই সপ্তাহে সে আসছে না। স্পেশাল কোচিং হবে। লাঞ্চের পর বেডরুমে একটু শুতে গিয়েছিল সোমদত্তা। সারা সপ্তাহ দুপুরে বিশ্রাম হয় না। শিরীষ খাটের এক পাশে বসে ল্যাপটপে খুটখাট করছিল। খানিকপরেই ল্যাপটপ সরিয়ে গায়ের উপর এসে পড়ল। মনে করার চেষ্টা করছে সোমদত্তা। এতদিনের দাম্পত্য জীবনের পর স্বামীর সঙ্গে কোনও একদিনের মিলন আলাদা করে মনে পড়ার কথা নয়, তারপরেও জোর করে মনে করতে চাইল সোমদত্তা। মনে পড়ল আবছা। সেদিনও অন্যদিনের মতো শান্তভাবে তার জামাকাপড় খুলেছিল শিরীষ। তারপর নিঃশব্দে ঠোঁট রেখেছিল গায়ে। আদর শুরু করেছিল একেবারে পায়ের পাতা থেকে। তারপর মুখ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল শরীর বেয়ে। এমনটাই ভালবাসে শিরীষ।

"বুঝলে সোম, শরীরে হল রাগের মতো। ভাল শিল্পী তাকে ধাপে-ধাপে এগিয়ে নিয়ে যায়। আলাপ দিয়ে শুরু করে, জোড় হয়ে ঝালায় পৌঁছোয়। এই বিষয়ে আমি একজন ভাল শিল্পী বলতে পার। ধৈর্য ধরে, সময় নিয়ে এগোই।"

চিরকাল তাই করে শিরীষ। মুখের স্পর্শে-স্পর্শে উন্মাদ করে দেয়। উরুসন্ধি, নাভি, পেট, বুক হয়ে গলা বেয়ে চিতা বাঘের মতো উঠে যায় চিবুকে, ঠোঁটে, চোখের পাতায়। একসময়ে নিজেও জেগে ওঠে। সেদিনও উঠেছিল। কতদিন আগে? কই বেশি দিন তো নয়! বড়মামা আসার কয়েকদিন আগেই তো। নাকি পরে? তাহলে? এত দ্রুত শরীর ঝরে গেল? একঘেয়ে হয়ে গেল সে? হয়তো এসব নয়। হয়তো কম বয়স বলে ত্রপার শরীর আরও সুন্দর। আরও মিঠে করে বেজে ওঠে।

মৈত্রেয় সোফায় হেলান দিয়ে বলল, "তোমাকে মিষ্টি দেখাচ্ছে।"

সোমদত্তা খুশি হল। অনেকটা সময় ধরে স্নান করায় খানিকটা কাজ দিয়েছে তাহলে। স্নান করতে-করতে সে ঠিক করেছে, দু'-একদিনের মধ্যে পার্লারে যাবে। পারলে কালই যাবে। ক্লাবেও কথা বলবে, সাঁতারটা যদি শুরু করা যায়। পেটে একটু চর্বি জমেছে মনে হচ্ছে।

সোমদত্তা মৈত্রেয়র উলটোদিকের সোফায় বসেছে। সোমদত্তা বলল, "আস্তে কথা বলো। মা ঘুমোচ্ছে।"

মৈত্রেয় ঘন গলায় বলল, "তাহলে পাশে এসে বসো।"

সোমদত্তা বলল, "নাওডুবির কী পেলে বলো।"

মৈত্রেয় পাশে রাখা ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করল। বলল, "তুমি ওখানে কখনও গেছ?"

সোমদত্তা বলল, "বয়ে গিয়েছে!"

মৈত্রেয় বলল, "নাওডুবির কাছে সবেরগঞ্জ বলে একটা জায়গা আছে। সেখানকার একজনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। তার নাম... থাক, নাম পরে হবে। আমি বিজ়নেস বাড়াতে চলেছি সোমদত্তা। গ্রামেগঞ্জে যেসব ছোট গাড়ি চলে, তার ডিলারশিপও নিয়েছি। সেই সূত্রেই একজনের সঙ্গে চেনাজানা হয়েছে। সে ক'দিন আগে আমার অফিসে এসেছিল। কথা প্রসঙ্গে সে আরও পাঁচটা গ্রামের সঙ্গে নাওডুবির কথা বলে। আমি চমকে উঠি। তাকে তোমার স্বামীর নাম করে বলি, এমন কাউকে চেনে কিনা। সে বলেছিল, খোঁজ নেবে। ক'দিন পর ফোন করেছিল। তোমার হাজ়ব্যান্ড নাকি ওখানে অতি ফেমাস। কালকাতা থেকে গিয়ে এক সুটবুট পরা ভদ্রলোক লাঙল কাঁধে নিয়েছে যখন, ফেমাস তো হবেই। আমি ওই লোককে গোপনে আরও খবর নিতে বলি। সম্ভব হলে, মোবাইলে ফোটো তুলে পাঠাতেও বলি। সে পাঠিয়েছে। আমি প্রিন্ট করে এনেছি। সবক'টা নয়, দুটো করেছি। আমার ধারণা, এই ফোটো তোমার ডিভোর্স মামলায় কাজে দেবে।"

সোমদত্তা উত্তেজিত হয়ে বলল, "ওই লোক তোমার হয়ে এত কাজ করে দিল!"

মৈত্রেয় মুচকি হেসে বলল, "এমনি করেনি, স্বার্থ আছে। আমার সঙ্গে সে ওই এলাকায় ব্যবসা করতে চায়।" একটু থেমে মৈত্রেয় নিচু গলায় বলল, "কিছু করি না বলে তোমরা আমাকে তাড়িয়েছিলে

সোমদত্তা, সেই কিছু করা দিয়ে আমি তার প্রতিদান দিতে চাই।"

সোমদত্তা বলল, "প্রতিদান না প্রতিশোধ?"

মৈত্রেয় বলল, "তোমার উপর আমার কোনও রাগ নেই।"

সোমদত্তা নিচু গলায় বলল, "আমি বুঝতে পারি। দাও ফোটোগুলো দেখাও। আচ্ছা, আমি তোমার পাশে যাচ্ছি।"

সোমদত্তা উঠে উলটোদিকে সোফায় গিয়ে বসল। বসল মৈত্রেয়র গা ঘেঁষে। সে জানতে চায়, পুরুষমানুষকে উত্তেজিত করার ক্ষমতা তার আজও কতটা আছে?

তিনমাসের বদলে সোমদত্তাকে লন্ডনে থাকতে হয়েছিল ছ'মাস। সেখানে তার সঙ্গে শিরীষের আলাপ। শিরীষ তখন তার বেঙ্গালুরুর অফিস থেকে ওই একই ট্রেনিং প্রোগ্রামে গিয়েছিল। বিষয় আলাদা। পার্টিতে আলাপ হল দু'জনের। সুদর্শন, শিক্ষিত, মার্জিত শিরীষকে দেখে মুগ্ধ হতে সোমদত্তার দু'দিনের বেশি সময় লাগেনি। এরপর যখন জানল, যুবক শুধু বড় কোম্পানির উচ্চপদে চাকরিই করে না, গানবাজনা, থিয়েটার, কবিতাও ভালবাসে, তখন আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। পরপর ক'টাদিন বাইরে দেখা করে বসল। শিক্ষিত, রূপসী, স্মার্ট সোমদত্তার নিজের আকর্ষণও কম ছিল না। যুবক শিরীষের পক্ষে বিদেশ বিভুঁইয়ে এই আকর্ষণ অস্বীকার করা কঠিন হল। একদিন টেমস নদীর পাশে দাঁড়িয়ে শিরীষ কথাটা বলেই ফেলল।

"মনে হয়, আমি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছি সোমদত্তা।"

সোমদত্তা গাঢ় স্বরে বলল, "মনে হয় কেন?"

শিরীষ হেসে বলল, "আমার মতো মানুষ যে কখনও প্রেমে পড়বে এটা আমারই বিশ্বাস হয় না। তাও আবার দেশ থেকে এত দূরে এসে! তাই বললাম মনে হয় না।"

সোমদত্তা ঠোঁটের কোণে হাসি সাজিয়ে বলল, "কেন এমন মনে হল তোমার?"

শিরীষ বলল, "কাল রাতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। ট্রেনিং-এর গুরু গম্ভীর প্যাড টেনে খসখস করে কবিতা লিখে ফেললাম। আমার ওল্ড ল্যান্ডলেডির গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে ঢংঢং করে দুটো বাজল। বুঝলাম, মাঝরাতের এই কবিতাকাণ্ডের জন্য তুমি দায়ী।"

সোমদত্তা তার ভাসানো চোখ বড় করে বলল, "রাত দুটোয় কবিতা! তাও আমরা জন্য! কবিতাটি কি শুনতে পারি?"

শিরীষ একটু চুপ করে থেকে বলল, "বলতে পারি, তবে একটা শর্ত আছে।"

"কী শর্ত?"

শিরীষ হেসে বলল, "কবিতা শোনার সময় চোখ বুজে থাকতে হবে। আমি না বলা পর্যন্ত খোলা যাবে না। রাজি?"

সোমদত্তা চোখ বুজেছিল। শিরীষ ফিসফিস করে বলে, "কাছে বা দূরে সবই সমান/ সবই তোমার সাক্ষ্য প্রমাণ/ আছ তো জানি কোথাও ঠিক/ চূর্ণ করে দিগ্বিদিক/ সেটাই বল মন্দ কী?/ বিদেশ পাড়ে তোমায় দেখে নিজের মনে চমকেছি।"

চোখ বোজা অবস্থাতেই এগিয়ে আসে সোমদত্তা। চোখ বোজা অবস্থাতেই দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে শিরীষের। ঘন হয়ে বুক দিয়ে স্পর্শ করে শিরীষের বুক। চোখ বোজা অবস্থাতেই মুখ তুলে তার ঠোঁট মুখে নেয়।

শিরীষ দেশে ফিরে আসে সোমদত্তা ফেরার দু'মাস আগেই। আসার আগের দিন সোমদত্তা তার অ্যাপার্টমেন্টে যায়। এই ছোট্ট ঘরটা ভাড়া নিয়েছিল শিরীষ। বাড়িওয়ালি রাগি প্রকৃতির বৃদ্ধা। ভাড়া দেওয়ার সময়ে বলে দিয়েছিলেন, কোনও মেমসাহেবকে ঘরে আনা চলবে না। রাতে তো একেবারেই নয়, দিনে এলে বসার সোফা পর্যন্ত অনুমতি। বেডরুমে ঢুকেছে জানতে পারলে চুক্তি বাতিল। শিরীষ অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল, "শুধু মেমসাহেবে আপত্তি কেন!"

ধবধবে ফর্সা বৃদ্ধা কাঁপা ঘাড় আরও কাঁপিয়ে যা বলেছিল, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়— "তোমরা মেমসাহেব দেখলে বড্ড আদেখলাপনা করো বাপু। একেবারে মাথা ঘুরে যায়। আমার বয়স তো কম হল না, দেখলাম অনেক। গায়ের রং ফর্সা হলেই হল। মনে করো মেয়ে বুঝি কোনও ফেয়ারি টেল থেকে নেমে এসেছে। তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে বিছানায় ওঠো। পুরুষমানুষের এই এক উৎকট স্বভাব। অধিকাংশই বীর বিক্রমে বিছানায় ওঠে, তারপর একেবারে ভেড়া বনে যায়। প্রেমে ট্রেমে পড়ে একাকার কাণ্ড। বিয়ে করবে বলে কান্নাকাটিও করতে দেখেছি। এদিকে দেশ থেকে বউ সমানে চিঠি লিখে চলে, ওগো ফিরে এসো। এদিকে মেম ছুড়ি তো নাচিয়ে যায়। নাচায় আর রস নিঙরোয়। পরে সর্বস্বান্ত হয়ে দেশে ফিরতে হয় তোমাদের। আমার বাড়িতে বসে এই অনাচার আমি হতে দেব না বাপু। বিছানা বড় ঝামেলার বস্তু। ওতে কাউকে নিয়ে একবার চড়েছ তো মরেছ।"

শিরীষ খুব মজা পায়। মেমসাহেবের মুখে এমন কথা শুনবে ভাবতে পারেনি। সে অতি আনন্দে বৃদ্ধার শর্তে রাজি হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে বৃদ্ধার খাতিরও হয়ে গিয়েছিল বেশ। একা মানুষ। স্বামী মারা গিয়েছে। দুই ছেলের একজন জাহাজে চাকরি করে, অন্যজন কানাডায়, ব্যবসা করছে। বৃদ্ধা এটা-সেটা রান্না করে শিরীষকে খাওয়াত। শিরীষও কেক, পাঁউরুটি, বিস্কুট এনে দিয়েছে। একবার একটা রেড ওয়াইনের বোতল উপহার দিল। বৃদ্ধা তো বেজায় খুশি। ডিনারে নেমন্তন্ন করে বসল শিরীষকে। সেই ওয়াইন খেতে-খেতে বলল, "বিয়ে-থা করোনি কেন? মতলব কী? তুমিও মেম খুঁজছ নাকি?"

শিরীষ হেসে বলেছিল, "না আন্টি, এখনও ঠিক করিনি। পাত্রী পাইনি।"

শিরীষ চলে যাওয়ার আগেরদিন সোমদত্তা সেই বাড়িতে এল। জিনিসপত্র গুছিয়ে দেবে। আন্টি দাঁড়িয়েছিল গেটের মুখে। শিরীষ আলাপ করিয়ে দিতে সাদা ভুরু কুঁচকে বলল, "শিরি, গায়ের রং দেখে মনে হচ্ছে, মেয়ে এশিয়ান।"

শিরীষ বলল, "এশিয়ান শুধু নয়, সোমদত্তা আমার দেশের মেয়ে। আবার শুধু আমার দেশের নয়, একেবারে আমার মতোই বাঙালি, বাংলা ভাষায় কথা বলে, একই শহরে থাকি আমরা, কলকাতায়। আমরা এসেছিও একই কাজে। আমার ট্রেনিং শেষ হয়ে গেল। ও আরও ক'টাদিন থাকছে।"

আন্টি চোখ বড় করে, রাগ দেখিয়ে বলল, "তোমাদের তো অনেকদিনের পরিচয় দেখছি শিরি। তবে যে বললে পাত্রী জোটেনি এখনও! বুড়ো মানুষকে মিথ্যে বলেছিলে?"

এই কথায় থতমত খেয়ে গেল শিরীষ। একেবারে পাত্রী! তাকাল সোমদত্তার দিকে। সে মিটিমিটি হাসছে। শিরীষ ঢোঁক গিলল। এই বৃদ্ধাকে সে মিথ্যে বলতে পারবে না। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "নানা, আন্টি অত কিছু নয়। চেনা এই পর্যন্ত। মনের চেনা কি মিনিট, ঘণ্টা, মাস, বছর দিয়ে মাপা যায়?"

আন্টি মাথা নাড়িয়ে বললেন, "বাঃ ভাল বললে, তুমি যে একজন পোয়েট তোমার কথা শুনেই বোঝা যায়। তুমি কাল চলে যাবে ভেবে আমার মন খারাপ লাগছে। বয়সের এই আর এক সমস্যা। যতদিন বেঁচে থাকবে, দেখতে হবে এক-এক করে ভাল লাগার মানুষ সবাই চলে যাচ্ছে। যাও, দুই মনের বন্ধু এনজয় করো।"

সেদিন ঘরে ঢোকার পর 'মনের বন্ধু'রা খুব দ্রুত 'শরীরের বন্ধু'ও হয়ে যায়। পরদিন ফিরে যাওয়া বলে জিনিসপত্র ছড়ানো ছিল ঘর জুড়ে। সোফা, ডিভানে জামা কাপড়ের স্তূপ। সুটকেস, ব্যাগ পড়ে আছে মেঝেতে। সেসব ডিঙিয়ে দাঁড়ানোর জায়গা করে নিয়েছিল দু'জনে। শিরীষই প্রথমে যত্ন করে চুমু খায়। তারপর এক-এক করে পোশাক খুলে ফেলে। সোয়েটার থেকে ব্রা পর্যন্ত। সোমদত্তা হাত লাগাতে গেলে, হাত সরিয়ে দেয় আলগোছে।

সোমদত্তা ফিসফিস করে বলেছিল, "তাড়াতাড়ি হবে।"

শিরীষ অস্ফুটে বলে, "আমার কোনও তাড়া নেই।"

শিরীষ হাঁটু গেড়ে বসে যখন ধীরে-ধীরে ট্রাউজ়ার এবং পরে প্যান্টি

খুলতে থাকে সোমদত্তার, সে তখন শিরীষের কাঁধ চেপে ধরে। এত সুন্দর করেও পুরুষ নগ্ন করতে জানে! যেন কোনও শিল্পী পাথর কেটে তাকে তৈরি করছে। লজ্জা, কাম, মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সে যত অস্থির হয়ে উঠছে, ধীরে-ধীরে তার সৌন্দর্য তত ফুটে উঠছে। শিরীষ হাঁটু পেতে বসে থাকা অবস্থাতেই দু'হাতে সোমদত্তার কোমর ধরে এবং মুখ নামায়। তীব্র আশ্লেষে শিরীষের চুল মুঠো করে চেপে ধরে সোমদত্তা। শরীর টলে ওঠে তার। চমকে-চমকে ওঠে। এমনও তার জানা ছিল না। শরীর এমনভাবে কথা বলে! জড়ানো গলায় সে বলে ওঠে, "কী করছ! এ কী করছ!"

শিরীষ কোনওরকমে বলেছিল, "রূপসাগরে ডুব দিয়েছি সোমদত্তা। বাধা দিও না।"

ছড়িয়ে থাকা জামাকাপড়, জিনিসের মাঝে দুই নগ্ন যুবক-যুবতী কতক্ষণ পরস্পরে আচ্ছন্ন হয়েছিল, তা বলা মুশকিল। তাদের কখনও মনে হয়েছিল, এইভাবে রয়েছে অনন্তকাল, আবার কখনও মনে হয়েছে, এই সুখ মুহূর্তটুকু বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল বুঝি।

কলকাতায় ফেরার পর এক সন্ধেতে বাবার কাছে শিরীষকে নিয়ে এল সোমদত্তা।

"বাবা উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজমেন্ট পড়েছেন। এখন বড় চাকরিও করছেন, কিন্তু সেসবের চেয়ে বড় পরিচয় হি ইজ় আ পোয়েট।"

শিরীষ লজ্জা পেয়ে বলে, "না না, পোয়েট টোয়েট কিছু নই, ছোটবেলায় লিখতাম, ও তো সব বাঙালি ছেলেই লেখে।"

সৌমেন্দু সেন এরপর এই ঝকঝকে যুবকটির সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে পড়েছিলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে এসে তাঁরা কিটস এবং বায়রনকে নিয়ে পড়েন। কাব্যচর্চার মধ্যেই সৌমেন্দু সেন টুকটাক করে শিরীষের চাকরি, অফিস, উন্নতি, বাড়ি, গাড়ি, পরিবারের খোঁজ নিয়ে নেন। খুশি এবং নিশ্চিন্ত হন। শিরীষ চলে যাওয়ার পর স্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেন। রাতে খেতে বসে সোমদত্তাকে বললেন, "খুবই ভাল ছেলে। তোমার বুদ্ধি এবং রুচির প্রশংসা করছি।"

মাধুরী বললেন, "বাড়িতে কে-কে আছে?"

সোমদত্তা বলল, "কেউ নেই। এক ছেলে। বাবা-মা দু'জনেই মারা গিয়েছেন। একাই থাকে। খাওয়ার দাওয়ার খুব সমস্যা। রান্না জানে না, তাও করা চাই। হাত পুড়িয়ে ফেলে।"

সোমদত্তার কথা বলার মধ্যে মায়া ছিল। মেয়েদের সহজ মায়া। সৌমেন্দু-মাধুরী পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। চোখে-চোখে কথা হল।

মাধুরী মুখ টিপে হেসে বললেন, "রোজ-রোজ হাত পোড়ানোর দরকার কি? তোর বাবা কথা বলুক।"

সোমদত্তা গালে লালচে আভা পড়ল কি? পড়লেও বোঝা মুশকিল। সে রাগের ভান দেখিয়ে বলল, "মা, তুমি যে কী সব বল! আমি কি ও কথা বলেছি?"

সৌমেন্দু সেন বললেন, "তোর আপত্তি নেই তো?"

সোমদত্তা চুপ করে মাথা নামিয়ে খেয়ে যেতে লাগল। মাধুরী স্বামীকে চোখের ইশারা করলেন। মেয়েকে বিয়েতে রাজি করানো কি সহজ কথা? সেই মেয়ে নিজেই হাতে চাঁদের টুকরো এনে দিয়েছে।

সৌমেন্দু সেন বললেন, "বাড়িতে তো কেউ নেই বললি। শিরীষের ফোন নম্বরটাই তাহলে দে।"

সোমদত্তা মুখ নামানো অবস্থাতেই নম্বর বলে দিল। বোঝাই যাচ্ছে, শিরীষের ফোন নম্বর তার কণ্ঠস্থ। মাধুরীদেবী আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। হেসে ফেলে বললেনে, "দাঁড়া বাবাকে আগে খেতে দে। বাপ রে, মেয়ের যে তর সয় না!"

সোমদত্তা লজ্জায় চোখ-মুখ লাল করে উঠে পড়ল। বলল, "যাও, আমি বিয়েই করব না।"

পরদিনই শিরীষের সঙ্গে কথা বললেন সৌমেন্দু সেন। তাকে শনিবার ডিনারে ডাকলেন।

গল্পের মতো শুনতে লাগলেও এই ঘটনার ঠিক এক সপ্তাহ পর মৈত্রেয় সোমদত্তাকে না জানিয়েই সৌমেন্দু সেনের সঙ্গে তার অফিসে দেখা করে। পিওন স্লিপ দেওয়ায় বিরক্ত হলেন সৌমেন্দু। মৈত্রেয়কে ঘরে ডেকে বললেন, "আবার কী হল? সেবার তো জালিয়াতির মধ্যে পড়েছিলে, এবার আবার কীসে ফাঁসলে? বাপু, আগেই বলে রাখছি বারবার কিন্তু বলতে পারব না। সেবার সোম খুব রিকোয়েস্ট করেছিল..."

মৈত্রেয় বেশ অবাক হল। অপমানিতও হল। কিছু শোনার আগেই ভদ্রলোক হড়বড়িয়ে আক্রমণ করছেন। মানুষটা কড়া এবং অহংকারি জানাই আছে, তবে আগ বাড়িয়ে এভাবে অপমান করা যায় কি? কিছু করার নেই, আজ সে যে কথা বলতে এসেছে, তাতে এসব গায়ে মাখলে চলে না। মনে সাহস সঞ্চয় করেই এসেছে। সাহস? নাকি দুঃসাহস? সোমদত্তাকে পর্যন্ত বলেনি। বললে আটকে দিত। সময় চাইত আরও। তার তো কোনও প্রয়োজন নেই। বাইরে যাওয়ার আগে সোমদত্তা তাকে যেভাবে কাছে টেনেছিল, তাতেই তার সম্মতি মিলেছে। পাত্রীর বাবার কাছে ছেলের বাড়ির তরফ থেকে প্রস্তাব দেওয়ার মতো তো কেউ নেই। মৈত্রেয়র বাবা মারা গিয়েছেন ছেলের স্কুল বয়সে। মা শয্যাশায়ী। সুতরাং যা করবার নিজেকেই করতে হবে।

মৈত্রেয় নিজেকে সামলে বলল, "স্যার, ওসব কিছু নয়, একটা নিবেদন নিয়ে এসেছিলাম।"

"কী বিষয়?" ভুরু কুঁচকে বললেন সৌমেন্দু সেন। তার গলা বলে দিচ্ছিল, এই ছেলের সঙ্গে কোনও বিষয়ে কথা বলতেই তিনি তেমন রাজি নন। মৈত্রেয় আর ভনিতায় গেল না।

"স্যার, আমি সোমদত্তাকে বিয়ে করতে চাই।"

সৌমেন্দু সেন চমকে উঠলেন। বললেন, "কী বললে?"

মৈত্রেয় মাথা নামিয়ে বলল, "আমার বাড়ি থেকে প্রস্তাব দেওয়ার মতো কেউ নেই, তাই আমাকেই বলতে হচ্ছে। স্যার, আপনার অনুমতি পেলে সোমদত্তাকে আমি বিয়ে করব।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সৌমেন্দু সেন লম্বা শ্বাস নিলেন। সম্ভবত রাগে ফেটে পড়ার হাত থেকে নিজেকে সামলালেন। শান্তভাবে বললেন, "তুমি কী বলছ, তুমি জানো?"

মৈত্রেয় বলল, "জানি স্যার।"

সৌমেন্দু সেন দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "একথা বলার সাহস তুমি পেলে কী করে? সোমদত্তাকে বিয়ে করার জন্য যে-যে যোগ্যতার প্রয়োজন, তার একটাও কি তোমার আছে ইয়ং ম্যান?"

মৈত্রেয় কিছু বলতে গেল। সৌমেন্দু সেন চাপা গলায় ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ করো। ভাঙা স্কুটার নিয়ে বিয়ে করতে আসবে? জালিয়াতির মামলায় পথে পুলিশ ধরবে না তো?"

মৈত্রেয়র কান, মাথা ঝাঁঝাঁ করে ওঠে। সে কাঁচুমাচুভাবে বলল, "স্যার, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি।"

"শাট আপ! সিনেমার ডায়লগ বলবে না। রোজগারপাতি বলতে তো ওই ছুটকো ব্যবসা। আগে সেদিকে মন দাও। যাও এখন, অনেক কাজ আছে।"

মৈত্রেয় হতবাক হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সৌমেন্দু সেন নরম গলায় ডাকেন, "শোনো।"

মৈত্রেয় ঘুরে দাঁড়ায়। সৌমেন্দু সেন বললেন, "সরি। মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল। তুমি বোধহয় জানো না, সোমদত্তার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। সোমদত্তা নিজেই ছেলে খুঁজে নিয়েছে।" একটু থেমেছিলেন সৌমেন্দু সেন। ফের বললেন, "ইয়ং ম্যান, একটা কথা বলি... না, একটা নয়, দুটো কথা। এক নম্বর হল, নিজের কতদূর ক্ষমতা নিজেকে জানতে হয়। আমার মেয়ে সোমদত্তাকে তুমি চিনতে পারোনি। যোগ্যতার কথা বাদ দিচ্ছি, সোমদত্তার সঙ্গে সংসার করার ক্ষমতাও তোমার নেই। যে-কোনও পাত্রে অমৃত রাখা যায় না। নইলে সেই অমৃতই বিষ হয়ে যায়। তোমার জন্য এটা ভালই হল। আর দু'নম্বর হল, বিজ়নেসে কোনও ছোটখাটো দরকার হলে আমার সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করো। তাকে



বলে রাখব। এবার যাও।"

সারারাত চেষ্টা করেও সোমদত্তার ফোন পেল না মৈত্রেয়। পরদিন সকালে সল্টলেকের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। সোমদত্তা দেখা করল না। মৈত্রেয় ভেবেছিল, দরজার বাইরে অপেক্ষা করবে। তারপর ভাবল, সেটা যেমন লোক হাসানো নাটক হবে, তেমন অপমানেরও হবে। দুপুরে সোমদত্তাকে ফোন করলে সে ফোন ধরে। বোঝাই গেল, সে তার বাবার কাছ থেকে বিষয়টা শুনেছে।

"ক্ষ্যাপামি কোরো না মৈত্রেয়। বলেই তো ছিলাম আমাদের বাড়িতে বাবাই শেষ কথা।"

মৈত্রেয় বলেছিল, "তুমি কিছু বলবে না?"

সোমদত্তা বলল, "বলছি তো ক্ষ্যাপামি কোরো না। বন্ধু হয়ে তো রইলাম।"

মৈত্রেয় বিড়বিড় করে বলল, "তুমি আমায় ভালবাস না?"

সোমদত্তা একটু হেসে বলল, "ভালবাসব না কেন? সে ভালবাসা মানেই তো বিয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া নয়। সেই সম্পর্ক তৈরি হলেও টিকত না মৈত্রেয়, মাথা ঠান্ডা করে বোঝার চেষ্টা করো।"

মৈত্রেয় নিঃশব্দে সরে যায়। আবার ফিরেছে। ফিরেছে সোমদত্তারই ডাকে। ভেবেছিল, এড়িয়ে যাবে। এখন আর সে ছটফটে যুবক নয়। বয়স বেড়েছে, পরিণতও হয়েছে। তারপরে নিজেকে ঠেকাতে পারেনি।

সোমদত্তা বলল, "এবার ফোটো দেখাও।"

হাতের খাম থেকে দুটো ফোটো বের করে এগিয়ে দিল মৈত্রেয়। দূর থেকে তোলা। খানিকটা অস্পষ্ট হলে শিরীষকে চিনতে অসুবিধে হল না সোমদত্তার। সে হাঁটু পর্যন্ত ঢোলা একটা হাফপ্যান্ট পরে আছে। চোখে সানগ্লাস। পাশের অল্প বয়সি মেয়েটি পরেছে কালো টপ, থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট। দু'জনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ধান ক্ষেতের সামনে। দু'জনের মাথাতেই টুপি। শিরীষ ডান হাত বাড়িয়ে দূরের কিছু দেখাচ্ছে। মেয়েটি শিরীষের কাঁধের কাছে মাথা নিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ফোটো বেশি স্পষ্ট। দু'জনে আলপথ ধরে হেঁটে আসছে। মেয়েটি শিরীষের হাত ধরে আছে।

সোমদত্তার শরীর জুড়ে আগুন জ্বলে উঠল। আবার খুশিও হল। সন্তোষ উকিল এবার তাকে ফেরাতে পারবে না। এই ফোটো প্রমাণ করছে, ওই স্কাউন্ড্রেল মেয়ে কীভাবে শিরীষকে ঘিরে ফেলেছে। শিরীষকে হাত করে ওই জমি কেড়ে নেওয়ার আগে ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ফোটো কাজে দেবে।

সোমদত্তা ঘুরে বসে মৈত্রেয় হাত দুটো চেপে ধরল।

"কী বলে ধন্যবাদ জানাব।"

মৈত্রেয় নিচু গলায় বলল, "কিছু না বলে।"

মৈত্রেয়র হাত নিজের কোলের উপর টেনে নিল।

"আমি শিরীষকে হারাতে চাই না মৈত্রেয়। আমি তাকে চাপ দিতে চেয়েছিলাম যাতে সে চাষবাসের পাগলামি ছেড়ে দেয়। একটা সময়ের পর জানতে পারলাম, চাষবাসের জীবন নয়, সে অন্য কিছুর মোহে পড়েছে। প্রথমে আমাকে মেয়েটির খবর দেয় আমার এক পুরনো বান্ধবী। তার দাদা এগ্রিকালচার বিভাগের অফিসার। ব্লকে-ব্লকে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের ছাড়াছাড়ির খবর পেয়ে বলল, 'এতদিন তোকে বলিনি, আমার দাদা কিন্তু বলেছিল, তোর বর একটি অল্পবয়সি মেয়ের সঙ্গে ব্লক অফিসে আসে।' ধীরে-ধীরে আরও জানতে পারি। তারপরেই আমি ডিভোর্স চাই।"

মৈত্রেয় চাপা গলায় বলে, "ভেরি আনফরচুনেট।"

সোমদত্তা আগুনজ্বলা চোখে ফিসফিস করে বলে, "আমি কি এতই বুড়িয়ে গিয়েছি মৈত্রেয়? আজও তো আমার ভিতরটা পুরুষমানুষের শরীর চায়, এখনও তো আমার যৌবন যায়নি। মাসের নির্দিষ্ট দিনে..."

মৈত্রেয় সোমদত্তার হাত চেপে ধরে বলে, "ছি ছি! কেন এসব ভাবছ?"

সোমদত্তা দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, "তাহলে কেন ওই মেয়েটা জিতে



বলে রাখব। এবার যাও।"

সারারাত চেষ্টা করেও সোমদত্তার ফোন পেল না মৈত্রেয়। পরদিন সকালে সল্টলেকের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। সোমদত্তা দেখা করল না। মৈত্রেয় ভেবেছিল, দরজার বাইরে অপেক্ষা করবে। তারপর ভাবল, সেটা যেমন লোক হাসানো নাটক হবে, তেমন অপমানেরও হবে। দুপুরে সোমদত্তাকে ফোন করলে সে ফোন ধরে। বোঝাই গেল, সে তার বাবার কাছ থেকে বিষয়টা শুনেছে।

"ক্ষ্যাপামি কোরো না মৈত্রেয়। বলেই তো ছিলাম আমাদের বাড়িতে বাবাই শেষ কথা।"

মৈত্রেয় বলেছিল, "তুমি কিছু বলবে না?"

সোমদত্তা বলল, "বলছি তো ক্ষ্যাপামি কোরো না। বন্ধু হয়ে তো রইলাম।"

মৈত্রেয় বিড়বিড় করে বলল, "তুমি আমায় ভালবাস না?"

সোমদত্তা একটু হেসে বলল, "ভালবাসব না কেন? সে ভালবাসা মানেই তো বিয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া নয়। সেই সম্পর্ক তৈরি হলেও টিকত না মৈত্রেয়, মাথা ঠান্ডা করে বোঝার চেষ্টা করো।"

মৈত্রেয় নিঃশব্দে সরে যায়। আবার ফিরেছে। ফিরেছে সোমদত্তারই ডাকে। ভেবেছিল, এড়িয়ে যাবে। এখন আর সে ছটফটে যুবক নয়। বয়স বেড়েছে, পরিণতও হয়েছে। তারপরে নিজেকে ঠেকাতে পারেনি।

সোমদত্তা বলল, "এবার ফোটো দেখাও।"

হাতের খাম থেকে দুটো ফোটো বের করে এগিয়ে দিল মৈত্রেয়। দূর থেকে তোলা। খানিকটা অস্পষ্ট হলে শিরীষকে চিনতে অসুবিধে হল না সোমদত্তার। সে হাঁটু পর্যন্ত ঢোলা একটা হাফপ্যান্ট পরে আছে। চোখে সানগ্লাস। পাশের অল্প বয়সি মেয়েটি পরেছে কালো টপ, থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট। দু'জনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ধান ক্ষেতের সামনে। দু'জনের মাথাতেই টুপি। শিরীষ ডান হাত বাড়িয়ে দূরের কিছু দেখাচ্ছে। মেয়েটি শিরীষের কাঁধের কাছে মাথা নিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ফোটো বেশি স্পষ্ট। দু'জনে আলপথ ধরে হেঁটে আসছে। মেয়েটি শিরীষের হাত ধরে আছে।

সোমদত্তার শরীর জুড়ে আগুন জ্বলে উঠল। আবার খুশিও হল। সন্তোষ উকিল এবার তাকে ফেরাতে পারবে না। এই ফোটো প্রমাণ করছে, ওই স্কাউন্ড্রেল মেয়ে কীভাবে শিরীষকে ঘিরে ফেলেছে। শিরীষকে হাত করে ওই জমি কেড়ে নেওয়ার আগে ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ফোটো কাজে দেবে।

সোমদত্তা ঘুরে বসে মৈত্রেয় হাত দুটো চেপে ধরল।

"কী বলে ধন্যবাদ জানাব।"

মৈত্রেয় নিচু গলায় বলল, "কিছু না বলে।"

মৈত্রেয়র হাত নিজের কোলের উপর টেনে নিল।

"আমি শিরীষকে হারাতে চাই না মৈত্রেয়। আমি তাকে চাপ দিতে চেয়েছিলাম যাতে সে চাষবাসের পাগলামি ছেড়ে দেয়। একটা সময়ের পর জানতে পারলাম, চাষবাসের জীবন নয়, সে অন্য কিছুর মোহে পড়েছে। প্রথমে আমাকে মেয়েটির খবর দেয় আমার এক পুরনো বান্ধবী। তার দাদা এগ্রিকালচার বিভাগের অফিসার। ব্লকে-ব্লকে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের ছাড়াছাড়ির খবর পেয়ে বলল, 'এতদিন তোকে বলিনি, আমার দাদা কিন্তু বলেছিল, তোর বর একটি অল্পবয়সি মেয়ের সঙ্গে ব্লক অফিসে আসে।' ধীরে-ধীরে আরও জানতে পারি। তারপরেই আমি ডিভোর্স চাই।"

মৈত্রেয় চাপা গলায় বলে, "ভেরি আনফরচুনেট।"

সোমদত্তা আগুনজ্বলা চোখে ফিসফিস করে বলে, "আমি কি এতই বুড়িয়ে গিয়েছি মৈত্রেয়? আজও তো আমার ভিতরটা পুরুষমানুষের শরীর চায়, এখনও তো আমার যৌবন যায়নি। মাসের নির্দিষ্ট দিনে..."

মৈত্রেয় সোমদত্তার হাত চেপে ধরে বলে, "ছি ছি! কেন এসব ভাবছ?"

সোমদত্তা দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, "তাহলে কেন ওই মেয়েটা জিতে

গেল?”

মৈত্রেয় বলল, “সে তোমার বর জিততে দিচ্ছে তাই। বিশ্বাস করো সোমদত্তা, তুমি আজও আগের মতো সুন্দরী। আজও তোমাকে দেখে কেমন যেন হয়।”

সোমদত্তা হিসহিসিয়ে বলে, “মিথ্যে কথা বলছ। তোমরা পুরুষমানুষরা সব সমান। লায়ার...পার্ভার্ট...”

মৈত্রেয় একটু চুপ করে রইল। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে সোমদত্তার মুখটা ধরল। নিজের মুখ এগিয়ে ফিসফিস করে বলল, “আমি প্রমাণ করে দিতে পারি সোমদত্তা। তোমার অনুমতি পেলে প্রমাণ করে দিতে পারি।”

সোমদত্তা হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, “বেডরুমে চলো।”

নারী শরীরের ব্যাপারে শিরীষ যেমন শান্ত, মৈত্রেয় তেমন উন্মত্ত। আবার এমন হতে পারে, না পাওয়া প্রেয়সীকে শেষ যৌবনে পেয়ে যাবতীয় সংযম সরিয়ে রাখে সে। চুমুর মধ্যেই টেনে হেঁচড়ে খুলে দেয় সোমদত্তার হাউসকোট। শিরীষের কিনে দেওয়া হাউসকোটের একটা পাশ অল্প ছিঁড়েও যায়। নাইটির ঘেরাটোপ থেকে সোমদত্তাকে মুক্ত করতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত নেয় মৈত্রেয়। খাটের উপর নগ্ন সোমদত্তাকে জড়িয়ে ধরে পাক মারে। ঘাড়ে, হাতে, স্তনে ঠোঁট দিয়ে কামড় বসায়। জড়ানো গলায় বলতে থাকে, “কোথায় গিয়েছিলে? আমাকে ফেলে কোথায় গিয়েছিলে এতদিন?”

সোমদত্তা অনুভব করে, এই উন্মত্ত আদর তার শরীর গ্রহণ করছে না। ভাল লাগছে না তার। সে সোমদত্তাকে যেন বলছে, “একে সরিয়ে দাও। ঠেলে সরিয়ে দাও একে।” না, এখনই সরিয়ে দেওয়া যাবে না। মৈত্রেয়র উত্তেজনা কমিয়ে দেওয়ার জন্য সোমদত্তা উদ্যোগী হল। তার একটা পা তুলে দিল মানুষটার গায়ের ওপর।

বুক পর্যন্ত চাদর ঢেকে শুয়ে আছে দুই রমণ-ক্লান্ত নারী-পুরুষ।

নারীটি সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, “একটা গোলমাল হবে। খুব বড় গোলমাল হবে। চাষবাসের নাম করে মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করার জন্য গ্রামের মানুষ গোলমাল করবে। বাড়ি ভাঙচুর হবে। জিনিসপত্রে আগুন ধরবে। ক্ষেতের ধান তছনছ করা হবে। বেশ্যা মেয়েটাকে ন্যাংটো করে চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে মাঠ দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে উন্মত্ত মানুষ। পুরুষমানুষটি যাতে পালিয়ে আসতে পারে, তার জন্য গাড়ি থাকবে, লোক থাকবে।”

নারীটি নগ্ন পুরুষের বুকে হাত দিয়ে বলল, “পারবে না?”

পুরুষটি নারীর ডান স্তনে হাত রেখে বলল, “একসময়ে পারতাম না, এখন পারব সোমদত্তা। অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে না?”

॥ ১২ ॥

প্রায় সাত মিনিট হতে চলল সোমদত্তা চুপ করে বসে আছে।

বসে না থেকে উপায় নেই। সন্তোষ খাস্তগির জহর কোটের দু'-পকেটেই হাতড়াচ্ছেন, কিন্তু নস্যির কৌটো খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর চোখ মুখে বিস্ময়। একটা না একটা পকেটে তো জিনিসটা থাকবে। উধাও হয়ে যেতে পারে না। খোঁজাখুঁজির পর্ব শেষ না হলে মক্কেলের সঙ্গে কথায় মন দিতে পারছেন না। নস্যি গুঁড়ো হাতে নিয়ে তিনি মনসংযোগ করবেন।

সন্তোষ উকিল সাতদিন ছিলেন না। পরিবার নিয়ে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন। সোমদত্তা ফোন করতে বললেন, “সমুদ্রের সামনে বসে আছি। এখানে বসে মামলার কথা আলোচনা করলে সমুদ্র বিরক্ত হবে। প্রকৃতি মামলা মোকদ্দমা পছন্দ করে বলে মনে হয় না। আপনাকে আমি ফিরে গিয়ে ফোন করব।”

আজ সকালে নিজেই সোমদত্তাকে ফোন করেছিলেন।

সোমদত্তা উৎসাহ নিয়ে বলল, “কবে ফিরলেন? আজ?”

সন্তোষ উকিল বললেন, “না, আজ নয়, দু'দিন আগে ফিরেছি।”

সোমদত্তা দমে গিয়ে বলল, “দু'দিন আগে ফিরেছেন!”

“দুঃখিত। ফিরেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত ছিল।”

সোমদত্তা লজ্জা পেয়ে বলল, “আমি তা বলিনি।”

সন্তোষ উকিল বলল, “আপনি বলবেন কেন! আপনার কণ্ঠস্বর বলছে। দু'দিন আপনার কাজই করছিলাম। যাক, বাদ দিন ওসব। মিসেস মুখার্জি, কাল যে একবার আপনাকে আসতে হবে!”

সোমদত্তা বলে, “অবশ্যই যাব। আমার ভীষণ দরকার।”

“কখন আসতে চান?”

একটু ভেবে নিয়ে সোমদত্তা বলল, “রাতের স্লটে যদি যাই?”

সন্তোষ উকিল বললেন, “ভাল। রাতে শুরু হয়েছিল রাতেই শেষ হোক।”

সোমদত্তা বলল, “কিছু বললেন?”

সন্তোষ উকিল এই কথার জবাব বললেন, “আপনি রাতেই আসুন।”

আসার পর থেকে খানিকটা কথা হওয়ার পর চুপ করে বসেই আছে সোমদত্তা। সন্তোষ উকিল ব্যস্ত।

“আপনি কি কিছু খুঁজছেন?”

সন্তোষ উকিল অন্যমনস্কভাবে বিড়বিড় করে বললেন, “নস্যির কৌটোটা কোথায় রাখলাম...”

“ওটা আপনার বাঁ-হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে না?”

সন্তোষ উকিল হাতটা তুলে দেখলেন। বললেন, “ধন্যবাদ।” তারপর খুব সহজভাবে বললেন, “আসলে কী জানেন ভাই, কিছু জিনিস আছে, যা আমরা হাতের মুঠোয় রেখেও খুঁজে বেড়াই। যাক, তারপর বলুন।”

সোমদত্তা বলল, “আমার মনে হয় এই দুটো ফোটো আপনার কাজে লাগবে। মেয়েটিকে আদালতে এনে নাস্তানাবুদ করা যাবে। এমনভাবে নাস্তানাবুদ যাতে আর যে কোনওদিন ভদ্র সমাজে মুখ দেখাতে না পারে।”

দু'আঙুলের টিপে নস্যি নিয়ে সন্তোষ উকিল বললেন, “দেখুন মিসেস মুখার্জি, আমি এসে জানতে পেরেছি, আপনার স্বামী লইয়ার মারফত কোর্টে, ডিভোর্স নোটিসের জবাব দিয়েছেন। জবাব হিসেবে ভাল। আমি গোড়া থেকেই জানতাম এরকম একটা জবাব আসবে। সেই কারণেই আমি মামলাটা লড়তে রাজি হয়েছিলাম।” এবার হাতের সামনে রাখা ফাইল থেকে একটা কাগজ বের করলেন সন্তোষ উকিল। সেদিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন, “জবাবে বলা হয়েছে, আমার মক্কেলের ডিভোর্স দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কোনও স্বামী যদি শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে থাকে, জীবিকা নির্বাহের জন্য অফিসের চাকরি ছেড়ে চাষবাস করে, তা কখনই স্ত্রীর প্রতি তার অবহেলা, অত্যাচার বা অবজ্ঞা প্রমাণ করে না। যে কেউ পেশা বদল করতেই পারে। চাষ আমাদের দেশে গুরুত্বপূর্ণ একটি পেশা। সেনসাস রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে প্রায় ২৪ কোটির মতো মানুষ কোনও না কোনওভাবে সরাসরি কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। হয় কৃষক, নয় ক্ষেত মজুর, নয়তো নানাভাবে ক্ষেতের কাজ করেন। এদের মধ্যে একজনের স্ত্রীও কি স্বামী কেন চাষ করে বলে আদালতে ডিভোর্স চেয়েছে? কোনও উদাহরণ আছে? নেই। আর বোঝাপড়া হচ্ছে না এটাও ঠিক নয়। এক্ষেত্রে শিরীষ মুখার্জি তার স্ত্রী সোমদত্তা মুখার্জির স্বাধীনতায় কোনওভাবে হস্তক্ষেপ করছেন না, তার পেশায় বাধা দিচ্ছেন না, তাকে ধানক্ষেতের মধ্যে গিয়ে বসবাস করতেও বলা হচ্ছে না। এটি শ্রীমতী সোমদত্তা মুখার্জির সাময়িক ক্রোধ মাত্র। অচিরেই ঠিক হয়ে যাবে। সুতরাং মহামান্য আদালত যেন মামলা হিসেব গ্রহণ না করেন।” থামলেন সন্তোষ উকিল। মন দিয়ে নস্যি নিলেন। রুমাল দিয়ে নাক মুছলেন।

সোমদত্তা উত্তেজিত গলায় বলল, “আমি তো শুধু এই কারণে ডিভোর্স চাইনি। আমি মনে করি, চাষবাস বাজে কথা। ওই মেয়েটোই নষ্টের গোড়া। আমি তো আজ প্রমাণ নিয়ে এসেছি।”

সন্তোষ উকিল একইরকম শান্তভাবে বললেন, “ঠিকই করেছেন। তাহলে আমাদের মামলাটিকে সেভাবে সাজাতে হবে। একটি অবৈধ প্রণয়কে ডিভোর্সের কারণ হিসেবে বলতে হবে।”

সোমদত্তা আরও উত্তেজিত গলায় বলল, “অবশ্যই।”

সন্তোষ উকিল নাক টানলেন, তারপর বললেন, "ভাই, আপনি তো ডিভোর্স চান না।"

সোমদত্তা থতমত খেয়ে বলল, "মানে!"

"মানে আপনি সবচেয়ে ভাল জানেন। প্রথমদিনই মনে হয়েছিল, আপনি কিছু গোপন করেছেন। আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই গোপন করা খবর সংগ্রহের জন্য আপনার পিছনেই লোক লাগিয়ে দিই।"

সোমদত্তা বলল, "সে কী! আপনার তো চর পাঠানো উচিত ছিল নাওডুবিতে। আমার স্বামীর সঙ্গে ওই মেয়ে কত নষ্টামি করছে, তা জানার জন্য। তার বদলে আমার পিছনে চর!"

সন্তোষ উকিল মৃদু হেসে বললেন, "পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ মিসেস মুখার্জি। তবে সন্তোষ খাস্তগির জানে কীভাবে কাজ করতে হয়। আপনার চর আমাকে যে-রিপোর্ট দিয়েছে, তার একটিই আমার জন্য যথেষ্ট।"

রাগ কোনওরকমে সামলে সোমদত্তা স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, "চুপ করলেন কেন? বলুন কী জেনেছেন, আমার একজন এক্স বয়ফ্রেন্ড আছে? সে আমার সল্টলেকের বাড়িতে এসেছিল? তাই তো?"

সন্তোষ উকিল জহরকোটের পকেট হাতড়াতে-হাতড়াতে বললেন, "ওসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। ঘামাতাম যদি আপনার স্বামী আমার মক্কেল হত।"

সোমদত্তা অস্ফুটে বলল, "তবে?"

সন্তোষ উকিল সোমদত্তার চোখে চোখ রেখে বললেন, "আপনি যতই টাকা পয়সা, কেরিয়ার নিয়ে মেতে থাকুন না কেন, আপনি আপনার স্বামীকে ভালবাসেন। একটু নয়, বেশি ভালবাসেন। সেই কারণে আপনি তাকে ফিরে পেতে চাইছেন।"

"কী করে বুঝলেন?"

সন্তোষ উকিল বললেন, "আপনি বারবার ডিভোর্স চেয়েছেন, কিন্তু তার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া যেত, তার একটাও নেননি। আমার পরামর্শ শোনেননি।"

সোমদত্তা ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, "ওসব কথা বাদ দিন। আপনার চর কী রিপোর্ট দিল সেটা খোলসা করে বলুন।"

সন্তোষ উকিল একটু হেসে বলল, "ওই যে বললুম। চর তো আমি নিজে। সব চরকে বাড়ি থেকে বেরোতে হয় না, কাউকে ফলো করতে হয় না। ঘরে বসে রিপোর্ট তৈরি করে। ভাই, মনের ভিতরে খবর যে জানতে পারে সেই তো আসল চর। তাই না? তবে সে ফিজ় নিয়ে কাজ করে। প্রফেশনাল।"

সোমদত্তা মাথা নামিয়ে বসে রইল। সন্তোষ উকিল এবার নরম গলা বললেন, "মিসেস মুখার্জি, আমি এই কেস করব না। টাকা পয়সা যেমন যা নিয়েছি তার সবটাই ফেরত দিয়ে দেব। এমনকী চরবৃত্তির ফিজ়টুকুও। এই প্রথম পেশার জীবনে মামলা নিয়েও ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। তারপরেও মনটা ভাল লাগছে। 'ডিভোর্স সন্তোষ' কখনও এমন দু'জনকে আলাদা করে না, যারা আসলে একইসঙ্গে থাকতে চায়। আমাকে মাপ করবেন। যান, মামলা তুলে নিয়ে শিরীষবাবুর সঙ্গে দেখা করুন। সব মানুষ এক হয় না। আমার চর বলছে আপনার স্বামী একজন ওয়ান্ডারফুল মানুষ। ভাগ্যিস ওকালতি করতে এসেছি, নইলে, এরকম মানুষের কথা জানা হত না! ভাই, আপনিও তো আপনার কাছে আসতেন না। দেখা হলে আমার অভিনন্দন জানাবেন।"

॥ ১৩ ॥

ঘটনাটা ঘটল বিকেল পাঁচটার অল্প পরে।

সবেরগঞ্জ থেকে কলকাতা ফেরার বাসে উঠে বসেছে দোতারা আর বিহান। বিহানের খুব ইচ্ছে ছিল থেকে যাওয়ার। 'নাওডুবি প্রজেক্ট' দেখে তার পাগলের মতো অবস্থা। এত ভাল লেগেছে যে, নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছিল না। শুধু ধানের ক্ষেত নয়, দোতারার বাবা বাড়িটা বড় চমৎকার বানিয়েছে। খোলামেলা ঘর, একটু বাগান, বাঁশের বেড়া, এক ফালি উঠোন। উঠোনের একপাশে একটা মাটির দেয়াল। একা দাঁড়িয়ে আছে। দেখে চমকে উঠতে হয়। শিরীষ আঙ্কল জানালেন, ওটা আলাদা করে বানানো। কাপড় শুকোতে দেওয়া যায়, ঘুঁটে দেওয়া যেতে পারে, কেউ ইচ্ছে করলে ছবিও আঁকতে পারে। আবার কেউ যদি চায়, শীতের দুপুরে ওই দেওয়ালে হেলান দিয়ে বইও পড়তে পারে। দোতারা বলল, ওদের কসবার ফ্ল্যাটে নাকি একসময়ে এরকম একটা মাটির দেয়াল রাখা হয়েছিল। সেটা ছিল একটা স্কাল্পচারের মতো। তবে মাপে অনেক ছোট। আর এটা তো একবারে আসল। বাড়ির ঘরগুলো চমৎকার, গেস্টরুমটাও চমৎকার। ভোরের আলোয় ছবিও উঠত সবচেয়ে ভাল। ক্ষেতের পাশে, নাওডুবি সাঁকোতে, মাটির দেওয়ালের গায়ে দোতারাকে দাঁড় করাত আর প্রাণ ভোরে শট নিত। দোতারা চুল কেটে ছোট করে ফেলেছে। তাতে কোনও সমস্যা নেই। এখানে এসে বিহানের মনে হয়েছে, কে বলে কেশবতী মেয়েরাই শুধু রহস্যময়ী? ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিকমতো থাকলে সব মেয়েই রহস্যময়ী। চুল ছোট করে কাটা দোতারা তো বটেই, এমনকী শিরীষও চেয়েছিল, ওরা থেকে যাক। ত্রপাও বলেছে।

"দোতারা, তোমরা থেকে যাও। আমিও কাল চলে আসব।"

দোতারা রাজি হয়নি। তার এবং বিহান দু'জনেরই সামনে পরীক্ষা চলেছে। আবার পরে আসব বলে তারা ফিরে গিয়েছে।

সারাদিন চুটিয়ে আনন্দ হয়েছে। দোতারা আর বিহান একেবারে সকালে চলে এসেছে। এসে শিরীষকে চমকে দিয়েছে। বিহানের সঙ্গে শিরীষের এই প্রথম আলাপ।

"এই তো একজনকে পাওয়া গেল। ডাক্তারি পাশ করে মাঝেমধ্যে কিন্তু এখানে আসতে হবে। নাওডুবিতে তোমার ফ্রি ডিসপেনসারি চালু করব। রাজি?"

বিহান বলল, "অবশ্যই রাজি।"

বাবার প্রজেক্ট দেখে দোতারা শুধু মুগ্ধ হল না, তার গর্ব হতে লাগল। ক্ষেত জুড়ে যে সোনালি ধান ঝলমল করছে, সেটা তার বাবা চাষ করেছে ভাবতেই গা শিরশির করে উঠল। বাবা বলেছে, চাষের সবক'টি পর্যায়েই সে হাত লাগিয়েছে।

"আমিও এখানে সপ্তাহে একদিন করে এসে ফ্রি স্কুল শুরু করব।"

ত্রপা হাত তুলে বলল, "আমাকেও নিতে হবে।"

দোতারা তাকে জড়িয়ে ধরে হেসে বলল, "নিশ্চয় নেব।"

মেয়েটিকে দোতারার খুব পছন্দ হয়েছে। খুব লেখাপড়া জানা মেয়ে। সে যে শিরীষ মুখার্জির উপর গবেষণা করছে, সেটা জেনেই গর্বে বুক ভরে গেল দোতারার। মেয়েটি বাবাকে যেমন শ্রদ্ধা করে, তেমন ভালওবাসে। তাতে যদি কোথাও কোনওরকম প্রেম থাকে, ক্ষতি কী? বাবার এটা প্রাপ্য। সব ভালবাসা একরকম হয় না। সব ভালবাসা অন্যের ভালবাসাতে ভাগও বসায় না। সে থাকে নিজের মতো। ত্রপাকে নিয়ে মা ভুল বুঝেছে। খুব বড় ভুল।

ত্রপাই দুপুরে খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াল। রান্না ভাল হয়নি, তারপরেও বিহান এত বেশি খেল যে, তার পেট আঁইঢাঁই করতে লাগল। সে আলের উপর মাদুর পেতে কিছুক্ষণ গড়িয়ে নেওয়ার প্ল্যান করে। ত্রপা আটকে দেয়। সাপ আছে।

চলে যাওয়ার সময় শিরীষ তার মেয়েকে বলল, "তোর মাকে সব বলিস। বলিস তাকে আমি আসতে বলেছি। আমি জানি তোর মা প্রজেক্টটা একবার নিজের চোখে দেখলে সব রাগ ভুলে যাবে।"

দোতারা বাবার গায়ে হাত দিয়ে বলল, "বলব।"

শিরীষ বলল, "ধান কাটা পর্যন্ত কলকাতায় যেতে পারব কিনা জানি না। চেষ্টা করব।"

দোতারা আদুরে গলায় বলল, "সে যেও, তবে তার আগে এখানকার কাজ। ধান কাটার সময় আমরা কিন্তু এসে থাকব।"

শিরীষ হেসে বলল, "তোরাই তো কাটবি।"

দোতারা বলল, "পরীক্ষা থাকলেও ফিরব না।"

ত্রপা ছেলেমানুষের মতো বলল, "স্যার, আমি? আমি কাটব না?"

ত্রপা প্রথমে ঠিক করেছিন, দোতারাদের সঙ্গেই রওনা হবে। তার গবেষণার কিছু কাজ বাকি ছিল। কালকেই একটা অংশ গাইডের কাছে জমা দিতে হবে। তাকে আরও ঘণ্টাখানেক থাকতে হল। আজ স্যারের মেয়ের ইন্টারভিউ নিয়ে নিয়েছে। সে বলেছে, "আমার বাবার জন্য আমার গর্ব হচ্ছে। এই ক্ষ্যাপামি একমাত্র তার পক্ষেই করা সম্ভব। তবু আমি চাইব বাবা কিছুদিন করে অন্তত কলকাতায় গিয়ে থাকুক। এই ক্ষ্যাপা মানুষটাকে ভাগাভাগি করে ধানও পাক, সফট্ওয়্যারের অফিসও পাক।"

ত্রপা তার গবেষণার কাগজপত্র গুছিয়ে চলে যাওয়ার জন্য বেরোল পাঁচটার অল্প পরে।

স্যারের বাড়ি থেকে খানিকটা ঢালু পথ ধরে যেতে হয়। তারপর বড় রাস্তা। একটু দাঁড়ালে সবেরগঞ্জ যাওয়ার ভ্যান পাওয়া যাবে। অশ্বথ গাছের তলায় স্যারের গাড়ি। স্যার বারবার করে বলেছিল, দোতরাদের গাড়িতে খানিকটা এগিয়ে দেবে। ওরা রাজি হয়নি। গাড়িতে উঠলে নাকি গোটা টুরটাই নষ্ট। স্যার আর ঘাঁটাননি। ওরা নিজের মতো রওনা হয়েছে। দোতারা–বিতানের কী সুন্দরই না প্রেম! ঢালু পথ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে নিজের মনে হাসল ত্রপা। সে তখনও দেখতে পায়নি বুড়ো অশ্বথ গাছের নীচে, আড়ালে ও ছায়ায় কতগুলো ছেলে মোটরবাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাঙচুরের আওয়াজ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে শিরীষ। দেখে উঠোনে মাটির দেওয়ালটা কোমর ভেঙে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ছুটে বাইরে যায়। বিস্ফারিত চোখে দেখে কয়েকজন তার বাঁশ দিয়ে বেড়া ভাঙছে, ঘরের চালা ভাঙছে। তাদের মুখে কাপড় বাঁধা, চেনা যাচ্ছে না। শিরীষ এগিয়ে যায়।

"এসব কী করছ! কে তোমরা?"

এবার দেখতে পায়, একই চেহারার ক'জন তার ক্ষেতে নেমে গিয়েছে। ফসলের উপর কেরোসিন ছড়াচ্ছে। এবার নিশ্চয় আগুন দেবে। শিরীষ ছুটে যায়। আর তখনই চিৎকার শুনতে পায়। ত্রপার চিৎকার।

"স্যার পালান, পালিয়ে যান, এরা আপনাকে মেরে ফেলবে..."

শিরীষ মুখ ফিরিয়ে দেখতে পায় কয়েকজন মিলে ত্রপাকে গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে। একজন ত্রপার কামিজ ছিঁড়তে শুরু করেছে।

শিরীষ প্রাণপণ সেদিকে ছুটতে থাকে আর চিৎকার করতে থাকে, "অ্যাই! তোমার ওকে ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও বলছি..."

ত্রপার কাছে পৌঁছোতে পারে না শিরীষ। তার আগেই তার মাথার পিছনে কেউ বাঁশ দিয়ে সজোরে আঘাত করে। হুমড়ি খেতে-খেতে সে শুনতে পায়, কেউ একজন বলল, "চাষের নামে গ্রামে এসে মেয়েছেলে নিয়ে ফূর্তি হচ্ছে...শুয়োরের বাচ্চা!"

আর-একজন কেউ বলে উঠল, "যা শাল্লা! লোকটাকে মারলি কেন...এ তো মরেই যাবে...পালা এখনই।"

শিরীষ দু'হাত ছড়িয়ে মাটি আঁকড়ে জ্ঞান হারাল।

একটা মাটির দেওয়াল। তাকে ঘিরে চারজন লুকোচুরি খেলছে। নিজেকে চিনতে পারলেও বাকিদের চিনতে দেরি হল শিরীষের। ওটা কে? সোমদত্তা না? তাই তো, সোমদত্তাই তো! আর এই পাশ থেকে যে উঁকি দিচ্ছে? নিশ্চয় ত্রপা। ঠিক তাই। মেয়েটা ছেলেমানুষের মতো আওয়াজ করে হাসছে। আরে! ওই তো দোতারা। এটা কি ছোটবেলা? নাকি বড়বেলা? কে একজন গম্ভীর গলায় বলল, "সাবধান, দেওয়ালটা মাটির কিন্তু। পড়ে যেন ভেঙে না যায়।"

ধীরে-ধীরে চোখ খুলল শিরীষ। নার্সিংহোমের নরম আলো। একজন গোল মুখের নার্স ঝুঁকে পড়লেন। সুন্দর হেসে বললেন, "এই তো জ্ঞান ফিরেছে। খুব কষ্ট হচ্ছে?"

শিরীষ জড়ানো গলায় বলল, "সোমদত্তা এসেছে?"

গলা তো জড়াবেই। দু'ঘণ্টার অপারেশন তো ছোটখাটো বিষয় নয়। এত তাড়াতাড়ি কথা বলতে পারছেন, এটাই তো অনেক। ক্যাবিনের বাইরে এসে নার্স বললেন, "পেশেন্টের জ্ঞান ফিরছে। সোমদত্তা নামে কে আছেন?"

সোমদত্তা এগিয়ে গেল।

নার্স বলল, "যান, আপনাকে ডাকছে।"

দোতারা আর ত্রপা একটু সরে দাঁড়িয়েছে। হাসপাতালের রেলিং ঘেঁষে। ত্রপা রুমাল দিয়ে ঘনঘন চোখ মুছছে।

দোতারা তার গায়ে হাত রেখে বলল, "ত্রপাদি, আর কাঁদছ কেন? বাবার জ্ঞান ফিরেছে। বাবা ভাল হয়ে যাবে। আর কেঁদো না।"

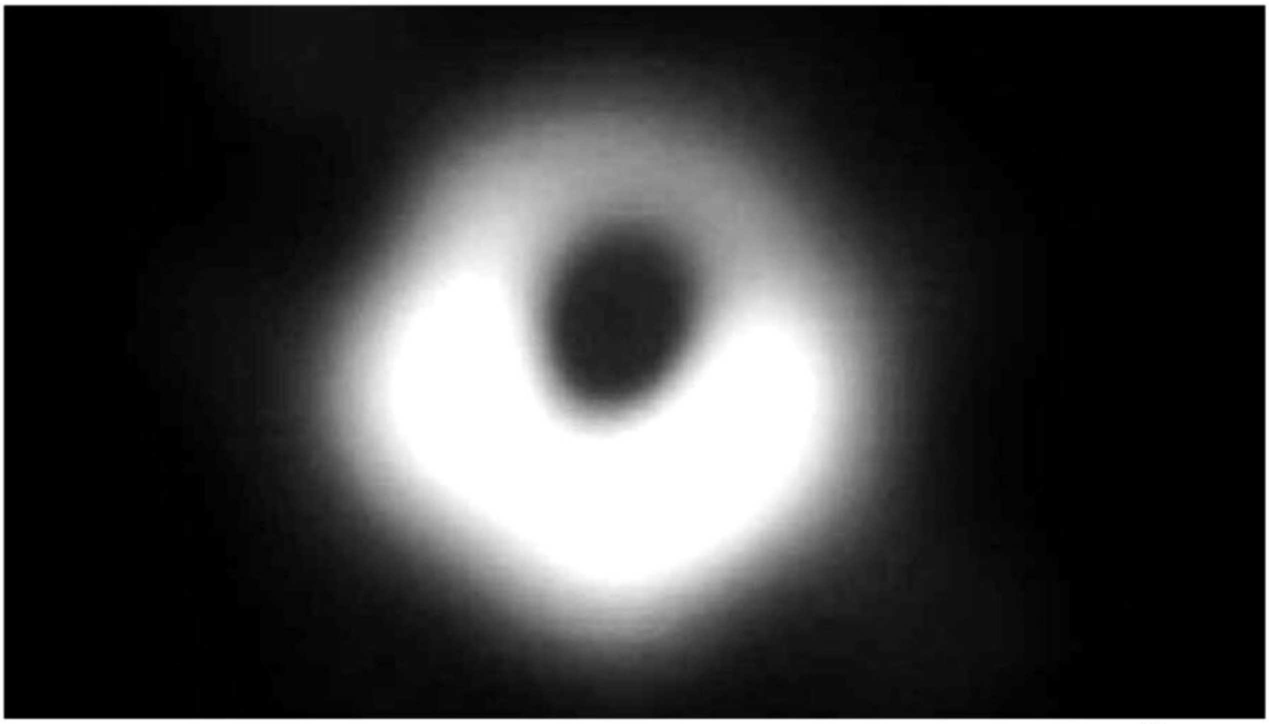
ত্রপা ফিসফিস করে বলল, "আমার খুব আনন্দ হচ্ছে দোতারা। প্লিজ়, আমাকে কাঁদতে দাও।"

শিল্পী: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়





পাখির চোখে বিশ্ব (জলরং,১৯৩৭) শিল্পী: অসিতকুমার হালদার সৌজন্য: এলাহাবাদ মিউজ়িয়াম



ব্ল্যাক হোলের যে ছবি ধরা পড়ল

জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসাধ্যসাধন

পথিক গুহ

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক রেড লেটার ডে, এপ্রিল ১০, সাল ২০১৯। যেমন ছিল ২০১৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি। ওদিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছিলেন তাঁদের এক বিরাট আবিষ্কার। বলেছিলেন, আলবার্ট আইনস্টাইন একশো বছর আগে ১৯১৬ সালে যার পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন, সেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সত্যিই আছে। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ স্পেসটাইমে পর পর সংকোচন এবং প্রসারণ, যা চারদিকে তরঙ্গাকারে ছড়ায়। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত স্পেশ্যাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি অনুযায়ী, স্পেস বা শূন্যস্থানের তিন মাত্রার (ডান-বাঁ, সামনে-পেছনে, ওপর-নীচ) সঙ্গে সময় (অতীত-ভবিষ্যৎ) মিলেমিশে একাকার। শুধু স্পেস নয়, একসঙ্গে স্পেসটাইম। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ হল স্পেসটাইমে কাঁপন। কেন তা হয়? তা হলে বলতে হয় আইনস্টাইনের আর-এক থিওরি জেনারেল রিলেটিভিটির কথা। আইজ্াক নিউটন বলেছিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ডে যে-কোনও দুটো বস্তু একে অন্যকে আকর্ষণ করে। ওই আকর্ষণ বলের নাম মহাকর্ষ বা গ্র্যাভিটি। জেনারেল রিলেটিভিটি হল ওই গ্র্যাভিটি ব্যাখ্যা করার তত্ত্ব। ওই থিওরিতে গ্র্যাভিটির নতুন ব্যাখ্যা দিলেন আইনস্টাইন। বললেন, গ্র্যাভিটি মানে আকর্ষণ নয়, স্রেফ জ্যামিতির খেলা। কীরকম? যে-কোনও ভারী বস্তু তার চারপাশের স্পেসটাইমকে দুমড়ে-মুচড়ে দেয়। অন্য বস্তু ওই দোমড়ানো-মোচরানো স্পেসের মধ্যে দিয়ে চলার সময় তার পথ যায় বেঁকে। আমরা বলি, ওই বাঁকা পথে চলা, প্রথম বস্তুর আকর্ষণের কারণে। আসলে আকর্ষণ নয়, গ্র্যাভিটি হল স্পেসটাইম দোমড়ানোর ফল। আর মহাকর্ষীয় তরঙ্গ? ধরা যাক শূন্যে বিরাট কোনও ঘটনা ঘটল। দুই নক্ষত্রের সংঘর্ষ বা একটা নক্ষত্রের বিস্ফোরণ। ওরকম আকস্মিক ঘটনায় স্পেসটাইমে দোমড়ানো ভাবটা একটা তরঙ্গের আকারে চারদিকে ছড়ায়। ওটাই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেভিটি অনুযায়ী, ওই তরঙ্গ ছড়ায় স্পেসটাইম একবার প্রসারিত এবং পরমুহূর্তেই সংকুচিত হয়ে। কামারের হাপরের মতো। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বে ওরকম তরঙ্গের অস্তিত্ব নেই, তা আছে আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটিতে। কে ঠিক, নিউটন না আইনস্টাইন? বি-রা-ট প্রশ্ন। তা নিষ্পত্তির ঘোষণাটিও হয়েছিল রাজকীয় ভাবে। ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন-এর দপ্তরে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শনাক্তকরণ পরীক্ষায় যুক্ত প্রায় হাজার জন পদার্থবিজ্ঞানীর (হ্যাঁ, সে এক মহাউদ্যোগ, যাতে যুক্ত এই ভারতসহ বহু দেশের গবেষক) তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল, ধরা পড়েছে ওই তরঙ্গ। পৃথিবী থেকে ১৩০ কোটি আলোকবর্ষ (আলো সেকেন্ডে যায়



মেক্সিকোয় লার্জমিলিমিটার টেলিস্কোপ

তিন লক্ষ কিলোমিটার। ১ আলোকবর্ষ=আলো এক বছরে যে দূরত্ব পাড়ি দেয়। হিসেবে দাঁড়ায় প্রায় ৯,৫০০,০০০,০০০,০০০ কিলোমিটার) দূরে ১৩০ কোটি বছর আগে সূর্যের ৩০ গুণ এবং ৩৫ গুণ ভারী দুটো ব্ল্যাক হোল কাছাকাছি এসে একসঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তৈরি করেছিল সূর্যের ৬২ গুণ ভারী একটা ব্ল্যাক হোল (বাকি সূর্যের ৩ গুণ পরিমাণ পদার্থ, আইনস্টাইন-আবিষ্কৃত নিয়ম অনুযায়ী, বনে যায় এনার্জি এবং তা চারদিকে ছড়ায় ওই মহাকর্ষীয় তরঙ্গের আকারে)। এহেন প্রকাণ্ড ঘটনা যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ছড়ায়, তা পৃথিবীর যন্ত্রে ধরা পড়ে ২০১৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর। এতকাল মহাজাগতিক ঘটনাবলি জানা যেত কেবল আলোর নানারকম তরঙ্গ (দৃশ্যমান বা মানুষের চোখে অদৃশ্য) শনাক্ত করে। তার বদলে এবার নতুন জানালায় আকাশ দেখা। আলোর তরঙ্গের বদলে স্পেসটাইমের তরঙ্গ। সুতরাং, শুধু আইনস্টাইনকে নির্ভুল প্রমাণই নয়, একেবারে জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চায় যুগপরিবর্তন। বড় ঘটনা কত বড়, তার প্রমাণ মিলল বছর ঘুরতেই। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শনাক্ত করার পেছনে প্রধান তিন বিজ্ঞানী— রাইনার ওয়েইস, কিপ থর্ন এবং ব্যারি বারিস— পেলেন ফিজ়িক্সে নোবেল প্রাইজ়। ২০১৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারির মতো ২০১৯ সালের ১০ এপ্রিলও জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক স্মরণীয় দিন।

কেন? ওদিন বিজ্ঞানীরা ওই ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে পৃথিবীর বহু দেশের সাংবাদিকদের সামনে ঘোষণা করলেন, তাঁরা আর-এক অসাধ্যসাধন করেছেন। কী? ছবি তুলেছেন এক ব্ল্যাক হোল-এর। ব্ল্যাক হোল মানে তো মহাশূন্যের সেই সব রাক্ষস, যারা সামনে পেলে গিলে খায় সবকিছু, এমনকী আলোও, তার ছবি! কোনও কিছু আমরা তখনই দেখি, যখন তার বা অন্য কারও আলো তা থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পৌঁছায়। ফোটো তোলায় চোখের কাজ করে যন্ত্র। যা থেকে আলোও বেরোয় না, তার ফোটো? হ্যাঁ, তাই। অসাধ্যসাধন ছাড়া একে কী বলা যায়?

বিজ্ঞানীরা বরাবরই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে ভালবাসেন। ওই যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ শনাক্ত করার প্রচেষ্টা, তাও মহা কঠিন এক কাজ। একে তো তাত্ত্বিক ব্যাপার। যদিও তাঁর তত্ত্ব জেনারেল রিলেটিভিটি থেকে আসে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ব্যাপারটা, তবু প্রথম দিকে স্বয়ং আইনস্টাইনের মনে হয়েছিল মহাকর্ষীয় তরঙ্গ অবাস্তব একটা ব্যাপার। এর অস্তিত্ব নেই। সেই মর্মে একটি পেপারও লেখেন তিনি। সে পেপার ছাপেননি জার্নালের এডিটরমশাই। এতে খেপে যান আইনস্টাইন। এতটা যে, ওই জার্নালের সঙ্গে সম্পর্কই ছিন্ন করে দেন। জার্নালটি 'ফিজ়িকাল রিভিউ' মোটামুটি ভাবে পদার্থবিজ্ঞানে সবচেয়ে দামি জার্নাল। সেখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন আইনস্টাইন। পেপার ফেরত আসার পর তা নিয়ে বসেন আইনস্টাইন। দেখতে পান, ভুল তাঁরই। তা শোধরান তিনি। এবার পেপারের নির্যাস এই যে, মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্ভব। তিনি তা ছাপতে পাঠান অন্য এক জার্নালে। 'জার্নাল অফ দ্য ফ্র্যাংকলিন ইনস্টিটিউট। তা ছাপা হয় সেখানে। মাঝখান থেকে ফিজ়িক্সের নামী পত্রিকাটির সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায় আইনস্টাইনের। এমন যে জটিল ব্যাপার, তা শনাক্ত করার কাজও জটিল। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অনেক দিনের অপেক্ষার পর শনাক্ত হয় মহাকর্ষীয় তরঙ্গ।

ব্ল্যাক হোলের ফোটো তোলার ব্যাপারটাও অনেকটা সেরকম। ব্ল্যাক হোল হল মৃত নক্ষত্র। জীবিত নক্ষত্র আলো, তাপ ইত্যাদি ছড়ায়। ব্ল্যাক হোল কিছু ছড়ায় না। তারায় চলে এক বিচিত্র খেলা। এক টানাপোড়েন। একদিকে প্রচণ্ড পদার্থের অভিকর্ষজ টান। যা নক্ষত্রকে সংকুচিত করতে চায়। অন্যদিকে তারার পেটে অগ্নিকুণ্ডে চলে রাসায়নিক বিক্রিয়া। হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম বা হিলিয়াম থেকে আরও ভারী মৌল উৎপাদন। এই বিক্রিয়ার উপহার প্রচুর তাপ। সেই তাপ লুচির মতো ফুলিয়ে নক্ষত্রের আয়তন বাড়াতে চায়। অভিকর্ষজনিত সংকোচন আর তাপজনিত প্রসারণ— এই দুই ক্রিয়ার টানাপোড়েন চলে জীবিত নক্ষত্রে। রাসায়নিক বিক্রিয়া চালু রাখার জন্য চাই রসদ। নক্ষত্রে রসদের জোগান ফুরোয় একসময়। তখন রাসায়নিক বিক্রিয়া নেই— ফলে তাপ নেই— শুধু থাকে অভিকর্ষ। মানে, সংকোচন। চারদিক থেকে নিষ্পেষণের চাপ। এই অবস্থায় মৃত নক্ষত্রের মধ্যে পদার্থ যদি একটা নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি হয়, তা হলে ওই চাপ ঠেকানোর কোনও উপায় থাকে না। সেক্ষেত্রে নক্ষত্র বনে যায় ব্ল্যাক হোল। মৃত নক্ষত্রের অদ্ভুতুড়ে দশা। যে দশায় ঘটতে পারে অনেক বিচিত্র ঘটনা। যার মধ্যে একটা হল সময়ের খুবই ধীরে বওয়া। এমন ধীরে, যে মনে হবে, সময় যেন থেমেই গেছে। মোটে এগোচ্ছে না। আমাদের মনে হবে, তেমন আবার হয় নাকি? সময় তো সবসময় এগিয়ে চলে। গতকাল,



শেপার্ড ডোয়েলেম্যান



অ্যাভেরি ব্রডেরিক

আজ এবং আগামিকাল। ব্ল্যাক হোলের মধ্যে যেসব অদ্ভুতুড়ে ঘটনা ঘটতে পারে, তার কেবল একটার কথাই বললাম এখানে। বিচিত্র জিনিসে ঘটে এমন বিচিত্র আরও ঘটনা।

বিচিত্র জিনিস বলেই বোধ হয় আইনস্টাইন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বে। বিশ্বাস করতে না-পেরে, মৃত নক্ষত্র যে কখনওই বনবে না ব্ল্যাক হোল, তা দাবি করে ১৯৩৯ সালে তিনি এক পেপার ছাপান 'অ্যানাল্‌স অফ ম্যাথমেটিক্স' জার্নালে। শিরোনাম 'অন আ স্টেশনারি সিস্টেম উইথ স্ফেরিকাল সিমেট্রি কনসিস্টিং অফ মেনি গ্রাভিটেটিং মাসেস'। ওই একই বছরে বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার এবং তাঁর ছাত্র হার্টল্যান্ড স্নাইডার 'ফিজ়িকাল রিভিউ' জার্নালে এক পেপার লেখেন। শিরোনাম 'অন কন্টিনিউড গ্রাভিটেশনাল কনট্রাকশন'। প্রতিপাদ্য, বাস্তবে ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব সম্ভব। দেখা যায় আইনস্টাইনের অনুমান ভুল, ওপেনহাইমার এবং স্নাইডারের গণনা ঠিক। সবচেয়ে মজার ব্যাপার বোধ হয় এই যে, ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব প্রমাণেও ওপেনহাইমার এবং স্নাইডার কিন্তু আইনস্টাইন-আবিষ্কৃত জেনারেল রিলেটিভিটি তত্ত্বই কাজে লাগান।

যে বস্তুর অস্তিত্বে আইনস্টাইনের নিজেরই বিশ্বাস ছিল না, তা শনাক্ত করা কত কঠিন কাজ, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এক্ষেত্রে অসাধ্যসাধনের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তাতে সফল হতে লেগে যায় অনেক বছর। প্রায় এক যুগ। অবশেষে এ বছর সাফল্য ঘোষণা। শুধু ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে নয়, চার মহাদেশে আরও ছ'টা জায়গায়



ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন

প্রেস কনফারেন্স করে বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন তাঁদের সাফল্য। তা ছাড়া ওই দিনই 'দি অ্যাস্ট্রোফিজ়িকাল জার্নাল লেটারস' পত্রিকায় ব্ল্যাক হোলের ছবি তোলায় যুক্ত বিজ্ঞানীরা পেপার ছাপেন। কাজটা যেহেতু বিশাল, তাই ছাপা হয় মোট ছ'টি পেপার। পুরো কাজটাকে ছ'ভাগে ভাগ করে। কোনও পেপারের বিষয় যদি ব্ল্যাক হোলের ছবি হয়, তবে অন্য এক পেপারের বিষয় হল সে ছবি তোলার জন্য যান্ত্রিক আয়োজন। আবার কোনও পেপার হয়তো ছবির চরিত্র বিশ্লেষণ নিয়ে। যাতে বিশাল কর্মকাণ্ডের কোনও দিক বাদ না-পড়ে।

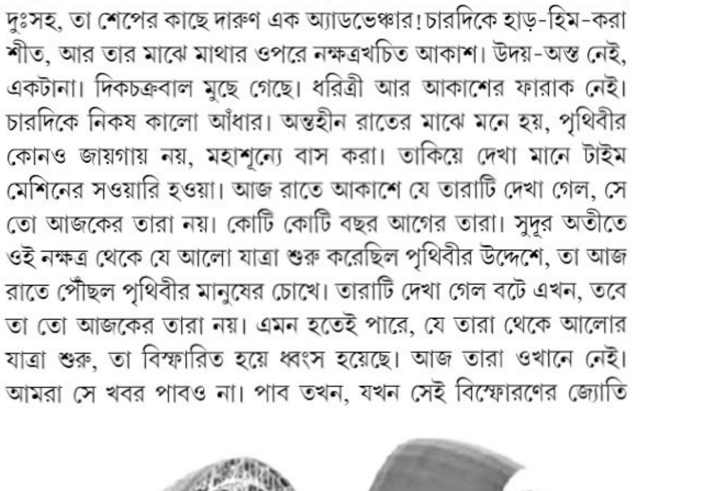
বিশাল এই কর্মকাণ্ড এবং তার সাফল্যের কথা বলতে গেলে একজনের কথা এসেই পড়ে। তিনি এই উদ্যোগের প্রাণপুরুষ। জ্যোতির্বিজ্ঞানী শেপার্ড এস ডোয়েলেম্যান। সতীর্থ মহলে শুধু শেপ।

জন্ম ১৯৬৭ সালে। বেলজিয়ামের উইলসেল নামে একটা জায়গায়। বাবা অ্যালেন ন্যাকম্যান আমেরিকান। মা লেন কনিয়াক-ও তাই। তেইশ বছর বয়সি অ্যালেন ডাক্তারি পড়তে এসেছিলেন বেলজিয়ামে। লেন-এর সঙ্গে ও দেশে আলাপ। এবং বিয়ে। ডাক্তারি পড়া ভাল লাগল না অ্যালেনের। সন্তান শেপ যখন মাত্র পাঁচ মাস বয়সি তখন স্বামী-স্ত্রী ফিরে এলেন আমেরিকায়। এ-জায়গা সে-জায়গা ঘুরে পৌঁছোলেন ওরেগন প্রদেশের পোর্টল্যান্ড শহরে। ওখানে অ্যালেন জোগাড় করলেন একটা চাকরি। সাংবাদিকের। আমেরিকান নিউজ় এজেন্সি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস সংস্থায়। ততদিনে অ্যালেনের এক মেয়েও হয়েছে। শেপ যখন সাত বছর বয়সি, তখন একদিন অ্যালেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর ইচ্ছে মোটরসাইকেলে এশিয়া পাড়ি দেবেন। সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না। নাবালক ছেলে এবং মেয়ে নিয়ে লেন বিপাকে। আবার বিয়ে করলেন। এবার স্বামী নেলস ডোয়েলেম্যান। হাই স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষক। এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তিনিও ডিভোর্সি। স্বামী, স্ত্রী ও চার ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার। নেলস দত্তক নিলেন শেপ ও তার বোনকে। শেপার্ড ন্যাকম্যান হয়ে গেল শেপার্ড ডোয়েলেম্যান।

শেপ ক্লাস ফাইভ পাশ করার পর নেলস স্কুলের চাকরিতে ছুটি নিলেন এক বছরের। চলে গেলেন কানাডা। সেখান থেকে জাহাজে চড়ে ইউরোপ। বেলজিয়াম, ইতালি, স্পেনে ছুটি কাটিয়ে ডোয়েলেম্যান পরিবার ফের আমেরিকায়। লেন চাকরি নিলেন নেলস-এর স্কুলে। বিজ্ঞানের শিক্ষক নেলস লক্ষ করলেন এক ব্যাপার। শেপ ক্লাসে অন্য ছাত্রদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। বিশেষত ম্যাথ আর ফিজ়িক্সে। ছাত্রাবস্থায় নেলসও যেসব অধ্যায় কঠিন ভাবতেন, তা শেপের কাছে খুব সোজা।

পনেরো বছর বয়সে হাই স্কুল শেষ। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রের আশা, এবার ঠিকানা হবে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (ক্যালটেক)। স্নাতক ছাত্রদের গর্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রবেশিকায় পাশ করলেন না শেপ। অগত্যা পোর্টল্যান্ডের নামকরা রিড কলেজে ভর্তি। পনেরো বছর বয়সের ছেলের ড্রাইভিং লাইসেন্স হবে না। মা'র পরামর্শে তা পেতে বয়েস ভাঁড়ালেন। মিথ্যে বললেন সহপাঠীদেরও। ধরা পড়ে গেলেন গ্র্যাজুয়েশনের দিন। যখন মাইকে ঘোষণা হল, এবার কলেজের ইতিহাসে সবচেয়ে কমবয়সি ছাত্র স্নাতক হচ্ছে।

স্নাতক হওয়ার পর পিএইচ ডি প্রোগ্রাম। শেপ ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি)-তে নির্বাচিত। কিন্তু যোগ দিলেন না ওখানে। চোখে পড়ল এক বিজ্ঞাপন। দরখাস্ত দিয়ে নির্বাচিত হলেন। আমেরিকান নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে দক্ষিণমেরুতে। যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগত। লেগে পড়লেন কাজে। ওই এক বছর বদলে দিল জীবন। বিশেষ করে ছ'মাসব্যাপী রাত। যা অনেকের কাছে দুঃসহ, তা শেপের কাছে দারুণ এক অ্যাডভেঞ্চার! চারদিকে হাড়-হিম-করা শীত, আর তার মাঝে মাথার ওপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ। উদয়-অস্ত নেই, একটানা। দিকচক্রবাল মুছে গেছে। ধরিত্রী আর আকাশের ফারাক নেই। চারদিকে নিকষ কালো আঁধার। অন্তহীন রাতের মাঝে মনে হয়, পৃথিবীর কোনও জায়গায় নয়, মহাশূন্যে বাস করা। তাকিয়ে দেখা মানে টাইম মেশিনের সওয়ারি হওয়া। আজ রাতে আকাশে যে তারাটি দেখা গেল, সে তো আজকের তারা নয়। কোটি কোটি বছর আগের তারা। সুদূর অতীতে ওই নক্ষত্র থেকে যে আলো যাত্রা শুরু করেছিল পৃথিবীর উদ্দেশে, তা আজ রাতে পৌঁছল পৃথিবীর মানুষের চোখে। তারাটি দেখা গেল বটে এখন, তবে তা তো আজকের তারা নয়। এমন হতেই পারে, যে তারা থেকে আলোর যাত্রা শুরু, তা বিস্ফারিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। আজ তারা ওখানে নেই। আমরা সে খবর পাবও না। পাব তখন, যখন সেই বিস্ফোরণের জ্যোতি

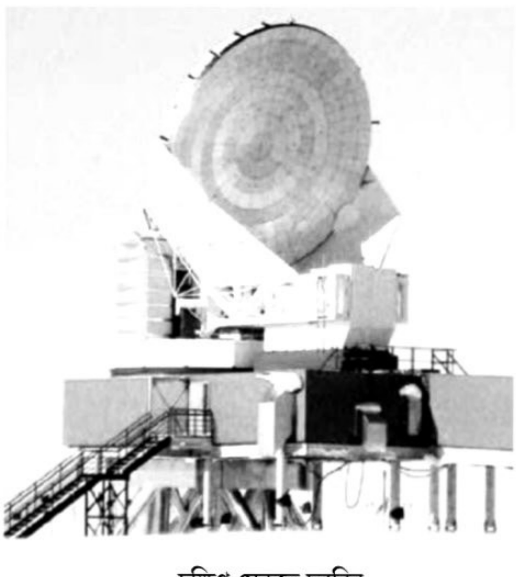


আটাকামা লার্জমিলিমিটার অ্যারে

এসে পৌঁছবে পৃথিবী গ্রহে। আজ যদি মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে বহু দূরে ভিনগ্রহে, সেখানকার জীবেরা তাকিয়ে দেখতে পায় পৃথিবী, তা হলে তারা হয়তো দেখবে এই গ্রহে মানুষ নয়, ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে নিয়ানডারথালরা। আকাশ দেখা, সুতরাং, অতীত দেখা।

এক বছরের চাকরি-কাম-অ্যাডভেঞ্চার শেষ। দক্ষিণমেরু থেকে ফিরে আসার পর শেপ ভাবলেন, এবার এমআইটি-তে পিএইচ ডি করবেন। ওই প্রোগ্রামে তো তিনি নির্বাচিত হয়ে আছেন। ধারণা ভুল। এমআইটি জানাল, সে নির্বাচন বাতিল। আবার নতুন করে নির্বাচনের পরীক্ষায় বসা। এবং নির্বাচন। গবেষণা শুরুর আগে কিছুদিনের ছুটি। এবং ট্যুরিজ়ম। বেড়ানোর জায়গা? পাকিস্তান এবং ভারত। কাশ্মীর।

তারপর এমআইটি। সে আর-একরকম। দুঃসহ পরিশ্রম। রাতের পর রাত জেগে। এক-একটা প্রশ্নের থই পেতে তিরিশ পৃষ্ঠা টেনসর ক্যালকুলাসের ক্যালকুলেশন। গবেষকদের গাইডরা প্রায়ই প্রশ্ন করেন, 'সাঁতার কাটছ, না ডুবছ।' শেপের তাত্ত্বিক গণনা অতটা পছন্দের কাজ নয়। তাঁর ভাল লাগে এক্সপেরিমেন্ট। ব্রহ্মাণ্ড বিষয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর পেতে আকাশ পর্যবেক্ষণ। তাই এমআইটি-র প্লাজ়মা ফিজ়িক্স গ্রুপে বেশিদিন থাকা হল না শেপের। ডিপার্টমেন্ট বদলে রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি গ্রুপে। সেখানেও পিএইচ ডি-র মৌখিক পরীক্ষায় ফেল। একবার নয়, দু'বার। তৃতীয় প্রচেষ্টা অবশ্য সফল। ততদিনে বিভাগীয় প্রধান শেপের ওপর আস্থা হারিয়েছেন। তিনি আর ওঁকে রাখতে চান না গ্রুপে। তবে তিনি একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিলেন না ওঁর থেকে। ব্যবস্থা করে দিলেন এমআইটি-রই অধীনে এক মানমন্দিরে কাজ করার।


দক্ষিণ মেরুতে দূরবিন

হেস্ট্যাক অবজ়ারভেটি। বস্টন শহরের অদূরে। ১৯৯২ সালে ওখানে কাজে যোগ দিলেন শেপ। হেস্ট্যাক এমআইটি-র বিখ্যাত র‍্যাড ল্যাব-এর উত্তরসূরি। ১৯৪০-এর দশকে ওই গবেষণাগারে বানানো রেডার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভীষণ কাজে লাগে। বস্তুতপক্ষে ওই রেডার বিনে যুদ্ধে জয় অসম্ভব হত মিত্রশক্তির পক্ষে। বলা হয়, দুটো জিনিস যুদ্ধ জেতায় ওদের। রেডার এবং অ্যাটম বোমা। কিন্তু অ্যাটম বোমা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে যখন ফেলা হয়, তখন যুদ্ধ একরকম শেষ হয়েই গেছে। যুদ্ধের মাঝপথে মিত্রশক্তিকে ভীষণ সাহায্য করে ওই রেডার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শুরু হল রুশ-মার্কিন ঠান্ডা লড়াই। অ্যাটম বোমার বদলে এল আরও ভয়ংকর হাইড্রোজেন বোমা। এবং তা বহনকারী ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল (আইসিবিএম)। আগে শত্রুবিমান ট্র্যাক করা হত রেডারে। আইসিবিএম ধেয়ে এলে তা ট্র্যাক করা যায় কীভাবে? ও কাজের জন্য র‍্যাড ল্যাব ভেঙে দিয়ে প্রতিরক্ষা দপ্তরের আর্থিক সাহায্যে তৈরি করা হল লিঙ্কন ল্যাবরেটরি। ওই ল্যাবরেটরি পরে তৈরি করল হেস্ট্যাক অবজ়ারভেটরি। যাতে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৭ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় আইসিবিএম ধেয়ে এলেও তার খবর আগেভাগে পাওয়া যায়। মানমন্দির শক্তিশালী, তাই তার সঙ্গে যুক্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দাবি করলেন, শুধু প্রতিরক্ষা নয়, গবেষণার কাজেও ব্যবহৃত হোক ওই অবজ়ারভেটরি। নিল আর্মস্ট্রং চাঁদে নামার ৫০ বছর পূর্ণ হল এবার। সে উপলক্ষে অ্যাপোলো-১১-র সাফল্য ঘিরে নানা অনুষ্ঠান, লেখাজোখা। ওই মহাকাশযানের আরোহী নভশ্চরেরা চাঁদের কোথায় নামবেন, তা খুঁজে দেখেছিল হেস্ট্যাক অবজ়ারভেটরি। কাজ কঠিন ছিল। অনেকের ভয় ছিল। চাঁদে বহু জায়গায় নরম ধুলোর ভিড়ে সঠিক জায়গা বাছা যাবে কি-না। যদি তা বাছা না যায়, তবে চাঁদে নামবে যে যান, সেই 'ঈগল' ধুলোর পাহাড়ে নেমে ডুবে যাবে তার মধ্যে। ধুলোর সমাধি ঘটবে নিল আর্মস্ট্রং এবং এডুইন অলড্রিন-এর। 'সি অফ ট্রাংকুলিটি' নামে চাঁদের যে জায়গায় ওঁরা নামেন ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই, তা ওই হেস্ট্যাক অবজ়ারভেটরির বেছে দেওয়া।

হেস্ট্যাক অবজ়ারভেটরিতে ১৯৯২ সালে শেপ যখন যোগ দিলেন, তখন এক নতুন কায়দায় আকাশ দেখা বেশ এগিয়েছে। রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি। আলো তড়িৎ আর চুম্বকের মিলিত তরঙ্গ। সে তরঙ্গের মাপ নানারকম হতে পারে। মানুষের চোখে কিছু মাপের তরঙ্গই কেবল ধরা পড়ে। এর বাইরেও আছে নানা মাপের তরঙ্গ। যা মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। যেমন উত্তাপ। সেটাও তরঙ্গ, কিন্তু সে তরঙ্গ মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। মোবাইল ফোন বা রেডিও টেলিভিশন যে তরঙ্গ ব্যবহার করে যোগাযোগ রক্ষা করে, সেসব তরঙ্গও মানুষ দেখতে পায় না। এরকম তরঙ্গকে বলে বেতার তরঙ্গ। এমন তরঙ্গ দৈর্ঘে হতে পারে মিলিমিটার বা কিলোমিটার। বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তু ওরকম অনেক ধরনের বেতার তরঙ্গ ছড়ায়, যা মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। ওসব তরঙ্গ শনাক্ত করে বস্তুগুলোর চরিত্র অনুধাবন হল রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি। এ পথে মহাজাগতিক বস্তুর অনুসন্ধান শুরু হয় ১৯৩০-এর দশক থেকে।

রেডিও অ্যাস্ট্রোনমির জন্য চাই রেডিও টেলিস্কোপ। এমন দূরবিন, যা সংগ্রহ করবে বেতার তরঙ্গ। তার থাকবে ডিশ অ্যান্টেনা, থালার আকারের তরঙ্গ-গ্রাহক যন্ত্র। আসলে থালা নয়, ডিশ অ্যান্টেনার তলটা হবে প্যারাবোলয়েড বা অধিবৃত্তাকার। যাতে সেই তলের সব জায়গায় তরঙ্গ পড়ে, প্রতিফলিত হয়ে এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হতে পারে। মানে, সব তরঙ্গ এক বিন্দুতে জড়ো হতে পারে। শক্তিশালী হতে পারে।

আকাশ দেখার নতুন কৌশল হলেও রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি গোড়ায় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তেমনভাবে সাহায্য করতে পারেনি। অপটিকাল টেলিস্কোপ, যা শনাক্ত করে দৃশ্যমান আলো, তা দিয়ে মহাজাগতিক বস্তুর চরিত্র যতটা বোঝা যেত, ততটা যেত না রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে। রেডিও টেলিস্কোপে মহাজাগতিক বস্তু কত স্পষ্ট ঠাহর করা যাবে, তা নির্ভর করে দুটো ফ্যাক্টরের ওপর। এক, অ্যান্টেনার অ্যাপারচার (ব্যাস) কত বড় হবে। দুই, মহাজাগতিক বস্তু থেকে নির্গত তরঙ্গ মাপে কত ছোট হবে। সাধারণত রেডিও টেলিস্কোপে অ্যান্টেনার অ্যাপারচার হয় ১০ থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে। তা হলেও যেহেতু বেতার তরঙ্গগুলো দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গের চেয়ে লম্বায় লক্ষগুণ বড় হয়, তাই রেডিও টেলিস্কোপে মহাজাগতিক বস্তু স্পষ্ট ঠাহর করার অসুবিধে ছিল। অবশ্য, অপটিকাল টেলিস্কোপে যে অসুবিধে ছিল না, তা নয়। প্রধান অসুবিধে পৃথিবী গ্রহ ঘিরে বায়ুমণ্ডল। তা দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গের চলার পথে নানারকম বাধার সৃষ্টি করে।

মহাজাগতিক বস্তুরা এক-একটা বহু দূরবর্তী। পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব প্রায়শই বহু আলোকবর্ষের। অতদূরের বস্তু সাইজে ছোট হয়ে যায়। পৃথিবীতে বসে ওদের ব্যাস বোঝা দুরূহ হয়ে পড়ে। এ সমস্যার সুরাহা হয় যে কৌশলে, তার নাম ইন্টারফেরোমেট্রি। আগেই বলেছি, বহুদূরের বস্তুর সাইজ় বুঝতে চাই এমন রেডিও টেলিস্কোপ, যার অ্যান্টেনার অ্যাপারচার হবে পেল্লায়। এদিকে অ্যান্টেনার অ্যাপারচার আর কতই-বা বড় করা যায়? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ওই অ্যাপারচার বাড়ানোর কাজটা সারেন ইন্টারফেরোমেট্রি-র সাহায্যে। মহাশূন্যে কোনও বস্তু থেকে নির্গত তরঙ্গ দূরবর্তী দুই বা ততোধিক রেডিও টেলিস্কোপে একসঙ্গে সংগ্রহ করা হল ইন্টারফেরোমেট্রি। এতে দূরের মহাজাগতিক বস্তু স্পষ্টতর হয়। কীভাবে? অনেকগুলো রেডিও টেলিস্কোপের ডিশ অ্যান্টেনা মিলে তখন একটা প্রকাণ্ড ডিশ অ্যান্টেনার মতো কাজ করে। যেন একখানাই ভারচুয়াল ডিশ অ্যান্টেনা। আর সে ভারচুয়াল অ্যাপারচার বা ব্যাস যেন রেডিও টেলিস্কোপগুলোর মধ্যে দূরত্বের সমান। ইন্টারফেরোমেট্রি এই কৌশলে অ্যান্টেনার অ্যাপারচার বাড়িয়ে ফেলে। নামটা এসেছে ইন্টারফেয়ারেন্স থেকে। শব্দটার অর্থ পারস্পরিক প্রভাব। একই মহাজাগতিক বস্তু থেকে নির্গত বেতার তরঙ্গ যখন অনেকগুলো টেলিস্কোপে সংগ্রহের পর মেশানো হয়, তখন নানা জায়গায় সংগৃহীত তরঙ্গ একে অন্যের ওপর প্রভাব

ফেলে। তরঙ্গ মানে ওঠা-নামা। উঁচু-নিচু। যদি নানা টেলিস্কোপে সংগৃহীত তরঙ্গগুলো সুসমঞ্জস হয়— মানে, যদি ওঠা ও নামাগুলো মিলে যায়— তাকে বলে পজ়িটিভ ইন্টারফেয়ারেন্স। তখন তরঙ্গ জোরদার হয়। আর যদি ওঠা ও নামাগুলো সুসমঞ্জস না হয়— মিলে না যায়— তাকে বলে নেগেটিভ ইন্টারফেয়ারেন্স। পজ়িটিভ এবং নেগেটিভ ইন্টারফেয়ারেন্সের তারতম্য থেকে দূরবর্তী মহাজাগতিক বস্তু স্পষ্টতর হয়।

ইন্টারফেরোমেট্রি কৌশল কাজে লাগাতে প্রথম অস্ট্রেলিয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা রেডিও ইন্টারফেরোমিটার তৈরি করেন ১৯৪০-এর দশকে। সমুদ্রের তীরে দু'জায়গায় পাহাড়গুলো। সে চূড়াগুলোর মাথায় দুটো অ্যান্টেনা। দুটো অ্যান্টেনায় তরঙ্গ শনাক্ত করে তারপর মেশানো। এর পর ইংল্যান্ডে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মার্টিন রাইল প্রায় আধ কিলোমিটার দূরের দুই রেডিও টেলিস্কোপ নিয়ে কাজ করেন। তাদের মধ্যে যোগাযোগ? তার দিয়ে। পরে রেডিও টেলিস্কোপগুলোর মধ্যে দূরত্ব আরও বাড়লে ওই যোগাযোগের ব্যাপারটা সমাধা করা হয় মাইক্রোওয়েভে।

ইন্টারফেরোমেট্রির পরের ধাপ এসে গেল ১৯৬০-এর দশকে। প্রথমে ইংল্যান্ডে জডরেল ব্যাঙ্ক মানমন্দির কাজে লাগায় লং-বেসলাইন ইন্টারফেরোমিটার। বেসলাইন হল দুটো রেডিও টেলিস্কোপের মধ্যেকার দূরত্ব। লং-বেসলাইন মানে দুটো রেডিও টেলিস্কোপের মধ্যে দূরত্ব ১২৭ কিলোমিটার। যোগাযোগ? সেই মাইক্রোওয়েভে। এরপর এল ভেরি-লং-বেসলাইন ইন্টারফেরোমেট্রি (ভিএলবিআই)। ভেরি-লং-বেসলাইন মানে এক একটা রেডিও টেলিস্কোপের দূরত্ব হাজার হাজার মাইল। একটা এ মহাদেশে তো অন্যটা ও মহাদেশে। এক্ষেত্রে রেডিও টেলিস্কোপগুলোর মধ্যে যোগাযোগ আর মাইক্রোওয়েভে নয়। বিভিন্ন রেডিও টেলিস্কোপে আলাদাভাবে তথ্য টেপ করে কোনও এক কেন্দ্রে সেসব মেশানো।



স্যাগিটারিয়াস

ভিএলবিআই-এর প্রসঙ্গে একটা তথ্য বেশ মজার। বিজ্ঞান যে এক অতীন্দ্রিয় যোগাযোগ, কোথা থেকে কী মিলবে তার ঠিক নেই, ওই তথ্যটা তার এক চমৎকার নিদর্শন। তথ্যটা এই যে, ভিএলবিআই চালু হওয়ার পর তা এমন এক কাজে লেগে গেল, যার সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা ভূতত্ত্বের। ভিএলবিআই এসে যাওয়ার পর বিজ্ঞানীরা টের পেলেন এই কৌশলটা বিশেষ এক কাজে লাগানো যায়। ততদিনে আবিষ্কৃত হয়েছে কোয়েসার বা কোয়াসি-স্টেলার অবজেক্ট। প্রচণ্ড উজ্জ্বল সব মহাজাগতিক বস্তু। এত তাদের আলো যে, কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকেও তাদের দেখা যায়। কোয়েসার থাকে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুমান কোয়েসার আসলে ব্ল্যাক হোল ঘিরে আলোর প্রবল ছটা। গ্যাস এবং কণা প্রবল বেগে টেনে নিচ্ছে ব্ল্যাক হোল। পড়ার সময় গ্যাস এবং কণা থেকে বেরোয় যে ছটা, তা-ই কোয়েসারের আলোর উৎস। কোয়েসার পৃথিবী থেকে এত দূরে যে, পৃথিবীর তুলনায় তা স্থির ধরা যায়। এবার, ভিএলবিআই কৌশলে পৃথিবীর দুই মহাদেশে অবস্থিত দুই রেডিও টেলিস্কোপ থেকে কোয়েসার দেখা হল। দু'জায়গা থেকে কোয়েসার দেখায় সময়ের সামান্য হেরফের হবে। ওই হেরফের থেকে দুটো জায়গার মধ্যে দূরত্ব গণনা করা যায়। সে মাপ নিখুঁত। একেবারে মিলিমিটার পর্যন্ত। এভাবে বছরের পর বছর, দশকের পর দশক ধরে ওই দূরত্ব মাপেন বিজ্ঞানীরা। দেখা যায়, দুই রেডিও টেলিস্কোপের মধ্যেকার দূরত্ব বাড়ছে। মানে, দুই মহাদেশের দূরত্ব বাড়ছে। তিল তিল করে হলেও, এক মহাদেশ অন্য মহাদেশ থেকে সরে যাচ্ছে। হ্যাঁ, প্লেট টেকটনিকস তত্ত্ব সম্পর্কে সন্দেহ দূর করে ভিএলবিআই। পৃথিবীর ত্বক যে কতগুলো প্লেট-এর সমষ্টি, এবং সেসব প্লেট যে নড়াচড়া করছে, তার প্রমাণ পেশ করে ভিএলবিআই।

হেস্ট্যাক অবজ়ারভেটরিতে ১৯৯২ সালে কাজে যোগ দিয়ে শেপ যাঁর সংস্পর্শে আসেন, তিনি হলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যালান রজার্স। আরও অনেকের সঙ্গে যিনি ভিএলবিআই প্রযুক্তির প্রথম সারির বিশেষজ্ঞ। তিনি শেপকে দায়িত্ব দেন বিভিন্ন রেডিও টেলিস্কোপে সংগৃহীত তথ্য সমন্বয়ের। ভিএলবিআই-এর সাফল্য নির্ভর করে এই সমন্বয়ের কাজটার ওপর। অনেক টেলিস্কোপে পাওয়া তথ্য যদি ভালভাবে সমন্বিত করা না যায়, তা হলে ভিএলবিআই কৌশল কাজে লাগে না। শেপ, সুতরাং, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন ভিএলবিআই প্রযুক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে। এই অভিজ্ঞতা তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থায় ভীষণ উপকারে লাগে।

শেপ যখন হেস্ট্যাক অবজ়ারভেটরিতে কাজ করতে ঢোকেন, তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক বিশেষ প্রশ্নে গবেষকদের আগ্রহ তুঙ্গে। কী আছে এক-একটা গ্যালাক্সির কেন্দ্রে? কিম্ভুতকিমাকার কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে ওসব জায়গায়, না হলে ওসব স্থান অত ঘটনাবহুল হতে পারে না। কেমন সব ঘটনা? প্রথম কথা, গ্যালাক্সিগুলোর কেন্দ্রে পদার্থের ঘনত্ব ভীষণ বেশি। যেন নিরেট, ঠাসা পদার্থে। আয়তন হবে আমাদের এই সৌরমণ্ডলের কম। এ পরিমাণ জায়গার ওজন সূর্যের ওজনের হাজার হাজার কোটি গুণ। পদার্থ অত বিশাল পরিমাণে বলে ওসব জায়গায় গ্র্যাভিটিও প্রচণ্ড। এমনিতে ওই সাংঘাতিক গ্র্যাভিটির টানই কেবল বোঝা যেত ওই জায়গাগুলো থেকে। কিন্তু তা হয়নি। দেখা গেল, জায়গাগুলোর খিদেও প্রচণ্ড। কাছাকাছি নক্ষত্রগুলোকে টপাটপ গিলে খাচ্ছে ওই জায়গা। যেসব নক্ষত্রকে গিলে খেতে পারছে না, তারা অকল্পনীয় বেগে সেকেন্ডে ১৫০০ কিলোমিটার; মানে, পৃথিবী যে বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, তার ৫০ গুণ বেশি স্পিডে) ঘুরপাক খাচ্ছে ওই জায়গার চারপাশে। ঘুরপাক খাচ্ছে কণা এবং গ্যাসের পুঞ্জ। ঘূর্ণায়মান কণা ও গ্যাসপুঞ্জের জ্যোতি এবং তাপও প্রচণ্ড। কী লুকিয়ে আছে এক-একটা গ্যালক্সির কেন্দ্রে? কে দায়ী ওসব ঘটনার জন্য?

দুই ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী মার্টিন রিস এবং ডোনাল্ড লিনডেন-বেল ১৯৭১ সালে বললেন, গ্যালাক্সিদের কেন্দ্রে আছে পেল্লায় সব ব্ল্যাক হোল। যাদের ওজন সূর্যের ওজনের কয়েক লক্ষ থেকে কয়েকশো কোটি গুণ বেশি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় ওসব মহাজাগতিক দানবের নাম সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল। অত্যধিক ভারী ব্ল্যাক হোল। দুই ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর দাবি যে ঠিক, তার প্রমাণ মিলতে লাগল ১৯৮০-র দশকের গোড়ায়। যখন আমাদের এই মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র— যার নাম স্যাগিটারিয়াস এ-স্টার (সংক্ষেপে এসজিআর এ-স্টার)— থেকে নির্গত শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ শনাক্ত হল। ওরকম তরঙ্গের উৎস প্রচণ্ড আকর্ষণের প্রভাবে থাকা ইলেকট্রন কণা। ব্ল্যাক হোল ছাড়া ইলেকট্রনদের অত জোরে টানবে কে? ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি আরও প্রমাণ এসে গেল। আমেরিকার বার্কলেতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী চার্লস টাউন্স এবং তাঁর সহযোগীরা এসজিআর এ-স্টার থেকে নির্গত বিশেষ জাতের বেতার তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারলেন, কী সাংঘাতিক ঘটনা ঘটছে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে। তিন আলোকবর্ষ ব্যাসবিশিষ্ট একটা জায়গা ঘিরে ঘুরছে লক্ষ কোটি কিলোমিটার বিস্তৃত গ্যাসপুঞ্জ। যেহেতু গ্যালাক্সির কেন্দ্রের কাছাকাছি গ্যাস ঘুরছে দূরের গ্যাসের অনেক বেশি বেগে, তাই টাউন্স এবং তাঁর সহযোগীরা বললেন, গ্যাসপুঞ্জকে টানছে নিশ্চয়ই কোনও প্রচণ্ড ভারী বস্তু। যা ব্ল্যাক হোল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

বিশেষণ যদিও সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল, এস জি আর এ-স্টার কিন্তু ওই বিভাগে নেহাতই পুঁচকে। ওজন মাত্র (!) ২৬ লক্ষ সূর্যের মোট ওজনের সমান। সে তুলনায় কন্যারাশির মধ্যে অবস্থিত মেসিয়ার ৮৭ গ্যালাক্সি, যার

নাম এম ৮৭—তার কেন্দ্রে যে ব্ল্যাক হোল (এম ৮৭-স্টার)— তার ওজন ৬৫০ কোটি সূর্যের মোট ওজনের সমান। অত প্রকাণ্ড যে ব্ল্যাক হোল, তার ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। তার ক্ষুধাও প্রচণ্ড। চারপাশের নক্ষত্ররাজি সে অনেক বেশি গিলে খাচ্ছে। তা ঘিরে ভীমবেগে ঘুরপাক খাচ্ছে যেসব কণা এবং গ্যাসপুঞ্জ, সেসব বেশি পরিমাণে বলে তাদের জ্যোতিও বেশি। এস জি আর এ-স্টারে যে ব্ল্যাক হোল, তার সঙ্গে এই এম ৮৭-এর কেন্দ্রস্থিত ব্ল্যাক হোলের একটাই তফাত। সুপারম্যাসিভ ঘরানার হলেও ওই পুঁচকে ব্ল্যাক হোল যেখানে মোটে (!) ২৬,০০০ আলোকবর্ষ দূরে, সেখানে ওই এম ৮৭-র কেন্দ্রের ব্ল্যাক হোল পৃথিবী থেকে ৫৫,০০০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে। একটা কাছে কিন্তু ছোট, অন্যটা দূরে অথচ প্রকাণ্ড। স্টাডি করতে দুটোর ক্ষেত্রে সুবিধে এবং অসুবিধে সমান।

ব্ল্যাক হোল গবেষণা? হ্যাঁ, মহাশূন্যের ওই দানবদের ঘিরে বিজ্ঞানীদের মনে নানা প্রশ্ন। ব্ল্যাক হোল যেন লম্বা এক প্রশ্নপত্র। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব। তত্ত্বের দিক থেকে ব্ল্যাক হোল জন্মসূত্রে বাঁধা আছে আলবার্ট আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত জেনারেল রিলেটিভিটির সঙ্গে। তবু কী আশ্চর্য, ব্ল্যাক হোল যে আছে, তা মানতে চাননি স্বয়ং আইনস্টাইন। আগেই বলেছি, এর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে একদা পেপারও লিখেছিলেন তিনি। আর আজ? সেই জেনারেল রিলেটিভিটি ঠিক না ভুল, তা প্রমাণ করতে পারে ব্ল্যাক হোল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডে দুই নিয়ম বিরাজমান। প্রকাণ্ড বস্তুরা মেনে চলে জেনারেল রিলেটিভিটি। আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণারা মেনে চলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। দুই নিয়ম যেন তেল আর জল। একসঙ্গে মেশে না। ব্রহ্মাণ্ডে এই দুই নিয়ম কেন? কেন সাইজ় ভেদে নিয়ম আলাদা? এক ব্রহ্মাণ্ডে একটা নিয়ম চালু থাকলে ভাল হত। ব্ল্যাক হোল এমনই এক বস্তু, যাকে টিকে থাকার জন্য জেনারেল রিলেটিভিটি এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্স এই দুই নিয়মের ওপর নির্ভর করতে হয়। ব্ল্যাক হোল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট, সুতরাং, বিজ্ঞানীদের বলে দিতে পারে ওই তেলে আর জলে মিল কোথায়। ব্ল্যাক হোলের সীমানা ব্যাপারটা অদ্ভুত। ব্ল্যাক হোল রাক্ষস। তার অভিকর্ষের টান প্রচণ্ড। সে যা পায়, তাই গিলে খায়। কতদূর পর্যন্ত তার এই আকর্ষণ বিস্তৃত? একটা ব্ল্যাক হোল তো ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যা আছে, তা গিলে খেতে পারে না। অভিকর্ষের ব্যাপার যখন, তখন তা নিশ্চয়ই অসীম দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। বিস্তৃত একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত। তার মধ্যে যা কিছু, তা গিলে ফেলে ব্ল্যাক হোল। তার বাইরে যা, তা ব্ল্যাক হোলের টান অনুভব করলেও, তার পেটে গিয়ে পড়বে না। এখন, যে ব্ল্যাক হোল বেশি ভারী, অভিকর্ষের নিয়মে তার থাবাও বেশিদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা ওই চৌহদ্দি বা সীমানা। যার মধ্যে কোনও কিছুই— এমনকী আলোও— আর বাইরে বেরোতে পারে না। ব্ল্যাক হোলের ওই সীমানার নাম ইভেন্ট হরাইজ়ন। ঘটনা দিকচক্রবাল। ওই নামের তাৎপর্য আছে। ইভেন্ট হরাইজ়ন-এর ভেতরে কী ঘটছে, সে খবর বাইরে আসে না। আসবে কী করে? ইভেন্ট হরাইজ়নের ভেতর থেকে কোনও সংকেত তো বাইরে বেরোতে পারে না। ঘটনার খবর নেই, তাই নাম ঘটনা দিকচক্রবাল। এটা কোনও বস্তুতে তৈরি দেওয়াল নয়, স্রেফ একটা সীমানা। এখন প্রশ্ন হল, ব্ল্যাক হোলের কি ইভেন্ট হরাইজ়ন সত্যিই আছে? ইভেন্ট হরাইজ়নের মতো ব্ল্যাক হোলের আর-এক উপাদান হল সিংগুলারিটি। ব্ল্যাক হোলের কেন্দ্রে একটা বিন্দু। যাতে ঠাঁই পেয়েছে ব্ল্যাক হোল যা গিলেছে সবকিছু। ফলে ওই বিন্দুর ঘনত্ব অসীম। বাস্তব কোনও দেওয়াল না-হলেও ইভেন্ট হরাইজ়ন একটা আবরণের মতো ঢেকে রাখে সিংগুলারিটিকে। ইভেন্ট হরাইজ়ন না-থাকলে সিংগুলারিটি উলঙ্গ। তখন তাকে বলে নেকেড সিংগুলারিটি। ইভেন্ট হরাইজ়ন বিনে নেকেড সিংগুলারিটি কি বাস্তবে আছে? এত সব প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে তাত্ত্বিক গণনা দিয়ে কাজ হবে না। চাই ব্ল্যাক হোল নিয়ে সরাসরি পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ। এসজিআর এ-স্টার এবং এম ৮৭ যখন দুই সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল, তখন তাদের নিয়ে পরীক্ষা করলে কেমন হয়?

জেনারেল রিলেটিভিটি অনুযায়ী, ওই দুই ব্ল্যাক হোল ছবিতে বিশেষ আকার নেবে। ওদের ছবি তুললে কেমন হয়? ছবিতে ধরা পড়বে একটা বিচিত্র জিনিস। এসজিআর এ-স্টার এবং আরও বড় এম ৮৭-স্টার— দুই ব্ল্যাক হোল ঘিরেই রয়েছে উত্তপ্ত প্লাজ়মা। তড়িৎ-যুক্ত কণার পুঞ্জ। প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে। ব্ল্যাক হোলের প্রচণ্ড আকর্ষণের ফলে যেসব নক্ষত্র গিয়ে পড়েনি ওদের মধ্যে, কিন্তু ইভেন্ট হরাইজ়নের বাইরে থেকেও অনুভব করেছে টান, আর তার ফলে হয়েছে ছিন্নভিন্ন, তাদের ভগ্নাবশেষ ওই কণাপুঞ্জ। ঘূর্ণায়মান ওই কণাপুঞ্জের নাম অ্যাক্রিশন ডিস্ক। নামের মধ্যে অ্যাক্রিশন, কারণ, ওই পুঞ্জের ভেতরের দিকটা ঘুরতে ঘুরতে ব্ল্যাক হোলের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। আর ডিস্ক শব্দটা ওই পুঞ্জের আকার থালার মতো (শনিগ্রহের বলয়ের মতো) বলে। অ্যাক্রিশন ডিস্ক-এর ওপর-নীচ দিয়ে থালার সঙ্গে লম্বাভাবে ছোটে জেট— কণার স্রোত।

জার্মানির বন শহরে ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর রেডিও অ্যাস্ট্রোনমির বিজ্ঞানী হাইনো ফালকে বললেন, ভিএলবিআই কৌশলে এসজিআর এ-স্টার এবং এম ৮৭-স্টার ব্ল্যাক হোল দুটোর ছবি তোলা যাবে। সে ছবি কেমন দেখাবে? তাও বলে দিলেন ফালকে। বললেন, পৃথিবী থেকে দেখলে শনি গ্রহের বলয় কিছুটা দৃশ্যমান, কিছুটা অদৃশ্য। অদৃশ্য অংশটা ঢাকা পড়ে থাকে শনি গ্রহের পেছনে। ওরকম ব্যাপার ঘটবে না এস জি আর এ-স্টার বা এম ৮৭-স্টার-এর দিকে তাকালে। ওদের অ্যাক্রিশন ডিস্ক পুরোটা দেখা যাবে। ব্ল্যাক হোলের সামনের দিকটা তো বটেই, পেছনের দিকটাও। যেন ম্যাজিক! কীভাবে দেখা যাবে পেছনের দিকের অ্যাক্রিশন ডিস্ক? জেনারেল রিলেটিভিটির কারণে। ওই তত্ত্ব অনুযায়ী, যে বস্তু যত ভারী, সে তার চারপাশের স্পেসটাইমকে তত বেশি দুমড়ে-মুচড়ে দেয়। ব্ল্যাক হোল দুটো যেহেতু প্রচণ্ড ভারী, তাই তারা তাদের চারপাশের স্পেসটাইমকে এতটাই দুমড়ে-মুচড়ে দেবে যে, তাদের আর সামনে-পেছনে বলে কিছু থাকবে না। প্রচণ্ড বাঁকা পথে চলতে গিয়ে আলো ঘুরবে ব্ল্যাক হোলের চারদিকে। পেছনের দিকের বাঁকাচোরা ছবি দেখা যাবে অনেকগুলো। যেন মনে হবে অ্যাক্রিশন ডিস্ক জ্যোতির মতো ঘিরে রেখেছে ব্ল্যাক হোলকে। অবশ্য, এ জ্যোতি তেমন নয়, যেমন দেখা যায় রেনেসাঁ পেন্টিং-এ মহাপুরুষদের মুণ্ডু ঘিরে। যেহেতু অ্যাক্রিশন ডিস্কের ভেতরের দিকে কণা বাইরের কণার চেয়ে বেশি বেগে ঘুরছে, তাই দর্শকের সামনের কণারা পেছনের কণার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল দেখাবে। সবটা মিলে যেন অষ্টমী বা নবমীর চাঁদ। ব্ল্যাক হোলের এই ব্যাপারগুলো ঠিক ঠিক দেখানো হয়েছে হলিউডের ফিল্ম 'ইন্টারস্টেলার'-এ। ২০১৪ সালের ওই সুপারহিট চলচ্চিত্রে পরিচালক ক্রিস্টোফার নোলান দেখিয়েছেন ব্ল্যাক হোল। দেখাতে গিয়ে পাছে কোনও ভুল করে না-ফেলেন, সে জন্য তিনি ফিল্মের বিজ্ঞান-উপদেষ্টা করেছিলেন ব্ল্যাক হোল বিশেষজ্ঞ ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক কিপ থর্নকে। সেই থর্ন, যিনি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ় পেয়েছেন ২০১৭ সালে।

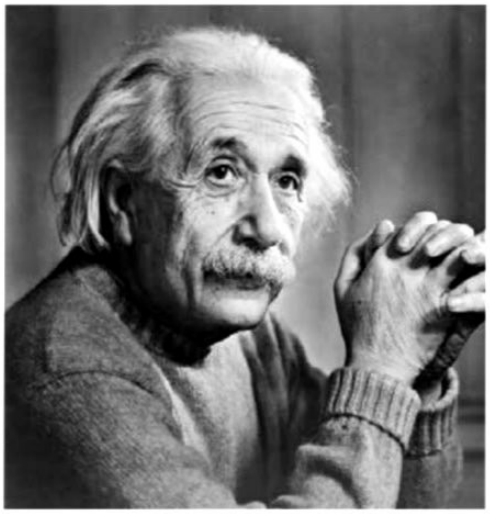
সেটা ২০০৪ সাল। ফালকে (তখন চলে এসেছেন হল্যান্ডের নিজমেগেন শহরে র‍্যাডবাড বিশ্ববিদ্যালয়ে) ভিএলবিআই কৌশল কাজে লাগিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন এসজিআর এ-স্টার। এ জন্য তিনি কাজে লাগান আমেরিকার মধ্যেকার কয়েকটা অবজ়ারভেটরি। যাদের বেসলাইন বা মোট দূরত্ব ২,০০০ কিলোমিটার। পর্যবেক্ষণ থেকে যে ছবি তৈরি করেন ফালকে, তা নেহাতই অস্পষ্ট। যেন ঘষা কাচে ব্ল্যাক হোল দেখা। এরপর ২০০৭ সালে শেপ ডোয়েলেম্যান এবং তাঁর সহযোগীরা তিন মানমন্দিরব্যাপী ভিএলবিআই ব্যবহার করে এস জি আর এ-স্টার এবং এম ৮৭-স্টার ব্ল্যাক হোল দুটোর ইভেন্ট হরাইজ়ন শনাক্ত করার চেষ্টা করেন। দুটো ইভেন্ট হরাইজ়নের ছবি ওঁরা তুলতে পারেননি। তবে দুটো ইভেন্ট হরাইজ়ন কত বড় মাপের হতে পারে, তা টের পান ওঁরা।

ততদিনে হেইনো ফালকে, শেপ ডোয়েলেম্যান এবং আরও কয়েকজন ব্ল্যাক হোল গবেষক বুঝে গেলেন একটা ব্যাপার। এসজিআর এ-স্টার এবং ৮৭-স্টারের মতো মাপের ব্ল্যাক হোলের ছবি তুলতে হলে ভিএলবিআই-তে শামিল করতে হবে অনেক বেশি অবজ়ারভেটরিকে। তৈরি করতে হবে এক প্রকল্প। যার নাম হবে ইভেন্ট হরাইজ়ন টেলিস্কোপ (ইএইচটি)। প্রকল্পের প্রাথমিক খরচ দু'কোটি ডলার। নতুন করে রেডিও টেলিস্কোপ বানাতে নয়, চালু টেলিস্কোপগুলোতেই প্রকল্প অনুযায়ী কাজ চালাতে। প্রকল্প তৈরির প্রজেক্ট রিপোর্ট লিখলেন শেপ ডোয়েলেম্যান। এবার অর্থের জন্য দরজায় দরজায় ধরনা। সেটা ২০০৮ সাল। চারদিকে অর্থনৈতিক মন্দা। গবেষণার জন্য ডলার মেলা দুষ্কর। তারপর আবার প্রজেক্ট রিপোর্টে ভিএলবিআই সম্পর্কে লেখা হয়েছে, ওই বিশেষ কথা। এই যে, ইএইচটি-তে শামিল হবে কমপক্ষে সাতটি রেডিও টেলিস্কোপ। শুধু তাই নয়, ওই সাতটি টেলিস্কোপকে কাজ করতে হবে একসঙ্গে এক সময়ে। পৃথিবীর চার মহাদেশে ছড়িয়ে-থাকা সাত রেডিও টেলিস্কোপের প্রত্যেকটিতে পর পর

কয়েক রাতে আকাশ পরিষ্কার থাকবে তো? সাফল্য পেতে এমন চান্স ফ্যাক্টর জড়িয়ে থাকলে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় কঠিন হয়ে পড়ে।

সালটা ২০০৯, সেই কঠিন বাধা পেরোলেন ডোয়েলম্যান, ফালকে এবং আরও কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী। অর্থ এল আমেরিকার ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন (এনএসএফ), ইউরোপিয়ান রিসার্চ কাউন্সিল (ইআরসি) এবং পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন সংস্থা থেকে। ডোয়েলেম্যান এবং ফালকে-র সঙ্গে যোগ দিলেন ফালভিও মেলিয়া (অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়), এরিক আগল (জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়), জনাথন ওয়েন্ট্রাব (হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স), অ্যাভেরি ব্রডেরিক (হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স), আব্রাহাম লোয়ের (টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা), মাইকেল ক্র্যামার (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর রেডিও অস্ট্রোনমি, জার্মানি), পল টি পি হো (ইস্ট এশিয়ান অবজ়ারভেটরি, জাপান), রজ়ার ব্ল্যান্ডফোর্ড (স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়), ফেরায়াল ওজ়েল (অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়), সেরা মারকফ (আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়), জেসিকা ডেম্পসি (ইস্ট এশিয়ান অবজ়ারভেটরি, জাপান ফ্রেডরিখ গেথ (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ, ফ্রান্স), মাইকেল ব্রেমার (ইনস্টিটিউট ফর মিলিমেট্রিক রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি, স্পেন এবং পাবলো টর্ন (ইনস্টিটিউট ফর মিলিমেট্রিক রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি, স্পেন)।

গড়ে তোলা হল ইভেন্ট হরাইজ়ন টেলিস্কোপ, ২০১৪ সালে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়ানো ১০ অবজ়ারভেটরির সমাহার। সাব-মিলিমিটার অ্যারে (হাওয়াই), জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল টেলিস্কোপ (হাওয়াই), কমবাইন্ড অ্যারে ফর রিসার্চ ইন মিলিমিটার-ওয়েভ অ্যাস্ট্রোনমি (ক্যালিফোর্নিয়া), সাব-মিলিমিটার টেলিস্কোপ (অ্যারিজ়োনা), লার্জ মিলিমিটার টেলিস্কোপ (মেক্সিকো), আটাকামা পাথফাইন্ডার এক্সপেরিমেন্ট (চিলি), আটাকামা লার্জ মিলিমিটার অ্যারে (চিলি), সাউথ পোল টেলিস্কোপ (কুমেরু), প্লেতু দে বুর ইন্তাফেরোমিতার (ফ্রান্স) এবং মিলিমেট্রিক রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি (স্পেন)। খোলা আকাশ পাওয়ার আশায়, সবক'টা মানমন্দিরই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত। কোনওটা ২,৫০০ মিটার উঁচুতে তো কোনওটা প্রায় ৬,০০০ মিটার উঁচুতে। শুধু অবজ়ারভেটরি নয়, পৃথিবীজুড়ে বহু শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানও এই মহাউদ্যোগে শামিল। ওরকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬০। যা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর ২০টা দেশে। আর, ইএইচটি প্রকল্পে যুক্ত হয়ে কাজ করেছেন ২০০ বিজ্ঞানী।


আইনস্টাইন

ওই দশটার মধ্যে ন'টা অবজ়ারভেটরি কাজ করেছে ইএইচটি প্রকল্পে। ওদের ডিশ অ্যান্টেনাগুলোকে বিজ্ঞানী মাইকেল ব্রেমার বর্ণনা করেছেন প্রকাণ্ড একটা আয়নার ভাঙা টুকরো হিসেবে। টুকরোগুলো যেন কাজ করেছে একটা গোটা আয়না হিসেবে। যেহেতু মানমন্দিরগুলোর মোট দূরত্ব ১২,০০০ কিলোমিটার (প্রায় পৃথিবীর ব্যাসের সমান), ভিএলবিআই কৌশলে ওই ন'টা অবজ়ারভেটরি মিলে হয়ে দাঁড়াল যেন পৃথিবীর সাইজ়ের একটা টেলিস্কোপ। এহেন টেলিস্কোপে ২০১৭ সালের ৫ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল এই দশ রাতে দেখা হল এম ৮৭-স্টার ব্যাক হোল। প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে। হ্যাঁ, পর পর দশ'টা রাতে আকাশ থাকল পরিষ্কার ওই ন'টা মানমন্দিরে। যন্ত্র 'দেখল' অত দূরের একটা ব্ল্যাক হোল। দূর থেকে দেখা কীরকম? একজন বিজ্ঞানী দুটো উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন ব্যাপারটা। কেমন সে দেখা? পৃথিবী থেকে চাঁদের বুকে একটা কমলালেবু দেখার মতন। অথবা, প্যারিসের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে নিউ ইয়র্কের বুক স্টলে ম্যাগাজ়িন পড়ার মতন। কী দেখা হল? নানা জায়গার রেডিও টেলিস্কোপে শনাক্ত হল এম ৮৭-স্টার ব্ল্যাক হোলের চারপাশে ঘিরে-থাকা অ্যাক্রিশন ডিস্ক থেকে নির্গত নানারকম বেতার তরঙ্গ। হার্ড ডিস্কে জমা হল তথ্য। এবার তা বিশ্লেষণ। করা হবে দুই কেন্দ্রে। হেস্ট্যাক অবজ়ারভেটরি এবং জ়ার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট অফ রেডিও অ্যাস্ট্রোনমিতে। বিশ্লেষণের জন্য ওই দুই জায়গায় হার্ড ডিস্কগুলো আনতে হবে। সে কাজ পিছিয়ে গেল মাসের পর মাস। দক্ষিণ মেরু বরফ-ঢাকা। যানবাহন চলাচল বন্ধ। মাসের পর মাস। ওখানকার অবজ়ারভেটরিতে তথ্যভর্তি হার্ড ডিস্ক পড়ে রইল। অনেকদিন। আনা হল বরফ কিছুটা গলার পর। হার্ড ডিস্কে জমানো তথ্যের পরিমাণ? চার পেটাবাইট। কখন কোথায় কোন তথ্য বা বেতার তরঙ্গ শনাক্ত হয়েছে, সেসব অ্যাটমিক ঘড়ির সময় অনুযায়ী রেকর্ড করা। মানে, যে ঘড়িতে এক সেকেন্ডের কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ হেরফেরও ধরা যায়। সময় অনুযায়ী বিভিন্ন টেলিস্কোপে সংগৃহীত তথ্য একত্রিত করতে না-পারলে চলবে না। পৃথিবী ঘুরছে। সেকেন্ডে সেকেন্ডে এক-এক জায়গা সরে সরে যাচ্ছে। একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তের সব তরঙ্গ এক জায়গায় জড়ো না করলে ভিএলবিআই-এর সুবিধে কাজে লাগবে না। বিশ্লেষণযোগ্য তথ্য পাহাড়-প্রমাণ। কতটা? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী। বলেছেন, সব তথ্য যদি গানবাজনা হিসেবে এম পি-থ্রি রেকর্ড হত, তবে তা শুনতে ৮,০০০ বছর লাগত।

বিশ্লেষণ করা হল তথ্য। গড়ে উঠল এম ৮৭-স্টার ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হরাইজ়ন-এর ছবি। কাল ব্যাকড্রপে এক অগ্নিবলয়। বলয়ের ভেতরে ভেতরে একটা কাল বৃত্ত। ওটাই ব্ল্যাক হোল। বৃত্তের সীমানা বা পরিধি হল ইভেন্ট হরাইজ়ন। অগ্নিবলয় ব্ল্যাক হোলটির অ্যাক্রিশন ডিস্ক। তার আকৃতি একেবারে আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটি মেনে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এম ৮৭-স্টারের সঙ্গে এসজিআর এ-স্টার ব্ল্যাক হোলও শনাক্ত করেছে ইভেন্ট হরাইজ়ন টেলিস্কোপ। যেহেতু ওই ব্ল্যাক হোল তুলনায় অনেক ছোট, তাই তার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ অনেক কঠিন কাজ। ১০ এপ্রিল আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সের আগে তা শেষ হয়নি। তাই সেদিন বিজ্ঞানীরা তার ছবি পেশ করেননি। জানিয়েছেন, তা পরে করা হবে।

ওয়াশিংটনের প্রেস কনফারেন্সে আমেরিকার ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন, যে সংস্থা ইএইচটি প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি আর্থিক সাহায্য (২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার) দিয়েছে, তার ডিরেক্টর ফ্রান্স করডোভা বললেন, 'আজ এক স্মরণীয় দিন।' ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে দেওয়ালজোড়া এম ৮৭-স্টার ব্ল্যাক হোলের ছবির দিকে তাঁর মন্তব্য: 'যাকে দেখা যায় না, তাকে দেখছি আমরা। ব্ল্যাক হোল আমাদের কল্পনা উসকে দিয়েছে দশকের পর দশক। অদ্ভুতুড়ে চরিত্র বলে ওরা আমাদের কাছে চিরকাল রহস্যময়। তবে, এরকম অনুসন্ধানের পর ওদের রহস্য ফাঁস হবে।' একই কথা বললেন, ইএইচটি প্রকল্পের নেতা শেপার্ড ডোয়েলেম্যান। বললেন, 'যাকে দেখা যাবে না বলে এতদিন ভেবেছিলাম, তা দেখলাম। ২০০ বিজ্ঞানীর পরিশ্রমের ফসল ফলল।' অ্যাভেরি ব্রডেরিক মন্তব্য করলেন, 'সায়েন্স ফিকশন হ্যাজ় বিকাম সায়েন্স ফ্যাক্ট।' হেইনো ফালকে বললেন, 'স্পেস এবং টাইম-এর প্রান্তসীমায় আমরা নরকের দ্বার দেখতে পেলাম।' সবচেয়ে ভাল বললেন রজ়ার ব্ল্যান্ডফোর্ড। তাঁর মন্তব্য: 'যখন ছাত্র ছিলাম, তখন কোনওদিন ভাবিনি এটা সম্ভব হবে। আরও একবার প্রমাণিত হল প্রচণ্ড গ্র্যাভিটি ব্যাখ্যা করতে আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটিই সেরা তত্ত্ব।' এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার বিস্ময় জাগে না একটা মানুষ ১০০ বছর আগে বসেও এত সব কী করে ভেবেছিলেন!' 'হ্যাঁ, জাগে বৈকি', জবাব দিলেন ব্ল্যান্ডফোর্ড।

হ্যাঁ, আইনস্টাইন। ঠিক ১০০ বছর আগে ১৯১৯ সালের ২৯ মে পূর্ণগ্রহণের দিন পরীক্ষা হয়েছিল তাঁর জেনারেল রিলেটিভিটির। তিনি, না নিউটন— কে ব্যাখ্যা করতে পারেন গ্র্যাভিটির স্বরূপ। সেদিন দেখা গিয়েছিল, পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ জেনারেল রিলেটিভিটি। সেই তত্ত্বের উপহার ব্ল্যাক হোল। তার ছবি তোলার সাফল্য ঘোষণা ঠিক তার শতবর্ষে। এ এক আশ্চর্য সমাপতন।



উত্তরপুরুষ

শীর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

রোগাভোগা চেহারার লোকটা যখন হাতজোড় করে সামনে এসে দাঁড়াল, তখন বাইরের ঘরে বসে লিখছিলেন শ্যামাচরণ। বড্ড বেয়াড়া রকমের গরম আজকে। সকাল থেকে একেবারে হাঁসফাঁস দশা। কিন্তু উপায় নেই। যে করেই হোক লেখাটা আজ জমা দিতে হবে। লেখার বরাত পেয়েছিলেন এক হপ্তা আগেই। কিন্তু গোবিন্দ নস্করের নাতনির মুখেভাতের অনুষ্ঠানটাও পড়ল ঠিক এই সময়েই। তার বাজার করা থেকে শুরু করে ঠাকুর-চাকর খাটানো, ভিয়েন বসানো, ভাঁড়ার পাহারা, সব কাজ একা হাতে শ্যামাচরণকেই সামলাতে হল! ফলে লেখার ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছিলেন।

আসলে শ্যামাচরণ পেশাদার কলমচি নন যে, লেখালেখির মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকবেন। তিনি হলেন জাত-জোগাড়ে। যখন যার যা দরকার, স্রেফ একবার শ্যামা বলে হাঁক পাড়লেই হল। দাঁড়িয়ে থেকে মিস্তিরি খাটানোয় শ্যামাচরণের বিশেষ সুখ্যাতি। এ ছাড়া মুখেভাত, পইতে, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, যে-কোনও অনুষ্ঠানে বাজারহাট থেকে পাত পেড়ে লোক খাওয়ানো—সব বিষয়েই এলাকার বড় ভরসা শ্যামাচরণ। তিনিই ঠিক লোকজন জোগাড় করে এনে কাজ উতরে দেন।

তাঁর লেখার ব্যাপারটাও কতকটা তেমনই। অর্ডার পেলে লিখতে পারেন পাতার পর পাতা। তাঁর আড়াই কামরার বাসাবাড়ির বাইরের ঘরের তিনটে দেওয়ালে, মেঝে থেকে সিলিং অবধি লোহার ফ্রেম করে বইয়ের তাক বানানো। তাতে ঠাসা বই, পত্র-পত্রিকা, পুরনো কাগজের কাটিং। সপ্তাহে অন্তত একটা দিন শহরে, পুরনো বইয়ের বাজারে কেটে যায়—সস্তা, অথচ কখনও কাজে লাগতে পারে, এরকম বইয়ের খোঁজে। আগ্রহজনক কোনও লেখা কাগজে দেখলে পরদিনই সেটি কেটে প্যাকেটে ভরে ফেলেন। এরকম অন্তত শ'দেড়েক প্যাকেট আছে তাঁর সংগ্রহে। কোনওটার বিষয় 'নকশাল আন্দোলন', তো কোনওটা 'সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ'। একটা পেটমোটা খামের ওপর লেখা 'বাঙালির ভোজনবিলাস'। তার চেয়েও মোটা একটা খামে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। এগুলোই শ্যামাচরণের

পুঁজি। এই তাঁর ন্যাশনাল লাইব্রেরি, এই-ই তাঁর উইকিপিডিয়া আর গুগল। এই কাগজপত্র হাতড়েই যে-কোনও আনকা বিষয়ে, যখন-তখন, দশ-বিশ পাতা লিখে ফেলতে পারেন। ফলে তিনি এই জেলার মাসিকপত্রের সম্পাদকদের খুবই প্রিয়পাত্র। প্রজাতন্ত্র, বা স্বাধীনতা দিবস, রবীন্দ্র, কিংবা গাঁধী জয়ন্তীতে এলাকার নেতাদের ভাষণও লিখে দেন। ইদানীং ফেসবুকে অন্যের হয়ে লম্বা লম্বা পোস্ট লেখার বরাত পাচ্ছেন। তাতেও রোজগার মন্দ হয় না।

কাজেই হঠাৎ একটা উটকো লোক একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে শ্যামাচরণ নিতান্তই বিরক্ত হলেন। যদিও তাঁর একতলা বাড়ি রাস্তার ধারেই, কারও ঢুকে আসাটা কোনও ব্যাপারই নয়। আসেও লোকে। সস্তার গুঁড়ো-সাবান থেকে জলের ফিল্টার, চিনে মোবাইল ফোন থেকে জীবনবিমা, হামেশাই ঢুকে পড়ছে। শ্যামাচরণ তখন ব্যস্ত থাকার ভান করেন। হুমড়ি খেয়ে পড়েন সামনে খোলা বই, বা লেখার কাগজে। তারা খানিক ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে ফিরে যায়।

কিন্তু এই লোকটা বিরক্তিকর। কিছুই বলছে না। হাত চারেক দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামাচরণ আড়চোখে একবার তাকালেন। ভালমানুষ চেহারার লোকটার ভাবলেশহীন মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই, ব্যাটার মতলব কী!

গলাটা অনাবশ্যক গম্ভীর করে, লেখার কাগজ থেকে মুখ না তুলে শ্যামাচরণ বললেন, "কী চাই?"

"আজ্ঞে, একটা দরকার ছিল। বিষয়টা জরুরি। তবে আমার কোনও তাড়া নেই। আপনি হাতের কাজটা সেরে নিন, তারপর না হয় কথা বলা যাবে'খন।"

গলার স্বরটি মিহি, তায় বিনয়ে মাখামাখি। আরও বিরক্ত হলেন শ্যামাচরণ। এমন ধরনের লোককে ঝেড়ে ফেলা সহজ হয় না। আর একে মুখের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে, নিজের কাজে মন বসানোও অসম্ভব। কলমের ঢাকনা আটকে, কাগজের ওপর একটা বই চাপা দিয়ে, সশব্দে চেয়ারটা ঘুরিয়ে, লোকটার দিকে ফিরে বসলেন শ্যামাচরণ। "না হে, এভাবে আমি কাজ করতে পারি না। বরং তোমার দরকারটাই আগে শুনি। বলো, কী বলার আছে বলো।"

লোকটা একবার গলাখাঁকারি দিল। তারপর বলল, "আজ্ঞে, কয়েকটা খুব বড় ভুল হয়ে যাচ্ছে। সেগুলো যদি এক্ষুনি শুধরে নেওয়া না যায়, তা হলে অনর্থ হবে। আপনার সাহায্য ছাড়া সেই কাজটা হবে না।"

লোকটার সাদামাটা কথাটার মধ্যে কোথাও একটা খটকা ছিল। কিন্তু শ্যামাচরণ সেটা খেয়াল করলেন না। তাঁকে কেউ এতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, বাগান পরিষ্কার বা সত্যনারায়ণ পুজোর বাজারের বাইরে কোনও একটা বড় কাজের জন্য তাঁর ডাক পড়ছে, এতেই খুব খুশি হয়ে গেলেন। চেয়ারের ওপর পা তুলে আয়েশ করে বসে বললেন, "বেশ বেশ। নিশ্চয়ই সাহায্য করব। আমার সাধ্যের মধ্যে থাকলে অবশ্যই করব।"

শুনে লোকটা আরও বিগলিত হয়ে বলল, "আজ্ঞে, কাজটা আপনার আয়ত্তের মধ্যেই। মানে, আপনার খুবই নামযশ তাতে। আপনিই পারবেন।"

সামান্য সতর্ক হলেন শ্যামাচরণ। মাস ছয়েক আগে এরকমই মিষ্টি কথার পুলটিস মেরে পালবাড়ির গিন্নি তাঁকে দিয়ে কুয়ো থেকে পেতলের বালতি তুলিয়েছিলেন। লোকটাকে সতর্ক চোখে জরিপ করতে করতে শ্যামাচরণ বললেন, "গতরে খাটার কাজ বললে কিন্তু এই বয়সে আর পারব না।"

লোকটা লম্বা জিভ কেটে বলল, "ছি ছি, গতরখাটার কাজ কেন হবে! আপনি একজন মানী লোক, আপনাকে কি সেরকম কাজ দেওয়া যায়! এ একেবারে আপনার মনোমতো কাজ।"

তবু সন্দেহ যায় না শ্যামাচরণের। গলাটা যতদূর সম্ভব নিস্পৃহ রেখে বললেন, "কেমন কাজ, শুনি!"

"আজ্ঞে মাথার কাজ। পড়াশোনা, লেখালেখি, এইসব। যা নিয়ে আপনি দিনভর থাকেন।"

শ্যামাচরণ বাক্যিহারা। এ যেন দেশের সরকার বাড়ি বয়ে এসে তাঁকে পদ্মশ্রী, বা আরও ভারী কোনও পুরস্কার দিয়ে যাচ্ছে। ভাবা যায়! উত্তেজনায় শ্যামাচরণ চেয়ার ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর-একটু হলে হাতের ধাক্কা লেগে টেবিলে রাখা জলের গেলাসটা উলটে যাচ্ছিল। তা হলেই হয়েছিল আর কী! সকাল থেকে বসে তৈরি করা লেখাটা ভেসে যেত একেবারে!

লোকটা গদগদ মুখে তাকিয়ে আছে। এখনও হাতজোড়। হঠাৎ নিজেকে একটা কেউকেটা মনে হল শ্যামাচরণের। জেলায় তো আরও কত লেখক, কবি আছে। অন্তত এক গন্ডা পণ্ডিত আছে, যারা নানা বিষয়ে টিভিতে মতামত দেয়। সবাইকে ছেড়ে এই লোকটা তাঁর কাছেই তো এসেছে!

শুরুতেই 'তুমি' বলে বসেছেন, কিন্তু এখন একটু অস্বস্তি হচ্ছে। সেটা কাটিয়ে উঠতে টেবিলে রাখা ফ্লাস্কটা টেনে নিতে নিতে বললেন, "কথা শুরু করার আগে একটু চা হয়ে যাক? চা চলবে তো?"

লোকটা আহ্লাদিত মুখে বলল, "হ্যাঁ, খুব চলবে। খাইনি কোনওদিন, তবে চায়ের কথা খুব শুনেছি।"

ফ্লাস্কের সঙ্গে একটাই চিনেমাটির কাপ রাখা থাকে। চা ঢেলে সেটাই লোকটাকে দিলেন শ্যামাচরণ। অতিথি বলে কথা! নিজে নিলেন ফ্লাস্কের ঢাকনায়। লম্বা একটা চুমুক দিয়ে ভারিক্কি ভঙ্গিতে বললেন, "কেন, যেখানে থাকা হয়, সেখানে চা পাওয়া যায় না?"

লোকটা একচুমুকে কাপের চা-টা শেষ করে, হাতের উলটো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে বলল, "আজ্ঞে, চা গাছ তো হয় পাহাড়ে, ঠান্ডায়। কিন্তু এখন পাহাড়ে নাকি ঠান্ডাই পড়ে না মোটে। সমতলেও সব খটখটে শুকনো। বৃষ্টি দূরের কথা, বাতাসে ছিটেফোঁটা জলও থাকে না। খুব অনাসৃষ্টি একেবারে।"

শ্যামাচরণ অবাক হলেন। ঠান্ডা পড়ে না! বৃষ্টি হয় না! ভূভারতে এমন জায়গা কোথায়? নাকি কোনও মরুভূমি-টুমি থেকে এল লোকটা!

তাঁকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লোকটা ফ্যাকাসে হেসে বলে, "চাষবাস আজকাল প্রায় বন্ধ। কোনওমতে কষ্টেসৃষ্টে এখনও একটু ধান হয়। কিন্তু বড়লোকেরা সব কেড়ে খেয়ে নেয়। তাতেও তাদের পেট ভরে না। তাই আমরা যা খাই— শাকপাতা, কচুঘেঁচু— সেদিকেও হাত বাড়ায়। গরিবের সবসময়ই কষ্ট, বুঝলেন না!"

শ্যামাচরণ শুনতে শুনতে স্থির হয়ে গেছেন। এ নির্ঘাত পাগল। তিনিই বুঝতে পারেননি। কী সব বলছে! বড়লোকরা ধান কেড়ে খেয়ে নেয়! সে অবশ্য নতুন কথা নয়। বড়লোকরা চিরকালই কেড়ে খায়। কিন্তু তারা কচুঘেঁচুও খেয়ে নিচ্ছে। কী সাংঘাতিক! অতি কষ্টে একচিলতে হাসেন শ্যামাচরণ। বলেন, "তা হলে তো দু'বেলা জল খেয়ে পেট ভরানো ছাড়া গতি নেই।"

লোকটা করুণ হাসে, "তারও জো নেই স্যার। জল এখন এমনি পাওয়া যায় না। কারখানায় তৈরি জল কিনে খেতে হয়। অনেক দাম এক শিশি জলের। গরিবদের সে সামর্থ্য কোথায়!"

শ্যামাচরণ এদিক-ওদিক তাকান। এই পাগলের হাত এড়াবেন কী করে, বুঝে উঠতে পারছেন না। ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলে হয়! কিন্তু পাগলদের গায়ে নাকি অমানুষিক শক্তি থাকে! খেপে গেলে কামড়েও দিতে পারে!

হাফ-হাতা সুতির ফতুয়া আর ঢোলা পাজামার নীচে দরদর করে ঘামছেন শ্যামাচরণ, কিন্তু বাইরে একটা নির্বিকার ভাব ধরে রেখেছেন। তিনি যে ভয় পেয়েছেন, বুঝতে দিলে চলবে না। এখন মাথা ঠান্ডা রাখার সময়। ফ্লাস্কটা নিয়ে ঢাকনায় কিছুটা চা ঢাললেন। ছোট একটা চুমুক দিয়ে বললেন, "ইয়ে, নামটাই তো জানা হল না হে।"

লোকটি কৃতার্থ ভঙ্গিতে বলল, "আজ্ঞে, আমার নাম অবিনাশ।"

গলায় ছদ্ম খুশি ফুটিয়ে শ্যামাচরণ বললেন, "অবিনাশ। যার বিনাশ নেই। বাহ্, খাসা নাম। তা থাকা হয় কোথায়?"

অবিনাশ খচখচ করে মাথা চুলকিয়ে বলল, "জায়গার নাম বললে চিনতে পারবেন

না। আমি আসছি ২১৬৯ থেকে।"

অবাক হলেন শ্যামাচরণ, "বাপ রে, কোন পাড়া গো? এত লম্বা রাস্তা! দু'হাজার একশো উনসত্তর নম্বর বাড়ি!"

"আজ্ঞে, বাড়ির নম্বর নয়। ২১৬৯ সাল। দেড়শো বছর পরের সময় থেকে আসছি আমি।"

চায়ে শেষ চুমুকটা মারতে যাচ্ছিলেন শ্যামাচরণ। শুনেই বেমক্কা বিষম খেলেন। মুখের চা নাক দিয়ে ছিটকে বেরোল। ধাক্কাটা লাগল একেবারে টাকরায়। শ্যামাচরণ চোখে অন্ধকার দেখলেন। কোনওমতে টেবিলের কানা ধরে ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারে। বই আর কাগজপত্রে ঠাসা ঘরটা তাঁকে ঘিরে এখন বাঁই বাঁই করে ঘুরছে!

॥ ২ ॥

হাভাতের মতো খাচ্ছে অবিনাশ। শ্যামাচরণ, তাঁর গিন্নি এবং মেয়ে— তিনজনের জন্য যা ভাত রাঁধা হয়েছিল, পুরোটা খেয়ে নিয়েছে। উচ্ছে দিয়ে তেতোর ডাল হয়েছিল, সাবড়ে খেয়েছে। কলমিশাক ভাজা এক গ্রাসে শেষ। মাঝারি মাপের পুঁটিমাছ পেয়েছিলেন বাজারে। পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে গরগরে করে রসা বানিয়েছিলেন গিন্নি, সেও সাবাড়। সংসারের পুরো রান্না একাই খেয়ে ফেলার জন্য গিন্নি রেগে যাবেন কী, হাঁ করে দেখছেন চুনোমাছের টকের শেষ ফোঁটাটাও কীভাবে সুড়ুৎ করে শুষে নিল লোকটা। আঙুল চাটতে চাটতে লাজুক মুখে বলল, "একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গেল। আসলে এসব তো আর পাই না, খুব লোভে ধরল।"

অবিশ্বাসী গলায় শ্যামাচরণ বললেন, "ছোট মাছও পাওয়া যায় না তোমাদের ওই ইয়ে, ২১৬৯ সালে?"

হেউ করে একটা ঢেকুর তুলে অবিনাশ বলল, "তবে আর বলছি কী! পুকুরে, ভেড়িতে একটুও তো জল পড়ে নেই, মাছ জন্মাবে কী করে!"

"তা হলে কী খাও তোমরা?"

"শুকনো গাছের ছাল খাই। পোকামাকড় খাই। হাতের সামনে যা পাই, তাই খাই।"

"সে কী হে! এতগুলো লোকের ওইসব খেয়ে চলে নাকি! বেঁচে থাকা যায়!"

"আজ্ঞে, বেঁচে থাকে না তো। পটাপট মরে যাচ্ছে সকলে। কমতে কমতে এখন আমরা মোটে কয়েকঘর এসে ঠেকেছি। সব মিলিয়ে শ'দেড়েক লোক হবে। আর অন্য সব জায়গায় ক'জন বেঁচে আছে কে জানে! সেও খুব বেশি হওয়ার কথা নয়। কেউই তো শুনি খেতে পায় না।"

"অন্য সব জায়গা মানে?"

"আপনাকে বলিনি বুঝি? এত মারামারি-কাটাকাটি শুরু হয়েছিল যে, জাত-ধর্মে ভাগ করে সবাইকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। সে আমার ঠাকুরদার সময়ের কথা। তখন ওই হিসেবেই আলাদা আলাদা রাজ্য তৈরি হয়েছিল সারা দেশে।"

"সে কী, মারামারি-কাটাকাটি কেন!" শ্যামাচরণ আঁতকে ওঠেন।

অবিনাশ একটু চেয়ে থেকে বলল, "আজ্ঞে, সবই শোনা কথা, তবে আপনাদের সময় থেকেই নাকি কে কোথাকার আদি বাসিন্দা, সেই ঝাড়াই-বাছাই শুরু হয়েছিল। আমাদের ওখানে অন্য জাত, অন্য ধর্মের লোকেদের বেছে বেছে আলাদা করেছিল সরকার। যারা দেশের বাইরে থেকে এসেছিল, বিশেষ করে অন্য ধর্মের, তাদের খেদিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতেও ঝামেলা কমছে না দেখে, প্রত্যেক জাত আর ধর্মের লোকের জন্যে আলাদা রাজ্য তৈরি হল। যাতে কাউকে বেজাতের সঙ্গে থাকতে না হয়।"

"তারপর? ঝামেলা কমেছিল?"

দু'দিকে মাথা নাড়ে অবিনাশ, "নাহ্, উলটে বেড়ে গেছিল। কারণ, প্রকৃতি তো আর জাত-ধর্ম বিচার করে না। সে ফসল ফলায় পরিবেশ বুঝে। কোথাও ধান হয়, তো কোথাও গম। কোনও জায়গায় ফলপাকুড় বেশি ফলে, কোথাও শুধুই শাকসবজি। নদীর ধারে, বা যেখানে পুকুর-ডোবা বেশি, সেখানে মাছ এন্তার। এবার ঝগড়া করে এক জাতের সঙ্গে আর-এক জাতের মুখ দেখাদেখি বন্ধ! প্রথমে সবার খুব ফুর্তি। ওরা মাংস পাচ্ছে না, বেশ হয়েছে! দুধ খেতে পাচ্ছে না বাচ্চাগুলো? দেখ কেমন লাগে!"

"ইসস, ছি ছি ছি..."

"সত্যিই খুব লজ্জার ব্যাপার, বুঝলেন। ঠাকুরদা বলত, খুব তাড়াতাড়ি ফুর্তি চটকে গিয়ে লোকের রাগ হতে শুরু করল। তখন আরম্ভ হল শোধ তোলার খেলা। কখনও ওরা চুপিচুপি এসে আমাদের ধানের গোলায় আগুন লাগায় তো কখনও আমরা লুকিয়ে ওদের পুকুরে বিষ মিশিয়ে দিই।"

"এহ্ হে হে... তারপর?"

"তারপর শুরু হল নিজেদের মধ্যে ঝামেলা। এক জাতের লোক পাশাপাশি থাকে, কিন্তু কেউ দু'বেলা শাক-ভাত খায়, তো কেউ রোজ পোলাও-মাংস। লোকের রাগ হতে শুরু করল। একদল বলে বেড়াতে লাগল, সব ঝামেলার মূল কারণ নাকি এটাই। নেতারা জেনেবুঝেই এতদিন আড়াল করে রেখেছিল।"

"হ্যাঁ, সে তো বটেই। ওটাই তো আসল ইয়ে..." চিন্তামগ্ন গলায় বললেন শ্যামাচরণ, "তারপর কী হল?"

"আর কী, আবার ভাগ হল সবকিছু। এটা বড়লোকদের জায়গা, ওটা গরিবদের। তার মধ্যেও ভাগ। গরিবদের কেউ খেটে খায়, কেউ একেবারে ভিখিরি। বড়লোকদের মধ্যেও কেউ পুরো বড়লোক, কেউ আধা, কেউ সিকি। আলাদা থাকার এলাকা ঠিক করে দিয়ে মাঝখানে ইয়াব্বড় পাঁচিল তুলে দেওয়া হল। মস্ত ফটক বানিয়ে পাহারা বসল। কেউ যাতে বিনা অনুমতিতে কারও এলাকায় যেতে না পারে।"

"হুঁ, বুঝলুম। আমাদের সময়েও এটা আছে। একটাই বেশ বড় থাকার জায়গা, ধরো, তার মধ্যে এইচআইজি, এমআইজি, এলআই.জি— এরকম সব ভাগ," শ্যামাচরণ বিজ্ঞের মতো বলেন।

"বাবাও সেটাই বলেন। এসবও আপনাদের সময় থেকেই শেখা।"

"আহা, এটা কি আর শেখার মতো কোনও ভাল জিনিস হল! লোকজনকে আলাদা করে দেওয়া! সে জাত-ধর্মের বিচারেই হোক, বা টাকাকড়ির হিসেবে!"

"না, মোটেও ভাল না তো। লোককে ভাগ করে, আলাদা করে দেওয়া মোটেও ভাল নয়। কিন্তু কী জানেন, তাতেই নেতাদের শাসন করার সুবিধে— আলাদা করে রাখতে পারলে। ঠাকুরদা বলত, শুরুতে কেউ মতলবটা বুঝতে পারেনি। বরং খুশি হয়েছিল আলাদা হয়ে। ভেবেছিল, যাক, নিশ্চিন্তি। আর কেউ আমাদের চাকরিতে, আমাদের খাবারে ভাগ বসাতে পারবে না। যা আছে, নিজেদেরই থাকবে।"

শুনতে শুনতে ভয়ংকর মুষড়ে পড়েন শ্যামাচরণ। মাথা নিচু হয়ে আসে তাঁর। আর তখনই চোখে পড়ে টেবিলে পড়ে থাকা নিজের লেখাটার দিকে। যার শিরোনাম— 'এবার ধর্মরাজ্য সমাগত'! অবিনাশের দিকে তাকান তিনি, "কিন্তু খাবারদাবারে টান পড়ল কেন?"

"ওই যে বললাম। জল। সব জল শুকিয়ে যেতে শুরু করল। আমার বাবা তখন সবে সংসার শুরু করেছে। আমি হয়েছি বছর দুয়েক হল, আমার বোনটা তখনও মায়ের পেটে। জলের আকাল দেখা দিল। সে এক সর্বনেশে আকাল। খেতের ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে, গাছপালা সব ধুঁকতে ধুঁকতে শুকিয়ে মরছে, আস্ত আস্ত ফলন্ত গাছ সার দিয়ে মরে কাঠ হয়ে যাচ্ছে... যাচ্ছেতাই ব্যাপার একেবারে।"

"কেন? এরকম হল কেন?"

"আর কী বলি, তারও শুরু আপনাদের সময়েই। গাছপালা কেটে সাফ করে, খাল-বিল বুজিয়ে চল্লিশ তলা পঞ্চাশ তলা সব বাড়ি বানিয়েছিলেন। ইচ্ছেমতো জল তুলেছিলেন, বাজে খরচ করেছিলেন সাঁতার কাটার জায়গা আর নকল ঝরনা তৈরিতে। মাটির নীচে জমে থাকা জল যে হু হু করে শেষ হয়ে আসছে, কেউ খেয়াল রাখেননি। সেই ফাঁকা জায়গা ভরাট করতে সমুদ্র থেকে চুপিসাড়ে ঢুকে এসেছিল নোনা জল। মাটির ফসল ফলানোর ক্ষমতা, গাছপালা গজানো থেকে শুরু করে সামান্য একটু খাবার জল, সব নষ্ট করে দিল সেই বিষ-নোনতা জল।

"সরকার কিছু করল না?"

"আর সরকার! ঝাঁ-চকচকে দোকানপাট, রাস্তাঘাট নিয়ে সবাই এমন মত্ত ছিল, নেতারা যে কোন ফাঁকে ফুড়ুৎ করে কেটে পড়ল, কেউ টেরই পায়নি। সেসব আমার বাবার আমলে। তখনই একবার গরিব–বড়লোকে খুব ঝামেলা হল। নেতারা এলেন। চোখ পাকিয়ে বললেন, মিলেমিশে যখন থাকতে পারছ না, কেউ কারও দিকে যাবে না! ব্যস, কাঁটাতারের বেড়া বসে গেল। তাতে অষ্টপ্রহর হাই ভোল্টেজ কারেন্ট চিড়বিড় করে। ছুঁলেই মরণ।"

শ্যামাচরণ আশ্বস্ত গলায় বলেন, "অ, তোমাদের তা হলে ইলেকট্রিসিটি আছে?"

অবিনাশ হাসল। "আছে বই কী। ইলেকট্রিসিটি আছে, গুচ্ছের যন্ত্রপাতির গ্যাঞ্জাম আছে। আগাপাছতলা ডিজিটাল দেশ আমাদের। আরও অনেক কিছু আছে, যেগুলো এখন আপনাকে বললে হয়তো বুঝতে পারবেন না।"

"তাও শুনি..." কৌতূহলী হন শ্যামাচরণ।

"যেমন ধরুন, পাঁচ বছর পর পর নেতারা আসেন আমাদের বাড়ি। সশরীরে নয়, ভার্চুয়ালি। আমরা তেনাদের ছায়া–শরীর দেখতে পাই কেবল। হাতের নাগালেই থাকেন, কিন্তু ধরতে পারি না। নেতারা আমাদের দুঃখ–কষ্টের খবর নেন। নিজেরাও দুটো মনের কথা বলেন।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী! আবার পাঁচ বছর পর আসবেন বলে শুভেচ্ছা–টুভেচ্ছা জানিয়ে চলে যান।"

"পাঁচ বছর পর ওঁরাই আবার আসেন?"

"বেঁচে থাকলে ওঁরাই আসেন," দার্শনিকের মতো বলে অবিনাশ।

ভেবড়ে যান শ্যামাচরণ, "সে আবার কী! নতুন নেতা নির্বাচন হয় না?"

"হয় তো! ওই যে ওঁরা কষ্ট করে ভার্চুয়ালি দেখা দিলেন, আমাদের পিঠ চাপড়ে দিলেন, আমরা গদগদ হয়ে গেলাম, ওটাই তো প্রমাণ করে যে, আমরা ওঁদেরই আবার বেছে নিলাম।"

শ্যামাচরণ এবার বিভ্রান্ত, "ভোট দিতে হয় না তোমাদের? ভোট দিয়ে নেতা বেছে নাও না?"

ঠোঁট উলটোয় অবিনাশ। "ঠাকুরদা তো বলত, সেসব পাট আপনাদের সময়েই চুকেবুকে গেছে। আপনারাই নাকি সংসদ না কী একটা জায়গায় মহা উৎসাহে বলেছিলেন, আর ওসব ভোটের দরকার নেই। একবার যে নেতা হবে, সে-ই আজীবন নেতা থাকবে। আপনারাই রাজি হয়েছিলেন!"

আড়চোখে একবার টেবিলে খোলা পাতাটার দিকে তাকান শ্যামাচরণ। নিজের লেখার প্রথম লাইনটা চোখে পড়ে, 'প্রতিবার নির্বাচনের নামে জনগণের অর্থ আর প্রশাসনিক ব্যবস্থার এমন অপচয় কি যুক্তিযুক্ত?' শ্যামাচরণ ঢোক গেলেন। "রেডিও–টিভিতে সরকারের সমালোচনা হয় না? এই যে তোমাদের খাওয়ার জল নেই, খেতে ফসল নেই, প্রতিবাদ হয় না?"

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে অবিনাশ, "রেডিও–টিভি আর নেই তো! শেষ টিভি দেখা গেছে সেই ঠাকুরদার আমলে। রেডিও তুলে দিয়েছিল তারও আগে। এখন সরকার যা বলার, ওই ভার্চুয়াল ব্রডকাস্টে বলে দেয়। তার জন্যে সুপার–জি ইন্টারনেট আছে। সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ে সরকার।"

"আর খবরের কাগজ? পত্রপত্রিকা?" উত্তেজনায় শ্যামাচরণ বুকের বাঁ দিকটা খামচে ধরেছেন। যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

অবিনাশ মাথা নাড়ায়, "নেই। দেশের জঙ্গল সব সাফ। কাঠ নেই বলে কাগজই তৈরি হয় না, তো খবরের কাগজ!"

"কেন? জঙ্গল সাফ হয়ে গেল কী করে?" শ্যামাচরণ এবার হাঁফাচ্ছেন।

"কী আর বলি, সেও আপনাদের সময়েই। গাছপালা কেটে, জলা বুজিয়ে বাড়ি বানাতেন আপনারা, রাস্তা চওড়া, ফ্লাইওভার... একরের পর একর জঙ্গল ফৌত! তারপর কোথায় যেন জঙ্গলের ভেতরে খনির খোঁজ পাওয়া গেল। আপনারা সবাই রাজি হয়ে গেলেন জঙ্গল খোঁড়াখুঁড়ি করায়। যদিও সেই খনির মাল আপনাদের ভোগে লাগেনি। সব চালান হয়ে গেছিল বিদেশে।"

"তা হলে? এখন উপায়?"

"সেই কথা বলতেই তো দেড়শো বছরের রাস্তা উজিয়ে আমি এলাম। এসেই কী বললাম আপনাকে? বেশ কিছু ভুল হয়ে যাচ্ছে। বড় ভুল। সময় থাকতে সেগুলো শুধরে নিতে হবে। নইলে অনর্থ!"

অবিনাশের কথা শুনতে শুনতে চমকে ওঠেন শ্যামাচরণ। তাঁর হাতের ধাক্কায় টেবিলের ওপর উলটে পড়ে জলের গেলাস। জলে থইথই হয়ে যায় শ্যামাচরণের লেখার কাগজ। কিন্তু সেটা সরিয়ে নেওয়ার কোনও তাগিদ হয় না তাঁর। দেখতে থাকেন, লেখার নীল কালি কেমন পাক খেয়ে মিশে যাচ্ছে গড়িয়ে যাওয়া জলের সঙ্গে। পরক্ষণেই আঁতকে ওঠেন— ইস, কতটা জল নষ্ট হল!

॥ ৩ ॥

অবিনাশ চলে যাচ্ছে। এগিয়ে দিতে বাড়ির বাইরে এসেছেন শ্যামাচরণ, দরজায় দাঁড়িয়ে গিন্নি। মেয়ে কনকচাঁপা এসে দাঁড়াল মায়ের পাশে। তাকে দেখে অবিনাশ বলল, "এটি তো আপনার কন্যা। খুব লক্ষ্মীমন্ত মুখ।"

হাসলেন শ্যামাচরণ। তারপর বন্ধুর মতো অবিনাশের কাঁধে হাত দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "আচ্ছা, আমার বংশের কেউ বেঁচে আছে তোমাদের সময়ে?"

অবিনাশ হাসল, "আছে তো। আমার ঠাকুরদাই আপনার মেয়ের বড় ছেলে। সেই জন্যেই তো ওই মুখ আমার আজন্ম চেনা। ঠাকুরদা বছর বিশেক আগে দেহ রেখেছেন অবশ্য। আহা, শেষজীবনে বড় অনুতাপ করতে করতে গেছেন!"

"কী নাম ছিল তোমার ঠাকুরদার?"

বউ–মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। সেদিকে তাকিয়ে শ্যামাচরণের হাত ধরে টেনে, একটু দূরে সরে যায় অবিনাশ। নিচু গলায় বলে ঠাকুরদার নাম। শুনেই শ্যামাচরণ শিউরে ওঠেন। তিনি কায়স্থ বংশের সন্তান। তাঁর জামাই হবে কিনা অন্য জাতের!

অবিনাশ যেন শ্যামাচরণের মনের কথা পড়তে পারে। মৃদু হাসে, "আমার প্রপিতামহ কিন্তু খুব ভাল ছেলে। আপনার মেয়ের সঙ্গে এখন এক কলেজে পড়ে। ইদানীং খুব ভাব হয়েছে দু'জনের। আপনি যেন আবার বাগড়া দেবেন না!"

এক হাতে শ্যামাচরণের কাঁধ জড়িয়ে ধরে, অবিনাশ আর-একটু ঝুঁকে আসে, "সত্যি কথাটা বলেই দিই। মেয়ের এই অসবর্ণ সম্পর্কে আপনার আপত্তি ছিল না বলেই বাবা আমাকে পাঠিয়েছে আপনার কাছে। শুধু এটা বোঝাতে, যে গোড়ার গলদ এইটাই। জাত–ধর্মের বিভেদ করা। ওইটা অস্বীকার করতে পারলেই নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি কমবে। তখন অনেকগুলো ভুল পরপর শুধরে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে।"

"কী ছাতার সমাজ সংস্কার হবে তাতে!" ঝেঁজে উঠে নিজের কাঁধ থেকে অবিনাশের হাতটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেন শ্যামাচরণ, "তোমার বাপ-ঠাকুরদা বেজাতের। তার মানে আমার জামাইও তাই। আমি তো আপত্তি করিনি। মেনে নিয়েছিলাম। তাতে কি কিছু এসে গেছে?"

"আপনি তো লেখেন। এবার লিখুন না এই নিয়ে। মেয়ের সম্পর্কটা মেনে নিতে বাধ্য না হয়ে, খোলামনে, খুশি হয়ে মেনে নিন। আশপাশের লোক দেখুক। যেচে পড়ে তাদের বোঝান। দরকার হলে যুক্তি দিয়ে তর্ক করুন। আরও যারা আপনার মতো ভাবে, তাদের সঙ্গে নিন। মানুষকে বোঝান জল বাঁচানোর কথা, গাছ বাঁচানো, জঙ্গল রক্ষা করার কথা। মানুষের স্বাধীনতা, তার অধিকারগুলো আগলে রাখাটা কত জরুরি, সেটা বারবার বলুন। জাত, ধর্ম বিচার না করে মানুষ যেন শুধু ভালবাসে, বোঝান সবাইকে।"

বিকেলের রোদে হেঁটে চলে যাচ্ছে অবিনাশ। শ্যামাচরণের চতুর্থ উত্তরপুরুষ। যাওয়ার সময় একটা কনকচাঁপা গাছের ডাল চেয়ে নিয়ে গেল। ঝকঝকে হেসে বলল, "দেখি চেষ্টা করে, বাঁচানো যায় কি না!"

শিল্পী: কুণাল বর্মণ



শাসকের লড়াই

দেবাশিস ভট্টাচার্য

দিনটা আজও ভুলিনি।

১৯৮৯। জীবনে দ্বিতীয়বার ভোটে দাঁড়িয়ে হেরে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন ফল বেরিয়েছে।

ঠিক তার আগের দফায় অর্থাৎ, ১৯৮৪-র লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্রে সিপিএমের সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে তরুণী মমতা সেই সময়ে জায়েন্ট কিলার। সংসদেও নজর কেড়েছেন। তাঁর সাদামাঠা উপস্থিতির পাশাপাশি স্পষ্টবাদিতা এবং প্রতিবাদী ভূমিকা প্রশংসা ও প্রশ্রয় পাচ্ছে স্বয়ং রাজীব গাঁধীর।

মমতার তখনকার দল কংগ্রেসের রাজ্য নেতারা সবাই যে তাঁর এই উত্থানে খুশি ছিলেন না, তা বলা বাহুল্য। স্বভাবজাত কাঁকড়াবৃত্তিতে ভর করে তাঁরা অনেকে বরং কমবয়সি মেয়েটিকে টেনে নামাতেই বেশি উৎসাহী ছিলেন। আর ঘটনাচক্রে '৮৯-এর ভোটেই যাদবপুরে সিপিএমের মালিনী ভট্টাচার্য মমতাকে হারিয়ে দিলেন। আড়ালে হাসলেন মমতার দলীয় 'বন্ধু'দের অনেকে।

কালীঘাটে মমতার টালির চালের বাড়ির সামনে তখন কিছুটা ফাঁকা জায়গা ছিল। প্রয়োজন এবং পরিস্থিতির দাবিতে এখন যেখানে কাচ ঘেরা বড় হলঘর তৈরি হয়েছে, সেই সময়ে ওই স্থানটি ছিল একেবারে উন্মুক্ত। ভোটের সময় বাঁশ বেঁধে ত্রিপল খাটিয়ে সেখানেই অস্থায়ী তাঁবু গড়া হত। দলের কর্মীরা সেখানে ভিড় করতেন। তারই তলায় সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলতেন মমতা।

ফল প্রকাশের সন্ধ্যায় ওই শামিয়ানাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হল। জায়গাটি তখন কার্যত ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। পরাজয়ের মুহ্যমানতা ঘিরে ধরেছে চারপাশ। মমতাও স্বাভাবিকভাবে একটু বিষণ্ণ, গম্ভীর।

"মানুষকে বুঝতে এত ভুল করলাম!" প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল তাঁর। ঠিক এই কথাটিই তিনি বলেছিলেন ২০০৪ সালে, যখন রাজ্যে ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে শুধু নিজের দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে জিতেছিলেন

তৃণমূলের মমতা। তাঁর দল সেবার আর একটি আসনও পায়নি।

কিন্তু ১৯৮৯-তে ওই কথা বলার পরেই চকিতে আগুন জ্বলতে দেখেছিলাম সেদিনের কংগ্রেস নেত্রীর চোখে। তিনি দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন, "আজকের এই পরাজয় আমার জিদ বাড়িয়ে দিল। লিখে রাখুন, সিপিএমকে আমিই রাজ্যের ক্ষমতা থেকে সরাব। তবেই আমার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

সেই শপথ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছেন তিনি। সময় লেগেছে দু'দশক। ইতিমধ্যে রাজনীতি তার গতিপথ বদলেছে বারবার। মমতা কংগ্রেস ভেঙেছেন। তৃণমূল গড়েছেন। আবার বামফ্রন্টকে হারাতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধেই ভোট লড়েছেন। তবু ২০১১-তে ৩৪ বছরের বাম-একাধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে ইতিহাস গড়ার মূল কৃতিত্ব যে তাঁরই, তা সংশয়ের উর্ধ্বে।

কিন্তু মাত্র আট বছর রাজ্যশাসনের পরেই সেই মমতা এবার এক বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র লক্ষণীয় উত্থান মমতাকে শুধু যে ধাক্কা দিতে পেরেছে তা-ই নয়, তাঁর দল এবং সরকারের ভিতরে জমতে থাকা অনেক কালো এখন আলোর তলায় আসতে শুরু করেছে। যেটা তাঁর পক্ষে খুব স্বস্তিকর হতে পারে না। আগামী বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে তাই অনেক প্রশ্ন, অনেক জল্পনা দানা বাঁধছে। আগ্রহটাও কেন্দ্রীভূত— তিনি কি পারবেন?

বিরোধী রাজনীতিতে মমতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন একজন আপসহীন প্রতিবাদী, সৎ, সাদামাঠা এবং লক্ষ্যে অবিচল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে। অন্য রাজনীতিকদের মধ্যে যেসব গুণের অভাব নিয়ে মানুষ প্রশ্ন তুলেছে, মমতার মধ্যে আপাতভাবে সেই গুণাবলির প্রকাশ দেখার পরে তাঁর প্রতি আস্থার পাল্লাও ভারী হয়েছে।

সকলে মানবেন, মমতার উত্থানের একটি বড় কারণ তাঁর লড়াকু চরিত্র। তিনি সাহসের সঙ্গে যে-কোনও কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পিছপা হননি। মার খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। কিন্তু ময়দান ছাড়েননি। ব্যতিক্রমী হিসেবে এভাবেই সিপিএমের বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য মুখ হয়ে ওঠা তাই তাঁর পক্ষে কিছুটা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। পাশাপাশিই তাঁর আর-একটি বড় পুঁজি ছিল সাদা কাপড়ে কাদা না-লাগা ভাবমূর্তি। বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন আগাগোড়া তিনি এর 'সুফল' পেয়েছেন।



আঘাত সে যে...

১৯৮৪ সালে সিপিএমের তৎকালীন দুর্গ বলে অভিহিত যাদবপুর থেকে জিতে সংসদীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের মমতা যখন প্রথম পা রেখেছিলেন, লোকের চোখে তিনি তখন যেন 'পাশের বাড়ির মেয়ে'। তাঁর সরল, অনাড়ম্বর, ঘরোয়া ব্যবহার ছিল মন জয়ের অন্যতম চাবিকাঠি। তাঁর জয়ের পথ তাতে আরও প্রশস্ত হয়েছিল।

একথা ঠিক যে, ইন্দিরা-হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৪-র ভোটে কংগ্রেসের পক্ষে প্রবল সহানুভূতির হাওয়া উঠেছিল। ফলে মমতার মতোই সেদিন রাজনীতিতে কার্যত নবাগত আরও অনেকে কংগ্রেসের টিকিটে জিতেছিলেন। রাজীব গাঁধীর পাঁচ বছরের শাসনকালে সেই হাওয়া স্বাভাবিকভাবেই স্তিমিত হয়ে যায়। পরের ভোটে তাই একই কেন্দ্রে সিপিএমের কাছেই হেরে যেতে হয়েছিল মমতাকে।

গল্পটাও হয়তো সেখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত, যদি ওই হারের পরে তিনিও অন্য অনেকের মতো রণে ভঙ্গ দিয়ে হাত-পা ধুয়ে ফেলতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। বরং অদম্য তেজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মার খেয়েছেন। রক্তাক্ত হয়েছেন। জীবনসংশয়ও হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের পথ থেকে সরেননি। যাদবপুর থেকে হেরে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে সরে গিয়ে ১৯৯১-তেই ফের সাংসদ হন মমতা। নরসিংহ রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বে জীবনে প্রথম কেন্দ্রে প্রতিমন্ত্রী হওয়ারও সুযোগ পান। সেই থেকে ভোটের বাজারে তিনি অপরাজেয়। কখনও হারেননি। আর আন্দোলনের ময়দানেও তিনি চিরকাল আগুয়ান। তারই জেরে তিনি আজকের 'মমতা।'

তবে এটাও খণ্ডসত্য। আঘাত, আক্রমণ মমতাকে নিশ্চয়ই মান্যতা দিয়েছে। তাঁর আন্দোলনকে লোকের চোখে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। কিন্তু রাজনীতিতে তাঁর অব্যবস্থিত মতি তাঁকে পিছিয়েও দিয়েছে অনেকবার। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্যে কয়েকটি বিধানসভা ও লোকসভা ভোটের ফলে চোখ রাখলে এটা কিছুটা বোঝা যায়।

এটা ঠিক যে, মমতা বারবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পরিচিত, লড়াকু, বিরোধী ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়েই। অবশ্যই পরিস্থিতি তাঁকে সেই সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু আজ সেই মমতা নিজেই ক্ষমতায়। ফলে আন্দোলনের পরিসর আর আগের মতো নেই। রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সাফল্য, ব্যর্থতা দুটোই তাঁর ওপর বর্তায়। পরিস্থিতি তাই অনেকটা আলাদা।

তবু সেখানে দাঁড়িয়েও গত লোকসভা নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়া মমতা পরবর্তী ধাপে ফের আন্দোলনে ফেরার কথাই বলেছেন। দলকে নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশি নির্ভরতা ছেড়ে পুরনো বিরোধী দলের চরিত্র মেনে পথে নামতে। এমনকী, তাঁর দলের ছাত্র, যুব, শ্রমিক বা সরকারি কর্মীদের শাখা সংগঠনগুলিকে আন্দোলনের ক্ষেত্রে সরকারি 'জো হুজুর' অবস্থান ছেড়ে আসার 'স্বাধীনতা' দেওয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ আবার সেই 'ব্যাক টু রুট'। লড়াই করে 'বাঁচতে চাওয়া'! তিনি হয়তো বুঝতে পারছেন, ভোট টানতে 'শাসক' মমতার চেয়ে 'লড়াকু' মমতার 'টিআরপি' বেশি!

কিন্তু আট-ন'বছর শাসকের চেয়ারে বসে থাকার পরে স্বাভাবিকভাবেই দলে 'ক্ষমতার মেদ' জমতে থাকে। তারই সঙ্গে আর্থিক দুর্নীতি, দম্ভ, জনবিচ্ছিন্নতার মতো নানা বিচ্যুতিও দলকে আশ্রয় করে। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের ফল তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। মমতা নিজেও তা বুঝেছেন। তবে প্রশ্ন হল, পথে নেমে লড়াই করলে সেই মেদ আজ কতটা ঝরবে? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, শাসকের অবস্থানে থেকে এখন কতদূর লড়াকু হওয়া সম্ভব এবং কীভাবে?

এই প্রসঙ্গে আলোচনায় যাওয়ার আগে তৃণমূলের সৃষ্টিলগ্ন থেকে যাত্রাপথটি সামগ্রিকভাবে একবার ফিরে দেখা প্রাসঙ্গিক। তাতে মমতার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার রেখচিত্র যেমন ধরা পড়বে, তেমনই তাঁর ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে 'লড়াই' কীভাবে তাঁকে সহায়তা করেছে, তারও একটা স্বচ্ছ ধারণা মিলবে।

মমতা কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন ১৯৯৭-এর শেষদিকে। ১৯৯৮-এর লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে। ওই বছরেই ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম হয়। রাজ্য কংগ্রেসে সোমেন মিত্রদের সঙ্গে যে তাঁর বনিবনা হচ্ছে না, সেটা অবশ্য তার ঢের আগে থেকেই প্রকাশ্য।

দিল্লিতে কংগ্রেসের ওপরতলার নেতারা প্রায় কেউই সেই সময় প্রকৃতপক্ষে মমতার পাশে ছিলেন না। একটু-আধটু মধ্যস্থতার চেষ্টা করতেন সনিয়া গাঁধী। তিনি তখন অন্দরমহলে থেকে দলের 'বিবেক' বা 'অন্তরাত্মা' বলে গণ্য হতেন। অন্যদিকে মমতাও তখন হাইকম্যান্ডকে চ্যালেঞ্জ করে তার নাকের ডগায় পালটা জনসভা ডেকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন কংগ্রেসের মূল স্রোত তাঁরই সঙ্গে। ভাঙনটা তাই নিশ্চিতই

ছিল। অপেক্ষা ছিল উপযুক্ত সময়ের।

চূড়ান্ত ঘটনাটি কিন্তু ঘটল একেবারেই আচমকা। দেশে তখন ১৯৯৮-এর ভোটের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সেইসময় মমতা চাইছিলেন, লোকসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে প্রার্থী বাছাই কমিটি তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাক। তিনি ওই কমিটির প্রধান হোন। কারণ, তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল, তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সিপিএমের ‘বি-টিম’। মমতার সেই দাবির বিরুদ্ধে বাধা হয়েছিলেন সোমেন ও তাঁর লোকজন। তা নিয়ে বিবাদ তুঙ্গে।

সীতারাম কেশরী তখন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি। তাঁকেও সঙ্গে পেলেন সোমেনরা। দলে ভাঙন অনিবার্য বুঝে শেষ চেষ্টায় নেমেছিলেন সনিয়া। দু’পক্ষকেই তাই অনুরোধ করেছিলেন তিন-চারদিন মুখ বন্ধ রাখতে। কিন্তু মাঝপথে কংগ্রেস সভাপতির একটি মন্তব্য আগুনে ঘি ঢালে। দল রাতারাতি ভাঙে।

সেদিন ছিল রবিবার। সন্ধেবেলা সীতারামকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা খবর পাঠাল, মমতা পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের প্রচার কমিটির নেতৃত্ব দেবেন। প্রার্থী বাছাই কমিটির নয়। খবরটি হাতে করে কালীঘাটে মমতার বাড়ি যাই। ভিতরের অফিসঘরে তিনি তখন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রঞ্জিত পাঁজার সঙ্গে কথা বলছিলেন। খবরটি দেখেই ঘরে যেন বিস্ফোরণ! মমতা চিৎকার করে উঠলেন, “এসবের মানে কী? কী ভেবেছে আমাকে? আমি ওদের দয়ায় রাজনীতি করব? আর এক মুহূর্ত নয়। কালই তৃণমূল কংগ্রেস ঘোষণা করে দেব।”

জানতে চেয়েছিলাম, যদি ১০ জনপথ (সনিয়ার বাড়ি) থেকে ফোন আসে? মমতা ঝাঁজিয়ে উঠে জবাব দিয়েছিলেন, “১০০ নম্বর থেকে ফোন এলেও আমার সিদ্ধান্ত বদলাবে না। তৃণমূল কংগ্রেস গড়ার ঘোষণা কাল-ই হবে।” পরদিন বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ঠিক সেটাই করলেন।

আগের রাতে দিল্লিতে অজিত পাঁজাকে ফোন করে সব জানিয়েছিলেন মমতা। আলাদাভাবে কথা বলেছিলেন বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণীর সঙ্গেও। বিজেপি এটাই চাইছিল। তাদেরও নজর ছিল মমতার দিকে। যদিও তখনই খোলাখুলি বিজেপির সঙ্গে মমতা যাননি। গিয়েছিলেন আরও একবছর পরে। ১৯৯৯-এর লোকসভা ভোটের সময়।



রাজনীতির অঙ্ক। লালকৃষ্ণ আডবাণীর সঙ্গে

তবে ’৯৮-এর লোকসভা ভোটেই তাঁর নবগঠিত তৃণমূল কংগ্রেস সাতটি আসন পেয়ে শুধু কংগ্রেসেরই নয়, রাজ্যে বিরোধী রাজনীতির ভিতটাও নাড়িয়ে দেয়। কংগ্রেস ভেঙে বেরনোর পরেই শ্যামবাজার মোড়ে মমতার প্রথম জনসভাটি ভিড়ের নিরিখে ছিল চোখে পড়ার মতো। এভাবেই সূচনা হয় মমতার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের। ভোটের পরে সাত সাংসদ নিয়ে লোকসভায় তৃণমূল। কেন্দ্রে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে প্রথম এনডিএ সরকার।

এর পরেই অকাল-ভোট হল ১৯৯৯-তে। দ্বিতীয় এনডিএ সরকার ক্ষমতায় ফিরল। বাজপেয়ীর সরকারে যোগ দিয়ে মমতা প্রথম রেলমন্ত্রী হলেন। কংগ্রেস-বিরোধিতার অবস্থান থেকে সেই সময়ে তাঁর বিজেপি-জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিকভাবে অযৌক্তিক ছিল, তা হয়তো বলা যাবে না। তখন তাঁর দলে আটজন সাংসদ। ২০০০ সালে বামেদের হারিয়ে কলকাতা পুরসভাও দখল করে নিল তৃণমূল।

কিন্তু এরপরেই শুরু হয় তাঁর রাজনীতির অস্থিরতা। কখন কার হাত ধরে চলবেন, তা নিয়ে দোলাচল। পরবর্তী কয়েক বছর ধরে একবার তিনি বিজেপি-র সঙ্গে যান, একবার থাকেন কংগ্রেসের হাত ধরে। এবং আসতে থাকে একের পর এক ধাক্কা। কারণ, মানুষ এটা গ্রহণ করেননি।

২০০০ সালেই প্রথম রেল বাজেট পেশ করার পরে বছর ঘুরতে না-ঘুরতে তহলকা কাণ্ডের প্রতিবাদে বাজপেয়ীর সরকার ছেড়ে বেরিয়ে আসেন মমতা। ফিরে যান তাঁর পুরনো দল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধতে। রাজ্যে বিধানসভা ভোটেও লড়েন একসঙ্গে এবং শোচনীয় বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয় তাঁকে।

সেবার সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বদলের ডাক দিয়ে মমতার স্লোগান ছিল, ‘হয় এবার, নয় নেভার’। মনে আছে, কংগ্রেসের সঙ্গে আসন রফার জন্যে হাইকমান্ডের প্রতিনিধি কমল নাথের কলকাতার বাড়িতে প্রায় রাতভর বৈঠক করেছিলেন মমতা। প্রদেশ কংগ্রেসের কেউ কিন্তু তখন সেখানে ছিলেন না।

সেই বাড়ির ভিতরে বসে দেখেছিলাম, একটি একটি করে আসন ধরে আলোচনার পরেও অনেকটাই গোঁজামিলের মতো ঝুলে রইল। আর ওই অবস্থায় পরদিন বিকেলে সাংবাদিকদের ডেকে আসন রফার কথা জানিয়ে দিলেন মমতা ও কংগ্রেসের নেতারা। পাশে সরে গিয়ে রাজ্যের কতিপয় কংগ্রেস কর্তা অবশ্য রসিকতা করতেও ছাড়েননি।

ফল ফলল! ২২৬টি আসনে লড়ে মমতার দলের প্রাপ্তি মাত্র ৬০। আর কংগ্রেস ৬০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পেল ২৬। সিপিএম সেবার ভোটের ঠিক আগেই জ্যোতি বসুকে সরিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে মুখ্যমন্ত্রী করে দিয়েছিল। সেটা ছিল অনিল বিশ্বাসের কুশলী চাল। মুখ-বদল! ভোটের ফল বেরনোর পরে তিনি হেসে বলেছিলেন, “দিদি তো বুঝতেই পারেননি! আসল বদলটা আগেই হয়ে গিয়েছিল।”

এরপরেই কংগ্রেসের সঙ্গ ছেড়ে আবার বিজেপির দিকে ঝুঁকলেন মমতা। ২০০৪-এর লোকসভা ভোটের মাস পাঁচেক আগে ফের তিনি চলে গেলেন এনডিএ শিবিরে। বাজপেয়ী তাঁকে আরও একবার মন্ত্রিত্ব দিলেন। এবার কয়লা ও খনি। বিজেপি ভাবল, মমতাকে সঙ্গে রেখে তারাও বঙ্গে জায়গা করে নেবে। সেই গুড়ে বালি তো পড়লই। ২০০৪-এর লোকসভায় মমতার তৃণমূলও হালে পানি পেল না। নিজের অস্থিরমতিত্বের মাশুল সেবারেও শোচনীয়ভাবে গুনতে হল তাঁকে। তৃণমূল কংগ্রেস মুখ থুবড়ে পড়ল। জিততে পারলেন একমাত্র তিনি। ফলে লোকসভায় তৃণমূলের তখন ওই একটি মুখ। আর বিজেপি-জোটকে হারিয়ে দেশের ক্ষমতায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রথম ইউপিএ সরকার। প্রধানমন্ত্রী হলেন মনমোহন সিংহ।

দু’বছর পরে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনেও মমতার পরাজয়ের বহর ছিল চোখে পড়ার মতো। তার আগেই অবশ্য ২০০৫-এ কলকাতা পুরসভা তাঁর হাতছাড়া হয়। আর ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বুদ্ধবাবুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট ২৯৪-এর মধ্যে ২৩৫টি আসন জিতে মমতাকে আক্ষরিক অর্থে কোণঠাসা করে দেয়। তৃণমূল-বিজেপি জোট করে মমতা সে-বার ২৫৭ আসনে লড়ে পান মাত্র ৩০টি আসন। বিজেপি-কে শূন্যহাতে ফিরতে হয়।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ততদিনে প্রচারের আলোয় ‘ব্র্যান্ড বুদ্ধ।’ দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রিত্বে শপথ নিয়েই সন্ধ্যায় মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিঙ্গুরে ন্যানো গাড়ি তৈরির জন্য টাটা গোষ্ঠীকে আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। পান থেকে চুন খসলেই বুদ্ধবাবু তখন মমতার উদ্দেশে দম্ভভরে বলতেন, “আমরা ২৩৫, ওরা ৩০!”

চাকা কিন্তু ঘুরতে শুরু করে এর কয়েকমাসের মধ্যেই। সিঙ্গুর আন্দোলন থেকে যার সূচনা। টাটার সঙ্গে সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানার চুক্তি করেন বুদ্ধবাবু। আর চাষের জমিতে শিল্প করার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান মমতা। একই ধারাবাহিকতায় এরপরে নন্দীগ্রামে রাসায়নিক শিল্পতালুক স্থাপনের উদ্যোগেও বাধা হয়ে দাঁড়ান তিনি। বস্তুত দু’টিই আদতে ছিল ‘ভূমিরক্ষার’ লড়াই।

ওই দুই আন্দোলনের অভিঘাত কতদূর পৌঁছেছিল, নতুন করে তার বর্ণনা করা বাহুল্য। কিন্তু এটা বলতেই হবে, গণ-আন্দোলন বলতে যা বোঝায়, মমতা বিষয়টিকে সেই মাত্রায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে, নন্দীগ্রামে গণহত্যার পরে সমাজের বিশিষ্টদের উদ্যোগে কলকাতায় যে-প্রতিবাদ মিছিল হয়, স্মরণকালে তার নজির নেই।



সিঙ্গুরের জমিতে

বুদ্ধবাবুর সরকার ২০০৭-এ নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে একের পর এক পদক্ষেপে চরম অবিবেচনা এবং ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়েছিল। ফলে মমতার সুবিধে হয়েছিল বিস্তর। কিন্তু তার আগেই ২০০৬ সালে সিঙ্গুরের জমি আন্দোলন থেকে মমতা ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ পেয়ে গিয়েছিলেন। জমিও শক্ত হচ্ছিল।

আসলে রাজনীতিতে সময় এবং বিষয় বেছে নেওয়া খুব জরুরি। কখন, কোন দাবি বা অভিযোগকে সামনে রাখতে হয়, সেটা বুঝে নেওয়া নেতৃত্বের একটি বড় গুণ। মমতা তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এই গুণটি ভালই আয়ত্ত করেছেন। আরও একটি জিনিস তাঁর সহায়ক। তা হল, বাস্তববুদ্ধি।

এই দুই 'মগজাস্ত্রে' ভর করে তিনি প্রথম সিঙ্গুর আন্দোলন শুরু করেন। আর সেখানে খুব কুশলী ছকে সিপিএমের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে তিনি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিতে সফল হন। ব্যাপারটা হয়, জমিরক্ষার লড়াইয়ে তিনি হয়ে ওঠেন চাষি, খেতমজুরদের 'প্রকৃত বন্ধু'। অন্যদিকে এতদিন কৃষক, খেতমজুরদের জন্য আন্দোলন করে আসা সিপিএম শাসকের আসনে বসে চরিত্রে পরিণত হয় ঠিক বিপরীত—সামন্ততান্ত্রিক, আগ্রাসী, চাষির শত্রু।

একটি সমান্তরাল চেষ্টাও ছিল, মমতাকে শিল্পায়ন-বিরোধী বলে চিহ্নিত করার। সত্যি বলতে কী, তাঁর ওই আন্দোলনের ফলে রাজ্যে শিল্প-সম্ভাবনা ধাক্কাও খেয়েছে। সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানা করতে না-পেরে মমতা সম্পর্কে রতন টাটা যে-ধরনের কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, তার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হওয়াই তো স্বাভাবিক। একটি ভারী শিল্পে বেশি লোকের কর্মসংস্থান এবং পাশাপাশি অনুসারী শিল্পের মাধ্যমে আরও কাজের সুযোগ সৃষ্টির ওই উদ্যোগ কার্যত বিফলে যাওয়ার নৈতিক দায় মমতার ওপরই বর্তায়।

কিন্তু ভোটের রাজনীতি সে কথা বলল না। বরং 'কৃষক বন্ধু' হয়ে উঠে মমতা গ্রাম বাংলার সমর্থনে বলিয়ান হয়ে উঠলেন। ফলে সিপিএমের গ্রামের 'দুর্গ' ধসে পড়ল। আভাস মিলেছিল ২০০৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই। ২০০৯-এর লোকসভা ভোটের ফল তাকে আরও বড় মান্যতা দেয়। ক্ষমতাসীন বামেদের চেয়ে বেশি আসন পায় বিরোধী তৃণমূল। এরপর ২০১০ সালে কলকাতা পুরসভাতেও একই ফল। বাকিটুকু ছিল সময়ের অপেক্ষা। ২০১১-তে একেবারে মহাকরণ দখল করে মমতা হয়ে ওঠেন 'বদলের মুখ'। বিরোধী মমতা বদলে যান প্রশাসক মমতায়। তখন তাঁর জোট কংগ্রেসের সঙ্গে।

কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, তৃণমূল নেত্রী কি ওইসময় ক্ষমতায় বসার জন্য তৈরি ছিলেন? অনেকের অভিমত, হয়তো তিনি শক্তিশালী বিরোধী হতে পারবেন ভেবেছিলেন। একেবারে ক্ষমতায় পৌঁছে যাওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকলে প্রার্থী তালিকায় 'যোগ্যতর'দের দেখা যেত।

কিন্তু এসব যুক্তিমাত্র। যা হয়েছে, বিচার তা নিয়ে। মমতা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রিসভা গড়লেন। সেই জোট বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তবে তৃণমূল একাই ১৮৪টি আসন জেতায় সরকারেও এর কোনও প্রতিক্রিয়া পড়েনি।



নন্দীগ্রামে 'ভরসা' দিতে

বিভিন্ন সময় কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব করলেও কখনও পুরো মেয়াদ পূর্ণ করেননি মমতা।। কোনও না-কোনও কারণে মাঝপথে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে আবার ফিরে গিয়েছেন আন্দোলনের ময়দানে। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা এবং স্থিতবুদ্ধি এজন্য বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তবে বলার মতো রাজনৈতিক যুক্তি তাঁর পক্ষেও তখন কম ছিল না। কারণ, তাঁর ওইসব পদত্যাগের পিছনে সর্বদাই কোনও না-কোনও 'জনস্বার্থ' বিষয়ক রাজনীতি থাকত।

মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা কিন্তু গোড়াতেই কয়েকটি জিনিস বুঝে নিয়েছিলেন। যেমন, এই পদে তাঁকে টিকে থাকতে হবে এবং তিনিই এর সর্বেসর্বা। তিনি না-থাকলে রাজপাট হাতছাড়া! আবার সরকারে আসার পরে আন্দোলনের ক্ষেত্র সংকুচিত। অথচ যে-কোনও ভাবে আমজনতার সমর্থন ধরে রাখাও জরুরি। নইলে বিরোধীরা যে-কোনও সময় দাবি-দাওয়া, বঞ্চনার আন্দোলন করে তার 'সুযোগ' নিতে পারে। তা হলে পথ কী? অভিজ্ঞতা ও বাস্তববুদ্ধি দিয়ে মমতা 'বিকল্প' খুঁজে নিলেন।

জনসমর্থনের ভিত মজবুত রাখার সহজ পন্থা হিসাবে নানা স্তরের মানুষের জন্য কিছু না-কিছু পাইয়ে দেওয়ার বিবিধ উদ্যোগ আসলে সেই ভাবনারই প্রতিফলন। সমালোচকেরা একে 'ডোল' বা দাক্ষিণ্য বণ্টনের রাজনীতি বলে কটাক্ষ করেন বটে! কিন্তু এর ফল যে সর্বাংশে খারাপ হয়েছে, তা একেবারেই বলা যাবে না। বরং তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। মহিলাদের স্বার্থ অনেক বেশি সুরক্ষিত হয়েছে। গরিব ও অবহেলিতরা বাঁচার পথ পেয়েছেন। আপাতভাবে এগুলি সবই তাঁর পক্ষে কাজ করেছে।

দাপটে মানুষ দূরে সরে যায়। লোকসভার কয়েক মাস আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে একের পর এক জেলায় 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার' কবলে পড়ে যাঁরা ভোট দেওয়ার সুযোগই পাননি, তাঁরাও এই যন্ত্রণার শরিক।

ক্ষত যত, ক্ষতি তত! ব্যাধি কতটা গভীর হয়েছে, সেটাই বোঝা গেল ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের ফলে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা তো বটেই, শাসক দলের নেতৃত্বও মানছেন, বিজেপি জেলায় জেলায় যেভাবে আসন পেয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের আঁচ টের পাওয়া যায়। শাসকেরা আগে এসব কতটা বুঝেছিলেন বা বুঝতে চেয়েছিলেন, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু এখন আর মূল রোগটা গোপন করার উপায় নেই। স্বয়ং মমতাও বিষয়গুলি সামনে এনে দিয়েছেন। ২০২১-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে রোগ নিরাময়ের বাধ্যবাধকতাই-বা তাঁর চেয়ে ভাল আর কে বুঝবেন! সব মিলিয়ে তাই বাড়ছে জল্পনা— কী রায় দেবে ২০২১!

সিপিএমকে হারিয়ে মমতা যখন ক্ষমতা দখল করেন, তখন 'চুপচাপ ফুলে ছাপ' কথাটি মুখে মুখে বেশ চাউর হয়েছিল। এর দ্বারা বোঝানো হত, মানুষ মনস্থির করেই ভোট দিতে যাবেন। মুখে বলার বাড়তি ঝুঁকি নেবেন না। রাজনীতির বিশ্লেষকেরা অনেকে রাজ্যে এবারের লোকসভা ভোটের ফলাফলে সেই ছাপ দেখতে পেয়েছেন! তবে তাঁদের অনেকের ধারণা, রাজ্যে ১৮টি আসন পেয়ে যাওয়ার সুবাদে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি-র 'অগ্রগতির' যে-ছবি দেখা যাচ্ছে, তাকে এখনই তাদের আন্দোলনমুখী রাজনীতি বা সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির প্রকাশ বলা বাড়াবাড়ি। বস্তুত রাজ্যে এখনও পর্যন্ত বিজেপি সেভাবে কোনও সুসংহত রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতেই পারেনি। তবু তাদের সমর্থনের পাল্লা অনেকটাই ভারী।



২০ মে, ২০১১। মহাকরণে প্রবেশ

তবে এরই ফাঁকফোকর দিয়ে শাসকদল এবং সরকারের অন্দরে বাসা বেঁধেছে দুর্নীতি। যেখানে পাইয়ে দেওয়া, সেখানেই 'বখরা' বুঝে নেওয়ার জন্য ওত পেতে থাকার অবকাশ বেশি। সেটা সরকারি প্রকল্পের পাওনা থেকে ভাগ নেওয়াই হোক, বা কয়লা-বালির চোরাকারবারের 'উপসত্ত্ব' ভোগ। আদায়-প্রথার 'সদ্ব্যবহার' করতে করতে বিষবৃক্ষ বেড়ে উঠেছে জেলায় জেলায়। পুরনোদের কোণঠাসা করে দলের 'নিয়ন্ত্রণ' চলে গিয়েছে তৃণমূলের নব্য বাহিনীর কবজায়। যাঁদের প্রায় কোনও নেতারই সংগ্রামী, মার খাওয়া তৃণমূলকে স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা নেই। নিজেরা পথে নেমে আন্দোলন করা তো দূরস্থান! তাঁরা গোড়া থেকেই দেখেছেন ক্ষমতাসীন মমতার দলকে। ফলে তাঁদের শরীরী ভাষায় ঔদ্ধত্য উপচে পড়ে। তাঁদের

কারণ, এ বার এখানে মূলত যেটা হয়েছে, তা হল তৃণমূলের কৃতকর্মের বিরুদ্ধে মানুষের জমতে থাকা ক্ষোভের উদ্‌গিরণ। সেই অর্থে, তৃণমূলকে হারিয়েছে তৃণমূলই! রাজ্যের বিরোধী ময়দানে সিপিএম এবং কংগ্রেস না-থাকায় বিজেপি হয়েছে তার একমাত্র মাধ্যম। ভোট গিয়েছে পদ্মফুলে।

কিন্তু সবাই জানেন, লোকসভা ভোটে রাজ্যের সরকার বদলায় না। তা হলে মমতার এই ধাক্কা খাওয়ার পরবর্তী পরিণতি কী হতে পারে? এটা কি বিধানসভা ভোটের আগে তাঁকে 'সচেতন' করে দেওয়ার সুস্পষ্ট বার্তা? নাকি অনাগত ভবিষ্যতের আভাস?

ইতিহাস টেনে অনেকে বলছেন, ২০০৯-এর লোকসভা ভোটে রাজ্যে ক্ষমতাসীন বামেরা পরাজিত হয়েছিল। তারপরেই ২০১১-তে বাম



একুশের মঞ্চে

সরকারের পতন হয়। অতএব এই রায় অর্থবহ। কথাটি হয়তো একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু এর প্রতিযুক্তিও এককথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

সেই যুক্তি বলে, ২০০৯ সালে তৃণমূল লোকসভা ভোটে লড়েছিল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে। কেন্দ্রে দ্বিতীয়বারের জন্য মানুষ কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ জোটকেই তখন ক্ষমতায় এনেছিল। বামফ্রন্ট ছিল বিরুদ্ধ পক্ষে। এবং এই রাজ্যে বাম-বিরোধী প্রধান দল হিসাবে মমতা ছিলেন ইউপিএ-র মুখ। তিনি সহজেই তার সুবিধা পেয়েছেন। তাই সেবার রাজ্যে ক্ষমতাসীন বামেদের বিরুদ্ধে রায় যেমন এক দিক থেকে ঠিক, তেমনই দেশে ইউপিএ সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর নিরিখে ওই নির্বাচনী ফলকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকে। আবার ২০১৪-র লোকসভায় মমতা একা লড়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গেও মোদী-হাওয়া ওঠেনি। সিপিএম তখন অস্তমিত। তৃণমূল ৩৪ আসনে জিতেছিল।

ঠিক একইভাবে এ বার বিজেপি-জোটকে দেশের মানুষ বিপুল গরিষ্ঠতায় ফিরিয়ে এনেছেন। জাতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী জোটের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন মমতা। অন্যান্য বিরোধী নেতার মতো তাঁর রাজ্যে তিনিও ধাক্কা খেয়েছেন।

এটা অনস্বীকার্য যে, মোদীর পাঁচ বছরের জমানায় দেশজুড়ে নানা অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়েছিল। নোটবন্দি, জিএসটি, কৃষকদের আন্দোলন, দিকে দিকে হিন্দুত্ববাদীদের হাঙ্গামা কোনও কিছুই মোদীর পক্ষে ছিল না। রাফাল চুক্তিতে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগও মোদী সরকারকে বিড়ম্বনায় ফেলার রসদ জুগিয়েছিল। আর যে যা-ই বলুক, মোদী-হাওয়াও এ বার সেভাবে অনুভব করা যায়নি। তবু সবকিছু ফুৎকারে নস্যাৎ করে বিজেপি যেভাবে হইহই করে জিতল, তাতে বিরোধীরা আর মুখ তুলে কথা বলার মতো অবস্থায় নেই!

এখন এই জয়ের পিছনে তাদের হিন্দুত্ববাদী বা বিভাজনের রাজনীতি কতটা কাজ করেছে, পুলওয়ামা-বালাকোটের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেমের উত্তাল হাওয়া কতটা সহায়ক হয়েছে, মোদী-অমিত শাহের 'ভাবমূর্তি' কীভাবে মানুষকে 'আকৃষ্ট' করেছে— সেইসব নিয়ে বিতর্ক থাকা খুব স্বাভাবিক। তা চলুক।

তবে এইসব চর্চার বাইরেও একটি বিষয় আছে। তা হল, সাধারণ মানুষের ধারণা। যাকে বলা হয়, পারসেপশন। রাজনীতিতে এটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সবাই জানেন, বিজেপি-বিরোধী জোটের যে-বেলুন ফোলানো হয়েছিল, মমতা ছিলেন তার অন্যতম কারিগর। ক্ষমতার লালসায় মত্ত একদল নেতার ভিতরকার টানাপোড়েনে সেই জোটের 'অসারত্ব' ভোটের আগেই নিদারুণ চেহারায় সামনে এসে পড়ে। তাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন, নড়বড়ে জোট গড়ে বিরোধীরা যদি-বা তালেগোলে সরকার গড়ে, সেটা স্থায়ী হবে না।

তাই 'স্থিতিশীল' সরকার গড়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে বিজেপিকে সমর্থন ঢেলে দিয়ে (প্রাপ্ত ভোটের হার প্রায় ৭০ শতাংশ) জনগণ কার্যত বিরোধীদের অগোছালো এবং আত্মকেন্দ্রিক জোট-রাজনীতিকেই পর্যুদস্ত করেছেন বললে বোধ হয় খুব ভুল হবে না। এটা সেই বিচারে স্থায়ী সরকার গঠনের পক্ষে দেশের রায়। যেহেতু বিজেপি-ই ছিল একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিকল্প, তাই সমর্থন স্বাভাবিকভাবে সেই দিকে গিয়েছে। জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মমতাও তার মাশুল গুনেছেন। তা বলে দেশের অধিকাংশ ভোটার বিজেপি-র রাজনীতিতে অনুরক্ত হয়ে ওই দলের উদ্বাহু সমর্থক হিসাবে ভোট দিয়েছেন, বললে সেটা বোধ হয় অতিসরলীকরণ হয়ে যাবে।

কিন্তু পারসেপশন-এর 'রাজ্য সংস্করণ'কেই-বা উপেক্ষা করা যাবে কী করে! লোকসভা ভোটে মমতার ধাক্কা খাওয়া রাজ্যের ক্ষেত্রে অন্যতর যে পারসেপশন তৈরি করেছে, সেটিও তো উড়িয়ে দেওয়ার নয়। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের কথা ভাবলে তাতে 'দুশ্চিন্তা'র উপাদানও তাই অনেক।

মুখে পুরোপুরি না-মানলেও নির্বাচনী ফল পর্যালোচনায় বসে তৃণমূল নেত্রী সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া সেইসব ধারণা অর্থাৎ পারসেপশনের আঁচ পেয়ে রীতিমতো দুর্ভাবনায়। ক্ষমতাসীন দলকে সাধারণত ভোটে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়ার মোকাবিলা করতে হয়। এটা কিছুটা স্বাভাবিক। কিন্তু মাত্র আট বছর রাজত্ব চালানোর মধ্যেই মমতার দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে মানুষের যে-ধরনের বিরূপ মনোভাব বেরিয়ে আসছে, তাতে অশনি সংকেত স্পষ্ট। এখন তাই সবচেয়ে আগে মুখচ্ছবি বদল তাঁর কাছে অনিবার্য হয়ে পড়েছে। সেটাই এখন 'শাসক' মমতার 'বাঁচার লড়াই।'

তবে কাজটি খুব সহজ নয়। যতদিন বিরোধী ছিলেন, ততদিন সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, বিচ্যুতি, দাদাগিরি, জুলুম-সন্ত্রাসের অভিযোগ

নিয়ে নিরন্তর আন্দোলনে যেতে পারতেন তিনি। শাসকের বিরুদ্ধে তাঁর সেই প্রতিবাদে জনসমর্থনও মিলত। ভাগ্যের পরিহাসে এখন তাঁর নিজের দলই ওইরকম নানা অভিযোগে জর্জরিত। ক্ষমতার দম্ভে তাঁর দলের নব্য নেতৃত্ব হাতে মাথা কাটেন— এটাও মিথ্যা নয়।

শাসনক্ষমতায় বসে থেকে তিনি কি তা হলে নিজেদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলবেন? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাচে ঢিল মারার মতো বিপজ্জনক ঝুঁকি নেবেন? নান্যঃ পন্থা। আপাতত এ ছাড়া পথ নেই।

অতএব মমতাকে আপাতভাবে সেই লড়াইতেই নামতে হয়েছে। এবং লাঠি না-ভেঙে সাপ মারার প্রচলিত প্রবাদে আস্থা রেখে, যথাসম্ভব সাবধানে!

তাঁর প্রথম ও প্রধান লড়াই নিজের ভাবমূর্তির সঙ্গে। শাসকের আসনে বসেও মমতা যে বদলাননি, তাঁর স্বচ্ছতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন থাকার ধর্ম থেকে তিনি যে সরেননি, তা প্রমাণের লড়াই। তাই বিরোধী হিসেবে একদিন যেমন করে তিনি শাসকের দুর্নীতির কথা বলতেন, আজ তাঁর নিজের দলের একাংশের কার্যকলাপ নিয়েও তেমনই আক্রমণাত্মক তিনি। কাটমানি বা নিচুতলায় তৃণমূলের একদল নেতা ও জনপ্রতিনিধির দুর্ব্যবহার, দুর্নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলে তিনি নিজের প্রতিবাদী স্বচ্ছতা বোঝাতে তৎপর।

কুড়ি বছর আগে তৈরি হওয়া তৃণমূলে এখন দ্বিতীয় প্রজন্মের উত্থান হয়েছে। এতে ভুল কিছু নেই। এই প্রসারণ বরং স্বাগত। কিন্তু সেই প্রজন্মের ‘মুখ’ যদি ক্ষমতার উৎসে পর্যবসিত হয়, দাপটের ঝাপটে যদি পুরনোদের কোণঠাসা হয়ে ‘অপমানিত’ হতে হয়, দলকে তার মূল্য চোকাতে হবেই। মমতা বুঝেছেন, লোকসভা ভোটে ধাক্কা এসেছে এখান থেকেও। তাই তাঁর আর-এক লড়াই হল, দলের অন্দরে ক্ষোভ প্রশমন এবং ভাঙন রোধ।

সন্দেহ নেই, বিজেপির প্রতি অনুরাগে যত না হোক, তৃণমূলের বর্তমান ‘উদ্ধত’ কতিপয় নেতা-আধানেতার তাড়না থেকে ‘মান’ বাঁচাতেও অনেকে প্রতিপক্ষের ঘরে ভিড় করছেন। তার প্রতিবিধান করতে মমতা পুরনোদের ‘মর্যাদা’ দেওয়ার ডাক দিয়েছেন। এটাও শক্ত সংগ্রাম। কারণ, দাঁড়িপাল্লায় চাপানো ‘বোঝা’ একদিকে হালকা করতে না-পারলে অন্যদিকে ভারসাম্য হবে না। নিজের ঘরে এ কঠিন পরীক্ষা।

আর হল জনবিচ্ছিন্নতা। সেখানেও ঘুরেফিরে একই সমস্যা। মমতা বলেছেন, দলকে পুলিশি ঘেরাটোপ ছেড়ে বিরোধী-চরিত্রে ফিরে গিয়ে মাঠে নামতে হবে। নেতাদের গ্রামে-গ্রামান্তরে গিয়ে খাটিয়ায় বসে অন্ন-পান ভাগ করে খেয়ে মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হতে হবে, বুঝতে হবে। বোঝাতে হবে, আমি তোমাদেরই।

একদম ঠিক। রাজা সোনার গদি ছেড়ে মাঠে হাওয়া খেতে নামলে মানুষ হয়তো তার নাগাল পেতে পারে! সত্যি বলতে কী, মুখ্যমন্ত্রী হয়েও মমতা তাঁর এই জনসংযোগ যৎপরোনাস্তি বজায় রাখার চেষ্টা করেন। তাঁর গাড়ির আগে-পিছে পুলিশ, পাইলট, সেপাইসান্ত্রীর হাঁকডাক মমতার ঘোরতর অপছন্দ। এক্ষেত্রে তিনি জ্যোতি বসু-বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও পিছনে ফেলে দিতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁরই দলের যাঁরা রাস্তার অর্ধেক জুড়ে নিরাপত্তা বলয় সাজান, চারদিকে সাজ সাজ রব তুলে এ পাড়া-ও পাড়া সফরে বেরোন, তাঁদের লাগাম পরানোটাও তো লড়াই-ই বটে! সেই লড়াই বিশ্বাসযোগ্য করে তোলাটাও এখনকার পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল নেত্রীর একটি চ্যালেঞ্জ।



একজনই শুধু...

অনেকে বলছেন, এবার পরিস্থিতি কঠিন বুঝে মমতা বিধানসভা ভোটকে পেশাদারি দক্ষতায় মোকাবিলা করার জন্য ভোট-কুশলী প্রশান্ত কিশোরকে ডেকে এনেছেন। তৃণমূল নেত্রীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাকে যে-উচ্চতায় দেখতে রাজ্যবাসী অভ্যস্ত, তাতে তাঁর পিছনে ভোট-কুশলী দাঁড়ালে সেটা হয়তো তাঁদের নজরে কিছুটা বেমানান লাগে। তবু এটা কোনও দোষের নয়। এই ধরনের পেশাদারি সহায়তা আজকের দিনে অন্য কোনও কোনও দল যদি নিতে পারে, মমতা নেবেন না কেন!

কিন্তু প্রশ্ন হল, নিজের দলের মুখচ্ছবি বদলাতে কার্যত দলের অন্দরে যেসব লড়াই মমতার লড়া দরকার, একজন ভোটকুশলী সেখানে কতদূর কী করতে পারেন? তাঁর ভূমিকা সেখানে কতটুকু? এ লড়াই তো একান্তভাবে মমতার। বলতে গেলে এটাই ‘শাসক’ মমতার ‘বিরোধী’ ভাবমূর্তি তুলে ধরার এক অভিনব পরীক্ষা। তাঁকে লোকসমক্ষে বিশ্বস্তভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে তিনি এখনও আগের মতোই দ্বিধাহীন।

বিজেপি রাজ্যে এখনও কোনও ‘সফল’ গণ-আন্দোলন সংগঠিত করতে পারেনি। যা করছে, তা মূলত আইনশৃঙ্খলা অবনতির লক্ষ্যে। তবু তাদের পক্ষে হাওয়া কিছু উঠলে সেটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাবের প্রতিফলন। কঠোর হাতে আগাছা সাফের লড়াইটা তাই মমতাকেই লড়তে হবে।

মনে আছে, ১৯৯৮ সালে লোকসভা ভোটে যে বার প্রথম তৃণমূল কংগ্রেস সাতটি আসন পেল, সেদিন ফল বেরনোর পরে অনেক রাতে মমতার বাড়ি গিয়েছিলাম। তাঁর ছোট্ট ঘরে বসে কথা বলছি। বাইরে কোলাহল কানে এল। মমতাও উৎকর্ণ। খবর এল, পাশের একটি জেলা থেকে ছেলের দল ম্যাটাডর বোঝাই হয়ে এসেছে তাদের নেত্রীর কাছে।

সারা দিনের ক্লান্তি। মমতা বলে পাঠালেন, পরের দিন সকালে দেখা করবেন। যুবকেরা নাছোড়বান্দা। কাতর অনুনয় শোনা গেল, ‘‘আমাদের ভগবানকে না দেখেই চলে যাব!’’

মমতা ঘরে থাকতে পারেননি। বেরিয়ে এসেছিলেন সামনের একফালি বারান্দায়। ছেলের দল উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। মমতা বললেন, ‘‘ওরে, এখনই এমন করিস না। এই তো লড়াই শুরু। আরও অনেক দূর যেতে হবে। অনেক লড়াই বাকি।’’

বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় বসতে মমতাকে লড়তে হয়েছিল তিন দশক। এখন আরও একবার সেই ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁকে ‘বিরোধী’ হতে হচ্ছে! যেটা আরও কঠিন।

রাজনীতির গতি সদাই পরিবর্তনশীল। দু’বছর লম্বা সময়। যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে এবং ঠিক সময়ে ভোট হয়, তা হলে মমতা এই অন্তর্বর্তী সময়কাল হাতে পেয়ে যাবেন। শেষ কথা কেউ বলতে পারে না। তবে এটা সত্যি, মানুষ একটি পরিবর্তনের সংকেত দিয়েছেন। সেটা শাসকপক্ষকে নিজেদের বদলানোর ‘সুযোগ’ দেওয়া, নাকি গোটাটাই বদলে দেওয়া, তার অনেকটাই নির্ভর করছে মমতার ওপর। এবং এক বিচিত্র রসায়নে ‘শাসক’ মমতার সাফল্য এক্ষেত্রে ‘বিরোধী’ মমতার ওপর নির্ভরশীল।

নিজের হাতে ‘শাসক’কে নির্দয় আঘাত করে ‘বিরোধী’কে জেতানোর এই লড়াইতে তিনি শেষ হাসি হাসতে পারবেন কি না, বলবে ভবিষ্যৎ।



সাংসারিক

ইন্দ্রনীল সান্যাল

রবিবারের খবরের কাগজের শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের যে কী শক্তি, সেটা একটা বিজ্ঞাপন দিয়েই বুঝেছে রিমা। যতীনদা মারা যাওয়ার পরে এর-তার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে বাড়িতে একের পর এক কাজের লোক আসছিল। কেউ একবেলা কাজ করবে, কেউ দু'বেলা— কিন্তু রাতে থাকতে রাজি নয়। এদিকে রিমার ডানলপের ফ্ল্যাটে সারাক্ষণের কাজের লোক ছাড়া চলবে না। সে চাকরি করে, বর শুভেন্দু চাকরি করে, একমাত্র ছেলে ঋষভের ক্লাস নাইন। টিউশনি আর ইশকুলের চক্করে ছেলেটা সারা দিন বাইরে। ফ্ল্যাটে আশি বছরের শাশুড়ি সুজাতা। তাঁর পাশে একজন লোক না রেখে অফিস বেরিয়ে যাওয়া রিমার পছন্দ নয়। তার বাবা-মা কিছুদিন আগে, কয়েক মাসের ব্যবধানে মারা গেছেন। বাবার শেষ সময়ে পাশে তাও মা ছিলেন। মায়ের পাশে কেউ ছিল না। পচা গন্ধ পেয়ে প্রতিবেশীরা রিমাকে খবর দেয়। তারপর তো থানা-পুলিশ, সরকারি হাসপাতাল, ময়নাতদন্ত, হ্যানো ত্যানো...

যতীনদা থাকলে এইসব নিয়ে ভাবতে হত না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই হাতের কাছে বেড-টি পেয়ে দিন শুরু হত। রিমার জন্যে ইংরেজি খবরের কাগজ আর মারি বিস্কুট, শুভেন্দুর জন্যে বাংলা কাগজ আর টোস্ট বিস্কুট, সুজাতার জন্যে টিভিতে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান, ঋষভের জন্যে হেল্‌থ ড্রিঙ্ক আর হোম টাস্কের খাতা – কখনও কিছু বলে দিতে হয়নি। সপ্তাহের বিভিন্ন বারে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনারে কী পদ হবে, দিনে কতবার চা আর কফি হবে, সাপ্তাহিক বাজারে ক'পিস মাছ, কতটা মাংস, কী কী শাকসবজি আসবে— সব মুখস্থ। মায় মাসকাবারি বাজার নিয়েও ভাবতে হয়নি। ঋষভের বন্ধুরা এলে চিজ় স্যান্ডউইচ আর কোক, শুভেন্দুর বন্ধুরা এলে হুইস্কির বোতল আর সোডা, আত্মীয়স্বজন এলে মিষ্টি আর নোনতার প্লেট— রিমা বা শুভেন্দু মাথাই ঘামায়নি।

সুজাতার নিঃসঙ্গ দুপুরগুলো গল্পগুজবে ভরিয়ে রাখত যতীনদা। লোকটা মারা যাওয়ার পরে ফ্ল্যাটের সবাই কেঁদেছিল। সুজাতা সবচেয়ে বেশি কেঁদেছিলেন।

তিনি সত্যিই একলা হয়ে গেলেন।

সুজাতার একাকিত্বই রিমাকে ভাবাল বেশি। সে বুঝতে পারল, সুজাতা নয়, নিজের জীবনের শেষ ক'টা মাস বা বছরকে ভয় পাচ্ছে। সুজাতাকে সে দেখলে তাকেও কেউ দেখবে— হিন্দুধর্মের কর্মফলের তত্ত্ব মেনেই কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা মনে হয়েছিল।

তবে সে কথা তো আর শুভেন্দু জানে না! রবিবার দেরি করে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজে চোখ বোলানোর সময় রিমার প্রস্তাব শুনে আঁতকে উঠে বলল, "ঝি-চাকরের জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন? অ্যাডের জন্যে কত টাকা নেয় জানো? এখন আবার শব্দ প্রতি নয়, ক্যারেক্টার প্রতি টাকা।"

শুভেন্দু চাকরি করে বিদ্যুৎদপ্তরে। রিমা প্রাইভেট ব্যাঙ্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। টাকার অভাব এই পরিবারে কোনওকালেই নেই। বরের কিপটেমির সঙ্গে 'দেখেশুনে বিয়ে'-র পর থেকেই পরিচিত রিমা। সে সুজাতার জন্যে ভেজিটেবল স্ট্যু বানাতে বানাতে বলল, "তোমার বা বিজ্ঞাপনের ক্যারেক্টার নিয়ে আমি চিন্তিত নই। টাকা আমিই দেব। তুমি বয়ানটা লিখে দাও। একটা জিনিস মাথায় রেখো। ছেলে নয়, মেয়ে কাজের লোক চাই। সবাই যতীনদা হয় না।"

খবরের কাগজ রেখে মোবাইল হাতে নিয়ে একটা বয়ান লিখে ফেলল শুভেন্দু। 'চারজনের পরিবারে সারাক্ষণ থেকে কাজ করার জন্যে পিছুটানহীন মহিলা চাই।' সঙ্গে মোবাইল নম্বর।

সামান্য অদলবদল করে এই ম্যাটারই খবরের কাগজে দিয়েছিল। পরের রোববার ভোর ছ'টা থেকে রিমার মোবাইল ফোন সেই যে বাজতে শুরু করল, থামল সোমবার বিকেলে। একটা ফোনালাপের মধ্যে তিনটে মিস্‌ড কল হচ্ছে। সেই নম্বরগুলোয় রিং ব্যাক করতে গিয়ে আরও পাঁচটা মিস্‌ড কল। এত ফোন সারা জীবনে করেনি বা ধরেনি রিমা। গোটা পঁচিশ ফোন ধরার পরে ঠেকে শিখল সে। রাইটিং প্যাডে মোবাইল নম্বর আর নাম লিখতে শুরু করল। সেই সঙ্গে ঠিকানা, কত মাইনে, কী কী কাজ করতে হবে, তার ফিরিস্তি। বিজ্ঞাপনে পরিষ্কার করে লিখে দেওয়া সত্ত্বেও অনেক পুরুষমানুষ ফোন করেছিল। ফোন এসেছিল পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে। অশিক্ষিত থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, সতেরো বছরের ছেলে থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধ—রেঞ্জ দেখলে মাথাখারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। দাবির বৈচিত্র শুনেও পিলে চমকে যায়। মুর্শিদাবাদের এক বিপত্নীক বলল, "আমার কোনও চাহিদা নেই। দু'বেলা খাবার আর মাথার ওপরে ছাদ হলেই হল।" বসিরহাটের এক কিশোরের দাবি কুড়ি হাজার টাকা মাস মাইনে আর নতুন স্মার্টফোন। এক যুবক তার মায়ের অপারেশনের জন্যে দু'লাখ টাকা চেয়ে বসল। পরের পাঁচ বছর নাকি তাকে আর কিছু দিতে হবে না।

রিমার রাইটিং প্যাড থেকে সব তথ্য এক্সেল স্প্রেড শিটে ফেলল শুভেন্দু। প্রিন্টআউট নিতেই একশো সাতাত্তর জনের তালিকা একনজরে দেখা যাচ্ছে। সব দিক বিচার করে সেমি-ফাইনালে গেল সাতটি মেয়ে।

দ্বিতীয় দফার টেলিফোন ইন্টারভিউ এবং একবার সাক্ষাতের পর, 'দ্য অ্যাওয়ার্ড গোজ় টু খুশি মাইতি ফ্রম শ্যামপুর!'

॥ ২ ॥

বছর চল্লিশেকের খুশির বাড়িতে বর আর দুটো বাচ্চা আছে শুনে প্রথম সাক্ষাতে পিছিয়ে গিয়েছিল রিমা। বিরক্ত হয়ে বলেছিল, "বিজ্ঞাপনে লেখা আছে 'পিছুটানহীন'। ওই কথাটার মানে বোঝো? ওর মানে হল, যার বাড়ি ফেরার চাহিদা নেই। তুমি তো বর আর বাচ্চার জন্যে ফি উইকে বাড়ি যাবে। তোমায় কেন রাখব?"

"আমার বর পলিটিক্স করে বলে অন্য পার্টির লোকেরা মেরে হাত-পা ভেঙে দিয়েছে। আমাকে রেপ করার ভয় দেখিয়েছে," হাউমাউ করে বলেছিল খুশি, "আমার বরই কাজ করতে পাঠাল। রোজগারও হবে, গেরাম থেকে দূরে থাকাও হবে। আমি বাড়ি যাব না দিদি। আমার যাওয়ার উপায় নেই কো।"

সেই রাতে খুশিকে সুজাতার শোওয়ার ঘরের মেঝেতে বিছানা করে শুতে দিয়ে শুভেন্দু আর রিমা মিলে ম্যারাথন মিটিংয়ের পরে ঠিক করল, একে রাখা হবে। বিপক্ষে অনেক যুক্তি থাকলেও মেয়েটার হাতেগড়া নরম রুটি আর কম তেল-মশলা দেওয়া মুরগির ঝোল সুজাতার পছন্দ হয়েছে। সুতরাং...

পরের দিনই গাড়ি নিয়ে বেরোল শুভেন্দু। সঙ্গী বলতে রিমা, ঋষভ আর খুশি। গাদিয়াড়া বেড়াতে যাওয়ার ছুতোয় খুশির গ্রাম এবং বাড়ি দেখে আসা হল। আলাপ হল ওর বর আর দুই বাচ্চার সঙ্গে। ডানলপের ফ্ল্যাটে ফিরে খুশির আধার কার্ড আর ভোটার কার্ডের ফোটোকপি স্থানীয় থানায় জমা দিয়ে এল রিমা। আজকাল কাউকেই বিশ্বাস নেই। রিমা তো নিজেকেও বিশ্বাস করে না। সেই জন্যেই বাড়ির মধ্যে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছে। অফিস থেকে মোবাইলে দেখা যায় কোন ঘরে কী হচ্ছে।

খুশি পাকা গৃহিণী। সে তিনদিনের মধ্যে বুঝে গেল এই বাড়ির সবার রুটিন। এবং সেইমতো সংসার সাজিয়ে নিল।

রিমা আর শুভেন্দু ঘুম থেকে ওঠে সকাল সাতটায়। উঠেই তাদের বেড-টি চাই। সরকারি কর্মচারী শুভেন্দু চায়ের কাপ আর খবরের কাগজ নিয়ে সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে কাটিয়ে দেয়। প্রাইভেট ব্যাঙ্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রিমা এক কাপ চা খেয়ে ঢুকে যায় বাথরুমে। আটটার মধ্যে অফিস যাওয়ার জন্যে রেডি।

রিমার জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে ফেলতে হয় পৌনে আটটার মধ্যে। শুভেন্দু আর ঋষভ ন'টার সময়ে বেরোয়। ওরা যাওয়ার পরে খুশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে সুজাতাকে নিয়ে। প্রাতঃকৃত্যের সময় সাহায্য করতে না হলেও স্নান করার সময় পাশে থাকতে হয়। এই বয়সে পড়ে গেলে কোমরের হাড় ভাঙবে। তখন আবার হাজার ঝামেলা।

অফিসে বসে মোবাইলে সবকিছু দেখতে পাচ্ছে রিমা। সুজাতাকে খাইয়ে, যত্ন করে বারান্দার আরামকেদারায় বসিয়ে আবার রান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে খুশি। রান্নার ফাঁকেই চায়ে চুমুক দিচ্ছে, পাউরুটি আর আলুর তরকারি দিয়ে জলখাবার সেরে নিচ্ছে। দুপুর আর রাতের রান্না একসঙ্গে সেরে ফ্ল্যাট সাফাই আর কাপড় কাচাকুচি শুরু করে দিল।

সে সব চুকতে চুকতে দুপুর একটা। ততক্ষণে সুজাতার দুপুরে খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তাঁকে খাইয়ে, বিছানায় শুইয়ে স্নান সেরে নেয় খুশি। দুপুরে খেয়ে দু'ঘণ্টার বিশ্রাম। বিকেল চারটের সময় ঋষভ ফিরে আসে। এদিকে-ওদিকে জামাকাপড় ছুড়ে, স্কুলব্যাগ চেয়ারে রেখে, জুতো পরেই বিছানায় শুয়ে পড়ে।

অনেক তোতাই-পাতাই করে ঋষভকে তোলে খুশি। বিকেলের খাবার মুখে পুরে দিতে হয়, জোর-জবরদস্তি ইউনিফর্ম খোলাতে হয়, পোশাক বদলাতে সাহায্য করতে হয়, টিউশনি পাঠাতে হয়। কবে, কোথায়, কখন পড়তে যাবে এবং ক'টার সময় ফিরে আসবে— সব মুখস্থ খুশির।

সন্ধে সাতটা নাগাদ ফেরে শুভেন্দু। আটটায় রিমা। সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে ঋষভ। ফ্ল্যাটে আবার চার সদস্য আর একজন কাজের লোক। আড্ডা, চায়ের সঙ্গে টা, পিএনপিসি, টিভির মেগা সিরিয়াল দেখতে দেখতে গালাগালি, নিউজ় চ্যানেল দেখে তার চেয়েও বেশি গালাগালি— এই সব করতে করতে রাতের খাওয়ার সময় হয়ে যায়। ডিনার সেরে, মুখ ধুয়ে শুতে যাওয়ার সময় রিমা দেখে, খুশি খেতে বসেছে। রাতের বাসন মেজে সুজাতার ঘরের মেঝেয় শুয়ে পড়বে। ঘড়িতে রাত সাড়ে দশটা।

পছন্দসই কাজের লোক পাওয়ার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে রিমা।

॥ ৩ ॥

সমস্যাটা এল খুশি কাজে যোগ দেওয়ার তিন মাস পরে। এবং এসেই সবকিছু তছনছ করে দিল। অফিস থেকে ফিরে সুজাতার কাছ থেকে রিমা জানল, খুশি দুপুরবেলা ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেছে। সুজাতার ভাষায়, "ওর মোবাইলে ফোন এল। কী গুজুরগুজুর ফুসুরফুসুর হল জানি না। আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি গেরামে যাচ্ছি। পরশু চলে আসব। আপনি দিদিভাইকে বলে দেবেন।' তারপরে ব্যাগ গুছিয়ে ভাগলবা হল।"

খুশি আসার এক মাস পর থেকেই মোবাইলের মাধ্যমে আর নজরদারি ক্যামেরায় চোখ রাখে না রিমা। আজ বাধ্য হয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে রিমোট হাতে নিল। মোবাইলে নয়, আজ সে মনিটরে ফুটেজ দেখবে।

আড়াইটে নাগাদ খুশির মোবাইলে ফোন আসা থেকে পৌনে তিনটেয় বেরিয়ে যাওয়া —সবটাই আছে। খুব খুঁটিয়ে, বারচারেক ফুটেজ দেখে রিমা বুঝল, খুশি চুরিচামারি করেনি। নিজের ঝোলা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেছে।

কিন্তু খুশি রিমাকে ফোন না করে বাড়ি গেল কেন? প্রশ্নটা ভাবাচ্ছে। বিরক্ত এবং কৌতূহলী রিমা খুশির মোবাইলে ফোন করল। ওকে মোবাইলে পাওয়া যাবে কি? মনে তো হয় না। দেখা যাক!

ওপাশ থেকে যন্ত্রমানবী বলছে, "আপনি যাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছেন, তাঁর মোবাইল সুইচ্ড অফ আছে।"

নেকু! যন্ত্রমানবীকে ভ্যাঙায় রিমা। তা হলে সে ঠিকই ভেবেছিল। খুশির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যাবে না। এবার কী হবে?

সেদিন শুভেন্দু অসুস্থ সহকর্মীকে দেখতে নার্সিং হোম গিয়েছিল। ফ্ল্যাটে দেরি করে ফিরে দেখল ধুন্ধুমার বেঁধেছে। সুজাতার বিকেলে চা জোটেনি বলে বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। ডামাডোলের বাজারে ঋষভ টিউশনি যায়নি। বাড়িতেও পড়াশোনা করছে না। সুজাতার খাটে শুয়ে রিমার স্মার্টফোনে ভিডিও গেম খেলছে। অফিস থেকে ফিরে রান্না করতে হচ্ছে বলে রিমার মেজাজ গরম। ছেলের ত্যাঁদড়ামি দেখে তেড়ে চেঁচাচ্ছে। এক ঘা দিয়েও এল। ঋষভ স্মার্টফোন রেখে দুপদাপ করে নিজের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। সেটা দেখে আরও রেগে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মারছে রিমা আর চ্যাঁচাচ্ছে, "খোল দরজা! আজ তোর একদিন কি আমার এক দিন!"

নাতিকে বকুনি দেওয়া সুজাতার পছন্দ নয়। তিনি বললেন, "শুভেন্দুকে মানুষ করার জন্যে তো আমাকে মারধোর করতে হয়নি। তুমি কেমন মা?"

ব্যস! তাক ধিনাধিন লেগে গেল শাশুড়ি আর বউমার মধ্যে। টিভির মেগা সিরিয়ালেও তখন একই জিনিস দেখাচ্ছে।

হোম ফ্রন্টের পরিস্থিতি আঁচ করতে পাঁচ মিনিট নিল শুভেন্দু। সিচুয়েশন হাতের বাইরে যাওয়ার আগেই রান্নাঘরের দখল নিল। ফুড ডেলিভারি অ্যাপ থেকে ডিনার অর্ডার করলে ঝামেলা কম হত। কিন্তু আজ রাতে সেটা করলে অশান্তি বাড়বে। এখন একটু কাজ দেখাতে হবে। না হলে অংশত মেঘলা আকাশ থেকে বজ্রবিদ্যুৎসহ ভারী এবং অতি ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

ফ্রিজ খুলে যা সবজি পেল, সেগুলো টুকরো করে কেটে, মুরগির টুকরো আর খানিকটা চাল দিয়ে সেদ্ধ করে নিল। তারপর পেঁয়াজ-রসুন আর আদা-লঙ্কা বাটা দিয়ে সামান্য তেলে কষে নেওয়া। ব্যস! হয়ে গেল 'ওয়ান পট রেসিপি'। সুস্বাদু খাবার খেয়ে সবার মুখে হাসি। নিজের কপাল আর ইউটিউবকে ধন্যবাদ দেয় শুভেন্দু।

রাতে শুয়ে রিমা বলল, "ফোনে যখন পাচ্ছি না, তখন ওর বাড়ি থেকে ঘুরে আসা উচিত।"

"অফিস কামাই করবে?"

"আমার অফিস কামাই করার উপায় নেই। তুমি যাবে খুশির বাড়ি। করো তো সরকারি চাকরি!" গম্ভীর গলায় বলে রিমা।

অকারণে অপমানিত হয়ে শুভেন্দু ভাবে, "তোমার বাপ-মা ওই 'স:চা:' বিশেষণ দেখেই আমাকে পছন্দ করেছিলেন। তোমার চাকরি আজ আছে তো কাল নেই। আমাদের ওরকম নয়।"

কিন্তু এই সব কথা কি আর বলা যায়? অশান্তি তাতে বাড়বে বই কমবে না! পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে শুভেন্দু।

পরদিন সকালে অফিস কামাই করে শুভেন্দুই গেল যমের দক্ষিণ দুয়ারে। ঘুম থেকে উঠে বাড়িতে এক কাপ চা-ও জুটল না। ডানলপের ওপর দিয়ে দিঘাগামী সরকারি বাস যায়। সেই বাসে উঠে পড়ল সকাল সাড়ে আটটায়। দশটার সময়ে ছ'নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে, বাগনান স্টপে নেমে পরপর দু'ভাঁড় চা খেয়ে আগে ঘুম তাড়াল। তারপরে একটা ভ্যানোতে উঠল। গন্তব্য শ্যামপুর।

শুভেন্দু গাড়ি নিয়ে আসতে চেয়েছিল। রিমা রাজি হয়নি। বলেছে, "অত দূরে আমি তোমাকে ড্রাইভ করে যেতে দেব না।"

শুভেন্দু আবারও কিছু বলার সুযোগ পায়নি। মনে-মনে বলছে, "তিন মাস আগে যখন খুশির বাড়ি খুঁজতে যাওয়া হয়েছিল, তখন এই শর্মাই ড্রাইভ করেছিল। তখন আমাকে নিয়ে তোমার কোনও টেনশন হয়নি। আসল কথা হল, আজ আমি গাড়ি নিয়ে বেরোলে তোমাকে বাসে চেপে অফিস যেতে হত। প্রাইভেট ব্যাঙ্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের তাতে গায়ে ফোসকা পড়ে যেত!"

এইসব কথা বলতে নেই। তা হলে সংসার ভেঙে যায়। চিড়বিড়ে গরমে ভ্যানোয় বসে টিকির-টিকির করে যেতে যেতে শুভেন্দু ভাবল, "আমি লং ড্রাইভের জন্যে সেন্টার থেকে ভাড়া করা ড্রাইভার নাকি? যাকে ঘণ্টাপিছু টাকা দিতে হয়?"

॥ ৪ ॥

শ্যামপুরে পৌঁছে খুশির পড়শিদের কাছ থেকে শুভেন্দু জানতে পারল, রাজনৈতিক গন্ডগোলের জন্যে খুশির বর আর দুই বাচ্চা গ্রাম থেকে ভাগলবা হয়েছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। খুশিকে গ্রামের লোক 'কলকেতা' থেকে ফিরে আসতে দেখেনি।

সত্যি বলল না মিথ্যে, বোঝা শক্ত! শুভেন্দু কী আর করে! ফেরার বাস ধরার আগে বাগনান থানায় টুঁ মারল। সাব ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক শুভেন্দুর কথা অর্ধেক শুনেই বললেন, "আপনার ফ্ল্যাট থেকে কিছু চুরি হয়েছে?"

"না।"

"যদি হত, তা হলে আপনাকে বরাহনগর থানায় এফআইআর করতে হত। তাই না?"

সত্যি কথা। চুপ করে থাকে শুভেন্দু।

"খুশি মাইতিকে পাওয়া যাচ্ছে না, এই মর্মে আপনি আমার থানায় 'মিসিং পারসন্স ডায়েরি' করতে পারেন। সেটা আপনি করতে চান কি?"

"না!" ঘাড় নাড়ল শুভেন্দু। কে আর রাজনৈতিক ঝামেলার মধ্যে ঢুকে হারাকিরি করতে চায়? তাও আবার ঝিয়ের জন্যে! শুভেন্দু ভাবল, এসআইকে বলে, "আমাকে একটা কাজের লোক জোগাড় করে দিন। তা হলেই আর বিরক্ত করব না।"

কিন্তু এসব কথা বলা যায় না। বাধ্য হয়ে থানা থেকে বেরোল শুভেন্দু। আবার এই কড়া রোদের মধ্যে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকা! আবার বাসে চেপে এতটা পথ যাওয়া! সকাল থেকে পেটে দু'কাপ চা ছাড়া কিছু পড়েনি। সে এবার মরেই যাবে! উহ! মা গো!

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে। ফ্ল্যাটে ঢোকামাত্র শুভেন্দুর সঙ্গে রিমার ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। তার কারণ সুজাতা। তিনি বিকেলবেলা বিছানায় পটি করে ফেলেছেন। রিমার বক্তব্য, "এগুলো বুড়ির বদমায়েশি!"

শ্বাশুড়ি-বউ ইস্যুতে শুভেন্দু সবসময় চুপ করে থাকে। বাড়িতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যে এটা তার 'গোল্ডেন রুল'। কিন্তু আজ

আর পারল না। গরমে, খিদেয়, পরিশ্রমে মাথা কাজ করছে না। ফট করে বলে বসল, "তোমার মাথাফাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কেউ কখনও ইচ্ছে করে বিছানায় পায়খানা করে?"

ব্যস! আর যায় কোথায়! সদ্য অফিস থেকে ফিরে কাপড় কাচতে বসা রিমা চিল চিৎকার শুরু করে দিল! পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীদের কথা বাদ দেওয়া যাক। তারা তো শুনতে পাচ্ছেই! পুরো অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স, মায় আশপাশের বাড়ির লোকেরাও জানতে পারল যে, শুভেন্দু এখন বউয়ের কাছে ধাতানি খাচ্ছে। যে যন্ত্রমানবী বরাহনগর স্টেশনে মাইকে ঘোষণা করে যে, আজ ডানকুনি লোকাল দেরিতে আসছে, সে পর্যন্ত ভয়ের চোটে চুপ করে গেছে।

নেহাত আইন মেয়েদের পক্ষে, মনে মনে গজরায় শুভেন্দু, না হলে এখনই দু'ঘা কষিয়ে দিতাম!

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ রিমাকে গালাগালি দেওয়ার পরে মাথা ঠান্ডা হল শুভেন্দুর। এইবার সুজাতাকে নিয়ে পড়ল। মা কতক্ষণ ধরে গু-মুত মেখে পড়ে রয়েছেন কে জানে!

সুজাতা বিছানায় শুয়ে ফিঁচফিঁচ করে কাঁদছিলেন। ছেলেকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, "আমাকে তোরা বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আয়। যদি টাকা কম পড়ে, তা হলে ডানলপের মোড়ে ভ্যাটের পাশে বসিয়ে রেখে আয়। আমি ভিক্ষে করে খাব। কিন্তু এই অশান্তি আমার আর সহ্য হয় না।"

সুজাতার ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিংয়ের উত্তর না দিয়ে তাঁকে বিছানা থেকে তুলতে গিয়ে শুভেন্দু দেখে, বিছানা সাফসুতরো। মায়ের পরনে নতুন ম্যাক্সি।

সারা দিন অফিসে খাটাখাটনি করে এসে রিমাকে গু-মুত ঘাঁটতে হয়েছে। আর এখন বসেছে নোংরা বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়াড় কাচতে। সেই জন্যে বিবির এত রাগ!

রিমার জন্যে খারাপ লাগল শুভেন্দুর। বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমেরিকা-ইংল্যান্ডে যারা থাকে, তাদের বাড়িতে ঝি-চাকর থাকে না। ওরা কীভাবে চালায় বলো তো?"

"ওরা নিজের কাজ নিজে করে। তা ছাড়া ওদের দেশে শিল্পবিপ্লব হয়েছে বলে অনেক গ্যাজেট পাওয়া যায়। ওদের লাইফস্টাইল যন্ত্রনির্ভর।"

"সে সব গ্যাজেট এখানেও পাওয়া যায়।"

"সেগুলো ইউজ় করার মানসিকতা আমাদের নেই। ওয়াশিং মেশিন বা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালানোর জন্যে আমাদের ঝি লাগে। তা ছাড়া ওদের দেশে বাবা-মা'রা ছেলেপুলের সঙ্গে থাকেন না। ছেলেমেয়েরাও সেয়ানা হলে বাড়ি ছাড়ে। ছোট পরিবার চালিয়ে নেওয়া যায়। আমার এক বন্ধু নেদারল্যান্ডসে আছে। ও সকালবেলা দুধ কর্নফ্লেক্স খেয়ে বেরোয়, একশো কিলোমিটার ড্রাইভ করে অফিসে পৌঁছয়। লাঞ্চে বার্গার আর কোলা খায়। রাতে ফিরে কী দিয়ে জাবর কাটে যিশু জানেন। তুমি পারবে এই ভাবে দিনের পর দিন চালাতে?"

নিমেষের মধ্যে রিমার ওপরে রাগটা ফেরত চলে এল শুভেন্দুর। ঝি-চাকরের প্রসঙ্গ থেকে একেবারে শিল্পবিপ্লবে চলে গেল? ব্যাঙ্কার বউয়ের বদলে একটা ঝিকে বিয়ে করলে অনেক ভাল হত শালা! রাগে গজগজ করতে করতে ঋষভের ঘরে উঁকি মারে শুভেন্দু। দেখে, ঋষভ স্মার্টফোনের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে বসে আছে।

সারা দিনে মাথার মধ্যে যত রাগ মাথার মধ্যে জমছিল, তা এবার আগ্নেয়গিরির লাভার মতো ছিটকে বেরোল। ঋষভের গালে সপাটে থাপ্পড় কষিয়ে শুভেন্দু চেঁচাল, "এই ভিডিও গেম একদিন তোকে খাবে!"

বাবার চড় খেয়ে হাউমাউ করে উঠেছে ঋষভ, "আমাকে মারলে কেন? মা-ই তো বলল, মাসকাবারির অর্ডারটা অনলাইনে সেরে ফেলতে। তা হলে আর বাজার যাওয়ার ঝামেলা থাকবে না!"

চিৎকার শুনে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে রিমা। দু'হাতে একগাদা ভিজে কাপড়। ছাদে সেগুলো মেলতে যাওয়ার আগে বলল, "তুমি ছেলের গায়ে হাত তুলেছ? এর পরে তো আমার গায়ে তুলবে!"

"তুলবই তো!" বিকট জোরে চেঁচিয়ে ওঠে শুভেন্দু, "দিনরাত এই অশান্তি আমার আর ভাল লাগছে না," দেওয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে সে বলতে থাকে, "আমার... আর... ভাল... লাগছে... নাআআ!"

শুভেন্দুর পাগলামি দেখে ভয়ের চোটে ঋষভ কেঁদে ফেলেছে।

সুজাতা বিছানা থেকে চিৎকার করছেন, "কী হল বউমা? আমার ছেলেটার কী হল?"

রিমা দাঁতে দাঁত চেপে বলছে, "আমি এখনই উকিলের কাছে যাচ্ছি। তোমার মতো খুনে লোকের সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। আমি ডিভোর্স চাই!"

ঠিক এই সময়ে ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠল।

নিমেষের মধ্যে বাড়ির সবাই চুপ। রিমার প্রথমেই মনে হল, চিৎকার শুনে পাশের ফ্ল্যাট থেকে কেউ আসেনি তো? তা হলে মানসম্মান বলে আর কিছু থাকবে না। নাকি পাড়ার কেউ এল? সামনে কোনও পুজোফুজো আছে নাকি? চাঁদা দিতে হবে?

আবার কলিং বেল বাজল। রিমা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আমার দু'হাতে ভিজে কাপড়। কেউ একজন দরজাটা খুলে দাও।"

ইঙ্গিত বুঝে ঋষভ পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সে কিছুতেই উঠবে না। শুভেন্দু কী করবে বুঝতে না পেরে চিৎকার করল, "মা! দরজাটা খুলে দাও না! সারা দিন কেন শুয়ে থাকো? এরকম করলে সারা শরীরে জং ধরে যাবে।"

ছেলের কাছ থেকে ধমক খেয়ে কোনওরকমে বিছানা ছেড়ে উঠেছেন সুজাতা। কী সব বিড়বিড় করে বকছেন আর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছেন।

কলিং বেল তৃতীয়বারের জন্যে বেজে উঠল।

॥ ৫ ॥

আজ ব্রেকফাস্টে উপ্‌মা হয়েছে। রিমা খেয়ে নিল পৌনে আটটার মধ্যে। শুভেন্দু আর ঋষভ তখনও বিছানায় গড়াচ্ছে। সুজাতা টিভিতে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান দেখছেন।

রিমা অফিস বেরনোর আগে ঋষভকে বলল, "সারা সকাল বিছানায় না গড়িয়ে একটু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ় করলে তো পারিস! দিনরাত জাঙ্ক ফুড খেয়ে তোর ভুঁড়িটা বাবার মতো হয়ে যাচ্ছে!"

ঋষভ ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "বাবা তো জাঙ্ক ফুড খায় না। বাবার কেন ভুঁড়ি হচ্ছে?"

"সেটা তোর বাবার এক গেলাসের বন্ধুদের জিজ্ঞাসা কর!" খোঁচা দেয় রিমা। ঋষভ লজ্জায় বাবার কোলে মুখ লুকোয়।

রিমা আর শুভেন্দু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। যাক বাবা! সংসারে খুশি ফিরে এসেছে।

শিল্পী: দীপঙ্কর ভৌমিক

উ প ন্যা স

ভালবাসার দুই দিশা

সিজার বাগচী





তিহরি লেকে নৌকো চড়তে গিয়ে আহির দেখতে পেল আত্রেয়ীকে। তবে আত্রেয়ী একা নয়। দলে আরও তিনটে মেয়ে রয়েছে। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, চারজনের একটা দল এসেছে। সেই চারজনের মধ্যে আলাদা করে চোখ পড়ছিল আত্রেয়ীর উপর। ছিপছিপে ফিগার। মাথাটা একটু তুলে হাঁটছে। রাজহাঁসের মতো গ্রীবাভঙ্গি। তবে কলেজে থাকতে যে কোমর পর্যন্ত চুল ছিল, তা আর নেই। এখন আত্রেয়ীর ঘন চুল কাঁধ ছাপিয়ে পিঠের খানিকটা নেমেই থমকে গিয়েছে। অনেকটা জমে যাওয়া হিমবাহের মতো। তবু তাতে আত্রেয়ীকে খারাপ লাগছে না।

আহির অপলক চেয়ে থাকল। কতদিন বাদে দেখছে আত্রেয়ীকে? শেষবার দেখেছিল এলিয়ট পার্কে। তুমুল ঝগড়া হচ্ছিল তখন। আহিরই করছিল সেই ঝগড়া। আত্রেয়ী চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ভাবটা এমন ছিল, আহিরের ঝগড়া থামলে ও মেট্রো স্টেশনের দিকে এগোবে। সেটা কত বছর আগের ঘটনা? পাঁচ বছর তো হবেই। তারপর আর আত্রেয়ীর কোনও খোঁজ রাখেনি আহির। পাঁচ বছর বাদে আত্রেয়ীকে দেখতে পেল কলকাতা থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরে তিহরি লেকে ঘুরতে এসে।

আহির হতবাক হয়ে দেখছিল আত্রেয়ীকে। হঠাৎ পিছন থেকে সঞ্জয় খোঁচা মারল। বলল, "সামনে বিয়ে। ওইভাবে হাঁ করে মেয়ে দেখিস না। মেয়েগুলো আবার বাঙালি। বরং এগিয়ে চল। ফালতু দেরি হচ্ছে। মুসৌরি ফিরতে অনেক সময় লাগবে।"

আহির সামলে নিল নিজেকে। সঞ্জয় অফিস কলিগ। ওর কলেজ জীবন সম্পর্কে কিছুই প্রায় জানে না। আত্রেয়ীর কথা তো নয়ই। অতএব সঞ্জয়কে কিছু টের পেতে না দিয়ে আহির এগিয়ে গেল। গাড়িতে আসতে-আসতে ড্রাইভার অনেক কথা শুনিয়েছে এই লেক সম্পর্কে। এখানে মাছ-ভাত পাওয়া যায়। আহিররা এসে আগে সেই মাছ-ভাত খেয়েছে। তারপর এই লেকে এসেছে। লেক তো নয়, তিহরি একটা বিরাট বড় বাঁধ। তার সবুজ জলে বোটিংয়ের ব্যবস্থা। স্পিড বোট আছে। মোটর বোট আছে। আহির স্পিড বোটে চড়তে চেয়েছিল। সঞ্জয় রাজি হয়নি। বলেছে, "তোর কি মাথা খারাপ! এখানে বোট একবার উলটে গেলে স্রেফ তলিয়ে যাবি।"

"আমি সাঁতার জানি।"

"তুই জানিস। আমি তো জানি না। আমার জল দেখলে খুব ভয় করে। এত দূরে এসেছি টাকা খরচ করে। বোটে না চাপলে পুরোটাই লোকসান। তাই রাজি হয়েছি। ফালতু ঝামেলা বাড়াস না।"

অগত্যা আহির আর বাধা দেয়নি। সঞ্জয়ই টিকিট কেটেছে। এখন বাঁধানো চত্বর ছেড়ে ওরা ঢালু রাস্তা দিয়ে নীচে নেমেছে। এখানে ভাসমান জেটি। সেটা প্রায়ই দোলে। দু'জনে এসে সেই জেটির ধারে দাঁড়াতেই একটা অল্পবয়সি ছেলে দু'জনকে লাইফ জ্যাকেট এগিয়ে দিল। সেই জ্যাকেট পরল আহির এবং সঞ্জয়। ছেলেটাই হাত ধরে দু'জনকে জেঠিতে তুলল। নিয়ে চলল একটা মোটর বোটের দিকে। সেই বোটের কাছে গিয়ে নাড়া খেল আহির। বোটে ছ'টা সিট। চারটে জুড়ে বসে আছে আত্রেয়ীরা। পিছনের দুটো সিট ওদের।

আহির ভাবলেশহীন মুখে এক লাফে বোটে উঠে পড়ল। সঞ্জয় অবশ্য তা পারল না। ছেলেটা ধরে ওকে নৌকোয় তুলল। আহির আড় চোখে দেখল আত্রেয়ীকে। সামনের দিকে তাকিয়ে। আহিরদের দেখেছে বলে মনে হল না।

ছেলেটা এবার বোটে উঠে বসল। এবং মোটর বোট ছেড়ে দিল। ধীরে-ধীরে বোটটা ওদের নিয়ে চলল ওই গভীর জলের মাঝামাঝি। ইঞ্জিনের প্রবল শব্দ। তবু তার মধ্যে আহির শুনতে পেল ছেলেটা গাইডের ভঙ্গিতে বলছে, "এই যে লেক দেখছেন, এটা খুব গভীর। এর ভিতরে একটা জনবসতি ছিল। রাজপ্রাসাদ ছিল। এই জলের তলায় অনেক উঁচু-উঁচু পাহাড় রয়েছে। একটা পাহাড়ের চূড়ায় ঘণ্টাঘর ছিল। সব নিয়েই ডুবে গিয়েছে..."

আহির সব কথা শুনতে-শুনতে আত্রেয়ীর দিকে তাকাল। আত্রেয়ী এক চোখ দিয়ে প্রবল রোদটাকে আড়াল করে শুনছে ছেলেটার কথা। বাকিরাও তাই করছে। সঞ্জয় মোবাইলে খচাখচ ছবিও তুলছে। আহির একবার জলের দিকে

তাকাল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে দূরের দিকে তাকাল। শুধু কি এই তিহরি লেকই গভীর! ওর কিংবা আত্রেয়ীর মনের মধ্যেও কি এমনই এক জনবসতি ডুবে নেই? যদি না-ই থাকে, তা হলে আত্রেয়ী একবারও পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না কেন?

আচমকা আরও একটা ভাবনা ওর মনে এল। আত্রেয়ী আর দীপঙ্করের কি বিয়ে হয়েছে? ছেলেটার কথা শুনতে-শুনতে ও একবার জরিপ করল আত্রেয়ীকে। কিন্তু আত্রেয়ীর সিঁথিতে কিংবা হাতে কোনও বিয়ের চিহ্ন নেই। অবশ্য অনেকেই রাখে না আজকাল। তবু আত্রেয়ীকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে ওর বিয়ে হয়েছে। বিয়েটা আদৌ হয়েছিল তো?

মোটর বোটটা ক্রমশ এগিয়ে চলেছে অন্য পাড়ের দিকে। সেই পাড়ে কোনও জেটি নেই। জল যেখানে গিয়ে আছড়ে পড়ছে সেটা একটা খাড়াই টিলার গায়ে। ওই জায়গাটার দিকে তাকালেই কেমন বুক ছমছম করে ওঠে। একে অত গভীর জল। তার উপর সামনে অত বড় টিলা। কোনও লোকজন নেই। আচমকা নৌকো ডুবে গেলে কী হবে!

ছেলেটা কিন্তু থামেনি। আহির খেয়াল করল এবার মেয়েগুলো টুকটাক প্রশ্ন করছে। ছেলেটা তার জবাবে বলছে, "একদিনে এত বড় জায়গা জল ভরেনি। এখানকার জনবসতিকে পাহাড়ে উপরে নতুন জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর বহু বছর একটু-একটু করে জায়গাটা জলে ভরেছে। আমরাও ছোটবেলায় এসে দেখেছি পাহাড়ের চূড়াগুলো জেগে আছে।"

"তোমার বাড়ি কোথায়?" একটা মেয়ে প্রশ্ন করল।

"পাশেই। আমার বাবা-মা তো আগেও এই জায়গা চিনত। তখন তো এখানে লোকজন থাকত। এর পর বাবা-মা'র চোখের সামনেই জায়গা জলে ভরে গেল। তাই বাবা-মা এখন আর ভয়ে এদিকে আসে না। এই জল দেখলে তারা ভয় পেয়ে যায়।"

আত্রেয়ীও কি ভয় পেয়েছে? ছেলেটার কথায় হঠাৎ মনে হল আহিরে। তবে মেয়েদের দলের একজন প্রশ্ন করতেই আহিরের চোখ পড়ল বাকি দলের দিকে। এই তিনটে মেয়ে কারা? এই মেয়েগুলোর সঙ্গেই বা আত্রেয়ীর কী সম্পর্ক? আত্রেয়ী চিরদিনই একটু গুটিয়ে থাকা মেয়ে। সেই মেয়ে কেন এমন তিনটে মেয়ের সঙ্গে এত দূর এসেছে?

আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে অনিন্দিতার কথা মনে এল আহিরের। আর তিন মাস বাদেই আহিরের সঙ্গে অনিন্দিতার বিয়ে ঠিক হয়েছে। তার আগে সঞ্জয়ের উসকানিতেই ব্যাচেলার্স ট্রিপে এসেছে আহির আর সঞ্জয়। দু'জনে এক অফিসে চাকরি করে। তবে সঞ্জয় ব্যাচেলার নয়। ওর বিয়ে হয়েছে বছর দেড়েক হল। তবু সঞ্জয়ের মতে, দুটো ছেলে যখন এক ট্রিপে বেরিয়েছে, এটা ব্যাচেলার্স ট্রিপ না হয়ে যায় না।

আহিরের যে এই ট্রিপ নিয়ে বিরাট কোনও আগ্রহ ছিল তা নয়। সঞ্জয়ই যা করার করেছে। ফ্লাইটের টিকিট কাটা থেকে হোটেল বুকিং। আহিরকে বারবার সঞ্জয় বুঝিয়েছে, "একবার বিয়ে কর। তারপর বুঝবি আমি কেন তোকে দশদিনের এই ট্রিপে নিয়ে এসেছি।"

আহির কোনওদিন মুসৌরি আসেনি। বিয়ের পরও এখানে আসা হবে না। আগে থেকেই গোয়ার টিকিট কাটা। অনিন্দিতা সমুদ্র ভালবাসে। তাই আহির হনিমুনের জন্য গোয়াই বেছেছে। তাই বিয়ের আগে পাহাড়ে ঘুরতে আসার পরিকল্পনায় শেষ পর্যন্ত ও রাজিও হয়ে যায়। অনিন্দিতা যদিও একটু কিন্তু-কিন্তু করছিল। আসার আগেও কয়েকবার বলেছে, "তুমি কিন্তু সাবধানে ঘুরবে। আমি ফোন করলেই ধরবে। কী দরকার ছিল বলো তো এখনই পাহাড়ে যাওয়ার! তাও সিকিম কিংবা নর্থ বেঙ্গল হলেও হত। যদি কোনও বিপদ হয়..."

"আরে ধুর! বিপদ আবার কী?" আহির উড়িয়ে দিয়েছে অনিন্দিতার দুশ্চিন্তা।

এখানে ওরা গতকালই এসে পৌঁছেছে। শীতকালে কোনওদিন পাহাড়ে ঘোরেনি আহির। এখানে আসার আগে ভেবেছিল খুব ঠান্ডা হবে নিশ্চয়ই। তবে গতকাল বিকেলে মুসৌরিতে আসার পর ওর ঠান্ডা লেগেছে জব্বর। তবে এই ঠান্ডা সমতলের ঠান্ডার মতো শিকশিকে নয়। ভাল লাগছে আহিরের। গতকাল সন্ধেবেলা ম্যাল রোডে হালকা ঘোরাঘুরি করেছে দু'জন। আজ সকালে উঠে সঞ্জয় প্রস্তাব দিয়েছে তিহরি বাঁধ দেখতে আসার। হোটেলে ব্রেকফাস্ট করে একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়েছে। আর তিহরিতে এসেই আত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা আহিরের।

মোটর বোট এবার ফিরছে জেটির দিকে। আত্রেয়ী ছাড়া বাকি মেয়েরা সোডা ওয়াটারের মতো দাপাচ্ছে। ছবি তুলছে। একজন সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করল, "বাঙালি? কোত্থেকে আসছেন?"

আহির দেখল এই মেয়েটাই একটু আগে ছেলেটাকে প্রশ্ন করছিল। ভারী ঢলঢল মুখ। চেহারায় হালকা চটক রয়েছে।

সঞ্জয়ও এক গাল হেসে বলল, "হ্যাঁ। বাঙালি তো বটেই। কী করে বুঝলেন?"

"আপনার হিন্দি শুনে," মেয়েটা বলল।

আহিরের হাসি পেয়ে গিয়েছিল। সামলে নিল।

সঞ্জয় অবশ্য হাসিটা আরও চওড়া করে বলল, "আমি থাকি গাঙ্গুলিবাগান। আপনি?"

"কেষ্টপুর।"

"ওরে বাবা, সে তো অনেক দূর!"

"হ্যাঁ, আপনার বাড়ি থেকে আমার বাড়ি অ-নে-ক দূ-র," মেয়েটা নাটুকে ভঙ্গিতে বলল।

আহির তাকাল আত্রেয়ীর দিকে। আত্রেয়ী দূরের দিকেই চেয়ে আছে। কারও সঙ্গে কথাও বলেনি। ওদের দিকে ফিরেও তাকায়নি।

সঞ্জয় আরও খানিকক্ষণ কথা চালাতে চেয়েছিল। কিন্তু তার আগেই মোটর বোট জেটিঘাটে চলে এল। সঞ্জয়ের আর কথা বলা হল না। আহির, সঞ্জয়ই আগে নামল। মেয়েরা নামতে হিমশিম খাচ্ছিল। ছেলেটা ধরে-ধরে ওদের নামাচ্ছিল। পাড়ের দিকে যেতে-যেতে আহির ভাবছিল, কীভাবে আত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলা যায়। সরাসরি গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, "কী রে কেমন আছিস?"

কিন্তু তাতে যদি আত্রেয়ী ফস করে অপমান করে বসে! এই সব ভাবতে-ভাবতেই আহির হাঁটছিল। হঠাৎ থামতে হল। পিছন থেকে ওই মেয়েটা হাঁক দিয়েছে, "এই যে মিস্টার গাঙ্গুলিবাগান! একটু হেলপ করবেন!"

ওরা ঘুরে তাকাল। দেখল, মেয়েটার হাতে মোবাইল। সঞ্জয়ের দিকে সেই মোবাইল এগিয়ে দিয়ে মেয়েটা বলল, "আমাদের চারজনের একটা ছবি তুলে দেবেন?"

সঞ্জয় বিগলিত গলায় বলল, "নিশ্চয়ই।"

আহির তাকাল আত্রেয়ীর দিকে। যথারীতি আত্রেয়ী অন্য দিকে তাকিয়ে। ভুরুতে হালকা ভাঁজ।

সঞ্জয় অবশ্য সে সব খেয়াল করল না। চারজনকে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলে দিল।

ওই মেয়েটা একবার বলল, "ভাল করে দেখে তুলেছেন তো? আমাদের যেন দেখে ভাল লাগে।"

আহির জানে সঞ্জয় ভাল ছবি তোলে। অতএব ছবিটা ভালই উঠবে। হলও তাই। ছবি দেখে তিনজনই খুশি। এর পর চারটে মেয়ে লাফাতে-লাফাতে পাড়ে উঠে চলে গেল।

সঞ্জয়ও জেটি থেকে বেরিয়ে তরতর করে উঠল বাঁধানো উঁচু চত্বরটায়। তারপর বলল, "এখানে টয়লেট কোথায় জানিস?"

আহির এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছু না পেয়ে বলল, "ঝোপের পিছনে চলে যা।"

দ্রুত সেদিকে গেল সঞ্জয়। আর আহির দেখতে পেল আত্রেয়ীরা একটা বড় সাদা গাড়িতে উঠছে। তিনটে মেয়ে পিছনের সিটে উঠল। আত্রেয়ী ড্রাইভারের পাশে। এখন ও বাকি তিনজনের সঙ্গে হেসে কথা বলছে। চোয়াল শক্ত হল আহিরের। সঞ্জয় ফিরতেই বলল, "পছন্দ হয়েছে? তোর কেষ্টপুরের শ্রীরাধিকাকে?"

সঞ্জয় হাসল। বলল, "বিয়ের আগে যে মেয়েগুলো কোথায় ছিল!"

"এখনই বা কোথায় রয়েছে একবার দেখে আসি, চল।"

"মানে!" সঞ্জয় অবাক।

"আমার আন্দাজ ভুল না হলে ওরা মুসৌরি থেকে আসছে। চল আলাপ করি। তোর সঙ্গে শ্রীরাধিকার জমবে ভাল।"

"মুসৌরিতে কোথায় খুঁজবি!" সঞ্জয়ের বিস্ময় কাটছিল না।

"চল তো গিয়ে দেখি," আহির তাড়াতাড়ি নিজেদের গাড়ির দিকে গেল।

গাড়িতে উঠে ড্রাইভার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে এক গাল হাসল আহির। বলল, "ওই যে সাদা গাড়িটা গেল, ওটায় আমাদের বন্ধুরা আছে। উসকা পিছা করো।"

ড্রাইভার ছেলেটা কী বুঝল কে জানে! দ্রুত গাড়ি স্টার্ট দিল।

॥ ২ ॥

আহিররা যখন গাড়িতে উঠেছিল তখনই দুপুর-বিকেল। সেই গাড়ি পাহাড়ি রাস্তায় এঁকেবেঁকে কিছু দূর যেতেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল।

আসার সময় আহির রাস্তা দেখতে-দেখতে এসেছিল। এখন ফেরার সময় তাই ও বুঝতে পারল ড্রাইভার সোজা মুসৌরিই যাচ্ছে।

আহির একবার জিজ্ঞেস করল, "কী করে বুঝলে ওরা মুসৌরি চলেছে?"

ড্রাইভার ছেলেটা হাসল। বলল, "ওই গাড়ির ড্রাইভার আমার চেনা। ওরা মুসৌরি থেকেই এসেছে।"

আহির আর ঘাঁটাল না। ড্রাইভার পালটা প্রশ্ন করলে অস্বস্তিতে পড়ে যাবে। বন্ধুর গাড়িকে কি কেউ এভাবে অনুসরণ করে? শুধু ওর মনে একটা খচখচানি কাজ করতে লাগল। আত্রেয়ীদের গাড়িটা এসইউভি। আর ওদেরটা ছোট গাড়ি। মুসৌরিতে গাড়ি বুক করার সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছে আহির। এখানে পর্যটকের তুলনায় গাড়ি বেশি। তাই গাড়ির লাইন পড়ে। একজন গাড়ি বুক করার সময় নিজের মর্জিমাফিক সব সময় গাড়ি পায় না। লাইনে যে গাড়ি পড়বে তাই নিতে হবে। সেই জন্য ওরা পেয়েছে ছোট গাড়ি। এখন ওদের ছোট গাড়ির পক্ষে এসইউভি-র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়নো সম্ভব নয়। একটাই ভরসা! এখানে পাহাড়ি রাস্তাগুলো বেজায় আঁকাবাঁকা। বাঁকগুলো ঘোরালো। একটু এদিক ওদিক হলেই গাড়ি ছিটকে নীচে পড়বে। অতএব খুব বেশি জোরে আত্রেয়ীদের গাড়িটা যেতে পারবে না।

গাড়িতে ওঠার পর সঞ্জয় যাও বা কথা-টথা বলছিল, খানিক দূর যেতেই তাও বন্ধ হয়ে গেল। সিটে মাথা দিয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ল। আহিরের ঘুম এল না। ও ঠায় তাকিয়ে থাকল বাইরের দিকে। কী দ্রুত অন্ধকার নামছে পাহাড়গুলোয়! গাড়ির কাচগুলো তোলা। জানলা কিংবা দরজা একটু ফাঁক করলেই কনকনে হাওয়া ছোবল মারছে। সেই হাওয়ার মতো ছোবল মারছে পুরনো স্মৃতি। মনে পড়ছে কলেজের দিনগুলোর কথা। আত্রেয়ীর কথা। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকল আহির। ওই ঝাপসা হয়ে আসা পাহাড় চূড়াগুলোয় যেন ওর অতীতের ছায়া পড়ছে। বারবার মনে পড়ছে ধর্মতলা চত্বরে সেই বাস থেকে নেমে দৌড়নোর স্মৃতি। তখন উন্মাদের মতো দৌড়েছিল। এখন আহির বুঝতে পারে, সেদিন সামান্য গন্ডগোল হলে ও বাসের তলায় চাপা পড়ত। অবশ্য প্রথম থেকেই আত্রেয়ীর জন্য আহির সব করতে প্রস্তুত ছিল। বাস কেন হাঙরের হাঁ-মুখের সামনে ঝাঁপ দিতেও দ্বিতীয়বার ভাবত না। মনে পড়ছে, আহিরের সব মনে পড়ছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ।

আত্রেয়ীর সঙ্গে ওর প্রথম দেখা কলেজের প্রথমদিনেই। যদিও ওদের বিষয়গুলো ছিল একেবারে আলাদা। আহির ভর্তি হয়েছিল গোলপার্কের সিটি কলেজে ভূগোল অনার্স নিয়ে। আর আত্রেয়ী নিয়েছিল বিকম অনার্স। ক্লাস আলাদা। বন্ধুদল আলাদা। তবু প্রথমদিনই পরস্পরের পরস্পরকে ভাল লেগে গিয়েছিল। ফার্স্ট ইয়ারের মাঝামাঝি আত্রেয়ীই প্রপোজ় করেছিল আহিরকে। তবে সেটা নিছকই প্রথাগতভাবে প্রেম নিবেদন। কারণ, ততদিনে দু'জনেই বুঝে গিয়েছিল যে, পরস্পরকে ছাড়া থাকতে পারবে না।

আহিরের বাড়ি একেবারেই সাদামাটা। বাবা চাকরি করতেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। মা গৃহবধূ। ঢাকুরিয়ার ব্যানার্জিপাড়ার পিছন দিকে ওদের দেড়তলা বাড়ি। সে বাড়ি ঠাকুরদার করে যাওয়া। আত্রেয়ীরা থাকত গলফ গ্রিনে। সেখানে ওদের একটা ছোট ফ্ল্যাট ছিল। এলআইজি বিভাগে। আত্রেয়ীর বাবা-মা ডিভোর্সি। আত্রেয়ী যখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে তখনই ওর বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়েছিল। মা চাকরি করতেন ফিলগুড নার্সিংহোমের অ্যাকাউন্টস সেকশনে। বাবার সঙ্গে ওদের তেমন সম্পর্ক ছিল না। প্রথম বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর আত্রেয়ীর বাবা আবার বিয়ে করেন। সেই দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর একটি ছেলেও রয়েছে। বাবা চিরদিনই আত্রেয়ীর ব্যাপারে আলগা। সেটা খানিকটা মায়ের সঙ্গে সম্পর্কের জেরে। খানিকটা দ্বিতীয় স্ত্রী চাপে। তাই বাবার সান্নিধ্য কিংবা ভালবাসা কিছুই সেভাবে পায়নি আত্রেয়ী। আর না পেয়ে-পেয়ে এক সময় 'বাবা' শব্দটা নিছকই একটা সম্বোধন হয়েই থেকে গিয়েছে ওর জীবনে।

কলেজে পড়ার সময়ই আহির দেখত ও যেমন ঢিলেঢালা, আত্রেয়ী তেমনই আঁটোসাঁটো। প্রথম থেকেই ও বলত, "আমাকে তাড়াতাড়ি চাকরি পেতে হবে।"

দু'জনে হয়তো তখন ঢাকুরিয়া লেকের ধারে বসে। আহির আড়মোড়া ভেঙে বলত, "কেন?"

"আমি চাকরি না করলে মায়ের কষ্ট কমবে না। প্রাইভেট হাউসে চাকরির পলিটিক্স জানিস!"

"কিন্তু বিকম অনার্স পাশ করে তুই কী এমন চাকরি পাবি? তার চেয়ে কোনও কোর্স কর। কখনও সখনও লম্বা লাফ মারতে হলে দু' পা পিছিয়ে আসতে হয়।"

"আমার পিছিয়ে আসার সময় নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।"

আহির কিছুতেই বুঝতে পারত না, কীসের এত তাগিদ আত্রেয়ীর। তবে ও কোনওদিন এই নিয়ে প্রতিবাদ করেনি। কারণ, আত্রেয়ী চিরকালই একটু চাপা স্বভাবের। চট করে ও কাউকে পুরোপুরি নিজের ভাবতে পারত না। ছোট-ছোট ব্যাপারে সেটা বোঝা যেত। হয়তো পাঁচ টাকার ফোটোকপি করতে হয়েছে। আত্রেয়ীর কাছে বড় নোট। দোকানদার ভাঙিয়ে দিতে পারবে না। আহিরই শেষে টাকাটা দিয়ে দিয়েছে। এ সব ছোটখাটো ব্যাপার আহির খেয়ালই রাখতে পারত না। কিন্তু পরের দিন কলেজে এসে আত্রেয়ী সবার আগে আহিরকে খুঁজে বের করে টাকাটা ফেরত দিত।

আহির প্রথম-প্রথম অবাক হত। রেগে যেত। কিন্তু আত্রেয়ীও ছিল অনড়। প্রায় এক বছর সম্পর্ক হওয়ার পর আত্রেয়ী সহজ হয়েছিল। আহির কোনও টাকা দিলে ওইভাবে ফেরত দিত না।

এভাবেই ওরা পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল। দু'জনের পরিবারই তা জেনেছিল। কেউ-ই আপত্তি করেনি। শুধু আত্রেয়ীর মা বলেছিলেন, "খুকু চাকরি না পেলে কিন্তু এই বিয়েতে আমার মত নেই।"

আহিরও জানত, আত্রেয়ী চাকরি না পেলে বিয়ে করবে না।

কলেজের পর আহির ভূগোল নিয়ে এমএসসি করতে ঢুকল। প্রবল পড়াশোনার চাপ। ততদিনে আত্রেয়ীও কেরিয়ারের টানে পড়ে গিয়েছে। ও বুঝতে শুরু করেছিল, দ্রুত যদি নিজের কেরিয়ার গুছিয়ে নিতে না পারে, ভবিষ্যতে আর পারবে না। আত্রেয়ী বিকম পাশ করার পর একটা সিএ ফার্মে ঢুকল। উদ্দেশ্য সিএ করা। প্রথম দু' বছর কোনও সমস্যা হয়নি দু'জনের মধ্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে ওরা এসে দেখা করত এলিয়ট পার্কে। কখনও বা নন্দন চত্বরে। এমএসসি-র পর আহির ঠিক করেছিল, ইকোনমিক জিওগ্রাফির উপর পিএই ডি করবে। সঙ্গে নেট এবং স্লেট পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবে। সেই মতো সব সুন্দরভাবে এগোচ্ছিল।

গোলমাল দেখা গেল পিএইচডি রেজিস্ট্রেশনের পরই। অসীম সান্যাল ছিলেন আহিরের পিএইচডি গাইড। ভারী ভালমানুষ। শুধু অল্পতেই রেগে উঠতেন। কিন্তু তাতে ছাত্রদের কোনও অসুবিধে হত না। সবাই জানত স্যার অমনই। তিনি রেগে যান বটে। কিন্তু রাগ পুষে রাখেন না। এমন পণ্ডিত মানুষের কাছে পিএইচডি করার সুযোগ সবাই পায় না। আহির পেয়েছে। পাওয়ার আগে আত্রেয়ীকে কিছুই বলেনি ও। যদিও আত্রেয়ী কয়েকবার জানতে চেয়েছে, "তুই এর পর কী করবি ভেবেছিস!"

নানা ছুতোয় সেই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছে আহির। সব পাকা করার পর ও গিয়ে জানিয়েছিল আত্রেয়ীকে। আহির ভেবেছিল, আত্রেয়ী খুশি হবে। কিন্তু তা হল না। আত্রেয়ী হঠাৎ রেগে উঠেছিল। সেদিন ওরা নন্দনের সামনে দেখা করেছিল।

রেগে গিয়ে আত্রেয়ী বলেছিল, "তুই এখন পিএইচডি করবি! তারপর? তারপর অপেক্ষা করবি কবে কলেজ সার্ভিস কমিশনে চান্স পাবি? না হলে গেস্ট লেকচারার হবি। আর বাড়িতে টোল খুলে বসবি। এই রাস্তায় যাওয়ার আগে একবার আমার কথা ভাবলি না!"

"তোর কথা ভাবলাম না মানে?" আহির অবাক হয়েছিল।

"মানেটা কি আলাদা করে বোঝাতে হবে! আমি বেশিদিন অপেক্ষা করতে পারব না, সেটা তুই ভাল করেই জানিস।"

"না জানি না। তোর কীসের তাড়া তাও জানি না। আগে থেকে ধরে নিচ্ছিস কেন যে, আমার অনেকদিন সময় লাগবে?"

"তুই পাঁচ বছর ধরে তো পিএইচডি করবি নাকি?"

"তার আগেও কলেজে পেতে পারি।"

"কত ছেলে পিএই ডি করে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে! খবর রাখিস?"

প্রচণ্ড রেগে আত্রেয়ী কথাগুলো বলতে লাগল। আহির ভেবে পেল না আত্রেয়ী কেন এত রেগে গেল। ওর বাড়ি থেকে কোনওদিন ওকে চাকরির জন্য তাড়া দেওয়া হয়নি। মা যদিও বা কখনও খুঁতখুঁত করেছেন। বাবা কোনওদিনই করেননি। উলটো উৎসাহ দিয়েছেন। হঠাৎ কী এমন হল যে আত্রেয়ী একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিতে লাগল?

আহির নানাভাবে আত্রেয়ীর মনোভাব বুঝতে চাইল। কিন্তু পারল না। আত্রেয়ীর কীসের তাড়া সেটাই ওর কাছে পরিষ্কার হল না। আত্রেয়ীও কোনও কারণ দেখাল না। কিন্তু এই পিএইচ ডি নিয়ে আত্রেয়ীর সঙ্গে ওর হালকা মনোমালিন্য লেগেই থাকত। পিএইচ ডি যেন আত্রেয়ীর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল। কোনওদিন ও বলত, "মা বলছে, এবার বিয়ে নিয়ে তোরা ভাব।"

কোনওদিন বলত, "এষারও বিয়ে হয়ে গেল। বন্ধুদের মধ্যে বাকি থেকে গেলাম একমাত্র আমিই। এষার বর জানিস দুবাইয়ে চাকরি করছে। কিছুদিনের মধ্যে এষাও চলে যাবে দুবাইয়ে। শুধু আমি সকালে উঠে অফিস যাই। আর সন্ধেবেলা তোর সঙ্গে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরি।"

আত্রেয়ীর বিষাদ চাপা দেওয়ার জন্য আহির মজা করতে চাইত। বলত, "যদি কলেজে চাকরি পেয়ে যাই, তা হলে আর পায় কে! ক্লাস নেব। সেমিনারে যাব। গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি, শীতের ছুটিতে ঘুরতে যাব।"

আহির একদিন এমন কথা বলার পর আত্রেয়ী হালকা হেসেছিল। কোনও প্রতিবাদ করেনি। শুধু বলেছিল, "যদি!"

কিন্তু এভাবে চলতে-চলতে দু'জনেরই ব্যস্ততা বাড়তে লাগল। আহির একের পর-এক সেমিনারে পেপার জমা দিতে থাকল। পিএইচ ডি নিয়েও লড়ে যাচ্ছিল। আত্রেয়ীর অফিসেও কাজের চাপ বাড়ছিল। সিএ পড়ার আশা ছেড়ে ও তখন একটা স্টিল কোম্পানির অ্যাকাউন্টস সেকশনে ঢুকেছে। বোধ হয় এই চাকরি পাওয়ার পিছনে ওর মায়েরও কোনও হাত ছিল।

নতুন চাকরিতে কাজের প্রচুর চাপ। ফলে আগের মতো সন্ধেবেলা দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কমছিল। দেখা হত ছুটির দিনে। তবে নিয়মিত ফোনে কথা হচ্ছিল।

তেমনই একদিন হাওড়া যাচ্ছিল আহির। অসীমবাবু একটা বই পৌঁছে দিতে বলেছিলেন উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যাপক পুরঞ্জয় মিশ্রকে। ভদ্রলোক হাওড়া স্টেশনে দাঁড়াবেন। আহির বইটা পৌঁছে দেওয়ার পর সাঁতরাগাছির ট্রেন ধরবেন। মিনিবাসের জানলায় বসে যেতে ভালই লাগে। আহিরও তাই যাচ্ছিল। বাসটা যখন ধর্মতলার আগে সুরেন ব্যানার্জি রোডে সিগনালে দাঁড়াল, তখন আলগোছেই বাইরে তাকিয়েছিল আহির। হঠাৎ দেখতে পেল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজের শোরুমের সামনে আত্রেয়ী আর-একটা ছেলের হাত ধরে যাচ্ছে। যেতে-যেতে আত্রেয়ী হেসে-হেসে ঢলে পড়ছে ছেলেটার গায়ে। প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না আহির। একটু ঝুঁকে ভাল করে দেখতে গেল। আর তখনই বাসটা ছেড়ে দিল। কিন্তু বাস ছাড়লেও আহির দেখতে পেল মেয়েটা আত্রেয়ীই।

বাসটা ধর্মতলার চার মাথা পেরিয়ে যতক্ষণে রাস্তার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল ততক্ষণে আহিরের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। পাগলের মতো বাস থেকে নেমে ও দৌড়তে লাগল কটেজ ইন্ডাস্ট্রির ফুটপাথের দিকে। এদিকে ওপাশের গাড়িগুলো যমদূতের মতো ধেয়ে আসছে। আহির সে সবের ভ্রুক্ষেপ না করে একটা বড় বাসের সামনে দিয়ে লাফ মেরে রাস্তার ওপারে গেল। পুলিশ দেখছে কিনা তা নিয়েও মাথা ঘামাল না। তারপর উন্মাদের মতো দৌড়তে লাগল।

কটেজ ইন্ডাস্ট্রির শোরুমের সামনে পৌঁছে আহির দেখল ওরা নেই। তা হলে কি মেট্রো সিনেমার দিকে গেল? আহির সেই ফুটপাথ ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগল। এই ফুটপাথে প্রচুর জামাকাপড়ের দোকান। তাড়াতাড়ি হাঁটার উপায় নেই। তবু লোকজনকে ঠেলেঠুলে উন্মাদের মতো আহির এগিয়ে যেতে থাকল। আত্রেয়ী আর ওই ছেলেটাকে খুঁজে বের করতে হবে।

॥ ৩ ॥

"আপনি কি ইকো পার্কে যাবেন? আমরা ধনৌল্টিতে এসে গিয়েছি।"

ড্রাইভার ছেলেটার কথায় আহিরের চটকা কাটল। পাশের সিটে সঞ্জয় ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকছে।

ড্রাইভার ছেলেটা ফের বলল, "তাড়াতাড়ি যান। সন্ধে ঘনাচ্ছে। আর দশ-পনেরো মিনিটে ইকো পার্ক বন্ধ হয়ে যাবে।"

আহির আর সঞ্জয়কে ডাকল না। গাড়ির দরজা খুলে নামল। আর নামতেই একটা কনকনে হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার জোগাড়। গাড়িতে ফিরে ব্যাগ থেকে টুপি, গ্লাভস বের করে পরে নিল ও। এগোল ইকো পার্কের দিকে। বাইরে ঝুপ-ঝুপ করে সন্ধে নামছে। আসার সময় ড্রাইভার ছেলেটা বলেছিল, "আগে তিহরি ড্যাম দেখে নিন। ফেরার সময় ইকো পার্ক আসবেন।"

তখন এখান দিয়ে যাওয়ার সময় আহির দেখেছিল, প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ইকো পার্কের উলটো দিকে। এখন সেই সব জায়গা ফাঁকা। এক-দুটো গাড়ি শুধু দাঁড়িয়ে। কী জানি কেন, আহিরের ভাল লাগছিল না। হঠাৎ ওর খেয়াল হল, এখন ইকো পার্কে ঢুকে সময় নষ্ট করলে আত্রেয়ীদের গাড়িটাকে ধরা যাবে না। ইকো পার্কের সামনে যে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে সেখানে আত্রেয়ীদের সাদা এসইউভি নেই। তার মানে ওরাও এখানে থামেনি। তাড়াতাড়ি গাড়িতে ফিরে এল আহির। গাড়িতে উঠে টুপি খুলে ড্রাইভারকে বলল, "নাহ। দেখব না। তুমি মুসৌরি চলো। ওই গাড়িটাকে ধরতে হবে।"

ড্রাইভার ফের গাড়ি ছোটাল মুসৌরির দিকে। সঞ্জয় একইভাবে ঘুমোচ্ছে। ইকো পার্কে নামা হল কী-হল না তা নিয়ে সঞ্জয়ের কোনও হুঁশ নেই। আহির চেয়ে থাকল বাইরের দিকে। এবার পুরোপুরি অন্ধকার নেমে এসেছে। গাড়ির হেডলাইটের আলোর বাইরে শুধু আকাশের ফিকে আলো ছাড়া অন্য কোথাওই আলো নেই। মাঝে-মাঝে উলটো দিকের গাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। রাস্তাটা বেশ বিপজ্জনক। বিশেষ করে বাঁকগুলো। আহিরের ভয়ই করছিল যেভাবে ছেলেটা বাঁকে গাড়ি ঘোরাচ্ছে তা দেখে। এক সময় ও চোখ বন্ধ করল। চোখ বন্ধ করতেই পুরনো স্মৃতিরা ফিরে এল।

সেদিন সন্ধেবেলা ওই ফুটপাথ ধরে গিয়ে আত্রেয়ীদের খুঁজে পায়নি আহির। প্রায় আধঘণ্টা ধরে ও খুঁজেছিল দু'জনকে। শেষে যখন পেল না তখন ওই ফুটপাথের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই ঝরঝর করে ও কেঁদে ফেলেছিল। আহির নিজেকে বারবার বোঝাতে চেয়েছিল, ও ভুল দেখেছে। ওদের এতদিনের সম্পর্কের মাঝখানে অন্য কেউ ঢুকতেই পারে না। কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি থেকে যাচ্ছে।

সেদিন কোনওমতে পুরঞ্জয়বাবুকে বইটা পৌঁছে দিয়ে ও বাড়ি ফিরেছিল। আত্রেয়ীকে রাতেই ফোন করেছিল।

আত্রেয়ী ফোন ধরতেই বলেছিল, "কাল সন্ধেবেলা তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছি। কখন তোর সময় হবে?"

আহিরের গলা শুনে থমকে গিয়েছিল আত্রেয়ী। বলেছিল, "হঠাৎ?"

"তোর সঙ্গে দেখা করব, তার মধ্যে হঠাৎ-এর কী আছে?"

"কাল তো আমার অফিসের খুব কাজে চাপ!"

"রাত দশটায় তোর সময় হবে? তেমন হলে আমিই চলে যাব গলফ গ্রিন।"

আত্রেয়ী চুপ হয়ে গিয়েছিল। একটু থেমে বলেছিল, "কাল সন্ধে সাতটায় তোর কলেজের উলটো দিকের কফিশপে বসতে পারবি?"

"ওখানে নয়। ওখানে চেনাশোনা লোকজন বেরিয়ে যেতে পারে। তুই গড়িয়াহাট মোড়ে চলে আয়। আশপাশের কোনও কফিশপে বসে নেব।"

আত্রেয়ী রাজি হয়ে গিয়েছিল। শুধু অস্ফুটে বলেছিল, "কী হয়েছে তোর?"

আহির আর কথা বাড়ায়নি। ফোন ছাড়ার আগে হালকা শ্লেষ মিশিয়ে জবাব দিয়েছিল, "কাল কথা বলি!"

পরদিন ইউনিভার্সিটি যেতে পারেনি আহির। বাড়িতে ছটফট করছিল। মা ধরতে পেরেছিলেন ওর অস্থিরতা। একবার দুপুরের দিকে জিজ্ঞেসও করলেন, "তোর কী হয়েছে রে? আত্রেয়ীর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস?"

আহির কোনও উত্তর দেয়নি। মা-ও আর ঘাঁটাননি। তিনি জানতেন, বেশি প্রশ্ন করে আহির রেগে গিয়ে চেঁচাতে থাকবে।

সন্ধে ছ'টা নাগাদ আহির তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। গড়িয়াহাটের মোড়ের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দেখল আত্রেয়ী আগে থেকেই হাজির। কাছাকাছি কোন কফিশপে বসবে সেটা আহির আগে থেকেই ভেবে এসেছিল। তাই আত্রেয়ীকে নিয়ে সেখানে গিয়ে বসল।

কফির অর্ডার দিয়ে গোল টেবিলে বসে আহির কোনও ভনিতা করল না। সোজাসুজি জানতে চাইল, "কাল যে ছেলেটার হাত ধরে ধর্মতলা দিয়ে হাঁটছিলি, সে কে?"

আত্রেয়ী এমন অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই কিছু বলতে পারল না। মাথা নামিয়ে নিল।

আহির মরিয়া। বলল, "চুপ করে থাকিস না। আর আমায় বোঝাতে যাস না যে, ওটা তুই ছিলি না। আমি পরিষ্কার তোকে দেখেছি। যে ময়ূরকণ্ঠী সালোয়ার-কামিজটা পরেছিলি, সেটা আমার বহুদিনের চেনা।"

আত্রেয়ী কিছু বলতে পারল না। এর মধ্যে ওদের টেবিলে দু' মাগ কফি দিয়ে গেল ওয়েটার। আহির চোয়াল শক্ত করল। বুকের ভিতরে পাহাড় ভাঙছে। ভাঙছে আরও অনেক কিছুই। কিন্তু কিছুতেই সেই ভাঙনকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।

এবার মুখ তুলল আত্রেয়ী। বলল, "ওর নাম দীপঙ্কর।"

"কী করে?"

"আমার সঙ্গে চাকরি করে। সিনিয়র। বছর তিনেকের বড়। আসলে দীপঙ্করকে মায়ের খুব পছন্দ..."

"আর তোর?" আহির হিসহিসে গলায় প্রশ্ন করল।

আত্রেয়ী একবার চোখ তুলে তাকাল আহিরের দিকে। তারপর চোখ নামিয়ে বলল, "আমারও।"

আহির এবার টের পেল ওর ভিতরে যে পাহাড়টা এতক্ষণ ধরে ভাঙছিল, সেটা এবার হুড়মুড় করে ধসে পড়েছে। সেই উঁচু পাহাড়ের জায়গায় শুধুই শূন্যতা। সেই শূন্যতায় ওর সব কথা হারিয়ে গেল।

আত্রেয়ী ধীরে-ধীরে বলতে থাকল, "আমি জানি তোর খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু অনেক ভেবে দেখলাম, তোর আমার এক সঙ্গে জীবন কাটানো সম্ভব নয়। আমরা...আমরা আলাদা হয়ে গিয়েছি। আমাদের জীবন আলাদা। রাস্তা আলাদা। দীপঙ্করের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল অফিসে জয়েন করার পরই। ও খুবই কেয়ারিং। একদিন কাজের চাপে রাত দশটা হয়ে গিয়েছিল। দীপঙ্কর ট্যাক্সি করে আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। তখনই মায়ের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়। এর পর মাঝে-মাঝেই ও আমাদের বাড়িতে...আমি কিছুতেই ওকে আটকাতে পারছি না আহির। বিশ্বাস কর। আমি নিজেকে অনেক বুঝিয়েছি। অনেক..."

"তুই কি বুঝতে পারছিস না এটা একটা মোহ?" আহির এতক্ষণে ভাঙা গলায় বলল।

"না রে, মোহ নয়। এটা ভালবাসা... একটা নির্ভরতা... যে নির্ভরতা তুই কোনওদিন দিতে পারিসনি।"

"নির্ভরতা দিয়ে জীবন চলে না।"

"চলে। ভালবাসা ফুরিয়ে যায় একটা বয়সের পর। নির্ভরতাই থাকে শেষ পর্যন্ত। তুই বুঝবি না। আমি...আমি তোকে ভালবাসি আহির। কিন্তু দীপঙ্করকে ছেড়ে তোর কাছে আসতে পারব না। এক মাস হল আমাদের এই সম্পর্ক পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠেছে। আমি এই এক মাস ধরে মনোকষ্টে ভুগছিলাম। কীভাবে তোকে বলব কথাটা! তুই কীভাবে নিবি! আমি তো তোকে চিনি... ভালই হল তুই নিজে দেখে ফেললি আমাদের। না হলে আমার আরও কষ্ট হত।"

সেদিন নানাভাবে বুঝিয়েও আত্রেয়ীকে টলাতে পারেনি আহির। ব্যর্থ হয়েই ফিরেছিল। এর পর এলিয়ট পার্কেও একদিন দেখা করেছিল। কিন্তু ফলাফল পালটায়নি। আত্রেয়ী চলেই গিয়েছিল। আর আত্রেয়ী চলে যাওয়ার পর আহির টের পেল ও কেমন ভিতর থেকে পালটে গিয়েছে। আগের শান্ত ছেলেটা আর ওর ভিতরে নেই। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে এক অন্য আহির। এইভাবে চলতে-চলতে একদিন অসীমবাবুর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল আহির। অসীমবাবু বোধ হয় ওকে তাড়া দেওয়ার জন্যই একটু ধমক-ধামক দিচ্ছিলেন। যেমন তিনি তাঁর অধীনে থাকা সব পিএইচ ডি স্কলারদের দিয়ে থাকেন। কিন্তু আহির সেদিন স্যারে ধমক নিতে পারল না। দুম করে রেগে গিয়ে যা-তা কথা বলে বসল। বাকিরা অনেক চেষ্টা করেও ওকে থামাতে পারল না। শেষ পর্যন্ত স্যারের ঘর থেকে ও বেরিয়ে এল।

অসীমবাবুর মতো মানুষের সঙ্গে ওইভাবে কেউ কথা বলে না। সেই ঘটনার জেরে তাই শুধু স্যারই নন, ঘরের বাকিরাও হাড়ে চটল আহিরের উপর। এর পরও অসীমবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন আহিরকে। কিন্তু আহির আর যায়নি। পিএইচডি করা ছেড়ে দিল।

গবেষণার কাজ ছাড়ার পর কিছুদিন বাড়িতে বসেই থাকল আহির। তারপর বুঝল, ওর জীবনের গতিপথ বদলে গিয়েছে। যে রাস্তায় হাঁটার স্বপ্ন দেখেছিল, তা কোনওদিনই পূরণ হবে না। এবার চাকরি খোঁজাই ভাল। শেষ পর্যন্ত জনসন ব্রাদার্সের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেলে চাকরি পেল ও। মাইনে ভদ্রস্থ। কাজের চাপ থাকে। কিন্তু পরিবেশ ভাল। তবু প্রথম-প্রথম চাকরি করতে আহিরের খারাপ লাগত। বারবার মনে পড়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো। ডিপার্টমেন্টের কারও সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে ও সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা পালটাত। তারা ভাবত অসীমবাবুর সঙ্গে ঝামেলার জেরে আহির এড়িয়ে যাচ্ছে। কেউই ধরতে পারত না, ওদের দেখলে আহিরে বুকে অদ্ভুত কষ্ট হতে থাকত। যে স্বপ্ন কোনওদিনই পূরণ হবে না, সেই স্বপ্নেরা এসে ওর সামনে ভিড় করে দাঁড়াত।

এমন সময়ই এক বিয়েবাড়িতে অনিন্দিতার সঙ্গে পরিচয় হল আহিরের। অনিন্দিতা ভারী শান্ত মেয়ে। বাড়ি গড়িয়া স্টেশনের কাছে। ওদিকেই একটা স্কুলে ইতিহাস পড়ায় অনিন্দিতা। বিয়েবাড়িতেই ফোন নম্বর বিনিময় হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যেই ফোনে এবং হোয়াটসঅ্যাপে দু'জনের সম্পর্ক জমে উঠেছিল। অনিন্দিতা খুবই ঘরোয়া মেয়ে। বাড়ির এক মেয়ে হওয়ায় বাবা-মায়ের আদরের। একটু প্রাচীনপন্থীও।

সম্পর্ক হওয়ার পর একবার দিঘা যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল আহির। অনিন্দিতা তখন ওর হাতে চিমটি কেটে বলেছিল, "বিয়ের আগে ওসব হবে না।"

বাধা পেলে জেদ বাড়ে। আহিরেরও তাই হয়েছিল। আত্রেয়ীর সঙ্গে ওর শারীরিক সম্পর্ক ছিল। তারপর দীর্ঘদিনের বিরতি। এবার অনিন্দিতাকে নিয়ে সারাদিনের সফরে ও ডায়মন্ড হারবার গেল। সেখানে হোটেলের রুমে প্রায় জোর করেই অনিন্দিতার সঙ্গে ও শারীরিক সম্পর্ক করেছিল। সব হয়ে যাওয়ার পর অনিন্দিতা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বারবার জানতে চেয়েছিল, "তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো?"

অনিন্দিতার এই আঁকড়ে ধরাটা আহিরকে ভারী তৃপ্তি দিয়েছিল। শারীরিক সম্পর্কের পর অনিন্দিতা ওর উপর নির্ভর করতে শুরু করেছে। তাই দু' বছরের সম্পর্কে প্রতি মাসেই এক-দু' দিন কোনও হোটেলের ঘরে কিংবা দূরে কোথাও গিয়ে শারীরিক সম্পর্ক হওয়াটাকে একটা নিয়মে ফেলে দিয়েছিল আহির। প্রতিবারই সব হয়ে যাওয়ার পর অনিন্দিতা যেভাবে ওকে আঁকড়ে ধরে, সেটাই আহিরকে অদ্ভুত আনন্দ দেয়। এইভাবে সম্পর্কটা চলতে-চলতে একদিন আহিরকে ফোন করেছিলেন অনিন্দিতার বাবা। সরাসরিই জানিয়েছিলেন, ওদের বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে চান। ভদ্রলোককে বাবার ফোন নম্বর দিয়ে দিয়েছিল আহির। বলেছিল, "আপনি বাবার সঙ্গে কথা বলুন। আমার মত তো আপনি জানেনই।"

দুর্গাপুজোর আগে দেখা করল দুই পরিবার। অল্প কথার পর বিয়ে ঠিক হল ফাল্গুন মাসে। আর ঠিক তারপরই সঞ্জয়ের উসকানিতে মুসৌরিতে এসেছে আহির। এখানে এসেই আত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা। এতদিন আত্রেয়ীকে প্রায় ভুলেই ছিল আহির। কিন্তু আজ আত্রেয়ীকে দেখার পর পুরনো রাগ, পুরনো আক্রোশ জেগে উঠল আহিরের ভিতরে।

ছ' বছরের সম্পর্ক ভেঙে আত্রেয়ী বেরিয়ে গিয়েছিল। একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি। যে সম্পর্কের জন্য আহিরকে ছেড়ে ও চলে গিয়েছিল সেই সম্পর্কের কী হল সেটা জানার জন্য আহির ছটফট করতে থাকল। তা ছাড়া আত্রেয়ী হাত ছেড়ে দেওয়ার পর আহিরও যে ভেসে যায়নি এবং ওর উপরেও যে একটা মেয়ে নির্ভর করে রয়েছে, সেটাও আত্রেয়ীকে জানানো দরকার। আহির ঠিক করল আত্রেয়ীকে খুঁজে বের করতেই হবে। যাবে কোথায়!

আর ঠিক তখনই ওদের গাড়িটা এসে থামল মুসৌরির ম্যাল রোডের মুখে। আহির দেখতে পেল আত্রেয়ীদের সাদা এসইউভি-টা খানিক দূরেই দাঁড়িয়ে।

॥ ৪ ॥

হোটেলের ঘরে ঢুকেই সঞ্জয় বলল, "যা ঠান্ডা! আজ মাল খাব।"

আহির হাসল। বলল, "সারাটা রাস্তা ঘুমোলি। ঠান্ডা তুই পেলি কীভাবে?"

"এই হাফ কিলোমিটার যে হেঁটে এলাম!" সঞ্জয় রুম হিটারের কাছে পা-টা নিয়ে গিয়ে বলল, "হাড় সেঁকে দিয়েছে।"

আহির কথা বাড়াল না। ওর মেজাজ বিগড়ে আছে। নিজেদের গাড়ি থেকে নেমে ও দৌড়েছিল এসইউভি-র দিকে। কিন্তু ড্রাইভার লোকটা সাফ জানিয়েছিল, মিনিট পাঁচেক আগে মেয়েগুলো নেমে চলে গিয়েছে।

আহির উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল, "কিধর গিয়া?"

লোকটা বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছিল, "মুঝে ক্যায়া মালুম।"

সঞ্জয় ততক্ষণে আড়মোড়া ভেঙে গাড়ি থেকে নেমেছে। আহিরকে ছোটাছুটি করতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"মেয়েগুলো এই গাড়িটায় ছিল। নেমে চলে গিয়েছে।"

সঞ্জয়ের তখন খেয়াল হল ওরা মেয়েগুলোকে অনুসরণ করেই মুসৌরি এসেছে। ঠান্ডায় গ্লাভস পরেই হাতে হাত ঘষে সঞ্জয় বলল, "যা ঠান্ডা। আগে হোটেলে চল।"

"হোটেলে চল মানে! আগে দেখি ওরা গেল কোথায়!"

"আরে কোথায় আর যাবে। দেখ হয়তো আমাদের হোটেলের দিকেই গিয়েছে," সঞ্জয় বলল।

আহির একটু ভাবল। সঞ্জয় বোধ হয় ভুল বলছে না। মুসৌরির সব ভাল হোটেলই তো ম্যাল রোডে। তাই সঞ্জয়ের কথায় সায় দিয়ে ও বলল, "ঠিক আছে। হোটেলেই চল।"

ম্যাল রোডের মুখ থেকে ওদের হোটেল বেশ খানিকটা। রাস্তায় বেশ ভিড়। প্রচুর লোক ঠান্ডা উপেক্ষা করেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকী ছোট বাচ্চাদের প্যারাম্বুলেটরে করে নিয়েও। দোকানপাট সব খোলা। রাস্তার ধারেও অনেকে গরম জামাকাপড় নিয়ে বসে পড়েছে। খাবারের রেস্তরাঁও রয়েছে। আবার রাস্তায়ও ভুট্টা, ডিমসেদ্ধ থেকে শুরু করে ঘুগনি, টুকটাক খাবার নিয়ে প্রচুর লোক বিক্রি করছে। বহু লোক কিনছে সেই সব খাবার। সব মিলিয়ে জায়গাটা জমজমাট। সেই জমজমাট রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ও আহির স্বস্তি পেল না। রাস্তার দু' পাশের লোকজনকে ও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে থাকল। কয়েকটা কশ্মীরীদের দোকানও রয়েছে। সেখানে প্রচুর টুরিস্ট। সেই সব দোকানগুলোর সামনে থেমে-থেমে আহির উঁকি দিল ভিতরটায়। কিন্তু চারটে মেয়ে যেন উবে

গিয়েছে। ঝলমলে ম্যাল রোডের কোথাও ওদের দেখা গেল না। পাঁচ মিনিটে কোন দিকে গেল চারজন?

আহিরের ইচ্ছে ছিল, হোটেল ছাড়িয়ে আর একটু এগিয়ে দেখে। কিন্তু সঞ্জয় রাজি হল না। বলল, "পাগল হয়েছিস নাকি! এখনই বাড়াবাড়ি করিস না। দুম করে ঠান্ডা লেগে গেলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবি। এটা কলকাতা শহর নয়। চট করে ডাক্তারও পাবি না।"

যুক্তিটা উপেক্ষা করতে পারল না আহির। বেজার মুখ করেই ও হোটেলের ঘরে এল। তবে রুমে ঢুকে ওরা জামাকাপড় ছাড়ল না।

সঞ্জয় বুদ্ধি দিল, "ডিনারটা ঘরে দিতে বলছি। স্রেফ মাংস-রুটি। ড্রিঙ্কটা বারে গিয়ে করতে হবে।"

আহির ঘাড় কাত করে সায় দিল। ওদের রুমটা হোটেলের দোতলায়। বারটা রয়েছে একতলায়। আবার দরজা লক করে ওরা একতলায় নামল।

বারে গিয়ে আহির বলল, "তুই কী নিবি?"

"আমি রাম খাব। তুই?"

"হুইস্কি।"

দু'জনে পছন্দের পানীয়র অর্ডার দিয়ে একটা টেবিল দখল করল। এক মিনিটে ওদের পানীয় এবং সঙ্গে ছোট বাটিতে ভাজা বাদাম সার্ভ করল বারের লোকটা। বারটা প্রায় খালিই। খানিক দূরে আর-দু'জন বসেছিল। হাতে পানীয়র গ্লাস। তবে তারা কেউই বাঙালি নয়।

আহির অপেক্ষা করল। সঞ্জয় একটা পেগ শেষ করতেই বলল, "কাল সকালে উঠে প্রথম কাজ কেষ্টপুরের শ্রীরাধিকাকে খুঁজে বের করা।"

সঞ্জয় হাসল। বলল, "তুই ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিয়ে নিয়েছিস।"

আর-একটা পেগের অর্ডার দিয়ে আহির বলল, "তুই নিসনি?"

"অনন্যা জানতে পারলে কেলেঙ্কারি হবে," সঞ্জয় মাথা নাড়ল।

"জানতে পারলে তো!" আহির হাসল, "দেড় বছর হয়ে গেল। হানিমুন পিরিয়ড ইজ় ওভার। এবার তো একটু বেড়ে খেল।"

"খেলতে কে না চায় ভাই," গ্লাসে চুমুক দিয়ে সঞ্জয় বলল, "কিন্তু খেলাটা খুব রিস্কি। আম ছালা দুই-ই যাবে।"

"তোর বউ বসে গাঙ্গুলিবাগানে..."

"না। এখন বারাসতে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছে। আমি ফিরলে আবার আসবে।"

"শালা, কোথায় বারাসত আর কোথায় মুসৌরি! তুমি মরলে লাশ নিয়ে ফিরতে দু' দিন লেগে যাবে। ঠিক আছে, তেমন কিছু হলে আমি সাক্ষী দেব, তুই নির্দোষ।"

"বউ যখন চেপে ধরবে তখন তুই কোথায়! নাহ, ফালতু ঝামেলায় জড়াস না। এখন কেস খেলে সারা জীবন ভুগতে হবে।"

আহির এবার ঝুঁকে এল সঞ্জয়ের কাছে। বলল, "একবার চোখ বন্ধ করে ওই মেয়েটার মুখটা ভাব। ভাল লাগছে?"

সঞ্জয় খিক-খিক করে হাসল। বলল, "চোখ খুলে বেশি ভাল লাগছে। হেভি দেখতে। প্রথমবার দেখেই মাথা ঘুরে গিয়েছিল।"

"তবে! রাজি হয়ে যা। কতদিন আর বাড়ির খাবার খাবি। এবার বাইরের খাবার একবার চেখে দ্যাখ! বাদবাকি সব আমি সামলে নেব। প্রমিস।"

সঞ্জয় বোধ হয় একটু উত্তেজিত হয়েই পড়ল। গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, "কিন্তু তুই যা বলছিস, সে সব হবে কীভাবে?"

সঞ্জয়ের কথায় মনে-মনে হাসল আহির। সঞ্জয় টোপ গিলেছে। নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আহির বলল, "কাল সকালে প্রথমে খোঁজ করতে হবে, মেয়েগুলো কোন-কোন হোটেলে উঠতে পারে। তারপর দেখতে হবে মেয়েগুলো কোন-কোন হোটেলে ওঠেনি..."

সঞ্জয় নেশার ঘোরেই বলল, "সব হোটেলে গিয়ে-গিয়ে খোঁজ করবি? কিন্তু ওদের নাম জানবি কীভাবে..."

"ধুস শালা, সব হোটেলে গিয়ে-গিয়ে খোঁজ নেওয়া যায়?"

"তা হলে পাবি কীভাবে?"

আহির হাসল। বলল, "বাইরের গাড়ি ম্যাল রোডে উঠতে দেয় না। কাউকে কোথাও যেতে হলে হোটেল থেকে বেরিয়ে হেঁটেই যেতে হবে। না হলে রিকশা ভাড়া করতে হবে। ওদের বয়স কম। দলে চারজন। মনে হয় না ওরা রিকশা নেবে। তার মানে হাঁটবে। কাল সকালে ম্যাল রোডে একটু চক্কর দিলেই ওদের সঙ্গে দেখা হবে। তার পরেরটা আমার উপর ছেড়ে দে।"

সঞ্জয়ের প্ল্যানটা মনে ধরল। অল্প হেসে ও বলল, "তুই তো মাইরি ফেলুদা হয়ে উঠেছিস! কিন্তু তোর না সামনে বিয়ে!"

"তো? মেয়ে তুলবি তুই। আমি তো স্রেফ তোকে হেলপ করছি। তোকে হেলপ করার সঙ্গে বিয়ের কী সম্পর্ক!" আহির ফের হাসল।

দু' পেগ খেয়ে ওরা বার থেকে বেরোল। উপরে নিজেদের রুমে যাওয়ার আগে আহির গিয়ে কিচেনে নির্দেশ দিল রাতের খাবার ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। রুমে ঢুকে দু'জন আগে হাত-পা ধুয়ে নিল। সঞ্জয় এক ফাঁকে অনন্যাকে ফোন করল। সাংসারিক কথা হল দু'জনের। সেই কথা শুনতে-শুনতে হাই উঠল আহিরের।

এর পর সঞ্জয় বিছানায় উঠে গুছিয়ে বসল। খাবার আসার পর কম্বল জড়িয়ে ও একটা রুটি দিয়ে সামান্য মাংস খেল। তারপর কোনওমতে প্লেট রেখে হাত ধুয়ে বলল, "আমি শুয়ে পড়ছি। খুব টায়ার্ড লাগছে।"

আহির বাধা দিল না। আত্রেয়ীর চিন্তা সমানে ওর মাথায় ঘুরছে। সেই চিন্তা নিয়েই ও খাওয়া শেষ করল। প্লেট রেখে বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে এসে সোফায় বসল। এখানে এখন প্রবল ঠান্ডা। বারে শুনছিল তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গিয়েছে। রাতে বোধ হয় আরও নামবে। আহির পরে আছে একটা উলিকট আর জিনসের ট্রাউজ়ার্স। তাতেও ঠান্ডা আটকাচ্ছে না।

ট্রাউজ়ার্সের পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে বিছানার পাশে রাখল ও। এবার আলো নিভিয়ে শুতে হবে। কারণ, সঞ্জয়ের নাক ততক্ষণে প্রবলভাবে ডাকতে শুরু করেছে। ঘড়ি দেখল আহির। বেশি বাজেনি। দশটা পাঁচ। তবু মুসৌরিতে এখন গভীর রাত। কিন্তু আলো নেভানোর আগেই আহিরের মোবাইল বেজে উঠল জোরে। তাড়াতাড়ি এসে ফোনটা নিয়ে ও দেখল অনিন্দিতা।

আহির ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে অনিন্দিতার গলা ভেসে এল, "কী গো সারাদিনে একটাও ফোন নেই! আছ কেমন?"

"আছি ঠিকঠাক। তুমি ফোন করোনি কেন?"

"বহুবার ট্রাই করেছি। তোমায় ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না। হোয়াটসঅ্যাপও করেছি। দেখলাম ঢুকেছে। কিন্তু তুমি দেখোনি। খুব চিন্তা হচ্ছিল।"

"আমরা গিয়েছিলাম তিহরি," আহির বলল, "জায়গাটা এখান থেকে গাড়িতে তিন ঘণ্টা। আরও ভিতরে। তাই বোধ হয় পাওনি..."

আহিরের কথাগুলো ফাঁকা ঘরে বেশ জোরেই শোনাল। সঞ্জয়ের নাক ডাকা থেমে গেল। আহির তাই একটা মোটা চাদর নিয়ে রুমের দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এল। এই বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যায়। আহির দেখতে পেল, অনেক দোকান ঝাঁপ ফেলছে। রাস্তার ধারের দোকানগুলোও গুটিয়ে ফেলছে জিনিসপত্র। কিন্তু বারান্দায় দাঁড়াতেই ওর সারা শরীর কেঁপে উঠল ঠান্ডায়। এত প্রবল ঠান্ডায় ও আগে কখনও আসেনি।

অনিন্দিতা বলল, "হ্যালো, কথা বলছ না কেন?"

আহির কোনওমতে বলল, "ঠান্ডায়। রুমে সঞ্জয় ঘুমোচ্ছে। তাই বাইরে এলাম।"

"এ বাব্বা, তুমি তা হলে ভিতরে যাও। আমি কাল ফোন করছি। সারাদিন তোমায় না পেয়ে কেমন পাগল-পাগল লাগছিল। তাই এত রাতে ফোন করেছি।"

"আরে নাহ, কথা বলো। অসুবিধে নেই," আহির হাসল। ঠান্ডাটা খানিক সয়ে এসেছে ওর।

"আসলে এখন তোমায় খুব পেতে ইচ্ছে করছে। তুমি যে কী দুষ্টু অভ্যেস করে দিয়েছ," লাজুক গলায় বলল অনিন্দিতা, "কতগুলো দিন তোমায় দেখি না। বাড়িতে, স্কুলে সবাই খালি বিয়ের কথা বলছে। তাই আরও বেশি-বেশি করে তোমার কথা মনে পড়ছে।"

আহির হেসে কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার দিকে চোখ পড়তে ওর কথা বন্ধ হয়ে গেল। আহির দেখতে পেল, ওদের হোটেলের সামনে দিয়ে আত্রেয়ী প্রায় ছুটতে-ছুটতে হয়ে কোথাও চলেছে। সঙ্গে বাকি তিনটে মেয়ে। যেতে-যেতে ওরা সতর্ক চোখে চারপাশ দেখে নিচ্ছিল। আত্রেয়ীরা এত কাছ দিয়ে চলে গেল যে, একবার মুখ তুলে তাকালেই আহিরকে দেখতে পেত। এত রাতে কোথায় যাচ্ছে মেয়েগুলো?

ফোনের রিসিভার দিয়ে অনিন্দিতার গলা ভেসে এল, "হ্যালো, তুমি কি লাইনে আছ?"

"আছি। কিন্তু আমরা খুব ঠান্ডা লাগছে। কালকে কথা বলবে?" আত্রেয়ীকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে-করতে আহির বলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই করব। তুমি ঘরে ঢুকে যাও। শরীর খারাপ কোরো না। আর শোওয়ার আগে আমার কথা ভাববে," অনিন্দিতা ফোন ছাড়ার আগে আদুরে গলায় বলল।

গিয়েছে। ঝলমলে ম্যাল রোডের কোথাও ওদের দেখা গেল না। পাঁচ মিনিটে কোন দিকে গেল চারজন?

আহিরের ইচ্ছে ছিল, হোটেল ছাড়িয়ে আর একটু এগিয়ে দেখে। কিন্তু সঞ্জয় রাজি হল না। বলল, "পাগল হয়েছিস নাকি! এখনই বাড়াবাড়ি করিস না। দুম করে ঠান্ডা লেগে গেলে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবি। এটা কলকাতা শহর নয়। চট করে ডাক্তারও পাবি না।"

যুক্তিটা উপেক্ষা করতে পারল না আহির। বেজার মুখ করেই ও হোটেলের ঘরে এল। তবে রুমে ঢুকে ওরা জামাকাপড় ছাড়ল না।

সঞ্জয় বুদ্ধি দিল, "ডিনারটা ঘরে দিতে বলছি। স্রেফ মাংস-রুটি। ড্রিঙ্কটা বারে গিয়ে করতে হবে।"

আহির ঘাড় কাত করে সায় দিল। ওদের রুমটা হোটেলের দোতলায়। বারটা রয়েছে একতলায়। আবার দরজা লক করে ওরা একতলায় নামল।

বারে গিয়ে আহির বলল, "তুই কী নিবি?"

"আমি রাম খাব। তুই?"

"হুইস্কি।"

দু'জনে পছন্দের পানীয়র অর্ডার দিয়ে একটা টেবিল দখল করল। এক মিনিটে ওদের পানীয় এবং সঙ্গে ছোট বাটিতে ভাজা বাদাম সার্ভ করল বারের লোকটা। বারটা প্রায় খালিই। খানিক দূরে আর-দু'জন বসেছিল। হাতে পানীয়র গ্লাস। তবে তারা কেউই বাঙালি নয়।

আহির অপেক্ষা করল। সঞ্জয় একটা পেগ শেষ করতেই বলল, "কাল সকালে উঠে প্রথম কাজ কেষ্টপুরের শ্রীরাধিকাকে খুঁজে বের করা।"

সঞ্জয় হাসল। বলল, "তুই ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিয়ে নিয়েছিস।"

আর-একটা পেগের অর্ডার দিয়ে আহির বলল, "তুই নিসনি?"

"অনন্যা জানতে পারলে কেলেঙ্কারি হবে," সঞ্জয় মাথা নাড়ল।

"জানতে পারলে তো!" আহির হাসল, "দেড় বছর হয়ে গেল। হানিমুন পিরিয়ড ইজ় ওভার। এবার তো একটু বেড়ে খেল।"

"খেলতে কে না চায় ভাই," গ্লাসে চুমুক দিয়ে সঞ্জয় বলল, "কিন্তু খেলাটা খুব রিস্কি। আম ছালা দুই-ই যাবে।"

"তোর বউ বসে গাঙ্গুলিবাগানে..."

"না। এখন বারাসতে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছে। আমি ফিরলে আবার আসবে।"

"শালা, কোথায় বারাসত আর কোথায় মুসৌরি! তুমি মরলে লাশ নিয়ে ফিরতে দু' দিন লেগে যাবে। ঠিক আছে, তেমন কিছু হলে আমি সাক্ষী দেব, তুই নির্দোষ।"

"বউ যখন চেপে ধরবে তখন তুই কোথায়! নাহ, ফালতু ঝামেলায় জড়াস না। এখন কেস খেলে সারা জীবন ভুগতে হবে।"

আহির এবার ঝুঁকে এল সঞ্জয়ের কাছে। বলল, "একবার চোখ বন্ধ করে ওই মেয়েটার মুখটা ভাব। ভাল লাগছে?"

সঞ্জয় খিক-খিক করে হাসল। বলল, "চোখ খুলে বেশি ভাল লাগছে। হেভি দেখতে। প্রথমবার দেখেই মাথা ঘুরে গিয়েছিল।"

"তবে! রাজি হয়ে যা। কতদিন আর বাড়ির খাবার খাবি। এবার বাইরের খাবার একবার চেখে দ্যাখ! বাদবাকি সব আমি সামলে নেব। প্রমিস।"

সঞ্জয় বোধ হয় একটু উত্তেজিত হয়েই পড়ল। গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, "কিন্তু তুই যা বলছিস, সে সব হবে কীভাবে?"

সঞ্জয়ের কথায় মনে-মনে হাসল আহির। সঞ্জয় টোপ গিলেছে। নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আহির বলল, "কাল সকালে প্রথমে খোঁজ করতে হবে, মেয়েগুলো কোন-কোন হোটেলে উঠতে পারে। তারপর দেখতে হবে মেয়েগুলো কোন-কোন হোটেলে ওঠেনি..."

সঞ্জয় নেশার ঘোরেই বলল, "সব হোটেলে গিয়ে-গিয়ে খোঁজ করবি? কিন্তু ওদের নাম জানবি কীভাবে..."

"ধুস শালা, সব হোটেলে গিয়ে-গিয়ে খোঁজ নেওয়া যায়?"

"তা হলে পাবি কীভাবে?"

আহির হাসল। বলল, "বাইরের গাড়ি ম্যাল রোডে উঠতে দেয় না। কাউকে কোথাও যেতে হলে হোটেল থেকে বেরিয়ে হেঁটেই যেতে হবে। না হলে রিকশা ভাড়া করতে হবে। ওদের বয়স কম। দলে চারজন। মনে হয় না ওরা রিকশা নেবে। তার মানে হাঁটবে। কাল সকালে ম্যাল রোডে একটু চক্কর দিলেই ওদের সঙ্গে দেখা হবে। তার পরেরটা আমার উপর ছেড়ে দে।"

সঞ্জয়ের প্ল্যানটা মনে ধরল। অল্প হেসে ও বলল, "তুই তো মাইরি ফেলুদা হয়ে উঠেছিস! কিন্তু তোর না সামনে বিয়ে!"

"তো? মেয়ে তুলবি তুই। আমি তো স্রেফ তোকে হেলপ করছি। তোকে হেলপ করার সঙ্গে বিয়ের কী সম্পর্ক!" আহির ফের হাসল।

দু' পেগ খেয়ে ওরা বার থেকে বেরোল। উপরে নিজেদের রুমে যাওয়ার আগে আহির গিয়ে কিচেনে নির্দেশ দিল রাতের খাবার ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। রুমে ঢুকে দু'জন আগে হাত-পা ধুয়ে নিল। সঞ্জয় এক ফাঁকে অনন্যাকে ফোন করল। সাংসারিক কথা হল দু'জনের। সেই কথা শুনতে-শুনতে হাই উঠল আহিরের।

এর পর সঞ্জয় বিছানায় উঠে গুছিয়ে বসল। খাবার আসার পর কম্বল জড়িয়ে ও একটা রুটি দিয়ে সামান্য মাংস খেল। তারপর কোনওমতে প্লেট রেখে হাত ধুয়ে বলল, "আমি শুয়ে পড়ছি। খুব টায়ার্ড লাগছে।"

আহির বাধা দিল না। আত্রেয়ীর চিন্তা সমানে ওর মাথায় ঘুরছে। সেই চিন্তা নিয়েই ও খাওয়া শেষ করল। প্লেট রেখে বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে এসে সোফায় বসল। এখানে এখন প্রবল ঠান্ডা। বারে শুনছিল তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গিয়েছে। রাতে বোধ হয় আরও নামবে। আহির পরে আছে একটা উলিকট আর জিনসের ট্রাউজ়ার্স। তাতেও ঠান্ডা আটকাচ্ছে না।

ট্রাউজ়ার্সের পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে বিছানার পাশে রাখল ও। এবার আলো নিভিয়ে শুতে হবে। কারণ, সঞ্জয়ের নাক ততক্ষণে প্রবলভাবে ডাকতে শুরু করেছে। ঘড়ি দেখল আহির। বেশি বাজেনি। দশটা পাঁচ। তবু মুসৌরিতে এখন গভীর রাত। কিন্তু আলো নেভানোর আগেই আহিরের মোবাইল বেজে উঠল জোরে। তাড়াতাড়ি এসে ফোনটা নিয়ে ও দেখল অনিন্দিতা।

আহির ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে অনিন্দিতার গলা ভেসে এল, "কী গো সারাদিনে একটাও ফোন নেই! আছ কেমন?"

"আছি ঠিকঠাক। তুমি ফোন করোনি কেন?"

"বহুবার ট্রাই করেছি। তোমায় ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না। হোয়াটসঅ্যাপও করেছি। দেখলাম ঢুকেছে। কিন্তু তুমি দেখোনি। খুব চিন্তা হচ্ছিল।"

"আমরা গিয়েছিলাম তিহরি," আহির বলল, "জায়গাটা এখান থেকে গাড়িতে তিন ঘণ্টা। আরও ভিতরে। তাই বোধ হয় পাওনি..."

আহিরের কথাগুলো ফাঁকা ঘরে বেশ জোরেই শোনাল। সঞ্জয়ের নাক ডাকা থেমে গেল। আহির তাই একটা মোটা চাদর নিয়ে রুমের দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এল। এই বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যায়। আহির দেখতে পেল, অনেক দোকান ঝাঁপ ফেলছে। রাস্তার ধারের দোকানগুলোও গুটিয়ে ফেলছে জিনিসপত্র। কিন্তু বারান্দায় দাঁড়াতেই ওর সারা শরীর কেঁপে উঠল ঠান্ডায়। এত প্রবল ঠান্ডায় ও আগে কখনও আসেনি।

অনিন্দিতা বলল, "হ্যালো, কথা বলছ না কেন?"

আহির কোনওমতে বলল, "ঠান্ডায়। রুমে সঞ্জয় ঘুমোচ্ছে। তাই বাইরে এলাম।"

"এ বাব্বা, তুমি তা হলে ভিতরে যাও। আমি কাল ফোন করছি। সারাদিন তোমায় না পেয়ে কেমন পাগল-পাগল লাগছিল। তাই এত রাতে ফোন করেছি।"

"আরে নাহ, কথা বলো। অসুবিধে নেই," আহির হাসল। ঠান্ডাটা খানিক সয়ে এসেছে ওর।

"আসলে এখন তোমায় খুব পেতে ইচ্ছে করছে। তুমি যে কী দুষ্টু অভ্যেস করে দিয়েছ," লাজুক গলায় বলল অনিন্দিতা, "কতগুলো দিন তোমায় দেখি না। বাড়িতে, স্কুলে সবাই খালি বিয়ের কথা বলছে। তাই আরও বেশি-বেশি করে তোমার কথা মনে পড়ছে।"

আহির হেসে কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার দিকে চোখ পড়তে ওর কথা বন্ধ হয়ে গেল। আহির দেখতে পেল, ওদের হোটেলের সামনে দিয়ে আত্রেয়ী প্রায় ছুটতে-ছুটতে হয়ে কোথাও চলেছে। সঙ্গে বাকি তিনটে মেয়ে। যেতে-যেতে ওরা সতর্ক চোখে চারপাশ দেখে নিচ্ছিল। আত্রেয়ীরা এত কাছ দিয়ে চলে গেল যে, একবার মুখ তুলে তাকালেই আহিরকে দেখতে পেত। এত রাতে কোথায় যাচ্ছে মেয়েগুলো?

ফোনের রিসিভার দিয়ে অনিন্দিতার গলা ভেসে এল, "হ্যালো, তুমি কি লাইনে আছ?"

"আছি। কিন্তু আমরা খুব ঠান্ডা লাগছে। কালকে কথা বলবে?" আত্রেয়ীকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে-করতে আহির বলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই করব। তুমি ঘরে ঢুকে যাও। শরীর খারাপ কোরো না। আর শোওয়ার আগে আমার কথা ভাববে," অনিন্দিতা ফোন ছাড়ার আগে আদুরে গলায় বলল।

"তুমি ছাড়া আমার আর আছে কী বলো তো!" আহির হেসে ওকে ভরসা দিল। তারপর ফোনের লাইন কেটে দ্রুত ঘরে ঢুকল।

সঞ্জয় ঘুমিয়েই যাচ্ছে। আহির নিঃশব্দে চাদর রেখে জ্যাকেট পরল। টুপিটা নিল। তারপর চাবি নিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে আটকে বেরিয়ে পড়ল।

হোটেলের বাইরে আসতেই ঠান্ডাটা আরও জাপটে ধরল। চারপাশে হালকা কুয়াশাও। আহির নামতে-নামতে আত্রেয়ীরা কুয়াশায় মিলিয়ে গিয়েছে। নীচের ঠোঁট কামড়াল আহির। গেল কোথায় মেয়েগুলো? এত রাতেই বা কী করতে বেরিয়েছে? ব্যাপারটা দেখা দরকার।

আত্রেয়ীরা যেদিকে গেল সেদিকে চুপিসারে এগিয়ে গেল আহির।

॥ ৫ ॥

মুসৌরির রাস্তা এখন ফাঁকা। অন্য সময় বোধ হয় আরও ফাঁকা থাকে। কিন্তু সামনে বড়দিন। তার পরপরই ইংরেজি নতুন বছর। উৎসবের মেজাজে রয়েছে শহর। তাই কুয়াশা থাকলেও রাস্তার আলোয় হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল না। কিছু লোকজনও রয়েছে।

আহির দ্রুত পা চালাল। সারা শরীর ঠান্ডায় শিরশির করছে। তবু ওর অদম্য কৌতূহল। এই রাতে কোথায় গেল মেয়েগুলো? ওদের হাঁটার ধরনও স্বাভাবিক নয়। চোখের চাউনিতে অদ্ভুত সতর্কতা। যদি এমনই রাতের শহরে ঘুরতে বেরোয় তা হলে চারজনের আচরণ অমন হবে কেন?

ম্যালের মুখের দিক থেকে ওরা হাঁটতে-হাঁটতে এসে চলে গিয়েছে অন্য দিকে। ওদিকে এখনও যাওয়া হয়নি আহিরদের। পরশু বিকেলে এসে যেটুকু ঘুরেছে সেটা ম্যাল রোডের মুখটা পর্যন্ত। আর আজ সকালে রেডি হয়েই তো তিহরি রওনা দিল। ফিরেও ঢুকে পড়ল হোটেলে। তাই ওপাশে কী আছে আহির জানে না! একবার ভেবেছিল যাবে। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি। সঞ্জয়কে কিছু না বলে হুট করে অন্ধকারে মেয়েগুলো পিছু নেওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কথা নয়। কার মনে কী রয়েছে কেউ জানে না। একটাই ভরসা আহিরের পকেটে মোবাইল আছে।

আহির প্রায় ছুটতে শুরু করল। অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে মেয়েগুলো। না দৌড়লে ধরা যাবে না ওদের। কুয়াশা বিছানো রাস্তায় খানিক যেতেই ও দেখতে পেল আত্রেয়ীদের। একইভাবে চলেছে। ওরা যেদিকে চলেছিল সেদিকে মুখ করে দাঁড়ালে মুসৌরির ম্যাল রোডের বাঁ পাশে পাহাড়। ডান পাশে খাদ। তবে খাদ মানে বিপজ্জনক কিছু নয়। তার আগে রেলিং আছে। অনেক দোকান, হোটেলও আছে। তবু বাঁ দিকটা বেশি অন্ধকার। আহির সেই অন্ধকারে মিশেই পিছু নিল। মেয়েগুলোকে অনুসরণ করতে অসুবিধে হচ্ছিল না ওর।

মাঝে-মাঝে এক-একটা মেয়ে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল। কেন কে জানে! আত্রেয়ী তো বার কয়েক পিছনে ফিরল। তখন পাহাড়ের গায়ে আরও সেঁটে যাচ্ছিল আহির। আত্রেয়ী কেন কারও পক্ষেই আন্দাজ করা সম্ভব নয় যে, এই প্রবল ঠান্ডায় আহির ওদের পিছু নিয়েছে। রাস্তার লোকজনও ওকে সেভাবে সন্দেহের চোখে দেখেনি। মুসৌরিতে আসার পর আহির শুনেছে, এখানে চুরি-টুরি বিশেষ হয় না। লোকজন ভারী সজ্জন। তাই কেউ ভাবতেই পারবে না, গভীর রাতে একটা ছেলে পিছু নিয়েছে চারটে মেয়ের।

মেয়েগুলো নিজেদের মধ্যে কিছু নিয়ে আলোচনা করছিল। এত দূর থেকে সেই কথা শুনতে পাচ্ছিল না আহির। তবে এইটুকু বুঝতে পারছিল, কোনও শলাপরামর্শ করছে চারজন। কিন্তু ওরা যাচ্ছে কোথায়? কী এমন শলাপরামর্শ যা হোটেলের ঘরে করা যায় না! চারজনকে অনুসরণ করতে-করতে এই সবই ভাবছিল আহির। ম্যাল রোডের এদিকে দোকান কম। কিংবা রাত বাড়ায় উঠে গিয়েছে। তবে রাস্তায় আলোর খামতি নেই। এখন তো মাথার উপর আলোর মালা টাঙানোর চল হয়েছে। কলকাতার অনেক বিয়েবাড়িতেও এইভাবে লাইটিং করা হয়। মুসৌরিতেও হয়েছে বড়দিন উপলক্ষে। সেই ধরনের আলোও রয়েছে ওর মাথার উপরে।

কিন্তু মেয়েগুলো হেঁটেই যাচ্ছে। কোনও থামাথামি নেই। অনেকটা হাঁটার পর মেয়েগুলো রাস্তার একটা লোককে কিছু জিজ্ঞেস করল। লোকটা হাত দিয়ে কিছু দেখাল। চারজন সেদিকে এগিয়ে গেল। আহিরও যথারীতি পিছু-পিছু চলল। মেয়েগুলো যে লোকটাকে জিজ্ঞেস করেছিল, সেই লোকটার কাছাকাছি এসে আহিরের একবার জানতে ইচ্ছে হল, মেয়েগুলো কী জানতে চেয়েছিল লোকটার কাছে!

কিন্তু লোকটা নেশা করেছে। নিজের মনে সুর ভাঁজছে। গলাটাও হেঁড়ে। লোকটাকে কিছু প্রশ্ন করলেই হয়তো গাঁক-গাঁক করে জবাব দেবে। ফাঁকা রাস্তায় সেই আওয়াজ বহু দূর পর্যন্ত ছড়াবে। আত্রেয়ীদের কানেও যেতে পারে। ওরা পিছন ফিরলেই দেখতে পাবে আহিরকে। বাকিরা না বুঝলেও আত্রেয়ী বুঝবে যে, আহির ওদের পিছন-পিছন চলেছে। তখন হবে আর-এক কেলেঙ্কারি। তাই লোকটাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই আহির এগিয়ে চলল।

আত্রেয়ীরা অনেকটা হেঁটে গিয়ে আরও একজনকে কিছু জিজ্ঞেস করল। তারপর খানিক এগিয়ে বাঁ পাশে পাহাড়ে গা বেয়ে একটা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। থমকে গেল আহির। যে সিঁড়ি বেয়ে আত্রেয়ীরা উঠছে সেটা পুরো অন্ধকার। অন্ধকারে মেয়েগুলো উপরে কোথায় যাচ্ছে! আহির ঠাওর করতে পারল না। আত্রেয়ীরা অনেকটা উঠে যাওয়ার পর ও সিঁড়ির মুখে এল। মেয়েগুলোকে আর চোখে পড়ছে না। সিঁড়ির মুখটা এমনই, ওরা চাইলেও উপর থেকে ঝুঁকে দেখতে পাবে না।

এখন কী করবে আহির? সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবে? নাকি ফিরে চলে যাবে। পরে এসে খোঁজ করবে? কিন্তু এত দূর এসে কিছুতেই ফিরে যেতেই ইচ্ছে করছিল না ওর। আত্রেয়ীর চলাফেরায় কোথায় যেন একটা গোলমাল ধরা পড়ছে। কী সেই গোলমাল? সেটা বোঝা দরকার। আহির সিঁড়ির মুখ থেকে সরে এল। তারপর রাস্তার অপর পারে গিয়ে উপরের দিকে তাকাল। এবার চারটে মেয়েকে দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ আহিরের ফোনটা বেজে উঠল। ফাঁকা রাস্তায় আওয়াজটা জোরেই শোনাল। তাড়াতাড়ি ফোনটা পকেট থেকে বের করে ও দেখল সঞ্জয় ফোন করেছে। দ্রুত ফোনটা কেটে দিল আহির। কিন্তু সঞ্জয় থামল না। আবার ফোন করল। নিরুপায় হয়ে ফোনটা ধরল আহির। বলল, "হ্যাঁ বল!"

"তুই কোথায় ভাই!" ঘুম-ঘুম চোখে প্রশ্ন করল সঞ্জয়।

"আমি একটু বেরিয়েছি। তোকে পরে সব বলব," আহির প্রায় ফিসফিস করে বলল। আর বলেই বুঝল, ভুল করে ফেলেছে।

সঞ্জয়ের গলায় এতক্ষণ ঘুমের জড়তা ছিল। এবার সেটা কেটে গেল। সঞ্জয় বোধ হয় উঠে বসেছে। স্পষ্ট গলায় জানতে চাইল, "তুই ঠিক কোথায় বল তো?"

"আরে, বলছি তো পরে বলব।"

"তুই কোথায়!" কেটে-কেটে বলল সঞ্জয়, "দরজা বাইরে থেকে আটকে গিয়েছিস কেন?"

"আমি একটু বেরিয়েছি..."

"জানি তুই ঘরে নেই। কোথায় বেরিয়েছিস?"

"তুই ঘুমিয়ে পড়ার পর অনিন্দিতা ফোন করেছিল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। তখন দেখলাম ওই শ্রীরাধিকা বাকিদের নিয়ে অভিসারে চলেছে।"

"মানে!"

"হ্যাঁ রে, অত রাতে চারটে মেয়ে বেরিয়েছে। ভাব! এই মুসৌরির মতো দূর দেশে চারটে বাঙালি মেয়ে রাত্তিরবেলা কোথায় যেন চলেছে।"

"তুই কি ওদের সঙ্গে?"

"না, ফলো করছি।"

সঞ্জয় এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, "তুই কি পাগল হয়ে গিয়েছিস আহির? অচেনা মেয়েগুলোকে নিয়ে মজে আছিস। এখন রাতে বেরিয়েছিস মেয়েগুলোকে ফলো করে। কেন? তুই এক্ষুনি ফিরে আয়। আমার ভয় হচ্ছে তুই কোনও বিপদে পড়তে চলেছিস।"

"আরে ধুর কোনও বিপদ নেই এতে। দাঁড়া না, কেসটা বুঝতে দে।"

"বুঝে করবি কী? ওদের একজনের নামও তুই জানিস না। আমার তো ধারণা ওরা কোনও খারাপ পেশার সঙ্গে যুক্ত। কোনও ভদ্র মেয়ে এই রাতে চুপি-চুপি কেন বেরোবে? বাই দ্য ওয়ে, তুই এখন কোথায় আছিস এগজ্যাক্টলি?"

"আমাদের হোটেল ছাড়িয়ে অনেকটা এসেছি। এখানে পাহাড়ের গা দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে, সেই সিঁড়ির উলটো দিকে দাঁড়িয়ে।"

"ফিরে আয় এক্ষুনি।"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি। একটু দাঁড়া!"

"আহির ভুলে যাস না, সামনে তোর বিয়ে। এখন যদি ফালতু কেস খাস, তা হলে কিন্তু খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।"

"আমি কোনও কেস খাব না। রাস্তায় এখনও লোক চলাচল করছে। তুই অহেতুক ভয় পাচ্ছিস।"

"লোকে এভাবেই বিপদে পড়ে। তুই এবার বাড়াবাড়ি করে ফেলছিস। আমার কথা শোন। চলে আয়। কাল সকালে দু'জনে গিয়ে দেখব ওই সিঁড়ির উপরে কী আছে। আমি যতটুকু জানি, এই জায়গায় বিশেষ গন্ডগোল হয় না। দিনের বেলা তো নয়ই। তুই ব্যাক কর।"

"আমায় আর পাঁচটা মিনিট সময় দে। আমি ফিরছি।"

"তোকে আমি পুরোপুরি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। যদি এই সময়ের মধ্যে না ফিরিস, তা হলে আমি কিন্তু হোটেলের রিসেপশনে ফোন করব। ভুলে যাস না, এটা সরকারি হোটেল।"

"ঠিক আছে," বলে আহির ফোন ছাড়ল। কারণ উপরের দিকে ঠায় তাকিয়ে থেকে ও এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে মেয়েগুলোকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটা একতলা ঘর। তার ভিতর বাল্বের আলো জ্বলছে। অন্তত নীচ থেকে তাই মনে হল। মেয়েগুলো এতক্ষণ ওই ঘরে ছিল। এবার ঘর থেকে বেরিয়ে সামনে ফাঁকা চত্বরে এল। সঙ্গে একটা লোক। লম্বা। চওড়া কাঁধ। গায়ে গরম জামা। মাথায় টুপি। লোকটার সঙ্গে মেয়েগুলো চত্বর পেরিয়ে ওপাশের আর-একটা ঘরে ঢুকল। সেই ঘরে টিউব লাইট জ্বলছে। চারটে মেয়ে লোকটার পিছু-পিছু ওই ঘরে ঢুকে গেল।

আহির ধরতে পারল না কী হচ্ছে। লোকটা কে? কেনই বা এত রাতে লোকটার সঙ্গে গিয়ে দেখা করল আত্রেয়ীরা? রাত বাড়ছে। সেই সঙ্গে ঠান্ডাও। চারপাশে কেমন ছমছমে কুয়াশা ছড়িয়ে। আহির আশপাশ তাকাল। রাস্তা এখন অনেকটাই ফাঁকা। লোকজন প্রায় নেই। মাঝে-মাঝে স্থানীয় দোকানদারেরা মালপত্রের ব্যাগ নিয়ে চলে যাচ্ছে। পর্যটকরা আর রাস্তায় বেরোয়নি। মোবাইলের ঘড়িও বলছে, সময় এগারোটা ছুঁই-ছুঁই।

কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না আহির। ফেরত চলে যাবে? ও জানে সঞ্জয় বাজে কথা বলছে না। পাঁচ মিনিট পেরোলে সঞ্জয় সত্যিই রিসেপশনে ফোন করবে। নাকি সঞ্জয়কে বলে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। কিন্তু উপরে কী চলছে? এমন সময় আহির দেখতে পেল একজন দু' হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে আসছে।

লোকটা কাছাকাছি আসতে আহির জানতে চাইল, "এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে গেলে কি কারও বাড়িতে যাওয়া যায়?"

লোকটা মালপত্র নিয়ে যেতে গিয়ে থেমে গেল। একবার উপরে তাকাল। তারপর বলল, "ওটা তো পুলিশ চৌকি।"

আহিরকে আর কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে লোকটা ফের হাঁটা লাগাল। আর আহির হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল উপরের ঘরগুলোর দিকে। পুলিশ চৌকি! মানে থানা। এত রাতে থানায় কী করছে আত্রেয়ীরা? ওদের কোনও বিপদ হল না তো?

সঞ্জয়কে এবার ফোন করল আহির। ফোন ধরেই সঞ্জয় বলল, "তুই কি ফিরছিস?"

"শোন, আমি ওখান থেকে দাঁড়িয়েই কথা বলছি। মেয়েগুলো যেখানে গিয়েছে সেটা মুসৌরি থানা।"

"থানা!" এবার সঞ্জয়ও অবাক হল, "তুই থানার বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস? এবার তো তোকে পুলিশ ধরবে!"

"এখানে পুলিশ, চোর, ডাকাত, মিলিটারি কেউ নেই। রাস্তা ফাঁকা। কেউ এসে আমায় ধরবে না। কিন্তু মাঝ রাতে চারটে মেয়ে কেন থানায় গেল বল তো?"

"তুই ভাই জেনে কী করবি! আমি বুঝতে পারছি, তোকে এখানে টেনে এনে বিরাট বোকামি করেছি। এখন যদি তুই ফাঁসিস, সঙ্গে আমিও ফাঁসব।"

সঞ্জয়ের কথায় আমল দিল না আহির। চাপা গলায় বলল, "শোন, এতক্ষণ ব্যাপারটা ছেলেখেলা ছিল। কিন্তু এবার আমার সত্যিই জানতে ইচ্ছে করছে, কলকাতার চারটে মেয়ে এত রাতে কেন মুসৌরি থানায় গেল। তুই শুয়ে পড়। আমি পুরো ব্যাপারটা দেখে ফিরব।"

সঞ্জয় কিছু বলতে গেল। আহির লাইন কেটে দিল। তারপর অন্ধকার একটা কোণ ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। আত্রেয়ীদের এত রাতে কেন থানায় আসতে হল সেটা দেখা দরকার। আর তা দেখতে হলে অন্ধকারে ওকে অপেক্ষা করতে হবে।

॥ ৬ ॥

মিনিট কুড়ি অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে থাকল আহির। আত্রেয়ীদের কোনও পাত্তা নেই। এদিকে রাত বাড়ছে। চারপাশ ফাঁকা। ছড়িয়ে পড়ছে কুয়াশা। ঠান্ডাও জব্বর। এই ঠান্ডা কলকাতার ঠান্ডা নয়। এই ঠান্ডায় কিছুক্ষণ দাঁড়ালে মনে হবে হাওয়া চাবুক চালাচ্ছে। তবু আহির নড়ল না। পরপর দুটো হাঁচি পড়ল ওর। শরীরও ক্লান্তি। গাড়িতে করে তিহরি আসা-যাওয়ায় ছ' ঘণ্টা লেগেছে। তার উপর বোটিং। এই পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটাহাঁটি। আহির আর ধকল নিতে পারছিল না। কিন্তু ফেরার উপায় নেই।

তাই ও উপর দিকে লক্ষ রাখছিল। সেই যে আত্রেয়ীরা গিয়ে থানার ডান পাশের ঘরে ঢুকেছে, এখনও বেরোয়নি। আহিরের হঠাৎ ইচ্ছে হল, উপরে উঠে একবার দেখে আসার। দুই ঘরের মাঝখানে যে ফাঁকা চত্বর সেখানে কোনও লোকজন নেই। ও যদি উঠে সন্তর্পণে ডান পাশের ঘরে উঁকি মারে, কেউ কি টের পাবে?

কথাটা মাথায় আসতেই আহির পা টিপে-টিপে সিঁড়ির কাছে গেল। আশপাশ দেখল। কেউ কি নজর রাখছে ওর উপর? কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। রাস্তা শুনশান। তা ছাড়া কুয়াশাতেও অনেকটা জায়গা ঢেকে। কুয়াশার জেরে ও যেমন দূরের কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, তেমন দূরের লোকজনেরাও তো ওকে দেখতে পাবে না। অতএব তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ও উপরে উঠে গেল।

উপরে উঠে ও বুঝতে পারল, পুরো জায়গাটাই পুলিশ চৌকি। বাঁ পাশে একটা ঘর। ডান পাশে আর-একটা ঘর। ডান পাশেরটাই বড়। সম্ভবত ওটাই মূল অফিস। সেই অফিসের বাইরে দু'জন পুলিশ কনস্টেবল বসে। অফিসের ভিতরে কোনও কিছু নিয়ে হইচই চলছে। কেউ জোরে-জোরে কথা বলছে। আত্রেয়ীদের কি জেরা করছে পুলিশ?

আহির হয়তো আরও একটু এগিয়ে দেখত। কিংবা হয়তো সোজা ভিতরে চলেই যেত। আচমকা ওর মোবাইল ফের প্রবল জোরে বেজে উঠল। আচমকা এমন নিস্তব্ধ জায়গায় মোবাইল বেজে ওঠায় আহির তো বটেই থানার বাইরে থাকা কনস্টেবলরাও চমকে উঠল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে আহির দেখল সঞ্জয় আবার ফোন করেছে। ওদিকে মোবাইলের শব্দে দু'জন কনস্টেবল উঠে দাঁড়িয়েছে। আহির দ্রুত মোবাইলটা সাইলেন্ট করল। তিন লাফে পিছিয়ে ঝড়ের গতিতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। প্রবল ঠান্ডা, থানা, নিঝুম পরিবেশ, হঠাৎ সঞ্জয়ের ফোন, কনস্টেবলদের উঠে দাঁড়ানো সব মিলিয়ে আহির ভয় পেয়ে গেল।

আত্রেয়ীরা কী করতে থানায় এসেছে ও জানে না। কিন্তু হঠাৎ যদি এখন পুলিশ এসে ওকে ধরে, জানতে চায়, কেন এত রাতে আহির থানায় এসে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে, কী জবাব দেবে? আহির যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে তখন সঞ্জয় আবার ফোন করল। আহির তাড়াতাড়ি ফোন ধরে বলল, "ফিরছি। তুই এখন রাখ। বাকি কথা গিয়ে বলছি।"

সঞ্জয়কে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ও লাইন কেটে দিল। তারপর একবার উপর দিকে তাকাল। পুলিশের কনস্টেবলরা কি নামছে? কিন্তু কাউকে নামতে দেখা গেল না। তবে উপর থেকে কয়েকজনের গলার আওয়াজ ভেসে এল।

আহিরের হঠাৎ প্রবল কাঁপুনি দিয়ে শীত করতে লাগল। আর সময় নষ্ট না করে ও সোজা হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল। কিছু দূর গিয়ে ও পিছনে ফিরে তাকাল। কেউ কি তাড়া করে আসছে? কুয়াশায় কাউকে দেখা গেল না। ক'টা বাজে এখন? কাঁপুনি থামছে না। তবু পকেট থেকে মোবাইল বের করে ও সময় দেখল। পৌনে বারোটা। এতক্ষণ ধরে ও রাস্তায় ঘুরছে! এতক্ষণ আত্রেয়ীরাই বা থানায় কী করছে?

আহির আর ভাবতে পারল না। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। একে উঁচু-নিচু রাস্তা। তার উপর প্রবল ঠান্ডা। এখন সঞ্জয়কে ফোন করে ডাকা যায় ঠিকই। কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। হাজার হোক সঞ্জয় অফিস কলিগ। ছোটবেলার বন্ধু তো নয়।

টুকটুক করে হাঁটতে-হাঁটতে আহির হোটেলের সামনে এল। হোটেলের কাচের দরজা বন্ধ। আহির টোকা দিতেই একজন ভিতর থেকে হাঁক দিল, "কৌন?"

আহির জবাব না দিয়ে ফের টোকা দিল। এবার লোকটা বেরিয়ে এল। আহির দেখল, এই লোকটাই সন্ধের পর রিসেপশনে বসেছিল। লোকটাও অবাক হয়েছে আহিরকে বাইরে থেকে আসতে দেখে। তাই বলল, "কাহাঁ গয়ে থে আপ?"

"থোড়া কাম থা," সংক্ষেপে জবাব দিল আহির।

লোকটা আর কথা বাড়াল না। কাচের দরজার লক খুলে দিল। আহির ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠল। তারপর নিজের ঘরের দরজার লক খুলে ভিতরে পা দিতেই স্বস্তি পেল। ঘরে আলো জ্বলছে। হিটারের জন্য ঘর বেশ গরম। কিন্তু হিটারের চেয়েও বোধ হয় গরম হয়ে বিছানায় বসে আছে সঞ্জয়। আহির জ্যাকেট, টুপি খুলে টেবিলে রেখে কম্বলের ভিতর সেঁধিয়ে গেল। এখানে এক-একটা কম্বল দুটো মোটা কম্বল জুড়ে তৈরি করা। তবু যেন শীত কাটছিল না।

সঞ্জয় চট করে কিছু বলল না। আহির বুঝল পরিস্থিতি গুরুতর। তাই

সামান্য ধাতস্থ হয়ে যা-যা হয়েছে সব বলল সঞ্জয়কে। শুনে সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, "তোকে তো চিরদিন বুদ্ধিমান বলেই দেখে এসেছি! এখানে এসে কী হল তোর? অন্য কিছু ছেড়ে দে, আজ যদি কনস্টেবল দুটো তোকে ধরত, কী হত বল তো?"

আহির হাসল। বলল, "আমিও কিছু বানিয়ে বলে দিতাম।"

"পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া কি অত সোজা?"

সঞ্জয় আর কথা বাড়াল না। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আলো নেভাল। নীল রংয়ের নাইটল্যাম্পে ভরে গেল গোটা ঘর। আহির তখনও কম্বলের ভিতরে কাঁপছে। ওর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে খানিক আগের দৃশ্যগুলো। কাঁপতে-কাঁপতেই আহির উপলব্ধি করল, বড্ড বোকামি হয়ে গিয়েছে। কনস্টেবলগুলো যদি ওকে ধরতে পারত, তা হলে কেলেঙ্কারি হয়ে যেত। আর এই সব ভাবতে-ভাবতে আহির আরও একটা ব্যাপার খেয়াল করল, আত্রেয়ীরা যে হোটেলে রয়েছে সেটা নির্ঘাত ম্যাল রোডের মুখ থেকে ওদের হোটেলের মাঝামাঝি কোনও জায়গায়। তা না হলে ওদিক থেকে চারটে এসে মেয়ে ওদের হোটেল পেরিয়ে থানায় যেত না।

কথাটা ভাবতেই কাঁপুনির মধ্যেও হালকা হাসি ছড়িয়ে পড়ল ওর মুখে। ওদিকে সঞ্জয়ের নাক ফের গর্জন করছে। তবে আহির একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হল, কাল আত্রেয়ীদের হোটেল খুঁজতে বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না। এইটুকু জায়গা খেয়াল রাখলেই হোটেলের সন্ধান পাওয়া যাবে। পাশ ফিরে শুল আহির। কাঁপুনি থেমে ঘুম নামছে চোখে।

পরদিন ঘুম ভাঙতে দেরি হল আহিরের। সঞ্জয়েরও দেরি হয়েছে। তবে আহিরে আগে ও উঠে দাঁত মেজে নিয়েছে। দুন ভ্যালির দিকের বড়-বড় জানলাগুলোর পরদা সরিয়ে দিয়েছে। সেই জানলা দিয়েই শীতের রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। রোদই ঘুম ভাঙাল আহিরের। একটা বড় হাই তুলে ও উঠে বসল। সামনে তাকিয়ে উপত্যকার সবুজ ঢল দেখতে পেল। হঠাৎ অনিন্দিতার কথা মনে পড়ল আহিরের। সোজা হয়ে ও বসল।

সঞ্জয় ততক্ষণে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। ওকে উঠে বসতে দেখে বলল, "চা-টা ঘরেই বলছি। তারপর ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরোব।"

"কোথায়?" আহির আবার হাই তুলতে-তুলতে প্রশ্ন করল।

"কেম্পটি ফলস।"

নিজের গলার স্বর কানে যেতেই আহিরের ঘুম-ঘুম ভাব কেটে গেল। ওর মনে পড়ে গেল আগের রাতের ঘটনা। আজ আত্রেয়ীদের হোটেল খুঁজে বের করতে হবে। জানতে হবে, অত রাতে মেয়েগুলো থানায় গেল কেন! সবচেয়ে বড় কথা, আত্রেয়ীর সঙ্গে থাকা মেয়েগুলোই বা কারা!

তাই আহির আড়মোড়া ভেঙে বলল, "পরশু এসেছি এখানে। সেদিন টায়ার্ড ছিলাম। গতকাল কিছু বোঝার আগেই টানতে-টানতে তিহরি নিয়ে গেলি। আজ আবার কেম্পটি ফলসের বায়না জুড়েছিস। আমরা তো এখানে ন'টা দিন গোটা পাব। মুসৌরিতে এত কিছু তো দেখার নেই। তা হলে খামোখা আজ কেম্পটি দৌড়তে যাব কেন? কাল দিনরাতের ধকলে বেশ ক্লান্ত লাগছে। তার উপর এই পাহাড়ি রাস্তা। আজ এখানেই ঘুরব। তেমন হলে কাল কেম্পটি যাব।"

"তুই কাল যা করেছিস, সেটা একেবারে ফালতু কাজ।"

"শোন, আমি প্রথমে তোর গার্লফ্রেন্ড জোগাড়ের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কেস সিরিয়াস..."

"আমরা ঘুরতে এসেছি আহির। গোয়েন্দাগিরি করতে নয়। তুই ওদের পিছন-পিছন ঘোরা থামা। ঠিক আছে, আজ এখানেই ঘুরব। কিছু তো বাড়ির জন্য কেনাকাটা করতে হবে। সেটা আজই করব।"

একটু বাদে স্নান-ব্রেকফাস্ট সেরে দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ল। হোটেলের উলটো দিকে একটা ফলের রসের দোকান। আহির প্রথম সেখানে দুটো কমলালেবুর রসের অর্ডার দিল। সঞ্জয় ততক্ষণে মোবাইল ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতে লাগল চারপাশের। একটা সেলফি তুলল ওদের। দু'জনের হাতে কমলালেবুর রসের মাগ। দু'জন সেই মাগ এমনভাবে ধরল যেন বিয়ার খাচ্ছে।

ছবি তোলার পর সঞ্জয় বলল, "এটা ফেসবুকে দেব।"

আহিরের ফেসবুক নিয়ে বিশেষ আগ্রহ নেই। এর পর ওরা টো-টো করে ম্যাল রোড ঘুরতে থাকল। ভুট্টা খেল। ডিমসেদ্ধ খেল। একটা দোকানে ঢুকে সঞ্জয় নিজের জন্য দুটো সোয়েটার কিনল। আহিরকে বলল, "তুই কিছু কিনবি না?"

আহির হাই তুলল। বলল, "এই সব জিনিসই কলকাতায় পাওয়া যাবে। আমার ধারণা দামও কম পড়বে।"

"সে আমিও জানি। কিন্তু স্মৃতিচিহ্ন বলেও তো একটা ব্যাপার আছে।"

অগত্যা আহির দুটো উলের সালোয়ার-কামিজের পিস কিনল অনিন্দিতার জন্য। সঞ্জয়ও তেমন একটা পিস কিনল অনন্যার কথা ভেবে।

দুপুর তিনটে নাগাদ দু'জনের জোর খিদে পেল। ম্যাল রোডের মুখের দিকে একটা রেস্তরাঁয় ঢুকল দু'জন। মটন রোগন জোশ আর তন্দুরি রুটিও খাওয়া হল। বেশ ভাল খেতে। দু'জনে তৃপ্তি করেই খাওয়া শেষ করল। তারপর মুখে মৌরি ফেলে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়েই আহির থমকে গেল। ঠিক ওদের সামনে দিয়েই আত্রেয়ীরা হেঁটে যাচ্ছে। বোধ হয় কোনও জায়গা ঘুরে ওরা ফিরল। সদ্য গাড়ি ছেড়ে নিজেদের হোটেলের দিকে ওরা চলেছে।

আহির ইশারায় সঞ্জয়কে ওদের দেখাল। তারপর চাপা গলায় বলল, "চল।"

সঞ্জয় এবার আহিরের জ্যাকেট টেনে ধরল। বলল, "চল মানে! কাল অত রাতে পুলিশের তাড়া খেয়ে এসেও তোর শিক্ষা হয়নি!"

আহির বলল, "ওদের হোটেল চিনতে হবে।"

"হোটেল নিশ্চয়ই ধারেকাছে। তুই তো বললি, এদিক থেকেই ওরা থানায় গিয়েছিল।"

আহির মেয়েগুলোর দিকে চোখ রেখে এগোচ্ছিল। সঞ্জয়ের কথা শুনে ওর দিকে ফিরে বলল, "শাবাশ তোপসে। তোর হবে।"

সঞ্জয় হয়তো আরও কিছু বলত। কিন্তু আহির ততক্ষণে এগিয়ে গিয়েছে। নিরুপায় হয়ে সঞ্জয়ও পিছু নিল।

মেয়েগুলো নিজের মধ্যে গল্প করতে-করতে হাঁটছিল। যেন কাল রাতে কিছুই হয়নি। সোজা গিয়ে ওরা একটা মোড়ে পড়ল। বাঁ দিকে একটা রাস্তা ঢুকে গিয়েছে। মেয়েগুলো সেই রাস্তা ছাড়িয়ে আর-একটু এগিয়েই বাঁ দিকের পাহাড়ের গায়ের একটা সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করল। আহির খানিক দূরত্ব রেখেই এগোচ্ছিল। মেয়েগুলো যে সিঁড়ি ধরে উঠছিল, সেই সিঁড়ি কোথায় গিয়েছে জানতে ও উপর দিকে তাকাল। দেখল উপরে একটাই হোটেল। নাম, পাইনউড।

সঞ্জয়ও এসে দাঁড়িয়েছিল ওর পিছনে। মেয়েগুলোকে উঠতে দেখে বলল, "এবার?"

আহির জবাব দিল, "অপারেশন পাইনউড।"

॥ ৭ ॥

"তুই কোনওদিন মার্লিন মনরোর ঠোঁটটা খেয়াল করেছিস? মনরোর আসল অ্যাপিল রয়েছে ওই ঠোঁটেই," সঞ্জয় হাত নেড়ে বোঝাতে থাকল।

আহির চুপচাপ গ্লাসে চুমুক দিল। তিন পেগ হয়ে গিয়েছে। সঞ্জয় এখন ভাসছে। এখন বাধা দেওয়া ঠিক হবে না।

সঞ্জয় বলল, "ওই কেষ্টপুরের মেয়েটার ঠোঁটেও সেই ম্যাজিক রয়েছে।"

"তুই মনরো আর ওর ঠোঁট মিলিয়ে দেখলি কবে?" আহির শান্ত গলায় প্রশ্ন করল।

"দেখেছি বাবা, দেখেছি," সঞ্জয় হাসল, "না দেখলে বলছি কীভাবে?"

আহির বাইরে তাকাল। আজ ওরা দু'জন ম্যাল রোডের একেবারে অন্য দিকে এসেছে। এখানে বড় বইয়ের দোকান। বিখ্যাত সাহিত্যিকেরাও নাকি আসেন এই সব দোকানে। এদিকে আসার উদ্দেশ্য, ভাল কোথাও গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করা। তেমনই একটা নামী রেস্তরাঁয় ওরা এসে বসেছে। বিকেলবেলা পাইনউড হোটেলে মেয়েগুলোকে ঢুকতে দেখার পর সঞ্জয়ও একটু-একটু করে বদলেছে। কে বলবে গত রাতে ও বারবার ফোন করে আহিরকে সতর্ক করছিল মেয়েগুলো সম্পর্কে। এখন খাওয়ার আগে একটু মদ্যপান করার পর তো সঞ্জয়ের বুকে জমে থাকা কথাগুলো বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

আহিরের হালকা লাগছিল। সঞ্জয় যদি বেঁকে বসে তা হলে আত্রেয়ীর পিছনে ঘুরতে পারবে না।

তবু সঞ্জয়ের মনোভাব আঁচ করার উদ্দেশ্য ও আরও এক ধাপ এগোল। বলল, "এবার তুই বাড়াবাড়ি করছিস। অনন্যা এমন কিছু পুরনো হয়নি যে তুই মনরো আর ওই মেয়েটার ঠোঁট নিয়ে এই কম্পারেটিভ স্টাডি করবি। চল এবার খাবার বলি। তোর নেশা হয়েছে।"

সঞ্জয় চোখ ছোট করে খিক-খিক করে হাসল। বলল, "অনন্যার সঙ্গে এই তুলনার কী সম্পর্ক? শোন, অনন্যার আগেও আমার দুটো প্রেম ছিল। মেয়েদের ব্যাপারে আমি একেবারে জিম করবেট। যত বড় নরখাদকই হোক না কেন, আমি ঠিক শিকার করে ফেলি।"

আহির নিজের গ্লাসটা শেষ করল। খাবার অর্ডার দিল। এখানে চাইনিজ

নেই। বেশির ভাগ খাবারই ভারতীয়। স্টার্টার হিসেবে ওরা দুটো সুইট কর্ন সুপের অর্ডার দিল। মেন কোর্সে নিল তন্দুরি রুটি আর মটনের ডিশ।

সঞ্জয়ের খাবারের দিকে মন নেই। ও ততক্ষণে আর-এক পেগ শেষ করে ফেলেছে। সুপ আসার পর মন দিয়ে সেটা খেল। তারপর ঢেঁকুর তুলে বলল, "অনেকদিন পর বেশ ভাল লাগছে। বউ নিয়ে নিত্যদিন ঘোরা যে কী বোরিং, বিয়ে করলে বুঝবি। এই যে তুই-আমি এলাম। এর কোনও তুলনা হয় না।"

আহির মিটিমিটি হাসল।

"হাসছিস! শালা, ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে..."

আহির এবার জোরে হেসে ফেলল। পাশের টেবিলে এক পঞ্জাবি পরিবার গোল হয়ে বসে ডিনার সারছিল। আহিরের হাসিতে তারা ঘুরে তাকাল। আহির নিজেকে সামলে নিল। বলল, "আমাদের এই ট্রিপটা বেশ অ্যাডভেঞ্চার ট্রিপ হয়ে উঠেছে। আসার আগে বুঝিনি এমন হবে।"

"অ্যাডভেঞ্চার বলে অ্যাডভেঞ্চার! কোনও গড়বড় হলে তুই শুধু অনন্যাকে ম্যানেজ করিস। বাকিটা আমি বুঝে নেব। তবে আমি প্রমিস করছি। তোর বিয়ের পরও আমরা এভাবে আসব। তখন তুই যত খুশি মেয়েবাজি করিস, আমি অনিন্দিতাকে সামলাব। মেয়েদের কনভিন্স করতে আমার পাঁচ মিনিট সময় লাগে।"

আহির আর কথা বাড়াল না। প্রায় চুপচাপ খাওয়া শেষ করল। খাওয়া-দাওয়ার পর আহিরকে কিছুতেই বিল দিতে দিল না সঞ্জয়। জোর করে নিজের ডেবিট কার্ড গুঁজে দিল ওয়েটারের হাতে। লোকটাকে একটা পাঁচশো টাকা টিপসও দিল।

আহির বুঝতে পারল, সঞ্জয় আর নিজের মধ্যে নেই। ধীরে-ধীরে দু'জন রেস্তরাঁর বাইরে এল। ঘড়িতে সাড়ে ন'টা। কলকাতা এখন গমগম করছে। কিন্তু মুসৌরিতে একের পর-এক দোকান বন্ধ হচ্ছে। রাস্তায় নেমে ওরা টের পেল, একটা কনকনে হাওয়া পাগলা ষাঁড়ের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছে। সেই হাওয়ার ঝাপটায় দু'জনেই কেঁপে উঠল। আহির হিসেব কষে দেখল রেস্তরাঁ খুঁজতে-খুঁজতে হোটেল ছাড়িয়ে অনেকটা চলে এসেছে। এখন এতটা পথ ফিরতে হবে।

দু'জনে হাঁটা শুরু করল। চড়াই উতরাইয়ের রাস্তা। সঞ্জয় এখনও মাঝে-মাঝে নেশার ঘোরে ভুল বকছে। আহির চুপ। এই রাস্তা দিয়ে ফিরতে-ফিরতে ওর মনে পড়ছিল আগের রাতের কথা। কিছু দূর আসার পরই রাস্তার বাঁ দিকে দেখা গেল অন্ধকার দুন উপত্যকা। তার ওপাশে ছোট-ছোট গ্রাম। সেই গ্রামের বাড়িতে ফুটি-ফুটি আলো জ্বলছে। আহির হাঁটছিল আর পাহাড়ের গায়ে অন্ধকারে ফুটে থাকা আলোগুলোর কথা ভাবছিল। ওখানেও মানুষ রয়েছে। তাদেরও কত সুখ-দুঃখ, পাওয়া-না পাওয়ার হিসেব রয়েছে। তারাও যেমন আহিরের খোঁজ পায় না, আহিরও তেমনই তাদের খোঁজ পায় না। কত জীবন পাশাপাশি তিরতির করে বয়ে চলেছে।

তবে হাঁটতে-হাঁটতে আহির পরের ছক কষে ফেলল। সঞ্জয় যা নেশা করেছে তাতে কাল সকালে উঠতে ওর দেরি হবে। আহির তাই পারলে সকালে উঠে একবার পাইনউডে গিয়ে হানা দেবে। হোটেলটার রিসেপশনে গিয়ে সরাসরি বলবে আত্রেয়ীর নাম। জানতে চাইবে কোন রুমে রয়েছে। দরকার হলে ইন্টারকমে কথাও বলবে।

বাকি মেয়েরা যদি কোনও সমস্যা করে তা হলে ওদের পুরনো সম্পর্কের ব্যাপারে সরাসরি জানাবে। আত্রেয়ী যদি রেগে যায় কিংবা চিনতে অস্বীকার করে, তা হলে অন্তত অনিন্দিতার খবরটুকু কানে তুলে দেবে। হয়তো বলবে, 'তোকে বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে যেতাম। ভালই হল, এখানে দেখা হয়েছে।'

ছকটা সাজানো হতে নিজের মনে হাসল আহির। একবার তাকাল সঞ্জয়ের দিকে। সঞ্জয় এলোমেলো পা ফেলতে-ফেলতে হেঁড়ে গলায় গান গাইছে, "ঘুংরু কি তর্‌হা, বজতা হি রহা হুঁ ম্যায়ঁ..."

হোটেলে ফিরে কারও আর আড্ডা মারার মতো অবস্থা ছিল না। সারাদিনের ঘোরাঘুরি, তারপর এতটা হাঁটাহাঁটি, নেশা করা সব মিলিয়ে শরীর ভেঙে আসছিল। তবু শোওয়ার আগে আহির একবার অনিন্দিতার সঙ্গে গল্প করল। আর সকাল আটটার অ্যালার্ম দিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে অ্যালার্মের শব্দে আহিরের ঘুম ভাঙল। হাত বাড়িয়ে ও তাড়াতাড়ি অ্যালার্ম বন্ধ করল। একবার তাকাল সঞ্জয়ের দিকে। অ্যালার্মের আওয়াজে সঞ্জয় জাগেনি। আহির ধীরে-ধীরে বাথরুমে গিয়ে গিজ়ার অন করল। ফ্রেশ হয়ে বেরোল। ইন্টারকমে হোটেলের কিচেনে ফোন করল। একজন ফোন ধরতে রুমে চা দিয়ে বলল।

আহির জানে সঞ্জয় শীতকাতুরে। ন'টার আগে ওর ঘুম ভাঙবে না। আগের দিন চার পেগ খেয়েছে। অতএব আজ উঠতে আরও দেরি হবে। আর সঞ্জয় ওঠার আগে মর্নিংওয়াকের ছুতোয় আহিরকে যেতে হবে পাইনউড হোটেলে।

চা চলে এল দ্রুত। আহির চা নিয়ে বসল জানলার ধারে। চা খেতে-খেতে ও মনকে তৈরি করল। জামাকাপড় পরল। সঞ্জয়ের দিকে একবার ভাল করে দেখল। সঞ্জয় এখনও নিথর হয়ে ঘুমোচ্ছে। ওর নাক হালকা ডাকছে। আহির আর সময় নষ্ট করল না। পৌনে ন'টা। ও সন্তর্পণে দরজা আটকে বেরিয়ে পড়ল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে পাইনউডের দিকে পা বাড়িয়েই থমকে গেল আহির। ওদের হোটেলের উলটো দিকেই যে ফলের রসের দোকান, সেই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আত্রেয়ী। একা। স্কিন টাইট জিনস আর জ্যাকেট পরেছে আত্রেয়ী। মাথায় টুপি। তবু সকালের রোদে আত্রেয়ীকে সূর্যমুখী ফুলের মতো লাগছিল। আহির কী করবে এক মুহূর্তের জন্য ভেবে পেল না। কাল রাতে নেওয়া এত প্রস্তুতি সকালের আলোয় কেমন চাপা পড়ে গেল।

আহির ইতস্তত করে তাকাল রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা আত্রেয়ীর দিকে। দেখল আত্রেয়ীও সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে। চোখাচোখি হওয়ায় হাসল। আহিরেরও কি হাসা উচিত? ও বুঝতে পারল না। আত্রেয়ী দোকানদার ছেলেটাকে কিছু বলল। তারপর রাস্তা পেরিয়ে ওর কাছে এল। বলল, "ভাল আছিস?"

আহির তেমন কিছুই বলতে পারল না। শুধু আলতো করে ঘাড় নাড়ল।

আত্রেয়ী হাসল। বলল, "চল জুস খাব। আমি দুটোর অর্ডার অলরেডি দিয়ে এসেছি।"

আহির কোনও প্রতিবাদ করল না। বরং আত্রেয়ীর পিছু-পিছু রাস্তা পেরিয়ে ফলের রসের দোকানের সামনে এল। ছেলেটা ততক্ষণে দুটো বিয়ারের মাগে কমলালেবুর রস করে ফেলেছে। আত্রেয়ী একটা মাগ নিয়ে চুমুক দিল। আহির অবশ্য অত তাড়াতাড়ি চুমুক দিতে পারল না। ওর যেন ঘোর কাটছিল না। আত্রেয়ীর উপর ওর প্রবল রাগ হওয়ার কথা। অনিন্দিতার সঙ্গে যে ওর বিয়ে সেটা বলার কথা। কিন্তু আহির আবিষ্কার করল আত্রেয়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ও তেমন কিছুই বলতে পারল না। খানিক ধাতস্থ হওয়ার পর শুধু কোনওমতে বলল, "তুই যে আমায় চিনতে পেরেছিস, এটাই তো অনেক।"

আত্রেয়ী কমলালেবুর রস খেতে-খেতেই ওকে দেখল। মুখ তুলে বলল, "তিহরিতে আমি আগেই তোকে দেখেছিলাম। সঙ্গে বাকিরা ছিল। ওরা তোর কথা জানে। কিন্তু তোর ছবি দেখেনি। তাই কিছু প্রকাশ করিনি।"

আহির এবার মাগে চুমুক দিল। বলল, "তা হঠাৎ এখানে দাঁড়িয়ে সাতসকালে জুস খাচ্ছিস?"

"জুস খেতে আসিনি। তুই তো এই সরকারী হোটেলে উঠেছিস। সেখানে গিয়ে চট করে তোর খোঁজ করাটা বিশ্রী ব্যাপার। তাই জুস খাওয়ার ছুতোয় লক্ষ রাখছিলাম তুই বেরোস কিনা। বেরোলে এগিয়ে গিয়ে কথা বলব। তা দেখলাম, ভুল আন্দাজ করিনি।"

আহির অবাক হল। বলল, "তুই কী করে জানলি আমরা এখানে উঠেছি?"

আত্রেয়ী স্থিরভাবে ওকে দেখল। বলল, "যে রাতে তুই আমাদের ফলো করে থানা পর্যন্ত গিয়েছিলি, সেই রাতেও আমিই আগে তোকে দেখেছিলাম। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলি।"

আহির তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। এবার ও বুঝতে পারল, আত্রেয়ী কেন সেই রাতে বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল।

"তুই যখন দেখলি আমি ফলো করছি, তখন ডাকলি না কেন?" আহির জানতে চাইল।

আত্রেয়ী এক চুমুকে মাগের বাকি জুসটুকু গলায় ঢালল। পার্স খুলে ছেলেটাকে দুটো জুসের দাম দিল। আহিরের দিকে ফিরে বলল, "ডাকার মতো পরিস্থিতি ছিল না। তবে তোকে পিছু-পিছু আসতে দেখে আমি ভরসা পেয়েছিলাম। জানতাম, কোনও বিপদ হলে পিছনে অন্তত তুই আছিস।"

"কিন্তু তোদের অত রাতে থানায় যেতে হল কেন?" আহির আবার প্রশ্ন করল।

আত্রেয়ী কোনও জবাব দেওয়ার আগে আহিরের ফোন বেজে উঠল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে আহির দেখল সঞ্জয়ের ফোন। সেই ফোন ধরতেই সঞ্জয়ের ঘুম-ঘুম গলা শোনা গেল, "তুই কোথায়?"

"হোটেলের ঠিক বাইরে। মর্নিংওয়াক করছি," আহির বলল, "তুই ঘুমোচ্ছিলি, তাই ডাকিনি।"

"ভাল করেছিস। এবার আয়। আমি উঠে পড়েছি।"

আহিরের কিছুতেই রুমে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। এত বছর বাদে আত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা। এই মুহূর্তে সঞ্জয়কে একটা বাড়তি বোঝা ছাড়া ওর



কিছুই মনে হচ্ছিল না। কিন্তু আত্রেয়ী আঁচ করতে পেরেছিল পরিস্থিতি। ও ইশারা করল সঞ্জয়ের কথায় সায় দিতে।

তাই আহির সংক্ষেপে বলল, "যাচ্ছি।"

সঞ্জয়ের ফোন কেটে আহির আবার পুরনো কথায় ফিরতে চাইল। আত্রেয়ী বাধা দিল। বলল, "তোর মোবাইল নম্বরটা আগে দে। এভাবে কথা হবে না।"

"তা হলে কীভাবে কথা হবে?" আহির মোবাইল নম্বর দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

আহিরের নম্বর আগে নিজের মোবাইলে সেভ করল আত্রেয়ী। বলল, "পরে দেখা করব। অনেক কথা বাকি।"

আত্রেয়ী আর থাকল না। চলে গেল। সেই চলে যাওয়া দেখতে-দেখতে আহির উপলব্ধি করল, আত্রেয়ীর সেই ডাকে ওকে সাড়া দিতে হবেই। আর তখনই আহিরে মোবাইল ফের বেজে উঠল। সঞ্জয়ের ফোন ভেবে ও বিরক্ত হয়ে ধরতে গিয়ে দেখল মোবাইলের স্ক্রিনে অনিন্দিতার নাম ফুটে উঠেছে।

॥ ৮ ॥

হোটেলে ফিরে আহির দেখল সঞ্জয় ছটফট করছে। অনিন্দিতার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা হয়নি। আহিরই বলতে পারেনি। ওর মাথা জুড়ে রয়েছে আত্রেয়ী। মুসৌরিতে কী করছে আত্রেয়ী? অত রাতে থানায়ই বা গেল কেন? আহির পিছু নিয়েছে জেনেও কেনই বা অমন অদ্ভুত আচরণ করল? সবচেয়ে বড় কথা, আজ সকাল থেকে ও কেন আহিরদের হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে? এই সব ভাবতে-ভাবতে আহির অনুভব করল, আত্রেয়ীর সঙ্গে অনেক কথা বাকি থেকে গেল। সঞ্জয় মাঝপথে ফোন না করলে অনেক প্রশ্নের উত্তর আজ সকালেই পাওয়া যেত।

আহির রুমে ফেরার পর সঞ্জয় বলল, "পরশু থেকে দেখছি, তুই কেমন আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো। ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপার কিছুই নয়। ঘুম ভাঙার পর চা খেতে বেরিয়েছিলাম। রাস্তায় ওই মেয়েগুলোর একটাকে দেখতে পেলাম। ভাবলাম, হুট করে পাইনউড না গিয়ে আগে একজনের সঙ্গে আলাপ করা যায় নাকি দেখি। এগিয়ে গিয়ে আলাপ করলাম। ফোন নম্বর নিলাম।"

সঞ্জয় এতটা আশা করেনি। একটু অবাক হয়ে বলল, "আলাপ করলি? কীভাবে? কী নাম মেয়েটার?"

"মেয়েটার নাম আত্রেয়ী। বেরিয়ে দেখি আমাদের হোটেলের সামনে দিয়ে আবার কোথায় যাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে কথা বললাম। দেখলাম, ভদ্রভাবেই জবাব দিল। তবে তোর শ্রীরাধিকার নাম জানতে পারিনি। সেটা জানতে চাওয়ার আগেই তোর ডাক এল।"

"তা ফোনে আমায় বললি না কেন?"

"আরে, সব কথা কি ওইভাবে বলা যায়? একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছিল। তবে চিন্তা করছিস কেন, ফোন নম্বর তো নিয়েছি। বাকিটুকু ঠিক জেনে নেব।"

সঞ্জয় হাসল। বলল, "চল ব্রেকফাস্ট সেরে আসি।"

হোটেলের নীচতলায় ডাইনিং হল। জায়গাটা খুব সুন্দর। দুন উপত্যাকার দিকে মুখ করে চেয়ার-টেবিলগুলো পাতা। তার একটায় গিয়ে দু'জন বসল। সঞ্জয় অর্ডার দিল পুরী-সবজির। আহির অবশ্য বাটার টোস্ট-অমলেট দিতে বলল। সঙ্গে কফি।

খাবার অর্ডার দেওয়ার পর চেয়ারে এলিয়ে সঞ্জয় বলল, "এই ঠান্ডায় এখানে চট করে টুরিস্ট আসে না। ওই বড়দিন উপলক্ষেই যা দিল্লি কিংবা পঞ্জাব থেকে কিছু লোক ফূর্তি মারতে হাজির হয়। বাঙালি টুরিস্ট আসে দুর্গাপুজোর ছুটিতে। আর গরমকালে।"

"তুই কোথায় ঘুরতে যাবি বলছিলি।"

"হ্যাঁ, কেম্পটি ফলস। একটা আসাধারণ ঝরণা। চল, খেয়েদেয়ে রেডি হয়ে রওনা দিই।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে দু'জন দোতলায় এল। গরম জামাকাপড় চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আবার হাঁটতে-হাঁটতে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। তবে ম্যাল রোড দিয়ে হাঁটতে আহিরের ভালই লাগছিল। জায়গাটা যে এক সময় অভিজাত ছিল, তা বেশ বোঝা যায় ম্যাল রোডে খানিক হাঁটাহাঁটি করলে। রেলিং থেকে বসার ছোট-ছোট জায়গা সব জায়গাতেই ব্রিটিশ আভিজাত্যের ছোঁয়া এখনও পুরোপুরি মোছেনি।

সঞ্জয় মোবাইলে কথা বলছিল। সেই কথার ধরন শুনে আহির আন্দাজ করল, অনন্যার ফোন। আহির লক্ষ করেছে অনন্যার সঙ্গে কথা বলার সময় সঞ্জয়ের গলাটা কেমন মোলায়েম হয়ে যায়। অনন্যাকে কোনওদিন দেখেনি আহির। সঞ্জয়ের ফেসবুক প্রোফাইলেও অনন্যার ছবি নেই। এমনকী অনন্যার যদি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকেও থাকে তারও কোনও সূত্র নেই সঞ্জয়ের

প্রোফাইলে। তাই অনন্যাকে দেখার ইচ্ছে আহিরের বহুদিনের। সঞ্জয়ের আচরণ থেকে ওর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে একেবারে বিপরীতমুখী মনোভাব বেরিয়ে আসে। কোনটা যে ঠিক ধরতে পারে না আহির।

ম্যাল রোড শেষ হওয়ার আগে বাঁ দিক দিয়ে একটা সরু সিঁড়ি নেমেছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে ওরা এসে নামল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। গাড়ি বুক করল। সেই গাড়ি চড়েই কেম্পটি রওনা দিল দু'জন। আগের দিনের ড্রাইভার ছেলেটা তেমন কথা বলেনি। কিন্তু এবারের ছেলেটা গায়ে পড়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছে। কোন ট্রিপে গিয়ে কোন পরিবারকে কেমন খুশি করেছে, কে কেমন টিপস দিয়েছে। শুনতে-শুনতে আহিরের হাই উঠছিল। তবে সঞ্জয় দিব্যি কথা বলতে থাকল ছেলেটার সঙ্গে।

আহির চুপচাপ বসে ভাবতে থাকল আত্রেয়ীকে নিয়ে। কত বছর বাদে আত্রেয়ীর সঙ্গে মুখোমুখি হল। কথা হল। ছাড়াছাড়ির পর কি কোনওদিন ভেবেছিল যে, আত্রেয়ীকে সামনে পেলে এমন শান্তভাবে কথা বলবে? কিংবা মোবাইল নম্বর বিনিময় করবে। আহির যেন নিজেকেই আবার নতুন করে চিনল। উপলব্ধি করল, জীবনের প্রথম নারীকে কখনও অস্বীকার করা যায় না।

এই সব ভাবতে-ভাবতে কখন চোখ বুজে এসেছিল আহির খেয়াল করেনি। সেই ঘুম ভাঙল সঞ্জয়ের ধাক্কায়। চোখ খুলে আহির দেখল, গাড়িটা রাস্তার ধারে দাঁড় করানো। রাস্তার উলটো দিকে শুদ্ধ শাকাহারী খাবারের দোকানের সারি। তারও পরে ছোট-ছোট দোকান। তাতে পুজোর জিনিস বিক্রি হচ্ছে।

সঞ্জয় আগেই নেমেছিল। এবার নামল আহির। নেমে দেখল, রোদ মিইয়ে গিয়ে আকাশ মেঘলা। ঠান্ডাও দাঁত বসাচ্ছে। আহির জ্যাকেটের চেন টানল। মাথায় টুপি পরল। তারপর গুটি-গুটি এগোল।

খানিক যেতেই রাস্তাটা বাঁ দিকে হেলে গিয়েছে। সেই হেলে যাওয়া জায়গাটায় আসতেই ঝরণাটা চোখে পড়ল। ঝরঝর করে জল ঝরছে। এক পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। প্রচুর অবাঙালি পর্যটক সেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছে। বোধ হয় কোথাও পুজোও দিচ্ছে।

আহির প্রথমেই হাই তুলে বলল, "চা খাব।"

সঞ্জয় মাথা নাড়ল। বলল, "খাব। দাঁড়া আগে জায়গাটা দেখে নিই।"

সিঁড়ি দিয়ে ওরা উপরে উঠল। প্রবল শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়! খানিকটা ওঠার পর একটা চাতাল মতো জায়গায় গিয়ে ওরা দাঁড়াল। আরও উপর থেকে জল নামছে। ওই চাতালের তলা দিয়ে তা নেমে যাচ্ছে। মাঝখানের ওই সরু চাতালে দাঁড়িয়ে লোকজন ছবি তুলছে। লাফালাফি করছে। তবে একবার তাকিয়েই আহির বুঝল, জলে ভাল স্রোত। কেউ পা পিছলে পড়লে বিপদ আছে।

কেম্পটিতে এসে সঞ্জয়ের মেজাজ ফুরফুরে হয়ে গিয়েছে। আহিরের দিকে ফিরে ও বলল, "ফাটাফাটি। শুধু ঠান্ডাটাই যা একটু বেশি।"

আহিরের অবশ্য তত ভাল লাগল না। এর আগে সিকিমে গিয়ে ও কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলস দেখেছে। এটাও মোটামুটি সেই রকমই দেখতে। তুলনায় সিকিমের ঝরণার আশপাশ অনেক পরিষ্কার এবং ঝকঝকে ছিল।

কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে সঞ্জয় মোবাইলে কয়েকটা ছবি তুলল। একবার ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই ছবি তুলবি না?"

আহিরের মাথায় তখনও আত্রেয়ীর চিন্তা। তাই হেসে বলল, "তুই তো তুলছিস। তোর থেকে নেব।"

সঞ্জয় সেই কথায় উৎসাহ পেয়ে আরও ছবি তুলতে লাগল। খানিক বাদে দু'জন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। রাস্তার উলটো দিকে লোকে উঁকিঝুঁকি মারছিল। সেখানে গিয়ে দু'জনে দেখতে পেল, ঝরণাটা নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর সেই দৃশ্যই লোকে মুগ্ধ হয়ে দেখছে।

অন্য সময় হলে আহির এখানে আরও থাকত। হয়তো হইচইও করত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি আলাদা। তাই চুপচাপ একটা চায়ের দোকানে এসে ও দুটো চায়ের অর্ডার দিল। কাগজের কাপে সেই চা আসতেই ওর পকেটের মোবাইল বেজে উঠল। আহির ধরেই নিয়েছিল আত্রেয়ীর ফোন। কিন্তু মোবাইল বের করে বুঝল আত্রেয়ী নয়, অনিন্দিতা।

অনিন্দিতার ফোন ধরতেই ঝরণার জলের মতো অভিমান ভেসে এল, "তুমি তো আমার কোনও খবরই রাখছ না! আমিই যা ফোন করার করছি। তুমি তো নিজের থেকে কোনও ফোনই করছ না।"

"আরে, কখন করব! একে প্রবল ঠান্ডা। তার উপর টাওয়ার থাকছে না সব সময়..."

"তোমায় এই ঠান্ডায় কে মুসৌরি যেতে বলেছিল? তাও আবার তিন-চারদিন হলে হত। এ তো একেবারে দশদিনের ধাক্কা। মুসৌরি কেউ দশদিন ধরে ঘুরতে যায়? তাও যদি হরিদ্বার কিংবা ঋষীকেশ যেতে তা হলেও বুঝতাম। তোমার বন্ধু যে কী বুদ্ধি দিল..."

"শোনো, বেশির ভাগ বাঙালিই তো কোনও জায়গায় কবাডি-কবাডি করে গিয়ে দেখে আসে। আমি একটু হাত-পা ছড়িয়ে ঘুরতে ভালবাসি। দেখার চোখ থাকলে মুসৌরির মতো জায়গায় শুধু দশদিন কেন দশ মাস থাকলেও দেখার জিনিস ফুরোবে না।"

অনিন্দিতার সঙ্গে হালকা গলায় কথা বলতে-বলতে আহির টের পেল আর-একটা ফোন ঢুকছে। মোবাইলটা কান থেকে সরিয়ে চোখের সামনে আনতেই ও দেখল, আত্রেয়ীর নম্বর। আহির ছটফটিয়ে উঠল। অনিন্দিতাকে বলল, "আমি আবার পরে করছি। এখন কেম্পটি ফলসে এসেছি। সঞ্জয় ডাকছে।"

অনিন্দিতা ফোন ছেড়ে দিল। আর আহির পালটা ঘুরিয়ে আত্রেয়ীকে ফোন করল।

আত্রেয়ী ফোন ধরেই জানতে চাইল, "তুই কোথায়?"

"কেম্পটি ফলসে। কেন?"

"কাল ল্যান্ডৌর যেতে পারবি? এই ধর, দুপুর-দুপুর।"

ল্যান্ডৌরের কথা অনেক শুনেছে আহির। কিন্তু এখনও যাওয়া হয়নি। তাই আত্রেয়ীর প্রস্তাব শুনে ও বলল, "পারব। কিন্তু সবাইকে এড়িয়ে যাব কীভাবে?"

আত্রেয়ী বলল, "কাল আমার বন্ধুরা কেম্পটি ফলস দেখতে যাবে। আমি সকাল থেকেই অসুস্থতার ভান করব। ওরা বেরোনোর পর আমি একটা গাড়ি নিয়ে ল্যান্ডৌর রওনা দেব।"

"ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যদি কোনওভাবে দেখা হয়?"

"হবে না। এখানে দুটো স্ট্যান্ড। একটা তো ম্যাল রোডের নীচে। আর-একটা ম্যাল রোডের গোল চত্বর ছাড়িয়ে ওপাশের রাস্তায়। আমি সেখান থেকে গাড়ি নেব।"

আহির ভাবল, আত্রেয়ী প্ল্যানটা মন্দ সাজায়নি। একই ছকে তো সঞ্জয়কেও কাটিয়ে দেওয়া যায়। মুশকিল হবে, ওর শরীর খারাপ শুনলে সঞ্জয় যদি হোটেলেই থেকে যায়!

"কী ভাবছিস? যাবি তো?" আত্রেয়ী অধৈর্য হয়ে বলল।

"যাব তো বটেই। আমিও ভাবছি একই কায়দায় বেরোব।"

"গুড। তা হলে আজ রাত থেকেই অসুস্থতার অ্যাক্টিং শুরু করে দে।"

আহির একবার চারপাশ জরিপ করল। সঞ্জয়ও উত্তেজিত হয়ে কারও সঙ্গে কথা বলছে। ঝরণার শব্দে ওর কথা চাপা পড়ে গিয়েছে। তবে সঞ্জয়ের মুখ-চোখ এবং হাত নাড়া থেকে পরিষ্কার ও ঝগড়া করছে। কার সঙ্গে ঝগড়া করছে? অনন্যা?

সঞ্জয়কে আমল না দিয়ে আহির আবার মন দিল ফোনে। বলল, "কিন্তু ল্যান্ডৌরে গিয়ে কোথায় দেখা করব? আমি কখনও ওখানে যাইনি!"

"তুই ড্রাইভারকে বলবি, চার দুকান যাব। ওটা ল্যান্ডৌরের প্রাইম স্পট। সেখানে পৌঁছে দেখবি, একটা পুরনো চার্চ। তার চারপাশে প্রচুর বাঁদর। সেই চার্চের পরই চার-পাঁচটা দোকান। সব চা, স্ন্যাক্স, কেক বিক্রি করছে। ওটাই চার দুকান। তুই যেদিক থেকে যাবি সেদিক থেকে ওই চার্চ এবং দোকানগুলো তোর ডান হাতে পড়বে। একেবারে শেষ দোকানটায় গিয়ে বসবি। বলবি, হানি-লেমন-জিঞ্জার টি দিতে।"

"সেটা আবার কী?"

"নিজেই খেয়ে দেখিস। আমি যদি তোর আগে ওখানে পৌঁছে যাই, তা হলে ওই দোকানেই বসে থাকব।"

আহির মাথা চুলকাল। বলল, "এত কিছু মাথায় রাখা মুশকিল। তেমন হলে আমি তোকে ফোন করে নেব।"

"সে নিস। কিন্তু অনেক সময় মোবাইলে কানেকশন থাকছে না। ল্যান্ডৌরে গিয়ে থাকবে কিনা জানি না। তাই আগাম জানিয়ে রাখলাম। তবে তুই ঘাবড়াস না। এমন কোনও কঠিন কাজ তোকে দিইনি। ওখানে গেলেই দোকানগুলো এমনিই চোখে পড়বে।"

"তা হলে দুপুরে কখন মিট করছি?" আহির ফের জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক একটা নাগাদ। আমি অপেক্ষা করব তোর জন্য।"

আত্রেয়ী ফোন ছাড়ল। আর আহির অনুভব করল ওর বুকের ভিতরেও যেন কুলকুল করে একটা স্রোত নামছে। কেম্পটি ফলসের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকল ও। এখন আর জায়গা খারাপ লাগছে না।

॥ ৯ ॥

আহির ভাবল এক। হল আর-এক। কেম্পটি ফলস দেখার ফাঁকেই ও ছকে রেখেছিল, হোটেলে ফিরেই পেট খারাপের অজুহাত খাড়া করবে। প্রয়োজন হলে রাতে খাবে না। কিন্তু তেমন কিছুই করতে হল না। কারণ, ঝরণা দেখে ফেরার পথেই সঞ্জয়ের হাঁচি শুরু হল। প্রথম দিকে আহির আমল দেয়নি ওই হাঁচাহাঁচিকে। কিন্তু গাড়ি যত মুসৌরির দিকে এগোতে থাকল, সঞ্জয়ের হাঁচি বাড়তে থাকল।

আহির একবার বলল, "একে ঠান্ডা তার উপর ওই ঝরণার কাছে ঘোরাঘুরি করায় তোর ঠান্ডা লেগে গিয়েছে।"

সঞ্জয়ও সেই কথা সমর্থন করে ঘাড় নেড়ে কিছু বলতে গেল। কিন্তু পারল না। একটা প্রবল হাঁচি এসে ওর কথা থামিয়ে দিল। সেই হাঁচির পর আবার হাঁচি। সেই হাঁচি চলতেই থাকল।

গাড়ি এসে যখন ম্যাল রোডের মুখে দাঁড়াল, তখন সঞ্জয়ের অবস্থা সঙ্গীন। হেঁচে-হেঁচে ওর চোখ লাল। নাকের পাটাও যেন ফুলে। অবিরাম কাঁচা জল গড়াচ্ছে। এদিকে ততক্ষণে সন্ধে ঘনিয়েছে। ম্যাল রোডের উপর কনকনে হাওয়া ঝাপটা মারছে। গাড়ি নিয়ে যে হোটেল পর্যন্ত যাবে, তার উপায় নেই। স্থানীয় গাড়িকে কিছুতেই ম্যাল রোডে উঠতে দেবে না ওখানকার প্রশাসন।

আহির দেখল, গাড়ির বাইরে এসেই সঞ্জয় বাঁশপাতার মতো কাঁপছে। ও তাড়াতাড়ি গিয়ে সঞ্জয়কে ধরল। না হলে বোধ হয় ছেলেটা ধপ করে পড়েই যেত। কিন্তু ওকে হোটেলে নেবে কীভাবে?

আহির বলল, "তোকে একটু হাঁটতে হবে। ম্যাল রোডে না উঠলে রিকশা পাব না।"

সঞ্জয় কথা বলার অবস্থায় নেই। তাই মাথা নাড়ল।

আহির ধীরে-ধীরে ওকে ধরে নিয়ে চলল ম্যাল রোডের দিকে। তিন-চার পা হাঁটা। কিন্তু সঞ্জয়ের যা অবস্থা, তাতে আহিরের মনে হচ্ছিল বুঝি আধমাইল হাঁটতে হচ্ছে। তবু শেষ পর্যন্ত ওরা গিয়ে ম্যাল রোডের মুখে পৌঁছল। আহির একটা রিকশায় ওকে তুলে, নিজে উঠল।

রিকশায় বসে-বসেও সঞ্জয় হাঁচতে থাকল। আহির তাড়া দিতে লাগল রিকশাওয়ালাকে। যদিও ও নিজের বুঝতে পারছিল, বড়দিন ঘনিয়ে আসায় পর্যটক বাড়ছে মুসৌরিতে। এই সন্ধের মুখে সব পর্যটকই বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। এমন ভিড়ে ঠাসা রাস্তায় জোরে রিকশা চালানো বেশ কঠিন।

হোটেলের সামনে পৌঁছতে ওদের মিনিট দশেক লাগল। রিকশা থেকে নামার আগেই ভাড়া মিটিয়ে দিল আহির। এর পর সঞ্জয়কে ধরে-ধরে নামাল। হোটেলের ভিতরে নিয়ে গেল। আহির চেয়েছিল, সঞ্জয়কে নীচে বসিয়ে আগে একটু গরম কফি খাইয়ে রুমে নিয়ে যাবে।

কিন্তু সঞ্জয় রাজি হল না। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, "আমায় আগে ঘরে নিয়ে চল। আর চা-বিস্কুট দিতে বল। ওষুধ না খেলে কিছু হবে না।"

তাই করল আহির।

রুমে ঢুকে কোনওমতে জুতো খুলে সঞ্জয় নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। মোটা কম্বল নিজেই গায়ে টেনে নিল। একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, "আমার সুটকেসটা খোল। দেখবি একটা লাল প্লাস্টিকের প্যাকেট রয়েছে। ওটা নিয়ে আয়।"

সঞ্জয়ের নির্দেশ পালন করল আহির। ঠিক সেই সময় দরজায় টোকা পড়ল। সঞ্জয়কে প্যাকেটটা দিয়ে আহির গিয়ে দরজা খুলল। কফি এবং বিস্কুট নিয়ে হোটেলের এক কর্মচারী দাঁড়িয়ে। আহির ইশারায় ট্রে-টা বেডসাইড টেবিলে রাখতে বলল। লোকটা তাই করল। তারপর জানতে চাইল, "এটা হল কীভাবে?"

আহির কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, "বোধ হয় ওয়াটারফলসে গিয়ে ঠান্ডা লেগে গিয়েছে। আপনাদের কাছে থার্মোমিটার আছে?"

"আছে," লোকটা বলল।

"একবার নিয়ে আসুন। জ্বর মাপতে হবে।"

লোকটা চলে গেল। আহির কাপে কফি ঢেলে এগিয়ে দিল সঞ্জয়ের দিকে। বলল, "আগে খা। না হলে গায়ে জোর পাবি না।"

সঞ্জয় হাত বাড়িয়ে কাপটা নিল। দু'-তিনবার চুমুক দিল। ওর মুখ দেখে বোঝা গেল আরাম পেয়েছে। আহিরও কফি নিল। হঠাৎ ওর খুব চিন্তা হচ্ছে। দোতলায় ধরে তোলার সময়ই ও টের পেরেছিল সঞ্জয়ের জ্বর এসেছে। গা ভাল গরম। তাই ওকে কিছু বুঝতে না দিয়ে একেবারে নির্বিকার মুখে আহির থার্মোমিটার আনার পাঠাল কর্মচারীটিকে। এবার ও ভাবতে লাগল, যদি রাতে বাড়াবাড়ি কিছু হয়, ডাক্তার পাবে তো?

আহিরের কফি খাওয়ার মধ্যেই থার্মোমিটার নিয়ে এল ওই কর্মচারী। সঞ্জয়ের হাত থেকে কফির কাপটা নিয়ে টেবিলে রাখল ও। সঞ্জয়কে বলল, "এটা বগলে গোঁজ।"

সঞ্জয় তাই করল। মিনিট দুয়েক বাদে যখন সঞ্জয় সেই থার্মোমিটার বগল থেকে বের করে আহিরের হাতে দিল, দেখা গেল জ্বর গিয়ে দাঁড়িয়েছে একশো একে।

আহিরে মুখ দেখে সঞ্জয় বোধ হয় কিছু আন্দাজ করে থাকবে। তাই বলল, "নিশ্চয়ই একশো এক কিংবা দুই। আমার সর্দিজ্বর এভাবেই হুট করে আসে। তুই ভাবিস না। সঙ্গে ওষুধ আছে। কফিটা দে। শেষ করে ওষুধ খাব। না হলে সারবে না।"

আহির প্রথমে ওই কর্মচারীকে থার্মোমিটার ফিরিয়ে দিল। তবে লোকটা নিল না। বলল, "আপনি আজ রাত ওটা রেখে দিন। তেমন হলে কাল সকালে আমি নিয়ে যাব।"

আহির তাতে আপত্তি করল না। আনমনে কফির কাপটা এগিয়ে দিল সঞ্জয়ের দিকে। সঞ্জয় কাপের কফিটুকু শেষ করল। প্লাস্টিকের ব্যাগ খুলে পরপর দুটো ওষুধ খেল। আহির দেখল একটা জ্বরের ওষুধ। অন্যটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক। দুটো ওষুধ খেয়ে সঞ্জয় কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আহির জামাকাপড় ছাড়ল। নিজের বিছানায় উঠে কম্বলে পা ঢুকিয়ে আধ শোওয়া হল। আর তখনই আহির উপলব্ধি করল, সেই সকাল থেকে ঘোরাঘুরির জেরে ও বেশ ক্লান্ত। এখানে যে প্রচুর হাঁটাহাঁটি করছে তা নয়। কিন্তু যেহেতু পাহাড়ি রাস্তা, তাই অল্প হাঁটাও সমতলের বেশি হাঁটার চেয়ে বেশ অনেকটাই পরিশ্রমের।

বিছানায় বসে আনমনে মোবাইল ঘাঁটতে থাকল আহির। পরিস্থিতি কোন দিকে বাঁক নেবে ও ধরতে পারছিল না। নানা চিন্তা ওকে কুরে খাচ্ছিল। সঞ্জয়কে নিয়ে চিন্তা। আগামী কাল ল্যান্ডৌর যাওয়া নিয়ে চিন্তা। সঞ্জয়ের শরীর খারাপটা যেন ওর সব পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে। দিশেহারা লাগছে আহিরের। আত্রেয়ী এখন ওকে চুম্বকের মতো টানছে। সকালের ওই সংক্ষিপ্ত যোগাযোগের পর আহির কেবলই আত্রেয়ীর কথা ভেবে চলেছে। সেই ভাবনায় কোথাও আত্রেয়ীর প্রতি বিদ্বেষ নেই। যে বিদ্বেষ এত বছর ধরে ও মনে-মনে পুষে এসেছে। বরং আহিরের বারবার মনে পড়ছে পুরনোদিনে দু'জনের বেড়ানোর কথা। কীভাবে ওরা পরস্পরের কাছে এসেছিল। কীভাবে খুনসুটি করতে-করতেই একদিন আচমকা আত্রেয়ী জড়িয়ে ধরেছিল ওকে। তারপর প্রগাঢ়ভাবে চুমু খেয়েছিল। সেটাই ছিল ওদের প্রথম চুমু। কী আনাড়ির মতোই না চুমু খেয়েছিল সেদিন! ভাবতে গিয়ে এখন মুসৌরির হোটেলের এই ঘরে বসে আলতো হাসি খেলে গেল আহিরে ঠোঁটে। দীপঙ্কর কি জানতে পেরেছে এই সব?

রাতে সঞ্জয় আধখানা রুটি একটু মাংস দিয়ে খেল। আহিরই খেল বাকিটা। তারপর সঞ্জয় ডুবে গেল গভীর ঘুমে। আহির জেগে থাকল। জ্বরের ঘোরে সঞ্জয় থেকে-থেকেই কঁকাচ্ছে। আহির সিদ্ধান্ত নিল, কালকের সকালটা দেখবে। মুসৌরিতে ভাল ডাক্তার আছে কিনা ওর জানা নেই। যদি পরিস্থিতি তেমনই হয়, সঞ্জয়কে নিয়ে ও দেরাদুনে নেমে যাবে। ওখানে ডাক্তারও থাকবে ঠান্ডাও কম হবে।

আহির ঠিক করল, পুরো ঘটনাটা আগে আত্রেয়ীকে জানানো দরকার। না হলে মেয়েটা বুঝতে পারবে ও কী বিপদে পড়েছে। সঞ্জয়কে একবার ভাল করে দেখে নিল ও। অঘোরে ঘুমোচ্ছে সঞ্জয়। এবার আহির সন্তর্পণে আত্রেয়ীর নম্বর ডায়াল করল। কিন্তু কপাল খারাপ। পাঁচ-ছ'বার চেষ্টা করেও আত্রেয়ীর নম্বর লাগল না। আত্রেয়ী নট রিচেবল।

সারা রাত ছটফট করল আহির। একবার গিয়ে দাঁড়াল জানলার ধারে। তাকিয়ে থাকল অন্ধকার দুন উপত্যাকা আর তারা ভরা আকাশের দিকে। আবার এসে বসল বিছানায়। সকালের দিকে সামান্য তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। সেটাও কেটে গেল সঞ্জয়ের ডাকে। উঠে বসল আহির। দেখল সঞ্জয়ও উঠে বসেছে। এখন ওর চোখ-মুখ কাল রাতের চেয়ে ভাল। তবে চেহারায় ক্লান্তির ছাপ পড়েছে।

আহিরকে দেখে সঞ্জয় বলল, "কাল সারা রাত ঘুমোতে পারিসনি, তাই না?"

হাসল আহির। বলল, "এখন কেমন আছিস?"

"ভাল। তুই ব্রেকফাস্টের অর্ডার দে। আমায় খাবার খেয়ে ওষুধ খেতে হবে।"

এর পর সঞ্জয় নিজেই বিছানা থেকে নামল। বাথরুমে গেল। আহির ততক্ষণে ওদের প্রাতরাশ ঘরে দিয়ে যেতে বলেছে। সঞ্জয় মুখ-টুক ধুয়ে এসে বিছানায় বসল। টোস্ট-অমলেট আনা হয়েছে। সেটা অল্প-অল্প করে অনেকটাই খেল। ব্যাগ থেকে ওষুধ বের করে মুখে ফেলল। জলের বোতল থেকে ঢকঢক করে অনেকটা জল গলায় ঢালল।

আহির বলল, "তুই একটা খেল দেখালি বটে! একেবারে হড়পা বান..."

"আরে, বহুদিন বাদে এমন শরীর খারাপ করল। পরশু রাত থেকেই শরীর কেমন করছিল। রাতে খেয়ে ফেরার সময়ই শরীরে হালকা ঝিমঝিমে ভাব ছিল। আমি আমল দিইনি। তোকেও কিছু বলিনি। কালকেও স্নানটা করার আগে একবার দোনোমনো করেছিলাম। পরে ভাবলাম, স্নান করলেই ফ্রেশ লাগবে। ওটাই ভুল হয়েছিল।"

সঞ্জয় আর বেশিক্ষণ কথা বলতে পারল না। কাহিল হয়ে পড়ল। আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ল। আহিরের কিছু করার নেই। তা ছাড়া সারা রাত জেগে থাকায় শরীরও বেগড়বাই করছে। ও বাথরুমে গিয়ে স্নান সারল। একবার বেরিয়ে হোটেলের বাইরে রোদে গিয়ে দাঁড়াল। সঞ্জয়ের যা অবস্থা, তাতে মনে হয় আর বাড়াবাড়ি হবে না। কিন্তু সঞ্জয়কে একা ফেলে আত্রেয়ীর সঙ্গেও যাওয়া যাবে না। কী বলবে সঞ্জয়কে? 'তুই ঘুমো, আমি ঘুরতে যাচ্ছি!'

অতএব আজকের প্ল্যান ক্যানসেল করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। ঘড়ি দেখল আহির। এগারোটা পঁচিশ। সকাল থেকে আত্রেয়ীর সঙ্গে আর যোগাযোগের চেষ্টা করেনি ও। এবার করতে হবে। আত্রেয়ীকে জানাতে হবে, আজকের পরিকল্পনা বাতিল করতে হচ্ছে।

আত্রেয়ীকে ফোন করতে যাচ্ছিল আহির এমন সময় ওর মোবাইল বেজে উঠল। আহির দেখল সঞ্জয় ফোন করেছে। লাইনটা কেটে ও তাড়াতাড়ি রুমে ফিরল।

সঞ্জয় বসেছিল বিছানায়। আহির ঢুকতেই বলল, "তুই কি সারাদিন রুমে কাটাবি নাকি?"

"মানে!" আহির অবাক হল।

"আমি এখন অনেক বেটার। তুই ঘুরে আয়।"

"ধুর! তা হয় নাকি!"

"বিশ্বাস কর, আমি ঠিক আছি। আজ সারাদিন ঘরে থেকে রেস্ট নিলেই ফিট হয়ে যাব। তুই কাছেপিঠে ঘুরে আয়। মোবাইলে যোগাযোগ করলে যেন তোকে পেয়ে যাই।"

আহিরের মন লাফিয়ে উঠল। কিন্তু সেটা মুখে প্রকাশ না করে ও বলল, "এটা হয় না।"

"শোন, আমার এমন ভল্লুকের জ্বর আগেও হয়েছে। তোর বিশ্বাস না হলে আমি অনন্যার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিচ্ছি। লাঞ্চটা রুমেই বল। এক সঙ্গে খাই। তারপর তুই কাঠেপিঠে একটা চক্কর মেরে আয়।"

আহির আর আপত্তি জানাল না। দু'জনের এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করল। খেয়ে উঠে সঞ্জয় ফের ওষুধ খেয়ে শুল। আর আহির প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সবার আগে ও ফোন করল আত্রেয়ীকে। জানাল নিজের বেরোনোর খবর।

আত্রেয়ী বলল, "ভাল হল। আমিও এই বেরিয়েছি। তেমন হলে এক গাড়িতেই যাব। তুই ম্যাল রোডের মুখে চলে আয়। আমি দাঁড়াচ্ছি।"

দ্রুত পা চালাল আহির। অনেক বছর পর আবার ওরা এক সঙ্গে ঘুরতে যাচ্ছে। এবার ল্যান্ডৌর।

॥ ১০ ॥

গাড়ি চলেছে ল্যান্ডৌরের দিকে। এবারও ছোট গাড়ি। তাই কাছাকাছি বসা গিয়েছে। আত্রেয়ীর উরুর ছোঁয়া মাঝে-মাঝেই পাচ্ছে আহির। নাকে আসছে আত্রেয়ীর শরীরের মন-কেমন-করা গন্ধ। আহিরের সব কথা যেন মিশে যেতে লাগল ওই গন্ধে।

ম্যাল রোডের মুখে দেখা হওয়ার পর থেকেই যে ওরা অনেক কথা বলেছে তা নয়। আগের দিন ওই ফলের রসের দোকানে বরং দু'জনে অনেক সহজ ছিল। সেই সহজতা এখন আর নেই। কেন নেই ধরতে পারল না আহির। হাঁটতে-হাঁটতে অল্প কথা হল ঠিক। তবে সে সবই মামুলি কথা।

যেমন আহির জানতে চাইল, "তোর সঙ্গের মেয়েগুলো কতক্ষণ হল বেরিয়েছে?"

"এক ঘণ্টা।"

"আশপাশে নেই তো কেউ?"

"না। আমি ওদের বলেছিলাম কেম্পটি ফলসে পৌঁছে যেন আমায় জানায়। ওরা জানিয়েছে। তারপর বেরিয়েছি।"

"মেয়েগুলো কে?"

"আমরা চারজন একসঙ্গে চাকরি করি। বহু বছর। তাই ভাল বন্ধু।"

"একই ডিপার্টমেন্ট?"

"না। তা হলে কি একসঙ্গে ছুটি পেতাম নাকি? তাও আবার এতদিনের জন্য!"

"তোরা কি মুসৌরিতেই থাকবি?"

"না। হরিদ্বার, ঋষীকেশ যাব।"

এর পর আর তেমন কোনও প্রশ্ন মাথায় এল না আহিরের। আত্রেয়ীও কিছু জানতে চাইল না। ফলে সব কথা সেখানেই থেমে থাকল।

এখন গাড়িতে বসেও দু'জন বাইরে তাকিয়ে। আত্রেয়ী টুকটাক কথা বলছে বটে। কিন্তু সেই কথা এখানকার ছোট-ছোট বাড়িঘর, মানুষজন সম্পর্কে। ল্যান্ডৌরে ঢোকার আগে গাড়িটা বেশ খাড়াই রাস্তা বেয়ে উঠতে থাকল। দু' পাশে ঘন বসতি। রাস্তাও চাপা। বাঁকগুলোও বেশ ঘোরালো। তবে ড্রাইভার ছেলেটা মনে হল এই রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে অভ্যস্ত। একেবারে নির্বিকার মুখে ও গাড়ি চালাচ্ছে।

ল্যান্ডৌর বাজার পেরিয়ে ওরা আরও উপরে উঠল। তারপর এক সময় একটা গির্জার সামনে গিয়ে ছেলেটা গাড়ি দাঁড় করাল। আহিররা গাড়ি থেকে নামল। চারপাশে হইহই করছে রোদ্দুর। কিন্তু ঠান্ডা আছে। গির্জাটাকে দেখল আহির। বেশ পুরনো। আহির একবার ভাবার চেষ্টা করল, এই গির্জা যখন তৈরি হয়েছিল তখন ল্যান্ডৌর জায়গাটা কেমন ছিল।

আত্রেয়ী ততক্ষণে এগোতে শুরু করেছে। ওকে বলল, "আয়। এখানে দুটো গির্জা। একটা তো দেখতেই পেলি। আর-একটা খানিক দূরে। কেলগস চার্চ। ল্যান্ডৌর এক দিক থেকে নিরাপদ জায়গা। এটা আর্মি ক্যান্টনমেন্ট। আমার খুব ইচ্ছে ছিল এখানে থাকার। মুসৌরি বড্ড ঘিঞ্জি। কিন্তু বাকিরা রাজি হল না। এখানে থাকলে কেনাকাটা, হুল্লোড় করা যাবে না।"

আত্রেয়ীর পিছু-পিছু হাঁটতে লাগল আহির। বেশি দূর নয়, কয়েক পা। তারপরই ডান দিকে দোকানগুলো পড়ল। চার দুকান। আত্রেয়ী গিয়ে বসল একেবারে শেষ দোকানের সামনে পাতা একটা চেয়ারে। আহিরও গিয়ে বসল ওর মুখোমুখি। দু'জনের মাঝখানে শুধু একটা টেবিলের দূরত্ব। হানি-জিঞ্জার-লেমন টি-র অর্ডার দিল আত্রেয়ী।

আহির চারপাশ দেখছিল। আত্রেয়ী ভুল বলেনি। জায়গাটা ভারী সুন্দর। দূরে পাহাড়ের সারি। মাঝে সবুজ উপত্যকা। অনেক পাখি কিচির মিচির করছে। লোকজন বেশি নেই। একটু ঝিমিয়ে থাকা জনপদ। আর সেই জনপদের গভীর থেকে ভুরভুর করে বেরিয়ে আসছে ব্রিটিশ আভিজাত্যের ঘ্রাণ।

ভাল লাগছিল আহিরের। মনে হচ্ছিল, চেনা জায়গার বাইরে একেবারে অন্য পরিবেশে চলে এসেছে।

আত্রেয়ী বলল, "এবার বল তোর কথা।"

"তার আগে তুই বল, অত রাতে থানায় গিয়েছিলি কেন?"

হেসে ফেলল আত্রেয়ী। বলল, "তুই এখনও আগের মতো রয়ে গিয়েছিস।"

আহির হাসল। কিন্তু কোনও জবাব দিল না। সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে থাকল আত্রেয়ীর দিকে। দোকানের লোকটা ততক্ষণে কাচের লম্বা কাপে দিয়ে গিয়েছে সেই অদ্ভুত চা। দু'জনে তাতে চুমুক দিল। চুমুক দিয়ে আহির বুঝল কেন আত্রেয়ী এই চা খেতে বলছিল বারবার। এমন অপূর্ব পানীয় ও বিশেষ খায়নি।

আত্রেয়ী চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, "সেই রাতে খুব বিপদে পড়েছিলাম। আমাদের দলে একটা মেয়ে আছে দেবযানী। খুব ছটফটে। ওই যে রে, তিহরি লেকে তোর বন্ধুকে ছবি তুলতে বলল। মনে পড়ছে?"

ঘাড় নাড়ল আহির।

"সেই দেবযানী একটা দামি ক্যামেরা এনেছিল এই ট্রিপে। ওর খুব ছবি তোলার ঝোঁক। আমরা তো কলকাতা থেকে ভায়া লখনউ হয়ে এসেছি। কলকাতার ফ্লাইট কুয়াশার জন্য ছাড়তে দেরি করেছিল। ফলে যখন লখনউয়ে এসে নেমেছি তখন পরের ফ্লাইটের সময় হয়ে গিয়েছিল। তাড়াহুড়ো করে সিকিউরিটি চেক করিয়ে দ্বিতীয় ফ্লাইটে উঠতে হয়েছিল। দেবযানীর সঙ্গে অনেক লাগেজ ছিল। তার উপর ভারী জুতো। জ্যাকেট, জুতো, ক্যামেরা, সব আলাদা-আলাদা ট্রে-তে করে দিতে হচ্ছিল। সেটা করতে গিয়ে ও ক্যামেরাটা ওখানে ফেলে চলে আসে।"

"বলিস কী!" আহির অবাক হল।

"হ্যাঁ, দেবযানীর সেটা খেয়ালও ছিল না। সেদিন সকালে যখন তিহরি

গেলাম, ও ক্যামেরা খুঁজে পেল না। তখন ঘুরতে যাওয়ার তাড়া ছিল, তাই খোঁজা হয়নি ঠিকভাবে। ফিরে এসে দেবযানী মনে করতে পারল, ক্যামেরা ফেলে এসেছে লখনউ এয়ারপোর্টে।"

"তারপর?"

"তারপর মাঝরাতে থানা অভিযান।"

"ক্যামেরা পাওয়া গিয়েছে?"

"এখনও যায়নি। তবে থানার সূত্রে জলি গ্রান্ট এয়ারপোর্টে যোগাযোগ করেছিলাম। ওখান থেকে লখনউ এয়ারপোর্টের নম্বর নিয়েছি। যোগাযোগও করেছি। তারা বলছে, দেখে জানাচ্ছে।"

"এয়ারলাইন্সকে জানাসনি কেন?"

"জানাইনি আবার! কিন্তু বেসরকারি এয়ারলাইন্স কোনও দায় নিতে চায় না। ফ্লাইট থেকে নেমে পড়েছ, অতএব এবার তোমারটা তুমি বুঝে নাও। রাত গয়ি বাত গয়ি। এই ছিল আমাদের এয়ারলাইন্সের মনোভাব। ভাবছি, কলকাতায় ফিরে ফেসবুকে এটা নিয়ে লিখব। লোকজনের জানা উচিত। যাক গে, এই সব ফালতু বিষয় ছাড়। তুই এখন কোন কলেজে পড়াচ্ছিস?"

"কলেজ!" আহির হাসল।

আত্রেয়ী তীক্ষ্ণভাবে ওকে জরিপ করল। বলল, "আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির জেরে কি তুই পিএইচ ডি করা ছেড়ে দিয়েছিলি?"

আহির অন্য দিকে তাকাল। আত্রেয়ী না বুঝেই ওর ক্ষতস্থানে হাত দিয়ে ফেলেছে। আচমকা খোঁচা লাগায় ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরছে। তবু আহির নিজের মুখ-চোখ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল।

আত্রেয়ী বুঝতে পারল ব্যাপারটা। ও হাত রাখল আহিরের হাতে। বলল, "বিয়ে করেছিস?"

"নাহ," দীর্ঘশ্বাস ফেলে আহির বলল। ইচ্ছে করেই অনিন্দিতার সঙ্গে সম্পর্ক এবং সামনের বছরের গোড়ার দিকে বিয়ে করার খবর ও চেপে গেল।

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। শব্দ বলতে শুধু পাখির ডাক। গাছের পাতার ঝিরিঝিরি ছায়া ওদের মুখে খেলে যাচ্ছিল।

শেষে আহির বলল, "আমার কথা ছাড়। তোর কথা বল! দীপঙ্কর কেমন আছে?"

"দীপঙ্করের সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে।"

চমকে উঠল আহির। অস্ফুটে বলল, "ডিভোর্স!"

এবার আত্রেয়ী কিছু বলল না। কেবল হাসল।

আহির একইভাবে বলল, "কিন্তু কেন?"

"যে জন্য তোর কেরিয়ার ঘুরে গেল, সেই জন্যই আমার বিয়ে টিকল না।"

আহির কিছু বুঝতে পারল না। তাকিয়ে থাকল আত্রেয়ীর মুখের দিকে।

আত্রেয়ী বলল, "তুই কেন পিএইচ ডি ছাড়লি? কারণ, আমি সরে গিয়েছিলাম আচমকা। তোর জীবনের ব্যালেন্স নড়ে গিয়েছিল। তাই তো? আমারও তাই। তফাত হল, তোর বিপর্যয়ের জন্য তুই দায়ী ছিলি না। ছিলাম আমি। আর আমার বিপর্যয়ের জন্যও আমি-ই দায়ী। তুই অনেক বুঝিয়েছিলি। কিন্তু আমি তখন দীপঙ্করের মোহে পড়ে গিয়েছিলাম। মা-ও বারবার বোঝাতে থাকল।"

"ঠিক কী হয়েছিল?" আহির জানতে চাইল।

"তোর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পরও আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল। নিজেকে বোঝাচ্ছিলাম, একটাই জীবন, একটাই সুযোগ। কিন্তু মনের ভিতর অন্য কেউ যেন বলছিল, আমি যা করেছি সেটা ঠিক নয়। তবু সেটা সামলে নিয়েছিলাম। দীপঙ্করকে জড়িয়েই তোকে ভুলতে চেয়েছিলাম। দীপঙ্কর তখন কেরিয়ারে প্রতিষ্ঠিত। দেখতে হ্যান্ডসাম। আমায় ভালবাসে। ওকে নির্ভর করা যাচ্ছিল। তাই ওকে পেয়ে তোকে না ভোলার মতো কিছু ছিল না। কিন্তু মেয়েদের মন আর কবেই বা সোজা রাস্তায় হেঁটেছে! তোর সঙ্গে ব্রেকআপের কিছুদিন পর থেকেই বুঝতে পারছিলাম, তুই আমার অনেক গভীরে ঢুকে বসে আছিস। সেই গভীরে দীপঙ্কর ঢুকতে পারছে না। কিন্তু ততদিনে তো আমার ফেরার রাস্তা বন্ধ। আমাদের রেজিস্ট্রি হয়ে গিয়েছিল। মানে আইনত আমরা বিবাহিত। আমি তখন দীপঙ্করের মধ্যে তোকে খুঁজতে লাগলাম। কিছুদিনের মধ্যে দীপঙ্কর সেটা ধরে ফেলল। শুরু হল এই নিয়ে অশান্তি। একদিন ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে আমি তোর নাম উচ্চারণ করে ফেলেছিলাম। সেদিনই দীপঙ্কর ছিটকে গিয়েছিল আমার কাছ থেকে। এর পর ডিভোর্স।"

এক টানা বলে আত্রেয়ী থামল। চায়ের কাপে চুমুক দিল। আহিরও কিছু বলল না। দু'জনের সব কথা যেন ল্যান্ডৌরের শীতের দুপুরে মিশে গিয়েছে। চুপচাপ বসেই থাকল ওরা।

অনেকক্ষণ বাদে আহির বলল, "তুই এখন থাকিস কোথায়? কাকিমার সঙ্গেই?"

"হ্যাঁ, আর কোথায় যাব! মায়েরও বয়স হয়েছে। হাঁটুতে অস্টিও আর্থারাইটিস। বাঁ হাত তুলতে পারে না। ফ্রোজেন শোল্ডার। প্রেশার হাই। আমি না থাকলে মা খুব অসহায় হয়ে পড়ে। এই যে ঘুরতে এসেছি, দু' বেলা মাকে ফোন করছি।"

আবার নীরবতা। দোকানের লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে। আত্রেয়ী পার্স খুলে চায়ের দাম দিল। তারপর দু'জন উঠে দাঁড়াল। দোকানগুলোকে ডান পাশে রেখে আরও এগোতে লাগল।

আহির জানে না জায়গাটায় আর কী-কী আছে। তবে জায়গাটায় ঘুরতে ওর খুব ভাল লাগছিল। আরও ভাল লাগছিল আত্রেয়ীর জন্য। এত বছর ধরে কত রাগ ও পুষে রেখেছিল নিজের ভিতরে। ভেবেছিল, আত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা হলে শোধ তুলবে। কিন্তু ল্যান্ডৌর কিছুতেই ওকে প্রতিশোধ নিতে দিল না। বরং এমন রোদে ভেসে যাওয়া নিঝুম দুপুর ওকে ফের পুরনো ভালবাসার কাছে টানতে লাগল। পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে কখন যেন আহিরের আঙুলের সঙ্গে জড়িয়ে গেল আত্রেয়ীর আঙুল।

সেই আঙুল নিয়ে খেলতে-খেলতে এক সময় দু'জনে আগের মতো পরস্পরের হাত ধরে হাঁটতে থাকল।

আহির বলল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"দেখা যাক," আত্রেয়ী হাসল।

আহির আর কিছু বলল না। বরাবরই আত্রেয়ীর হাত ধরলে ওর গন্তব্যের কথা মনে থাকে না। হাঁটাই যেন আসল। গন্তব্যটা নয়। এত বছর বাদেও আহিরের তেমনই মনে হল। কলকাতায় থাকলেও কি এমন মনে হত? আহির জানে না। শুধু এইটুকু উপলব্ধি করেছে, ল্যান্ডৌর ওর ভিতর থেকে টেনে বের করেছে সেই কলেজ জীবনের মনটাকে। এখনও আত্রেয়ীর আঙুলগুলো ফার্স্ট ইয়ারে পড়া আত্রেয়ীর আঙুলেরই মতো হাতছানি দিতে জানে।

হাতে হাত ধরে দু'জন হেঁটে চলেছিল সোজা। দু' পাশে গাছেরা নতজানু হয়ে নিজেদের ছায়া দিয়ে রাস্তাকে ঢেকে ফেলেছে। লোকজন কেউ নেই। আহির ডান হাত দিয়ে আত্রেয়ীর বাঁ হাতকে অনুভব করতে পারছিল। আত্রেয়ীর হাত এখনও একই রকম নরম। সেই হাতের স্পর্শে পরস্পরের গভীরে পরস্পর ডুবে যাচ্ছিল। আর ঠিক তখনই আহিরের মোবাইল বেজে উঠল। সেই যান্ত্রিক শব্দে তাল কাটল। আত্রেয়ীর হাত ছাড়িয়ে ট্রাউজারের ডান পকেটে হাত ঢোকাল আহির। মোবাইল বের করে সামনে ধরতেই দেখল অনিন্দিতা ফোন করেছে।

থতমত খেয়ে গেল আহির। কী করবে বুঝতে পারল না। সবার আগে মোবাইলটাকে ও আড়াল করল আত্রেয়ীর কাছ থেকে। তারপর তাড়াতাড়ি সরে গেল আত্রেয়ীর পাশ থেকে।

॥ ১১ ॥

আহির ছিটকে সরে যেতে অবাক হল আত্রেয়ী। হঠাৎ কার ফোন এল যে ছিটকে সরে যেতে হল আহিরকে? তারপর মোবাইলের দিকে তাকিয়ে আহিরের মুখে যে দিশেহারা ভাব ফুটি-ফুটি করেও মিলিয়ে গেল, তা দেখে আত্রেয়ী আরও অবাক হল। তীক্ষ্ণভাবে ও জরিপ করল আহিরকে। খানিক দূরে সরে আহির কারও সঙ্গে কথা বলছে। গলার স্বর নিচু। মাঝে-মাঝে হাসছে। যেন কাউকে কিছু বোঝাচ্ছে। ব্যাপারটা কী? আহিরকে কম দিন চেনে না আত্রেয়ী। তাই আহিরের কিছু হাবভাব এখনও ওর পরিচিত। আত্রেয়ী খুঁটিয়ে আহিরকে লক্ষ করতে থাকল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

আত্রেয়ী যে ওকে লক্ষ করছে আহির খেয়াল করেনি। এক মুহূর্তের জন্য ওর মন চলে গিয়েছিল অনিন্দিতার দিকে। অনিন্দিতার ফোন প্রথমে ওর ভাবনাচিন্তা এলোমেলো করে দিল। আহির তাই সরে গেল আত্রেয়ীর পাশ থেকে। কারণ ও চায়নি আত্রেয়ী কোনওভাবে অনিন্দিতার কথা আঁচ করুক। সেই সঙ্গে আহির খানিকক্ষণ অনিন্দিতাকেও মজিয়ে রাখতে চাইল। অনিন্দিতা যদি আজ বারবার ফোন করে তা হলে ওর সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।

অনিন্দিতাকে ট্যাকেল করতে তেমন অসুবিধে হল না। অল্প কথার পর ও ফোন ছাড়ল। আহির আশ্বস্ত করল, রাতে অনেকক্ষণ গল্প করবে দু'জনে। এবার মোবাইল পকেটে ঢুকিয়ে আহির এল আত্রেয়ীর কাছে।

আত্রেয়ী বলল, "কার ফোন? তুই কেমন ছিটকে গেলি!"

"যাব না!" আহির মুখে ভয়ের ভাব আনল, "আমার রুমমেট সঞ্জয়।

নম্বরটা দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। হঠাৎ মনে হয়েছিল, সঞ্জয় বোধ হয় কিছু টের পেয়েছে।"

"এই সঞ্জয় লোকটা কে?"

"আমরা এক সঙ্গে চাকরি করি। সঞ্জয় ছেলে ভাল। তবে মাথায় ছিট আছে।"

"ছিট আছে!"

"হ্যাঁ, না হলে কেউ দশদিন ধরে মুসৌরি ঘোরার প্ল্যান করে? অবশ্য ওকে দোষ দিয়ে কী হবে। আমিও তো রাজি হয়েছিলাম। তখন কি আর জানতাম যে, মুসৌরি দু'দিনেই দেখা হয়ে যায়। ভাগ্যিস তোর সঙ্গে দেখা হল।"

"তোরা আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার চল। ওখানে অনেক কিছু দেখার আছে। সন্ধ্যারতি আছে। রাজাজি ন্যাশনাল পার্ক আছে। ঋষীকেশও খুব দূরে নয়। আমাদের সেখানেও যাওয়ার প্ল্যান আছে।"

আহির হাসল। বলল, "তিহরিতে তোকে দেখে আমি কী করেছি জানিস?"

আত্রেয়ী কোনও প্রশ্ন করল না। বড়-বড় চোখ করে তাকাল আহিরের দিকে। আহিরও সবিস্তারে শোনাল সঞ্জয়কে কীভাবে রাজি করিয়েছে আত্রেয়ীদের অনুসরণ করার ব্যাপারে।

সব শুনে আত্রেয়ী হেসে ফেলল। বলল, "কাজটা কিন্তু ঠিক করিসনি। তোর কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে, সঞ্জয় নিতান্তই ভাল ছেলে!"

"ও নিজেকে ক্যাসানোভা ভাবে। তুই ওই মেয়েটার সঙ্গে ওর একটু আলাপ করিয়ে দে। আর দেখিস সঞ্জয় নির্দোষ ফ্লার্ট করলে যেন দেবযানী কিছু মনে না করে।"

উত্তরে আত্রেয়ী কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারল না। একটা হইচই ভেসে এল সামনে থেকে। থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল, সামনে অনেকগুলো গাড়ি দাঁড় করানো। একদল ছেলেমেয়ে গাড়িগুলো ছাড়িয়ে খানিকটা গিয়ে চ্যাঁচামেচি করছে। এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায়, ছেলেমেয়েগুলো পঞ্জাবি। বোধ হয় ওদেরই মতো ঘুরতে এসেছে। কিন্তু কী দেখে উত্তেজিত হয়ে ওদের এত হাঁকাহাঁকি আহির ধরতে পারল না।

সামান্য ধাতস্থ হয়ে আত্রেয়ী বলল, "এই জায়গাটা হল লাল টিব্বা। বাব্বা, আমরা অনেকটা রাস্তা হাঁটতে-হাঁটতে চলে এসেছি।"

"লাল টিব্বা আবার কী জায়গা?"

"ল্যান্ডৌরের টুরিস্ট স্পট হাতে গোনা। এটা সম্ভবত হায়েস্ট পয়েন্ট। এখানে একটা টেলিস্কোপ রাখা। তুই চাইলে সেটা দিয়ে সামনের বরফ ঢাকা চূড়াগুলো কাছ থেকে দেখতে পারবি। দেখবি? টিকিট কাটতে হবে কিন্তু।"

আত্রেয়ীর হাত ছেড়ে পাহাড় চূড়া দেখার ইচ্ছে আহিরের একটুও হচ্ছিল না। তাই ও ঘাড় নাড়ল। যাবে না।

আত্রেয়ী বলল, "ওখানে একটা রেস্তরাঁও আছে। ওই কফি-টফি পাওয়া যায়। বসবি গিয়ে?"

একটু আগেই হানি-জিঞ্জার-লেমন টি খেয়েছে। এখন আর অন্য কিছু খাওয়ার মানে হয় না। আহির তাই এবারও একইভাবে আত্রেয়ীর প্রস্তাব নাকচ করে দিল।

পাছে আত্রেয়ী আবার কোনও প্রস্তাব দেয়, তাই আহির বলল, "চল হাঁটি। হাঁটতে ভাল লাগছে। এমন জায়গায় তো সচরাচর আসা হয় না। এলামই যখন, তখন একটু ঘুরি।"

আবার দু'জন হাত ধরাধরি করে হাঁটতে থাকল। লাল টিব্বা ছাড়িয়ে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে ওরা এগিয়ে চলল। এদিক আরও নির্জন। ছায়া-ছায়া। বড়-বড় গাছেরা রাস্তায় ছায়া বিছিয়ে দাঁড়িয়ে। সেই গাছেদের বয়স হয়তো শতাব্দী সমান।

গাছের ছায়া দিয়ে দু'জন নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। অল্প-অল্প হাওয়া দিচ্ছিল। ঠান্ডা হাওয়া। সেই হাওয়ায় গাছের পাতায় সর সর শব্দ হচ্ছিল। দূরে-দূরে বহু পাখি শিস দিচ্ছিল আনমনে। সেই সব শব্দ ছাড়া ওই রাস্তায় আর কোনও শব্দ নেই।

এমন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আহির কেমন চুপ করে গেল। আত্রেয়ীও। শুনশান রাস্তায় দু'জন শুধু একে-অপরের হাত ধরে এগিয়ে চলল। কথা না বললেও আহিরের মাথায় অনেক কিছু ঘুরছিল। আত্রেয়ীর নরম হাত নিজের হাতের মুঠোয় ধরে ও ভাবছিল, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? আর কয়েক মাস বাদেই ওর বিয়ে। শুধু তাই নয়, এখান থেকে ফিরে গিয়েই ও পড়বে বিয়ের পরিমণ্ডলে। অনিন্দিতার কেমন লাগবে যদি জানতে পারে ল্যান্ডৌরের নিরিবিলিতে আহির পুরনো প্রেমিকার হাত ধরে ঘুরছে? সেই প্রেমিকা যে অন্য পুরুষের টানে আহিরকে ফেলে চলে গিয়েছিল! এটা জানার পর অনিন্দিতা কি আর ওকে বিয়ে করতে চাইবে? উলটো দিক থেকে দেখলে আত্রেয়ীই বা কী ভাববে যখন ও জানতে পারবে আহিরের বিয়ে ঠিক হয়ে রয়েছে? মুসৌরি থেকে ফিরে ও গিয়ে বসবে বিয়ের পিঁড়িতে। আত্রেয়ীও কি তখন সব কিছু সহজভাবে নিতে পারবে? বিশেষ করে আত্রেয়ীর যখন মনে পড়বে ল্যান্ডৌরের রাস্তায় হাত ধরে হাঁটার মুহূর্তগুলো, তখন কি ধরতে পারবে না আহির আসলে ওকে ঠকিয়েছে? সবচেয়ে বড় কথা হল, আত্রেয়ী বিয়ের কথা জানার পর আহির পরিস্থিতি সামলাবে কী করে? কী বলবে? 'তোকে খুব ভালবাসি তাই বলিনি?' আত্রেয়ী বিশ্বাস করবে ওর যুক্তিটা?

কিন্তু আহিরের মনে আবার অন্য ভাবনাও এল। আত্রেয়ীর সঙ্গে আবার কীসের বিশ্বাস-অবিশ্বাস! আত্রেয়ী নিজেই তো ওর হাত ছেড়ে দীপঙ্করের হাত ধরেছিল। তখন কি একবারও পিছন ফিরে তাকিয়েছিল? ভেবেছিল, আহিরের উপর দিয়ে কী ঝড় যাচ্ছে? তা হলে আজ আহিরে বিয়ের খবর জানার পর আত্রেয়ী কী মনে করবে, তা নিয়ে এত ভাবার কী আছে?

কিন্তু আহির কি সত্যিই আত্রেয়ীকে ঠকাতে চাইছে? নিছক প্রতিশোধের নেশাতেই কি ও এসেছে ল্যান্ডৌরে? সেই উদ্দেশ্যেই কি ও এখন ধরেছে আত্রেয়ীর হাত? আহির জানে, সেটা পুরোপুরি মিথ্যে। আত্রেয়ীর উপর যে রাগই থাকুক না কেন, এখন আত্রেয়ীকে ভালবেসেই ও হাঁটছে এই রাস্তায়। এই ভালবাসা ঠিক না ভুল, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। কিন্তু এই ভালবাসায় কোনও খাদ নেই।

রাস্তাটা সোজা নয়। আঁকাবাঁকা। সেই আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ওরা যেখানে এল, সেটা একটা কবরখানা। এমন আশ্চর্য সুন্দর কবরখানায় আগে কখনও আসেনি আহির। কবরগুলোর পাশে পাহাড়ি ফুল ফুটেছে। প্রজাপতি উড়ছে। সাউথ পার্ক স্ট্রিট সিমেট্রিতে ও গিয়েছে এক-দু'বার। জোব চার্নকের সমাধিতেও ঘুরেছে। কিন্তু শহরের মাঝখানে অভিজাত কবরখানার সঙ্গে পাহাড়ের গায়ে গাছে ঢাকা এই কবরখানার কোনও তুলনাই হয় না।। ওরা যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, তার বাঁ দিকটা ঢালু হয়ে নীচে নেমে গিয়েছে। আর ডান দিকটা উঁচু। সেই উঁচু জায়গা জুড়েই কবরখানা। শান্ত। সমাহিত। এমন পরিবেশে এসে দাঁড়ালে মনে হয় মৃত্যু আশপাশেই থমকে দাঁড়িয়ে। যে-কোনও মুহূর্তে এসে নিঃশব্দে কাঁধে হাত রাখবে।

আহির আর আত্রেয়ী হাঁটা থামিয়ে সেই কবরখানাটা দেখতে লাগল।

এক সময় আহির নৈঃশব্দ ভেঙে বলল, "এখানে ঢোকা যায়?"

"জানি না," আত্রেয়ী ঘোরের মধ্যে থেকে বলল।

খানিক হাঁটতেই কবরখানার গেট। তার আগে দু' ধাপ সিঁড়ি রয়েছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে কবরখানার বড় গেটের সামনে পৌঁছতে হবে। কিন্তু সেই গেটে তালা ঝুলছে। ঢোকার উপায় নেই। আহির সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেটের কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারল। কেউ নেই। শেষ পর্যন্ত কাঁধ ঝাঁকিয়ে ও রাস্তায় নেমে এল। দু'জনে ফের হাঁটতে-হাঁটতে পৌঁছল কেলগস গির্জার সামনে। সেখানে সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা বসার জায়গা। ছাউনিও আছে। সেই জায়গায় গিয়ে আত্রেয়ী বসল। আড়মোড়া ভাঙল।

আহিরও বসল।

আত্রেয়ী বলল, "এখানে একটু বসি। অনেকটা হেঁটেছি।"

আহির কোনও জবাব দিল না। কেলগস গির্জার সামনেটা দেখতে থাকল। ল্যান্ডৌর জায়গাটায় খুব বিদেশ-বিদেশ গন্ধ। বিশেষ করে এই জায়গাটায় সেটা আরও বেশি। ভাল লাগছিল আহিরের। বিশেষ করে পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতো আত্রেয়ীকে পাওয়ায় সেই ভাল লাগা আরও বেড়ে গেল। মুসৌরিতে আসার আগে কি কল্পনাও করতে পেরেছিল, এই ট্রিপে এসে আত্রেয়ীর সঙ্গে এভাবে দেখা হবে? কিংবা গোটা পৃথিবীকে লুকিয়ে দু'জনের এভাবে ল্যান্ডৌরে চলে আসবে! হাতে হাত ধরে ঘুরবে!

সেই ভাললাগাকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে আহির এবার বলল, "শোন, তখন সঞ্জয়ের কথাটা উঠি-উঠি করেও চাপা পড়ে গেল। তোকে একটা কাজ করতে হবে।"

আত্রেয়ী কিছু বলল না। তবে জিজ্ঞাসু চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকল।

"তোর ওই বন্ধু দেবযানীকে ভিড়িয়ে দিতে হবে সঞ্জয়ের সঙ্গে। তা না হলে আমরা দেখা করতে পারব না।"

"দেবযানীর স্টেডি বয়ফ্রেন্ড রয়েছে। বেঙ্গালুরুতে থাকে।"

"সে থাকুক। সঞ্জয়েরও তো বউ আছে বাড়িতে। অসুবিধে কোথায়?"

আত্রেয়ী হাসল। বলল, "তুই ছেলেটাকে না ফাঁসিয়ে থামবি না দেখছি!"

"ফাঁসানোর প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল, আমাদের দেখা করার সুযোগ বের করা। সঞ্জয়কে যদি দেবযানীর সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হলে আমার লাইন

ক্লিয়ার।"

"কিন্তু সঞ্জয় যদি কিছু টের পায়?"

"প্রথমত পাবে না। সঞ্জয় আমার অতীত সম্পর্কে কিছুই প্রায় জানে না। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই, সঞ্জয় কিছু জানতে পেরেছে, তা হলে আমিও চার্জ করব, তুই মুসৌরি গিয়ে কোন মেয়ের সঙ্গে কী করেছিস, সেটা তোর বউকে বলে দেব। মনে হয় না এর পর সঞ্জয় মুখ খুলবে।"

আত্রেয়ী হেসে ফেলল। বলল, "পাকা মাথায় প্ল্যান কষেছিস তো!"

আহিরও হাসল। বলল, "নেসেসিটি ইজ় দ্য মাদার অফ ইনভেনশন। পড়িসনি?"

কেলগস গির্জার সামনেও দুটো পাখি ডেকে উঠল। প্রথমটা মনে হয় পুরুষ। তার ডাকে সাড়া দিল মেয়েটা।

সেই ডাক শুনে আত্রেয়ী বলল, "ভালই হল। ঘুরতে এসে হালকা প্রেম করতে দেবযানীর ভালই লাগবে। অন্তত ক্যামেরার শোক খানিক হলেও ভুলতে পারবে। বাকিদেরও আমি শিখিয়ে দেব। ওরা আমাদের আগের কথা সঞ্জয়ের সামনে ভাঙবে না।"

"তোদের তো দেখছি ভাল বন্ধুত্ব!"

আত্রেয়ী হাসল। বলল, "মেয়েরা যদি কোনও কথা চেপে রাখব মনে করে, তা হলে সেটা বের করা মুশকিল।"

আহির আর কিছু বলল না। শুধু এইটুকু উপলব্ধি করল, দুর্বার গতিতে ওরা পরস্পরের দিকে এগিয়ে চলেছে। পুরনোদিনের মতোই কোনও বাধা মানছে না। একবার অনিন্দিতার মুখ ভেসে উঠল ওর মনে। কিন্তু সেই মুখ, সেই ভালবাসাও আহিরকে টেনে রাখতে পারল না।

॥ ১২ ॥

হোটেলে ফিরে আহির দেখল সঞ্জয় চেয়ারে বসে চা খাচ্ছে। তখন সন্ধে হব-হব। দুন উপত্যকার উপর মশারির মতো মিহি কুয়াশা। দূরের বাড়িগুলোয় আলো জ্বলতে শুরু করেছে। বাইরের রাস্তায় লোক চলাচল বাড়ছে। বড়দিন আসছে। তার পায়ের শব্দ হোটেলের ঘরে বসেও শোনা যাচ্ছে।

আহিরকে ঢুকতে দেখে সঞ্জয় হাসল। বলল, "ফোন করে আর-এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে দে।"

আহির নিজের বিছানায় ধপ করে বসল। হাই তুলল। বলল, "দাঁড়া একটু জিরিয়ে নিই।"

সঞ্জয় আবার বাইরের দিকে তাকিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল। আহিরের মধ্যে যে পরিবর্তন সেটা ওর চোখে পড়ল না। কিন্তু আহির তখনও মনে-মনে বিভোর। আত্রেয়ীর সঙ্গে ল্যান্ডৌর ঘোরার রেশ তখনও ওর মন থেকে যায়নি। শুধু ঘোরা? হাতে হাত দিয়ে কতটা পথ ওরা পেরিয়েছে! ল্যান্ডৌরের বড় গির্জা থেকে হাঁটা শুরু করে ফের ঘুরতে-ঘুরতে সেখানেই গিয়ে হাজির হয়েছিল দু'জনে। তার মাঝে কত কথা, কত ভালবাসা, নিজেকে খুঁজে পাওয়া! আহিরের ইচ্ছে করছিল, দূরের বরফঢাকা পাহাড়গুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আত্রেয়ীকে চুমু খেতে। ঠিক যেমন চুমু ওরা খেত কলেজ জীবনে। তারপর আত্রেয়ীকে জড়িয়ে ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত।

কিন্তু প্রথমদিনই অতটা এগোতে সাহস পেল না আহির। আত্রেয়ী বাধা দেয়নি। বাধা দিল অনিন্দিতা। আহির যতই অনিন্দিতাকে মন থেকে সরিয়ে দিক, কিছুক্ষণ বাদে ধূপের গন্ধের মতো অনিন্দিতার ভাবনা ফের এসে হাজির হচ্ছিল। স্বস্তি দিচ্ছিল না ওকে। আহির নিজেকে ধমক দিচ্ছিল। এটা ওর জীবন। এই জীবনে কী করবে, না-করবে সেটা ও ঠিক করবে। তা হলে অনিন্দিতা এভাবে বাধা দেবে কেন? কিন্তু অনিন্দিতার ভাবনা যেন পার্শ্ববর্তী দেশের অনুপ্রবেশকারী। কোনও কাঁটাতার, বি এস এফ দিয়েও তাকে ঠেকানো সম্ভব হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত নিজের উপরই বিরক্ত হল আহির।

আত্রেয়ীর হাত ধরে ও নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-টানাপোড়েনে জড়িয়ে পড়েছিল। হালকা আনমনা হয়ে যাচ্ছিল। আত্রেয়ী সেটা পুরোপুরি ধরতে না পারলেও কিছু একটা আঁচ করছিল। তাই একবার জানতে চেয়েছিল, "কী এত ভাবছিস বল তো!"

আহির হেসেছিল। নিজের দুশ্চিন্তার কথা আড়াল করতে বলেছিল, "ভাবছি আমাদের পুরনোদিনগুলোর কথা। তখনও আমরা এভাবেই হাঁটতাম। এখনও হাঁটছি। মাঝখানে কত কিছু ঘটে গিয়েছে। আমরা আর আগের মতো নেই।"

আত্রেয়ী মৃদু চাপ দিয়েছিল আহিরের হাতে। বলেছিল, "জীবন এমনই। তুই ছক কষবি। জীবন ছক ওলটাবে। ওইভাবে ভাবিস না। নিজেই কষ্ট পাবি। আমিও এক সময় এভাবে ভাবতাম। এখন আর পিছন ফিরে তাকাই না। পিছন ফিরলেই নিজের ভুলগুলো দেখতে পাই। তখন বুকের ভিতরটা খা খা করে।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই আত্রেয়ীকে চুমু খেতে ইচ্ছে করেছিল আহিরের। কিন্তু ঠোঁট এগোতে যেতেই মনে পড়েছিল অনিন্দিতাকে। এখানে আসার আগে এয়ারপোর্টেই আহিরকে চুমু খেয়েছিল অনিন্দিতা। সঞ্জয় খেয়াল করেনি। ও তখন ব্যাগপত্র সামলাচ্ছিল। কিন্তু এয়ারপোর্টের গাদা-গাদা লোক তো দেখেছিল! অনিন্দিতা ভ্রুক্ষেপ করেনি। সেই কথা স্মরণে আসতেই আহির আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল। আত্রেয়ীর হাতও নিজের মুঠো জোরে চেপে ধরে ও নিজেকে সামলে নিয়েছিল। আত্রেয়ী ভেবেছিল, আহির বোধ হয় ওর যন্ত্রণার কথা শুনে ভরসা দিল। তাই ও আরও বেশি ঘেঁষে এসেছিল আহিরের।

"কী রে ঘরে ঢুকে তো ব্যোমকে গেলি!"

সঞ্জয়ের কথায় ঘোর কাটল আহিরের। হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমে চায়ের অর্ডার দিল। উঠে দাঁড়িয়ে জ্যাকেট খুলল। বলল, "তোর কাজেই গিয়েছিলাম। কাজটা হলও।"

"আমার কাজে!" চায়ের কাপ রেখে সঞ্জয় সোজা হয়ে বসল। বলল, "মানে?"

"বলছি। তার আগে বল, তোর শরীর কেমন আছে।"

"বেটার। আজ সারাদিন রেস্ট নেওয়ায় বেশ ঝরঝরে লাগছে। অবশ্য এখানে ঠান্ডা তো প্রবল। বাড়িতে থাকলে আরও ফিট হয়ে যেতাম।"

"বুঝলাম না। কাল বেরোতে পারবি?"

"কোথায়?"

"দূরে কোথাও নয়। এই ম্যাল রোডেই।"

"হ্যাঁ, সে তো এখনই পারি। তবে হাঁটাহাঁটি করলে একটু কাহিল লাগবে। এই যা..."

"না-না। এখন বেরোতে হবে না। কাল বেরোলেই হবে।"

সঞ্জয় অবাক হয়ে একবার আহিরকে জরিপ করল। বলল, "তুই কেমন বাঙালি গোয়েন্দাদের মতো কথা বলছিস!"

এবার আহির অবাক। বলল, "মানে!"

"ওই, কোনও কথাই পুরো বলছিস না। কিছুই ভাঙছিস না। কেমন 'জানি কিন্তু বলব না' গোছের ভাব। যেন লাস্ট পাতার আগে খুনির নাম বললে পাঠক আর বাকিটা পড়বে না।"

আহির এবার বেশ জোরেই হেসে ফেলল। বলল, "সাসপেন্স! সাসপেন্সটাই আসল। সেই টানেই তো বাকি গল্প শুনবি। ঠিক আছে। আর রহস্য করছি না। শোন, তোর যে মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে, ওই যে কেষ্টপুরের শ্রীরাধিকা, যার নাম দেবযানী। কাল সকালে দেবযানীর সঙ্গে তোর অ্যাপো। এই ধর সাড়ে দশটা নাগাদ। তাই জানতে চাইছিলাম, তুই ফিট কিনা!"

সঞ্জয় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল আহিরের দিকে। কোনও কথা জোগাল না ওর মুখে। আহির বুঝতে পারছিল, সঞ্জয় বোকা বনে গিয়েছে। ও ভাবতে পারেনি, আহির সত্যিই দেবযানীর সঙ্গে ওকে আলাদা করে দেখা করার বন্দোবস্ত করবে। রাস্তাঘাটে কত মেয়েকেই কতজনের ভাল লাগে। তাই নিয়ে বন্ধুরা ইয়ার্কি করে। তারপর ভুলে যায়। কিংবা আবার কোনও নতুন মেয়েকে নিয়ে ইয়ার্কি মারা শুরু করে। কিন্তু তিহরি লেকে দেখা একটা মেয়েকে নিয়ে আহিরের এই পাগলামির কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছিল না সঞ্জয়।

অনেকক্ষণ চুপ করা থাকার পর সঞ্জয় বলল, "আমি কালই মুসৌরি থেকে চলে যাব। তুই যাবি আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যাবি? হিমালয় না বারাসত?"

"আপাতত জলি গ্রান্ট। সেখানে কলকাতার যে ফ্লাইট পাব..."

"পাবি না। একশো তিরিশ কোটির দেশ। তোর জন্য কোনও এয়ারলাইন্স সংস্থাই একেবারে ইলেভেন্থ আওয়ারে টিকিট হাতে বসে নেই। বরং কাল তোর জন্য বসে থাকবে দেবযানী।"

সঞ্জয় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, "আমার জন্যও আর-এক কাপ চা বল।"

আহির টেলিফোনের রিসিভার তুলে রুমে দ্বিতীয় কাপ চা দিতে বলল। তারপর মিটিমিটি হেসে তাকাল সঞ্জয়ের দিকে।

সঞ্জয় একইভাবে বসে। একবার জানলা দিয়ে বাইরে দেখল। চাদরটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিল। কিছু ভাবল। বলল, "আমার পক্ষে কালকে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি অনন্যাকে ঠকাতে পারব না।"

"ঠকানোর কথা আসছে কোত্থেকে! অনন্যার আগেও তো তোর দুটো প্রেম ছিল। ছিল না? সেই প্রেম করার সময় নিশ্চয়ই শুধু আকাশ দেখে কাটাসনি!"

সঞ্জয় চুপ করে থাকল। আহির ফের যুক্তি দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় ডোরবেলের শব্দ। আহিরই দরজা খুলল। ট্রে-তে করে একজন ফ্লাস্ক আর দুটো চায়ের কাপ-ডিশ নিয়ে এসেছে। লোকটা এসে সঞ্জয়ের সামনের টেবিলে ট্রে-টা রাখল। একবার হেসে সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করল, "আজ শরীর কেমন আছে?"

সঞ্জয় কোনও জবাব দিল না। শুধু মাথা নাড়ল। লোকটা রুম থেকে বেরিয়ে গেল। সঞ্জয় কোনও কথা না বলে ফ্লাস্ক থেকে দু'জনের কাপে চা ঢালল।

আহির একটা কাপ তুলে চুমুক দিল। বলল, "বুড়িয়ে যাস না সঞ্জয়। তুই এখনও হেসে-খেলে দু'-চারটে প্রেম করতে পারিস। এখন সতীপনা দেখালে বুড়ো বয়সে আফশোস করবি।"

সঞ্জয় এবার ওর দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বলল, "তুই হঠাৎ আমায় প্রেমে ফেলতে চাইছিস কেন? নিজেও তো করতে পারিস। সাধারণত লোকে নিজে যখন ভুলভাল সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে তখন এই সব যুক্তি দেয়। তুই আমায় জড়াতে চাইছিস! কারণটা কী?"

"শোন ভাই, ফিরে গিয়ে যদি বিয়ে না থাকত, তা হলে হয়তো আমিও জড়াতাম। কিন্তু এবারের ট্রিপে তা আর হওয়ার নয়।"

"তা হলে আমারও এবার হওয়ার নয়।"

আহিরের এবার রাগ হতে থাকল। যত সহজে সঞ্জয়কে রাজি করাবে ভেবেছিল, তত সহজে কাজটা হচ্ছে না। সঞ্জয় যেন পেন্ডুলামের মতো দুলছে। কিন্তু কেন দুলছে? আহির ধরতে পারল, সঞ্জয়ের অবস্থাও ওরই মতো। আজ যেমন আত্রেয়ীকে হাতের নাগালে পেয়ে ও চুমু খেতে পারেনি, তেমনই সঞ্জয়ের ইচ্ছে থাকলেও দেবযানীর দিকে এগোতে পারছে না। দেবযানীর প্রতি সঞ্জয়ের টান প্রবল। কিন্তু মধ্যবিত্ত মূল্যবোধই ওকে আটকে দিচ্ছে। আহিরের মতো সঞ্জয়ও আপ্রাণ চাইছে বাঁধনের বাইরে বেরিয়ে নতুন জমিতে চড়ে বেড়াতে। মুশকিল হল, বাঁধন ছেঁড়ার জন্য সঞ্জয় যত চাপ দিচ্ছে, ততই বাঁধনের ফাঁস ওর গলায় এঁটে বসছে। এ এক জটিল পরিস্থিতি।

আহির এবার ঠান্ডা গলায় বলল, "আজ সারাদিন আমি কাটিয়েছি তোর জন্য। আমার মনে হয়েছিল, এটা একটা ফ্রি ট্রিপ। এখানে আমরা লাগামছাড়া জীবন কাটাব। সেই জীবন যা আমরা চাইলেও হয়তো আর কোনওদিন কাটাতে পারব না। তাই তোর সঙ্গে মেয়েটার সেটিং করানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি। এখন তুই পিছিয়ে গেলে আমি কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যাব। আর তুই অনন্যার কথা বলছিস! সম্পর্কের ব্যাপারে ঠকানোর কিছু থাকে না। তুই শিওর তোর পাশে শুয়ে অনন্যা অন্য কোনও পুরুষের কথা কখনও ভাবে না? হয়তো অনন্যা কোনওদিন সেই পুরুষের কাছে যাবে না। কারণ, সমাজ আছে, সেই পুরুষের ব্যক্তিগত জীবন আছে। কিংবা সেই পুরুষ কোনওদিন অনন্যাকে গ্রহণ করবে না। চাইলেই তো সব পাওয়া যায় না! কিন্তু কল্পনায় যে অনন্যা এমন উড়ান দিচ্ছে না তুই জানছিস কীভাবে? তলিয়ে ভাবলে দেখবি, এটাও এক ধরনের ঠকানোই। কিংবা ঠকানো নয়। এটাই জীবন। মানুষ রোবট নয় যে প্রোগ্রামিং করে দিলি, আর সেই মতো সে চলবে। সেটাই মজা। নিজের জীবন থেকে এই মজাগুলো মুছে দিস না। তা হলে কোনওদিন ভাল থাকতে পারবি না।"

এক টানা বলে আহির থামল। চায়ে চুমুক দিল। লক্ষ করল সঞ্জয়ের মনে একটা নাড়া লেগেছে।

সঞ্জয় এবারও চা খেতে-খেতে কিছু ভাবল। তারপর বলল, "ভয় করে জানিস তো! এখন এত কিছু বেরিয়ে গিয়েছে যে, যে-কোনও সময় ফেঁসে যেতে পারি। একবার লেগে গেলে আর সেই দাগ সারা জীবনে উঠবে না।"

"এখানে তুই ফাঁসবি না, সেই গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি।"

"কী করে এত জোর গলায় বলছিস? তুই চিনিস মেয়েগুলোকে?"

"আজ কথাবার্তা বলে যা বুঝেছি তাতে মেয়েগুলোকে খারাপ মনে হয়নি। ওরা চাকরি করে এক সঙ্গে। তাই সবাই মিলে ঘুরতে এসেছে।"

সঞ্জয় চুপ করে থাকল। বলল, "ঠিক আছে। চল তা হলে কাল দেখা করছি। তবে তার আগে একটু ফ্রেশ হতে হবে।"

আহির চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিল। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। বলল, "চাপ নিস না। কালকের মধ্যে তুই ফিট হয়ে যাবি।"

"কিন্তু দেখাটা করব কোথায়?"

"হোটেল ছাড়িয়ে খানিক গেলেই দেখবি বাঁ দিকে একটা প্রায় হ্যাঙ্গিং রেস্তরাঁ। সেখানে বসব।"

"সাড়ে দশটায়?"

"হ্যাঁ, তার আগে বড্ড ঠান্ডা থাকবে।"

সঞ্জয় আর কথা বাড়াল না। চাদরটা ফের ভাল করে জড়াল গায়ে।

আহিরের মনে হল সঞ্জয়ের শীত করছে। চা শেষ করে বাথরুমে গেল ও। তারপর পকেট থেকে মোবাইল বের করে পরের পরিকল্পনার কথা লিখতে লাগল আত্রেয়ীকে।

॥ ১৩ ॥

রেস্তরাঁয় পৌঁছে আহির দেখল আত্রেয়ী আর দেবযানী আগে থেকেই হাজির। রেস্তরাঁটা ঝুল বারান্দার মতো। খাদের দিকের একটা টেবিল। তার ওপাশের চেয়ারে দু'জন পাশাপাশি বসে। ওদের দেখে দেবযানী হাত নাড়ল। আহিরও হেসে পালটা হাত নাড়ল। তারপর দু'জন এগিয়ে গিয়ে বসল দেবযানীদের উলটো দিকের চেয়ারে।

সঞ্জয় একটু আড়ষ্ট। তাই দেখে দেবযানী বলল, "কী মিঃ গাঙ্গুলিবাগান, আপনার শরীর এখন কেমন?"

"এখন ভাল," সঞ্জয় হেসে বলল।

"তা তো হবেই। দু'জন সুন্দরীর সামনে বসলে সব ছেলেদেরই শরীর ভাল হয়ে যায়।"

সঞ্জয় আবার হাসল। এবার লাজুকভাবে।

আহির বলল, "আপনারা কোনও কিছুর অর্ডার দিয়েছেন?"

"নাহ," এবার আত্রেয়ী বলল।

আহির এবার উঠে গিয়ে চারটে কফির অর্ডার দিল। ফিরে এসে দেবযানীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আহির।"

দেবযানী বলল, "জানি।"

কফি এল। গল্প করতে-করতে চারজন কফি খেল। কফি শেষ হতেই আহির উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমি এবার উঠব। কিছু কেনাকাটা আছে।"

আত্রেয়ীও উঠে দাঁড়াল। বলল, "হ্যাঁ, আমাকেও যেতে হবে। অফিসের একটা ই-মেল করা দরকার।"

সঞ্জয় সবই বুঝল। কিছু বলল না। দেবযানীও তাই।

সঞ্জয়-দেবযানীকে বসিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। রাস্তায় উঠল।

আহির বলল, "দেবযানীকে রাজি করালি কীভাবে?"

"রাজি করানোর কিছু নেই। দেবযানীকে আলাদা করে সবই বললাম। তোকে-আমাকে স্পেস দিতে দেবযানী এক কথায় রাজি হল। আসলে দেবযানীকে আমি কয়েকবার জোর বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছি।"

কথা বলতে-বলতে ওরা হাঁটতে লাগল। এলোমেলোভাবে।

এক সময় আত্রেয়ী বলল, "কোথায় যাবি?"

"আমিও তাই ভাবছি। ফের ল্যান্ডৌর যাবি?"

"নাহ। তা চেয়ে কোম্পানি গার্ডেনে চল। কাছেই।"

জায়গাটার নাম শুনেছে আহির। তাই ঘাড় নেড়ে ও বলল, "চল।"

আত্রেয়ী একটা রিকশা থামাল। তাতে উঠে বলল, "কোম্পানি গার্ডেন চলিয়ে।"

আহিরও উঠল। রিকশা ছুটতে লাগল।

আজকের দিনটা তেমন ঝকঝকে নয়। হালকা মেঘ-মেঘ ভাব। রোদে তেমন তেজ নেই। আহির চারপাশ দেখতে-দেখতে আত্রেয়ীর সঙ্গে টুকটাক কথা বলছিল। গল্পে-গল্পে রিকশা এসে থামল কোম্পানি গার্ডেনের গেটের সামনে। আত্রেয়ী রিকশার ভাড়া দিল। আহির গিয়ে টিকিট কাটল। কিন্তু গার্ডেনে ঢুকে আহামরি কিছু লাগল না আহিরের। কলকাতার পার্কগুলো এর চেয়ে ঢের সুন্দর। তবে ওরা তো গার্ডেন দেখতে আসেনি। এসেছে সময় কাটাতে।

গার্ডেনের এক পাশে বোটিংয়ের ব্যবস্থা। আর-এক পাশে খেলাধুলোর আয়োজন। আজ সকালে এখানে তেমন লোক নেই। ওরা গিয়ে একটা বেঞ্চে বসল।

আহির এলিয়ে বসে বলল, "তারপর!"

"তার আর পর নেই," আত্রেয়ী হেসে বলল।

খানিকক্ষণ ওইভাবে দু'জন বসে থাকল। চুপচাপ। এই গার্ডেনে প্রচুর পাখি। কিচিরমিচির লেগেই রয়েছে।

এক সময় নীরবতা ভেঙে আত্রেয়ী বলল, "জানিস, ল্যান্ডৌর থেকে ফেরার পর রাতে ঘুমোতে পারিনি। কী যে হল!"

আহির কিছু বলল না। শুধু আত্রেয়ীর দিকে তাকাল।

আত্রেয়ী আনমনে বলল, "আমার কেবলই পুরনো কথা মনে পড়ছিল। বিশেষ করে দীপঙ্করের কথা। তখন তোর কাজকর্ম নিয়ে আমি ফ্রাস্ট্রেটেড। মা

সমানে বোঝাচ্ছে, আমার তাড়াতাড়ি সেটল করা দরকার। এই পরিস্থিতিতে দীপঙ্কর সামনে এসে দাঁড়াল। দীপঙ্করেরও একটা পাস্ট অ্যাফেয়ার ছিল। সেটা আমার সঙ্গে দেখা করার পর ও ভেঙে দেয়।"

"ভেঙে দেয় কেন?"

"আমি ছিলাম ওর লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। আমায় দেখে ও অন্য কোনও মেয়েকে আর ভালবাসতে পারেনি।"

আহির হেসে ফেলল। বলল, "তুই এখনও এই ধাপ্পাবাজিতে বিশ্বাস করিস!"

"এটা ধাপ্পাবাজি ছিল না। সেই পার্টিকুলার মোমেন্টে দীপঙ্কর সত্যিই তেমন ভেবেছিল। আসলে মানুষ যে কখন কী করবে, সেটা সে নিজেও পরিষ্কার জানে না। সেই সময় যে-কোনও কারণেই হোক দীপঙ্কর গভীরভাবেই আমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। শুধু সেই সময় কেন, বিয়ের পরেও দীপঙ্কর কোনওদিন আমার বাইরে কাউকে নিয়ে ভাবেনি। এমনকী ওর পুরনো প্রেমিকা মান্যতাকে নিয়েও নয়।"

"মান্যতাকে তুই দেখেছিলি?"

"প্রথমে দেখিনি। পরে দেখেছিলাম। সবার আগে দেখেছিলাম একটা ভিডিয়ো ক্লিপিংস। ওদের একটা ইন্টিমেট ভিডিয়ো শুট করেছিল দীপঙ্কর নিজের মোবাইলে। সেটা ও আমায় অকপটে দেখিয়েছিল। যাতে আমি না কখনও ভাবি যে দীপঙ্কর কিছু চেপে গিয়েছে আমার কাছে।"

"মান্যতা কেমন ছিল?"

"বড়লোক বাড়ির আদুরে মেয়ে। ইন ফ্যাক্ট, মান্যতাকে বিয়ে করলে দীপঙ্করের কেরিয়ারের উন্নতি অনেক দ্রুত হত। মান্যতার মা রাজনীতি করে। রুলিং পার্টিতে ভাল পোস্টে আছে। ওর বাবার বিরাট কারবার। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় নাকি তিনটে মাছের ভেড়ি। এ সবই আমার দীপঙ্করের কাছ থেকে শোনা। দীপঙ্কর শুধু মান্যতাকে ছাড়েনি। ওই বিপুল সম্পত্তিও ছেড়েছে। মান্যতারা দুই বোন। ওই প্রপার্টির হাফ পেলেই দীপঙ্কর পায়ের উপর পা তুলে জীবন কাটাতে পারত।"

"তা হলে তোদের ছাড়াছাড়ি হল কেন?"

"হল তোর জন্য। দীপঙ্কর আমায় ছাড়েনি। আমি দীপঙ্করকে ছেড়েছি। আমি দীপঙ্করের মধ্যে তোকে খুঁজে না পেয়ে আবার ফ্রাস্ট্রেটেট হয়ে পড়েছিলাম।"

"ওদিকে মান্যতা ঝামেলা করেনি!"

"করেনি আবার। আমায় ফোনে অ্যাসিড মারার থ্রেট দিয়েছিল। দীপঙ্করকে বলেছিল, ওর কেরিয়ার ডুম করে দেবে।"

"বলিস কী!" আহির সোজা হয়ে বসল।

আত্রেয়ী হাসল। বলল, "তোকে আগেই তো বলেছিলাম, আমার ঘাড়ে তখন ভূতে ভর করেছিল। দীপঙ্করের হাসি। কথা। সেন্স অফ হিউমারে ফিদা হয়ে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া ছোটবেলা থেকে ইনসিকিউরিটি দেখে-দেখে আমি চিরদিনই একটা নির্ভরতার জায়গা খুঁজতাম। তুই যত রাগারাগি করছিলি, মান্যতা যত থ্রেট দিচ্ছিল, আমার তত রোখ চেপে যাচ্ছিল। বিশেষ করে মান্যতার দাপাদাপি আমার জেদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।"

"তারপর কী হল?"

"কী আবার হবে! আমি একদিন মান্যতার সঙ্গে দেখা করলাম। বোঝালাম যে, ও হেরে গিয়েছে। আমার উপর চাপ বাড়ালে ওর কোনও লাভ হবে না। দীপঙ্কর আর ওর দিকে ফিরবে না। বরং ওকে নিয়ে দীপঙ্করের যে সুখস্মৃতি, সেটুকুও আর থাকবে না। দীপঙ্কর ওকে ঘেন্না করবে।"

"মান্যতা মানল?"

"না মেনে উপায় কী!"

"মেয়েটা এখন কেমন আছে?"

"ভালই আছে। বিয়ে করে এখন নিউ ইয়র্কে। বাবার অঢেল টাকা। মায়ের বিপুল কানেকশন। মান্যতাকে দেখতেও খুব সেক্সি। মেয়েটা মাসে হাজার-হাজার টাকা রূপচর্চার পিছনে খরচ করত। জামাকাপড়, জুতো, পারফিউম কিনত। সবই ব্র্যান্ডেড। অতএব এনআরআই পাত্র পেতে অসুবিধে হয়নি। সত্যি বলতে, আমি মান্যতার উপকারই করেছিলাম। দীপঙ্করের সঙ্গে বিয়ে হলে ও এত সুখী হত না, এখন যতটা হয়েছে।"

"কিন্তু দীপঙ্করের কাছে যে ওর ওই ক্লিপিং রয়ে গেল!"

আত্রেয়ী হাসল। বলল, "তুই কি সত্যিই মনে করিস আজকের পৃথিবীতে তাতে কারও কিছু এসে যায়! এটা কি টিনএজ প্রেম?"

আহির কোনও জবাব দিল না। আত্রেয়ী হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বলল, "ধুর, এই পুরনো কাসুন্দি অনেক ঘেঁটেছি। এবার একটু ঘুরব। ওই দ্যাখ, ওখানে একটা গোস্টরুম রয়েছে। চল, টিকিট কেটে ওটা দেখি।"

আহিরও উঠে পড়ল। আত্রেয়ীর দেখানো ঘরটা দেখল। কিন্তু জায়গাটা ওর ভাল লাগল না। খুবই খেলো ভূতের ঘর। কিন্তু আত্রেয়ী উত্তেজিত। বোধ হয় পুরনো প্রসঙ্গের রেশ কাটাতেই এমন বৈচিত্র চাইছে। তাই আহির বাধা দিল না। দুশো টাকা দিয়ে দুটো টিকিট কাটল।

কাউন্টারে বসা ছেলেটা বলল, "চলে যাইয়ে। শো চালু হ্যায়।"

আহির আর আত্রেয়ী একটা প্লাইউডের দরজা ফাঁক করে ঢুকল। ভিতরটা ঘুটঘুটে। শুধু একটা অন্ধকার প্যাসেজের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। ওরা সেই প্যাসেজে পা রাখতেই পিছনের দরজাটা ক্যাঁচ করে বন্ধ হয়ে গেল। দু'জনে অন্ধকারে সাবধানে পা ফেলে-ফেলে হাঁটতে থাকল। হঠাৎ পিছন থেকে একটা হাত এসে পড়ল আত্রেয়ীর কাঁধে। সেই সঙ্গে চাপা গলায় হাসি।

অন্ধকারেই চিৎকার করে উঠল আত্রেয়ী। জড়িয়ে ধরল আহিরকে। আহির ভয় পায়নি। তবে ওর বিরক্তি লাগছিল। আত্রেয়ীকে ভরসা দিতে আহিরও জড়িয়ে ধরল ওকে। এর পর কিছুটা যেতেই শুরু হল ভূতের উপদ্রব। কখনও মাথার উপর থেকে কোনও শরীর ঝুলে পড়ছে। কখনও ডান দিক থেকে কেউ বেরিয়ে আসছে। কখনও বা বাঁ দিক থেকে। সেই সঙ্গে উৎকট হাসি। আত্রেয়ী আরও জোরে আঁকড়ে ধরল আহিরকে। আহিরও সমানে আত্রেয়ীকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে নিয়ে চলল। এভাবে চলতে-চলতে আহির হঠাৎ খেয়াল করল, ওদের দু'জনের শরীর-মন যেন পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে। প্যাসেজটা খানিক গিয়ে ডান দিকে ঘুরেছে। সেই রাস্তাও দেখা যাচ্ছিল না। আন্দাজে হাঁটতে হচ্ছিল। আহিররা বুঝতে পারেনি, রাস্তাটা খানিক গিয়ে নেমে যাবে। সেখানে অবশ্য দুটো সিঁড়ির ধাপ ছিল। কিন্তু ভূতেদের দিকে নজর দিতে গিয়ে সিঁড়িটা ওরা খেয়াল করেনি। তাই চারপাশ দেখতে-দেখতে পা বাড়িয়ে দু'জন হুমড়ি খেল। আহিরই উলটে পড়ছিল। আত্রেয়ী ধরে ফেলল। কিন্তু আহিরের মুখ গিয়ে পড়ল আত্রেয়ীর বুকের উপর।

আবার দু'জনে জড়াজড়ি করে এগোতে থাকল। কিছুটা গিয়ে আবার দু' ধাপ সিঁড়ি। এবার উপরে ওঠার। তারপরই বেরোনোর গেট।

কোনওমতে ওই অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে খোলা আকাশের নীচে গিয়ে দু'জন দাঁড়াল। মাত্র পনেরো মিনিটের ট্রিপ। কিন্তু তাতেই যেন দু'জনের দম আটকে যাচ্ছিল। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর আহির দেখাল, ওরা তখনও একে অপরকে জাপটে। চারপাশ ফাঁকা তাই। না হলে ওদের অবস্থা দেখে অনেকেই ঘুরে তাকাত।

আহির সরে যেতে চাইল। কিন্তু আত্রেয়ী হঠাৎ আহিরের জামার বুকের কাছটা খামচে ধরে ওর কাঁধে মাথা রাখল। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, "ক্ষমা করে দে। আমি ভুল করেছিলাম। সব মানুষই তো কখনও না-কখনও ভুল করে। তাই বলে কি তুই আমায় ক্ষমা করবি না? একটা সুযোগ দে। আমি তোকে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে থাকতে পারব না! তুই আমায় ফিরিয়ে দিস না।"

আত্রেয়ীর কান্নার সামনে আহিরের সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল। কোম্পানি গার্ডেনের বড়-বড় গাছগুলো নীচে দাঁড়িয়ে আহির গভীরভাবে আত্রেয়ীকে চুমু খেল। আত্রেয়ীর চোখের নোনা জলে ওর ঠোঁট ভিজে গেল। চারপাশে তখন শুধুই পাখিদের ডাক।

এর পর ওরা হাতে হাত ধরে চুপচাপ ঘুরে বেড়াল চারপাশ। কিছুই দেখার নেই। কিন্তু আহির-আত্রেয়ীর কাছে তাও পরিবেশটা ভারী সুন্দর হয়ে উঠল।

আহির টের পাচ্ছিল, ওর ভিতর থেকে কলেজ জীবনের আহির আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে। আহির ফের খুঁজে পাচ্ছে নতুন করে সব শুরু করার দিশা।

এক সময় আত্রেয়ী বলল, "এবার আমাদের ফেরা উচিত। দেবযানী আর কতক্ষণ নাটক চালিয়ে যাবে?"

আহিরও সায় দিল সেই প্রস্তাবে। কিন্তু ওরা যখন কোম্পানি গার্ডেনের গেটের সামনে, তখন আহিরের মোবাইল বেজে উঠল। মোবাইল বের করে আহির দেখল অনিন্দিতার ফোন।

আত্রেয়ীকে ইশারায় এগোনোর নির্দেশ দিয়ে আহির ফোনটা ধরল। নির্লিপ্ত গলায় বলল, "হ্যাঁ বলো!"

"তোমার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলা যাবে?" কাঁপা-কাঁপা গলায় অনিন্দিতা বলল।

সেই গলায় এমন কিছু ছিল যে, আহির থমকাল। বলল, "হ্যাঁ যাবে। কী হয়েছে?"

"আমি এবার পিরিয়ড মিস করেছি," অনিন্দিতা ফিসফিসিয়ে বলল, "মনে হয়...মনে হয়...আমি কনসিভ করেছি..."

অনিন্দিতা আরও কিছু বলছিল। কিন্তু সেই সব কথা আহিরের কানে ঢুকল না। আত্রেয়ী খানিক এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ইশারায় ওকে ডাকছে। কিন্তু আহির ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। এগোতেও পারল না। আত্রেয়ীকে কিছু বলতেও পারল না।

॥ ১৪ ॥

"তুই আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার চল। বড়দিনের পরই আমরা হরিদ্বার চলে যাচ্ছি।"

"গিয়ে কী করব?"

"কী করব মানে! তুই কি কখনও হরিদ্বার গিয়েছিস?"

"না।"

"আমি গিয়েছি। তখন ক্লাস নাইনে পড়তাম। আমি, বাবা আর মা। সেটাই বোধ হয় আমাদের এক সঙ্গে শেষ ট্রিপ। আমার মুখ চেয়েই দু'জনে রাজি হয়েছিল যেতে। তখন এই সব বেল্টও ঘুরেছিলাম। তুই চল। তোর ভাল লাগবে।"

আহিরের হাত ধরে ম্যাল রোডের ধারের একটা বেঞ্চে বসে রয়েছে আত্রেয়ী। বেলা বেশি হয়নি। দেড়টা মতো বাজে। মিঠে রোদ এসে পড়েছে ওদের গায়ে। সঞ্জয় গিয়েছে ল্যান্ডৌর। সঙ্গে দেবযানী। কিন্তু আত্রেয়ীর সঙ্গে বসে স্বস্তি পাচ্ছিল না আহির। গতকাল বিকেলে অনিন্দিতার ফোনটা আসার পর থেকে ওর সব হিসেব গুলিয়ে গিয়েছে। আহির হয়তো নিশ্চিন্তে পা বাড়াত আত্রেয়ীর দিকে। কিন্তু এখন সেটা পারছে না। ভিতরে অদ্ভুত ছটফটানি। এক-একবার নিজের উপরই বিরক্তি, রাগ হচ্ছে। পরক্ষণে যুক্তি দিয়ে ও নিজেকে বোঝাচ্ছে, আত্রেয়ীর সঙ্গে মুসৌরিতে এসে দেখা হওয়া এবং ফের দু'জনের কাছাকাছি আসাটা নিছকই আকস্মিক ঘটনা। ও কী করে বুঝবে এমন পরিস্থিতিতে ওর জীবন গিয়ে পড়বে! কেউ কি ভাবতে পারে? তা হলে ওর ভুল কোথায়?

আত্রেয়ী এবার ওর কাঁধে মাথা রাখল। বলল, "কী রে, চুপ করে গেলি যে!"

"ভাবছি।"

"কী এত ভাবছিস বলতো! তুই তো আগে এত ভাবুক ছিলি না। আমিই গোমড়া মুখে ভাবতাম। তুই তো দিব্যি ফুরফুরে মেজাজে ঘুরতি।"

"ঘুরতাম। কারণ, তখনও স্বপ্ন দেখতাম আমি কলেজে পড়াব। সেমিনারে গিয়ে পেপার পড়ব। বিদেশ যাব। বই লিখব।"

আহিরের কথায় আত্রেয়ী সোজা হয়ে বসল। চেয়ে থাকল আহিরের মুখের দিকে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। আহির ভাবলেশহীন মুখে সামনের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে। ওর মাথায় কত কিছু যে ঘুরছে! আত্রেয়ী তার নাগাল পেল না। আত্রেয়ীর মনে হল, ওর ফিরে আসা সেই সব পুরনো স্মৃতিকেও টেনে এনেছে। তাই আত্রেয়ী জানতে চাইল, "তোর কেরিয়ার এদিকে বাঁক নিল কীভাবে? তুই পিএইচ ডি করা কি ছেড়ে দিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ।"

"আবার শুরু করা যায় না?"

"না। আমি ফেরার রাস্তা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে এসেছি।"

আত্রেয়ী কিছু বলল না। শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকল উপত্যকার দিকে।

আহিরের মাথায় তখন ঘুরছে অন্য চিন্তা। ওদিকে যদি সত্যিই অনিন্দিতা কনসিভ করে থাকে তা হলে কী হবে? বিয়ের এখনও তিন মাস বাকি। ততদিনে ওর শরীরে গর্ভবতী নারীর সব চিহ্ন ফুটে বেরোবে। আর বিয়ের ছ' মাস বাদেই সেই সন্তান জন্মাবে। এই ব্যাপারটা ওদের দুই পরিবার, আত্মীয়স্বজন কীভাবে নেবে? এটা নিয়ে কি চাপা হাসাহাসি চলবে? সন্তান বড় হলে কি তাকে শুনতে হবে যে বাবা-মায়ের বিয়ের ছ' মাসের মাথায় তার জন্ম হয়েছে? শোনার কী আছে, সে তো বড় হয়ে নিজেই হিসেব কষে ব্যাপারটা বের করতে পারবে! তা হলে কি অ্যাবর্শন? কিন্তু সেই কথাও ভাবতে পারল না আহির। এটা ওর কিংবা অনিন্দিতার পক্ষে সম্ভব নয়। তা হলে উপায়?

কিন্তু সেই চিন্তার পিছু-পিছু আর-একটা ভাবনাও এল। মেয়েদের পিরিয়ড হাজার একটা কারণে বন্ধ কিংবা দেরি হতে পারে। অনিন্দিতা হয়তো একটু বেশিই ভয় পাচ্ছে। হয়তো আর দু'-চারদিনেই ওর পিরিয়ড হবে। বাঙালি পরিবারে এখনও যৌনশিক্ষার বড় অভাব। অনিন্দিতার ভুল হওয়াটা কোনও আশ্চর্যের ঘটনা নয়।

তবু গ্র্যান্ডফাদার ক্লকের টিক টিক শব্দের মতো একটা দুশ্চিন্তা ওর মনেও টিক টিক করতে থাকল। বিয়েবাড়ি বুকিং হয়ে গিয়েছে। কার্ডও বোধ হয় এসে যাবে এবার। এদিকে আহির দিব্যি আত্রেয়ীর হাত ধরে এখানে বসে। ওদিকে অনিন্দিতার আশঙ্কা ও গর্ভবতী। কারও সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে পারলে আহিরের পক্ষে ভাল হত। কিন্তু কার সঙ্গে করবে? থাকার মধ্যে হাতের কাছে আছে একমাত্র সঞ্জয়। যদিও সঞ্জয় সবটুকু জানে না। তবু বন্ধু তো। কিছু অন্তত বুদ্ধি দিলেও দিতে পারে। কিন্তু সেই সঞ্জয়ও দিব্যি দেবযানীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওকে দেখলে এখন কে বলবে, দু'দিন আগেও দেবযানীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল না ছেলেটা। তার পিছনে যুক্তি ছিল, অনন্যাকে নাকি তাতে ঠকানো হবে! এখন কি ওই মেয়েদের সঙ্গে ল্যান্ডৌর যাওয়ার সময় সঞ্জয়ের একবারও মনে পড়েছে নিজের স্ত্রীর কথা? দিব্যি তো ও লাল টিব্বা থেকে চার দুকান ঘুরছে।

এই সব ভাবনায় ঘেঁটে ছিল আহির। হঠাৎ আত্রেয়ী বলল, "চল উঠি। এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছে না।"

"উঠে যাবি কোথায়?"

"আমি একবার হোটেলে ফিরব। মায়ের খোঁজ নিতে হবে।"

"কাকিমা কেমন আছেন?"

"ভাল না। কাল চৌকাঠে হোঁচট খেয়েছে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা ফুলে আছে। গরম জল, ঠান্ডা জল করেছে। কিন্তু ফোলা কমলেও ব্যথা কমেনি। বাড়িতে যা পেন কিলার ছিল, খেয়েছে। আমি ভয় পাচ্ছি ভাঙল কিনা! এই বয়সে আঙুল ভাঙলে কিংবা হেয়ার ক্র্যাক হলে ভোগান্তির একশেষ। নিজেও ভুগবে। আমাকেও ভোগাবে।"

আহির কোনও উত্তর দিল না। দু'জনে হাঁটতে লাগল আত্রেয়ীদের হোটেলের দিকে। হোটেলের কাছাকাছি এসে আত্রেয়ী বলল, "ফোন করিস। তেমন হলে বিকেলে বেরোব।"

আহির ঘাড় কাত করল। কিন্তু কোনও কথা বলল না। আত্রেয়ী একবার স্থির চোখে ওকে দেখল। আর কিছু বলল না। সোজা হোটেলের দিকে হাঁটা লাগাল। একবার পিছন ফিরে তাকালও না। আহিরের খারাপ লাগল। খানিক আগে হুট করে নিজের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের কথা বলে ফেলেছিল আত্রেয়ীকে। বলার সময় তেমন কিছুই ভাবেনি। নিজের হতাশা বেরিয়ে এসেছিল আচমকাই। কিন্তু এখন ওর মনে হচ্ছে, কাজটা ঠিক হয়নি। আত্রেয়ীর খারাপ লেগেছে। সত্যিই তো পুরনো ব্যর্থতাকে মনে রেখে কী হবে? জীবন তো দ্বিতীয় সুযোগ দেয় না। তা হলে ওই সব না ভেবে এখন যে সময় কাটাচ্ছে তার থেকে সেরাটা উশুল করে নেওয়াই তো ভাল।

কিন্তু সব সময় কি যুক্তি দিয়ে জীবন কাটানো যায়? এই যেমন আত্রেয়ীর সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর আহিরের মনে হয়েছিল, অনিন্দিতার কথা এবার আত্রেয়ীকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। আহিরে মনে যাই থাক, আপাতভাবে দেখলে ও এই মুহূর্তে দু'জনের সঙ্গে প্রেম করছে। পরিস্থিতি বেশ জটিল। তবু এত জটিলতার পরেও আহির কিছুতেই আত্রেয়ীকে বলতে পারছে না অনিন্দিতার ব্যাপারে। কোথায় যেন আটকে যাচ্ছে।

আজও সকালে দু'জনে যখন বেরিয়েছিল, তখনও আহির ঠিক করেছিল আত্রেয়ীকে সব জানিয়ে দেবে। অথচ আত্রেয়ীর মুখোমুখি হওয়ার পর আহির কিছুতেই অনিন্দিতা সম্পর্কে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারল না। সেটা কি আত্রেয়ীকে হারানোর ভয়ে? যদি অনিন্দিতার সঙ্গে সম্পর্কের জেরে আত্রেয়ী আবার ওর হাত ছেড়ে দেয়, সেই আশঙ্কা? নাকি আহির এখনও পুরোপুরি ঠিক করতে পারেনি কাকে ছেড়ে কাকে ধরবে? নিজের মনের গতিবিধিও ধরতে পারল না আহির। যে আত্রেয়ীকে এত বছর ঘেন্না করে এসেছে, চেয়েছে প্রতিশোধ নিতে, সেই আত্রেয়ীকেই এখন আহির বলতে পারছে না যে মার্চ মাসে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে।

নানা দিক থেকে ও বিষয়টার উপর আলো ফেলতে লাগল। অনিন্দিতাকে কি বলা যায় আত্রেয়ীর ফিরে আসার কথা? যে মেয়েটা ওকে বিশ্বাস করে নিজের সর্বস্ব দিয়েছে, মাসখানেক বাদেই যার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, সেই মেয়ে কি আদৌ মেনে নিতে পারবে আহিরের নতুন ভালবাসাকে? এখন তো সেই মেয়ে আরও ঘোরালো অবস্থার মধ্যে রয়েছে। আহির যদিও ওকে ওষুধের দোকান থেকে প্রেগন্যান্সি কিট কিনে পরীক্ষা করে দেখতে বলেছে। যদি সেটা পজিটিভ হয়, তা হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। অনিন্দিতা একটু ইতস্তত করছিল। ওই এলাকার পুরনো বাসিন্দা হল অনিন্দিতাদের পরিবার। পাড়ার সব ওষুধের দোকানই ওকে চেনে। অনেকে হয়তো জানে, সামনে ওর বিয়ে। তাই হুট করে প্রেগন্যান্সি কিট কিনলে এলাকায় কিছু জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

আহির তখন বলেছে, "তোমার স্কুলের ওখান থেকে কেনো!"

"তুমি কি পাগল হয়েছ?" অনিন্দিতা রেগে উঠেছিল, "স্কুলের অবিবাহিত

দিদিমণি গিয়ে ওষুধের দোকান থেকে ওই জিনিস কিনবে!"

আহির আর কিছু বলতে পারেনি। সত্যিই তো তালেগোলে এদিকটা ওর ভাবা হয়নি।

অনিন্দিতা শেষ পর্যন্ত বলেছে, "দাঁড়াও দূরের ওষুধের দোকান থেকে জিনিসটা কিনতে হবে। একটু সময় লাগবে। মুশকিল হল, এখন সবাই আমায় চোখে-চোখে রাখছে। সামনে বিয়ে বলে কথা!"

আহির আর কোনও জবাব দেয়নি। এখন মুসৌরিতে বসে শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া ওর সামনে আর কোনও রাস্তা নেই। কখন অনিন্দিতা সেই জিনিস কিনবে। তারপর পরীক্ষা করে দেখবে আদৌ ও অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে কিনা। তারও পরে যদি রিপোর্ট পজ়িটিভ হয় তখন দু'জনে ভাববে এর পর কী করবে!

এই সব চিন্তা মাথায় নিয়ে আহির ম্যাল রোডে হাঁটছিল। হোটেলে ফেরার এখন কোনও মানে হয় না। এদিকে যাওয়ারও কোনও জায়গা নেই। মনে অস্বস্তি। আহির ঠিক করল, হাঁটতে-হাঁটতে ও একবার ম্যাল রোডের শেষ প্রান্তের গির্জায় যাবে। অনেকবারই সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ও ভেবেছে গির্জায় ঢোকার ব্যাপারে। সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

সেই কথা ভাবার পর আহির হাঁটতে থাকল গির্জার দিকে। রোদ তেমন কড়া নয়। ঠান্ডা হাওয়াও দিচ্ছে। দুপুরবেলা হাঁটতে খারাপ লাগছিল না আহিরের। হঠাৎই ওর ফোন বেজে উঠল। আহির দেখল অচেনা নম্বর।

হাঁটতে-হাঁটতে আনমনেই আহির ফোনটা ধরল। ওপাশ থেকে এক পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল, "আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।"

"কে বলছেন?" আহির জানতে চাইল।

"আমি কে বলছি সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলব সেটা।"

লোকটার গলায় এমন কিছু ছিল যে, আহির দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "আপনি কে বলছেন সেটা আগের বলুন?"

"বলব। তবে এখন নয়। কাল সকাল দশটায়। বুদ্ধ মন্দিরে।"

"বুদ্ধ মন্দির?"

"হ্যাঁ, কোনও রিকশায় উঠে বলবেন। আপনাকে নিয়ে যাবে। গাড়িও নিতে পারেন।"

"কিন্তু আমি কেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব?"

"যাবেন। কারণ, আত্রেয়ীর সম্পর্কে আমি যে সব কথা আপনাকে বলব, তা আপনি জানেন না। শুনলে চমকে উঠবেন।"

আহিরের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে ভয়ে। কোনওমতে ও বলল, "আত্রেয়ী!"

"হ্যাঁ, আত্রেয়ী। এমন ভাব করছেন যেন আগে কখনও নামটা শোনেননি! গতকাল তো দিব্যি জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। কাল সকাল ঠিক দশটায় পৌঁছবেন। দেরি করবেন না।"

ফোনটা কেটে গেল। হতভম্ব আহির রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল। একবার মোবাইল হাতে নিয়ে দেখল নম্বরটাকে। এই নম্বরে পালটা ফোন করাই যায়। কিন্তু তাতে লোকটাকে চেনা যাবে না। বরং লোকটা আরও সতর্ক হয়ে যাবে। অতএব কাল সকালে ওকে বুদ্ধ মন্দিরে যেতেই হবে। লোকটা কে জানার জন্য। তার পাশাপাশি আরও একটা ভাবনা ওর মাথায় এল, আত্রেয়ী সম্পর্কে কী এমন তথ্য দেবে লোকটা যা শুনলে ও চমকে উঠবে?

॥ ১৫ ॥

মুসৌরিতে যে এমন সুন্দর বৌদ্ধ মঠ রয়েছে আহির জানত না। সঞ্জয়ের কাছেও এই মঠের কোনও খোঁজ নেই। তাই মঠটাকে খানিক খুঁজেই বের করতে হয়েছে ওকে। আহির যখন এই মঠে আসার পরিকল্পনা করছিল তখন অবাকই হয়েছিল সঞ্জয়। হঠাৎ এত জায়গা থাকতে ও এই মঠেই বা কেন আসতে চাইছে! আহির অবশ্য প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছে। সঞ্জয়ও আর জোরাজুরি করেনি। ততক্ষণে আহির জেনে গিয়েছে, সঞ্জয় আর দেবযানী কোম্পানি গার্ডেন যাওয়ার প্ল্যান করেছে।

তবে এখন এই মঠে দাঁড়িয়ে আহিরের মন ভাল হয়ে গেল। মঠের পরিবেশ এমনই, মন স্নিগ্ধ করে দেয়। কিছুক্ষণ মঠে দাঁড়িয়ে পরিবেশটাকে অনুভব করতে চাই আহির। তিব্বতী মঠগুলো যেমন হয়, এটাও তেমনই।

তবু এমন পরিবেশেও পুরোপুরি স্বস্তি পাচ্ছিল না আহির। সেই লোক কোথায়? আহিরের মোবাইলে লোকটার নম্বর সেভ করা আছে। ও চাইলে এক্ষুনি লোকটাকে ফোন করতে পারে। কিন্তু আহির একটু সময় নিল। লোকটা কী করে দেখা যাক। আহির লোকটাকে নাই চিনুক। লোকটা তো আহিরকে চেনে। নিশ্চয়ই আশপাশের কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। আহিরের উপর নজর রাখছে। যদি কোনওভাবে সামনে না আসে, তখন ফোন করা যাবে।

আহির পায়ে-পায়ে এসে দাঁড়াল মঠের মাঝামাঝি চওড়া চাতালের মতো জায়গাটায়। মেজাজ ফুরফুরে থাকলে ও এই মঠটা ঘুরে দেখত। ভিতরে ঢুকত। ফুলগাছের পাশে থাকা বেঞ্চগুলোর কোনও একটায় চুপচাপ বসে দূরের সাদা পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত।

এই সব ভাবনাতেই আনমনা হয়েছিল ও। আচমকা পিঠে টোকা পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে আহির দেখল, একটা লম্বা লোক এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটার চেহারা রোগাটে। গালে চাপ দাড়ি। চোখের কোলে পুরু কালি। চুল বড় এবং এলোমেলো। চাউনি জ্বলজ্বলে। কোনও রকম ভনিতা না করে লোকটা বলল, "আমিই ফোন করেছিলাম। আমার নাম দীপঙ্কর। আমি আত্রেয়ীর হাজ়ব্যান্ড।"

দীপঙ্কর নিজের পরিচয় দিতেই আহির চমকে উঠেছিল। আর ও যখন নিজেকে আত্রেয়ীর হাজ়ব্যান্ড হিসেবে ঘোষণা করল, তখন আহির এতটাই অবাক হল যে কোনও কথা বলতে পারল না। শুধু হাঁ করে দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে থাকল। আহির ভেবে পেল না লোকটা সত্যিই দীপঙ্কর কিনা। মুসৌরি তো কলকাতার কাছাকাছি কোনও জায়গা নয়। দীপঙ্কর এত দূর উজিয়ে মুসৌরিতে এসেছে? শুধু তাই নয় ওদের পিছুও নিয়েছে? এমনকী গত পরশু ওদের চুমু খেতেও দেখেছে। কোনও স্বামী কি স্ত্রীকে পরপুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখলে নির্লিপ্ত থাকতে পারে?

আহির সামলে নিল নিজেকে। লোকটাকে আগে বাজিয়ে দেখতে হবে। এক্ষুনি হতবাক হলে চলবে না। তাই দীপঙ্করকে আপাদমস্তক জরিপ করে ও বলল, "আপনি যে দীপঙ্কর, বুঝব কী করে?"

"আধার কার্ড দেখাব?"

"আধার কার্ডে আপনার নাম দীপঙ্কর থাকলেও আপনি যে আত্রেয়ীর এক্স হাজ়ব্যান্ড দীপঙ্কর সেটা বুঝব কীভাবে?"

দীপঙ্কর হাসল। বলল, "আমি এক্স নই, আমি আজও ওর হাজ়ব্যান্ডই। আত্রেয়ী আইনত আমার স্ত্রী।"

"দেখুন দাদা, আমার হাতে সময় কম। আপনি কী বলতে চাইছেন সোজাসুজি বলুন! আর এখানেই বা ডেকে আনলেন কেন? হোটেলের কাছে কোথাও বসা যেত না?" আহির তেড়িয়া হয়ে বলল।

"বলব। বলব বলেই তো ডেকেছি। হোটেলের কাছে বসলে কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এখানেই ডাকলাম। তবে আসল কথা শুরুর আগে আমার মনে হয় আমরা পরস্পরকে তুমি বলি। সেটাই সুবিধের।"

আহির কোনও জবাব দিল না। দীপঙ্করের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকল। বুঝতে চাইল, দীপঙ্করের মতলবটা কী!

দীপঙ্কর বলল, "একেবারে শুরু থেকে শুরু করি। প্রথমত, আত্রেয়ী নিজের সুবিধের জন্য তোমায় বলেছে, ওর সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়েছে। ইনফরমেশনটা ভুল।"

"ভুল মানে!"

"ভুল মানে ভুল। তুমি একবার আত্রেয়ীকে ডিভোর্স পেপার দেখাতে বোলো তো! আমার সঙ্গে আত্রেয়ীর ছাড়াছাড়ি হয়েছে। কিন্তু আইনি বিচ্ছেদ হয়নি। সেই জন্যই তোমাকে এখানে ডাকলাম। এবার থেকে তুমি আত্রেয়ীর থেকে দূরে থাকবে। না হলে কিন্তু তোমার কপালে দুঃখ আছে।"

আহিরের ঠোঁটে বাঁকা হাসি খেলে গেল। ও বলল, "আপনাকে আমি চিনি না। জানি না। আগে কোনওদিন দেখিনি। হঠাৎ পাকা আমের মতো টুপ করে খসে পড়ে আপনি আমায় বলছেন, আত্রেয়ী এখনও আপনার বউ। এবং আমি আত্রেয়ীর থেকে দূরে থাকব! আপনি কি পাগল? না ড্রাগ অ্যাডিক্ট!"

"আমি পাগল কিংবা ড্রাগ অ্যাডিক্ট কোনওটাই নই। আমি সরাসরি তোমায় থ্রেট দিলাম..."

"ধুর মশাই থ্রেট! এটা কি বলিউডের সিনেমা নাকি? আমি সোজা থানায় গিয়ে কমপ্লেন করলে কী হবে জানেন?"

"জানি। তুমি আমাদের ডিভোর্সের মামলায় জড়িয়ে যাবে।"

আহির আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। দীপঙ্করের শেষ কথায় থমকে গেল।

দীপঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, "তুমি কেন বুঝতে পারছ না, আত্রেয়ী তোমায় ব্যবহার করছে? তুমি ভাবছ আত্রেয়ী এত বছর বাদে তোমার কাছে ফিরে এসেছে! ভুল। আত্রেয়ী তোমার কাছে ফেরেনি। ফিরবেও না।"

"কী বলতে চাইছেন!" আহিরের ভুরু কুঁচকে গেল।

"বলতে চাইছি, আত্রেয়ীর একদিন মনে হয়েছিল, আমি তোমার চেয়ে বেটার। তাই তোমায় ছুড়ে ফেলে আমার কাছে চলে এসেছিল। আজ ও বুঝতে

পারছে, তোমাকে আমার সামনে এনে দাঁড় করালে আমায় টাইট দেওয়া যাবে। আমায় দেখিয়ে-দেখিয়ে ও তোমার সঙ্গে ঘুরবে। চুমু খাবে। আরও অনেক কিছু করবে। সেই জন্যই আত্রেয়ী প্রেম-প্রেম খেলছে তোমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে ওর বোঝাপড়া শেষ হলে আত্রেয়ী আবার তোমাকে ছুড়ে ফেলে দেবে।"

"হোয়াট ননসেন্স," আহির এবার নিজেকে সামলাতে না পেরে প্রায় ধমকের স্বরেই বলে উঠল।

দীপঙ্কর একবার চারদিক দেখল। তারপর বলল, "এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কথা হয় না। চলো বসি। তুমি আত্রেয়ীর কথা শুনেছ। এবার আমার কথাগুলোও একবার শুনে দেখো। যে-কোনও কিছু তো দু' পক্ষের কথা শুনেই বিচার করা উচিত। তাই না?"

আহিরের মনে হল দীপঙ্কর ভুল বলছে না। তাই দু'জনে গিয়ে একটা ফাঁকা বেঞ্চে বসল।

দীপঙ্কর বলল, "আমাদের ছাড়াছাড়ি নিয়ে আত্রেয়ী তোমায় কী বলেছে?"

"সেটা আমার আর আত্রেয়ীর কথা। তোমায় কেন বলতে যাব? তুমি যা বলতে চাইছ সেটা শুধু বলো!" আহির এবার সচেতনভাবেই দীপঙ্করকে 'তুমি' বলল। লোকটাকে আর আপনি বলা যাচ্ছে না।

"বলছি। কিন্তু দুটো ইন্টাররিলেটেড।"

"আত্রেয়ীর কথা তোমায় বলতে আমি বাধ্য নই।"

"ঠিক আছে। আমিই তা হলে বলি। আমার আন্দাজ ভুল না হলে আত্রেয়ী বলেছে, ও তোমায় ভুলতে পারেনি বলেই আমায় ডিভোর্স দিয়েছে। রাইট!"

আহির কোনও উত্তর দিল না।

দীপঙ্কর বলল, "কিন্তু সত্যি কথাটা হল, আমাদের ছাড়াছাড়ির পিছনে তোমার কোনও ভূমিকা নেই। আমাদের দাম্পত্য জীবনে তুমি কোনওদিন এন্ট্রিই নিতে পারোনি।"

আহির মনে-মনে জোর ধাক্কা খেল দীপঙ্করের কথা শুনে। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করল না।

দীপঙ্কর বলে চলল, "আমরা দিব্যি ছিলাম। কিন্তু আত্রেয়ী এবং ওর মা ওভারঅ্যাম্বিশাস। সেটাই কাল হল। আমি চিরকালই একটু-আধটু ভদকা খেতাম। আমাদের চাকরিতে কাজের খুব প্রেশার। না খেলে মাথা হালকা হয় না। টেনশন ছাড়া যায় না। তাই খাই। বিয়ের আগে উইকএন্ডে দু'-তিন পেগ খেতাম। সেটা আত্রেয়ী জানত। কখনও আপত্তি করেনি। বিয়ের পর আমরা একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করলাম। ইচ্ছে ছিল, একটু গুছিয়ে নিয়ে ফ্ল্যাট কেনার দিকে যাব। কিন্তু আত্রেয়ী আর ওর মা এমন চাপ দিতে থাকল ফ্ল্যাট কেনার জন্য যে, আমি চাপে পড়ে গেলাম। শুধু ফ্ল্যাট নয়। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, গাড়ি, সব কিছু নিয়েই এই চাপটা আসতে থাকল। সেই চাহিদা সামলাতে আমি কাজের চাপ বাড়ালাম। নেশাও বাড়ল। সেই নিয়ে শুরু হল অশান্তি। যার ফাইনাল আউটকাম, আত্রেয়ীর বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া। এর মাঝখানে তুমি কোথাও নেই আহির। তুমি নিছকই একটা অ্যাক্সিডেন্টাল স্কেপগোট। এখানে এসে তোমার সঙ্গে আত্রেয়ীর দেখা হয়েছে। আত্রেয়ী তারপর তোমায় ধরে নিয়েছে।"

"আমার সঙ্গে আত্রেয়ীর দেখা হওয়া, ধরে নেওয়া, ঘুরতে যাওয়া, এই সব তুমি জানছ কোত্থেকে?" আহির অবাক হয়ে বলল।

দীপঙ্কর আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গি করল। বলল, "আত্রেয়ীর চারপাশে আমার লোক ছড়ানো আছে। আমি অত সহজে ওকে ছাড়ব না। মেয়েটা আমার জীবন তছনছ করে দিয়েছে। শুধু তোমাকে একটাই রিকোয়েস্ট, এই ঝামেলার মাঝখান থেকে সরে যাও। এতে তোমার ক্ষতি হবে। আর-একটা রিকোয়েস্ট, আত্রেয়ীকে এক্ষুনি কিছু বলার দরকার নেই। আমি যে মুসৌরিতে এসেছি, সেটাও ও জানে না। তুমি প্লিজ় কিছু জানিয়ো না।"

আহির কোনও উত্তর দিতে পারল না। ওর সব হিসেব গুলিয়ে গিয়েছে।

দীপঙ্কর বোধ হয় ওর মনে অবস্থা ধরতে পারল। তাই বলল, "আমি বুঝতে পারছি, তোমার মনের মধ্যে কী চলছে। তবে তোমায় আরও একটা ইনফরমেশন জানিয়ে রাখি, আত্রেয়ী যখন তোমায় ছেড়ে আমার কাছে এসেছিল, তখন আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, পুরনো রিলেশন ও কেন ভাঙছে। আত্রেয়ী বলেছিল, তুমি নাকি আত্রেয়ীর কেরিয়ারের উন্নতি মেনে নিতে পারছ না। ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছ। সেই ফ্রাস্ট্রেশন থেকে কয়েকবার ওর গায়ে হাতও তুলেছ।"

আহির ফ্যালফ্যাল করে তাকাল দীপঙ্করের দিকে। আত্রেয়ীর গায়ে ও হাত তুলেছে! এমন অভিযোগ করতে পারল আত্রেয়ী?

দীপঙ্কর এবার ওর কাছে আরও ঘনিয়ে এল। বলল, "আত্রেয়ী পারে না



হেন কাজ নেই আহির। তুমি অনেক সরল। আত্রেয়ীর ধারেকাছে থেকো না। মেয়েটা সুবিধের নয়। তোমরা আর কলেজ জীবনে নেই।"

আহির চুপ করে বসে থাকল।

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়াল। বলল, "এবার আমি যাব। তুমি কি ফিরবে?"

"তুমি যাও। আমি খানিকক্ষণ এখানে থাকব," আহির জানাল।

দীপঙ্কর চলে গেল। আহির উঠতে পারল না। থম মেরে ও বসেই থাকল। একবার আত্রেয়ীর কথাগুলো ভাবতে থাকল। আর-একবার দীপঙ্করের। কে সত্যি বলছে? যদি ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েই থাকে তা হলে দীপঙ্কর কেন এভাবে আত্রেয়ীকে অনুসরণ করছে? আহিরের মনে হল, বিষয়টা নিয়ে সরাসরি আত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলা দরকার। গতকাল বিকেলে ওদের দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু আত্রেয়ী ফোন করেনি। আহিরও এই সব নিয়ে এত ঘেঁটে ছিল যে, আত্রেয়ীকে ফোন করতে পারেনি। এবার আহির বৌদ্ধ মঠ থেকে ফোন করল আত্রেয়ীকে।

খানিকক্ষণ বাজার পর আত্রেয়ী ফোন ধরল। ভারী গলায় বলল, "হ্যাঁ বল!"

আহির সোজাসাপটা প্রশ্ন করল, "তোর সঙ্গে কি দীপঙ্করের ডিভোর্স হয়েছে? না তোরা এখন শুধু সেপারেশনে আছিস!"

"হঠাৎ?" আত্রেয়ীর স্বর এবার কঠিন হল।

"এক্ষুনি দীপঙ্কর এসে আমার সঙ্গে দেখা করল..."

"দেখা করল মানে?" আত্রেয়ী প্রায় চিৎকার করে উঠল।

"দেখা করল মানে দেখা করল। দীপঙ্কর এখন মুসৌরিতে। শুধু তাই



নয়, গত পরশু কোম্পানি গার্ডেনে ও আড়াল থেকে আমাদের উপর নজর রেখেছিল।"

"তুই এখন কোথায়? হোটেলে?"

"না। বৌদ্ধ মঠে। নিজের পরিচয় না দিয়ে দীপঙ্কর আমায় এখানে ডেকেছিল।"

"তুই এক্ষুনি ম্যাল রোডের মুখটায় আয়। আমি যাচ্ছি। যা কথা সামনাসামনি হবে।"

ফোনের লাইন কেটে আহির এবার উঠে পড়ল। আত্রেয়ী ঠিকই বলছে। ওদের একবার মুখোমুখি হওয়া দরকার। এক্ষুনি।

॥ ১৬ ॥

ম্যাল রোডের মুখে পৌঁছে আহির দেখল আত্রেয়ী এক পাশে দাঁড়িয়ে। দূর থেকে আত্রেয়ীকে দেখেই আহির ধরতে পারল আত্রেয়ী প্রবল দুশ্চিন্তায়। হোটেলে পরা সালোয়ার কামিজের উপর গরম জামাকাপড় চাপিয়েই ও চলে এসেছে। মাথায় টুপি নেই। চুল উলুঝুলু হয়ে আছে। আহির যেতেই আত্রেয়ী বলল, "এবার বল কী হয়েছে!"

"আগে কোথাও বসি। এভাবে ভিড়ে মধ্যে দাঁড়িয়ে তো কথা বলা যাবে না।"

"কোথাও বসতে হবে না। চল ওপাশে গিয়ে দাঁড়াই," বলে আত্রেয়ী রাস্তার উলটো দিকের একটা ফাঁকা জায়গা দেখাল।

আহির ঘাড় কাত করে সায় দিল। তারপর দু'জন রাস্তা পেরিয়ে ওই জায়গায় গেল। সেখানে গিয়ে আত্রেয়ী সপ্রশ্ন চোখে তাকাল আহিরের দিকে।

আহির বলল, "সবার আগে বল, দীপঙ্করকে দেখতে কেমন? আমি যে লোকটার সঙ্গে কথা বললাম, সেই লোকটাই যে তোর দীপঙ্কর কিনা সেটা আগে বোঝা দরকার।"

আত্রেয়ী মোবাইলের গ্যালারিতে গিয়ে দীপঙ্করের ছবি বের করে আহিরকে দেখাল। ছবিটা বেশি পুরনো নয়। তবে ছবিটা দেখার পর আহিরের মনে কোনও সন্দেহ থাকল না যে, বুদ্ধ মন্দিরে যার সঙ্গে ও কথা বলেছে, সে দীপঙ্করই। ফারাক শুধু এক জায়গায়। ছবির মানুষটা অনেক ঝকঝকে। সেই তুলনায় আজ সকালে আহির যার মুখোমুখি হয়েছিল সেই লোকটা যেন গ্রামবাংলার ভাঙাচোরা জমিদারবাড়ি।

আত্রেয়ী বলল, "দীপঙ্কর তোকে কী-কী বলেছে?"

আহির ধীরে-ধীরে দীপঙ্করের যোগাযোগ করা, দেখা করতে বলা, দেখা করার পর যা-যা হয়েছে, সবই জানাল আত্রেয়ীকে।

শুনতে-শুনতে আত্রেয়ীর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। চোয়াল শক্ত করে ও বলল, "কাল যখন ফোনটা এল, তখন তুই আমায় কিছু জানাসনি কেন?"

"আমি নিজে আগে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছিলাম।"

আত্রেয়ী রেগে গিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহির বাধা দিল। বলল, "তুই শুধু আমায় একটা কথা বল, তোর সঙ্গে কি দীপঙ্করের ডিভোর্স হয়েছে?"

আত্রেয়ী সেই কথার কোনও সরাসরি জবাব দিল না। তার বদলে মোবাইলে একটা নম্বর ডায়াল করতে গেল।

আহির জানতে চাইল, "কাকে ফোন করছিস?"

"দীপঙ্করকে।"

"তুই কি পাগল হয়েছিস?" আহির খপ করে আত্রেয়ীর হাত থেকে মোবাইল নিয়ে ফোনটা কাটল।

আর তার ফলে আত্রেয়ীর ভিতর এতক্ষণ যে রাগ জমেছিল, সেটা দুম করে ফেটে পড়ল।

আহিরের হাত থেকে মোবাইলটা কেড়ে নিয়ে আত্রেয়ী প্রায় চিৎকার করে বলল, "বেশ করব ফোন করব। আর তুই আমায় বাধা দেওয়ার কে! দীপঙ্কর ভেবেছেটা কী? আমার জীবন ছারখার না করে থামবে না? লোকটা সাহস পায় কী করে আমার পিছু-পিছু মুসৌরিতে আসার! শুধু আসা নয়, লুকিয়ে-লুকিয়ে গোয়েন্দাগিরিও করছে! তোর মন বিষিয়ে দিতে চেয়েছে! ও বুঝতে পেরেছে, আমার মন থেকে তোকে মোছা যাবে না। এবার চেষ্টা শুরু করেছে তোর কাছে আমায় হেয় করার। যাতে তুই আমার কাছ থেকে সরে যাস।"

আহির তাও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আত্রেয়ী আবার একইভাবে বলল, "তুই এর মাঝখানে একদম কথা বলবি না। এটা আমার আর দীপঙ্করের বোঝাপড়া। তুই জানিস না, দীপঙ্করটা একটা স্কাউন্ড্রেল! ও যে কী করতে পারে আর পারে না, আমার ভালভাবে জানা আছে।"

আহির তবু বলল, "মাথা গরম করিস না। তা হলে চালে ভুল করবি। আর তোর চালে ভুল হলে দীপঙ্করেরই সুবিধে। তার চেয়ে আমার কথা শোন..."

"জ্ঞান দিস না," আত্রেয়ী একইভাবে বলল, "আমায় কী করতে হবে, সেটা আমার জানা আছে। সেই ছোটবেলা থেকে আমি নিজেই ডিসিশন নিতে-নিতে বড় হয়েছি। আমায় রাস্তা দেখানোর কেউ ছিল না। দীপঙ্করের সঙ্গে একটা এসপার ওসপার করার সময় এসে গিয়েছে।"

আহির এগিয়ে গিয়ে আত্রেয়ীর হাত ধরল। ওকে ঠান্ডা করতে চাইল।

আত্রেয়ী এক ঝটকায় ওর হাত সরিয়ে দিল। বলল, "তোকে বলেছি না, আমায় বোঝাতে আসিস না। তুই এখন হোটেলে যা। আমিও হোটেলেই যাব। তারপর যা করার করব।"

আহির আহত চোখে আত্রেয়ীর দিকে তাকাল। কিন্তু সেই চাউনিকে পাত্তা না দিয়ে আত্রেয়ী পা বাড়াল হোটেলের দিকে। আহির দাঁড়িয়েই থাকল। আত্রেয়ী দু'-চার পা গিয়েছে, এমন সময় আহিরের পিঠে আবার টোকা পড়ল। চমকে উঠল আহির। দীপঙ্কর কি এতক্ষণ আড়াল থেকে নজর রাখছিল! কিন্তু পিছন ফিরে ও দেখল সঞ্জয়। আর সঞ্জয়ের পিছনে দেবযানী। দেবযানী অবশ্য আহিরের দিকে তাকাল না। আত্রেয়ীকে হনহন করে যেতে দেখে ও চিৎকার করে ডাকল, "অ্যাই আত্রেয়ী দাঁড়া! কী হল রে!"

কিন্তু আত্রেয়ী দাঁড়াল না। বাধ্য হয়ে ওদের ফেলে দেবযানী ছুটল আত্রেয়ীর পিছনে।

এদিকে সঞ্জয় অবাক হয়ে আহিরকে জরিপ করল। বলল, "কেসটা কী? হঠাৎ ওই মেয়েটা তোকে এত টেম্পার দেখল কেন? ভুলভাল কিছু করতে গিয়েছিলি?"

আহির কিছু বলল না। আত্রেয়ীর অপমান তখনও ও হজম করতে পারছিল না।

সঞ্জয় এবার খুঁটিয়ে ওকে দেখল। ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, "তুই কি মেয়েটাকে চিনিস?"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আহির। এত টানাপোড়েনে ওর হাঁসফাঁস অবস্থা। সঞ্জয়ের কথা শুনে ওর মনে হল, এবার সঞ্জয়কে সব বলা দরকার। না হলে একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হবে।

ঘাড় কাত করে আহির বলল, "হ্যাঁ, আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়তাম।"

সঞ্জয় এমন উত্তর আশা করেনি। আহিরকে আপাদমস্তক মেপে ও বলল, "শুধু একসঙ্গে পড়তিস?"

"না। আমাদের দীর্ঘদিনের অ্যাফেয়ার ছিল।"

"তারপর?"

"তারপর আবার কী! ব্রেকআপ হয়ে গিয়েছিল।"

"সেই ব্রেকআপের পর তোর সঙ্গে আত্রেয়ীর দেখা হল তিহরি লেকে। তাই তো?"

আহির 'হ্যাঁ' বলতে গিয়েও থমকে গেল। সঞ্জয় বলতে কী চাইছে!

সঞ্জয় ফের বলল, "কীরে তাই তো?"

আহির কোনওমতে মাথা নাড়ল।

"সেই টানেই তুই মাঝরাতে থানা পর্যন্ত ওদের ফলো করেছিলি! ওদের হোটেলটা পাগলের মতো খুঁজেছিলি! আশা করি আমি ভুল বলছি না।"

আহির পুনরায় মাথা নাড়ল।

"আর আত্রেয়ীর কাছে পৌঁছনোর জন্য তুই আমায় ব্যবহার করেছিলি! ওই সব কেষ্টপুরের রাধিকা-ফাদিকা ফালতু ব্যাপার ছিল। তুই আমার সঙ্গে দেবযানী প্রেম করাতে চাসনি। চেয়েছিলি আমায় সামনে রেখে নিজের পুরনো প্রেমিকার সঙ্গে মুসৌরিতে রোম্যান্স করতে। তাই তো?"

এবার আর আহির মাথা নাড়তে পারল না।

সঞ্জয় এবার হিসহিসে গলায় বলল, "আমি ঢের-ঢের ধান্দাবাজ দেখেছি আহির। কিন্তু তোর মতো এমন ভোলাভালা চেহারার ছেলে যে এত শয়তান হতে পারে, আমি ধরতে পারিনি। হোটেলের রুম আমার নামে বুক করা। তুই এখনই গিয়ে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে যাবি। আর তোর ফ্লাইটের টিকিট আমার কাছে। সেটা নিয়ে যাবি। তোর মতো শয়তানের সঙ্গে থাকা যায় না!"

আহির বলল, "তুই কিন্তু আমায় ভুল বুঝছিস।"

"আমি এতদিন ভুল বুঝতাম আহির। আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না, হঠাৎ আমার সঙ্গে দেবযানীর প্রেম করিয়ে দেওয়ার জন্য তুই কেন এত মরিয়া। আমিও শালা মাথামোটা। সুন্দরী মেয়ে দেখে তোর ফাঁদে পা দিয়েছিলাম। ভাগ্যিস দেবযানী মেয়েটা ভাল। ভদ্র। না হলে এই ট্রিপে আমার হয়ে গিয়েছিল। তুই এক্ষুনি হোটেলে গিয়ে নিজের জিনিস নিয়ে বেরিয়ে যাবি।"

"এদিকে কী হয়েছে একবার শুনবি না!"

"না। তোর সঙ্গে আমার আর কোনও কথা নেই। তুই বেরো। অফিসে ফিরে আমি সবাইকে বলব। হ্যাঁ, পারলে অনিন্দিতাকেও বলব। ওই মেয়েটারও জানা দরকার কী ছেলের সঙ্গে ও জীবন শুরু করতে যাচ্ছে।"

"তুই কিন্তু আমায় কিছু বলতেই দিচ্ছিস না," আহির এবার ক্ষোভে ফেটে পড়ল, "হ্যাঁ, আত্রেয়ীকে এত বছর বাদে দেখে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কেন জানিস? আমার কেরিয়ার, স্বপ্ন সব ওই মেয়েটার জন্য ছারখার হয়ে গিয়েছিল। তুই আমার পাস্ট সম্পর্কে কিছুই জানিস না সঞ্জয়। শুধু একটা ঘটনা দেখে বাকি ঘটনাটা নিজের মতো সাজিয়ে নিচ্ছিস। তুই কি জানিস ওই মেয়ের জন্য আমি পিএইচ ডি গাইডের সঙ্গে তুমুল ঝামেলা করে ইউনিভার্সিটি ছেড়েছিলাম। তোর কোনও জোরালো পুরনো প্রেম নেই। তুই বেঁচে গিয়েছিস। কিন্তু যাদের থাকে, তারা যদি ফের ওই পুরনো ভালবাসার কাছে আসে, তা হলে নিজেদের সামলাতে পারে না। জীবনটা নীতিকথার বই নয়। আমি তোর সঙ্গে, অনিন্দিতার সঙ্গে যা করেছি সেটা অন্যায়। আমি কবুল করে নিচ্ছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, ওই পরিস্থিতিতে পড়লে তুইও তাই করতিস।"

সঞ্জয় বাঁকা হাসল। বলল, "হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়। তুই নিজে অন্যায় করেছিস বলে ধরে নিস না সবাই তাই করবে। যাই হোক, আমি হোটেলে ফিরছি। তোকে নিয়ে আমাকেও নতুন করে ভাবতে হবে।"

সঞ্জয় আর আহিরকে কিছু বলার সুযোগ দিল না। সোজা হাঁটা দিল হোটেলের দিকে। আহির দাঁড়িয়ে থাকল। বিকেল হয়ে আসছে। ঠান্ডা বাড়ছে নিঃশব্দে। তবে রাস্তায় প্রচুর লোকজন। গাড়ি। আহির চুপ করে ফুটপাথের এক ধারে দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ এই শীতের বিকেলে আহির আবিষ্কার করল, আসলে ও খুবই একা। সেই একাকিত্ব ভাগ করার জন্য কেউ নেই ওর জীবনে। আত্রেয়ীও নয়। অনিন্দিতাও নয়।

আহিরও আনমনে ম্যাল রোডের ধার দিয়ে হাঁটা শুরু করল। চারপাশে পাহাড়। দূর থেকে কুয়াশা উড়তে-উড়তে আসছে। আহির সেই কুয়াশার দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকল নিজেকে নিয়ে। একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল ও। এমন সময় মোবাইল বেজে উঠল পকেটে।

কথা বলতে ভাল লাগছে না। আহির ভাবল লাইনটা কেটে দেবে। সেই উদ্দেশ্যেই ও পকেট থেকে মোবাইলটা বের করেছিল। কিন্তু কলটা কাটতে গিয়ে দেখল অনিন্দিতা ফোন করেছে। সারাদিনে অনিন্দিতার সঙ্গে কথা হয়নি। আহির তাই জোরে নিশ্বাস ছেড়ে ফোনটা ধরল।

ওপাশ থেকে অনিন্দিতার চাপা গলা ভেসে এল, "সেই সকাল থেকে তোমায় ট্রাই করছি। কিছুতেই পাচ্ছিলাম না।"

"কী হয়েছে?" আহির প্রশ্ন করল।

"আজ সকালে টেস্ট করেছি। পজ়িটিভ। আমি কনসিভ করেছি।"

আহির দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর মুখে কোনও কথা জোগাল না।

ওপাশ থেকে অনিন্দিতা সামনে বলে চলেছে, "হ্যালো, হ্যালো! তুমি শুনতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি," কোনওমতে বলল আহির।

"কী হবে গো!" অনিন্দিতা প্রায় কেঁদেই ফেলল, "তুমি এখানে নেই।

আমার খুব ভয় করছে।"

আহির চুপ করে থাকল। ও কিছুতেই অনিন্দিতাকে বলতে পারল না যে, ওর নিজেও এখন বেশ ভয় করছে। এক অদ্ভুত ঠান্ডা অনুভূতি ওর শরীর-মনে চারিয়ে যাচ্ছে। মানুষের জীবনে প্রথম সন্তান এক বিশেষ অনুভূতি নিয়ে আসে। কিন্তু আহিরের সেই অনুভূতি হচ্ছে না। আহির কুঁকড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, কোনও গভীর কুয়োর মধ্যে ও তলিয়ে যাচ্ছে একটু-একটু করে। কুয়োর চারপাশ মসৃণ। কিছুতেই ওর পতন আটকাতে পারছে না আহির।

ওপাশ থেকে অনিন্দিতা আর্ত গলায় 'হ্যালো হ্যালো' বলেই চলেছে।

আহির সেই ডাকে সাড়া দিতে চাইছে। কিন্তু পারছে না। ওর দম আটকে আসছে। রাস্তার ধারের রেলিং ধরে নিজেকে ও সামলালো। শুনতে পেল অনিন্দিতা জিজ্ঞেস করছে, "হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ! তুমি কবে ফিরবে? আমি এভাবে একা থাকতে পারব না... হ্যালো..."

॥ ১৭ ॥

"অনিন্দিতা কে?"

"কে অনিন্দিতা?"

"তুই অনিন্দিতা বলে কোনও মেয়েকে চিনিস?"

আহির চুপ করে থাকল। কী জবাব দেবে বুঝতে পারল না। হঠাৎ ওর মনে পড়ল বহুদিন আগের এক সন্ধে। সেদিন গড়িয়াহাট মোড়ের কফিশপে এভাবেই আহির সোজাসুজি জানতে চেয়েছিল, "কাল যে ছেলেটার হাত ধরে ধর্মতলা দিয়ে হাঁটছিলি, সে কে?"

আজ আবার সেই পরিস্থিতি। শুধু ওদের অবস্থান উলটে গিয়েছে।

আত্রেয়ী ফের বলল, "কীরে, তুই তো একদম বোবা হয়ে গেলি! আমি কি তা হলে ধরে নেব, মৌনং সম্মতিলক্ষণম?"

আহির এবার তাকাল আত্রেয়ীর দিকে। বলল, "কী জানতে চাইছিস বল!"

"তুই কালা না নির্বোধ!" আত্রেয়ী দাঁতে দাঁত পিষে বলল, "এতক্ষণ ধরে একটাই কথা বলে চলেছি, অনিন্দিতা বলে কোনও মেয়েকে তুই চিনিস কিনা!"

"হ্যাঁ চিনি!" আহির সরাসরি উত্তর দিল, "হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?"

"সেই মেয়েটার সঙ্গে তোর মার্চ মাসে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে?"

এবার 'হ্যাঁ' বলতে গিয়ে হোঁচট খেল আহির। তার বদলে ও বলল, "আপাতত।"

"আপাতত! আপাতত বলতে কী বোঝাতে চাইছিস?" আত্রেয়ী এবার গলা তুলল।

আহির কফির কাপে চুমুক দিল। একেই বোধ হয় বলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। বছর ছয়েক আগে গড়িয়াহাটের কফিশপের এভাবেই আহির চেপে ধরেছিল আত্রেয়ীকে। আচমকা। আত্রেয়ী ভাবেনি, এমন কোনও কারণে আহির হুট করে ওকে ডেকে থাকতে পারে। সেদিন আত্রেয়ী স্পষ্ট করে দিয়েছিল নিজের অবস্থান। ওদের সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছিল। এত বছর বাদে মুসৌরিতে এসে তেমন ঘটনাই ঘটল। গতকাল বিকেলে আত্রেয়ী রেগে ফিরে গিয়েছিল হোটেলে। আহির তারপর এলোমেলো ঘুরে হোটেলের রুমে ফিরেছিল। সঞ্জয় তখনও হোটেলে আসেনি। কিংবা হয়তো এসে আবার বেরিয়েছিল। আহির একা-একা বসে চা খেতে-খেতে দূরের দুন উপত্যাকার দিকে চেয়েছিল। অনিন্দিতার কথা ওর মাথায় ঘুরছিল। অনিন্দিতার গর্ভে ওর সন্তান এসেছে। কী করবে এখন আহির? এই পরিস্থিতিতে অনিন্দিতা যদি জানতে পারে, আত্রেয়ীর সঙ্গে ও ঘুরে বেড়াচ্ছে মুসৌরিতে, তার ফল তো হবে ভয়ঙ্কর। সঞ্জয় কোথায় গেল তা নিয়ে আহির চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। কারণ, সঞ্জয় যদি কোনওভাবে অনিন্দিতার নম্বর জোগাড় করে ওকে সব জানিয়ে বসে, তা হলে যে কী হবে ভাবতেই আহির ঘেমে উঠছিল।

কিন্তু আহির একবারও ভাবেনি অনিন্দিতার কথা কোনওভাবে আত্রেয়ীর কাছে পৌঁছবে। আজ সকালে যখন আত্রেয়ী দেখা করার কথা বলেছিল, আহির ভেবেছিল দীপঙ্করকে নিয়েই কথা হবে। এই কফিশপটা বেশ পুরনো। হয়তো ব্রিটিশ আমলের। ওরা ছাড়া এখন এখানে অন্য কোনও কাস্টমার নেইও। আহির ঢুকে দেখল আত্রেয়ী আগেই চলে এসেছে। আহির আসতে আত্রেয়ী কফির অর্ডার দিল। কফি আসার পর দু' চুমুক দিয়েই ওই প্রশ্ন। অনিন্দিতাকে নিয়ে।

আহির ভেবে পাচ্ছিল না, অনিন্দিতার কথা আত্রেয়ীকে কে বলল! সঞ্জয় কি দেবযানী মারফত কিছু জানিয়েছে? সম্ভবতই তাই-ই হবে। আহির ভেবেছিল, সঞ্জয় ফোন করবে অনিন্দিতাকে। কিন্তু অনিন্দিতার নম্বর জোগাড় করা শক্ত। তাই সঞ্জয় একেবারে সহজ চালটাই দিয়েছে। এবং মানতে হবে, সঞ্জয় মোক্ষম চালই দিয়েছে। ঠিকমতো সামলাতে না পারলে আহির কিস্তিমাত হয়ে যাবে। এখন এই রেস্তরাঁয় আত্রেয়ীর মুখোমুখি বসে আহির উপলব্ধি করল, সঞ্জয়কে একটু বেশিই বোকা ঠাওরে নিয়েছিল ও। সেই সঙ্গে ও নিজের কাছে এটাও কবুল করল, সঞ্জয়কে সামনে রেখে যে পরিকল্পনা সাজিয়েছিল, সেটাও ভুল ছিল।

"তুই কি বুঝতে পারছিস না যে, তুই ধরা পড়ে গিয়েছিস?" আত্রেয়ী শান্ত গলায় বলল।

"ধরা পড়া মানে!"

"আহির, আর লুকিয়ে লাভ নেই," আত্রেয়ী একইভাবে বলল, "একদিন এই পরিস্থিতিতে আমি তোকে সত্যি কথা বলেছিলাম। আমি আশা করব আজ তুইও তাই করবি।"

আহির স্থিরভাবে তাকাল আত্রেয়ীর দিকে। বলল, "আমি কি জানতে পারি তোকে এই খবর কে দিয়েছে?"

"জানতে চাইতেই পারিস। আগে হলে আমিও বলতাম নামটা। কিন্তু এখন বলব না। কারণ, তুই আমাদের সম্পর্কের মাঝখানে স্বচ্ছতা রাখিসনি," আত্রেয়ী ঘাড়টা সামান্য পিছন দিতে হেলিয়ে বলল।

"তোর আর দীপঙ্করের কি ডিভোর্স হয়েছে?" আহির পালটা চাল দিল, "কাল এই প্রশ্নের জবাবও তুই স্বচ্ছভাবে দিসনি।"

"তা হলে তো হয়েই গেল। আমি নাম জানাতে বাধ্য নই। তুই যদি মনে করিস, আমাদের মধ্যে একদিন ভালবাসা ছিল। সেই ভালবাসার রেশ এখনও কিছুটা হলেও দু'জনের মধ্যে রয়ে গিয়েছে। তা হলে উত্তর দে। না হলে আজ সন্ধে থেকে তুই তোর রাস্তায় চল। আমি আমার রাস্তায়। আমি এখানে বেডপার্টনার খুঁজতে আসিনি আহির। সেই কাজ কোনও জিগোলোকে দিয়েও হয়ে যায়। তোর কাছে আমি যদি এসে থাকি, সেটা ভালবাসার টানেই। যদি একটা মেয়ের ভালবাসার টান বুঝিস, তা হলে ঠিকঠাক কথা বল। না হলে ছেড়ে দে। তোর কাছে আমি কোনও কৈফিয়ত দাবি করছি না।"

আত্রেয়ী উঠে দাঁড়াল। আহির খপ করে ওর হাত ধরল। বলল, "বোস। আমি সব বলছি।"

একবার তীক্ষ্ণভাবে আহিরকে জরিপ করল আত্রেয়ী। ধীরে-ধীরে বসল নিজের চেয়ারে। তবে এবার আর কোনও প্রশ্ন করল না। স্রেফ তাকিয়ে থাকল আহিরের দিকে। আহির একটু সময় নিল। কাপের কফিটুকু তিন-চার চুমুকে গলায় ঢালল। আত্রেয়ী কোনও তাড়া দিল না। শুধু অপেক্ষা করতে লাগল। ও বোধ হয় টের পেয়েছিল, আহিরকে এই পরিসরটুকু দেওয়া প্রয়োজন। না হলে ও কিছু বলতে পারবে না।

কফি খাওয়া শেষ করে আহির কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। মাথা নিচু করে কাপটা হালকা নাড়াচাড়া করল। বলল, "অনিন্দিতার সঙ্গে আমার অ্যাফেয়ার কয়েক বছরের। তুই ছেড়ে যাওয়ার পর আমি কিছুটা হলেও ওকে ধরে উঠে দাঁড়িয়েছি। তবে তোকে যেভাবে ভালবেসেছিলাম, সেভাবে কোনওদিন অনিন্দিতাকে ভালবাসতে পারিনি। তুই তো বুঝতেই পারিস, একটা বয়সের পর কোনও সম্পর্ক আর ছেলেখেলার থাকে না। এটা কোনও কলেজ জীবনের প্রেম নয় যে, কিছুদিন পর হাত ছেড়ে দেব। অতএব ও বাড়িতে জানিয়েছে। আমিও আমার বাড়িতে জানিয়েছি। এবার ঠিক হয়েছে আগামী মার্চে আমাদের বিয়ে হবে। এদিকে এখানে ঘুরতে এসে হঠাৎ তোর সঙ্গে দেখা হল। সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল।"

আহির প্রায় সবই বলল। শুধু ইচ্ছে করেই অনিন্দিতার গর্ভবতী হওয়ার খবরটা চেপে গেল। কেন যেন ওর মনে হল ওই কথাটা এই পরিস্থিতিতে বলা ঠিক হবে না।

আত্রেয়ী এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবার বলল, "আমি যেদিন ল্যান্ডৌরে তোকে সব কথা বললাম, সেদিন অনিন্দিতার কথা বললি না কেন?"

"ভয়ে," বলল আহির, "আমি চিরদিন তোকেই ভালবেসে এসেছি। এত বছর বাদে তোকে পেয়ে, কিছুতেই তোকে হারাতে চাইনি।"

"এতে হারানোর কী আছে!"

"কী আছে মানে! যদি তুই অনিন্দিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জেনে আমার কাছ থেকে আবার সরে যাস!"

আত্রেয়ী হাসল। বলল, "তুই ঠিক আগের মতোই রয়ে গিয়েছিস আহির। কিচ্ছু পালটাসনি। সেদিন এই জন্যই তোর-আমার মাঝখানে দীপঙ্কর এসেছিল। তুই ভাবলি, আমায় যদি অনিন্দিতার কথা না জানাস, তা হলেই আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কিন্তু এটা ভাবলি না সেই সম্পর্কের পরিণতি কী হতে পারে! এখন আমি তোর কী হব আহির? গ্লোরিফায়েড কেপ্ট! এটা কি

বাজিরাও-মস্তানীর গল্প?"

"আমি তোর সঙ্গে সেটল করতে চাইছি," আহির বলল, "এই সোজা কথাটা কেন বুঝতে পারছিস না!"

"কিন্তু কীভাবে আমার সঙ্গে সেটল করবি? অনিন্দিতা জানে এখানে এসে তোর আমার দেখা হওয়ার ব্যাপারে? বাই দ্য ওয়ে, তোর পাস্ট অ্যাফেয়ার সম্পর্কেই বা অনিন্দিতা কতটুকু জানে?"

"কিছুই প্রায় জানে না। একবার গোড়ার দিকে বলেছিলাম, কলেজে আমার একটা প্রেম ছিল। সেটা তেমন কিছু নয়। কলেজ ছাড়ার পর সেই মেয়েটার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তোর নামও জানে না অনিন্দিতা।"

"আহির, সরি টু সে, তুই কিন্তু আসলে সবাইকে ঠকাতে চাইছিস। সবচেয়ে বেশি ঠকাচ্ছিস নিজেকে।"

"আমি কাউকে ঠকাতে চাইছি না। শুধু চাইছি নিজের মতো বাঁচতে। আমি কী করে জানব এত বছর বাদে ফের তোর সঙ্গে দেখা হবে?" আহির এবার উত্তেজিত হয়ে বলল।

"রাবিশ! এই সব ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট যুগের বাংলা ছবির ডায়লগ দিস না। তুই একই সঙ্গে অনিন্দিতার সঙ্গে রিলেশন রেখেছিস, আবার আমার সঙ্গে ঘুরছিস। দু' নৌকোয় পা দিয়ে জীবন চলে না। অনিন্দিতা কী বলবে জানি না। আমি বলব, তুই আমায় জেনেবুঝে ঠকিয়েছিস..."

"সে তো তুইও একদিন তাই করেছিলি!" আহির আঙুল তুলে বলল, "এখন সাধু সাজছিস!"

"বাহ, তার মানে সেদিনের প্রতিশোধ নিলি! তাই তো? হ্যাঁ, এটা নেওয়ার অধিকার অবশ্য তোর আছে।"

"আমি কোনও প্রতিশোধ নিইনি আত্রেয়ী। সেটা তুই ভাল করেই জানিস। আমি সেদিনও সবচেয়ে বেশি তোকে ভালবাসতাম। আজও তাই বাসি। সেই জন্যই..."

"কথাটা কি ভেবে বলছিস? নাকি ভয়ে বলছিস?"

"ভেবেই বলছি।"

"গুড," আত্রেয়ী বলল, "এবার আমার প্রতি ভালবাসার জন্য একটা কাজ কর। তোর মোবাইল ফোন বের কর। তারপর আমায় যা-যা বললি সেটা অনিন্দিতাকে বল।"

থমকে গেল আহির। এই প্রবল ঠান্ডাতেও ওর কপাল ভিজে উঠল।

আত্রেয়ীর হাসি আরও প্রশস্ত হল। ও বলল, "কী রে! মোবাইল বের করে বল অনিন্দিতাকে! দেখি তোর এলেম। যদি না বলিস, তা হলে কিন্তু আমি যা স্টেপ নেওয়ার নেব। তুমি গাছেরও খাবে, তলার কুড়োবে এটা চলতে পারে না। যদি আমায় ভালবাসিস, সেই ভালবাসার কথা সবাইকে জানিয়ে দে। আমিও তাই দেব। চল ফোনটা কর।"

আহির অনুভব করছিল আত্রেয়ী ক্রমশ ওকে খাদের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

আত্রেয়ী এবার আহিরে হাতের উপর হাত রাখল। আত্রেয়ীর ঠান্ডা হাতের স্পর্শে আহিরের শরীর শিরশির করে উঠল। আত্রেয়ী চাপা গলায় বলল, "ফোনটা কর আহির। সেদিন তোকে চুমু খাওয়ার পর থেকে আমার কেবলই পুরনোদিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। সেই মনে আছে, মা অফিসে থাকত। আমি আর তুই কলেজ কেটে চুপি-চুপি... তুই চাইলেই আমরা আবার সেই দিনগুলো ফিরে পাব। তুই ফোনটা কর..."

আহির আর থাকতে পারল না। কলেজ জীবনে আত্রেয়ীর সঙ্গে কাটানো ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলো ওর চোখে ভেসে উঠল। আহির ফোন করল অনিন্দিতাকে। ওর ভিতরে অদ্ভুত ছটফটানি।

ফোনটা বাজতে না-বাজতেই অনিন্দিতা ধরল। বলল, "একেই বলে টেলিপ্যাথি। যদিদং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম... আমিই তোমায় ফোন করতে যাচ্ছিলাম। তুমি কবে ফিরছ?"

আত্রেয়ীর দিকে একবার তাকাল আহির। আত্রেয়ী আঙুল দিলে আলতো সুড়সুড়ি দিল আহিরের হাতের চেটোয়। আহির নির্লিপ্ত গলায় অনিন্দিতাকে বলল, "কেন?"

"তুমি নেই... মোবাইলেও তোমায় সব সময় পাওয়া যাচ্ছে না... আমি না, বাড়িতে প্রেগন্যান্সির খবরটা জানিয়ে দিয়েছি!"

টেবিলের উপর গোখরো সাপ দেখলেও বোধ হয় আহির এতটা চমকাত না, অনিন্দিতার কথায় যতটা চমকাল। আত্রেয়ীর হাতকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে ও বলল, "মানে!"

"হ্যাঁ, আজ দুপুরে মাকে সব জানিয়ে দিয়েছি। মা তো শুনে কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারেনি। কী করব বলো! যদি তোমাকে ফোনে পেতাম তা হলেও না হয়..."

অনিন্দিতা অনর্গল বলে চলেছে। আহির পাথর হয়ে বসে সব শুনছে। কোনও কথা বলতে পারছে না। আত্রেয়ী তীব্র চোখে আহিরের পরিবর্তন দেখতে থাকল। আহিরের সেদিকে হুঁশ নেই।

ওপাশে অনিন্দিতা কথা বলেই যাচ্ছিল। আহির এবার শুনতে পেল অনিন্দিতার পিছন থেকে ওর মায়ের গলা ভেসে আসছে, "কে আহির? পেলি আহিরকে? দে, আমি একবার ওর সঙ্গে কথা বলব!"

॥ ১৮ ॥

"তোমার আবার কী দরকার?"

আহির ঝাঁঝিয়ে ওঠায় সঞ্জয় একবার ফিরে তাকাল ওর দিকে। সঞ্জয়ের চাউনি দেখে আহির নিজেকে সামলে নিল। হোটেলের ঘরে এখনও দু'জন পাশাপাশি থাকছে। যদিও সঞ্জয় এড়িয়ে চলছে আহিরকে। কথা বলছে না। আহিরও যতটা পারছে সঞ্জয়কে সমঝে চলছে। কিন্তু এই ফোনটা আসার পর ও নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারল না।

কিন্তু আহিরের অমন ঝাঁঝালো গলা শুনে ওপারের মানুষটার তেমন হেলদোল হল না। দীপঙ্কর নির্বিকারভাবে বলল, "এবার আর বুদ্ধ মন্দিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, তুমি শর্ত ভেঙে আত্রেয়ীকে আমার খবর দিয়ে দিয়েছ। অতএব এবার তোমার হোটেলের নীচের রেস্তরাঁতেও বসা যায়। কিংবা হোটেলের উলটো দিকের জুসের দোকানের সামনে। কোথায় যাব বলো!"

"আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছি না।"

"কিন্তু সেটাই এখন তোমার সবার আগে চাওয়া উচিত আহির," দীপঙ্কর হেসে বলল, "না হলে তুমি ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছ, সেটা ধরতে পারবে না!"

"কোথায় দাঁড়িয়ে আছি মানে?" আহির ফের গলা তুলল। আর চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল সঞ্জয় রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আহির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, "দীপঙ্কর, আমি আর আত্রেয়ীর সঙ্গে থাকছি না। তুমি এবার তোমার বউকে সামলাও। আমাকে আবার বিরক্ত করছ কেন?"

"বাহ রে, তুমি আমার বউকে নিয়ে ফার্স্ট ইনিংসে খেললে। ঝোপে নিয়ে গিয়ে চুমু খেলে। না জানি আরও কী-কী খেয়েছ! এবার আমি যেই ব্যাটিং করতে নেমেছি অমনি আব্বুলিশ দিচ্ছ! তোমার কোনও স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নেই?"

আহির বুঝতে পারল, দীপঙ্করের হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি নেই। তাই ও সরাসরি প্রশ্ন করল, "তুমি ঠিক কী চাইছ, বলবে?"

"নিশ্চয়ই বলব। সেই জন্যই তো দেখা করতে চাইছি। আমি কি এখন আসব?"

"এসো।"

"তোমার হোটেলে?"

"না, জুসের দোকানের সামনে। দশ মিনিট বাদে।"

"ডান। আমি পৌঁছে যাচ্ছি।"

ফোনের লাইন কেটে মোবাইলটা ছুড়ে বিছানায় ফেলল আহির। কাল সন্ধেবেলা এক ঝামেলা পাকাল। সেটা সামলে ওঠার আগে দীপঙ্কর আর-এক ঝামেলা এনে হাজির করছে। কাল অনিন্দিতার ফোনের মাঝখানেই আত্রেয়ী উঠে চলে যায়। কোনও কথা বলেনি। আহির ফোনে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে, উঠে গিয়ে আত্রেয়ীকে আটকাতে পারেনি। তারপর থেকে আত্রেয়ী আর কোনও যোগাযোগ করেনি ওর সঙ্গে। আহির জানে আত্রেয়ী কোনওদিন যোগাযোগ করবেও না। মেয়েটাকে ও খুব ভাল করে চেনে। আহির চাইলে ফোন করতে পারত। কিন্তু ও ইচ্ছে করেই করেনি। এই পরিস্থিতিতে আত্রেয়ী কিছুতেই ওর ফোন ধরবে না।

সেই রেস্তরাঁ থেকে ফিরে স্বস্তি পাচ্ছে না আহির। একদিকে মনে পড়ছে অনিন্দিতার মায়ের কথাগুলো। ভদ্রমহিলা চিন্তিত গলায় বলেছেন, "আহির, এবার কী হবে বলো তো! তোমরা এমন কাণ্ড করবে আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তুমি একবার তোমার বাড়িতে ব্যাপারটা জানাও। তেমন হলে বিয়ের তারিখ এগিয়ে আনতে হবে। কারণ, যে আসছে তার আসা আটকানো উচিত হবে না। সেটা পাপ হবে। তুমি ফিরে এসো তাড়াতাড়ি। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এটা এমার্জেন্সি সিচুয়েশন।"

আহির কোনও জবাব দিতে পারেনি। 'হুঁ, হাঁ' করে কাজ চালিয়েছে।

ওদিকে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে আহিরের মনে পড়তে লাগল আত্রেয়ীকে।

এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে আত্রেয়ী বেরিয়ে গেল। যদি আত্রেয়ী জানত যে অনিন্দিতা গর্ভবতী তা হলে কি ওইভাবে ভুল বুঝে চলে যেত?

হোটেলের ফিরে রাতে কিছু খেতে পারল না আহির। রাতে ঘুমও হল ছেঁড়া-ছেঁড়া। আত্রেয়ী আর অনিন্দিতার গর্ভে আসা ওর সন্তানের টানাপোড়েনে অস্থির হয়ে উঠেছিল আহির। আত্রেয়ীকে ভোলা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। সেটা এতদিনে বুঝে গিয়েছে আহির। আরও বুঝে গিয়েছে, আগের বারের মতো এবারও আত্রেয়ী ওর কাছে ধরা দিয়েও দিল না।

আত্রেয়ী এবার কার হবে? দীপঙ্করের? কী বলতে আসছে দীপঙ্কর? ফোনে যে ইঙ্গিত ও দিল সেটা বিশেষ সুবিধের নয়। যদি আত্রেয়ী গিয়ে দীপঙ্করের কাছেই উঠত তা হলে কি ওই নোংরা কথাগুলো দীপঙ্কর বলতে পারত? ওদিকে আজ সকালে অনিন্দিতা আবার ফোন করেছিল। এবার ও চাপ বাড়াচ্ছে। বলছে, 'কবে ফিরছ।' আহিরেরও আর মুসৌরি ভাল লাগছিল না। ঘোরাঘুরি ঢের হয়েছে। এখন আর ঘোরার কিছু বাকি নেই। ইচ্ছেও নেই। এবার ফেরা যেতেই পারে। বরং আগে ফিরে গেলেই ভাল। এখানে যত থাকবে তত ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে। আত্রেয়ী, দীপঙ্কর মায় সঞ্জয়ের কাছ থেকে দূরে থাকলে আহির অনেক ভাল থাকবে।

এই সব ভাবতে-ভাবতেই দশ মিনিট বাদে আহির হোটেল থেকে বেরিয়ে উলটো দিকের ফলের রসের দোকানের সামনে এল। দোকানটা সদ্য খুলেছে। আহিরকে দেখে দোকানদার উৎসুক হয়ে তাকাল। আহির একটা কমলালেবুর জুস দিতে বলল। জুসের মাগ হাতে নিয়ে ও চুমুক দেবে, দীপঙ্কর এসে হাজির। আহির আর-এক মাগ কমলালেবুর জুসের জন্য হাঁক দিল।

দীপঙ্কর এসে হাত বাড়াল। বলল, "কনগ্র্যাচুলেশনস!"

আহির ভুরু কুঁচকে বলল, "কীসের জন্য?"

"বাহ্, সামনে তোমার বিয়ে অনিন্দিতার সঙ্গে। তার আগাম শুভেচ্ছা।"

আহির ধাক্কা খেল জোর। কিন্তু সেটা বুঝতে না দিয়ে বলল, "এই কথা বলার জন্য টেনে এনেছ এখানে?"

দোকানদার ছেলেটা দ্বিতীয় জুসের মাগ ধরিয়ে দিয়ে গেল দীপঙ্করের হাতে। সেই মাগে লম্বা চুমুক দিয়ে ও বলল, "আরে না রে ভাই! এই খবরটা আগের দিন পাইনি, তাই কনগ্র্যাচুলেট করতে পারিনি। তাই আজ করলাম। এটা কোনও খবর নাকি!"

"তা হলে কোনটা খবর? আমি তো সরে গিয়েছি তোমার কথামতো!"

"আমার কথামতো সরোনি। সরেছ কারণ বুঝেছ বিপদ আছে। দুটো এক নয়। তুমি আমার কথামতো সরলে কি আমার খবর আত্রেয়ীকে দিতে?"

"কিন্তু তোমার কাজ তো হয়ে গিয়েছে!"

"আমার কাজ? আমার কোন কাজ? বরং আমার কাজ তো তুমি ঘেঁটে দিয়েছ।"

"কীভাবে?"

"তুমি যদি মুসৌরিতে এসে নিউটনের আপেলের মতো আত্রেয়ীর সামনে না খসে পড়তে, এতক্ষণে আমি নিজের বউকে বাড়ি নিয়ে চলে যেতাম। কিন্তু তুমি খসে পড়লে আর নিউটনের মতো আত্রেয়ীও নতুন দিশা আবিষ্কার করে ফেলল। আমার পুরো প্ল্যান চৌপাট। এখন আমি জানি আত্রেয়ী আর আগের আত্রেয়ী নেই। যা ভেবে এসেছিলাম, তা আর হবে না।"

"এই তো আগের দিন বললে, আমি নাকি কোনও ফ্যাক্টর ছিলাম না তোমাদের সম্পর্কে..."

"ছিলে না তো। কিন্তু এখন তো তুমি ভাল দাবার ঘুঁটি হয়েছ। সেই ঘুঁটির সাহায্যে আত্রেয়ী আমায় কিস্তি দিতে চাইছে। এটা আমি অ্যালাও করব না।"

"তুমি এগজ্যাক্টলি কী চাইছ দীপঙ্কর?" আহির ক্লান্ত গলায় বলল।

দীপঙ্কর হাসল। বলল, "বলছি। তার আগে কয়েকটা জিনিস তোমার দেখা দরকার। তা হলে বিষয়টা আরও ভাল করে বুঝবে।"

দীপঙ্কর পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল। তারপর গ্যালারিতে গিয়ে পরপর কয়েকটা ছবি দেখাল আহিরকে। বিস্ফারিত চোখে আহির দেখল ল্যান্ডৌরে ওদের হাতে হাত ধরা ছবি, কোম্পানি গার্ডেনে ওই ভূতের ঘর থেকে বেরিয়ে আত্রেয়ীর ওকে আঁকড়ে ধরার ছবি, এমনকী আত্রেয়ী আর ওর চুমু খাওয়ার ছবি।

ছবিগুলো দেখিয়ে দীপঙ্কর বলল, "কোম্পানি গার্ডেনের ভিডিয়োও আছে। দেখবে?"

আহির কোনও কথা বলতে পারল না।

দীপঙ্কর বলল, "অনিন্দিতার বাড়ির ঠিকানা আমি জোগাড় করেছি। মোবাইল নম্বরও। এবার যদি এগুলো তোমার শ্বশুরবাড়িতে পাঠাই কেমন হবে বলো তো ব্যাপারটা!"

আহির কোনও কথা বলতে পারল না। দীপঙ্কর মিটিমিটি হেসেই চলল। আহিরের মনে হল, ও একটা জটিল জালে না বুঝেই জড়িয়ে গিয়েছে।

কোনওমতে ফ্যাসফেসে গলায় ও বলল, "এটা আমার শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে তোমার লাভ?"

"আমার লাভ? প্রতিশোধ। তুমি আমার বউকে নিয়ে ফূর্তি মারবে আর আমি দীপঙ্কর দাশগুপ্ত সেটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখব? ভাবো তো যদি হুট করে অনিন্দিতার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ওই চুমু খাওয়ার ছবি কিংবা ভিডিয়ো চলে যায়! তখন কী অবস্থা হবে মেয়েটার? আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের কাছে ওর মান থাকবে? আর এমন সিচুয়েশনে ওদের পরিবার তোমায় ছেড়ে দেবে?"

আহির ঢোক গিলল।

দীপঙ্কর আবার হাসল। বলল, "তবে তোমার কথার পিছনেও যুক্তি আছে। তুমি একটা অ্যাক্সিডেন্টাল স্কেপগোট। তোমায় বলি দিয়ে বড় কোনও লাভ নেই। নেহাতই নিজের নাক কেটে তোমার যাত্রাভঙ্গ করা হয়ে যাবে। সত্যি বলতে তাতে আমার মন সায়ও দিচ্ছে না। আমার টার্গেট তুমি নও, আত্রেয়ী। আত্রেয়ী তোমাকে সামনে এনে আমায় টাইট দিতে চেয়েছে। এবার আমি তোমাকে দিয়েই আত্রেয়ীকে টাইট দেব।"

"কীভাবে?"

"সেটা বলব বলেই তো তোমায় ডেকেছি। এ কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না। শোনো বস, তোমার প্রতি আমার কোনও রাগ নেই। তবে আত্রেয়ীকে আমি ছাড়ব না। তুমি আমার কাজ করে দাও। আমি এই সব ছবি, ভিডিয়ো তোমার সামনে ডিলিট করে দেব।"

"কাজটা কী?"

"খুব সোজা। তুমি আত্রেয়ীর সঙ্গে এই প্রেম-প্রেম কেসটা চালিয়ে যাও। ওকে বোঝাও ডিভোর্সের সময় যেন অ্যালিমনি ক্লেম না করে। বাকিটা আমি আত্রেয়ীর সঙ্গে বুঝে নেব।"

আহিরের মনে হচ্ছিল লোকটাকে খুন করে ফেলে। কিন্তু এখন রাগ করা যাবে না। দীপঙ্করের সঙ্গে লড়তে হলে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

আহির বলল, "তুমি কি আত্রেয়ীকে এত বোকা পেয়েছ? আমি বোঝাব। আর ও বুঝে যাবে?"

"আরে দূর, তুমি বোঝাবে যে তুমি ওকে বিয়ে করতে চাইছ। ও যেন দ্রুত মিউচুয়াল ডিভোর্স দিয়ে দেয়। টাকাপয়সা নিয়ে দরাদরি না করে। তুমি বোঝালে ও বুঝবে। কারণ, আত্রেয়ীর এখন টার্গেট তোমাকে ধরা। আর আমার টার্গেট, আত্রেয়ী যে রাস্তা দিয়ে আমায় জব্দ করতে চেয়েছিল, সেই রাস্তা দিয়ে আমি ওকে জব্দ করব। কাজ মিটে গেলে আত্রেয়ীকে ফুটিয়ে দিয়ো। তখন অনিন্দিতার সঙ্গে বিয়ে করো। হনিমুনে যাও। আত্রেয়ীকে তখন পাত্তা না দিলেও চলবে। এবার বলো, রাজি?"

আহির কী বলবে ভেবে পেল না। শেষে ও বলল, "আমাকে একটু ভাবার সময় দাও।"

"আমি চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। তার মধ্যে আমায় জানাবে। না হলে আমি কোম্পানি গার্ডেনের ভিডিয়ো অন্য নম্বর থেকে অনিন্দিতার মোবাইলে পাঠিয়ে দেব। তখন কিন্তু আমায় দোষ দিয়ো না।"

ঢক ঢক করে কমলালেবুর রসটুকু গলায় ঢেলে দীপঙ্কর হনহন করে চলে গেল। আহির দাঁড়িয়ে থাকল। কমলালেবুর রসও এখন ওর বিস্বাদ লাগছে। তাই রসের মাগটা রেখে ও দুটো জুসের দাম দিল।

কী করা যায় চিন্তা করতে-করতে আহিরের ফের মনে হল, একমাত্র সঞ্জয়ই পারে এই বিপদ থেকে ওকে উদ্ধার করতে। হোটেলে ফিরে এল আহির। দেখল সঞ্জয়ও ফিরেছে।

আহির বলল, "তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।"

"কিন্তু আমার তোর সঙ্গে কোনও কথা নেই," সঞ্জয় সপাটে উত্তর দিল।

"তোর একটু হেল্প লাগত!"

"হেল্প? তোকে?" সঞ্জয় হাসল, "এবার কী ধান্দা!" আহির বুঝতে পারল সঞ্জয় কিছুই করবে না। উপরন্তু গতবারের মতো হয়তো আত্রেয়ীর কানে ভুলভাল খবর তুলে দেবে। ও তাই আর কথা বাড়াল না।

কিন্তু দীপঙ্কর যা প্রস্তাব দিয়েছে তার কী হবে? আহির ঠিক করল সরাসরি আত্রেয়ীকেই সব বলবে। পারলে একমাত্র আত্রেয়ীই পারবে ওকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে।

॥ ১৯ ॥

দূর থেকে আত্রেয়ীকে দেখতে পেল আহির। স্কিন টাইট জিনস। লাল

সোয়েটার। গলায় মাফলার। পায়ে স্নিকার। আত্রেয়ী দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে আসছে। আহির বসে আছে সেই রেস্তরাঁয় যে রেস্তরাঁয় দেবযানীর সঙ্গে সঞ্জয়ের আলাপ করানো হয়েছিল। আহিরের ডান পাশে খাদ। বাঁ পাশে আত্রেয়ী। বাঁ পাশের দিকের সিঁড়ি দিয়ে আত্রেয়ী নেমে এসেছে। এবার কয়েকটা চেয়ার-টেবিল পেরিয়ে ওর সামনে আসবে।

আত্রেয়ীর সেই হেঁটে আসার ভঙ্গি দেখতে-দেখতে আহির নিজের কাছে কবুল করল, এখনও ওর কাছে নারী মানেই আত্রেয়ী। এই ঘোর কিংবা ভালবাসা বোধ হয় কোনওদিনই কাটবার নয়। প্রথম প্রেম বলেই কি এত টান? নাকি আত্রেয়ীর চোরাটান আজও প্রবল? এই প্রশ্নের উত্তর নেই আহিরের কাছে। তবে আহির জানে, আত্রেয়ী ডাকলে আজও ও সাড়া না দিয়ে পারবে না। আজও আত্রেয়ী পাশে এসে বসলে ওর মনের ভিতর কী জানি সব হতে থাকে। তখন নিজেকে একটু পাগল-পাগলই লাগে। কোম্পানি গার্ডেনে আত্রেয়ীর সেই চুমু যেমন পালটে দিয়েছে আহিরের জীবনের গতিপথ। আহির আর আগের আহির নেই। যদিও ও নিজেকে বুঝিয়েছে, এটা অনুচিত কাজ। ওদিকে ওর সন্তান অনিন্দিতার গর্ভে প্রতিদিন একটু-একটু করে বাড়ছে। আহিরের উচিত সেদিকে মনোযোগ দেওয়া। সেটা না দিয়ে আহির কিনা এখনও আত্রেয়ীর প্রতিই অনুরক্ত হয়ে বসে আছে!

তাও আবার কোন আত্রেয়ী? এই আত্রেয়ীকে আজ রেস্তরাঁয় ডাকতে আহিরকে অন্তত কুড়িবার ফোন করতে হয়েছে। প্রথম আঠেরোবার তো আত্রেয়ী ফোনই ধরেনি। তারপর যখন ধরল, তখন আহির দেখা করার প্রস্তাব দিতেই লাইন কেটে দিয়েছিল। এর পর আহির ফোনেই খানিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেছে। তাতে অবশ্য দীপঙ্করের মূল পরিকল্পনার কথা কিছু বলেনি। তবে এটা বুঝিয়েছে দীপঙ্কর এক ভয়ঙ্কর ছক কষেছে। দু'জনে যদি আজ এখানে মুখোমুখি না বসে তা হলে আহিরের চেয়ে আত্রেয়ীর বিপদ বেশি। অতঃপর আত্রেয়ী রাজি হয়েছে দেখা করতে। তবে আগেই জানিয়ে দিয়েছে, ভুলভাল দিকে যদি আলোচনা গড়ায় তা হলে ও উঠে চলে যাবে।

আত্রেয়ী এসে আহিরের উলটো দিকের চেয়ার টেনে বসল। একবার ঘড়ি দেখল। বলল, "বল, কী ব্যাপার?"

"তার আগে বল, কী খাবি?"

"আমি কিছুই খাব না।"

"আরে, এখানে কিছু না নিলে বসতে দেবে কেন?"

"সে তো জানি না। তুই-ই বা এখানে বসার প্ল্যান করলি কেন? আমরা তো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েও কথা সেরে ফেলতে পারতাম।"

আহির সেই কথা সরাসরি জবাব দিল না। যে লোকটা অর্ডার নিচ্ছিল, তাকে একটা কফি আনতে বলল। এবার আত্রেয়ীর দিকে ফিরে ও জানতে চাইল, "দীপঙ্কর কি তোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে?"

"তুই কিন্তু আমার পার্সোনাল ব্যাপারে নাক গলাচ্ছিস। এক সময় তোর সঙ্গে আমার একটা রিলেশন ছিল। তারপর এখানে এসে কিছুদিন আমাদের মধ্যে পুরনো ইনফ্যাচুয়েশন জেগে উঠেছিল। সেই সব চুকেবুকে গিয়েছে। এবার তুই তোর রাস্তায়। আমি আমার রাস্তায়। হঠাৎ এভাবে ডেকে পাঠিয়ে এই ধরনের প্রশ্ন করার মানে কী!"

"মানে আছে তাই ডেকেছি," এবার আহির শক্ত হওয়ার চেষ্টা করল, "তুই যেভাবে ব্যাখ্যা করলি ব্যাপারটা যদি তাই-ই হত, তা হলে তোর-আমার মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন হয়নি। আর সেটা হয়নি দীপঙ্করের জন্যই।"

"তা হলে তুই সেটা দীপঙ্করের সঙ্গেই মিটিয়ে নে। আমায় ডেকেছিস কেন?"

দু'জনের এই কথার ফাঁকে কফি এল। সেই কফির কাপে প্যাকেট খুলে চিনি ঢালতে-ঢালতে আহির বলল, "দ্যাখ আত্রেয়ী, আমি মুসৌরিতে এসে তোকে দেখে নিজে সামলাতে পারিনি। কারণ, তুই আমার প্রথম ভালবাসা..."

"আমরা এই ধরনের ন্যাকা কথা বলার বয়স পেরিয়ে এসেছি আহির! তুই ওই বোকা আবেগগুলো এডিট করে যা বলার বল।"

আহির একবার থমকাল। আত্রেয়ীকে দেখল। আত্রেয়ীর চোখ-মুখ সকালের রোদের মতো ঝকঝক করছে। সেখানে কোনও ভালবাসার মেঘ নেই। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আহির বলল, "বেশ। সোজা কথায় আসি। তোর আর দীপঙ্করের এখনও ডিভোর্স হয়নি। সেপারেশন হয়েছে। সেই সময় তোর সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক যা তোর ভাষায় ইনফ্যাচুয়েশন সেটা গড়ে উঠেছে..."

"উঠেছিল।"

"ওক্কে! উঠেছিল। কিন্তু সেই পর্বে তুই-আমি যা-যা করেছি সব তোর হাজব্যান্ড দীপঙ্কর ছবি তুলেছে, ভিডিয়ো করেছে। এখন সেটা নিয়ে ও ব্ল্যাকমেল করছে।"

"টাকা চেয়েছে?"

"টাকা?"

"হ্যাঁ, তোর কাছ থেকে আর কী চাইবে?"

"নাহ, ব্যাপারটা অত সহজ হলে তো হয়েই যেত..."

আহির কথাটা মাঝপথে থামিয়ে কফির কাপে চুমুক দিল। তাকিয়ে থাকল খাদের দিকে।

"তা হলে কী চেয়েছে? অত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে না বলে সবটা সোজাসুজি বল। আমার তাড়া আছে!"

"দীপঙ্কর থ্রেট দিয়েছে ওই সব ক্লিপিংস এবং ছবি আমার হবু স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবে।"

আত্রেয়ী ঠোঁটে এবার এক চিলতে হাসি খেলে গেল। কিন্তু ও কিছু বলল না।

আহির আবার কফি কাপে চুমুক দিল। বলল, "তুই বুঝতে পারছিস তা হলে কী হবে?"

আত্রেয়ী মাথা নাড়ল। বলল, "পারছি। কিন্তু এতে আমি কী করব? এটা তোর পার্সোন্যাল সমস্যা। তোর সামনে বিয়ে! সেটা ভুলে গিয়ে যদি মুসৌরিতে উয়োম্যানাইজ় করিস, তার খেসারত তো তোকে গুনতেই হবে।"

"তুই এভাবে কথা বলছিস কেন?"

"বলছি কারণ এটাই সত্যি। তুই যদি আমায় সব কথা গোড়ায় বলতিস, তারপর কী হত না হত সেটা আমার দায়িত্বে এসে পড়ত। পুরোটা না হলেও অনেকটা তো বটেই। কিন্তু তুই বলিসনি। তা হলে তার দায় আমি নেব কেন? আমি জানতাম তুই কোনও রিলেশনে জড়াসনি। তাই এগিয়েছি। এত দূর আসার পর আমি খবরটা পেয়েছি। তাও তোর কাছ থেকে নয়। অন্য সোর্সে। সেটা পাওয়ার পরও আমি তোর উপর ভরসা হারাইনি। তোকে সোজাসুজি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, একজনকে বেছে নিতে। তখনও আমার বিশ্বাস ছিল, তুই আমায় বাছবি। কিন্তু তুই বেছেছিস অনিন্দিতাকে। ভেরি গুড। আমার তা নিয়ে কিছু বলার নেই। আমার ভুল, আমার বোকামি। তার খেসারত আমায় গুনতে হবে। আমি কাউকে তার জন্য দায়ী করতে পারব না। কিন্তু এখন তুই যা বলছিস সেটা তোর প্রবলেম। তাতে আমি জড়াতে যাব কেন?"

"তুই না চাইলেও তুই জড়াচ্ছিস আত্রেয়ী। দীপঙ্কর আফটার অল তোর হাজব্যান্ড। এখনও। সেটা তুই মানিস আর না-মানিস। লুকোস আর না-লুকোস।"

"তো? আমাদের সেপারেশন চলছে। কালেদিনে আমি ডিভোর্স নেব। আর বাই দ্য ওয়ে, তুই তো ফোনে বলেছিলি আমার নাকি তোর চেয়ে বেশি বিপদ। এতক্ষণ ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে তুই যা বললি তাতে আমি নিজের কোনও বিপদ দেখছি না। তুই কি ওই চুমু খাওয়ার ছবিটাকে আমার বিপদ বলে ঠাওরেছিস? সরি, আমি ওতে কোনও বিপদ দেখছি না। দীপঙ্কর আর আমার চুমু খাওয়ার ঢের ছবি দীপঙ্করের কাছেই আছে। তবে ডেফিনেটলি, দীপঙ্কর যদি ওই ছবি অনিন্দিতাকে পাঠায় তা হলে তোর কপালে দুঃখ আছে। হয়তো বিয়ে ক্যানসেল হয়ে যাবে।"

"আমি তা বলছি না।"

"তা হলে কী জন্য আমায় ডেকেছিস? দীপঙ্করকে রিকোয়েস্ট করার জন্য যাতে তোর-আমার ওই ছবি অনিন্দিতাকে না পাঠায়? সেটাও আমি পারব না। দীপঙ্কর একটা ফার্স্টক্লাস হারামজাদা। তুই ওকে পুরোপুরি চিনিস না। আমি চিনি।"

"না," আহির ইতস্তত করে বলল, "তুই যা ভাবছিস তা নয়। দীপঙ্কর আমাকে একটা অন্য প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাব মানে কাজ। সেই কাজ করে দিতে পারলে ও আর আমাদের ওই ছবি পাঠাবে না অনিন্দিতার কাছে।"

"কী সেই প্রস্তাব?" আত্রেয়ী বিরক্ত গলায় বলল।

আহির নিজেকে গুছিয়ে নিল। চারপাশ দেখল। দীপঙ্কর কোথাও লুকিয়ে ওদের কথা শুনছে না তো? কিন্তু কোথাওই দীপঙ্করকে দেখা গেল না। যদি দূরে কোথাও ঘাপটি মেরে থাকেও তা হলে ওদের কথা কানে যাবে না।

আহির এবার বলল, "দীপঙ্কর আমাকে বলেছে তোর সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলতে..."

এইটুকু শুনেই আত্রেয়ীর চোখ-মুখ পালটে গেল। এতক্ষণ টেবিলের উপর ঝুঁকে ও কথা বলছিল। এবার সোজা হয়ে বসল।

"তারপর তোকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে। এবং বোঝাতে যে কোনও

অ্যালিমনি না নিয়ে তুই যেন দীপঙ্করকে ডিভোর্স দিয়ে দিস। তারপর কাজ মিটে গেলে আমি তোকে ফুটিয়ে দেব। তার বদলে আমাদের চুমুর ছবি এবং ভিডিয়ো দীপঙ্কর নষ্ট করে দেবে।"

এক মুহূর্তের জন্য আত্রেয়ী কোনও কথা বলতে পারল না। শেষে কোনওমতে নিজেকে ধাতস্থ করে বলল, "তা তুই কী বললি!"

"এটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস, দীপঙ্করের এই প্রস্তাবে আমি রাজি হতে পারব না। তুই বোধ হয় খোরপোশ বাবদ মোটা টাকা ক্লেম করার কথা ভাবছিস। দীপঙ্কর চাইছে সেটা না দিতে। তবে তুই কোর্টে গেলে তো ওকে সেটা দিতেই হবে। কিন্তু এই রাস্তায় গেলে তুই আমার টানে দীপঙ্করকে যে-কোনও মূল্যে ছাড়তে চাইবি।"

এবার আত্রেয়ী ঠোঁটে হাসি খেলল। ও বলল, "তা তুই রাজি হলি না কেন? আমি তোর প্রথম ভালবাসা বলে?"

"তোর কাছে ব্যাপারটা ঠাট্টা হতে পারে। আমার কাছে নয়।"

"তার মানে তুই আমায় ডেকেছিস দীপঙ্করের কাছ থেকে সাবধান করতে। তাই তো?"

"তাই। তবে সঙ্গে আরও একটা ফ্যাক্টর রয়েছে।"

"সেটা আবার কী?"

"আমি এবার কী করে দীপঙ্করকে সামলাব বল তো? দীপঙ্কর যখন জানবে আমি কাজটা করিনি, তখন তো ও ক্লিপিংস, ছবি সব পাঠাবে অনিন্দিতাকে। সেটা ঠেকাব কীভাবে?"

আত্রেয়ী এবার উঠে দাঁড়াল। আহিরের প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে বলল, "আমি এবার যাব। আশা করি তোর আর কিছু বলার নেই।"

"যাবি মানে?" আহির অবাক হয়ে গেল। ও ভাবতে পারেনি আত্রেয়ী সব শোনার পর এমন নির্লিপ্ত থাকবে। এবং পাশ থেকে সরে যাবে।

কিন্তু আত্রেয়ী যেন তেমনই করতে চাইল। আহিরের দিকে তাকিয়ে বলল, "দীপঙ্কর সবটুকু জানে না, তাই তোকে ওই প্রস্তাব দিয়েছে। আর যাকে দিকে হোক তোকে দিয়ে ওই কাজ হবে না। কারণ, আমাদের রাস্তা আগেই আলাদা হয়ে গিয়েছে। অতএব আমার এসব শুনে কী হবে? এবার তুই কীভাবে দীপঙ্করকে সামলাবি, সেটা পুরোপুরি তোর ব্যাপার। আমি এতে জড়াব না।"

আহির তবু উঠে দাঁড়িয়ে আত্রেয়ীকে আটকাতে গেল। কিন্তু তার আগেই আত্রেয়ী হনহন করে সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে। আহির দেখল চলে যাওয়ার সময় আত্রেয়ী একবারও ওর দিকে ফিরে তাকাল না।

আত্রেয়ীর যাওয়া দেখতে-দেখতে আহিরের একবার ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে মেয়েটাকে আটকায়। বোঝায় যে, ও এখনও আত্রেয়ীকেই ভালবাসে। কিন্তু আহির জানে তাতে পরিণতির কোনও হেরফের হবে না। আত্রেয়ী কোনও কথা শুনবে না। বিশ্বাস করবে না। চলেই যাবে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আহিরও কফির দাম কাপের তলায় রাখল। তারপর ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। ওকে এবার অন্য রাস্তা খুঁজতে হবে।

॥ ২০ ॥

শেষ পর্যন্ত সঞ্জয়ের কাছে গিয়ে সব বলল আহির। সঞ্জয় অবশ্য প্রথমে শুনতেই চাইছিল না। তবু আহির জোরাজুরি করেই সব শোনাল। সব শুনে সঞ্জয় খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল।

আহির বলল, "তুই কি বুঝতে পারছিস আমি কী জটিল জালে জড়িয়ে পড়েছি?"

সঞ্জয় তাও কোনও জবাব দিল না। শুধু দূরের উপত্যকার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল।

আহির বলল, "এবার কী করব তার দিশা পাচ্ছি না।"

সঞ্জয় প্রায় স্বগতোক্তির মতো করেই বলল, "ডিভাইন জাস্টিস। তোর এটাই হওয়ার ছিল। ভাবিস না, আমি তোর ব্যাপারে সিম্প্যাথিটিক। এটাও ভাবিস না যে, আমি তোর পাশে আছি। এটা পুরোপুরি তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

"সঞ্জয়, সব মানুষই ভুল করে," আহির কাতরভাবে বলল, "তোকে আমি আগেও এই কথা বুঝিয়েছি।"

"দ্যাখ ভাই, ওই সব দার্শনিক বুলি ছাড়। আমি আবার জড়াই আর তুই ফের আমায় ফাঁসিয়ে দিস আর কী! হয়তো তুই কায়দা করে প্রমাণ করে ছাড়বি যে, আত্রেয়ীর সঙ্গে আমারই প্রেম ছিল। তুই নির্দোষ।"

আহির স্থিরভাবে সঞ্জয়কে দেখল। বলল, "আমি বুঝতে পারছি তুই আর আমায় বিশ্বাস করতে পারছিস না। কিন্তু তুই খণ্ড সত্যকে পূর্ণ সত্য বলে চালাতে চাস না। সেটাও ঠিক নয়। তোর আমার আজকের বন্ধুত্ব নয়। অনেকদিন ধরেই তুই আমায় চিনিস। জীবনের বেশির ভাগ সময় মানুষ যেখানে কাটায় সেই অফিসেই তুই আমি থাকি। পাশাপাশি। হঠাৎ তুই সেই সব স্মৃতি ভুলে একটা ঘটনা, যে ঘটনাটা আমার একটা ভুল, সেটা ধরে তুই বারবার আমায় বিচার করছিস। এটাও কি ঠিক?"

সঞ্জয় কোনও উত্তর দিল না।

আহির ফের বলল, "যে শয়তান হয় সে সব জায়গাতেই শয়তান থাকে সঞ্জয়। ইন ফ্যাক্ট আমি যদি শয়তানই হতাম, তা হলে হয়তো এভাবে ফাঁসতাম না। রাস্তায়-রাস্তায় না ঘুরে হোটেলে গিয়ে আত্রেয়ীকে নিয়ে ফূর্তি মেরে ছেড়ে দিতাম। আমি কিন্তু তা করিনি। আমি আমার পুরনো প্রেমকে দেখে নিজেকে সামলাতে পারিনি। এটাই আমার অপরাধ। সেই অপরাধে তোরা সবাই আমার পাশ থেকে সরে যাচ্ছিস। এমনকী, অনিন্দিতার কথা পর্যন্ত তুই গিয়ে জানিয়ে দিয়েছিস আত্রেয়ীকে।"

"আমি জানিয়েছি!" সঞ্জয় অবাক হয়ে বলল, "আমি তোর ব্যাপারে আত্রেয়ী কিংবা দেবযানীকে কিছুই বলিনি।"

"তুই না বললে আর কে ওই খবর দেবে আত্রেয়ীকে?" আহির হাসল।

"দাঁড়া, দাঁড়া এখানে কোথাও একটা মিস কমিউনিকেশন হচ্ছে। অনিন্দিতার কথা আমার থেকে আত্রেয়ী জানেনি। জেনেছে অন্য কারও কাছ থেকে। আত্রেয়ী কি আমার নাম বলেছে?"

"না, তা বলেনি। তবে তুই ছাড়া এই সার্কিটে অনিন্দিতার কথা দ্বিতীয় কেউ জানে না সঞ্জয়। ফলে আমার আন্দাজ করতে অসুবিধে হয়নি।"

সঞ্জয় থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "তুই এমন জট পাকিয়েছিস যে, কেউ আর আলাদা থাকতে পারবে না। সবাই জড়িয়ে যাবে। তবে বিশ্বাস কর, তোর প্রতি আমার যত রাগই থাকুক, অনিন্দিতা কেন তোর সম্পর্কে কোনও কথাই আমি আত্রেয়ীকে সরাসরি জানাইনি। এমনকী কারও মাধ্যমেও সেই সব কথা আত্রেয়ীর কানে পৌঁছে দিইনি। কিন্তু তা হলে আত্রেয়ী বিষয়টা জানল কীভাবে?"

আহির চুপ করে থাকল। ও বুঝতে পারল না সঞ্জয় সত্যি কথা বলছে কিনা!

সঞ্জয় এবার মোবাইল বের করে একটা নম্বর ডায়াল করল। ওপাশে কেউ ফোন ধরতে বলল, "তুমি কি ফাঁকা আছ? একবার আমাদের রুমে এসো তো।"

"কাকে ডাকছিস?" আহির জানতে চাইল।

"দেবযানী। আমার জানা দরকার অনিন্দিতার খবর আত্রেয়ীর কানে কে তুলে দিল। আমার ধারণা আড়াল থেকে কেউ খেলছে। সে শুধু তোকে নয়, আমাকেও ফাঁসাচ্ছে। আমিও যেমন তোকে বিশ্বাস করতে পারছি না, তেমন তুইও বিশ্বাস করতে পারবি না যে, অনিন্দিতার নাম ওদের কানে আমি তুলে দিইনি। যদি তোর বিয়ে ভাঙে কিংবা অন্য সমস্যা হয়, তা হলে তার জন্য তুই আমায় দায়ী করবি। সেটা হতে দেওয়া যায় না।"

দশ মিনিট বাদে আহিরদের রুমের ডোরবেল বাজল। সঞ্জয় গিয়ে দরজা খুলল। দেবযানী দাঁড়িয়ে।

রুমে ঢুকে আহিরকে একবার দেখে নিয়ে দেবযানী স্পষ্ট গলায় সঞ্জয়কে বলল, "কী ব্যাপার, একেবারে জরুরি তলব!"

"বলছি, তার আগে বলো আত্রেয়ী কোথায়?"

"জানি না। কিছুদিন ধরেই আত্রেয়ী কোথায়-কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রথম দিকে আমরা ভেবেছিলাম, আহিরের সঙ্গে ঘুরছে," দেবযানী একবার আহিরকে দেখল, "কিন্তু এখন তো দেখছি আহির থাকছে না আত্রেয়ীর সঙ্গে। তবু আত্রেয়ী কোথায় যাচ্ছে কিছু আন্দাজ করতে পারছি না। আজ সকালেও ও তেমনই বেরিয়েছে।"

আহিরও আশ্চর্য হয়ে দেবযানী আর সঞ্জয়কে দেখছিল। দু'জনে কি সত্যিই পরস্পরের প্রেমে পড়ে গিয়েছে? না হলে সঞ্জয় ডাকতেই এভাবে দেবযানী চলে এল!

সঞ্জয় এবার একটা চেয়ার দেখিয়ে দেবযানীকে বলল, "বোসো। জরুরি কথা আছে।"

দেবযানী বসল। সঞ্জয় এবার আহিরের দিকে ঘুরে বলল, "ভাবিস না আমরা প্রেম করছি। বরং এই প্রেম-প্রেম খেলা খেলতে গিয়ে আমরা ভাল বন্ধু হয়ে গিয়েছি। মুসৌরিতে এসে এটাও আমার একটা বড় প্রাপ্তি।"

এর পর সঞ্জয় ধীরে-ধীরে সব কথা দেবযানীকে বলল। শুনতে-শুনতে দেবযানীর চোখ বড়-বড় হয়ে উঠল। সঞ্জয়ের বলা শেষ হতেই দেবযানী শুধু বলল, "মাই গড। এত কিছু হয়ে গিয়েছে? আমরা তো কিছু টেরই পাইনি।"

সঞ্জয় ঘাড় নাড়ল। বলল, "কিন্তু এখানে কয়েকটা গিঁট আছে যা আমি খুলতে পারছি না। শুধু তাই নয়, আমি চাই বা না-চাই আমি ব্যাপারটায় জড়িয়ে পড়েছি। প্রথম কথা হল, আত্রেয়ী মেয়েটা কেমন? ওর আর দীপঙ্করের সম্পর্কটাই বা এখন কোথায় দাঁড়িয়ে?"

দেবযানী টেবিলের গ্লাসে জল নিয়ে তাতে এক চুমুক দিল। বলল, "আত্রেয়ী আমার ভাল বন্ধু। তবে ইদানীং ও এমন কিছু করছে যেটাকে বন্ধুসুলভ বলা যায় না। আত্রেয়ীর পাস্ট অ্যাফেয়ার নিয়ে আমরা জানি। আহিরকে ছেড়ে ও বিয়ে করেছিল দীপঙ্করকে। কিন্তু দীপঙ্করকে উপর থেকে দেখলে বোঝা যায় না যে, ও পাঁড় মাতাল হয়ে রাতে ফিরে বউয়ের গায়ে হাত তুলতে পারে। শুধু হাত তোলা নয় আরও অনেক কিছু করেছে। লোকটা পারভার্ট। সেই জন্যই আত্রেয়ী বেরিয়ে এসেছে দীপঙ্করের খপ্পর থেকে। তবে এটাও ঠিক, আহিরকে ছেড়ে দীপঙ্করকে বেছে নেওয়াটা ভুল হয়েছে এটা বুঝতে পারলেও, আত্রেয়ী কিন্তু আহিরের জন্য দীপঙ্করকে ছাড়েনি। এটা যদি ও বলে থাকে, সেটা নিছকই আহিরকে ইমপ্রেস করার জন্য বলেছে।"

দেবযানী থামল। গ্লাসের বাকি জলটুকু ঢক ঢক করে খেয়ে নিল। আহির কিছু বলল না। তবে ওর ভিতরে কিছু পুড়তে থাকল।

দেবযানী গ্লাসটা টেবিলে রেখে আবার বলল, "আত্রেয়ী প্রথম দিকে চেয়েছিল দীপঙ্করের নেশা ছাড়াতে। ওকে সুস্থ করে তুলতে। কিন্তু পারেনি। আলটিমেটলি ও বেরিয়ে এসেছে। এবার মাসখানেক বাদে ডিভোর্স চাইবে। এবং মোটা টাকা অ্যালিমনি হিসেবে ক্লেম করবে। আমি ব্যাপারটাকে সমর্থন করি। আত্রেয়ীর জীবনটাকে ছারখার করে দিয়েছে দীপঙ্কর। লোকটার শাস্তি পাওয়াই উচিত। দীপঙ্করের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ায় আত্রেয়ী এতটাই ভেঙে পড়েছিল যে, আমরা এই পনেরোদিনের ট্রিপের প্ল্যান করি। এটা ঠিক ঘোরা নয়। ওই পরিবেশের বাইরে এসে সময় কাটানো। যাতে কিছুদিন বাদে আবার কলকাতায় ফিরে আত্রেয়ী নতুন করে শুরু করতে পারে। কিন্তু এখানে এসে আহিরকে দেখে আত্রেয়ীর মাথা ঘুরে গেল। ও এসে আহিরের সঙ্গে ফের যোগাযোগ করল। এবং আহির যখন আত্রেয়ীর ডাকে সাড়া দিল, তখন আত্রেয়ী ঠিক করল আহিরকে ধরে দীপঙ্করকে ছাড়বে। আত্রেয়ী যখন এসে আমাদের প্রথম ব্যাপারটা বলেছিল, তখন আমরা সবাই সায় দিয়েছিলাম এই প্রস্তাবে। আত্রেয়ীও চেয়েছিল সর্বস্ব দিয়ে আহিরকে ধরতে। তখনও আমরা জানি না আহিরের বিয়ে আগেই ঠিক হয়ে আছে।"

"সব বুঝলাম। কিন্তু এখানে দীপঙ্কর এল কীভাবে? ও কি তোমাদের ফলো করছিল?"

"না। তবে কালকেই ধরতে পেরেছি আমাদের গ্রুপের একটা মেয়ে আছে হিয়া। সেই হিয়ার সঙ্গে তলে-তলে যোগাযোগ রয়েছে দীপঙ্করের। আত্রেয়ী তো আমাদের সবার সামনেই যা বলার বলেছিল। সেই সব কথা হিয়াই জানিয়েছে দীপঙ্করকে।"

"কিন্তু হিয়ার পক্ষে কি অনিন্দিতার খবর জানা সম্ভব?"

"না।"

"তা হলে সেই খবর ছড়াল কীভাবে?"

"এটা আমিও জানি না। দিনদুই আগে আত্রেয়ী শুধু আমায় আলাদা করে বলেছিল, 'জানিস, আহিরের সামনে বিয়ে। পাত্রীর নাম অনিন্দিতা।' আমি সত্যিই চমকে উঠেছিলাম। বলেছিলাম, 'মানে! তোকে কিছু বলেনি?' আত্রেয়ী মাথা নিচু করে ঘাড় নেড়েছিল। যার মানে, আহির খবরটা দেয়নি। বুঝতে পারছিলাম আত্রেয়ী একটা কষ্ট চাপছে। শুধু বিড় বিড় করে বলেছিল, 'সব সমান। আমি আর পারছি না।'"

দেবযানীর কথা শুনে আহিরেরও মাথা হেঁট হয়ে গেল। দেবযানী সেটা খেয়াল করল।

সঞ্জয় বলল, "কিন্তু কার কাছ থেকে আত্রেয়ী খবরটা পেল?"

"আমি জিজ্ঞেস করতে পারতাম। করতামও। কিন্তু আত্রেয়ী পুরো ঘটনার জেরে এমন ভেঙে পড়েছিল যে, ওই পরিস্থিতিতে ওটাই বড় হয়ে উঠেছিল। কে খবরটা দিয়েছে সেটা নয়। তখন ওই প্রশ্ন করলে সেটা খুব খেলো শোনাত।"

ঘরের মধ্যে অদ্ভুত নৈঃশব্দ নেমে এল। এর পর কেউ কোনও কথা বলতে পারছে না।

প্রথম কথা বলল সঞ্জয়। দেবযানীর দিকে তাকিয়ে ও প্রশ্ন করল, "এবার কী হবে?"

"আমি জানি না। তবে পরিস্থিতি খুবই গোলমেলে। সত্যি বলতে ঘুরতে এসে এভাবে গোলমেলে পরিস্থিতিতে পড়ব, আমরা কেউ ভাবিনি। কেউ বিরক্ত, কেউ ফিরে যেতে চাইছে। আমাদের গ্রুপের একেবারে যা-তা অবস্থা। বললাম না, আত্রেয়ী এখন যা করছে সেটা পুরোপুরি বন্ধুসুলভ নয়।"

"আর আত্রেয়ী? ও এখন কী করতে চাইছে?" এবার জানতে চাইল আহির।

দেবযানী মাথা নাড়ল। বলল, "জানি না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি আত্রেয়ী ভয়ঙ্কর কোনও কিছুর দিকে এগোচ্ছে। আপনি সাবধানে থাকবেন। ভালবাসায় দাগা খেলে মেয়েরা সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। আত্রেয়ী কিন্তু এখন সব করতে পারে।"

"সব মানে?"

"সব মানে সব। নিজের এবং আপনাদের জীবন নিয়ে ও ছিনিমিনি খেলতে পারে। মুশকিল হল, দীপঙ্কর এখানে না থাকলে তবু কিছু করা যেত। দীপঙ্কর শুধু এখানে আসেইনি, এসে যাবতীয় নোংরামি শুরু করেছে।"

তিনজন যখন এই নিয়ে কথা বলছে তখন আহিরের মোবাইল আচমকা বেজে উঠল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে আহির দেখল অনিন্দিতার ফোন। একটু ইতস্তত করল আহির। এখন কি ফোন ধরাটা ঠিক হবে? কিন্তু অনিন্দিতা এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, একবার ফোনে না পেলে বার বার ফোন করেই যাবে।

আহির তাই ফোনটা ধরল। আর ফোন ধরতেই অনিন্দিতা বলল, "আহির!"

"হ্যাঁ। বলো।"

"আত্রেয়ী মেয়েটা কে?" অনিন্দিতা সরাসরি প্রশ্ন করল।

আহির কোনও জবাব দিতে পারল না। ওর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল।

॥ ২১ ॥

অনিন্দিতা আবার বলল, "আমার মনে হচ্ছে আহির তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ।"

"আমি...লুকোব...মানে..."

"তোমার গলা শুনেই আমার তা মনে হচ্ছে। আত্রেয়ী কে?" অনিন্দিতা জেরা করার ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল।

আহির ততক্ষণে খানিক সামলেছে। বাকি দু'জনকে ইশারায় চুপ করতে বলে ও জানতে চাইল, "কী হয়েছে বলবে?"

"বলব। আগে তুমি বলো, আত্রেয়ী বলে কাউকে তুমি চেন কিনা!"

"হ্যাঁ, এককালে চিনতাম। এককালে আমাদের সম্পর্কও ছিল। সে বহুদিন আগের কথা। আমি আত্রেয়ীর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ এই প্রসঙ্গে এল কোত্থেকে? তোমাকেই বা নামটা কে বলল?"

অনিন্দিতা বলল, "কই আমায় তো কোনওদিন আত্রেয়ীর কথা বলোনি!"

"বলেছিলাম। আমাদের কলেজে সম্পর্ক ছিল। কলেজ ছাড়তেই ব্রেকআপ হয়ে যায়। তোমার মনে হয় খেয়াল নেই।"

"আত্রেয়ী নামটা আমি জানতাম না।"

"সম্পর্কটা এতটাই মামুলি ছিল যে, বলার প্রয়োজনই মনে করিনি। কী হয়েছে?"

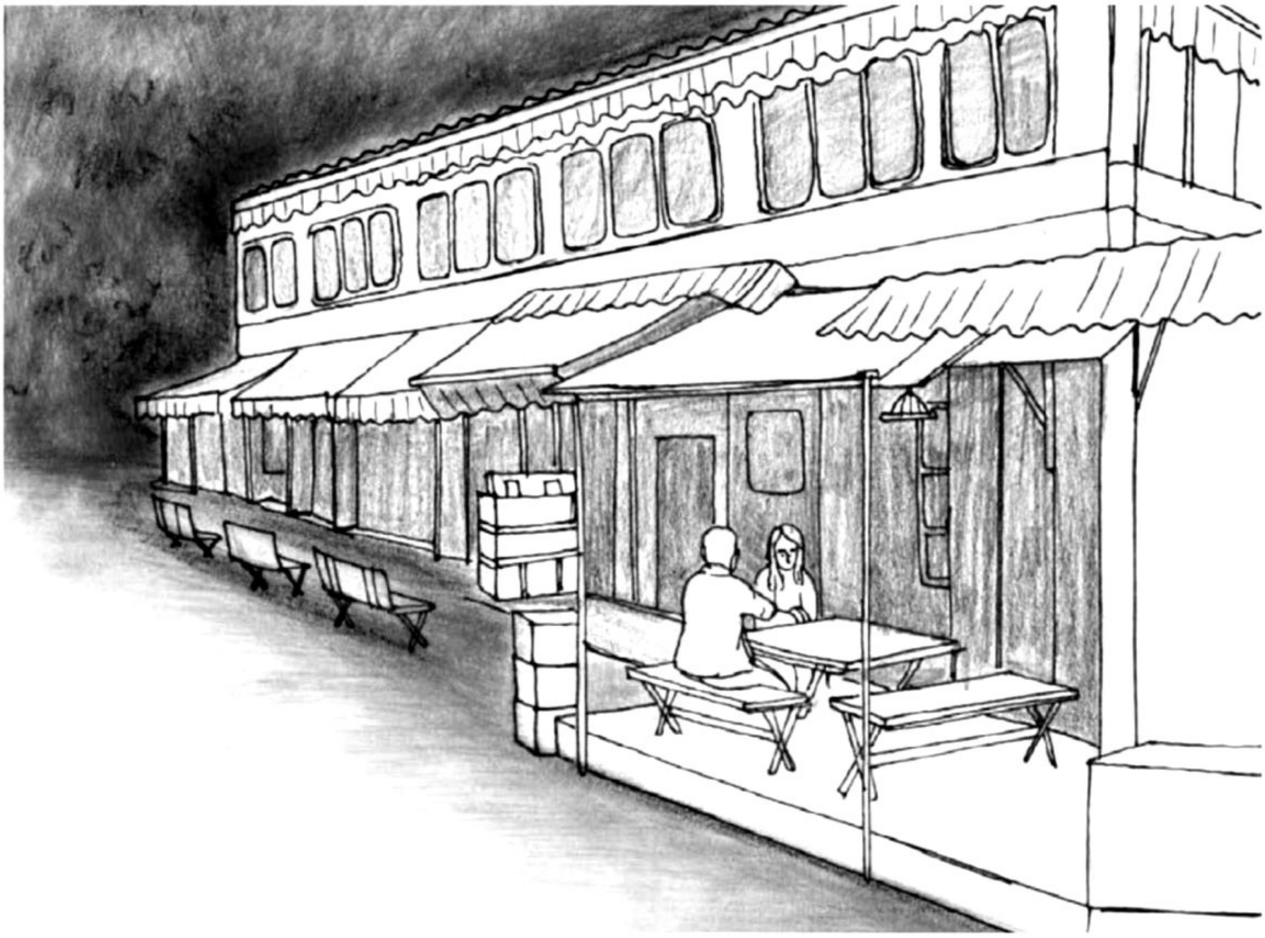
অনিন্দিতা চুপ করে গেল। বলল, "একের পর-এক টেনশন শুরু হয়েছে আহির। বিয়ের আগেই আমি কনসিভ করলাম। ওদিকে তুমি পাশে নেই। তারপর উপর কাল রাতে একটা ফোন এল আমার মোবাইলে। অচেনা নম্বর রাত-বিরেতে আমি ধরি না। কে না কে হবে! কিন্তু কাল ফোনটা বার বার বাজছিল। তুমি অত দূরে। সব সময় তোমায় মোবাইলে পাওয়া যায় না। চিন্তা তো হয়ই। তাই ফোনটা ধরলাম। আর সেটা ধরতেই এক পুরুষকণ্ঠ বলল, 'অনিন্দিতাদেবী বলছেন?' দেবী-টেবি শুনে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম কোনও ছাত্রের বাবা কিনা। তাই বললাম, 'হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?' ওই গলার স্বর বলল, 'আমায় আপনি চিনবেন না। তবে আমি আপনাকে সতর্ক করতে ফোন করলাম। আর দু' মাস বাদে আপনার বিয়ে। এদিকে মুসৌরি গিয়ে আত্রেয়ী বলে একটি মেয়ের সঙ্গে তো আহিরবাবু দিব্যি ফস্টিনস্টি করে বেড়াচ্ছে। বেড়ানো তো স্রেফ ছুতো। এই মেয়েটার সঙ্গে আহিরবাবুর আগের সম্পর্ক ছিল। আপনি কি তা জানেন?'"

"তুমি কি গলাটা রেকর্ড করতে পেরেছ?" আহির বলল।

"না। আমার ভয়েস রেকর্ডার সব সময় চালু থাকে না। তা ছাড়া রেকর্ড করার কথা মাথাতেও আসেনি।"

"তারপর কী হল বলো!"

"আমি তখন লোকটার কাছে জানতে চাইলাম, 'আপনি কে বলছেন?' লোকটা বলল, 'পরিচয় দিলে কি চিনতে পারবেন? আপনি আমায় কোনওদিন



দেখেননি। নামও শোনেননি। তবে আহিরবাবু আমায় চেনেন। আমার নাম জানেন।' আমি থাকতে না পেরে বললাম, 'আমার হবু স্বামীর নামে অপবাদ দিচ্ছেন! আমি পুলিশে ইনফর্ম করব।' লোকটা তাতে কী বিচ্ছিরিভাবে হাসল। বলল, 'যান-যান, তাতে আহিরবাবুই বিপদে পড়বেন। আমার কাছে সব কিছু প্রমাণ রয়েছে।'"

অনিন্দিতা কথা বলতে-বলতে ফোঁপাচ্ছিল। দেবযানী এবং সঞ্জয়ও নিজেদের কথা থামিয়ে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছিল কী কথা হচ্ছে আহির-অনিন্দিতার মধ্যে। সঞ্জয় বুঝতে পারছিল, অনিন্দিতা কাঁদছে।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অনিন্দিতা বলল, "আমার খুব ভয় করছে। আমার গর্ভে তোমার সন্তান। এই সব সময় মায়েদের খুব সাবধানে থাকতে বলে। মিসক্যারেজ হতে পারে, ডিস্টার্বড থাকলে বাচ্চার উপর তার প্রভাব পড়তে পারে...আর এই পরিস্থিতিতে উড়ো ফোন আসছে তোমায় নিয়ে। আমি এটা আর নিতে পারছি না।"

আহির কী বলবে ভেবে পেল না। একই সঙ্গে একটা রাগ এবং একটা অসহায়তা ওর ভিতরে পাক দিতে থাকল। আহির বলল, "শোনো, আমার সঙ্গে সঞ্জয় রয়েছে। আমি ওকে ফোনটা দিচ্ছি। তুমি একবার ওর সঙ্গে কথা বলো। সঞ্জয়ই তোমায় বলবে যে, শুধু আমরা দু'জনেই মিলেই শুধু ঘুরছি। আর কেউ নেই আমাদের সঙ্গে।"

আহির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফোনটা সঞ্জয়ের দিকে এগিয়ে দিল।

সঞ্জয় ফোনটা ধরে উৎফুল্ল গলায় বলল, "হ্যাঁ অনিন্দিতা, বলো কী হয়েছে!"

অনিন্দিতা বোধ হয় মার্জিত গলায় ওই ফোনটার ব্যাপারে সঞ্জয়কে আবার বলল। শুনে সঞ্জয় হেসে ফেলল, "ধুর, আমরা ছাড়া আবার কে থাকবে? এই তো আজ চব্বিশে ডিসেম্বর। তাই আমরা প্ল্যান করছিলাম ক্রিসমাস ইভে কী করা যায় তা নিয়ে! তুমি এখানে থাকলে দেখতে বড়দিনে কী সুন্দর করে সাজানো হয়েছে মুসৌরির ম্যাল রোড। এখানে যে গির্জাগুলো আছে সন্ধে হলেই সেগুলোও কেমন আলো ঝলমল করবে। তুমি ওই সব ফোনে একদম কান দেবে না। কাল বাদ পরশুই তো আমাদের ফেরা।"

সঞ্জয়ের কথায় আশ্বস্ত হয়ে ফোন ছাড়ল অনিন্দিতা। আহিরের মোবাইলটা ওর দিকে এগিয়ে দিল সঞ্জয়। বলল, "মেয়েটা খুবই সরল এবং সেন্টিমেন্টাল।"

"অনিন্দিতা কনসিভ করেছে," আহির প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল।

"মানে?" বিস্ফারিত গলায় বলে উঠল দেবযানী, "কী বলছেন আপনি!"

আহির ঘাড় নাড়ল।

"সেই অবস্থায় তুই মুসৌরি এলি?" এবার বলল সঞ্জয়।

"সেই অবস্থায় আসিনি। আসার কয়েকদিন পর খবরটা পেয়েছি। তখন তোর সঙ্গে কথা বন্ধ।" সঞ্জয়ও ধপ করে পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। দেবযানী কোনও কথা বলতে পারছিল না। শুধু আহিরকে জরিপ করছিল। শেষে বলল, "আপনিও দীপঙ্করের চেয়ে কম যান না। হবু স্ত্রী প্রেগন্যান্ট। আর আপনি ঘুরছেন আত্রেয়ীর সঙ্গে?"

"আত্রেয়ীর সঙ্গে যখন দেখা কিংবা ঘোরাঘুরি তখনও অনিন্দিতার কনসিভ করার খবর পাইনি। যখন পেলাম তখনই ঝামেলা লাগল," আহির বলল।

সঞ্জয় বলল, "আমার মনে হচ্ছে ফোনটা দীপঙ্করই করেছে।"

"তাতে কোনও সন্দেহ নেই," দেবযানী বলল, "কিন্তু লোকটাকে কী করা যায়?"

"সেটা আমি বুঝতে পেরেছি," আহির বলল।

সঞ্জয় আর দেবযানী দু'জনে তাকাল আহিরের দিকে। দু'জনেই বোঝার চেষ্টা করল, আহির ঠিক কী বলতে চাইছে।

আহির সেই চাউনিকে আমল না দিয়ে ফোন করল দীপঙ্করকে। দীপঙ্কর ফোন ধরতে বলল, "ব্যস্ত?"

"তোমার জন্য আমার কাছে সব সময় সময় আছে।"

"তা হলে চলে এসো।"

"কোথায়?"

"আমাদের হোটেলের গায়েই যে স্কেটিংয়ের জায়গা রয়েছে সেখানে। নিরিবিলিতে কিছু কথা বলতে চাইছি।"

"এক্ষুনি যাচ্ছি। রাজি করাতে পারলে?"

"খানিকটা। এসো। বলছি।"

আহির ফোন কাটল।

সঞ্জয় বলল, "তুই কী করতে চাইছিস?"

"হেস্তনেস্ত।"

"আপনি দীপঙ্করকে চেনেন না। ও ডেঞ্জারাস। আপনার ক্ষতি করতে পারে।"

“যা ক্ষতি করার তো করেই ফেলেছে,” আহির হাসল, “আপনি ভাববেন না। দীপঙ্কর আমার কাজটা সহজ করে দিয়েছে।”

সঞ্জয় বলল, “আমি কি তোর সঙ্গে থাকব?”

“না,” আহির মাথা নাড়ল।

দু’জনকে আর কিছু বলতে না দিয়ে আহির রুম থেকে বেরিয়ে হোটেলের পাশের স্কেটিং রিংকের সামনে এল। স্কেটিং রিংক দুপুরে খোলে। তাই এখন কেউ নেই। তবে চাইলে রিংকের ভিতরে ঢুকে দাঁড়ানো যায়। আহির ভিতরে ঢুকেই দাঁড়াল। কয়েক মিনিট বাদেই দীপঙ্করকে দেখা গেল। একটা রিকশা করে আসছে। স্কেটিং রিংকের সামনে রিকশা থেকে নামল দীপঙ্কর। ভাড়া মিটিয়ে ভিতরে ঢুকে এল।

আহিরের সামনে এসে মিটিমিটি হেসে বলল, “বলো, কী জন্য এই জরুরি তলব!”

আহির ঠান্ডা চোখে দীপঙ্করকে দেখল। রাস্তাটাও দেখে নিল। এখনও লোক চলাচল সেভাবে শুরু হয়নি। দোকান-টোকান খুলবে এবার। দীপঙ্করের দিকে ফের চোখ ফেরাল আহির। দীপঙ্করের চোখ হাসছে। আহির এক মুহূর্ত সময় নিল। তারপর প্রবল জোরে একটা ঘুসি মারল দীপঙ্করের মুখে। আহির যে হাত চালাতে পারে দীপঙ্কর আন্দাজ করতে পারেনি। তাই কোনও সতর্কতা নেওয়ার সুযোগ পেল না। আহিরের ঘুসি খেয়ে ওর লম্বা শরীরটা টলে গেল। ঠোঁটের পাশটা ফুলে উঠল। তবে আহির একটা ঘুসি মেরে থামল না। গায়ের সব শক্তি দিয়ে দ্বিতীয় ঘুসিটা মারল দীপঙ্করের বুকের বাঁ দিকে। প্রথম ঘুসিতেই বেসামাল হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। দ্বিতীয় ঘুসি আটকানোর অবস্থায় ও ছিল না। দ্বিতীয় ঘুসিতে ও কাবু হল বেশি। বুক চেপে বসে পড়ল। আহির সতর্কভাবে চারপাশ আবার দেখল। রাস্তার লোকের এদিকে নজর নেই। দীপঙ্কর নিচু হতেই ও সপাটে একটা লাথি মারল দীপঙ্করের মুখে। কলেজে ঢোকার আগে পর্যন্ত আহির নিয়মিত ফুটবল খেলত। সেই জন্য লাথিটা নিখুঁত হল। দীপঙ্কর গড়িয়ে পড়ল। আহির তবু থামল না। দীপঙ্করের পেট লক্ষ করে পরের পর লাথি মারতে লাগল।

কুঁকড়ে গিয়ে কোঁকাতে থাকল দীপঙ্কর। কোনওমতে বলল, “মারছ কেন!”

আহির নির্বিকার গলায় বলল, “মোবাইল ফোনটা দাও। না হলে খাদের ধারে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলব।”

দীপঙ্কর কোনওমতে আহিরের পা বাঁচিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে দিল। আহির লাথি মারা থামাল। নিচু হয়ে দীপঙ্করকে বলল, “লকটা খোলো।”

“কেন?” দীপঙ্কর প্রশ্ন করল।

আহির কোনও জবাব দিল না। ফের সপাটে লাথি মারল দীপঙ্করের তলপেটে। দীপঙ্কর কোনওমতে মোবাইলটা হাতে নিয়ে লকটা খুলে দিল। আহির গ্যালারিতে গেল। ওর আর আত্রেয়ীর ছবি এবং ভিডিয়োগুলো সবার আগের ডিলিট করল। একবার দেখে নিল গুগল ড্রাইভ কিংবা অন্য কোনও জায়গা ছবি, ভিডিয়োগুলো সরিয়ে রাখা আছে নাকি। দেখল নেই। দীপঙ্কর বোধ হয় অতটা টেক স্যাভি নয়। ছবি ডিলিট করার পর আহির আছাড় মেরে মোবাইলটা ভাঙল। দীপঙ্কর ততক্ষণে উঠে বসেছে। তবে এক মিনিটের মধ্যে ওর উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গিয়েছে, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। ঠোঁটের পাশটা আরও ফুলেছে। দু’ হাত দিয়ে পেট চেপে ও বসে। মুখে যন্ত্রণার ছাপ পড়েছে। হাঁপাচ্ছে।

আহির কলার ধরে দীপঙ্করকে টেনে তুলল। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, “অনিন্দিতাকে কেন ফোন করলি?”

“আমি ফোন করিনি,” দীপঙ্কর বলল।

আহির আবার ওর চোখ লক্ষ করে একটা ঘুসি চালাল। দীপঙ্কর মাথা সরিয়ে নিয়েছিল। তাই ঘুসিটা গিয়ে পড়ল ওর বাঁ কানে। বাঁ হাত দিয়ে বাঁ কান চেপে ধরল দীপঙ্কর। চিৎকার করে বলল, “আমি ফোন করিনি। বিশ্বাস করো! আমি স্রেফ তোমায় ভয় দেখিয়েছিলাম। তার বেশি আর কিছু...”

দীপঙ্কর কথা শেষ করতে পারল না আহির টেনে একটা চড় কষাল ওর গালে। এই লোকটা একদিন এসে ওর কাছ থেকে আত্রেয়ীকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। এই লোকের সঙ্গেই একদিন হাত হাত ধরে আত্রেয়ী ধর্মতলা দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল। বিয়ের পর লোকটা নেশা করে আত্রেয়ীর গায়ে হাত তুলত। এই লোকটা এসে ওর জীবন তছনছ করে দিয়েছে। এই লোকটার জন্য ও পিএইচ ডি শেষ করতে পারেনি। জীবনের সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিয়েছে। এখন ও যখন অনিন্দিতার সঙ্গে ঘর বাঁধতে যাচ্ছে, তখন এই লোক আবার সেখানে গিয়ে বিষ ঢেলেছে। একটা রাগ আহিরের শরীর মনে লেজ ঝাপটাতে লাগল।

আর উন্মাদের মতো আহির মারতে লাগল দীপঙ্করকে। দেখতে লম্বাটে হলেও দীপঙ্করের গায়ে তেমন জোর নেই। তবু হয়তো ও হাত চালাত। কিন্তু প্রথম দুটো ঘুসিতেই ওর সব প্রতিরোধ খসে পড়েছিল। তাই আহিরের চড় খেতে-খেতে ওর ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত গড়াতে লাগল। দু’ হাত নিয়ে নিজেকে আড়াল করতে লাগল দীপঙ্কর। কিন্তু পালটা মার দিতে পারল না।

এক সময় আহির থামল। দীপঙ্কর তবু নিজের মুখ দু’ হাত দিয়ে আড়াল করে রাখল। বলা যায় না, যদি আহির ফের হাত চালায়। আহির থামতে দীপঙ্কর ফুঁপিয়ে উঠল। বলল, “আমি আন্দাজ করতে পারছি কে ফোনটা করেছে।”

আহির কোনও জবাব দিল না। শুধু অপলকভাবে দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে থাকল।

দীপঙ্কর কোনওমতে বলল, “আত্রেয়ী। ওর হাতে এই কাজ করার ছেলে আছে।”

॥ ২২ ॥

দীপঙ্করের কলার ধরে আহির হিসহিসিয়ে বলল, “আত্রেয়ী!”

“হ্যাঁ, আত্রেয়ী। তুমি আত্রেয়ীর সঙ্গে একবার কথা বলো,” দীপঙ্কর ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, “ও যে কী পারে আর পারে না, তুমি উপর থেকে দেখে আন্দাজ করতে পারে না আহির। আত্রেয়ী সাংঘাতিক মেয়ে।”

আহির একটা ঝটকা মেরে দীপঙ্করের কলার ছেড়ে দিল। বলল, “আমি দেখে নিচ্ছি। তবে যদি এটা তোর কোনও চালাকি হয়, তোকে আমি ছাড়ব না। ভাবিস না মুসৌরি থেকে পালালে তুই আমার হাত থেকে নিস্তার পাবি। আমি কলকাতায় ফিরেও তোকে পেটাব।”

স্কেটিং রিংক থেকে বেরিয়ে এল আহির। আড় চোখে দেখল দীপঙ্কর কোনওমতে ভাঙা মোবাইল কুড়িয়ে তার ভিতর থেকে সিমকার্ডটা বের করছে।

দীপঙ্করের আড়ালে গিয়ে আহির ফোন করল সঞ্জয়কে। বলল, “তোরা কি এখনও রুমে?”

“আমি রুমে। দেবযানী বেরিয়ে গিয়েছে তোর পিছু-পিছু। কেন?”

আহির সংক্ষেপে সব কথা জানাল সঞ্জয়কে। শুনে সঞ্জয় বলল, “দীপঙ্কর আবার থানায় যাবে না তো?”

“গেলে আমি ওর বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেলিংয়ের চার্জ আনব।”

“প্রমাণ করবি কীভাবে? ছবিগুলো তো ডিলিট করে দিয়েছিস।”

“আগে যাক। তারপর ভাবব।”

আহির এবার সঞ্জয়ের ফোন ছাড়ল। হোটেলের রুমে যেতে-যেতে ও ফোন করল আত্রেয়ীকে। কিন্তু আত্রেয়ী ফোন বেজে-বেজে এক সময় কেটে গেল। আহিরের মনে হল আত্রেয়ী আর কোনও যোগাযোগ রাখতে চাইছে না। তাই ফোন ধরল না। কিন্তু ওর জানা দরকার অনিন্দিতাকে ফোন করার পিছনে আত্রেয়ী হাত আছে কিনা। আর সেটা আত্রেয়ীর মুখ থেকে শোনাটা একান্ত জরুরি।

রুমে ফিরে আহির দেখল সঞ্জয় একইভাবে বসে। আহির বলল, “দেবযানীকে একবার ফোন কর তো। আত্রেয়ী কি ওদের হোটেলের রুমে? তা হলে আমি একবার ওর মুখোমুখি হতে চাইছিলাম।”

সঞ্জয় ফোন করল দেবযানীকে। জানতে চাইল আত্রেয়ীর কথা। তারপর ওপাশ থেকে এত কথা ভেসে আসতে থাকল যে, সঞ্জয় চুপ করে গেল।

আহির জিজ্ঞেস করল, “কী রে? কী হয়েছে?”

সঞ্জয় ইশারায় ওকে থামাল। দেবযানীর কথার ফাঁকে-ফাঁকে ‘হুঁ, হাঁ’ করতে থাকল। এক সময় ফোনটা কেটে দিয়ে বলল, “আত্রেয়ীকে পাওয়া যাচ্ছে না।”

“পাওয়া যাচ্ছে না মানে? কখন থেকে?”

“আজ সকাল থেকে।”

আহির ঘড়ি দেখল। বারোটা মতো বাজে। এমন কিছু বেলা হয়নি। তাই ও বলল, “সকাল তো সবে ফুরোল।”

“আত্রেয়ী কাউকে কিছু না বলেই বেরিয়ে গিয়েছে। বন্ধুরা ফোন করলেও ফোন ধরছে না। এমনকী দীপঙ্করও নাকি তোর হাতে মার খাওয়ার পর আত্রেয়ীকে খুঁজছে। হিয়াকে ফোন করে জানতে চাইছিল আত্রেয়ী কোথায়? কিন্তু কেউ-ই আত্রেয়ীর খোঁজ দিতে পারছে না।”

“দেবযানীরা এখন কী করবে ভাবছে?”

“ওরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এমনিতেই আত্রেয়ীর আচরণে দেবযানী ছাড়া ওদের টিমের বাকি দুটো মেয়ে বিরক্ত। তার উপর আত্রেয়ী এখন পুরো গায়েব। কারও ফোনও ধরছে না। দুটো মেয়ে চাইছে, এই সব ঝামেলা থেকে

সরে থাকতে। দেবযানী আবার অন্য নীতিতে বিশ্বাসী। দেবযানীর মত হল, একটু অপেক্ষা করি। আগের চারপাশটা খুঁজে দেখি। তারপরও যদি না পাওয়া যায়, তখন পুলিশে যাওয়া হবে।"

"এখন ওরা কী করছে?"

"এখন ওরা দুটো দলে ভাগ হয়ে ম্যাল রোডটা খুঁজে দেখছে। একটা দলে দেবযানী একা। অন্য দলে বাকি দু'জন। মুশকিল হল, আত্রেয়ীর জন্য ওদের দল ভেঙে গিয়েছে। ওই দু'জন ভাবছে আত্রেয়ী যদি সুইসাইড করে বসে তা হলে সবাই ফেঁসে যাবে। তাই দু'জন এক্ষুনি কলকাতায় ফিরে যেতে চাইছে।"

"তোর কী মনে হয়?" আহির এবার প্রশ্ন করল সঞ্জয়কে।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সঞ্জয়। বলল, "বুঝতে পারছি না। আত্রেয়ী জটিল মনের মেয়ে। তার উপর পরপর দুটো ধাক্কা খেয়েছে। প্রথমটা দীপঙ্করের কাছে থেকে। পরেরটা তোর কাছ থেকে। এই পরিস্থিতিতে মেয়েটা ভুলভাল কিছু করে বসতেই পারে। আমিও সেটা নিয়ে ভয় পাচ্ছি।"

আহির কোনও কথা বলতে পারল না।

সঞ্জয় আবার বলল, "একবার যদি তেমন কিছু করে বসে, শুধু ওই মেয়েগুলো নয়, তুইও ফেঁসে যাবি। দেবযানী সব জানে। ও তো সবার আগে সাক্ষী দেবে। আর যে কে-কে ফাঁসবে তার ঠিক নেই। এই বাজারে তুই আবার দীপঙ্করকে বেধড়ক পিটিয়েছিস। সেই লোক আবার না কোনও ঘোঁট পাকায়।"

আহিরের ভিতরটা ছটফটিয়ে উঠল। ও আবার ঘরের বাইরে পা বাড়াল।

সঞ্জয় অবাক হয়ে বলল, "কোথায় যাচ্ছিস?"

"আমিও একটু চারপাশটা ঘুরে দেখি। আত্রেয়ী আর আমি তো কয়েক জায়গায় ঘুরেছি। যদি সেখানে পাই।"

"তুই কিন্তু ফোনটা খেয়াল রাখিস।"

আহির ঘাড় কাত করে আশ্বস্ত করল সঞ্জয়কে। ও যখন দরজা টেনে খুলতে যাবে সঞ্জয় পিছন থেকে বলল, "আর শোন!" আহির পিছন ফিরে তাকাল।

সঞ্জয় বলল, "নিরিবিলি জায়গায় যাস না। দীপঙ্কর লোকটা সুবিধের নয়। যে লোক লুকিয়ে-লুকিয়ে তোদের ছবি তুলতে পারে, সে সব পারে।"

আহির ম্লান হাসল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল। হালকা খিদে পাচ্ছে ওর। কিন্তু এখন খেতে গেলে সময় নষ্ট হবে। তা ছাড়া খিদে পেলেও খেতে পারবে না ও। আত্রেয়ীর কথা ভাবলেই হালকা টেনশন হচ্ছে।

হোটেলের বাইরে এসেই একটা রিকশা পেল আহির। সেটায় উঠে ও নির্দেশ দিল, "কোম্পানি গার্ডেন চলিয়ে।"

রিকশা এগিয়ে চলল ভিড় কাটিয়ে-কাটিয়ে। সত্যিই আজ ভিড় শুরু হয়েছে মুসৌরিতে। বড়দিনের ভিড়। বেশির ভাগ লোকজনের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তারা পঞ্জাবি। গাড়ির পর-গাড়ি। রাস্তার দু' পাশ দিয়েও অনেকে হাঁটছে। মাইকে তারস্বরের হিন্দি সিনেমার গান বাজছে। অনেক দোকানে লাইট লাগানো শুরু হয়েছে। সেই সব ভিড় কাটিয়ে রিকশা এগোচ্ছে। আহির বাইরের দৃশ্যগুলো দেখছিল। কিন্তু সেগুলো ওর মনে কোনও অভিঘাত তৈরি করতে পারছিল না। আহির কেবল ভাবছিল, যদি আত্রেয়ীর কিছু হয়ে যায়, তা হলে কী হবে!

কোম্পানি গার্ডেনে পৌঁছে টিকিট কাটল আহির। আগের দিনের দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভাসতে লাগল। খারাপ লাগল আহিরের। কিন্তু সেই খারাপ লাগা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। কারণ, কোম্পানি গার্ডেনে খানিক ঘোরাঘুরির পরই ফোন এল ওর মোবাইলে। আবার অনিন্দিতা ফোন করেছে।

আহির ফোন ধরতেই অনিন্দিতা আতঙ্কিত গলায় বলল, "আবার ফোনটা এসেছিল। তবে এবার অন্য নম্বর থেকে।"

"এবার গলা রেকর্ড করেছ?"

"না। এটা তো অন্য নম্বর। তাই বুঝিনি ওই ফোন হবে।"

"সেই একই গলা?"

"না। এবার একটা মেয়ে ফোন করেছিল।"

"মেয়ে?" আহির হোঁচট খেল।

"হ্যাঁ, ফোন করে একই কথা বলল।"

"কী বলল?"

"এই যে তুমি নাকি আত্রেয়ী বলে একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরছ। প্রেম করছ। সেটা নিয়ে সঞ্জয়ের সঙ্গে তোমার ঝামেলা হয়েছে।"

আহিরের এবার মনে হল অনিন্দিতাকে কিছুটা অন্তত বলা দরকার। না হলে সমস্যা আরও বাড়বে। আহির জোর নিশ্বাস টানল। বলল, "শোনো, তুমি বলার পর আমিও খোঁজ নেওয়া শুরু করেছি। আত্রেয়ী সত্যিই এখানে এসেছে। এবং যে-কোনও কারণেই হোক মেয়েটা এই কাজটা করছে।"

"কে! আত্রেয়ী?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কী করে জানলে?"

"মুসৌরি ছোট জায়গা অনিন্দিতা। এই ম্যাল রোডটুকুর বাইরে সে রকম কিছু নেই। ম্যাল রোডেই আমি আত্রেয়ীকে দেখেছি। কে জানে, কার মনে কী আছে। হয়তো আত্রেয়ীর আমার প্রতি কোনও পুরনো রাগ আছে।"

"কিন্তু সেই রাগে তোমার ডিটেলস, এমনকী আমার মোবাইল নম্বরও জোগাড় করে ফেলবে? তাও আবার এত বছর বাদে?"

"পৃথিবীর এখন অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে অনিন্দিতা। কারও সম্পর্কে কোনও খোঁজ বের করাটা কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। এখন সব কিছুই ওপেন।"

"তুমি কি এখনও আত্রেয়ীকে ভালবাসো?" অনিন্দিতা অদ্ভুত গলায় জানতে চাইল।

"না," আহির সোজাসাপটা উত্তর দিল।

অনিন্দিতা আর কিছু বলল না।

আহির বলল, "তুমি এবার থেকে ভয়েস রেকর্ডার অন করে রেখো। যে ফোনই আসুক তা যেন রেকর্ড করা যায়। মনে রাখবে, আত্রেয়ী কিংবা যেই কাজটা করুক, সে কিন্তু ক্রিমিনাল অফেন্স করছে।"

অনিন্দিতার ফোন ছেড়ে আহির ফুঁসতে লাগল। সবার আগে আত্রেয়ীকে খুঁজে বের করা দরকার। মেয়েটা গেল কোথায়?

কোম্পানি গার্ডেন থেকে আর-একটা রিকশা নিয়ে আহির এল ম্যাল রোডের মুখে। ততক্ষণে ওর খিদে পেয়ে গিয়েছে। বেলাও গড়িয়েছে। আড়াইটে বাজে। নেহাত জায়গাটা ঠান্ডা এবং ও ঘুরতে এসেছে তাই এত দেরি করে খাওয়া-দাওয়া করছে। কলকাতায় থাকলে এর ঢের আগেই ওর দুপুরের খাওয়া হয়ে যেত।

আহির একটা উত্তর ভারতীয় রেস্তরাঁয় ঢুকে আগে খেয়ে নিল। সঞ্জয়কেও ফোন করে বলল খেয়ে নিতে। তখন সঞ্জয় জানাল, আত্রেয়ীকে তখনও খুঁজে পায়নি দেবযানীরা। সেই জন্য আত্রেয়ীকে নিয়ে ওদের বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছে। হিয়া আর বিশাখা চাইছে এক্ষুনি মুসৌরি ছাড়তে। দেবযানী রাজি হচ্ছে না। থানা যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কী সেটা ওদের বোঝাচ্ছে।

আহির ঘড়ি দেখল। বিকেল ঘনাচ্ছে। রোদ মরে আসছে। এখনও যদি আত্রেয়ীকে পাওয়া না যায়, তা হলে সত্যিই এবার থানায় জানানো উচিত। না হলে পরে সমস্যার হতে পারে।

তবে এখন আহির নিজে কী করবে ভেবে পেল না। হোটেলে ফিরে যাবে? এভাবে রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরার কোনও মানে হয় না।

আহির যখন প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে হোটেলের দিকে হাঁটা দেবে, তখনই ওর মোবাইল বাজল। পকেট থেকে ফোন বের করে ও দেখল 'আত্রেয়ী কলিং' লেখাটা ফুটে উঠেছে স্ক্রিনে। দ্রুত ফোন ধরল আহির।

ওপাশ থেকে আত্রেয়ী বলল, "ফোন করেছিলি?"

"তুই কোথায়?"

"শুধু এটা জানার জন্য ফোনটা করেছিলি?" আত্রেয়ী হাসল।

"না। আমি জানতে চাইছি অনিন্দিতাকে ফোনটা কি তুই করেছিলি?"

"অনিন্দিতা তাই বলল?"

"তোকে আমি সোজা প্রশ্ন করছি, তুই তার সোজা উত্তর দে।"

"দেব। তবে ফোন নয়। তোকে আসতে হবে আমার কাছে।"

"তুই এখন কোথায় আছিস?"

"ল্যান্ডৌরে।"

"ল্যান্ডৌরে! তা হলে কারও ফোন ধরছিস না কেন? সবাই তো তোকে খুঁজছে। পুলিশে যাওয়ার কথাও ভাবছে।"

আত্রেয়ী সেই কথার কোনও জবাব দিল না। বলল, "তুই এক্ষুনি এখানে চলে আয়। তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আর-একটা কথা, আমি কোথায় আছি কিংবা আমি যে তোকে ডেকেছি, সেটা কাউকে বলবি না।"

"কেন?"

"আমি বারণ করছি তাই। যদি কারওকে নিয়ে আসিস, আমি তা হলে তোর সঙ্গে কোনও কথা বলব না। উলটে আবার এমন জায়গায় চলে যাব যে, তোরা আমায় খুঁজে পাবি না।"

আহির একটু ভাবল। তারপর বলল, "বেশ। কিন্তু ল্যান্ডৌরের কোথায় থাকবি তুই?"

"চার দুকানে। যে দোকানটায় আগের দিন দু'জনে বসেছিলাম, সেখানেই রয়েছি।"

আহির ফোন ছাড়ল। পকেটে গাড়ি ভাড়া করার মতো টাকা নেই। এটিএম-এ যেতে হবে। তার আগে ও ফোন করল সঞ্জয়কে।

সব শুনে সঞ্জয় বলল, "এটা একটা ফাঁদও হতে পারে। হয়তো দীপঙ্কর আর আত্রেয়ী হাত মিলিয়েছে। আত্রেয়ী বুঝেছে তোকে পাবে না। অগত্যা দীপঙ্করের সঙ্গে প্যাচআপ করে নেওয়াই ভাল।"

"আমি কী করব?"

"তুই ল্যান্ডৌর যা। আমি এদিকে দেবযানীকে ইনফর্ম করে রাখছি। যদি আত্রেয়ী কোনও ঝামেলা করে, তখন এদিকের সাপোর্ট কাজে লাগবে। তবে আমি বলে দেব, তুই সিগন্যাল না দেওয়া পর্যন্ত কেউ আত্রেয়ীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবে না। কিংবা ল্যান্ডৌর রওনা দেবে না।"

সঞ্জয়ের ফোনটা ছাড়ল আহির। আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য ডুবছে। ঝপ করে এবার অন্ধকার নামবে। আহির পা বাড়াল কাছাকাছি এটিএম-এর দিকে। এবার আত্রেয়ীর সঙ্গে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করা প্রয়োজন।

॥ ২৩ ॥

গাড়ি ভাড়া করে আহির যখন ল্যান্ডৌর পৌঁছল তখন সন্ধে। প্রবল ঠান্ডা। যেন হাত-পা জমে যাবে। চারপাশেও ঘুটঘুটে ভাব। তবে আলো জ্বলছিল। চব্বিশে ডিসেম্বর সন্ধে গড়িয়ে চলেছে রাতের দিকে। ঠান্ডার সঙ্গে বাড়ছে উৎসবের আমেজ। মুসৌরি, ল্যান্ডৌরে হইচই শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে কলকাতার মতো হইচই নয়। অন্তত ল্যান্ডৌরের উৎসবের ধরনই আলাদা। গাড়ি থেকে নেমে আহির দেখল, চার দুকানের সামনে আলো ঝলমল করছে। কিন্তু তার ঠিক গায়েই যে গির্জাটা সেটার দরজা বন্ধ। তবে গির্জার দেওয়ালে আলো লাগানো হয়েছে। জায়গাটাও নিঝুম। গাঢ়, ফিকে নানা ধরনের অন্ধকার সেখানে ছড়িয়ে। এমনকী দিনের বেলা যে বাঁদরগুলোকে দেখা যায়, সেগুলোও নেই। গির্জা চত্বর শুনশান। বড়দিনের আগের সন্ধেয় এমন গির্জা আহির কখনও দেখেনি। চিরকালই ও দেখেছে বড়দিন মানেই গির্জা ঘিরে মাতামাতি। এখানে সেটা তেমন নেই দেখে ও খানিক থমকেই গেল।

পরিবেশের মতো এমন ঠান্ডাও আহিরের অপরিচিত। গ্লাভস পরা হাতও জমে যাচ্ছে। শিরশির করে যে হাওয়া দিচ্ছে সেটা ছুরির মতো ধারালো। সেই ঠান্ডায় আহির এগিয়ে গেল আগের দিন যে রেস্তরাঁয় বসেছিল তার দিকে। সেই রেস্তরাঁর কাছাকাছি পৌঁছে আহির দেখতে পেল আত্রেয়ীকে। রেস্তরাঁর সামনে অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল পাতা। তার একটায় বসে। চুপচাপ। দূরের অন্ধকারের দিকে ও চেয়ে আছে। চারপাশের হইচইয়ে মন নেই। আত্রেয়ী যেখানে বসেছিল, সেখানে আর কেউ নেই। একে ওই রেস্তরাঁটা চার দুকানের একেবারে শেষে। তার উপর আত্রেয়ী বসেছিল রেস্তরাঁর শেষ চেয়ারে। সেই চেয়ারের পরই চওড়া রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে অন্ধকারে। দেখলে মনে হবে, আত্রেয়ীর সামনে বড়দিনের উচ্ছ্বাস। পিছনে ঘন অন্ধকার।

আহির নিজেকে প্রস্তুত করল। এক সন্ধিক্ষণে এসে ও দাঁড়িয়েছে। এখন আত্রেয়ীর সামনে দুর্বল হয়ে পড়লে চলবে না। কারণ, আত্রেয়ী আবার ওর ক্ষতি করতে চাইছে। একবার ক্ষতি করেছিল দীপঙ্করের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে। এবার ক্ষতি করতে চাইছে অনিন্দিতাকে সব জানিয়ে দিয়ে। এখন যদি আহিরের মনে পুরনো প্রেম জেগে ওঠে তা হলে সবার ক্ষতি। সেই ফাঁক দিয়েই আত্রেয়ী পালিয়ে যাবে। আত্রেয়ীকে আজ কোনওভাবেই পালাতে দেওয়া যাবে না। বরং সন্তর্পণে ওকে ঘিরে ফেলতে হবে। যাতে কোথাও গিয়েও আত্রেয়ী বিশেষ সুবিধে করতে না পারে। সোজা কথা আহির বুঝতে পারছিল, আত্রেয়ীকে আজ মারতে হবে। আত্রেয়ীকে না মারতে পারলে ও নিজে মরবে। আত্রেয়ীর সঙ্গে বিচ্ছেদ বিপর্যয়ের পর ও যেভাবে নিজেকে একটু-একটু করে দাঁড় করিয়েছে, নতুন জীবনের দিকে এগোচ্ছে, সেই নতুন জীবন তছনছ হয়ে যাবে। অতএব এমন পরিস্থিতিতে আত্রেয়ীকে রেয়াত করা যাবে না।

আহির চারপাশ তাকাল। গোটা ল্যান্ডৌর জুড়ে এক মায়ারী আলো ছড়ানো। এই আলো শান্তির। ভালবাসার। এখানে কোনও যুদ্ধের হানাহানি নেই। এ এক অন্য বড়দিন। এখানে উচ্ছ্বাস কিংবা ভালবাসা কোনওটাই প্রকট নয়। প্রচ্ছন্ন। আনন্দ যেন ফল্গুধারার মতো বইছে।

আহির পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়াল আত্রেয়ীর উলটো দিকে। ওকে দেখে ঘোর কাটল আত্রেয়ীর। মুখ তুলে ও বলল, "এসেছিস? বোস।"

আহির উলটো দিকের চেয়ার টেনে বসল। আশপাশ দেখল।

আত্রেয়ী হাসল। বলল, "চিন্তা নেই। আমি এখানে একা।"

"আমি তা দেখছি না। আমি দেখছি, চব্বিশে ডিসেম্বর রাতেও কলকাতার মাতামাতি এখানে নেই। জায়গাটা বেশ শান্ত। নিরিবিলি।"

"কলকাতা কলকাতাই। ভাব তো, এখন পার্ক স্ট্রিট চত্বরে কী চলছে!" আহিরের কথার জবাব দিয়ে আত্রেয়ী এবার রেস্তরাঁর মালিককে ইশারায় দুটো হানি জিঞ্জার লেমন টি-র অর্ডার দিল।

আহির এবার প্রসঙ্গে ঢুকল। বলল, "হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে তুই এখানে বসে আছিস? ওদিকে তো ওরা তোকে সারা দিকে খুঁজছে।"

আত্রেয়ী হাসল। বলল, "মাঝে-মাঝে এই ধরনের মজা করতে ভাল লাগে।"

"মজা! তুই কি এখনও স্কুল স্টুডেন্ট? ঘুরতে এসে একটা মেয়ে আচমকা বেপাত্তা। বাকি মেয়েদের উপর দিয়ে কী যাচ্ছে ভাবতে পারছিস! সবাই টেনশনে। সবাই তোর উপর চটেছে।"

"আমি তো সেটাই চাইছি।"

"মানে?"

"মানে, আমি বিপদে পড়েছি ভেবে কে কী করে সেটা এখন আমার দেখে নেওয়া দরকার। তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ওরা কেউ ফিরে যেতে চায়নি? কিংবা পুলিশে ইনফর্ম করেনি?"

"ওখানে এখন দুটো মতামত। দেবযানী চাইছে তোকে খুঁজতে। না পেলে পুলিশে ইনফর্ম করতে। হিয়া আর বিশাখা চাইছে ফিরে যেতে।"

আত্রেয়ী আবার হাসল।

আহিরের মনে হল, ও আবার ভুল করছে। এখন ওর উচিত আত্রেয়ীর সঙ্গে বোঝাপড়া করা। সেটা না করে আত্রেয়ীকে নিয়ে কারা কী করছে সেটা বলা মানে আত্রেয়ীর সুবিধে করে দেওয়া। এই নিয়ে পরে আরও জটিলতা হতে পারে। আহির তাই ওই প্রসঙ্গে আর ঢুকল না। বরং নিজেকে গুছিয়ে নিল। এখানে এসে আজেবাজে আলোচনা করার কোনও মানে হয় না।

এবার ও সরাসরি প্রশ্ন করল, "অনিন্দিতাকে ফোনটা কি তুই করেছিলি?"

"তোর কী মনে হয়?"

"আমি এখানে কী মনে হয় তা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে আসিনি আত্রেয়ী। তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস, ওই টেলিফোনের ইমপ্যাক্ট কতখানি মারাত্মক হতে পারে। আমি তা নিয়ে যথেষ্ট ডিস্টার্বড। তুই সোজা উত্তর দে, ফোনটা কি তুই করেছিলি?"

"না। তবে করিয়েছিলাম। দু' বারই। প্রথম ফোনটা করেছিল দীপঙ্কর। আমি জানতাম, তুই ধরতে পারবি কাজটা দীপঙ্করের করা। এবং ওকে চার্জও করবি। তাই ওকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে তুই চার্জ করলে যেন আমার কথা বলে। আমার দিকে তোকে ঠেলে দেয়। দ্বিতীয় ফোনটাও করেছিল আমার পরিচিত একটা মেয়ে। আমি নই। তবে যেটা আমার হিসেবের বাইরে ছিল, সেটা হল তোর ওই মারধরটা। তুই কি পুরনো রাগের বদলা নিলি? লোকটাকে কিন্তু বেদম পিটিয়েছিস। এখানে ভাল ডাক্তার নেই। বেচারাকে পেন কিলার খেয়ে থাকতে হচ্ছে।"

"তার মানে তুই আর দীপঙ্কর মিলেমিশেই আমায় ফাঁদে ফেলেছিস।"

"ফাঁদে? কোনটা ফাঁদ? রাত দুপুরে আমার পিছু-পিছু থানায় যাওয়াটা ফাঁদ ছিল? খুঁজে-খুঁজে আমার হোটেল বের করাটা ফাঁদ ছিল? নাকি কোম্পানি গার্ডেনে..."

"তুই নিশ্চয়ই আগে থেকে ফোটোগ্রাফার রেডি করে রেখেছিলি! যাতে একেবারে ঠিকঠাক ছবি ওঠে। আমি ছবির সব কপি ডিলিট করে দিয়েছি। তুই কি আলাদা করে কিছু সরিয়ে রেখেছিস?"

আত্রেয়ী ঘাড় কাত করে সায় দিল। বলল, "হ্যাঁ, একটাই ছবি নিজের কাছে রেখে গিয়েছি। ওই চুমু খাওয়ার ছবিটা। তোর আমার কলেজ জীবনের তেমন ছবি নেই। ওই দু'-চারটে। তার মধ্যে বেশির ভাগই বন্ধুদের সঙ্গে। এমন ভাল ছবি কি কেউ ছাড়ে?"

"তুই কেন এটা করলি?" আহির চাপা গলায় গর্জে উঠল। ঠিক তখনই ওদের দু'জনের সামনে দু' কাপ চা রেখে গেল একজন।

আহির একটু থামল। তারপর বলল, "আমার জীবন নষ্ট করে বার বার তুই কী আনন্দ পাস? গতবার দীপঙ্কর। এবার অনিন্দিতা..."

প্রবল ঠান্ডা। আত্রেয়ী চায়ে চুমুক দিল। মুচকি হেসে বলল, "খুব ভালবাসিস অনিন্দিতাকে, তাই না? তা হলে আমার সঙ্গে ঘুরলি কেন? চুমু খেলি কেন? আমি যদি সেদিন তোর হাত ধরে হোটেলের রুমে নিয়ে যেতাম, তুই দিব্যি চলে আসতি। এই সব করার সময় অনিন্দিতার কথা তোর মনে পড়েনি? তখন একবারও বলেছিলি, তোর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে? তুই হলি

"চার দুকানে। যে দোকানটায় আগের দিন দু'জনে বসেছিলাম, সেখানেই রয়েছি।"

আহির ফোন ছাড়ল। পকেটে গাড়ি ভাড়া করার মতো টাকা নেই। এটিএম-এ যেতে হবে। তার আগে ও ফোন করল সঞ্জয়কে।

সব শুনে সঞ্জয় বলল, "এটা একটা ফাঁদও হতে পারে। হয়তো দীপঙ্কর আর আত্রেয়ী হাত মিলিয়েছে। আত্রেয়ী বুঝেছে তোকে পাবে না। অগত্যা দীপঙ্করের সঙ্গে প্যাচআপ করে নেওয়াই ভাল।"

"আমি কী করব?"

"তুই ল্যান্ডৌর যা। আমি এদিকে দেবযানীকে ইনফর্ম করে রাখছি। যদি আত্রেয়ী কোনও ঝামেলা করে, তখন এদিকের সাপোর্ট কাজে লাগবে। তবে আমি বলে দেব, তুই সিগন্যাল না দেওয়া পর্যন্ত কেউ আত্রেয়ীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবে না। কিংবা ল্যান্ডৌর রওনা দেবে না।"

সঞ্জয়ের ফোনটা ছাড়ল আহির। আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য ডুবছে। ঝপ করে এবার অন্ধকার নামবে। আহির পা বাড়াল কাছাকাছি এটিএম-এর দিকে। এবার আত্রেয়ীর সঙ্গে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করা প্রয়োজন।

॥ ২৩ ॥

গাড়ি ভাড়া করে আহির যখন ল্যান্ডৌর পৌঁছল তখন সন্ধে। প্রবল ঠান্ডা। যেন হাত-পা জমে যাবে। চারপাশেও ঘুটঘুটে ভাব। তবে আলো জ্বলছিল। চব্বিশে ডিসেম্বর সন্ধে গড়িয়ে চলেছে রাতের দিকে। ঠান্ডার সঙ্গে বাড়ছে উৎসবের আমেজ। মুসৌরি, ল্যান্ডৌরে হইচই শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে কলকাতার মতো হইচই নয়। অন্তত ল্যান্ডৌরের উৎসবের ধরনই আলাদা। গাড়ি থেকে নেমে আহির দেখল, চার দুকানের সামনে আলো ঝলমল করছে। কিন্তু তার ঠিক গায়েই যে গির্জাটা সেটার দরজা বন্ধ। তবে গির্জার দেওয়ালে আলো লাগানো হয়েছে। জায়গাটাও নিঝুম। গাঢ়, ফিকে নানা ধরনের অন্ধকার সেখানে ছড়িয়ে। এমনকী দিনের বেলা যে বাঁদরগুলোকে দেখা যায়, সেগুলোও নেই। গির্জা চত্বর শুনশান। বড়দিনের আগের সন্ধেয় এমন গির্জা আহির কখনও দেখেনি। চিরকালই ও দেখেছে বড়দিন মানেই গির্জা ঘিরে মাতামাতি। এখানে সেটা তেমন নেই দেখে ও খানিক থমকেই গেল।

পরিবেশের মতো এমন ঠান্ডাও আহিরের অপরিচিত। গ্লাভস পরা হাতও জমে যাচ্ছে। শিরশির করে যে হাওয়া দিচ্ছে সেটা ছুরির মতো ধারালো। সেই ঠান্ডায় আহির এগিয়ে গেল আগের দিন যে রেস্তরাঁয় বসেছিল তার দিকে। সেই রেস্তরাঁর কাছাকাছি পৌঁছে আহির দেখতে পেল আত্রেয়ীকে। রেস্তরাঁর সামনে অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল পাতা। তার একটায় বসে। চুপচাপ। দূরের অন্ধকারের দিকে ও চেয়ে আছে। চারপাশের হইচইয়ে মন নেই। আত্রেয়ী যেখানে বসেছিল, সেখানে আর কেউ নেই। একে ওই রেস্তরাঁটা চার দুকানের একেবারে শেষে। তার উপর আত্রেয়ী বসেছিল রেস্তরাঁর শেষ চেয়ারে। সেই চেয়ারের পরই চওড়া রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে অন্ধকারে। দেখলে মনে হবে, আত্রেয়ীর সামনে বড়দিনের উচ্ছ্বাস। পিছনে ঘন অন্ধকার।

আহির নিজেকে প্রস্তুত করল। এক সন্ধিক্ষণে এসে ও দাঁড়িয়েছে। এখন আত্রেয়ীর সামনে দুর্বল হয়ে পড়লে চলবে না। কারণ, আত্রেয়ী আবার ওর ক্ষতি করতে চাইছে। একবার ক্ষতি করেছিল দীপঙ্করের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে। এবার ক্ষতি করতে চাইছে অনিন্দিতাকে সব জানিয়ে দিয়ে। এখন যদি আহিরের মনে পুরনো প্রেম জেগে ওঠে তা হলে সবার ক্ষতি। সেই ফাঁক দিয়েই আত্রেয়ী পালিয়ে যাবে। আত্রেয়ীকে আজ কোনওভাবেই পালাতে দেওয়া যাবে না। বরং সন্তর্পণে ওকে ঘিরে ফেলতে হবে। যাতে কোথাও গিয়েও আত্রেয়ী বিশেষ সুবিধে করতে না পারে। সোজা কথা আহির বুঝতে পারছিল, আত্রেয়ীকে আজ মারতে হবে। আত্রেয়ীকে না মারতে পারলে ও নিজে মরবে। আত্রেয়ীর সঙ্গে বিচ্ছেদ বিপর্যয়ের পর ও যেভাবে নিজেকে একটু-একটু করে দাঁড় করিয়েছে, নতুন জীবনের দিকে এগোচ্ছে, সেই নতুন জীবন তছনছ হয়ে যাবে। অতএব এমন পরিস্থিতিতে আত্রেয়ীকে রেয়াত করা যাবে না।

আহির চারপাশ তাকাল। গোটা ল্যান্ডৌর জুড়ে এক মায়াবী আলো ছড়ানো। এই আলো শান্তির। ভালবাসার। এখানে কোনও যুদ্ধের হানাহানি নেই। এ এক অন্য বড়দিন। এখানে উচ্ছ্বাস কিংবা ভালবাসা কোনওটাই প্রকট নয়। প্রচ্ছন্ন। আনন্দ যেন ফল্গুধারার মতো বইছে।

আহির পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়াল আত্রেয়ীর উলটো দিকে। ওকে দেখে ঘোর কাটল আত্রেয়ীর। মুখ তুলে ও বলল, "এসেছিস? বোস।"

আহির উলটো দিকের চেয়ার টেনে বসল। আশপাশ দেখল।

আত্রেয়ী হাসল। বলল, "চিন্তা নেই। আমি এখানে একা।"

"আমি তা দেখছি না। আমি দেখছি, চব্বিশে ডিসেম্বর রাতেও কলকাতার মাতামাতি এখানে নেই। জায়গাটা বেশ শান্ত। নিরিবিলি।"

"কলকাতা কলকাতাই। ভাব তো, এখন পার্ক স্ট্রিট চত্বরে কী চলছে!" আহিরের কথার জবাব দিয়ে আত্রেয়ী এবার রেস্তরাঁর মালিককে ইশারায় দুটো হানি জিঞ্জার লেমন টি-র অর্ডার দিল।

আহির এবার প্রসঙ্গে ঢুকল। বলল, "হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে তুই এখানে বসে আছিস? ওদিকে তো ওরা তোকে সারা দিকে খুঁজছে।"

আত্রেয়ী হাসল। বলল, "মাঝে-মাঝে এই ধরনের মজা করতে ভাল লাগে।"

"মজা! তুই কি এখনও স্কুল স্টুডেন্ট? ঘুরতে এসে একটা মেয়ে আচমকা বেপাত্তা। বাকি মেয়েদের উপর দিয়ে কী যাচ্ছে ভাবতে পারছিস! সবাই টেনশনে। সবাই তোর উপর চটেছে।"

"আমি তো সেটাই চাইছি।"

"মানে?"

"মানে, আমি বিপদে পড়েছি ভেবে কে কী করে সেটা এখন আমার দেখে নেওয়া দরকার। তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ওরা কেউ ফিরে যেতে চায়নি? কিংবা পুলিশে ইনফর্ম করেনি?"

"ওখানে এখন দুটো মতামত। দেবযানী চাইছে তোকে খুঁজতে। না পেলে পুলিশে ইনফর্ম করতে। হিয়া আর বিশাখা চাইছে ফিরে যেতে।"

আত্রেয়ী আবার হাসল।

আহিরের মনে হল, ও আবার ভুল করছে। এখন ওর উচিত আত্রেয়ীর সঙ্গে বোঝাপড়া করা। সেটা না করে আত্রেয়ীকে নিয়ে কারা কী করছে সেটা বলা মানে আত্রেয়ীর সুবিধে করে দেওয়া। এই নিয়ে পরে আরও জটিলতা হতে পারে। আহির তাই ওই প্রসঙ্গে আর ঢুকল না। বরং নিজেকে গুছিয়ে নিল। এখানে এসে আজেবাজে আলোচনা করার কোনও মানে হয় না।

এবার ও সরাসরি প্রশ্ন করল, "অনিন্দিতাকে ফোনটা কি তুই করেছিলি?"

"তোর কী মনে হয়?"

"আমি এখানে কী মনে হয় তা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে আসিনি আত্রেয়ী। তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস, ওই টেলিফোনের ইমপ্যাক্ট কতখানি মারাত্মক হতে পারে। আমি তা নিয়ে যথেষ্ট ডিস্টার্বড। তুই সোজা উত্তর দে, ফোনটা কি তুই করেছিলি?"

"না। তবে করিয়েছিলাম। দু' বারই। প্রথম ফোনটা করেছিল দীপঙ্কর। আমি জানতাম, তুই ধরতে পারবি কাজটা দীপঙ্করের করা। এবং ওকে চার্জও করবি। তাই ওকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে তুই চার্জ করলে যেন আমার কথা বলে। আমার দিকে তোকে ঠেলে দেয়। দ্বিতীয় ফোনটাও করেছিল আমার পরিচিত একটা মেয়ে। আমি নই। তবে যেটা আমার হিসেবের বাইরে ছিল, সেটা হল তোর ওই মারধরটা। তুই কি পুরনো রাগের বদলা নিলি? লোকটাকে কিন্তু বেদম পিটিয়েছিস। এখানে ভাল ডাক্তার নেই। বেচারাকে পেন কিলার খেয়ে থাকতে হচ্ছে।"

"তার মানে তুই আর দীপঙ্কর মিলেমিশেই আমায় ফাঁদে ফেলেছিস।"

"ফাঁদে? কোনটা ফাঁদ? রাত দুপুরে আমার পিছু-পিছু থানায় যাওয়াটা ফাঁদ ছিল? খুঁজে-খুঁজে আমার হোটেল বের করাটা ফাঁদ ছিল? নাকি কোম্পানি গার্ডেনে..."

"তুই নিশ্চয়ই আগে থেকে ফোটোগ্রাফার রেডি করে রেখেছিলি! যাতে একেবারে ঠিকঠাক ছবি ওঠে। আমি ছবির সব কপি ডিলিট করে দিয়েছি। তুই কি আলাদা করে কিছু সরিয়ে রেখেছিস?"

আত্রেয়ী ঘাড় কাত করে সায় দিল। বলল, "হ্যাঁ, একটাই ছবি নিজের কাছে রেখে গিয়েছি। ওই চুমু খাওয়ার ছবিটা। তোর আমার কলেজ জীবনের তেমন ছবি নেই। ওই দু'-চারটে। তার মধ্যে বেশির ভাগই বন্ধুদের সঙ্গে। এমন ভাল ছবি কি কেউ ছাড়ে?"

"তুই কেন এটা করলি?" আহির চাপা গলায় গর্জে উঠল। ঠিক তখনই ওদের দু'জনের সামনে দু' কাপ চা রেখে গেল একজন।

আহির একটু থামল। তারপর বলল, "আমার জীবন নষ্ট করে বার বার তুই কী আনন্দ পাস? গতবার দীপঙ্কর। এবার অনিন্দিতা..."

প্রবল ঠান্ডা। আত্রেয়ী চায়ে চুমুক দিল। মুচকি হেসে বলল, "খুব ভালবাসিস অনিন্দিতাকে, তাই না? তা হলে আমার সঙ্গে ঘুরলি কেন? চুমু খেলি কেন? আমি যদি সেদিন তোর হাত ধরে হোটেলের রুমে নিয়ে যেতাম, তুই দিব্যি চলে আসতি। এই সব করার সময় অনিন্দিতার কথা তোর মনে পড়েনি? তখন একবারও বলেছিলি, তোর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে? তুই হলি

জাত সেয়ানা। ধর্মেও আছিস, জিরাফেও আছিস। আর আমি যদি দীপঙ্করকে দিয়ে ফোন করাই, তখন তোর পৌরুষ জেগে ওঠে। চমৎকার!"

"তুইও তো আমায় অনেক কিছু বলিসনি," আহির এবার পালটা আক্রমণ করল, "তোর সঙ্গে যে দীপঙ্করের ছাড়াছাড়ি হয়নি, তুই যে আজও দীপঙ্করের সঙ্গে জুড়ে আছিস, এটা আমায় জানিয়েছিলি?"

"তোকে এসব কথা কে বলেছে?"

"যে-ই বলুক। কথাগুলো কি সত্যি নয়?"

আত্রেয়ী হাসল। কাপে আবার লম্বা চুমুক দিল। একবার দূরের অন্ধকারে দিকে তাকাল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "সত্যি জিনিসটা বড় গোলমেলে। আমার কাছে যা সত্যি, তোর কাছে সেটা সত্যি নয়। তুই কনসিভ করা হবু বউকে ফেলে আমার সঙ্গে দিব্যি প্রেম করছিলি। তা নিয়ে তোর কোনও বিবেক দংশন ছিল না। অথচ সেই খবরটা তোর হবু বউয়ের কানে তুলে দিতেই তোর মনে হল, আমি মেয়েটা খারাপ। আবার আমি মনে করছি, তুই খারাপ। সব চেপে আমার সঙ্গে ফূর্তি করছিস মুসৌরিতে এসে। সত্যিটা ডিপেন্ড করে পার্সপেক্টিভের উপর।"

"তার মানে তুই বলতে চাইছিস, যা করেছিস ঠিক করেছিস। তাই তো?"

"আমি শুধু বলতে চাইছি, প্রতিটি মানুষের কাছে সত্যিটা আলাদা। রাসবিহারী বসু ছিলেন আমাদের চোখে বিপ্লবী। ব্রিটিশদের কাছে সন্ত্রাসবাদী। কোনটা সত্যি?"

আত্রেয়ী হয়তো আরও কিছু বলত। তার আগেই টেবিলে রাখা ওর মোবাইল বেজে উঠল। আহির দেখল আত্রেয়ীর ফোনের স্ক্রিনে দীপঙ্করের নাম ভাসছে।

মোবাইলটা হাতে নিল আত্রেয়ী। আহিরের দিকে অল্প হেসে বলল, "তোর কম্পিটিটর। কিংবা ব্ল্যাকমেলার। দাঁড়া লাউডস্পিকারে দিই। কথাগুলো তোরও শোনা দরকার।"

আত্রেয়ী ফোনটা লাউডস্পিকারে দিতেই ওপাশ থেকে দীপঙ্করের কর্কশ গলা ভেসে এল, "তুমি কোথায়?"

আত্রেয়ী একবার আহিরকে দেখল। গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, "বলব না।"

"বলবি না মানে! তোর জন্য আমার আজ এই অবস্থা। শালা, কলেজে একজনকে নাচিয়েছিলি। আমায় নাচিয়েছিস। এখন মুসৌরিতে এসে আবার নতুন খেলা শুরু করেছিস। কী ভেবেছিসটা কী!"

"তোমার কি কিছু বলার আছে? না হলে ফোনটা রাখো।"

"রাখব না। কী করবি? আমি ল্যান্ডৌর যাচ্ছি। কী ভেবেছিলি, আমি খবর পাব না? আমার কাছে সব খবর আছে। এখনও সময় আছে। বল, নাগরকে নিয়ে কোন কটেজে উঠেছিস ফূর্তি মারতে? না হলে তোর কপালে অশেষ দুঃখ। বিয়ের পর একবার তোকে চুলের মুঠো ধরে পিটিয়েছিলাম, মনে পড়ছে? আবার তোকে ওইভাবে মারতে-মারতে কলকাতা নিয়ে যাব।"

আত্রেয়ী ফোনটা কেটে দিল।

আহির হতভম্ব। কোনওমতে বলল, "এ লোকটা তো জানোয়ারের অধম।"

আত্রেয়ী হাসল। বলল, "একটু আগের পার্সপেক্টিভের কথা বলছিলাম না! এখন বুঝতে পারছিস, সত্যিটা কী?"

আহির কোনও জবাব দিতে পারল না।

আত্রেয়ী বলল, "তুই নিশ্চয়ই ওখানে জানিয়েই ল্যান্ডৌরে এসেছিস?"

"হ্যাঁ, সঞ্জয়কে বলেছিলাম।"

"সেখান থেকেই হিয়ার মাধ্যমে খবর পেয়েছে দীপঙ্কর। এবার ও ল্যান্ডৌরে আসছে।"

আহিরের চোয়াল শক্ত হল। বলল, "আসতে দে। আমি আছি।"

আত্রেয়ী হাসল। বলল, "তিন-চারদিন আগে হলে আমি তাই ভাবতাম। এখন ভাবি না। এখন এটা আমার আর দীপঙ্করের বোঝাপড়া। চিন্তা করিস না। আমি জানি কীভাবে দীপঙ্করকে ট্যাকেল করতে হয়।"

আহির তবু হাত রাখল আত্রেয়ীর হাতে। আত্রেয়ী নিজের হাত সরিয়ে নিল। বলল, "চল উঠি। একটু হাঁটি। দীপঙ্কর রওনা দিয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে। ততক্ষণ আমরা একটু গল্প করি।"

আহির আর কিছু বলল না। আত্রেয়ীই চায়ের বিল মেটাল। তারপর দু'জন পা বাড়াল অন্ধকার রাস্তার দিকে।

॥ ২৪ ॥

অন্ধকার রাস্তায় খানিক এগোতেই চারপাশ নিঝুম হয়ে এল। উৎসবের শব্দেরা পিছিয়ে পড়তে থাকল। মিশমিশে অন্ধকারে দু'জন হাঁটতে থাকল। এখন কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। শুধু পায়ের শব্দে পরস্পরের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে।

আহির এবার নিচু স্বরে বলল, "কেন এমন করলি?"

"তোর জন্য," আত্রেয়ী একটু থেমে বলল, "তোকে পেয়ে ভেবেছিলাম, সব নতুন করে শুরু করব। একেবারে গোড়া থেকে... কিন্তু তখন কী জানতাম যে তুই আসলে আমায় পেয়ে অনিন্দিতাকে ভুলে গিয়েছিস..."

আহির কোনও কথা বলতে পারল না। খানিক থেমে ও বলল, "কিন্তু দীপঙ্কর?"

"আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল," আত্রেয়ীর হাসি শোনা গেল অন্ধকারে, "মানুষ কী ভাবে, কী হয়! এর পিছনে অবশ্য মায়েরও খানিকটা ভূমিকা ছিল। সেটা মা বুঝতে পেরেছে এখন। তাই আমার অবস্থা দেখে কষ্ট পায়। তোর খোঁজ করে। কিন্তু ভুল তো ভুলই। সে কি আর শোধরানো যায়?"

"কিন্তু ভুলটা হল কীভাবে?"

"তুই তখন লেখাপড়ায় মন দিলি। আমিও ঝোঁকের মাথায় সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি চিরদিনই একটা নির্ভরতা খুঁজেছি। ভাঙা পরিবারে মানুষ হয়েছি তো। ইনসিকিউরিটি ব্যাপারটা ভিতরে ঢুকে ছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছুদিন বাদেই উপলব্ধি করলাম, বিরাট গোলমাল হয়ে গিয়েছে। দীপঙ্করকে অফিসে দেখে কিংবা রাস্তায় ঘুরে যা ভেবেছিলাম, ও একদমই তা নয়। তবু মানিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। কারণ, আমি জানতাম ফেরার রাস্তা আমিও ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়েই এসেছি। এখন আমাকে এই রাস্তাতেই হাঁটতে হবে। শেষে এমন অবস্থা হল যে, না পারলাম ধরে রাখতে, না পারলাম ছাড়তে। সেই সময় আমার প্রাণান্তকর অবস্থা। শুনলি তো খানিক আগে কী ছিল দীপঙ্কর!"

"তখন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলি না কেন?" অন্ধকারেই একবার আত্রেয়ীর দিকে তাকাল আহির। অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে। কিন্তু আত্রেয়ীর অবয়বটুকুই ওর চোখে পড়ল। বাকি কিছু দেখা গেল না।

আত্রেয়ী মাথা নাড়ল। নাক টানল একবার। বলল, "সাহসে কুলোয়নি। একদিন মাঝরাস্তায় তোর হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু খবর রাখতাম। তোর জীবন যে তছনছ হয়ে গিয়েছে, সেটা জানতে পেরেছিলাম। তাই তোর সামনে যাওয়ার মতো মনের জোর আমার ছিল না। তুই যে বলেছিলি না, আমার কাছে তুই অনিন্দিতার কথা বলতে ভয় পেয়েছিলি। সেই ভয়টাকে চিনি। আমারও একই ভয় হয়েছিল তোর সামনে দাঁড়ানোর কথা ভাবলে।"

"তা হলে মুসৌরিতে এসে হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়েছিলি কেন?"

"আচমকা তিহরি লেকে তোকে দেখে বুকটা ধক করে উঠেছিল। ভাবলাম, না চাইতেই একটা সুযোগ পেয়েছি। এটা কাজে লাগাতে হবে। যেদিন রাতে থানায় গেলাম, সেদিন খেয়াল করলাম তুই পিছু নিয়েছিস। তখন নিশ্চিত হলাম, আমার প্রতি তোর টান কমেনি। সেটা ভালবাসার হতে পারে, ঘৃণার হতে পারে। তবে টান আছে। চেষ্টা করলাম সেই টানটাকে ব্যবহার করতে।"

আত্রেয়ী থামল। দু'জনের ততক্ষণে হাঁটতে-হাঁটতে লাল টিব্বার কাছাকাছি চলে এসেছে। এখানে রাস্তায় আলো আছে। যদিও লোকজন নেই।

আহির বলল, "তারপর?"

"তারপর তোর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে কথা বললাম। দেখলাম, তুইও রাজি নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে। তখন ভেবে দেখলাম, হুট করে যদি বলি, আমার ডিভোর্স হয়নি, তুই পিছিয়ে যাবি। কিছুটা সত্যি, কিছুটা মিথ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে একটা গল্প দাঁড় করালাম। তোকে ভুলতে পারিনি বলে আমাদের ছাড়াছাড়ি এই গল্পটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। এটা ঠিক যে, তুই কখনওই সরাসরি আমার আর দীপঙ্করের মাঝখানে আসিসনি। আবার এটাও ঠিক, দীপঙ্করের সঙ্গে কিছুদিন থাকার পরই আমার তোর কথা খুব মনে পড়ত। তাই তোর খোঁজখবর রাখা শুরু করেছিলাম। এবং দীপঙ্করের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর আমি নতুন কারও সঙ্গে না জড়িয়ে তোর কাছেই ফিরতে চেয়েছিলাম।"

লাল টিব্বার একটা আলোর নীচে দু'জনে এসে দাঁড়াল। শীতের রাত। তবু দু'জনের বেশ গরমই লাগছিল।

আহির বলল, "কিন্তু তুই যা বলছিস আর যা দেখছি, দুটো কিন্তু মিলছে না!"

"আমি তো সব কথা শেষ করিনি," আত্রেয়ী বলল, "মুসৌরিতে আসার সময় আমি জানতাম না, তোর সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু মুসৌরিতে তোকে দেখে

বন্ধুদের সব কথা জানিয়েছিলাম। হিয়ার হাজব্যান্ড যে দীপঙ্করের বন্ধু এবং ও যে দীপঙ্করকে সব খবর দেবে, এটা গ্রুপের কেউ ধরতে পারেনি। বিশাখা সাতে-পাঁচে থাকে না। আমার আর তোর সম্পর্ক গড়ে উঠছে দেখে হিয়াই ফোন করেছিল দীপঙ্করকে। তবে হিয়া বোধ হয় পুরো ব্যাপারটা বলেনি। শুধু বলেছিল, দীপঙ্কর যদি এখানে এসে আমায় না নিয়ে যেতে পারে, তা হলে আর কোনওদিন পারবে না। সেই টানেই দীপঙ্করে দ্রুত উড়ে এসেছে।"

"কিন্তু দীপঙ্কর তোকে ডিভোর্স দিতে চাইছে না কেন?"

"দীপঙ্করের বাজারে কত ধার-দেনা জানিস? ফ্ল্যাট, গাড়ির ইএমআই আছে। নেশাভাঙের খরচ আছে। এখন রোজগেরে বউ পাশ থেকে সরে গেলে ও পথে বসবে। আগের প্রেম তো বিয়ে করে আমেরিকায়। তার উপর ডিভোর্সে আমি মোটা টাকা খোরপোশ চাইব। এই ভয়ও কাজ করছে।"

আহির আর কিছু বলল না। শুধু প্রস্তাব দিল, "চল হাঁটি।"

আবার লাল টিব্বা ছেড়ে ওরা অন্ধকার রাস্তার দিকে এগোল।

আত্রেয়ী বলল, "মুসৌরিতে এসে দীপঙ্কর জানতে পারল তোর আমার সম্পর্কের কথা। প্রথমে ও সামনে আসেনি। আড়াল থেকে আমাদের ফলো করেছে। ছবি তুলেছে। তারপর এসেছে। প্রথমে ভয় দেখিয়েছে। আমি পাত্তা দিইনি সেই ভয়ে। তারপর দীপঙ্কর তোর ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছে।"

"নিল কীভাবে?"

"কলকাতায় কতগুলো ডিটেকটিভ এজেন্সি আছে জানিস? ওরা এই ধরনের কাজই করে থাকে। কার বউ কার সঙ্গে গোপনে ডেটিং করছে, কার স্বামী অফিসের কাজে বিদেশ না গিয়ে সেক্রেটারির সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছে, এই সব ওই সংস্থার গোয়েন্দারা জোগাড় করে দেয়। তেমন এক এজেন্সি দীপঙ্করকে তোর ডিটেলস দিয়েছে। সেই সব খবর জোগাড় করে ও এসে আমায় জানিয়েছিল, 'কার পিছনে ছুটছ? তার তো সামনে বিয়ে!' বিশ্বাস কর, এই ধাক্কাটা আমি নিতে পারিনি। আমি তখন তোর প্রেমে মশগুল। নতুন করে তোর সঙ্গে জীবন শুরু করব। প্রেগন্যান্সি প্ল্যানিং করব। কল্পনায় আমি তখন উড়ছি। সেই সময় যদি এমন খবর কানে আসে, তা হলে যা হওয়ার তাই হয়েছিল। আমি মনে করেছিলাম, একদিন আমি যেমন তোকে ঠকিয়েছি, আজ তুই তার প্রতিশোধ নিলি। এর পরের সব কথা তো তুই জানিসই..."

"না, সব জানি না। দীপঙ্কর যে আমায় ব্ল্যাকমেলিং করতে চাইল সেটা কি তোর প্ল্যান?"

"না। দীপঙ্কর আমার কাছে সুবিধে করতে না পেরে তোর কাছে গিয়েছিল। তুই যেদিন আমায় ডেকে সব বললি, সেদিন আমিও এই সব কথা বলতে পারতাম। কিন্তু তোর প্রতি আমার সব বিশ্বাস চলে গিয়েছিল। তবে দীপঙ্কর যে অত নোংরা প্ল্যান করতে পারে, আমি ভাবিনি। তোর সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝেছিলাম, দীপঙ্কর সহজে থামবে না। আরও ঘোঁট পাকাবে। আমারও তখন তোর প্রতি খুব রাগ। আমি তখন ছক কষলাম, এক ঢিলে দুই পাখি মারব। দীপঙ্করকে বললাম, 'তুমি যদি চাও আমি তোমার সঙ্গে ফেরত যাব, তা হলে অনিন্দিতাকে ফোন করে সব জানাও।' দীপঙ্কর ইতস্তত করছিল। হাজার হোক, অনিন্দিতার পরিবার যদি পুলিশের কাছে যায়, দীপঙ্কর ফেঁসে যাবে। কিন্তু তবু ও রাজি হয়েছিল। আমাকে এখন না পেলে ও পথে বসবে। কিন্তু তখনও আমি জানতাম না, অনিন্দিতা কনসিভ করেছে। সেটা আজ বিকেল দিকে আমায় জানাল দেবযানী। সেটা জানার পর বুঝতে পারলাম, বিরাট ভুল করেছি। এই অবস্থায় মেয়েটাকে ওই পরিস্থিতিতে ফেলা আমার উচিত হয়নি।"

আত্রেয়ী থামল। অন্ধকারে ওর শরীর তির তির করে কাঁপছিল। আহির বুঝতে পারল, আত্রেয়ী কাঁদছে। আহির কিছু বলল না। আত্রেয়ীকে কাঁদতে দিল। কাঁদলে মন হালকা হয়। খানিকক্ষণ কাঁদার পর আত্রেয়ী থামল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল।

আহির বলল, "তারপর তোর অনুশোচনা হল। সেই অনুশোচনায় ফোন করে আমায় এখানে ডাকলি। তাই তো?"

মাথা নেড়ে সায় দিল আত্রেয়ী। একবার জোরে নাক টানল। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল, "অনিন্দিতাকে বলিস, আমায় যেন ভুল না বোঝে। আমি যদি সবটুকু জানতাম, তা হলে কিছুতেই এগোতাম না তোর দিকে।"

"তুই এখন কী করবি?"

"জানি না। তবে দীপঙ্করের সঙ্গে আর ফিরব না। সব কিছু নতুন করে শুরু করব। চিন্তা একটাই, মাকে নিয়ে। মায়ের বয়স হয়েছে। আমার অবস্থা দেখে মা তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছে।"

"আমি একবার যাব কাকিমার কাছে?"

"না। তুই আর আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখবি না। আজ রাতের পর তুই তোর রাস্তায় বেরিয়ে যাবি। আমি আমার রাস্তায়। একবার যে ভুল না জেনে করে ফেলেছি, সেই ভুল জেনেশুনে করতে পারব না।"

দু'জনের সব কথা ফুরিয়ে গেল। নিঃশব্দে ওরা পরস্পরের পাশাপাশি হাঁটতে থাকল। এক সময় আহির বাঁ হাতের গ্লাভস খুলে ফেলে আত্রেয়ীর হাত ধরল। আত্রেয়ী একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়ল প্রথমে। তারপর ধীরে-ধীরে ডান হাতের গ্লাভস খুলে ও ধরল আহিরের হাত। ল্যান্ডৌরের কবরখানার রাস্তায় অন্ধকারে দু'জন পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে চলল কেলগস গির্জার দিকে।

আহির টের পেল পরস্পরের স্পর্শে ওদের ঠান্ডা হাত উষ্ণ হয়ে উঠছে। দূরে কোথাও ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। আহির আলতো চাপ দিল আত্রেয়ী হাতে। আত্রেয়ীও সাড়া দিল। অন্ধকার রাস্তায় দু'জন থমকে দাঁড়াল। মাথা উপর কাচের গুঁড়োর মতো তারা ছড়িয়ে। এক পাশে সারি-সারি কবর। আদিম গাছেরা। সেই তারা ভরা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আহির দেখতে পেল না আত্রেয়ীকে। তবু আত্রেয়ীর স্পর্শ ওকে জানিয়ে দিল, আত্রেয়ী আছে। এত অন্ধকারেও ওর পাশেই আছে। আহির এবার মুখ নিচু করে গভীরভাবে চুমু খেল আত্রেয়ীকে। অন্ধকারে আত্রেয়ীও আঁকড়ে ধরল আহিরকে।

কতক্ষণ যে দু'জন পরস্পরের ঠোঁটে ডুবেছিল আহিরের খেয়াল থাকল না। আত্রেয়ীও কি হিসেব রেখেছে? মনে হয় না। আহিরের মনে হল, জন্মজন্মান্তর। যেন আকাশের অন্ধকার, চারপাশের অন্ধকার সব মিলিয়ে এক মহাবিশ্বের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'জন পরস্পরকে ভালবেসে যাচ্ছে। যুগের পর-যুগ। শতাব্দীর পর-শতাব্দী। জীবনের পর-জীবন। এই ভালবাসা ফুরোনোর নয়।

এক সময় আত্রেয়ী আলাদা হল। ফিসফিসিয়ে বলল, "আর না। এবার তুই না থামলে আমি হেরে যাব। এবার তুই যা।"

আহির আবার গ্লাভস পরল। আবার ওরা হাঁটতে লাগল পুরনো পথে।

কিছু দূর যাওয়ার পর আত্রেয়ী বলল, "আমি হয়তো আর কখনও তোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখব না। তবে একটা জিনিস আমার কাছে থেকে যাবে।"

"কী?" ভাঙা গলায় আহির বলল।

আত্রেয়ী পকেট থেকে মোবাইল বের করল। তারপর দীপঙ্করের তোলা ওদের চুমু খাওয়ার ছবিটা বের করে আহিরের সামনে ধরল। বলল, "এটা নিয়েই আমি নতুন করে সব সাজাব।"

আহির কিছু বলতে পারল না। শুধু বুঝল, সব সম্পর্ক ঠিক জোড়া কিংবা ছাড়ার নিরিখে হয় না। তার বাইরেও অনেক কিছু থেকে যায়।

॥ ২৫ ॥

জলি গ্রান্ট বিমানবন্দরে আহিররা যখন পৌঁছল তখনও প্লেন ছাড়তে ঘণ্টা দুই বাকি। ছোট এয়ারপোর্ট। চেক-ইন করতে বেশি সময় লাগল না। তা ছাড়া প্লেনে ওঠার একটাই গেট। ফলে এদিক ওদিক যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আহির আর সঞ্জয় যাবতীয় মালপত্র জমা দিয়ে ঝাড়া হাত-পায়ে এসে এয়ারপোর্টের ভিতরে বসল।

সঞ্জয় একবার আড় চোখে দেখল আহিরকে। আহির ভাবলেশহীন। সঞ্জয় উশখুশ করতে থাকল। গত পরশু রাতে ল্যান্ডৌর থেকে ফেরার পর থেকে আহির মুখে কুলুপ এঁটেছে। কী যে হয়েছিল ল্যান্ডৌরে সঞ্জয় জানে না। কিন্তু ল্যান্ডৌর থেকে ফিরে আহির একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে সেটা সঞ্জয় লক্ষ করেছে।

আহির চুপচাপ বসেছিল। আজ আবহাওয়া ভারী চমৎকার। সামনে একটা বিরাট বড় প্লেন দাঁড়িয়ে। সহজে এত কাছ থেকে এত বড় প্লেন দেখা যায় না। দমদম কিংবা মুম্বই বড় এয়ারপোর্ট। ওখানে বিমানগুলো দূরে-দূরে থাকে। জলি গ্রান্টের মতো ছোট এয়ারপোর্ট বলেই বোধ হয় প্লেনটাকে এত চমৎকার দেখা যাচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখতে-দেখতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আহির। আজ আত্রেয়ীদের হরিদ্বার বেরিয়ে যাওয়ার কথা। গেল কি? সেটা আর জানার কোনও উপায় নেই। ল্যান্ডৌর থেকে ফেরার পর শুধু আত্রেয়ী নয়, ওদের দলের অন্য কোনও মেয়েই আহিরের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। সঞ্জয়ের সঙ্গে করেছে কিনা আহির জানে না। এমনকী দীপঙ্করেরও কোনও পাত্তা নেই। আজ সকালে গাড়িতে করে মুসৌরি ছেড়ে দেরাদুন আসতে-আসতে আহিরের মনে হচ্ছিল আত্রেয়ী কিংবা মুসৌরির ঘটনাগুলো যেন আরব্য রজনীর কোনও গল্প। যা রাত ফুরোতেই শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

এর পর আহির আর কোনওদিন মুসৌরিতে আসতে পারবে না। তিহরি তাল, কোম্পানি গার্ডেন, বুদ্ধ মন্দির কিংবা কেম্পটি ফলসে গেলে ওর আবার মনে পড়ে যাবে আত্রেয়ীকে। নিজেকে সামলাতে পারবে না ও। হয়তো আবার

আত্রেয়ীকে ফোন করে বসবে। হয়তো আবার কোনও ভুলভাল কিছু করে বসবে। জীবনে একবার ভুল করলে তার মাশুল বইতে হয় বাকি জীবন। আত্রেয়ীর জন্য তাই মাঝে-মাঝেই কষ্ট হচ্ছে আহিরের। মেয়েটা এবার কী করবে? দীপঙ্করকে যতটুকু দেখেছে তাতে ওর মতো লোক সহজে আত্রেয়ীর পিছু ছাড়বে না। হয়তো বাকি জীবন আত্রেয়ীর ছারখার করে দেবে।

আহিরের খারাপ লাগল আত্রেয়ীর মায়ের জন্যও। মেয়েকে বেশি ভাল পাত্রের হাতে দিয়ে গিয়ে ভদ্রমহিলা যে ভুল করেছেন তা নিয়ে তিনি আজও পস্তাচ্ছেন। একদিন নিজের স্বামীকে হারিয়েছিলেন তিনি। সেটাও এমন কোনও ভুল কিনা আহির জানে না। তবে বিচ্ছেদের পর আত্রেয়ীর বাবা মানে ভদ্রমহিলার স্বামী ফের নতুন জীবন শুরু করেছিলেন। তিনি কিন্তু করেননি। মেয়েকে ঘিরেই বেঁচেছেন। মেয়েই চিরদিন তাঁর অবলম্বন। তাঁর ভালবাসা। তাঁর সব। এখন তাঁর ভুলে মেয়ের জীবনও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শেষ বয়সে সেটাও দেখতে হচ্ছে তাঁকে। এ কষ্ট বড় কষ্ট।

তবে আহির আর ভুল করেনি। ল্যান্ডৌর থেকে ফিরতে রাত হয়েছিল। তা ছাড়া সেই রাতে কারও সঙ্গে কথা বলার মতো মানসিকতা ওর ছিল না। তাই বড়দিন সকালে উঠে সবার আগে ও ফোন করেছিল অনিন্দিতাকে। তারপর মুসৌরিতে যা-যা হয়েছে সব অকপটে জানিয়ে দিয়েছিল মেয়েটাকে। ফোনটা করার আগে একটু ইতস্তত ভাব কাজ করেছিল ওর ভিতরে। আচমকা এই কথাগুলো শুনে যদি অনিন্দিতা এমন কিছু করে বসে যাতে ওদের সন্তানের ক্ষতি হয়? কিংবা হয়তো অনিন্দিতাই সম্পর্কে ভেঙে দিতে চাইল!

সব কথা অনিন্দিতাকে বলার পর নিজের মধ্যে থাকা এই ভয়গুলোর কথাও আহির জানিয়ে দিয়েছিল। আহির মনে-মনে ঠিক করে নিয়েছিল, যা হওয়ার হোক। কিন্তু এবার আর কোনও লুকোচুরির রাস্তায় ও হাঁটবে না। অনিন্দিতার সামনে গিয়ে ওর চোখে চোখ রেখে যেন আহির দাঁড়াতে পারে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে আহির সব বলেছিল। কোনও খুঁটিনাটি বাদ দেয়নি। শুনে অনিন্দিতা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেনি। তারপর নীরবতা ভেঙে বলেছিল, "আত্রেয়ীর জন্য খারাপ লাগছে। এবার ও কী করবে?"

"আমি জানি না," আহির উত্তর দিয়েছিল।

অনিন্দিতা বলেছিল, "আমি কি একবার কথা বলব?"

বাধা দিয়েছিল আহির। বলেছিল, "আমি যতটুকু বুঝেছি, আত্রেয়ী তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলবে না। বরং তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে।"

"তুমি এখন কী ভাবছ?" অনিন্দিতা জানতে চেয়েছিল।

"আমি? আমি কাল ফিরছি," আহির এক নিশ্বাসে জবাব দিয়েছিল। কথাটা উচ্চারণের সময় ও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল কলকাতা শহরটাকে। শহরটাকে যে ও এত ভালবাসে সেটা মুসৌরিতে দশদিন না থাকলে টের পেত না। এখন এই পাহাড়ি পরিবেশে আহিরের আর থাকতে ইচ্ছে করছিল না।

অনিন্দিতা হেসেছিল। বলেছিল, "কবে দেখা হবে?"

"কালই।"

"কখন?"

"আমাদের পৌঁছতে সন্ধে হবে। ভায়া লখনউ আমাদের ফ্লাইট। মাঝে কিছুক্ষণ লখনউ এয়ারপোর্টে বসে থাকতে হবে। তবে চিন্তা কোরো না। আমি ফিরেই বাড়িতে সব জানাচ্ছি।"

"সব জানাচ্ছ মানে? মুসৌরিতে যা করে এলে সেই সব?"

"না। তোমার কনসিভ করার খবরটা। বিয়ের তারিখ তো এগিয়ে আনতে হবে। আমাদের বিয়ের এখন যে ডেট ঠিক হয়েছে তখন তোমার চার মাস চলবে। ভাবো, বিয়ের কনে চার মাসের বাচ্চা নিয়ে..."

"যাহ," অনিন্দিতা ফোনের অপরপ্রান্তে ফুলে-ফুলে হাসছিল।

"অতএব আমায় বাড়িতে সব জানাতে হবে।"

"তুমি, বাবা-মা সবাই বলছ বিয়ের ডেট এগিয়ে আনতে হবে। কিন্তু এই যে এতজন আত্মীয়স্বজন রয়েছে, তারা যদি জানতে চায় হঠাৎ কী এমন হল যে, বিয়ের ডেট এগিয়ে আনতে হচ্ছে? তখন কী জবাব দেবে?"

এবার আহির হেসে ফেলেছিল। বলেছিল, "যা সত্যি তাই বলব।"

"তুমি আগে গিয়ে নিজের বাবা-মাকে ব্যাপারটা বলো। দেখি সেটা কীভাবে পার। তারপর ভাববে আত্মীয়দের কীভাবে সব বলবে।"

জলি গ্রান্টে বসে আহিরের মনে হল, অনিন্দিতা ভুল বলেনি। বাবা কিংবা মায়ের সামনে গিয়ে কথাটা বলা সহজ হবে না। এয়ারপোর্টে বসে-বসেই আহির এক-দু'বার মহড়া দিতে চাইল। কীভাবে কথাটা শুরু করবে, "বাবা, তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। বিয়ের তারিখ এগিয়ে আনতে হবে।"

বাবা হয়তো অবাক হয়ে বলবেন, "কেন?"

তখন? তখন ঠিক কী বলবে আহির? "তোমাদের বউমার বাচ্চা হবে!" নাকি একটু কায়দা করে বলবে, "আসলে একটু গন্ডগোল হয়ে গিয়েছে। অনিন্দিতা কনসিভ করেছে..."

আচ্ছা যদি একটু নাটুকে কায়দায় বলা যায়, "মা, মাঝে একদিন নিজেদের সামলাতে পারিনি। তোমার বউমা প্রেগন্যান্ট।"

কথাটা মনে-মনে উচ্চারণ করেও ঘেমে উঠল আহির। সব ক'টা বলাই বড্ড কাঁচা হয়ে যাচ্ছে। কেমন-কেমন শোনাচ্ছে।

বাবা কিংবা মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে হবু বউকে গর্ভবতী বলাটা বেশ কঠিন কাজ। অনিন্দিতা কীভাবে ওর মায়ের কাছে কথাটা পাড়ল কে জানে! বোধ হয় টেনশনে ছিল তাই ঝপ করে বলে দিতে পেরেছে। টেনশনে না থাকলে বলতে পারত না।

আহির ঠিক করল, কলকাতায় নেমে আগে অনিন্দিতার কাছে গিয়ে রিহার্সাল দিয়ে নেবে। তারপর বাড়ি ফিরে বাবা কিংবা মাকে, মানে যাকে বলা সোজা হবে, তাঁকে বলে ফেলবে। একেবারে চোখ বন্ধ করে। বাবা-মা প্রথমে অপ্রস্তুত হলেও পরে নিশ্চয়ই মেনে নেবেন ব্যাপারটা।

কথাটা ভাবতে-ভাবতে নিজের মনেই হাসল আহির। একটা নতুন প্রাণ ধীরে-ধীরে বড় হচ্ছে। আর কিছুদিন বাদেই সে পৃথিবীতে আসবে। কেউ কোনওদিন জানবেও না, সেই প্রাণ কীভাবে আরও দুটো প্রাণকে এক সূত্রে জুড়ে দিয়ে গেল।

সঞ্জয় বসে-বসে দেখছিল আহির একা ফিক ফিক করে হাসছে। এবার ও টোকা মারল আহিরের পিঠে। বলল, "কী রে, কী ভাবছিস?"

আহির হাই তুলল। বলল, "কত কথা মাথায় ঘোরে! এদিকে কিছু বলল?"

"এবার বলবে," সঞ্জয় ঘড়ি দেখে বলল, "ফ্লাইটের সময় তো হয়ে এল।"

আহির আড়মোড়া ভাঙল। বলল, "কফি খাবি?"

"সে খেতে পারি। কিন্তু তার জন্য একেবারে ওই কোণে যেতে হবে। কাছাকাছি আর কোনও স্টল নেই।"

"চল তা হলে।"

আহির আর সঞ্জয় উঠে পড়ল। কফিশপের সামনে এসে দুটো কফি নিল। কফিতে চুমুক দিয়ে সঞ্জয় বলল, "তুই কিন্তু আমায় কিছুই জানালি না।"

"জানানোর কিছু নেই। দ্য গেম ইজ় ওভার। এবার কলকাতায় ফিরব। বিয়ের তারিখ এগিয়ে আনতে হবে।"

সঞ্জয় বলল, "ঠিক আছে। তবে তোকে একটা খবর জানিয়ে রাখি। আমি কাল দেবযানীকে ফোন করেছিলাম। তুই বলিসনি তো কী হয়েছে, দেবযানী তো জানতে পারবে আত্রেয়ীর কাছ থেকে, ওর থেকেই ব্যাপারটা জানব।"

আহির কিছু বলল না। শুধু সপ্রশ্ন চোখে তাকাল সঞ্জয়ের দিকে।

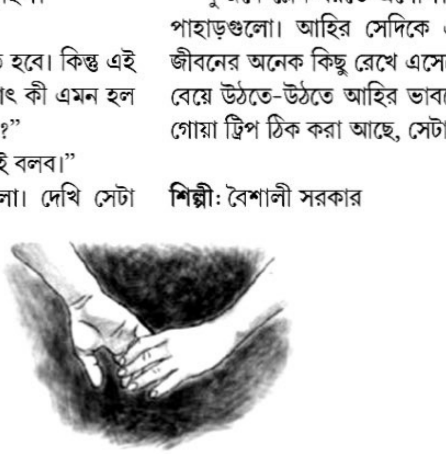
সঞ্জয় বলল, "কিন্তু ফোনটা করে বুঝলাম দেবযানী আমার নম্বর ব্লক করে দিয়েছে। অন্য কোনও নম্বর থেকে ফোনটা করাই যেত। কিন্তু করলাম না। রুচিতে বাধল। তা ছাড়া যে আমায় ব্লক করেছে তার সঙ্গে কথা বলতে যাওয়াটা ঠিক নয়।"

আহির কফি খেতে থাকল। এমন সময় ওদের ফ্লাইটের ঘোষণা হল।

সঞ্জয় কফিটা গলায় ঢেলে বলল, "চল।"

দু'জনে প্লেন ধরতে এগোল। ফাঁকা জায়গা আসতেই দেখা গেল দূরের পাহাড়গুলো। আহির সেদিকে একবার তাকাল। ওই পাহাড়ের কাছে ও জীবনের অনেক কিছু রেখে এসেছে। এবার ঘরে ফেরার সময়। প্লেনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে আহির ভাবতে থাকল বিয়ের পর অনিন্দিতার সঙ্গে যে গোয়া ট্রিপ ঠিক করা আছে, সেটায় যেতেই হবে।

শিল্পী: বৈশালী সরকার





মানুষ হওয়ার শিক্ষা

সেমন্তী ঘোষ

বিদ্যাসাগর বাঙালি ছিলেন? সত্যিই?

প্রশ্ন শুনে অবাক হলে দোষ দেওয়া যায় না। ঠিকই তো, তাঁকে নিয়ে বাঙালি সমাজে এখন কত হইচই, কেউ মূর্তি ভাঙছে, কেউ মূর্তি তৈরি করছে, দুশো বছর হল বলে কত লোক কত কী বলছেন লিখছেন! এর মধ্যে আবার এরকম একটা উটকো প্রশ্ন?

বিদ্যাসাগর নিজে এ সব দেখলে কী বলতেন? হয়তো বলতেন, আচ্ছা, দুশো বছর হচ্ছিল না বলেই তোমরা এ সব করতে পারছিলে না! এ দিকে তোমরা বাংলায় একটা গোটা বাক্য শুদ্ধ বলতে পারো না, ও দিকে আবার এত কিছু! হয়তো বলতেন, গাদাগুচ্ছের বাজে কথা না-বলে বরং নিজেরা একটু ভাল ইশকুল বানিয়ে দেখাও দেখি।

হ্যাঁ, এমনিই ছিলেন তিনি। বাঙালির স্বভাবে যে আপাত-বিরোধিতা, দু'মুখো ভাব, কাজের কাজ না-করে কেবল মুখে বড় বড় কথা— বিদ্যাসাগর ঠিক এটাই ঘোরতর অপছন্দ করতেন। আর সেই জন্যেই ওঁকে নিয়ে এত সন্দেহ জাগে, এমন এক জন মানুষ কি পুরোদস্তুর বাঙালি হতে পারেন? কোথা থেকে এলেন তিনি? স্বভাবে চরিত্রে কাজে কর্মে ভাবনায় এত আলাদা কী করে হলেন? এই জন্যই মানুষটিকে ঠিকঠাক বুঝে ওঠা বা হজম করার ক্ষমতা বাঙালির সে দিনও হয়নি, আজও হচ্ছে না। বিদ্যাসাগর ও বাঙালির সম্পর্কের মধ্যে একটা বিষম গোলযোগ সে দিনও থেকে গিয়েছিল, আজও আছে।

আসলে বিদ্যাসাগরের প্রধান কাজগুলোই শুধু নয়, তাঁর ছোটখাটো ভাবনাচিন্তা চলাফেরা রকমসকম সব কিছুতেই একটা খাপছাড়া ব্যাপার ছিল। আমরা জানি, চার পাশের সমাজকে দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কী ভাবে তিনি সেটাকে যতটুকু-সম্ভব শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন সংস্কার-কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সে তো

গেল গুরুগম্ভীর ইতিহাস। ইতিহাসে ঠাঁই পায় না, এমন অনেক কিছু তাঁর জীবনযাপনের মধ্যে ছিল, যা আমাদের খুব অচেনা, খুব দূরের। বড় বড় সংস্কার-কর্মের কথা পাশে সরিয়ে সেগুলোই বরং এক বার ভাবা যাক এখন। কেননা, ওই সব আপাত-তুচ্ছ ঘটনা থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের। চারপাশের সমাজের প্রকার ও বিকারকে উপেক্ষা করে এতটা নিজের মতো থাকতে হয় কী ভাবে, সেই শিক্ষা। তাঁর বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কেউ বলেছেন 'অজেয় মানবতা'র কথা, কেউ বলেছেন 'অপরিসীম কর্মোদ্যোগ'-এর কথা। আমরা এখানে দেখতে চাই, প্রতি দিনের বাঁচার মধ্যে তিনি কী ভাবে দিয়ে গিয়েছেন অন্য রকম একটা মূল্যবোধের শিক্ষা।

কেমন সেই শিক্ষা? প্রথমেই মনে পড়ে তালতলার চটি-টির কথা। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের জীবনের এই বৃত্তান্তটিকে হয়তো আলাদা ভাবে ঐতিহাসিক বলা যাবে না, কিন্তু তাঁকে বোঝার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনা। ব্যাপার এই— হিন্দি ভাষার সাহিত্যিক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাসাগর একদা চলেছেন এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালা দেখাতে— কিন্তু সেখানে ঢুকতে গিয়ে হল মুশকিল। হরিশ্চন্দ্র এসেছেন দরবারি পোশাকে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সেই আদি অকৃত্রিম বেশ, আর পায়ে তালতলার চটি। এদিকে এশিয়াটিক সোসাইটির নিয়ম হল: হয় সাহেবি জুতো পরতে হবে, নয়তো খালি পায়ে ঢুকতে হবে। বাধা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরতি পথে রওনা হলেন পণ্ডিত। হরিশ্চন্দ্র আর কী করেন, একাই ঢুকলেন। তখনও বিদ্যাসাগর যথেষ্ট নামী মানুষ, তাঁকে ফিরে আসতে হল অত বড় একটি প্রতিষ্ঠানের দরজা থেকে। কাগজে এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হল। ইংরেজের সংবাদপত্রও লিখল, 'দ্য গ্রেট শু কোয়েশ্চেন'! তবে লেখাই সার— আজ যে-সোসাইটি সমারোহ করে তাঁর দ্বিশতবর্ষ পালনে আগ্রহী, তার কর্তৃপক্ষ সে দিন মোটেই পাত্তা দিলেন না 'নেটিব' পণ্ডিতকে, নিয়মও পাল্টালেন না। 'সাধারণী' পত্রিকায় বের হল অসাধারণ প্রহসন-রচনা 'তালতলার চটি'— 'রে তালতলার চটি ইংরাজের আমলে কেবল তোরই অদৃষ্ট ফিরিল না।... এমন সামাজিক জোয়ারে তাই তুই ঠেলিয়া উঠিতে পারিলি না।' আর বিদ্যাসাগর লিখে ফেললেন একটি দারুণ শ্লোক— 'বিদ্বত্বঞ্চ জুতত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন/ স্বদেশে পূজ্যতে বিদ্যা, জুতা সর্বত্র পূজ্যতে!' বিদ্যাসাগরকেই খাপছাড়া বলতে হবে, কেননা ওই সময়ের অনেক আগে থেকেই তো বাঙালি সমাজ ঠিক করে নিয়েছে সাহেবিয়ানায় ফার্স্ট হয়েই সে ছাড়বে!



এশিয়াটিক সোসাইটি

কেবল অনুকরণপ্রিয়তা নয়, বাঙালির বিশেষ পারদর্শিতা চাটুকারিতাতেও। অথচ তার মধ্যেই এই মানুষটি 'বজ্রাদপি কঠোর'। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের টেবিলে জুতোসুদ্ধ পা তুলে বসে থাকা, আর তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সাহেবকে ডেকে পাঠিয়ে বিদ্যাসাগরের নিজের টেবিলের ওপর তালতলার চটি-পরা পা তুলে কথাবার্তা চালানোর গল্প আমরা সবাই জানি। যেটা মনে রাখা দরকার— এই জন্য মোটেই বিদ্যাসাগরের চাকরি যায়নি। কার সাহেব অপমানিত হয়েছিলেন, হয়তো অভিযোগও করেছিলেন, কিন্তু তত দিনে নিশ্চয়ই আমাদের শাসকমহলেও জানাজানি হয়ে গিয়েছে যে, সাহেব দেখলেই মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে দেওয়ার লোক নন ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা। সুতরাং যদি তাঁকে যদি কাজে লাগাতে হয়, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধিগুণের কদর যদি করতে হয়, তা হলে তাঁর সঙ্গত তেজটিকেও সহ্য করতে হবে। তাই ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব পর্যন্ত বাগ মেনেছিলেন তাঁর জেদের কাছে। ছোটলাটের কাছে বিদ্যাসাগর মশাইকে যেতে হত তাঁকে নানা আলোচনার জন্য। এক দিন তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "এই আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা, আর আসব না আমি।" হাঁ হাঁ করে উঠলেন ছোটলাট, "কেন কেন?" কেননা, কেউ না কি বিদ্যাসাগরকে বলেছিল, বড় সাহেবের সম্মান রাখার জন্য তাঁকে ধুতি ছেড়ে চোগা-চাপকান আর পাগড়ি পরে আসতে হবে। ব্যস, তাতেই ধৈর্যের বাঁধ উড়ে গিয়েছে পণ্ডিতের। জানিয়ে দিলেন, ও রকম সঙ সেজে মোটেই আসবেন না তিনি। সব শুনে হ্যালিডে জানালেন, বিদ্যাসাগর যেমন আসেন তেমন বেশেই আসবেন, কেউ কিছু বলতে পারবে না তাঁকে।

শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন বিদ্যাসাগরের অতি স্নেহের মানুষ, পরে তাঁর জীবনীকারও বটে। সেই শাস্ত্রীমশাইয়ের প্রবন্ধে পড়ি বিদ্যাসাগরের তালতলার চটি বিষয়ে এক দারুণ উক্তি। শাস্ত্রীর ভাষায়, বিদ্যাসাগর "এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতাসুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।' আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম, এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য, তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনই ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরাও নগণ্য ব্যক্তির মতো।"

পুরোটা কি বলেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী? পুরো সত্যিটা হল, 'নগণ্য মানুষ' বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে অনেক ওপরে ছিলেন, রাজারাই ছিলেন নীচে। তাই জন্য তাঁর সুহৃদ রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বিদ্যাসাগর অমন বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলেন। রাজাকে তিনি বলেছিলেন যে, ধনীদের বদলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দোকানে বসে তামাক খেতে খেতে গল্প করতে বিশেষ ভালবাসেন তিনি, তাতে যদি বিদ্যাসাগরকে বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিতে রাজা লজ্জা পান, তা হলে না হয় তিনি তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করুন। শুনে যতীন্দ্রমোহন রীতিমতো লজ্জিত হয়ে পড়েন। আর আমাদের এই কাহিনি পড়ে মনে হয়, এ কি কেবল 'তেজ'-এর কথা? জেদ-এর কথা? না কি বিদ্যাসাগর এ সব বলতেন কিছু শেখানোর জন্য? বেথুন স্কুল বা মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠার চেয়ে কম দরকারি ছিল না এই স্বভাবত দুর্বিনয়ী সমাজটার সামনে ভব্যতা ও ভদ্রতার উদাহরণ দিতে দিতে চলা। বাঙালিকে মানুষ করে তুলতে চাইতেন তিনি, বড় বড় তত্ত্বকথা আওড়ানোর চেয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একত্র বসে তামাক খাওয়ার মধ্যেই যে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার শিক্ষা আছে, কোনও পণ্ডিতি বাক্যবিন্যাসে না-ঢুকে নিজের কাজের মধ্য দিয়েই সেটা দেখিয়ে দিতেন।

'পণ্ডিত' কথাটিও তাঁর কাছে ছিল বিরক্তিকর। 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' অভিধা তো পছন্দই করতেন না মোটে। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মে আজীবন লেখাপড়ায় ডুবে-থেকেছেন শাস্ত্রজ্ঞ মানুষটি, কিন্তু বিধবাবিবাহ নিয়ে তর্কবিতর্কের সময় নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে সোজা বলে দিয়েছিলেন, "বিদ্যারত্ন মহাশয়, আপনিও কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছেন, আমিও কিছু শিখিয়াছি। আপনি যদি পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন, আমিও পারি। কিন্তু ওইরূপ পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, যদি কেহ আমাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাবে, তাহাতেই আমার যৎপরোনাস্তি অপমান বোধ হয়।" এই বিরাগের কারণটা কি 'বাঙালি পণ্ডিত' জাতিটাকে দেখেই ঘটেছিল? প্রমাণ নেই, তবু অনুমান থাকতেই পারে। এক দিকে তখন বাঙালি শহুরে বাবুরা আপ্রাণ সাহেব হতে ব্যস্ত, অন্য দিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরে দৌড়তে প্রস্তুত পিছনের দিকে। এর মধ্যে বিদ্যাসাগর তখন— না ঘরের না ঘাটের। সময়ের পরিবর্তনকে খোলা মনে স্বীকার করেছেন তিনি, কিন্তু দেশীয় সমাজকে এক কণা ছাড়েননি। বরং দুই দিককে কী করে মেলাতে

পারেন, সেই লড়াইয়ে নেমেছেন। একা।

সংস্কৃত শেখার অধিকারের বিষয়টাই ধরা যাক। সংস্কৃত কলেজের দায়িত্বে তিনি। তখনও নিয়ম— সংস্কৃত কলেজে পড়তে আসবেন শুধু ব্রাহ্মণরাই। বিদ্যাসাগর জানালেন, এই বিশ্রী প্রথা পাল্টে দিচ্ছেন তিনি, শিক্ষায় অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন তিনি তাঁর পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে আসতে দিতে পারেন না। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সব রকম অন্যান্য জাতের জন্যও সংস্কৃত শিক্ষার দরজা খোলা রাখতে হবে। শুনে তো তাজ্জব সমাজের পণ্ডিতবর্গ! বলে কী এই পণ্ডিত? জাতব্যবস্থা না-মানার অর্থ তো ধর্মপালন থেকেও বিচ্যুত হওয়া! কোনও মতেই মানতে পারেন না তাঁরা এই সব অনাসৃষ্টি! কিন্তু বিদ্যাসাগরকে নড়ায় কার সাধ্য। পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন তিনি— ও, শুধু ব্রাহ্মণদের জন্যই সংস্কৃত বুঝি? তা হলে রাজা রাধাকান্ত দেব সংস্কৃত পড়ছেন কেন, তিনি তো ব্রাহ্মণ নন? সাহেবরা সংস্কৃত পড়ছেন কেন, তাঁরা তো ম্লেচ্ছ? টাকা থাকলে কিংবা সাদা হলেই বুঝি জাত-নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়? ব্যস, চুপ হয়ে গেল সব প্রতিবাদ। ভেঙে গেল অনেক দিনকার একটা বাধা। আসলে বাঙালি সমাজ চির কালই ক্ষমতার কাছে নতজানু। সেটা বুঝতে পেরেই ঠিক জায়গায় তিরটা ছুড়েছিলেন বিদ্যাসাগর। এই সব কারণেই হয়তো 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' ডাক-এ অত আপত্তি ছিল তাঁর।

কেবল আপত্তি বললে কম বলা হবে। আসলে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলতে যে-সমাজটাকে বোঝানো হত, তার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের দূরত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। কেননা, ওই সমাজের প্রথম ও প্রধান স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেওয়া হত যে— সমাজটাই আগে, মানুষ পরে। ধরে নেওয়া হত, শাস্ত্র ও আচার আগে, বাকি সব পরে। বিদ্যাসাগর ছিলেন এর সম্পূর্ণ উল্টো পথের পন্থী। রামমোহন রায়ের মতো পাশ্চাত্য দর্শনে পণ্ডিত ছিলেন না তিনি, কিন্তু কী এক আশ্চর্য স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তচিন্তা দিয়ে বুঝে গিয়েছিলেন যে, সমাজের পিছনে মানুষের জায়গা হতেই পারে না। বিধবা-বিবাহ বিষয়ে যুক্তির ভিত্তি হিসেবে এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন, ''আপনারা ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের দেশের আচার একেবারেই অপরিবর্তনীয় নহে। ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, সৃষ্টিকাল অবধি আমাদের দেশের আচার পরিবর্তন হয় নাই: এক আচারই পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমাদের দেশের আচার পদে পদে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বকালে এ দেশে চারি বর্ণের যেরূপ আচার ছিল, এক্ষণকার আচারের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোকদিগকে এক ভিন্ন জাতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। বস্তুত, ক্রমে ক্রমে আচারের এত পরিবর্ত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোক, পূর্বতন লেকদিকের সন্তানপরম্পরা, এরূপ প্রতীতি হওয়া অসম্ভব।''


শিবনাথ শাস্ত্রী

এত বড় একটা উদ্ধৃতি দিতে হল, কেননা এটা কেবল তর্কের জন্য যুক্তি দেওয়া নয়। বিদ্যাসাগর যে কেন এত আলাদা, তার মূল সুরটাই ধরা আছে এখানে। কেবল দয়া বা করুণা দিয়ে তিনি মানুষটা তৈরি বললে তাই মোটেই পুরোটা বলা হয় না, বাকিটা রয়েছে তাঁর মন ও স্বভাবের এই ধরনটার মধ্যে— যাকে এক কথায় বলতে পারি— চলিষ্ণু। নিজের মাটিতে শক্ত শিকড় নিয়ে দাঁড়িয়েও এতটা মানসিক চলিষ্ণুতা রাখতে পারা— কঠিন, খুব কঠিন কাজ। আমরা বাঙালিরা সাধারণত তা পারি না।

'নিজের মতো' করে ভাবতে পারতেন বলেই তিনি 'নতুন করে'ও ভাবতে পারতেন। বিদ্যাসাগর যে বিদ্বান ছিলেন ছেলেবেলা থেকেই, সে আর এখানে বলার দরকার নেই। বিদ্যাশিক্ষার কাজে তিনি সবচেয়ে বেশি উৎসাহ পেতেন, সেও আমরা সকলে জানি। কিন্তু সম্ভবত যেটা আমরা মনে রাখি না, সেটা হল— বিদ্যাশিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে এই মানুষটিই কিন্তু বাংলা বইয়ের মুদ্রক ও প্রকাশক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ এ দেশের প্রথম যুগের দেশীয় মুদ্রক-প্রকাশকদের মধ্যে তাঁর নামটি অগ্রগণ্য। স্বাভাবিক দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বই মুদ্রিত করতে না-পারলে সমাজজীবনে মুক্তি আনাও কঠিন। হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপির দৌড় আর কতটা? মুদ্রণযন্ত্রের মাধ্যমেই তাকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব, জ্ঞানের আলো চার দিকে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। তিনি কি এটাও ভেবেছিলেন যে, যত বেশি বই প্রকাশ করা যাবে, সামাজিক 'এলিট' অর্থাৎ বিজ্ঞজনের দাপটও ততই কমানো যাবে?— মনে রাখা ভাল যে তখনকার দিনে এই 'বিজ্ঞজন'রা ছিলেন তাঁরাও, যাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের অন্যান্য সমাজসংস্কার ও প্রতিবাদের তির ধাবিত হয়েছিল। কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেন যে ব্রাহ্মণ্য বিজ্ঞরা, যে শাস্ত্রবাদীরা— তাঁদের কবল থেকে সমাজকে একটুখানি মুক্তি দিতে হলেও বৃহত্তর সমাজকে জ্ঞানচর্চার সুযোগ দেওয়া চাই। এক বিখ্যাত বিদ্যাসাগর-গবেষক এই জন্যে তাঁকে 'প্রমিথিউস' বলেছেন।

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ ছাড়বার আগেই বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃত প্রেস' ও 'ডিপজিটারি' প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি নিজে লিখেছেন, ''যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত ছিলাম, তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে সংস্কৃতযন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায় তিনি ও আমি সমাংশভাগী ছিলাম।'' দুই বন্ধু মিলে তৈরি করলেন ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসা, যদিও পরবর্তী কালে তাঁদের মধ্যে বিরোধ তৈরি হল, তাঁদের কাজও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সে যাই হোক, তাঁদের এই উদ্যোগ বাঙালির ব্যবসায়িক ইতিহাসের গোড়ার কথা। অথচ সাধারণত ব্যবসার দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য যে হাতে-গোনা কয়েক জন বাঙালির নাম আমরা করি, তার মধ্যে বিদ্যাসাগরকে ধরা হয় না। তাঁর এই 'উদ্যোগপতি' ভূমিকার কথা কিন্তু আলাদা করে স্মরণ করা উচিত। বাঙালি বুদ্ধিজীবী বলতে যাঁদের বোঝানো হয় তাঁরা সে দিনও এই ধরনের কাজকে গুরুত্ব দেননি, আজও দেন না।

'নিজের মতো' চলার মধ্যে একটা কাঠিন্যও থাকে বইকি। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের ধর্মের প্রতি মনোভাবের কথা মনে পড়ে। না, ধর্ম বিষয়ে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর যে ভাবটি ছিল, তাকে নাস্তিকতা বলাও মুশকিল। বরং যেন, বিদ্যাসাগরের ধর্মবিষয়ক উদাসীনতার মধ্যে একটা অধৈর্যের ভাব ছিল। সে দিনের বাঙালি সমাজের একটি অংশ যখন হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল চেহারায় ফিরতে ব্যগ্র, অন্য একটি অংশ হিন্দুধর্মের কোনও নতুন চেহারার কল্পনায় ব্যস্ত, আরও একটি অংশ ব্রাহ্ম সমাজ নামে একটি আলাদা কিছু তৈরি করতে উদ্যত, তেমন সময়ে ধর্ম বিষয়ে কথা উঠলে এই মানুষটি খানিক ব্যঙ্গ, খানিক স্পর্ধার সঙ্গে তা উড়িয়ে দিতেন। শোনা যায়, রামমোহন রায়ের পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুয্যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরকালতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করায় বিদ্যাসাগর তাঁকে বলেছিলেন, ''হ্যাঁরে ললিত, আমারও আবার পরকাল আছে না কি রে?'' এই ধরনের একটি কাহিনি বলেছেন শিবনাথ শাস্ত্রীও। এক বার বিদ্যাসাগর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে গল্প জুড়েছেন, এমন সময়ে এক বাঙালি খ্রিস্টান পাদরি সেখান দিয়ে যেতে যেতে ছোট ছেলেদের লক্ষ করে 'salvation' বিষয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন । একটুক্ষণ বক্তৃতা শুনেই বিদ্যাসাগর তাঁকে বললেন, ''ওদের ছেড়ে দিন, আমার কাছে আসুন। ওরা নিতান্ত বালক, এদের salvation-এর কথা চিন্তা করার এখনও অনেক সময় আছে। আমি বুড়ো হয়েছি, আজ বাদে কাল মরব, আমাকে বোঝান, কাজ হবে।''

পাদরি মশাই তা-ই করলেন। ব্যস, যা হওয়ার তাই হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের বাক্যবাণে অস্থির হয়ে তিনি চটে গিয়ে অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেলেন!

আসল কথা— ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি নিয়ে যা-ই ভেবে থাকুন না কেন বিদ্যাসাগর, সে সবই তিনি ব্যক্তিগত বিষয় করে রাখতে চাইতেন। সামাজিক কাজ বলতে তিনি বুঝতেন সম্পূর্ণ অন্য কিছু— যা দিয়ে ইহজাগতিক জীবনকে একটু হলেও সহনীয় করে তোলা যায়। এইখানে তাঁকে কঠিন ও অসহিষ্ণু বলাই যেতে পারে। আজও কি বাঙালি এতখানি আধুনিক হতে পেরেছে?

যে-কথাটা বিদ্যাসাগর বিষয়ে সবাই জানি, সেটা তাঁর 'দয়ার সাগর' হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু তার মধ্যেও একটা দিক আমরা খেয়াল করি না। দয়ার সাগর হয়ে ওঠার জন্য মানুষটিকে কিন্তু অনেকখানি আত্মত্যাগ করতে হয়েছিল— কেননা টাকাপয়সার দিক দিয়ে সম্পন্ন তো তিনি ছিলেনই না, অনেক সময়ে বেশ দারিদ্রেই কাটত তাঁর দিন। কিন্তু তাতে থেমে থাকেনি তাঁর দৃঢ় সংকল্প-জাত করুণাধারা। ১৮৬৬ সালে অনাবৃষ্টির ফলে প্রবল খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বাংলায়। দক্ষিণবঙ্গ ও উড়িষ্যায় ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল সেই দুর্ভিক্ষ। মানুষ যে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাবে, অভুক্ত অশক্ত শরীরে সে উপায়ও যেন ছিল না, কঙ্কালসার দেহগুলি প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে ছিল গ্রামবাংলায়। এমন সময় কলকাতায় বসে খবর পেলেন বিদ্যাসাগর, ছুটে গেলেন গ্রামে। নিজে ক্যাম্প খুলে মানুষকে খাবার বিলি করা শুরু করলেন। প্রতি দিন ক্ষুধাকাতর মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগল, প্রায় হাজারে পৌঁছল। ভাই শম্ভুচন্দ্রকে দায়িত্ব দিলেন তিনি, বললেন যত খরচই লাগুক, কাজ চালিয়ে যেতেই হবে। পাশাপাশি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজের সাংবাদিকের কাছে খবর পৌঁছে দিলেন, তারা সে খবর ছাপলও। মেদিনীপুরের গড়বেতার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খবর পেলেন, অনেকটা দায়িত্ব নিলেন তিনিও। এই ভাবে বিদ্যাসাগর শুধু নিজের দয়াদাক্ষিণ্যের ওপরই ভর করতেন না, জনসংযোগের জরুরি কাজটিও নিজে হাতে করতেন। সরকারকে অনুরোধ করে নানা জায়গায় ক্যাম্প খোলানোর ব্যবস্থা করেও শান্তি ছিল না তাঁর। মনে হত, এই অভুক্ত গরিব লোকগুলিকে কেউ যদি নিচু চোখে দেখে! এই ভয়ে তিনি নিজের হাতে ছেলেদের রুক্ষ চুলে তেল মাখিয়ে দিতেন।



বিদ্যাসাগর কলেজ

এই ভাবেই চার দিক থেকে জোগাড়যন্ত্র করে কাজ করতেন তিনি, এতই তাঁর জীবনীশক্তি। এতই 'কঠিন' ধাতু দিয়ে গড়া ছিলেন তিনি। আমরা জানি বিদ্যাসাগর কেবল বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টাই করেননি, নিজে থেকে বিবাহবিবাহের আয়োজন করতেন। ফলে প্রবল ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন মানুষটি। কিন্তু ওই অসচ্ছলতা বা দারিদ্রের সময়েও একটি ভিক্ষুকেও ফেরাতেন না তিনি। কী করে যে এই ভাবে চলতে পারতেন, সে সত্যিই এক রহস্য।

তাঁর এই অদ্ভুত চরিত্রের কথা এতই ছড়িয়ে পড়েছিল যে দীনদুঃখী ভিড় জমাত তাঁর দর্শন পেতে। কেবল সাহায্য চাইতেই আসত না তারা, দেখতেও আসত। এক বার বর্ধমান স্টেশনে বিদ্যাসাগরের সামনে এসে দাঁড়াল একটি ক্ষীণদেহী ছেলে, একটি পয়সা চাইল তাঁর কাছে। ছেলেটির চোখ দেখে কী যেন মনে হল তাঁর, কাছে ডেকে নিলেন। জানতে চাইলেন ''আমি যদি তোমায় চার পয়সা দিই, কী করবে তা দিয়ে?'' সে বলল, ''আমি দু পয়সা দিয়ে কিছু কিনে খাব, আর বাকি দু পয়সা মা'র জন্য নিয়ে যাব।'' ''আর যদি দু আনা দিই?'' ছেলেটি ভাবল, পণ্ডিত তাকে নিয়ে তামাশা করছেন। তার চোখ ভরে এল জলে। বলল, ''আমি চার পয়সা দিয়ে চাল কিনব, আর বাকিটা মার জন্য নিয়ে যাব।'' ''যদি চার আনা দিই?'' বিস্ময়াহত ছেলেটির উত্তর, ''আমি দু আনা রাখব কাল-পরশুর জন্য, দুই আনা দিয়ে আম কিনব, সেটা চার আনায় বিক্রি করব। তাতে আরও দু দিন চলে যাবে, তার পরও দুই আনা থাকবে, সেটা দিয়ে আবার আম কিনব। এই ভাবে চলব যাতে আমার আর মা-র কয়েক দিন চলে যায়।'' বিদ্যাসাগর মহা খুশি হয়ে তার হাতে গোটা একটা টাকা ধরিয়ে দিলেন। বছর-দুয়েক পর আবার এক দিন বর্ধমান স্টেশন দিয়ে কোথায় চলেছেন বিদ্যাসাগর। হঠাৎ এক যুবক এসে তাঁর পায়ে পড়ল। বলল, ''আপনাকে আসতেই হবে আমার দোকানে।'' বিদ্যাসাগর অবাক! তার পর জানতে পারলেন, সে-ই সে দিনের বালক। সত্যিই সেই একটি টাকা দিয়ে শুরু করে সে আস্তে আস্তে এই জায়গায় পৌঁছেছে। বিদ্যাসাগর খুব খুশি শুনে। চললেন তার সঙ্গে, দোকান দেখতে।

গল্পটি শুনে হয়তো বালকটিকে নিয়েই বেশি অবাক হব আমরা। খেয়াল করব না যে, যিনি বালকটিকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, তাঁর মতো করেও আমরা কখনও কোনও ভিক্ষাপ্রার্থীর দিকে তাকাই না। মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবার অভ্যেস আমাদের নেই যে! ঠিক সেই রকমই, বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন তৈরি করেছিলেন, যার নাম আজ বিদ্যাসাগর কলেজ— এই খবর আমরা হয়তো রাখি। কিন্তু খবর রাখি কি যে-ছাত্ররা সেই কলেজ থেকে ভাল ভাবে পাশ করলে তাদের নিজের বাসায় টেনে আনতেন, নিজেই নানা রকম বই হাতে ধরিয়ে দিতেন। কলেজের অধ্যাপকদের বাড়িতে এনে নিজের হাতে ফলমূল কেটে খাওয়াতেন। অধ্যাপকদের কোনও সমস্যা হলে তার সমাধানের ভারও নিয়ে নিতেন নিজের হাতে। এ সব কেবল দয়ার দানই নয়। এর পিছনে আছে একটা কঠিন সংকল্পের ব্রত। তাই কেবল 'দয়ার সাগর', 'করুণাসাগর', শুধুমাত্র এই সব পরিচয়ে বিদ্যাসাগরকে বোঝার চেষ্টাটা বোধহয় ভুল। যে-কঠোর নীতিনিষ্ঠা ছিল তাঁর, নিজের কথা না-ভেবে অন্যের কথা ভাবার যে-অভ্যেস তিনি এক দিনের জন্যও পালন করতে বাদ দেননি— সেগুলোর জন্য শুধু নরম মন নয়, কঠিন মনেরও দরকার হয়। অথচ বাঙালি প্রবণতার কারণেই তাঁর চরিত্রের সেই কঠিন দিকটিকে বুঝতে চাই না আমরা। যে-শিক্ষা তিনি বাঙালিকে দিতে চাইছিলেন, সেটা লুকিয়ে আছে এই কঠিন-কোমলের তাল-ফাঁকেই।

তাই ছোটখাটো, অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও তাঁর জীবনের এ সব কাহিনি মোটেই গুরুত্বহীন নয়। মানুষটি খুব বড় বলে তাঁর জীবনের ছোট ঘটনার মাপও ছিল অনেক বড়। এ দিকে আমরা বাঙালিরা চরিত্রে, স্বভাবে চির কালই ছোট মাপের। রবীন্দ্রনাথ সেই হিসেব করেই বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর ''বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন।'' আশ্চর্য বাক্য, বলতেই হবে। 'শব্দহীন', 'সুদূর' আর 'নির্জন'— বাঙালি আর বিদ্যাসাগরের মধ্যে ব্যবধান বুঝতে কী মোক্ষম তিনটি শব্দ!

দুশো বছরের মাথায়, আজকের বাঙালির সঙ্গে তার বিদ্যাসাগরের ব্যবধান হয়তো আরওই বাড়তে বসেছে। তাই, নিজের জীবন দিয়ে আমাদের মানুষ হওয়ার যে-পাঠগুলি তিনি দিয়ে গিয়েছেন, সে সব এই বেলা ঝালিয়ে নেওয়া ভাল।



একদা এক নবকান্ত

উল্লাস মল্লিক

জ্যৈষ্ঠমাসের মাঝামাঝি কোনও এক বুধবার সকালে চালতাবেড়ের নবকান্ত ঘোষণা করল, সে সুইসাইড করবে। সুইসাইড মানে আত্মহত্যা। এবং সেটা করবে এখনই, এই মুহূর্তেই।

ঝগড়াঝাঁটি মান-অভিমানের সময় অনেকেই এমন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে দেয়। কিন্তু সে নেহাতই কথার কথা। স্বামীর তাস খেলাকে কেন্দ্র করে সকালে স্ত্রী হয়তো বলল এমন কথা। কিন্তু সেদিনই সন্ধেবেলা যখন স্ত্রীর শপথ অনুযায়ী তার বডি মর্গে থাকার কথা, দেখা গেল, দু'জনে সেজেগুজে হাসিমুখে 'দেবদাস' দেখতে যাচ্ছে। অথবা বাপ ছেলেকে বলল, ওই মেয়েকে যদি বিয়ে করিস, তা হলে তুই আমার মরা মুখ দেখবি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, সেই মেয়েকেই বিয়ে করেছে ছেলে। এবং বউমার রান্না ছাড়া শ্বশুরমশাইয়ের মুখে খাবার রোচে না।

কিন্তু এক্ষেত্রে পরিস্থিতি অন্যরকম। আত্মহত্যা করবে বলে নবকান্ত একেবারে গাছে চড়ে বসেছে। সঙ্গে আত্মহত্যার সরঞ্জাম। অর্থাৎ দড়ি একটা। এই

দড়িই গাছের ডালে বেঁধে ঝুলে পড়বে সে। এমনই পরিকল্পনা তার।

চালতাবেড়িয়ার মণ্ডলপাড়ায় শিবমন্দিরের সামনে ছোট্ট একফালি জমি। সেখানে ক'টা আম, জাম, নিমগাছ। এর মধ্যে একটা আমগাছে উঠেছে নবকান্ত। বেশ প্রাচীন গাছ। মোটা গুঁড়ি সোজা উঠে গেছে অনেকটা। তারপর শুরু হয়েছে ডালপালা। এ গাছে ওঠা সহজ নয়। কিন্তু নবকান্ত গাছে উঠতে ওস্তাদ। তাই সহজেই উঠে পড়েছে গাছের উপর দিকে। সঙ্গে করে দড়ি নিয়েই উঠেছে। এবং চিৎকার করে ঘোষণা করছে, আত্মহত্যা করবে।

নবকান্ত যখন এই গল্পের নায়ক, তখন তার সম্পর্কে দু'-চার কথা বলে নেওয়া দরকার। নবকান্তকে অবশ্য খলনায়কও বলা যায়। গল্পের আর পাঁচটা চরিত্রকে সে যেমন হেনস্থা করেছে তাতে তাকে নির্দ্বিধায় খলনায়ক বলা চলে।

চালতাবেড়ের হারাধন দাসের দুই ছেলের মধ্যে নবকান্ত বড়। ছোটর নাম শিশুকান্ত। বছর দুই আগে অল্প ব্যবধানে নবর বাবা-মা দেহ রেখেছে। দু'ভাই পৃথগন্ন অর্থাৎ আলাদা সংসার। নবর সংসারে নব আপাতত একা। বছর পাঁচেক আগে ফাল্গুনের এক গোধূলি লগ্নে পাথরডাঙা নিবাসী গৌরহরি দাসের ছোট মেয়ে শিবানীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বটে নবকান্তর, কিন্তু সে বিয়ে টেকেনি। টেকার কথাও নয়। নব এমনিতেই তার-কাটা, অকারণে ভ্যাজর ভ্যাজর বকে। স্থায়ী কোনও কাজ-কাম নেই তার। সারা দিন হাটে-বাটে ঘুরে বেড়ায়। কেউ বলল, নব আমার বাগানটা পরিষ্কার করে দে তো, পয়সা দেব। তো, নব করে দিল। কেউ নবকে দিয়ে পুকুরের পানা সাফ করিয়ে নিল। কোনও চায়ের দোকানে জল তুলে দিয়ে দু'পয়সা পেল নব। কেউ আবার বলল, নব গা-হাতটা ভাল করে ম্যাসাজ করে দে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এসব খুচরো রোজগার যেটুকু করে, সব্‌টুকুই চুল্লুর ঠেকে চলে যায় তার। তাই বউ পালানোর পক্ষে নব একেবারে উপযুক্ত লোক। সে জন্য শিবানী পালিয়েছে, আর যাওয়ার সময় জোর গলায় ঘোষণা করে গেছে, মিনসে মরলে তাকে যেন একটা খবর দেওয়া হয়। কারণ, তখন শাঁখা-সিঁদুর তোলার একটা দায়িত্ব বর্তায় তার ওপর।

তা এহেন নব আত্মহত্যা করলে কারও কিছু যায় আসে না। এমন কত মানুষ রোজ উবে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপার অত সহজ নয়। নবর এই ঘোষণা শুনে প্রথমেই বেরিয়ে এল তার ভাই-বউ পূর্ণিমা। আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে প্রবল কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, "দাদা, অমন কাজটা করবেন না, নেমে আসুন।"

এমন শুনে মনে হতেই পারে ভাসুর-ভাদ্দরবউয়ে দারুণ সম্পর্ক এবং ভাসুরের ভালমন্দের প্রতি সজাগ দৃষ্টি পূর্ণিমার। কিন্তু অতীত তথ্য এমন কথা বলছে না। মাঝে-মাঝেই খুঁটিনাটি নানা বিষয় নিয়ে দু'ভাইয়ে লেগে যায়। স্বভাবতই তখন স্বামীর পক্ষ নেয় পূর্ণিমা। এই তো ক'দিন আগেই একটা যৌথ নারকেল গাছ থেকে নারকেল পাড়িয়ে বিক্রি করে দিয়েছিল নব। শিশুকান্ত তখন বাড়ি ছিল না। কিন্তু শিশুকান্তর অভাব বুঝতে দেয়নি পূর্ণিমা। এক গলা ঘোমটা টেনে ভাসুরের প্রতি এমন খিস্তি-বাণ নিক্ষেপ করেছিল যে, নবর টাটকা নেশা ছানা কেটে গিয়েছিল। সেদিন পূর্ণিমা বিশেষ একটা খেদোক্তি করেছিল—"ওপরওলা রোজদিন এত মানুষকে টেনে নিচ্ছে, কিন্তু এই মরাখেকোটার দিকে একবারও নজর পড়ছে না কেন!"

সেই পূর্ণিমাই আজ করুণ গলায় বলল, "দোহাই দাদা, আপনি নেমে আসুন গাছ থেকে।"

নব হুংকার ছেড়ে বলল, "কেন নামব! নামব কেন! আমি আমার গলায় দড়ি দিচ্ছি তাতে তোর বাপের কী!"

পূর্ণিমা বলল, "তা বললে হয় না দাদা, আপনি নেমে আসুন।"

নব বলে, "যখন খিস্তি দাও তখন মনে থাকে না?"

পূর্ণিমা বলে, "সে দাদা, পাশাপাশি বাস করতে গেলে অমন হয়। তাও মানছি, ঘাট হয়েছে। এই আমি নাক কান মলছি দাদা, আপনি নেমে আসুন।"

বলে, পূর্ণিমা সত্যিই নিজের নাক-কান মলে নেয়।

নব বলে, "ওসব জানি না। মরব একবার মন করেছি যখন, মরবই।"

পূর্ণিমা বলে, "ঠিক আছে দাদা, মরার অত ইচ্ছে যখন, মরুন। কিন্তু আজ বাদ দিয়ে কাল মরুন।"

নবকান্ত বলে, "কাল কেন, আজই মরব আমি। আজও যা, কালও তাই।"

পূর্ণিমা বলে, "আজ যে আমার ঘরে সত্যনারায়ণ পুজো, সব জোগাড় হয়ে আছে। আপনি মরলে আমাদের কালাওযুধ হয়ে যাবে যে দাদা।"

নব বলে, "ও সব সত্যনারান-ফারান জানি না, আজই মরব।"

পূর্ণিমা হাতজোড় করে বলল, "শুধু একটা দিন তো দাদা, এটুকু করতে পারছেন না! একদিন পরে মরলে কী এমন ক্ষতি! আর না হয়, আজই মরবেন। সন্ধেবেলা পুজোটা হয়ে গেলে সিন্নি খেয়ে মরবেন।"

দেখতে দেখতে বেশ ভিড় জমে যায় গাছের নিচে। সেই ভিড়ের মধ্যে রায়বাড়ির ছোট ছেলে অংশুমানও আছে। সে-ই এবার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, "নব, তুই মরবিই-বা কেন?"

নব বলে, "সে অনেক ব্যাপার।"

অংশুমান বলে, "আরে, সেটাই তো শুনতে চাইছি তোর থেকে। কী জন্য মরবি তুই?"

নব বলে, "তোমাকে বলব কেন! মরব বলেছি মরব, ব্যস! কারও কথা শুনব না।"

দৌড়োতে দৌড়োতে এলেন যদু মণ্ডল। চানে যাবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সেই সময়ই পেলেন সংবাদটা। তাঁদের আমগাছে নব গলায় দড়ি দিচ্ছে। তাই গামছা পরেই চলে এসেছেন তিনি। যদিও গাছের মালিকানা তাঁরই, এমন কথা হলফ করে বলা যাবে না। কারণ, ভাই মধু মণ্ডলের সঙ্গে আজ টানা দশ বছর এই গাছ নিয়ে মামলা চলছে। মামলার মীমাংসা হলে তবেই বলা যাবে গাছ কার— যদুর না মধুর। যাই হোক, গাছের নীচে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন যদু, "অ্যাই শালা নব!"

নব বলল, "কী?"

"নেমে আয় হারামজাদা।"

নব বলে, "কেন?"

"তোর বাপের গাছ?"

নব বলে, "আমি বলেছি নাকি!"

"তবে নেমে আয়।"

"আমি গলায় দড়ি দেব।"

যদু বলেন, "তোর যা ইচ্ছে কর গে যা, কিন্তু এ গাছে নয়, তুই অন্য গাছে দে।"

নব বলে, "আমি এই গাছেই দেব মন করেছি, তো এ গাছেই দেব।"

"খবরদার নয়!" গর্জে ওঠেন যদু, "নেমে আয় বলছি।"

নব বলে, "নামব বলে উঠেছি নাকি! শালা, গাছে তো কাঠপিঁপড়ের চাষ করে রেখেছ। ঝালিয়ে দিল একেবারে।"

মধু মণ্ডল বাজারে গিয়েছিলেন। সবে এক আঁটি লাউশাক কিনেছেন, তখনই পেলেন সংবাদটা। লাউশাক হাতে নিয়ে দৌড়ে এলেন। আর এসে দাদা যদু মণ্ডলের মতোই তড়পাতে লাগলেন।

মামলার জন্য দু'ভাইয়ের বাক্যালাপ নেই। কিন্তু এই সংকটমুহূর্তে সে নিয়ম ভেস্তে গেছে। দু'ভাই শলাপরামর্শ করছেন। পাগলটা সত্যিই যদি গলায় দড়ি দেয়, তা হলে গাছটার বদনাম হয়ে যাবে। বছর বছর প্রচুর আম ফলে এই গাছে, সেই আম পাড়া নিয়ে দু'ভাইয়ের খিটিমিটিও লাগে। এ বছরেও প্রচুর ফলেছে। মামলায় যেই জিতুক পরে আম পাড়ানোর লোক পাওয়া যাবে না। গলায় দড়ি দেওয়া গাছে চট করে কেউ উঠতে চায় না। তাই যেমন করেই হোক, পাগলাটাকে নামাতে হবে। কিন্তু এ গাছে উঠবে কে? মধু মণ্ডলের হঠাৎ চোখে পড়ল, একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে বাবলু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে। গাছ বাইয়ে

হিসেবে বাবলুর নাম আছে। মধু এগিয়ে গিয়ে বাবলুকে বললেন, "অ্যাই বাবলু, কিছু একটা ব্যবস্থা কর।"

বাবলু বিড়িতে একটা টান দিয়ে বলল, "কী করব?"

"গাছে ওঠ একবার, নামা পাগলাটাকে।"

বাবলু বলে, "এখন আবার কে গাছে উঠবে! আমাকে হালদারপাড়ায় যেতে হবে এখন।"

"এ গাছ তো তোর কাছে জলভাত, একবার উঠতে কতক্ষণ লাগবে!"

"শরীরটা আজ ভাল নেই গো।"

যদু মণ্ডলও পা পা করে এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। বুঝলেন, তাল বুঝে বাবলু কিছু খেঁচে নিতে চাইছে। তিনি তাই সরাসরি প্রসঙ্গে এলেন। বললেন, "তোকে কিছু দেব'খন, তুই উঠে পড়।"

বিড়িতে একটা টান দিয়ে বাবলু বলে, "কত?"

"সে তোকে বুঝেশুনেই দেব। তুই ওঠ না আগে।"

বাবলু বলে, "আগে শুনি না, কত দেবে।"

দরাদরি শুরু হয় দু'পক্ষের। বাবলু চাইছে একশো টাকা। যদু-মধু কুড়ির ওপর উঠতে নারাজ। শেষে পঞ্চাশ টাকায় রফা হয়। দু'ভাই ঠিক করে নেয় হাফ হাফ শেয়ার করবেন। দরাদরি চলছে যখন, চিন্টুর মায়ের কালো ছাগলটা মধুর হাতে ধরা লাউশাকের ডগা মসমসিয়ে খেয়ে নেয়।

কিন্তু তখনই সেখানে উগ্রচণ্ডী মেজাজে হাজির হয় বাবলুর বউ সন্ধ্যা। সে খবর পেয়েছে, পাগল নামাতে তার স্বামীকে গাছে তোলা হচ্ছে। এসেই তুলকালাম শুরু করে দেয় সন্ধ্যা। পাগল যদি গাছের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দেয় তার স্বামীকে, তখন কী হবে? কে দায়িত্ব নেবে? চিৎকার করতে করতেই স্বামীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলে যায় সন্ধ্যা।

প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে আসেন পঞ্চায়েত প্রধান শিবতোষ পাল। তাঁর এলাকায় একটা লোক দিনেদুপুরে জনসমক্ষে গলায় দড়ি দিচ্ছে— এ তো ভাল কথা নয়। এলাকার বদনাম। শিবতোষ অকুস্থলে পৌঁছাতে একটু শোরগোল ওঠে। নেতা বলে কথা। ভাবটা এমন, প্রধান যখন এসে গেছে, কিছু একটা বিহিত হবে। শিবতোষকে ঘিরে ছোটখাট একটা ভিড় জমে যায়। নানা জনের নানা দাবি।

"শিবুদা, ব্যবস্থা কিছু একটা করুন। একটা লোক এভাবে মরবে, সেটা আবার হয় নাকি!"

"শিবতোষবাবু, দেখুন একটু। আপনারা যদি না দেখেন তো কে দেখবে! সরকার থেকে একটা স্টেপ নিন।"

"শিবতোষ, কী কাণ্ড দেখেছ! যত পাগল-ছাগল জোটে এখানে। নামিয়ে এনে ঠাটিয়ে দুটো থাপ্পড় দাও তো। চ্যাংড়ামি!"

শিবতোষ একটু এগিয়ে যান। তারপর চিৎকার করে বলেন, "অ্যাই নবা, নেমে আয়।"

নব একটু ভুরু কুঁচকে তাকায়। তারপর বলে, "কেন!"

"শুধু শুধু মরবি কেন?

নব বলে, "শুধু শুধু কে বলল!"

"কী জন্যে তা হলে?"

"ব্যাপার আছে।"

"ঠিক আছে," শিবতোষ বলেন, "তোর যা বলার আমাকে বল, আগে নেমে আয়।"

নব বলে, "তোমাকে বলে কী হবে?"

শিবতোষ বলেন, "আমি তোর সমস্যা মিটিয়ে দেব।"

একটু চুপ করে থাকে নব। তারপর বলে, "তুমি শালা বহুত ঢপবাজ আছো।"

শিবতোষ ধমকে ওঠেন, "অ্যাই, কী বাজে কথা বকছিস!"

"বাজে কথা নয়," নব বলে, "গেল বার ভোটের আগে তুমি বললে, নব, ভোটটা দে, তোর ঘরের চালটা সারিয়ে দেব আর তোর বউকে ফিরিয়ে আনব। তা, ভোট তো দিলুম, কিন্তু কিছুই তো হল না।"

শিবতোষ বলেন, "ঠিক আছে, কালই তোর চাল মেরামতের ব্যবস্থা করছি, আর তোর বউকেও..."

শিবতোষের কথা শেষ হওয়ার আগেই নব বলে ওঠে, "ওসব আর শুনছি না, মরব বলেছি, মরব। আজই মরব।"

ততক্ষণে হাজির হয়ে গেছেন রুইদাস ঘোষ। শিবতোষের বিরোধী নেতা। তিনি একপাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন। ভাবখানা এমন—তোমরা এখন ক্ষমতায়, সুতরাং ঠেলা তোমরা সামলাও।

খবরের গন্ধে হাজির চালতাবেড়িয়া বার্তা-র সম্পাদক শিশির সাহা। গ্র্যাজুয়েশনের পর চাকরিবাকরি না পেয়ে কিছুদিন টিউশন করে শিশির। তারপর মিউচুয়াল ফান্ড চিট ফান্ড এইসব চক্কর ঘুরে, এখন সাংবাদিকতায় থিতু হয়েছে। শিশির এসে প্রথমে কূট চোখে চারদিক পর্যবেক্ষণ করে নেয়। গাছতলায় দাঁড়িয়ে খচাখচ করে ছবি তোলে মোবাইলে। কাণ্ড দেখে নবও কিছুটা অবাক। সে-ও তাকিয়ে আছে শিশিরের দিকে। শিশির বলে, "আচ্ছা নবকান্তবাবু, আপনি সুইসাইড করতে চাইছেন কেন!"

এবার একটু ঘাবড়েই যায় নবকান্ত। এই লোকটা তার ছবি তুলল, তারপর আপনি আজ্ঞে করছে, কে লোকটা! তাই চুপ করে থাকে সে।

শিশির বলে, "চুপ করে থাকবেন না নবকান্তবাবু। কেন সুইসাইড করছেন সেটা বলে যান। সবাইকে সেটা আমরা জানাব, সবার জানা উচিত।"

নব এবার বলে ওঠে, "ওসব জানি না। মরব ঠিক করেছি, মরব। কার তাতে কী!"

শিশির বলে, "সে তো মরবেনই। ওই ব্যাপারে আমি আপনাকে বাধা দেব না। আমি শুধু কারণটা জানতে চাইছি। জেনে, আমি আমার কাগজে লিখব, পাঁচজন জানবে। এটুকুই আমার ডিউটি।"

নব হঠাৎ পট করে একটা কাঁচা আম ছেঁড়ে গাছ থেকে। তারপর সাঁই করে ছুড়ে মারে শিশিরকে। শেষমুহূর্তে সরে গিয়ে আঘাত এড়ায় শিশির।

গাছতলা থেকে একটু সরে আসে শিশির। সরে এসে আবার ছবি তুলতে থাকে মোবাইলে।

তপনের ঠাকুরমার বয়স আশি ছাড়িয়েছে। কানে কিছু শুনতে পান না। কোমরে আর হাঁটুতে বাত। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসেছেন। নবকান্তকে গাছে দেখে বললেন, "ওরে নবা, আমাকে ভাল দেখে একটা আমপল্লব ভেঙে দে তো...সাত পাতার দিবি কিন্তু..."

শুভশ্রীদের দোতলার ছাদ থেকে আমগাছটা সোজা দেখা যায়। ছাদে উঠে দেখছিল শুভশ্রী। মাতাল নব গাছের উঁচু ডালে উঠে সুইসাইড করতে যাচ্ছে। সে-ও মোবাইলে ক'টা ছবি তুলল। তারপর ঘরে এসে ফেসবুকে পোস্ট দিল। সঙ্গে সঙ্গে লাইকের বন্যা। প্রচুর কমেন্টও আসছে। কারণ জানতে চাইছে অনেকে। কেউ দেশের আর্থসামাজিক অবস্থাকে দায়ী করছে। কেউ করছে সরকারকে। সরকারকে দায়ী করছে যারা, তাদের সমালোচনা করে অনেকে পোস্ট দিচ্ছে। তাদের বক্তব্য, সরকারকে ঠিকমতো কাজ করতে দিচ্ছে না বিরোধী পক্ষ। তারা উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে। তার ফলেই ঘটছে এই ধরনের আত্মহত্যা। এর মধ্যে কয়েকজন অবশ্য আমেরিকাকেও দায়ী করছে। আমেরিকার আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতিই নাকি...

চন্দন কখন চুপিচুপি এসেছে, খেয়াল করেনি শুভশ্রী। এসে একেবারে জড়িয়ে ধরেছে শুভশ্রীকে। শুভশ্রী প্রথমে ছাড়ানোর চেষ্টা করে নিজেকে। কিন্তু আরও প্রবলভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে চন্দন। শুভশ্রী ফিসফিস করে বলে, "কী হচ্ছে, ছাড়ো, কেউ এসে যাবে।"

চন্দন বলে, "কে দেখবে, কেউ নেই! সবাই সুইসাইড দেখতে গেছে।"

চন্দন একটা চুমু খায় শুভশ্রীর ঠোঁটে। এবার শুভশ্রী আঁকড়ে ধরে চন্দনকে। তার এখন মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

নানা দিক থেকে ছবি তুলে শিশির

শিবতোষের পাশে এসে দাঁড়ায়। টেনশনে সিগারেট ধরিয়েছেন শিবতোষ। শিশির বলে, "শিবতোষদা, ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছেন?"

শিবতোষ মাথা নাড়েন "না, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"কিন্তু আমাকে তো কিছু একটা লিখতে হবে। শুনছি লোকটা নাকি খুব গরিব।"

"তা বটে।"

"তা হলে কি অভাবে আত্মহত্যা লিখে দেব? খেতে না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে?"

চমকে ওঠেন শিবতোষ। বলেন, "তোমার মাথাটা কি গেছে শিশির। অনাহারে আত্মহত্যা—ব্যাপারটা কী পরিমাণে হইচই ফেলে দেবে বুঝতে পারছ। অপোনেন্ট ছেড়ে কথা বলবে! আর তা ছাড়া সুইসাইড তো করেনি এখনও! তোমাদের সবেতেই বাড়াবাড়ি!"

শিশির বলে, "কিন্তু শিবতোষদা, সুইসাইড করলেও নিউজ়, না করলেও নিউজ়। আজ যখন আমরা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা বলছি, মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাচ্ছি, তখন দেশের একটা মানুষ খেতে না পেয়ে সুইসাইড করতে যাচ্ছে, এ নিউজ় তো আমার ফ্রন্ট পেজে যাবে।"

শিবতোষ শিশিরের হাতটা চেপে ধরেন। তারপর গলা নামিয়ে বলেন, "এটা চেপে যাও তুমি, তোমার ব্যাপারটা আমি দেখছি।"

"কোথায় আর দেখছেন!" একটু ক্ষোভের গলায় শিশির বলে, "পুজোর সময় একটা ফুলপেজ অ্যাড চেয়েছিলাম, দেওয়া হল কোয়াটার পেজ। তাও এখনও পেমেন্ট পাইনি।"

শিবতোষ শিশিরের হাতে একটু চাপ দিয়ে বলেন, "কাল একবার পঞ্চায়েত অফিসে এসো, আমি থাকব, হয়ে যাবে।"

বিরোধী নেতা রুইদাস এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার তিনি মুখ খোলেন। চিৎকার করে বলেন, "নবা, মরবিই তা হলে?"

নবা বলে, "হ্যাঁ, বলছি তো।"

রুইদাস বলেন, "তুই কি কোনও সুইসাইডাল নোট লিখেছিস?"

নব একটু অবাক হয়ে বলে, "সেটা আবার কী!"

"মানে, তোর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে, এটা কি লিখে রেখেছিস কোথাও?"

নবা একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, "তোমাকে শালা বলব কেন?"

সুইসাইডাল নোট কথাটা যেন আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল গাছের নীচে দাঁড়ানো মানুষগুলোর মধ্যে। এদের মধ্যে অনেকেই নবার পিছনে লাগে। অকারণে থাপ্পড় মারে, লাথি মারে পাছায়। অনেকে কাজ করিয়ে পয়সা দেয় না। এদের সবার মনে গিঁথে গেল কথাটা। থমথমে হয়ে উঠল পরিবেশ। গুজগুজ, ফিসফাস। এর মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠল, নবা কি লিখতে পড়তে পারে? সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারছে না। অগত্যা ঠিক হল, নবাকে গাছ থেকে নামাতেই হবে, কিছুতেই মরতে দেওয়া যাবে না ওকে। শিবতোষ তার পার্টির ছেলে পল্টুকে ডাকেন। বলেন, "পল্টু, তোদের একটা বড় মই আছে না?"

পল্টু বলে, "হ্যাঁ।"

"মইটা গাছে লাগিয়ে উঠে যা না, গিয়ে নামা ব্যাটাকে।"

আগের দিনই পল্টু গা-হাত-পা টিপিয়ে নিয়েছে নবকে দিয়ে। শর্ত ছিল, চা-পাউরুটি খাওয়াবে। কিন্তু কাজ মিটে যাওয়ার পর পল্টু ভাগিয়ে দিয়েছে তাকে। তাই তার মনের মধ্যেও প্রবল টানাপোড়েন চলছিল এতক্ষণ। সে দৌড়ে গিয়ে মইটা নিয়ে এল বাড়ি থেকে। মইটা লাগাল গাছের গায়ে। দেখে চিৎকার করে উঠল নব, "খবরদার বলছি, কোনও শালা গাছে উঠবে না কিন্তু।"

কিন্তু তার কথা কে শোনে! মই বেয়ে একটু-একটু করে উঠতে লাগল পল্টু। নব তখন আরও উঁচু একটা ডালে উঠতে যায়। আর তখনই অসাবধানেই বুঝি দড়িটা পড়ে যায় হাত থেকে। দৌড়ে গিয়ে দড়িটা কুড়িয়ে নেন শিবতোষ।

দড়ি পড়ে যেতে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় নব। তারপর চিৎকার করে, "আমার দড়ি, আমার দড়ি দিয়ে দাও।"

শিবতোষ বলেন, "তুই এবার নাম হতভাগা।"

নব বলে, "নামব কেন? আমি তো গলায় দড়ি দেব।"

"দেওয়াচ্ছি তোকে গলায় দড়ি। নাম একবার, চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দেব আজ। এতগুলো মানুষকে শুধু শুধু হ্যারাস করা!" চিৎকার করে বলেন শিবতোষ।

নব বলে, "খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু, আমার দড়ি আমাকে দিয়ে দাও।"

শিবতোষ কড়া ধমক দিয়ে ওঠে "নাম বলছি আগে।"

"না, নামব না। আমি গলায় দড়ি দেব। দেবই দেব, কার তাতে কী! কোনও শালাকে ভয় খাই না আমি। তোরা সব শালা মরবি। সব শ্মশানে যাবি, "প্রবল চিৎকার করতে থাকে নবকান্ত। গলার শির ফুলে ওঠে, মুখ দিয়ে থুতু ছিটকে বেরোয়। যে ডালটা ধরে ছিল রাগের চোটে, সেই ডাল ধরে ঝাঁকাতে থাকে। ঝাঁকুনি খেয়ে ডালের আমগুলো টুপটাপ ঝড়ে পড়তে থাকে নীচে। আম পড়ছে, আম পড়ছে! হইহই করে ওঠে সকলে। প্রবল হুড়োগুড়ি পড়ে যায়। আম কুড়োতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সবাই। গাছের ওপর পাগলাটা কী বলছে, এখন তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারও।

শিল্পী: রৌদ্র মিত্র



বায়োন মন্দিরের প্রবেশপথে দুই বৌদ্ধ ভিক্ষু

বৈচিত্রে ভরা আঙ্কোর

আবাহন দত্ত

কাম্বোডিয়া খুব দূরের দেশ নয়। দূরত্বেও নয়, সংস্কৃতিতেও নয়, তবু মনে হয় সেই যেন কোথায়! সে দেশে যাওয়ার আগে এক আত্মীয়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আঙ্কোরের টানে কাম্বোডিয়া গিয়েছিলেন।

আঙ্কোর ভাট, নামটা বইয়ে পড়া। শুনেছিলাম, বিশ্বের বৃহত্তম মন্দির চত্বর। ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ পোক্ত। কারণ, সেটি আসলে খমের সাম্রাজ্যে বিষ্ণুর উদ্দেশে নিবেদিত এক হিন্দু মন্দির। আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার পঙ্‌ক্তি, "শ্যাম-কাম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম',— মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।" ফরাসি 'কাম্বোজ'-এর ইংরেজি রূপ 'কাম্বোডিয়া'। আজ সেই দেশকে আমরা যেমন দেখি, অর্থাৎ এখন কাম্বোডিয়া বলতে আমরা যা বুঝি, তার প্রথম শাসক ছিলেন দ্বিতীয় জয়বর্মন (৮০২-৩৫)। ইতিহাস বলে, ৮০২ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে 'দেবরাজ' বা 'বিশ্বজনীন রাজা' বলে ঘোষণা করেছিলেন তিনি। যুবা বয়সে তিনি জাভার বৌদ্ধ শৈলেন্দ্র বংশের রাজসভায় থাকতেন এবং দেশে ফিরে এসেই দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর জাভার দখলদারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্ররোচনা দেন। বহু জোট ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশকে নিজের দখলে আনেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খমের সাম্রাজ্য। আজও কাম্বোডিয়ার মানুষ, ভাষা, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী সব কিছুকেই বলা হয় খমের। এই সব গল্প জানা যায় খমেরদের জনপ্রিয় তীর্থস্থান তথা প্রাচীন

রাজধানী শহর আঙ্কোরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত নম কুলেন-এর পবিত্র পাহাড়ে প্রাপ্ত এক শিলালিপি থেকে।

ভ্রমণের পরিকল্পনা করার আগে এটা ঠিক করে ফেলেছিলাম, সড়কপথে যাব। তা না হলে খুঁটিয়ে দেখা যাবে না। অতএব তাইল্যান্ড থেকে ল্যান্ড বর্ডার পেরিয়ে কাম্বোডিয়া ঢুকতে হবে।

ব্যাঙ্ককের সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টে নেমে প্রথমটায় অবশ্য একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। পুলিশেকে সিয়েম রিপ যাওয়ার কথা বলায়, তাঁরা বাতলে দিয়েছিলেন বাস স্টেশন, সঙ্গে বর্ডার বিষয়ে সাবধানবাণী— কাম্বোডিয়ার পুলিশ নাকি তাইল্যান্ড পুলিশের মতো সৎ নয়, খুব ঘুষ খায়! ভাবলাম, অ্যাডভেঞ্চারটা একটু বেশি হয়ে গেল নাকি! যদিও মো চিট স্টেশনে সিয়েম রিপ-গামী বাসে ওঠার পর থেকেই অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলতে লাগল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রবল আরামদায়ক বাসেই পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, বর্ডারে পৌঁছতে এল লাঞ্চ। এ পারে অরণ্য প্রাথেট, ও পারে পয় পেট, বিন্দুমাত্র ঝক্কি নেই। আরও অবাক হলাম, যখন জানলাম যে, এই বাসটাই নাকি সোজা সিয়েম রিপ যাবে। এই বাহন যে আন্তর্জাতিক, তা আগে বুঝিনি। কাম্বোডিয়ার রাস্তা অবশ্য তাইল্যান্ডের মতো মসৃণ নয়। তবে বাসের চলন— যাকে বলে মাখনের মতো।

সিয়েম রিপ ফরাসি আমলের ছোটখাটো, শান্ত, সুন্দর শহর। মূলত পর্যটকদের শহর। তাঁদের আনাগোনার ভরসাতেই দাঁড়িয়ে আছে জায়গাটা। যে পর্যটকেরা আসেন, তাঁদের একশো শতাংশই আঙ্কোরের দর্শনার্থী। হবে না-ই বা কেন? এ দেশের হৃদয় আর আত্মা দুই-ই আঙ্কোর। খমেরদের কাছে আঙ্কোরের অসংখ্য মন্দির অনুপ্রেরণার উৎস, জাতীয় গর্ব। সে জন্যই দশকের পর দশক ধরে বহু সন্ত্রাস ও আঘাতের পরও আঙ্কোরের পুনর্নির্মাণ চলছে। তীর্থক্ষেত্র যেমন হয়। আর পর্যটকরা মোহিত হন তার অমিত সৌন্দর্যে।

আঙ্কোর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দ্বিতীয় জয়বর্মন। আঙ্কোরের জোরেই এই অঞ্চলে রাজতন্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাসে প্রথম শাসক হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উত্থানের সাক্ষী দ্বিতীয় জয়বর্মন। আঙ্কোরের ধূমকেতুর মতো উত্থানের পিছনে সবচেয়ে বড় কারিগরি ছিল



আঙ্কোর দোমের প্রবেশ পথ

জল ও জলকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবহারের পদ্ধতি নির্মাণ। জলকে হাতিয়ার করেই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছিল খমেররা। বিপুল পরিমাণ সেচের প্রথম নিদর্শন মেলে প্রথম ইন্দ্রবর্মনের (৮৭৭-৮৯) আমলে। এই সেচের মাধ্যমেই বেঁচে থাকত শহর। এ সময়ই ইন্দ্রতাতকের ‘বারে’ (জলাধার) তৈরি হয়েছিল, যা আজ শুকিয়ে গিয়েছে। তাঁর শাসনেই সমৃদ্ধ হয় আঙ্কোর শিল্প। রোলুয়োস অঞ্চলের মন্দিরগুলিও এই সময়ই তৈরি, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বাকোং। নিজের সুসময়ে এই শহরের জনসংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। তুলনীয়, সে কালের ছোট্ট শহর লন্ডনে মাত্র পঞ্চাশ হাজার লোকের বাস ছিল। আঙ্কোরের বাড়িঘর, সরকারি ভবন ও প্রাসাদগুলি কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল। বহুদিন হল সে সব আর নেই। ইট বা পাথর দিয়ে তৈরি কাঠামোয় থাকার অধিকার কেবল দেবতাদেরই ছিল। তাই মন্দিরগুলো রয়ে গিয়েছে। সুবিপুল এলাকা জুড়ে জল-জঙ্গলঘেরা অঞ্চল। আঙ্কোর ঘোরার সময় তাই কেবল দেখা যায় কয়েকশো মন্দির। সেগুলোই বহুকালের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কেন্দ্র, যেন প্রাচীন খমের সাম্রাজ্যের কঙ্কাল।

আঙ্কোর ঘুরে দেখার বর্ণনার আগে তার বিস্তৃত ইতিহাসের কিছুটা অন্তত বলতেই হয়। মনে রাখা ভাল, আঙ্কোর যুগের বয়স ৬০০ বছরেরও বেশি, ৮০২ থেকে ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কাম্বোডিয়ার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রাজ্যগুলি একসঙ্গে যুক্ত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল। এক অভূতপূর্ব রাজতন্ত্রের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল আঙ্কোর, যা মেকং অববাহিকার বেশির ভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু সব সাম্রাজ্যের মতোই একদিন আঙ্কোরেরও পতন হল। একাদশ শতকে নিজের এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে আঙ্কোর সাম্রাজ্য। সে সময় ক্ষমতার কেন্দ্রে শূন্যস্থান তৈরি হয়, একরকম জোর করেই তা দখল করেন প্রথম সূর্যবর্মন (১০০২-৪৯), এবং দ্বিতীয়



আঙ্কোর ভাট মন্দির

জয়বর্মনের দু'শো বছর আগেকার পুরনো কায়দাতেই অসংখ্য জোট ও যুদ্ধ করে সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন। আঙ্কোরের পুরো পর্ব লক্ষ করলে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়— প্রথমে বিচ্যুতি ও বিশৃঙ্খলা, তারপর পুনর্মিলন, এবং শক্তিশালী রাজার নেতৃত্বে আরও বিস্তৃতি— ফিরে ফিরে আসতে থাকে। স্থাপত্যের দিক থেকে আবার সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ সময় বিশৃঙ্খলার পরেই দেখা যেত। ইতিহাসবিদদের অনুমান, নতুন ক্ষমতাসীন রাজারা উদ্‌যাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন, অতএব বিশাল বিশাল নির্মাণের মাধ্যমে শাসনকে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

এর পরবর্তী দ্বন্দ্বের পর্ব ১০৬৬ নাগাদ। সে সময় ক্ষমতার লড়াই চলতে চলতে যখন দ্বিতীয় সূর্যবর্মন (১১১২-৫২) গদিতে বসলেন, তখন সাম্রাজ্য ফের একতাবদ্ধ হল। ফের একপ্রস্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃতির লড়াই। ভিয়েতনাম এবং চাম্পার (মধ্য ভিয়েতনাম) বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন রাজা। চাম্পাকে নিজের পায়ের কাছে এনে ফেলে বানালেন



চারটি মুখের অবলোকিতেশ্বর

অধীনস্থ সামন্তপ্রভু। এই যুদ্ধে বিপুল অর্থব্যয় হয়। তবু জনতার চোখে তিনি অমর। কারণ, হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর নিবেদনে মহৎ মন্দির আঙ্কোর ভাট নির্মাণ করিয়েছিলেন তিনিই। এই সময়ের ঘটনাক্রম এবং দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের রাজত্বকালের কথা মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম করিডরেই খোদাই করা আছে।

এর পরে অবশ্য মেকং নদী ও তোনলে সাপ হ্রদ ধরে নৌ অভিযানের মাধ্যমে ১১৭৭-এ পালটা আঘাত হানে চাম-রা। সকলকে চমকে দিয়ে দখল করে নেয় আঙ্কোর শহর। হত্যা করা হয় রাজা দ্বিতীয় ধরণীন্দ্রবর্মনকে। আবার, পরের বছর দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের এক আত্মীয়ের নেতৃত্বে আর-এক নৌ-যুদ্ধে চামদের পরাজিত করে দেয় খমের বাহিনী। এর পর ১১৮১-তে নতুন নেতা হিসেবে অভিষিক্ত হন সপ্তম জয়বর্মন (১১৮১-১২১৯)। তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আঙ্কোর দোম শহরটি তাঁর আমলে তৈরি হয়, সঙ্গে নির্মিত হয় আরও বহু মন্দির। এখন আঙ্কোরের আশপাশে যে অসংখ্য সব নির্মাণ দেখা যায়, তার বেশির ভাগই সে সময় তৈরি। যদিও এই রাজার প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা গবেষকের নানা মত। বায়োন মন্দিরের কারুকাজ দেখলে মনে হয় রণাঙ্গনে তিনি ভয়ানক হিংস্র। আবার তাঁর মূর্তিগুলি ধ্যানীর। তাঁর মন্দির নির্মাণ ও অন্যান্য উদ্যোগ অত্যধিক দ্রুত সম্পন্ন হয়েছিল, ফলে নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের উপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল। এবং এর জন্যই তাঁর পতন ত্বরান্বিত হয়। প্রথমত, নিজের শাসনকে মান্যতা দেওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল সপ্তম জয়বর্মনের, না হলে রাজরক্তের নিকটাত্মীয়দের কেউ সিংহাসন দাবি করতে পারত। দ্বিতীয়ত, প্রজাদের কাছে একটা নতুন ধর্মের স্বরূপ উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন তিনি, যে প্রজাদের অধিকাংশই তখন ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। যদিও অনেকে বলেন, তিনিই নাকি কাম্বোডিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক নেতা। সমাজের সকলকে সমান চোখে দেখা, জাতপাত নির্মূল করা ছাড়া বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও রাস্তা নির্মাণের উপরও জোর দিয়েছিলেন সপ্তম জয়বর্মন।

বহু পর্যটকেরই এই ধারণা থাকে যে, এক বা দু'দিনের মধ্যে চত্বরের সব মন্দির দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে ঢোকার পর বুঝতে পারেন, কীভাবে এক দেবরাজ থেকে আর-এক দেবরাজের আমলে



নারকেলের দুধ দিয়ে তৈরি মাছের আমোক



স্টিকি রাইস আর মাংসের পদ লোকলাক

মন্দিরের কারুকাজ বদলে যাচ্ছে। এক বিপুল বৈচিত্রের জগৎ। বিচিত্র স্থাপত্য বায়োনের সামনে দাঁড়ালে এক অনুভূতি, আবার প্রাকৃতিক বিস্ময় তা প্রোমের সামনে দাঁড়ালে আর-এক রকম। কিংবা প্রাচীন তীর্থযাত্রীদের মতো সহস্র লিঙ্গের পবিত্র নদী ধরে হাঁটার রোমাঞ্চ! প্রথম বিশ্বের কোনও প্রান্তে এই সৃষ্টির অবস্থান হলে আলোড়নের মাত্রা অন্যরকম হত। সুতরাং একদিনে আঙ্কোর— ভাববেনও না।

এত বড় নির্জন প্রত্নতাত্ত্বিক শহরে ঘুরতে ঘুরতে কখন যেন ইতিহাসের ভিতর হারিয়ে যেতেই হয় পর্যটকদের। আমাদের আঙ্কোর ভাট মন্দির দেখতে লেগেছিল আস্ত একটা বেলা। তারপর জঙ্গলের ভিতরেই এক চমৎকার রেস্তরাঁয় খমের লাঞ্চ। তখন আবার সংবিৎ ফেরে আধুনিক জগতে। প্রবল রোদ আর গরমের মধ্যে সাময়িক স্বস্তিও বটে। প্রয়োজনে ট্র্যাভেল গাইড খুলে কী দেখলাম তা একবার ঝালিয়ে নেওয়া এবং কী দেখতে চলেছি তা-ও বুঝে নেওয়া। প্রথম দিন দুপুরে আঙ্কোর দোম, বিকেলে তা প্রোম দেখে বেরোতে বেরোতেই সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছিল। সিয়েম রিপ শহরে যখন ফিরেছিলাম, চারপাশে আলো ঝলমল করছে।

চোখের সামনে দেখার পর এ কথা স্বীকার করতেই হয়, এমন সৃষ্টিশীলতার আকাঙ্ক্ষা আর আধ্যাত্মিক ভাবের চমৎকার মিশেল দেখে-দেখেও আশ মেটে না। ক্লান্ত লাগে না। আকৃতি, মাপ ও নৈপুণ্যে নিজের পূর্বপুরুষকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন প্রত্যেক কাম্বোডিয়ান 'দেবরাজ'। এই পদ্ধতিতেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় ভবন।

অনেক গবেষকের মতে, আঙ্কোর ভাট নির্মাণের কালটি সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সময় হলেও, তখন থেকেই তার পতনেরও সূচনা হয়েছিল। আঙ্কোরের উত্তর ও পশ্চিম দিকে, যেখানে জনসংখ্যা খুব বেশি ছিল, সেখানে অত্যধিক সেচখাল কাটা এবং বিপুল অরণ্য ধ্বংস করার ফলে পলি জমতে থাকে। আঙ্কোর ভাট ও আঙ্কোর দোমের মতো বিপুল নির্মাণ-প্রকল্প রাজকোষে ভয়ানক চাপ সৃষ্টি করেছিল। সেই চাপ পড়েছিল হাজার হাজার ক্রীতদাস ও সাধারণ মানুষের উপর, যাঁরা প্রভূত শ্রম ও রাজস্ব দিয়ে এই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। তাই সপ্তম জয়বর্মন ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পরেই নির্মাণকাজ থমকে যায়। বেশির ভাগ অঞ্চলেই বেলেপাথরও প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তী শাসকের আর-একটি চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয়ী শত্রুতা। সাম্রাজ্যের অস্তাচলের সময় বেশ কয়েকবার রাজধর্ম বদল হয় এবং এ সময় মূর্তি ভাঙার কাজেই বেশি জোর দিয়েছিলেন রাজারা! নিজেদের কৃতিত্বের জন্য সৌধ নির্মাণের চেয়ে পূর্বসূরিদের নির্মিত মন্দিরের কারুকার্য নষ্ট করাই মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সময়-সময় গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে আঙ্কোর। তাইদের উদয় হয়— কুবলা খান আর তাঁর মোঙ্গল বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে ইউনান থেকে আরও দক্ষিণে পালিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। প্রথমে সুখোতাই ও পরে আয়ুথিয়া দখল থেকে শক্তিবৃদ্ধি করেন তাইরা। আঙ্কোরের উপর বারবার আক্রমণ হেনে ১৪৩১ সালে শহরকে দখলে আনেন। প্রথমেই রাজসভা থেকে কারিগর, নৃত্যশিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সম্ভবত চিনের সঙ্গে সমুদ্র বাণিজ্যের সম্ভাবনায় এবং আরও মারমুখী হয়ে ওঠা তাইদের ভয়ে নম পেন অঞ্চলে অভিবাসন করতে থাকেন খমের অভিজাতরা। সেই শতকে কয়েকবার রাজধানী বদল হয়। শেষপর্যন্ত বর্তমান নম পেন শহরেই প্রতিষ্ঠিত হন তাঁরা।

১৬০০ থেকে ১৮৬৩ সালে ফরাসিদের আগমন পর্যন্ত রাজবংশের অন্তর্দ্বন্দ্বের আবহে একের পর এক দুর্বল রাজা শাসনকাজ পরিচালনা করেন। এ রকম চক্রান্তের পরিবেশের মধ্যে তাঁরা কেউ তাইল্যান্ড, কেউ ভিয়েতনামের কাছে সুরক্ষা চান। তা মেলেও, তবে বড়সড় মূল্য দিয়ে। সপ্তদশ শতকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের গুয়েন প্রভু কাম্বোডিয়ার রাজার পরিত্রাণে আসেন, বিনিময়ে মেকং ব-দ্বীপ অঞ্চলে থাকার অধিকার তাঁদের দিয়ে দিতে হয়। এই এলাকাকে আজও 'কাম্পুচিয়া ক্রম' (নিম্ন কাম্বোডিয়া) বলে চিহ্নিত করেন খমেররা। যদিও এই এলাকায় ভিয়েতনামিজ়দেরই সংখ্যাধিক্য। ১৭৯৪ থেকে পশ্চিম অঞ্চলের বাতামবাং ও সিয়েম রিপ প্রদেশ নিয়ন্ত্রণ করতেন তাইরা এবং কাম্বোডিয়ার রাজপরিবারের উপর তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এমনকী, একজনের রাজ্যাভিষেকও হয় ব্যাঙ্ককে এবং তাই সেনার সহায়তায় উদোন-এ রাজত্বও শুরু করেন তিনি। অষ্টাদশ শতক জুড়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে কাম্বোডিয়ার টিকে থাকতে পারার একমাত্র কারণ হল, প্রতিবেশীরাও নিজ নিজ সমস্যায় জর্জরিত ছিল। বর্মিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজেদের যাবতীয় শক্তি ও অর্থ খরচ করে ফেলেছিলেন তাইরা এবং ভিয়েতনামিজ়দের ছিল প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই ঘটনাবলি দুই শতকেরও বেশি সময় ধরে চলে। কাব্য করে বলা হয়, কাম্বোডিয়ার মৃতদেহ নিয়ে যেন দুই শক্তিশালী বাঘের টানাহেঁচড়া চলেছে।



তা প্রোম মন্দিরের গা বেয়ে নেমে এসেছে গাছের ঝুরি



আঙ্কোর ভাটের বিস্তৃত ও মনোমুগ্ধকর প্যানেল



তবে এর মধ্যেই, ষোড়শ শতকে বৌদ্ধ ধর্মস্থান হিসেবে আঙ্কোর ভাট পুনরুদ্ধার করেছিল খমের রাজপরিবার। আঙ্কোরের বাদবাকি মন্দির অবশ্য আরও বহু শতক ধরে জঙ্গলে ঢাকা পড়ে ছিল। বেশির ভাগ মন্দিরই বেলেপাথরে তৈরি, যা দীর্ঘদিন স্যাঁতসেঁতে জায়গায় থাকলে ক্ষয়ে যায়। জায়গায় জায়গায় বাদুড়ের বাসা তৈরি হওয়ায় কারুকার্য ও পাথরের ক্ষতি হয়। তা প্রোমের মতো কিছু সৌধকে জঙ্গল প্রায় গ্রাস করে ফেলে। সেই সব গাছকে আর সরানো যায়নি। কারণ, জালের মতো বিস্তৃত শিকড়ের সাহায্যেই এখন দাঁড়িয়ে আছে কাঠামোগুলো।

১৮৬০ সালে আঙ্কোর 'আবিষ্কার' করেন ফরাসিরা। যদিও একে 'আবিষ্কার' বলা যায় না। কারণ, ফরাসি অভিযাত্রী হেনরি মুহো যখন প্রথম ভুলবশত আঙ্কোর ভাটে গিয়ে পৌঁছন, তখন তা রীতিমতো চালু একটি মন্দির। ভিক্ষু ও দাসেরা সেই সমৃদ্ধ মন্দির চত্বরে থাকতেন। তা ছাড়া ষোড়শ শতকের পর্তুগিজ পর্যটকেরাও আঙ্কোরে পৌঁছেছিলেন, যাকে তাঁরা বলতেন প্রাকার-ঘেরা শহর। ১৬১৪ সালে আঙ্কোরের নিখুঁত বিবরণ দিয়েছিলেন দিয়োগো দো কৌতো, কিন্তু তা ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। আবার মুহোর দশ বছর আগে চার্লস-এমিল বুলিভু নামে এক ফরাসি পাদরি আঙ্কোরে গিয়েছিলেন এবং সেই ভ্রমণের কথা লিখেছিলেন। যদিও বুলিভুর লেখা অগ্রাহ্যই করা হয়। ১৮৬৮ সালে মুহোর 'ভয়েজ আ সিয়াম এত দাঁ ল্য কাম্বোজ'-এর মাধ্যমেই আঙ্কোর প্রথম জনসমক্ষে আসে, সেই প্রথম আন্তর্জাতিক ভাবে আঙ্কোর নিয়ে হইচই শুরু হয় এবং কাম্বোডিয়ার বাইরেও তাকে নিয়ে উৎসাহ দেখা দেয়। খুঁটিনাটি বিবরণ ও মন্দিরের রঙিন স্কেচ সংবলিত মুহোর লেখাই জনমানসে গৃহীত হয়। সেই সূত্রেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ঘিরে আগ্রহী হয়ে ওঠে গোটা বিশ্ব। ১৮৭০-এর দশকে তাঁর মৃত্যুর পর কাম্বোডিয়ার হারিয়ে যাওয়া মন্দির-নগরীর 'আবিষ্কর্তা' হিসেবে স্বীকৃতি পান মুহো, যদিও তিনি নিজে তেমন কোনও দাবি কখনও করেননি। মুহোর সময় থেকে ফরাসি অভিযাত্রীরা সেখানে যেতে শুরু করেন। ১৯০১ সালে 'ইকোল ফ্রাঙ্কাই দ্যো এক্সট্রিম-ওরিয়েন্ট' (ইএফইও) নামে এক সংস্থার সঙ্গে আঙ্কোরের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠে। বায়োন অভিযানের খরচ দেয় তারা। ১৫০ বছর তাই নিয়ন্ত্রণে থাকার পর ১৯০৭ সালে আঙ্কোরকে কাম্বোডিয়ার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সমগ্র ক্ষেত্রটি পরিষ্কার করে পুনরুদ্ধার করার দায়িত্ব নেয় ইএফইও। সেই বছরই আঙ্কোরে আসতে শুরু করেন বিদেশি পর্যটকেরা— তিন মাসে পৌঁছে গিয়েছিলেন দু'শো জন! তাঁদের চোখে আঙ্কোর তখন জঙ্গল থেকে 'উদ্ধার' করা হয়েছে এবং নতুন দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

ইএফইও-র নেতৃত্বে যখন আঙ্কোর পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়, তখন বেশ কিছু প্রায়োগিক সমস্যা ও তাত্ত্বিক মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। জঙ্গল সাফ করতে করতেই দেখা যাচ্ছিল তা ফের গজিয়ে যাচ্ছে। আবার, মন্দিরকে কতদূর পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে, তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। কারও কারও মত ছিল, হিন্দু মন্দিরে পরে যে সব বুদ্ধের ছবি বসানো হয়েছে, সেগুলোও সরিয়ে ফেলা হোক। ১৯২০-র দশকে অ্যানাস্টাইলোসিস প্রক্রিয়ায় কাজ শুরু হয়। জাভার বরোবুদুর পুনরুদ্ধারে এই প্রক্রিয়াই ব্যবহার করেছিল ওলন্দাজরা। মূল স্থাপত্যের উপকরণ যতদূর সম্ভব ব্যবহার করে এবং কাঠামোর মূল চেহারা যতদুর সম্ভব অবিকৃত রেখে, কোনও বাড়ি বা সৌধের ধ্বংসাবশেষকে পুনরুদ্ধার করার প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতিকে বলে অ্যানাস্টাইলোসিস। যেখানে মূল উপকরণ খুঁজে পাওয়া যায় না, একমাত্র সেখানে নতুন উকপকরণ ব্যবহার করা যায়। এর একটি উদাহরণ হল আঙ্কোর ভাটের মূল প্রবেশপথের বাঁধানো রাস্তা বা কজ়ওয়ে, যার ডান দিকের অংশটি ফরাসিরা পুনরুদ্ধার করেছিল।



তা সোম মন্দির

পুনরুদ্ধারের প্রথম কাজ ১৯৩০ সালে বান্টি স্রেই-তে হয়েছিল। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আঙ্কোরের নানা এলাকায় কাজ শুরু হয়। ১৯৬০-এর দশকে আঙ্কোর পুনরুদ্ধারের বিপুল কর্মযজ্ঞ তারই ফল। বিরাট বিরাট ক্রেন ও বুলডোজার নিয়ে এসে সমীক্ষা-সংস্থার সাহায্যে কাজ শুরু হয়।

আঙ্কোরে ঢোকার তিন রকম টিকিট— এক দিনের পাস ২০ ডলার, তিন দিনের ৪০ ডলার এবং এক সপ্তাহের ৬০ ডলার। পাসের মেয়াদ বাড়ানো যায় না এবং পর পর দিন হিসেবেই গোনা হয়। আঙ্কোর ভাট

যাওয়ার পথে বিরাট এলাকা জুড়ে কাউন্টার রয়েছে। সেখানে ছবি তুলে পাস দেওয়া হয়। বিকেল পাঁচটার পর গেলে সে দিনের টিকিট আর পাওয়া যায় না, তবে চমৎকার সূর্যাস্ত দেখার অভিজ্ঞতা হয়। পাসের দামের মধ্যে সিয়েম রিপ অঞ্চলে সব ক'টি সৌধে প্রবেশের দামই ধরা থাকে। অনেক মন্দিরে আবার আলাদা আলাদা করে টিকিট চেক করার ব্যবস্থা আছে। আমাদের হাতে তিন দিনের পাস ছিল। প্রথম দিনের কথা আগেই বললাম, দ্বিতীয় দিন ঘুরেছিলাম বান্টি স্রেই, প্রে খান, প্রে নিক পন, তা সোম এবং ফেরার পথে বান্টি সামরে।

আঙ্কোর রক্ষায় আজও যেমন যত্ন চোখে পড়ে, তা সংরক্ষণের প্রথম থেকেই ছিল। এমনকী, হাজার বছর ধরে প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনাম, তাইল্যান্ড ও মায়ানমারের সঙ্গে বহু যুদ্ধ হয়েছে, কাম্বোডিয়ায় গৃহযুদ্ধ হয়েছে এবং খমের রুজ বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে, তবু আঙ্কোরে হাত পড়েনি। যদিও বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সেনাশাসন ও কমিউনিস্ট আমলে আঙ্কোরের বিপুল ক্ষতি হবে, এই ধারণায়, সুরক্ষার জন্য মন্দির চত্বর থেকে বহু মূর্তি সরিয়ে ফেলেছিল ইএফইও এবং মিনিস্ট্রি অফ কালচার। তবে কাম্বোডিয়ার অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার ফলে পুনরুদ্ধারের কাজ ব্যাহত হতে থাকে। জঙ্গল বেড়ে গিয়ে মন্দিরগুলির ক্ষতি হয়। বিশ্বের শিল্প-বাজারে বিভিন্ন উপকরণের অবৈধ ব্যবসাও আঙ্কোরের সামনে একটি বিপদস্বরূপ। ইদানীংকালেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কয়েকটি মন্দিরের ক্ষেত্রে এই বিপদের কথা শোনা গিয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকাভুক্ত হয়েছে আঙ্কোর। এবং তার উপর সব সময়ই স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর কড়া নজর আছে, যারা মন্দিরগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে। ২০০৩ সালে ইউনেস্কোর বিপন্ন তালিকা থেকে বেরোতে পারে আঙ্কোর। এখনও আঙ্কোরের বহু রহস্য আবিষ্কৃত হয়নি। কারণ, পুনরুদ্ধারের সময় প্রায় পুরো শ্রমই মাটির উপরে অবস্থিত মন্দিরগুলিকে বাঁচানোর কাজে ব্যয় করা হয়েছে, গভীরে গিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন সে ভাবে হয়নি। মনে করা হয়, মাটির নীচেই আঙ্কোর এবং তার বাসিন্দাদের আসল গল্প লুকিয়ে আছে। মন্দিরের শিলালিপিগুলি দেবতাদের— যাঁদের উদ্দেশে সৌধগুলি নিবেদিত— খণ্ডচিত্র প্রদর্শন করে। নির্মাণকারী রাজাদের কথাও আছে সেখানে।



প্রে রুপ মন্দিরের উপর থেকে

এই বৃহৎ যজ্ঞ দেখার জন্য যথেষ্ট পরিকল্পনা দরকার। তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও আছে। আঙ্কোর দর্শনের দুটো মূল পথ— স্মল সার্কিট ও বিগ সার্কিট। স্মল সার্কিট ১৭ কিলোমিটার, আঙ্কোর ভাট থেকে শুরু করে উত্তর দিকে যায়। সেই রাস্তায় পর পর আসে নম বাখেং, বাকসেই চামক্রং, আঙ্কোর দোম, বায়োন, বাফুয়োন, রাজকীয় বেষ্টনি, ফিমিনাকাস, প্রে পালিলে, রাজা লেপেরের চত্বর, হাতিদের চত্বর, ক্লিংস, প্রাসাত সুয়োর প্রাত। পূর্ব দেওয়ালের বিজয়তোরণ দিয়ে আঙ্কোর দোম থেকে বেরনোর পর আসবে চাউ সে তেভোদা, থোম্মানোন, স্পিন মর এবং তা কেয়ো। তার পরে উত্তর-পূর্ব দিকের রাস্তা ধরে যেতে হবে 'তা নেই' মন্দিরে, সেটা তা প্রোমের ঠিক দক্ষিণেই অবস্থিত। পূর্বদিকে এগোতে থাকলে আসবে বান্টি দেই ও স্রা স্রাং এবং শেষপর্যন্ত প্রাসাত ক্রাভান হয়ে তা আঙ্কোর ভাটে ফিরবে। বিগ সার্কিট আসলে আগেরটারই বৃহৎ সংস্করণ, মোট ২৬ কিলোমিটার। আঙ্কোর দোমের প্রাচীর ঘেরা শহরের পূর্ব গেট দিয়ে বেরনোর বদলে উত্তর গেট দিয়ে বেরোতে হয় এবং তা চলতে থাকে প্রে খান ও প্রে নিক পোন অবধি, যেটি তা সোমের পূর্বে। তারপর দক্ষিণ দিকে যেতে হয় পূর্ব মেবন থেকে প্রে রুপ অবধি। সেখান থেকে প্রথমে পশ্চিম, তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলে আঙ্কোর ভাটে ফিরে আসা যায়। সিয়েম রিপ থেকে উত্তর দিকে গেলে প্রথম মন্দির পড়বে আঙ্কোর ভাট, তার পরেই দেওয়ালে ঘেরা শহর আঙ্কোর দোম। এই শহরের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টি বিশাল জলাধার আছে। এতেই বেঁচে থাকত সে সময়ের ওই বিপুল জনসংখ্যা। আরও পূর্বে প্রোম, বান্টি দেই ও প্রে রুপ। আঙ্কোর দোমের উত্তরে প্রে খান, আরও উত্তর-পূর্বে বান্টি স্রেই, কবাল স্পিন, নম কুলেন, বেং মিলি। সিয়েম রিপের দক্ষিণ-পূর্বে আছে রোলুয়োস গোষ্ঠীর মন্দিরগুলি, যেগুলি আঙ্কোর পর্বের গোড়ার দিকে তৈরি।

আঙ্কোরের ইতিহাস মোটামুটি জেনে-বুঝে নিতে গেলে এক বার ঘুরে আসতে হবে আঙ্কোর ন্যাশনাল মিউজিয়াম বা জাতীয় জাদুঘরে। সংগ্রহশালা হিসেবে এটি দুর্দান্ত। খমের সভ্যতা ও আঙ্কোরের সমৃদ্ধি সম্পর্কে যত খুটিনাটি তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে এবং যাচ্ছে, সে সবই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এখানে সাজানো রয়েছে। যুগ, ধর্ম ও শাসন হিসেবে ভাগ করা আছে গ্যালারিগুলি। টাচ-স্ক্রিন ভিডিয়ো, অসামান্য ধারাভাষ্য এবং বড় পরদায় আঙ্কোরের ইতিহাস ও বর্তমান দর্শনের আধুনিক ব্যবস্থা আছে এখানে। দেখতেই হবে 'হাজার বুদ্ধের প্রদর্শনী'।

কিসে চড়ে ঘোরা হবে, তা অবশ্যই আঙ্কোর ঘোরার আগের দিন ঠিক করে নিতেই হবে। পায়ে হেঁটে ঘোরার সুযোগ যে নেই, এমন নয়, তবে প্রবল গরমের দেশে সেই ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। প্রত্যেকটা মন্দিরই কিন্তু কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সিয়েম রিপ শহর থেকে আঙ্কোর দোমের দূরত্ব ৮ কিলোমিটার, জনপ্রিয় মন্দিরগুলো আবার সেখান থেকে আরও কয়েক কিলোমিটার। অতএব টুকটুক। কাম্বোডিয়ার এই জনপ্রিয় যানটি মোটরবাইকের পিছনে জুড়ে দেওয়া দু'পাশ খোলা চার জন বসার মতো একটা গাড়ি। আঙ্কোর ঘোরার ক্ষেত্রেও স্থানীয় এবং নিরীহ এই যানই বেশির ভাগ পর্যটক ব্যবহার করেন। সিয়েম রিপে বাস থেকে নামার পরই পর্যটকদের ছেঁকে ধরেন টুকটুক চালকরা। হোটেলে যাওয়ার পথে তাঁদের কারও সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে নিলেই হল। অনেক ক্ষেত্রেই টুকটুকের চালকরা খুব ভাল গাইডের কাজ করেন। বেড়ানোর ক্ষেত্রে টুকটুকের নির্দিষ্ট রেট থাকলেও বিদেশি দেখলে দাঁও মারার চেষ্টা হয়েই থাকে। তাই দরাদরিই দস্তুর।

শুধু ইতিহাস নয়, স্থাপত্যেও আঙ্কোর বৈচিত্রময়, সমৃদ্ধ। যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহৎ শক্তি হিসেবে ক্ষমতা সংহত করেছে খমের সাম্রাজ্য, ইতিহাসের সেই অবিশ্বাস্য সময় আঙ্কোরের মন্দিরগুলো তৈরি। আঙ্কোরের প্রথম যুগের সৌধ রোলুয়োস থেকে শুরু করে খমের স্থাপত্য ক্রমশ বদলেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা স্থাপত্যগুলিকে ন'টি যুগে ভাগ করেছেন। প্রত্যকটা যুগের নামকরণ হয়েছে স্থাপত্যশৈলী দিয়ে। খমের স্থাপত্যের বিবর্তনের ভিত্তি ছিল পাহাড়ের উপর মন্দির। সাধারণত আসল পাহাড়ের উপরেই, অভাবে নকল পাহাড়। কোনও একটা মন্দির যত আগে নির্মিত, ততই তা মূল ভাবনাটির কাছাকাছি। ধাপে ধাপে তৈরি এক-একটি স্তম্ভ বা টাওয়ার ছিল পাহাড়ের প্রতীক। একেবারে চূড়ায় থাকত কেন্দ্রীয় উপাসনাস্থল। তার পূর্ব দিকে একটি উন্মুক্ত দরজা এবং কম্পাসের মূল বিন্দুগুলিতে আরও তিনটি নকল দরজা। বাখেং যুগে এই ধরনটি আরও অলংকৃত হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় টাওয়ারের চূড়াটি পাঁচটি শৃঙ্গ দিয়ে সাজানো হয়। চারটি কম্পাসের বিন্দুতে, একটি মাঝখানে। আঙ্কোর ভাটেও এই বৈশিষ্ট্যই দেখা যায় বহু জাঁকজমকে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে একটি প্রবেশস্তম্ভ বা টাওয়ার এবং বাঁধানো প্রবেশপথ, যার দু'পাশ ধরে থাকে পৌরাণিক চরিত্র নাগ।



বায়োন মন্দিরের ভিতর

মন্দিরগুলি যত ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে, ততই কেন্দ্রীয় টাওয়ার গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে, যদিও সেটাই মন্দিরের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে। পরে স্তম্ভের পাশে তৈরি হয় বিস্তৃত চত্বর বা কোর্টইয়ার্ড এবং অলংকৃত গ্যালারি। গেটের পাশে ও দেওয়ালের কোণে ছোট স্তম্ভ স্থাপন করা হয়। সব মিলিয়ে এগুলির যা সংখ্যা, তা ধর্ম ও জ্যোতিষে তাৎপর্যপূর্ণ। পুনর্গঠন ও সংযোগ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় আঙ্কোর ভাটে, যেখানে আঙ্কোর-স্থাপত্যশৈলীর সামগ্রিক বিবর্তনের ছবি ধরা পড়ে। তা প্রোম ও প্রে খানের মতো মন্দিরগুলির মাধ্যমে বায়োন যুগের স্থাপত্য ঐতিহ্য ভঙ্গ করে। এগুলিতে গ্যালারি, করিডর ও চত্বরের অনুভূমিক বিন্যাস দেখা যায়, যা কেন্দ্রীয় স্তম্ভকে পুরো ঢেকে দেয়। এই কাঠামোগুলিতে করিডর ও দরজাগুলি সংকীর্ণ। এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়— সম্পূর্ণ খিলান তৈরির ক্ষেত্রে আলম্ব নির্মাণের দক্ষতা অর্জন করে পারেননি আঙ্কোরের শিল্পীরা। তাই একটার উপর একটা ব্লক বসিয়ে খিলানগুলি তৈরি হত, যতক্ষণ না সেগুলো একটি কেন্দ্রীয় বিন্দুতে মিলত। এগুলিকে বলা হত নকল খিলান। কারণ, সেগুলো খুব অল্প সময় ঠেকনো দেওয়ার কাজ করত।

আঙ্কোর ভাট সন্দেহাতীত ভাবে সবচেয়ে বিস্ময়কর মন্দির। এই মন্দির অনন্য— আধ্যাত্মিকতা ও ভারসাম্যের এক মিশেল এবং দেবতার প্রতি মানুষের নিষ্ঠার বিরাট উদাহরণ। প্রথম যখন আঙ্কোরের বাঁধানো রাস্তায় গিয়ে কেউ পৌঁছবেন, সেই সময়ের গায়ে কাঁটা দেওয়া অনুভূতিটা বোধ হয় জীবনে একবারই হয়। আঙ্কোর চত্বরে এই মন্দিরটিই সবচেয়ে ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। কারণ, এটি কখনওই পরিত্যক্ত হয়নি। বারবার এখানে এসেছেন পর্যটক ও অভিযাত্রীরা এবং প্রতিবারই নতুন করে কোনও খুঁটিনাটি বিশেষত্ব খুঁজে পেয়েছেন। অনুমান করা হয়, দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের স্মৃতির উদ্দেশে বিষ্ণুর সম্মানে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। কারণ, তাঁকে অবতার বলে মনে করা হত। আঙ্কোরের মধ্যে আঙ্কোর ভাট মন্দিরটি নানা কারণেই বিশেষ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই মন্দিরের অভিমুখ পশ্চিম দিকে, যা মৃত্যুর অভিমুখ বলে মনে করা হয়। এ থেকেই বহু গবেষকের ধারণা হয়েছিল, প্রাথমিক ভাবে আঙ্কোর ভাট ছিল সমাধিক্ষেত্র। এই ভাবনার সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়েছিল কারুকার্যগুলি, যা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরে-ঘুরে দেখতে হয়। প্রাচীন হিন্দু ধর্মে শেষকৃত্য হত এ ভাবেই। যদিও বিষ্ণুর সঙ্গে পশ্চিমের যোগ আছে এবং এখনকার সাধারণ ধারণা হল, আঙ্কোর ভাট একই সঙ্গে মন্দির এবং দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের স্মৃতিসৌধ। আঙ্কোর ভাটের খ্যাতির সবচেয়ে বড় কারণ সুন্দরী অপ্সরারা।

আগে থেকে আঙ্কোর ভাট এবং আঙ্কোর শহর একটু চিনে নিলে, ঘুরতে সুবিধে হয়। পড়াশোনা করতে সমস্যা নেই, ছোটবেলা থেকে দাদু-ঠাকুরমার মুখে শুনে আসা হিন্দু পুরাণেরই চেনা সব গল্প। আঙ্কোর ভাটের প্যানেলগুলি দেখলে ভারতীয়দের চিনতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। না হলে ইউরোপীয়দের জন্য বিস্তৃত পরিচয়ের ব্যবস্থা আছেই, তার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে বিস্তৃত ও মনোমুগ্ধকর প্যানেলে আছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের সেনা, স্বর্গ ও নরক, সমুদ্রমন্থন, হস্তিদ্বার, বিষ্ণু কর্তৃক অসুর বধ, কৃষ্ণ ও বান, দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ, লঙ্কাকাণ্ড। ঠিক যেমন আঙ্কোরের দেওয়ালে যে দেবতাদের দেখা যায় তাঁরাও সবাই আমাদের চেনা— অপ্সরা অসুর দেব বরুণ অগ্নি গরুড় কাল লিঙ্গ পদ্ম মকর নাগ নন্দী অঙ্গুরী যম যোনি।

আঙ্কোর ভাটে প্রথম দর্শনে যা দেখে পর্যটকরা মুগ্ধ হয়ে যান তা হল, এর বিপুল আড়ম্বর। আর কাছে পৌঁছলে তাক লাগিয়ে দেয় কারুকাজের সম্ভার। আঙ্কোরের সময়ের পবিত্র ব্যক্তিত্বরা এর বহুস্তরীয় ধাপবিশিষ্ট অর্থ নিয়ে মাতামাতি করতেন। 'আঙ্কোর ভাট: টাইম, স্পেস অ্যান্ড কিংশিপ' বইয়ে লেখক ইলিনর মান্নিক্কা আঙ্কোর ভাটের বিস্তৃতির ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, এর দৈর্ঘ্য সনাতন হিন্দু ভাবনার চারটি যুগের সমান। যে পর্যটক আঙ্কোর ভাটের বাঁধানো রাস্তা দিয়ে মূল প্রবেশপথে আসছেন এবং চত্বরের মধ্য দিয়ে শেষ মূল টাওয়ারে পৌঁছচ্ছেন, রূপকার্থে তিনি ফিরে যাচ্ছেন মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রথম যুগে। উল্লেখ্য, এই স্তম্ভে একসময় বিষ্ণুমূর্তি ছিল। আঙ্কোরের অন্যান্য পাহাড় সদৃশ মন্দিরের মতোই আঙ্কোর ভাটও স্থান হিসেবে মহাবিশ্বের এক প্রতিলিপি। কেন্দ্রীয় টাওয়ারটি মেরুপর্বত, যার চারপাশে রয়েছে ছোট ছোট শৃঙ্গ, তাকে ঘিরে আছে মহাদেশ (নিচু চত্বর) ও মহাসাগর (পরিখা)। সাত মাথাওয়ালা নাগ প্রতীকী রামধনু সেতু হয়ে ওঠে, যার মাধ্যমে মানুষ দেবতার আবাসস্থলে পৌঁছতে পারে। মূল মন্দির চত্বরের চার পাশে ৮০০মিটার দীর্ঘ এলাকায় চমকে দেওয়ার মতো



প্রে খান মন্দিরের দোতলা কাঠামো

কারুকাজ আছে। কাজগুলি নির্দিষ্ট ক্রমে সজ্জিত, পশ্চিম দিক থেকে দেখা শুরু করলে সেগুলি বাঁ হাতে রাখতে হবে। বেশির ভাগ কাজই শেষ হয়েছিল দ্বাদশ শতকে, তবে ষোড়শ শতকে অসমাপ্ত কিছু প্যানেলের কাজ হয়।

এর পর আঙ্কোর দোমে গেলেই যেন এক নতুন জগৎ। অনেকগুলি মন্দির, অনেক গল্প। প্রাচীরে ঘেরা সেই এলাকায় প্রবেশ-প্রস্থানের জন্য পাঁচটি কুড়ি মিটার উঁচু তোরণ আছে। সেগুলি হাতির শুঁড় দিয়ে অলংকৃত এবং খোদিত আছে চারটি বৃহদাকার অবলোকিতেশ্বরের মুখ, আছে দয়াময় বোধিসত্ত্ব, প্রধান দিকগুলিতে মুখ করে আছে তারা। প্রত্যেক তোরণের সামনে আছে ৫৪টি দেবতার (বাঁধানো রাস্তার বাঁ দিকে) এবং ৫৪টি অসুরের (ডান দিকে) বিশাল মূর্তি। এ কাহিনি অবশ্য সমুদ্রমন্থন থেকেই নেওয়া। আঙ্কোর দোমের মূল মন্দির বায়োন। এটি সপ্তম জয়বর্মনের প্রতিভা এবং আত্মম্ভরিতার চূড়ান্ত উদাহরণ। এখানকার কারুকার্যে আছে ২১৬টি অবলোকিতেশ্বর মুখ, আর আছে রাজার কৃতিত্বের পরিচয়। প্যানেলে চোখে পড়বে চামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, লিঙ্গ পূজা, নৌযুদ্ধ, চামদের পরাস্ত করা, সেনার কুচকাওয়াজ, গৃহযুদ্ধ, সর্বদর্শী রাজা, বিজয় মিছিল, শহরে সার্কাসের আগমন, সমৃদ্ধ দেশ, চামদের অগ্রসর হওয়া, আঙ্কোরের পতন ও চামদের ক্ষমতা দখল। তা প্রোম মন্দিরটি ১১৮৬ সালে তৈরি। সে সময় এর নাম ছিল 'রাজবিহার'। বৌদ্ধ মন্দিরটি সপ্তম জয়বর্মনের মায়ের উদ্দেশে নিবেদিত। এই মন্দিরে যাঁরা থাকতেন এবং যাঁদের জীবনযাপন নির্ভরশীল ছিল এর উপর, তাঁদের কথা লেখা আছে মন্দিরের এক শিলালিপিতে। আঙ্কোর চত্বরে এই উদাহরণ বিরল। তা প্রোমে আছে অসংখ্য টাওয়ার, আচ্ছাদিত কোর্টইয়ার্ড এবং সরু করিডর। বিশাল বৌদ্ধমন্দির বান্টি দেই নির্মিত হয়েছিল দ্বাদশ শতকের শেষ লগ্নে। চার পাশে পুরু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এই মন্দিরের চারটি তোরণের অলংকারে রয়েছে গরুড়, যা তুলে ধরে আছে অবলোকিতেশ্বরের চারটি মুখ। প্রে খান মন্দির চত্বরটি আঙ্কোরের বৃহত্তমগুলির অন্যতম। অনুমান করা হয়, আঙ্কোর দোমের নির্মাণ চলাকালীন সপ্তম জয়বর্মনের অস্থায়ী বাসস্থান ছিল এটি। শিলাস্তম্ভ অনুসারে ১১৯১ সালে মন্দিরটি উৎসর্গীকৃত হয়। তাঁর আমলেই, দ্বাদশ শতকের শেষদিকে, তৈরি হয় প্রে নিক পন। এখানে চৌকো আকৃতির একটি বিরাট পুকুর আছে, চার পাশে আরও চারটি ছোট পুকুর। বড় পুকুরের মাঝখানে একটি গোলাকৃতি 'দ্বীপ', তাকে ঘিরে দু'টি নাগ। দ্বিতীয় রাজেন্দ্রবর্মনের আমলে তৈরি হয়েছিল প্রে রুপ। পাহাড় সদৃশ মন্দিরটি পিরামিড আকৃতির, যার সবচেয়ে উপরের তিনটে স্তরে আছে পাঁচটি পদ্মের টাওয়ার।

এ তো হল ইতিহাস যাপন। আর বর্তমান? সিয়েম রিপ শহরে পর্যটকদের জন্য সে বন্দোবস্তও পাকা। সারা দিন মন্দির এবং ইতিহাস দেখে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরলে ভ্রমণপিপাসুদের তৃপ্তির জন্য রয়েছে আস্ত একটা রাস্তা— পাব স্ট্রিট! শহরের কেন্দ্রস্থলের কাছে অবস্থিত সেই রাস্তায় গাড়ি চলে না। দু'পাশে স্ট্রিট ফুডের স্টল, রেস্তরাঁ এবং অবশ্যই নানাবিধ পানীয়ের বন্দোবস্ত। কোথাও আস্ত মাছ বারবিকিউ হচ্ছে, কোথাও নানাভাবে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিফ-পর্ক, কোথাও সাজানো আছে পানীয় ভর্তি পিপে! লোকাল ফুড চাখা যাঁরা বেড়ানোর অঙ্গ বলে মনে করেন, তাঁরা দেখতে পাবেন রাস্তার ধারে ডাঁই করে বিক্রি হচ্ছে হরেক ভাজাভুজি। তাতে উচ্চিংড়ে আছে, আরশোলাও আছে, আবার বেসনে ডুবিয়ে ভাজা হচ্ছে ব্যাঙও। এ সব অবশ্য প্রায় কোনও ভারতীয়েরই মুখে রুচবে না। তবে চিন্তা নেই, কারণ কাম্বোডিয়ায় স্বাদ-বৈচিত্রের অভাব নেই। লোকলাক বলে এক রকমের মাংসের পদ আছে, যা স্টিকি রাইস বা আঠালো ভাত দিয়ে খেতে হয়, নানারকমের সস দিয়ে তৈরি। আর আছে আমোক, তৈরি হয় নারকেলের দুধ দিয়ে।

সড়কপথে ভ্রমণ দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। তা হলে প্রশ্ন, সকলকে কি বাসেই যেতে হবে সিয়েম রিপ? ব্যাঙ্ককে নেমে দীর্ঘ বাসযাত্রা করে সিয়েম রিপ পৌঁছনোর পরিকল্পনা শুনেই অনেকে চোখ কপালে তুলেছিলেন। দীর্ঘ ৪০০ কিলোমিটার পথ। সব মিলিয়ে ঘণ্টা আটেক। এয়ারপোর্ট থেকে বাস স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে বাস ধরতে হবে, অর্থাৎ কোনও নিশ্চয়তা নেই। ভাষা-না-জানা বিদেশ বিভুঁইয়ে সেটা করা বিচক্ষণতা হবে কি? খাওয়াদাওয়ারও তো কোনও স্থিরতা নেই! তা ছাড়া, পৃথিবীর নানা প্রান্তেই ল্যান্ড বর্ডার পেরনো কত ঝক্কি। তবে গিয়ে বুঝলাম, এ অভিজ্ঞতা আসলে কত দামি, আর কত সহজ। আর সিয়েম রিপ শহরে যখন বাস ঢুকবে, দেখবেন, এত খোলামেলা সজ্জার শহর দেখলে কখনও ইউরোপ বলেও ভুল হতে পারে। বেড়ানোর শেষে অনেক রাত অবধি কখনও রাস্তায় অলস হাঁটাহাঁটি, কখনও ফুটপাথে বসে খাওয়াদাওয়া। পর্যটকদের এমন আদর্শ পরিবেশ। কাজেই দেশটাকে না হয় আর-একটু বেশি করেই দেখা হল। এই তো সুযোগ।



পুরনো বই

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

উত্তর কলকাতার সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বহু পুরনো একটা বাড়িতে যদুপতির বাস। এজমালি বাড়িটা বেজায় বড়, তবে বনেদি বাড়ি নয় বলে তেমন স্থাপত্যের বাহার নেই। চুন-সুরকির গাঁথনিওয়ালা আঠারো ইঞ্চি চওড়া দেওয়ালের নিরেট বাড়ি, আর তাতে অনেক শরিকের বাস। যদুপতি রায় থাকে একতলায় দু'টি ঘর, একটা দরদালান আর একচিলতে রান্নাঘরটুকু নিয়ে। বাথরুম বা কলঘরও একটা আছে বটে, তবে সেটা তার এক জেঠতুতো দাদার সঙ্গে ভাগাভাগিতে। যদুপতির বয়স বেশি নয়। বত্রিশ-তেত্রিশ, ফরসা রোগা চেহারা। অকৃতদার, এবং তার নেশা আর পেশা হল পুরনো বই আর পুরনো জিনিস কেনাবেচা। খুব যে বেশি আয় হয় তা নয়। তবে চলে যায়। পাশের গলিতে তাঁর একটা ঘুপচিমতো দোকানও আছে। সমঝদার সংগ্রাহকরা মাঝে মাঝে সেই দোকানে হানা দেয়। যদুপতির আরও একটা গুণের কথাও বলা দরকার। সে চমৎকার স্কেচ করতে পারে। আর পোর্ট্রেটের হাত তার এতই ভাল যে, পুলিশের আর্টিস্টস প্যানেলেও তার নাম আছে। আর সে বেশ ঘনঘনই ডাকও পায়। মুখে বিবরণ শুনে কারও মুখের স্কেচ এঁকে ফেলা বড় সোজা কাজ নয়। এর জন্য আলাদা এলেম লাগে, আর যদুপতির সেটা ভালই আছে। তবে পুলিশের প্যানেলে যে তার নাম আছে, তার জন্য দায়ী তার মাসতুতো আইপিএস দিদি ঝুমুর। ঝুমুরের মতো দিদি থাকলে যে-কোনও ভাইয়েরই অহংকার হওয়ার কথা। ঝুমুর দেখতে যেমন সুন্দরী, তেমনই সাংঘাতিক মেধাবিনী, আবার তেমনই দুর্দান্ত অ্যাথলিট ছিল। ওর বর শৌভিকও আইপিএস।

ডাকাতিটা করেছিলাম।"

"আপনি চিকিৎসা করাচ্ছেন না?

"করাচ্ছি। ফিজিওথেরাপি চলছে। ডাক্তার বলছে কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সেরে যাবে। ড্যামেজ তেমন কিছু হয়নি। নিউরোসার্জেন একটা অপারেশন করেছেন কিছুদিন আগে। তিনি আশাবাদী। আমি এখন কিছুক্ষণ দাঁড়াতেও পারি। হাতে সাড় ফিরেছে। ফিজিক্যাল ড্যামেজের চেয়ে আমার মনের ড্যামেজ হয়েছে অনেক বেশি।"

"আপনার অনুমতি নিয়ে আমি কি একবার অন্বেষার সঙ্গে দেখা করতে পারি?"

স্পষ্টই চমকে উঠে ছেলেটা। বলে, "কেন? ওর সঙ্গে দেখা করবেন কেন?"

"মেয়েটা অনুতপ্ত কি না সেটা জানা দরকার। আর হ্যাঁ, আপনার নামটা কিন্তু আমি এখনও জানি না।"

"সরি, ভুল হয়ে গেছে। আমার নাম অতন্দ্র বসু। আমি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আমার নিজস্ব একটা অডিট ফার্ম খোলার সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই সময়ে এই বিপত্তি। আর শুনুন, অন্বেষা অনুতপ্ত কি না সেটা জেনে কী হবে?"

"উনি যদি এখন একটা উলটো বিবৃতি দেন, তা হলে আপনি অনেকটা স্বস্তি বোধ করবেন।"

"অন্বেষা সেটা কখনও করবে না।"

"মেয়েটা এমনিতে কেমন মেয়ে বলে আপনার মনে হয়?"

"যে মেয়ে মিথ্যে কথা বলে একজনকে জেলে পাঠাতে পারে, সে কি ভাল মেয়ে হতে পারে?"

"মেয়েটি হয়তো ওর বাবার চাপে পড়ে এ কাজ করেছে। কে জানে অনিলবাবুই ওকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছেন কি না।"

"সেটা খুবই সম্ভব। আসল কথা আমাকে জেলে যেতে হয়েছিল ওর জন্যই। সেটা আমি ভুলব কী করে!"

"অনিলবাবুও কি উইটনেস ছিলেন?"

"উনি ডাকাতির সময়ে দিল্লিতে ছিলেন। কিছু দেখেননি।"

"অনিলবাবুর স্ত্রী?"

"তিনি তখন গলস্টোন অপারেশনের জন্য নার্সিং হোমে। বাড়িতে ছিল অন্বেষা, তার ছোটবোন দিশা আর দুটো কাজের মেয়ে। তারা কেউই আমার কথা বলেনি প্রথমে। উকিলের জেরায় শেষমেশ তারাও আমার কথা কবুল করেছে। সেটা অন্বেষার চাপেই হয়তো।"

"আমি তবু অন্বেষার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আপনার কি খুব আপত্তি হবে?"

"আপত্তি তো আছেই। ওর কাছে কোনও অনুগ্রহ নেওয়া তো সম্ভব নয়।"

"অনুগ্রহ নেওয়ার প্রশ্নই নেই। আমি শুধু মেয়েটার মনোভাব বুঝতে চাইছি। একটা ভুল বা অন্যায় করলে মানুষের তো অনুতাপ হয়!"

"তাতেই বা কী লাভ বলুন তো!"

"লাভ আছে। আপনি যে মনোকষ্টে আছেন, তা থেকে হয়তো ছুট পাবেন।"

"অসম্ভব। এই কষ্ট আমার সহজে যাওয়ার নয়।"

"অন্বেষার এখন বয়স কত?"

"বাইশ-তেইশ হবে হয়তো। ঘটনার সময়ে ওর বয়স বোধ হয় সতেরো বছর। আগে অনিলবাবুদের সঙ্গে আমাদের বেশ সদ্ভাবই ছিল। মাঝে-মাঝেই স্ত্রী আর মেয়েদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন। আমার মা আর দু'টি ছোট বোনের সঙ্গে অনিলবাবুর মেয়েদের খুব ভাবও ছিল। কিন্তু প্রোমোটিংয়ে রাজি না হওয়ায় সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। শুনুন, আপনার কাছে আমি একটা জিনিস বিক্রি করতে চাই বলেই আপনাকে নিয়ে এসেছি। কথাগুলো শোনালাম বলে কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে এই কেসটার একটা ক্ষীণ যোগাযোগ আছে বলেই বলতে ইচ্ছে হল।"

"আপনি যে মনোকষ্টে আছেন, তাতে কাউকে ব্যাপারটা বললে মন একটু হালকা হয়। আমি আপনার প্রবলেমটা বুঝেছি। কিছু মনে করিনি। প্রথমে একটু সন্দেহ হয়েছিল ঠিকই, তবে আপনার কাহিনি শুনে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। আমি কিন্তু অন্বেষার সঙ্গে দেখা করব।"

অতন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "লাভ নেই। তবু ইচ্ছে হলে করবেন।"

ড্রয়ার থেকে একটা পুরনো চেহারার চামড়ায় বাঁধানো বই বের করে বলল, "এটা আরলি শেক্সপিয়ার। আঠারোশো সতেরো সালে ছাপা। এতে রাজা রামমোহন রায়ের সিগনেচার আছে। হ্যামলেট। অবশ্য সইটা অথেনটিকেটেড নয়। সেটা আপনি যাচাই করতে পারবেন নিশ্চয়ই।"

বইটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখল যদু। তারপর বলল, "সইটা জেনুইন হলে এর ভাল দাম পাবেন।"

"আপনি বইটা নিয়ে যান। যদি কাস্টমার পান, তা হলে আমাকে টাকা দেবেন।"

যদু একটু হেসে বলে, "আমাকে এতটা বিশ্বাস করলেন বলে ধন্যবাদ।"

দিনতিনেক বাদে সন্ধেবেলায় অন্বেষার ঠিকানায় বাগবাজারে হাজির হল যদু। মাঝারি মাপের একটি চমৎকার ডিজাইনের বাড়ি, নীচের তলায় একটা ব্যাঙ্ক। একপাশে একটা ফটক, ছোট্ট একটু জমি, তার পরেই দোতলায় ওঠার বেশ চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখেই একজন উর্দিধারী গার্ড দাঁড়িয়ে আছে।

"কাকে চাই?"

"অন্বেষা কি আছে?"

"আছেন। একটু দাঁড়ান। ফোনে নাম বলতে হবে।"

"আমার নাম যদু রায়।"

ফোনে নামটা বলতেই অনুমতি পাওয়া গেল। বেশ অবাক হল যদু। তাকে মনে রাখার তো কোনও কারণ নেই।

ওপরে উঠতেই বেল দেওয়ার আগে দরজা খুলে একটি ছিপছিপে, ভারী সুন্দর মুখশ্রীর একটি মেয়ে তাকে দেখে হাসিমুখে বলল, "আসুন।"

যদু বলে, "আপনি আমাকে কি মনে রেখেছেন?"

"আমার মেমারি খুব ভাল। আর আপনার ছবি আঁকার ঘটনাটা আমি ভুলতে পারিনি।"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যদু। নতুন করে পরিচয় দিতে হল না। বৈঠকখানায় তাকে বসিয়ে অন্বেষা বলে, "কী খাবেন বলুন।"

"কিছু না। একটু খাওয়ার জল।"

অন্বেষা মুখ টিপে হেসে বলে, "তা বললে হবে কেন?"

অন্বেষা ভিতরে গিয়ে কিছু বলে এসে মুখোমুখি বসে বলে, "এবার বলুন।"

যদু মৃদুস্বরে বলে, "আমি অতন্দ্র বসুর কথা আপনার কাছে জানতে চাই। লোকটা কি সত্যিই অপরাধী?"

অন্বেষার মুখটা হঠাৎ মলিন হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে সে বলে, "এই একটা ঘটনা গত চার-পাঁচ বছর ধরে আমাকে কুরেকুরে খাচ্ছে। কত রাত ঘুমোতে পারিনি। না, টুকুদা অপরাধী নন।"

"টুকু কে?"

"অতন্দ্রর ডাকনাম, বরাবরই ওকে টুকুদা বলেই ডাকতাম। কী করে যেন আমাদের দুই বাড়ির সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খুবই খারাপ।"

"তার মূলে কি প্রোমোটিং?"

"আপনাকে টুকুদা কিছু বলেছে নাকি?"

"হ্যাঁ। সম্প্রতি আমাদের আলাপ হয়েছে। ওঁর এখনকার অবস্থা..."

"আমি সব জানি। টুকুদা আমার খবর না রাখলেও আমি ওঁর সব খবর রাখি। ওঁর ড্রাইভার জুরন আগে আমাদের ড্রাইভার ছিল।"

"খবর রাখেন কেন?"

একটু লাল হয়ে অন্বেষা বলে, "একজনকে এরকম বিপদে ফেলে দিয়েছিলাম তো! তাই বড্ড অনুশোচনা হয়েছিল। কিন্তু আমার তখন আর কিছুই করার ছিল না। আমাদের পুরনো উকিল আমাকে দিয়ে জোর করে মিথ্যে কথাটা বলিয়েছিল। ডাকাতদের আমি চিনতে

পেরেছিলাম। টুকুদাদের বাড়ির পিছনের বস্তির ছেলে। টুকুদার বাড়িতে আসত। উকিলকাকা সেটা শুনেই বলল, বাঃ, তা হলে এক ঢিলে দুই পাখিই মারা যায়! বাবারও সায় ছিল। আমার বাবা প্রচণ্ড রিভেঞ্জফুল। কেউ কোনও ক্ষতি করলে উনি তার ওপর শোধ তুলবেনই। টুকুদা প্রোমোটিং রিফিউজ় করছিল একটু রাফ ভাবে। তাইতেই বাবা ক্ষেপে যান। দু'জনে খুব ঝগড়া ঝামেলা হয়েছিল।"

"আমি আইনজ্ঞ নই। কিন্তু মনে হয় ঠিকমতো সওয়াল করলে অতন্দ্রর সাজা হত না। এত কাঁচা মামলা হেরে যাওয়ার কথা নয়।"

"আপনি ঠিক ধরেছেন। টুকুদার উকিলকে এক লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল মামলাটা হেরে যাওয়ার জন্য। হাই কোর্টেও টুকুদা হেরেছিল। আমার বিশ্বাস সেখানেও টাকার লেনদেন হয়েছিল। নিজের ওপর আমার এখন খুব ঘেন্না হয়।"

"না, আমি অতন্দ্রকেও বলেছি আপনি হয়তো চাপে পড়ে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিলেন। তবে আপনি তো অতন্দ্রর কাছে গিয়ে সব খুলে বলতে পারতেন।"

"অনেকবার ভেবেছিলাম, কিন্তু সাহস হয়নি। টুকুদা আর তার মা-বোনেরা আমার ওপর নিশ্চয়ই খুব রেগে আছে! ওরা আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেবে।"

"না, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। অতন্দ্র বোধ হয় তেমন লোক নয়।"

একটু মিষ্টি হেসে অন্বেষা বলে, "আমি এখনই যেতে পারি। তিল তিল করে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে একবার মুখোমুখি হওয়া ভাল।"

অবাক হয়ে যদু বলে, "সত্যিই যাবেন! তা হলে চলুন।"

"আপনি সঙ্গে আছেন বলেই সাহস পাচ্ছি। চলুন, এই ঘরোয়া পোশাকেই যাই।"

"আপনার মতো সুন্দরীদের মেকআপের দরকার হয় না। চলুন।"

অতন্দ্র বাইরের ঘরেই ছিল। একটা বই পড়ছিল বসে। তাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "বইটা কি বিক্রি হয়ে গেছে?"

"না, তবে হয়ে যাবে। রামমোহনের সইটা জেনুইন বলেই মনে হচ্ছে। তবে আজ আমি একজনকে সঙ্গে করে এনেছি।"

"কে বলুন তো!"

পরদাটা সরিয়ে যদু বলল, "আসুন।"

অন্বেষা ঘরে ঢুকতেই অতন্দ্র কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল। তারপর ভারী সুন্দর একটু হেসে বলল, "কেমন আছো, অনু?"

অন্বেষা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল, আর তার পরেই অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে হাঁটু গেড়ে অতন্দ্রর হাঁটুতে মুখ গুঁজে বলতে লাগল, "আমি ভাল নেই টুকুদা, আমি একটুও ভাল নেই।"

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল যদু। তারপর বাস ধরে বাড়ি ফিরল। তিন মাস পরে বই বিক্রির পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে যখন অতন্দ্রর বাড়িতে গেল, তখন দেখল অতন্দ্র দিব্যি হাঁটতে পারছে। টাকা পেয়ে মিষ্টি হেসে বলল, "এত টাকা!"

বিদেশ হলে আরও বেশি পেতেন।

আট মাসের মাথায় এক সন্ধেবেলায় অন্বেষা আর অতন্দ্রর বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গেল যদু।

শিল্পী: রৌদ্র মিত্র